সেই সময়

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭১

প্রকাশক :

মৈনাক বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

অজয় বর্ধন

দীপ্তি প্রিন্টার্স

৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

কালীপ্রসন্ন সিংহ স্মরণে

সেই সময়

দ্বিতীয় খণ্ড

সেই সময়

দ্বিতীয় খণ্ড

শীতের শেষ কিন্তু গ্রীষ্ম এখনো তেমনভাবে আসরে নামেনি। বাতাস মোলায়েম আর রোদ্দুর যেন রেশমী ওড়না। বাজারে এখনো তরিতরকারি টাটকা সতেজ। দিনের বেলা জাগরণের সময় সহসা ক্লান্তি আসে না, রাত্রির নিদ্রা সুখকর। সময়টি প্রকৃতই মধুর।

বাংলায় বসন্ত শুধু কবি-কল্পনায় আর মা-শীতলার দয়ার প্রকাশে। শীত যেতে না যেতেই গা-পোড়ানো গ্রীষ্ম হুড়মুড় করে এসে পড়ে। কিন্তু এ বৎসরটি যেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতু যেন কিছু ব্যবধান রেখে দুই ধারে দণ্ডায়মান আর মধ্যখানে এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বহুকালের অজ্ঞাত-বাসের পর ঋতুরাজ বসন্ত। সুন্দর, সুস্নিগ্ধ, পিকরব মুখরিত, মন-উচাটন বসন্তকাল।

ছাতুবাবুর মাঠে সার সার তাঁবু পড়েছে। সকাল থেকে সেখানে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা। আর মাঝে মাঝেই তার মধ্য থেকে চিৎকার উঠছে, ধ্যো মারা, ধ্যো মারা।

লাল বুলবুলি, শা বুলবুলি আর সেপাই বুলবুলি। লাল বুলবুলির সর্বাঙ্গই প্রায় কুচকুচে কালো, শুধু পেটের তলা আর লেজ লালবর্ণ। আর শা বুলবুলি শাবক অবস্থায় থাকে পুরো খয়েরি, ক্রমশ শরীরের নানা অংশের রঙ সাদা হতে থাকে, মাথায় ঝুঁটি, ডাগর চোখে চঞ্চলভাবে তাকায় আর গলা ফুলিয়ে ডাকে।

তবে আসল লড়াকু হল সেপাই বুলবুলি। এদের ডানা খয়েরি, কিন্তু মাথার দু পাশে লাল রঙের রেখা। ঝুঁটিটি কালো। যেন সেপাইদের মতন লাল-কালো উষ্ণীষ পরে আছে মাথায়।

এক একজন বড় মানুষের তাঁবুতে বিশাল বিশাল খাঁচায় রাখা আছে এই সব শিক্ষিত, যোদ্ধা পাখিদের। খালিফারা তাদের সর্বক্ষণ তোষামোদ করে চলেছে শিস দিয়ে। আজকের দিনটিতে বাবুদের চেয়ে বাবুদের বুলবুলিরাই নায়ক। সালিশী মশায় হাঁক দিলে এক একজন বাবু একজোড়া করে পক্ষী নিয়ে আসছেন লড়াইয়ের আঙিনায়। এই বুলবুলিগুলিকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে উপবাসী রাখা হয়েছে, সালিশী মশাই মাঝখানে এক খাবলা কাবলি ছোলা ছড়িয়ে দেবার পর দু পক্ষের দু জোড়া বুলবুলি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। এদের এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিপক্ষীয় পক্ষীদের আগে হটিয়ে না দিয়ে দানায় মুখ দেয় না। পক্ষীতে পক্ষীতে ঝটাপটি বেঁধে যাবার পর দর্শকরা তুমুল হাততালি ও গালবাদ্য দিয়ে ওদের আরও উত্তেজিত করে তোলে। তারপর এক পক্ষের আহত বুলবুলি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেই দর্শকরা দুয়ো দেয়, ধ্যো মারা।

এই খেলার উদ্যোগের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয়িত হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। তবে যারা বহু বৎসর বুলবুলির লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, যারা আসল সোয়াকীন, তাদের

মতে, এ বৎসর খেলার মধ্যে যেন তেমন ধার নেই। কোথায় সেই আড়ম্বর, সেই গীত বাদ্য, সেই পয়সার ঝনঝনি। বাবুদের যেন তেমন আর মৌরোদ নেই। এই মাঠেই মল্লিকবাড়ির বাবু হরনাথের সঙ্গে লড়েছিলেন ছাতুবাবু স্বয়ং। পক্ষীর খেলা তো নয় যেন এক ধুন্দুমার কাণ্ড। সে দৃশ্য এখনো অনেকের মনে আছে। রাজা সুখময় রায়ের পুত্রেরাও এ খেলায় ঢেলে দিতেন অঢেল টাকা। আর সে রকম উঁচু নজর ক'জনের আছে।

দু বৎসর আগেই যেন হয়ে গেছে শেষ জমজমাট বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ। সেবার এসেছিলেন রাজা সুখময় রায়ের বংশেরই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিশাল পক্ষিবাহিনী নিয়ে। আগে থেকেই ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বুলবুলিদের রুখতে পারে এমন বুলবুলিওয়ালা ভূ-ভারতে কেউ নেই। তাঁর বুলবুলিদের যদি সত্যিই কেউ হারাতে পারে তাহলে তিনি নিজের মাথার মুকুট খুলে রাখবেন প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে। সে খেলা দেখতে ছুটে এসেছিল লাখে লাখে মানুষ, এমনকি সাহেব রাজপুরুষরাও আসর ঘেঁষে সার বেঁধে দণ্ডায়মান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভূতপূর্ব অঘটন ঘটে গিয়েছিল সেবারেই। অতবড় মানী লোক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, তাঁকে কিনা টক্কর দিতে এলো কোথাকার এক দয়াল মিত্তির।

বেলা দশটা থেকে খেলা শুরু, প্রথম খেলাতেই রাজার পক্ষী ঘায়েল। তার পরের বারও। এবং তার পরের বার। মোট পঞ্চাশ জোড়া পক্ষীর খেলার ফলাফল নিয়ে জয় পরাজয় হবার কথা, কিন্তু সাঁইতিরিশ বার খেলার মধ্যে সাতাশবারই হারলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর প্রথম দিকের বিস্ময় ক্রমশ পরিণত হলো গভীর শোকে। তাঁর অনুচরেরা নিয়মিত খবর রেখেছে যে কলকাতায় কোন কোন বাড়িতে পক্ষীদের কেমন তালিম দেওয়া হয়। একবারও দয়াল মিত্তিরের নামও কেউ উচ্চারণ করেনি। খেলার শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না রাজেন্দ্রনারায়ণ, দারুণ বিমর্ষ মুখে কুরুক্ষেত্রের দুর্যোধনের মতন রণে ভঙ্গ দিলেন।

লোকে বলে, সেই বুলবুলির লড়াইতে হেরে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মনের দুঃখে লালাবাবুর মতন বিবাগী হয়ে গেছেন।

এ বৎসরের রণাঙ্গনে সেই দয়াল মিত্তিরই জাঁকিয়ে বসে আছেন মাঝখানে, কিন্তু প্রতিপক্ষ বিশেষ কেউ নেই। কিছু কিছু নতুন উঠতি বাবু তাঁবু ফেলেছেন বটে, কেউ পাঁচ গণ্ডা, কেউ দশ গণ্ডা পক্ষীও এনেছেন। কিন্তু তাদের না আছে তেমন সহবৎ, না আছে রোশনাই। এই সব ফাতাবাবুদের নামই আগে শোনা যায়নি। সেইজন্য ঝানু দর্শকরা নাসিকা কুঞ্চিত করে মন্তব্য করছে, এ যে দেকচি বাওয়া সড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসের ছেলে গো! ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাঙ!

সাধারণ দর্শকদের থেকে খানিকটা দূরে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে যুগলসেতুর সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের সন্তান নবীনকুমার। এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় যুবা। সে পরিধান করে আছে হলুদ রঙের চায়না কোট ও সাদা পাণ্টলুন, কালো ইংলিশ লেদারের জুতো কিন্তু মাথায় টুপি পরেনি। বুকপকেটে একটি স্বর্ণময় ঘড়ি, তার গার্ড চেইনও সোনার। বাঁ হাতের তর্জনীতে একটি বৃহদাকার হীরকসমন্বিত অঙ্গুরীয়। তার কোমল লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল।

নবীনকুমারের পাশে দণ্ডায়মান তার সর্বক্ষণের সঙ্গী দুলালচন্দ্র। এই দুলাল-চন্দ্রের চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে। তার মনিবের চেয়ে সে কয়েক বৎসরের

বড়, মাত্র গত বৎসরই সে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে মনে হয় পালোয়ানের মতন। চওড়া স্কন্ধ, চওড়া কব্জি, ঘাড় স্থূল। বড় বড় চুল রেখেছে সে। নবীনকুমারের এখনো কণ্ঠ ভাঙেনি, তার স্বর কোমল, সুরেলা, অনেকটা নারীদের মতন। সেই তুলনায় দুলালচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বয়স্ক পুরুষদের মতন। সে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে এবং গায়ে একটি তুলোর বেনিয়ান। ইদানীং সে বিম্ববতীর নির্দেশে নবীনকুমারকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলে।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুই আরও দেক্‌তে চাস?

দুলালচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে, আপনি যা বলবেন।

নবীনকুমার বললো, তুই দেক্‌তে চাস তো দ্যাক্‌, আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে না। আমিও যাবো।

বস্তুত দুলালচন্দ্র এই খেলা খুবই উপভোগ করছিল। বুলবুলির মতন নরম, সুশ্রী চেহারার পক্ষীও যে ঠোঁট দিয়ে একে অপরের উদর ফুটো করে দিতে পারে, সে আগে কখনো কল্পনাও করেনি। যুদ্ধে পরাজিত কোনো বুলবুলি যখন ওড়ার চেষ্টা করেও বার বার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন অন্য দর্শকদের সঙ্গে সেও উত্তেজনায় গলা মিলিয়েছে।

নবীনকুমার আগাগোড়া নীরব ছিল। দুলালচন্দ্রের অত্যুৎসাহ তার নজর এড়ায়নি। ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে সে বললো, তোর মতন পাঁচপেঁচী লোকদের এই বুলবুলির লড়াইয়ে মন চুলবুলোবে তাতে আশ্চর্যির কিচু নেই—

দুলালচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, আজ্ঞে, আপনার ভালো লাগেনি?

নবীনকুমার বললো, বড় বড় বংশের মানী মানী লোকেরা যে এমন ছেলে-খেলায় মজে, সেটাই বড় তাজ্জবের কতা। পণ্ডগব্যের আসল গব্যটি এদের মাতায় পোরা নিশ্চয়। কোর্তা উল্টে দ্যাখ, এদের সবার পেছুনে একটা করে ন্যাজ আচে!

দুলালচন্দ্র সবটা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো।

গম্ভীর ভারিক্কী চালে অগ্রসর হতে হতে নবীনকুমার আবার বললো, দেশটা ধনী বংশের মর্কটে ছেয়ে গ্যাচে, আর সেই সুযোগে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ইংরেজ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্চে সব। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। বুলবুলি লড়াইয়ের এত নামডাক শুনিচি, তা কিনা এই। এর চেয়ে মেয়েমানুষের পুতুল খেলাও ভালো।

ভিড় ছাড়িয়ে বাইরে এসে নবীনকুমারের মুখের ভাবের পরিবর্তন হলো। হাসি ফুটলো এই প্রথম। সে বললো, তবে একটা ব্যাপারে আমি খুশী হয়েচি। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্তর সব কটা পাখির ঠ্যাং খোঁড়া হয়েচে, ওকে হারিয়ে একেবারে ভুষ্টিনাশ করে দিয়েচে। বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, ভালো হয়েচে।

দুলালচন্দ্র কালীপ্রসাদ দত্তকে চেনে না, সে বুঝতে পারলো না সেই বিশেষ ব্যক্তিটির হার হওয়ায় তার মনিব এত খুশী কেন।

নবীনকুমার আপন মনে একটুক্ষণ হাসলো, তারপর একদিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বললো, ওদিকে চ।

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে, গাড়ি এদিকে।

নবীনকুমার এক ধমক দিয়ে বললো, জানি! ওদিকে চ!

ছাতুবাবুর মাঠে এই বুলবুলির লড়াই উপলক্ষে বেশ বড় একটা মেলা বসে যায়। পর পর মেয়া, মুড়কি, পাঁপড় আর তেলেভাজার দোকান। কিছুদিনের

মধ্যেই গাজনের উৎসব আসছে, সেইজন্য রকমারি মাটির পুতুল, গামছা, হাঁড়ি-কুড়ির ব্যাপারীরা আসে। কাছেই রামবাগান, সেখানকার অবিদ্যা-স্ত্রীলোকেরা খাতায় খাতায় আসে কেনাকাটি করতে।

আর আসে পক্ষী বিক্রেতারা। নানা জাতের গৃহপোষ্য, রঙ-বেরঙের ছোট বড় পাখি তো থাকেই, সবচেয়ে বেশী থাকে বুলবুলি। নতুন বাবুরা আগামী বৎসরের লড়াইয়ের জন্য এখান থেকেই বুলবুলি কিনে নিয়ে যায়। কোন কোন বিশিষ্ট খালিফার তালিম দেওয়া বুলবুলি, দোকানদাররা সেইসব নাম হাঁকাহাঁকি করছে।

একটি পাখির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো নবীনকুমার। দুলালচন্দ্রকে বললো, কত দাম জিজ্ঞেস কর।

দুলালচন্দ্র বিস্মিত হলো। এইমাত্র তার মনিব নিন্দে করলো এই পাখির লড়াইয়ের, এবার সে নিজেই পাখি কিনবে নাকি? আগামী বছর এখানে তাঁবু খাটিয়ে খেলতে আসবে? তার খামখেয়ালী মনিবের মনের গতিবিধি বোঝা ভার।

একজোড়া বুলবুলির দাম চার টাকা।

তা শুনে দুলালচন্দ্রের চোখ প্রায় কপালে ওঠার অবস্থা। এ লোকগুলো বলে কী? এরা ঠ্যাঙাড়ে না গলা কাটা? সাত আট টাকায় একটি দুধেল গাই পাওয়া যায়, আর এই টুকুন টুকুন এক একটা পাখনার দাম দু'টাকা? তার কম বয়স্ক মনিবকে দেখেই এরা বুঝতে পেরেছে সে খুব বড় মানুষের সন্তান, তাই এরা দাঁও মারতে চাইছে।

দুলালচন্দ্র বললে, দিনে ডাকাতি পেইচিস ব্যাটারা?

তখন পাশাপাশি দোকানদাররা বলতে লাগলো, বাবু ছায়েব, জমির শেখ খালিফার নাম শোনেননি? খিদিরপুরের জমির শেখ! তেনার নিজের হাতের শিকুনো...বাবু ছায়েব, মিঞা হোসেন সা, তিনি আরও বড় খালিফা, এই দ্যাখেন।

নবীনকুমার বললো, দরদাম কর। আমি কিনবো।

অনেক ধস্তাধস্তি করে দু'টাকা জোড়ায় নামানো গেল। এর থেকে আর কমানো যাবে না।

নবীনকুমার কোটের লম্বা পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই সবচেয়ে বড় খাঁচাটায় কটা বুলবুলি আচে গুণে দেকতে বল্।

হিসেব করাই ছিল, আবার গণনা করা হলো। ছ্যাঁচা বাঁশের লম্বা খাঁচাটিতে রয়েছে পঞ্চাশ জোড়া সেপাই বুলবুলি।

নবীনকুমার ঝনঝন করে একশোটি টাকা ছুঁড়ে দিল দোকানীর সামনে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে খাঁচার দরজাটা সে নিজেই খুলে ফেললো।

কোনো বড় খলিফার কাছেই এসব পাখিরা তালিম পায়নি। যারা ধরে, তারাই কিছুদিন পায়ে সুতো বেঁধে রেখে একটু একটু পোষ মানায়। খাঁচার দরজা খোলা পেলেও এরা উড়ে যায় না সহসা।

নবীনকুমার তাদের ডাকতে লাগলো, আয়, আয়। একটা পাখিকে সে খপ করে ধরে ফেলে বাইরে আনলো। তারপর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, যাঃ।

বুলবুলিটা ডানা ঝটপটিয়ে একটুক্ষণ ঘুরপাক খেল, বিস্মিত চোখে বুঝি একবার দেখে নিল মুক্তিদাতাকে, তারপর উড়ে চলে গেল।

দোকানদার আঁতকে উঠে বললো, আরে করেন কী, করেন কী ছায়েব?

খাঁচার ওপর দু হাতের চাপড় মারতে মারতে নবীনকুমার বলতে লাগলো, আয়! আয়! বাইরে আয় সব।

ফুরুৎ ফারাৎ করে উড়ে বেরুতে লাগলো একটি দুটি বুলবুলি। নবীনকুমার

নিজেও হাত ঢুকিয়ে একটা করে ধরে এনে ওপরের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, যাঃ। যেখেন ঠেঙে এসিচিস, সেখেনে যা। মাঠের ধান খা গিয়ে। হিমালয় পাহাড়ে উড়ে যা।

একশো বুলবুলি কয়েক মিনিটেই শেষ। নবীনকুমার পাশের খাঁচাটির কাছে সরে গিয়ে বললো, এটার মধ্যে কত আচে, হিসেব করো।

দেখতে দেখতে ভিড় ভেঙে লোকজন ধেয়ে এলো সেদিকে। মল্ল খেলা ছেড়েও দর্শকেরা চলে এলো নবীনকুমারকে দেখতে। দাবানলের মতন খবর রটে গেল যে সিংগীবাড়ির ছোটকুমার দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। টাকা ওড়ানো নয় তো কী! এক একটা পাখি এক টাকা। অনেকে আবার সেই পাখিগুলিকে ধরার জন্য লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগলো, কিন্তু একজনও একটাও ধরতে পারলো না।

তিনটি খাঁচা খালি করার পর নবীনকুমার একটু থামলো। কয়েকটি বুলবুলি কাছেই একটা বকুলগাছে বসে বিস্মিতভাবে ডাকাডাকি করছে। একঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর আকাশে। নবীনকুমার সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো, সে এখন সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করছে। সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে যে এমন আনন্দ পাওয়া যায়, সে জানতো না।

তার কাছে আর টাকা নেই। সে হাতের হীরক অঙ্গুরীয়টি খুলে দুলালচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ইদিকে কোতায় স্যাকরার বাড়ি আচে দ্যাক। এটা বেচে যত টাকা পাস নিয়ায়।

দুলালচন্দ্র কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, ছোটবাবু, এবার উঠুন। আর দরকার নেই।

—তোকে যা বলচি কর!

—আজ্ঞে ও আংটি আমি বেচতে পারবো না, কত্তামা তা হলে আমায় রক্ষে রাখবেন না। ও আপনার বাবার আংটি।

—তবে যা, বাড়ি থেকে টাকা নিয়ায়।

—আর থাক না। এবার উঠুন বরং—।

নবীনকুমার ওর সঙ্গে আর কোনো বাক্যব্যয় না করে আর একটি খাঁচার দরজা খুলতে গেল। সে খাঁচার মালিক হা হা করে উঠতেই সে ধমক দিয়ে বললো, কাল সিংহ বাড়িতে গিয়ে ডবল দাম নিয়ে আসবি। আমার কতার দাম লাখ টাকা।

বুলবুলির লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ একেবারে দর্শকশূন্য। সমস্ত মানুষ এখন এদিকে। নবীনকুমার এক একটি খাঁচা খুলছে আর তুমুল আনন্দের শোরগোল উঠছে। ছাতুবাবুর বাগানে এমন অভিনব দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি। দয়াল মিত্তির, কালীপ্রসাদ দত্ত পর্যন্ত নিজেদের তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছেন এই নতুন খেলা দেখতে।

নবীনকুমার সব কটি খাঁচা শেষ করলো যখন, তখন ওদিকে বুলবুলির লড়াই অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেছে। যিনি সালিশী করতে এসেছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে হাঁটা দিয়েছেন বাড়ির দিকে।

নবীনকুমার যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন ঘন ঘন জয়ধ্বনি দেওয়া হতে লাগলো তার নামে। তার যাওয়ার পথ করে দেবার জন্য জনতা বীরের সম্মান দিয়ে ফাঁক হয়ে গেল। নবীনকুমারের জুড়িগাড়ি পর্যন্ত বহু লোক এলো তার পেছন পেছন।

জুড়িগাড়িটির ঠিক সামনে রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল এক উন্মাদ। তার বয়েস হবে বছর পঞ্চাশেক, কাঁচা-পাকা চুল ও দাড়িগোঁফ বহুকালের ধুলোয় জট পাকানো।

এত মানুষের শোরগোলে সে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। সামনেই নবীন-কুমারকে দেখে সে হাত দুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে বললো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো!

নবীনকুমার পাগল, মাতাল ও পুলিশদের অত্যন্ত অপছন্দ করে। একেবারে মুখোমুখি এক বলশালী উন্মাদকে দেখে সে বলে উঠল, দুলাল!

দুলালচন্দ্র অমনি এক কঠিন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল উন্মাদটিকে।

নবীনকুমার গাড়িতে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দিল।

দুলালচন্দ্র পাশের পাদানিতে দাঁড়িয়ে বললো, সহিস, হাঁকো। জুড়িগাড়ি চলে গেল কপকাপিয়ে।

সেই উন্মাদ তখন অন্যদের বলতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবে, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

শহরের মানুষ বড় বিচিত্র রকমের আমোদখোর। অনেকে তখন সেই পাগলটিকে নিয়ে পড়লো। এ ব্যাটা চিঁড়ে চায় না, জল চায়। আগে চিঁড়ের খোঁজ কর, জল তো কত রয়েছে, পাঁচ পা অন্তর একটা করে পুকুর।

—বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

সবাই সামনে থেকে সরে যায়, আর একটু দূরে থেকে বলে, আরে ব্যাটা, চিঁড়ে খাবি কেন, ভাত খা, ভেজাতে হবে না। আর একজন বললো, ভাত কেন, পোলাউ খা না, মনে মনে খাবি যখন, তখন পোলাউতে আপত্তি কী!

লোকটি যেন কারুর কথাই শুনতে বা বুঝতে পারে না। একঘেয়ে কাকুতি-মাখা গলায় ও শুধু বলে চলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

এক সময় অপরাহ্ণ শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো, মেলা সাঙ্গ হলো। ছাতুবাবুর বাগান জনশূন্য হয়ে গেল। পশ্চিম দিগন্তে আকাশ অরুণ বর্ণ, রাত্রির মজলিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নগরী। গাছের ডালে ডালে এখনও কল-কূজনে মত্ত হয়ে আছে অনেক পক্ষী। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই স্বাধীন বুলবুলি।

কাছাকাছি আর কোনো মানুষ নেই, তবু সেই উন্মাদটি বলে যেতে লাগলো, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো।

উন্মাদটি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। কিন্তু সে কেড়ে খেতে জানে না। মস্তিষ্কের গোলযোগ হেতু সে ভিক্ষার সঠিক ভাষাটিও বলতে পারে না। সে যদি বলতো, বাবু, একটু চিঁড়ে দিন, জলে ভিজিয়ে খাবো, কেউ হয়তো দয়াপরবশতঃ তাকে কিছু খাদ্য দিত। কিন্তু ভাষার ভুলের জন্য তার ক্ষুধার কথা কেউ বুঝলো না। সে সবার উপহাসের পাত্র হলো।

কিন্তু সে কী করবে। বহুকাল আগে সে শুকনো চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবার জন্য জলের সন্ধানেই বেরিয়েছিল। সে কথাই তার মনে গেঁথে আছে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে সেই মূর্খ উন্মাদটি এক একবার রক্তবর্ণ আকাশের দিকে চায়, তারপর নিকটবর্তী কোনো পথচারীকে দেখলে আবার সেই ভুল ভাষাতেই বলে, বাবু, এট্টু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবো!

পথচারীরা ভয় পেয়ে বলে, আ মলো যা, এ ব্যাটা কে রে, দূর হ! দূর হ!

কিছুদিন আগে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে বড় রকম একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা কারুকে প্রাণে মারতে পারেনি কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে সবই। এমনই অবস্থা যে পরদিন থালা-বাটি, হাঁড়িকুঁড়ি কিনে না আনলে ভাত খাওয়ারও উপায় নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র সে সময় গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দস্যু মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ মশাল ও বর্শা হাতে নিয়ে আক্রমণ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ও বাড়ির অন্য লোকজনদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজে প্রস্তুত রইলেন ডাকাতদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু হট্টগোল শুনেও গ্রামবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসেনি, একা ঈশ্বরচন্দ্র কী করবেন। বাড়ির লোকেরা সবাই ঈশ্বরচন্দ্রকে পলায়ন করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কিন্তু এ গোঁয়ার ব্রাহ্মণ একবার জেদ ধরলে সহজে ছাড়বে না। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী দীনময়ী দেবী তিন বৎসরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে কোলে নিয়ে সদরের কাছে বসে পড়ে বললেন, তবে আমিও থাকবো। ডাকাতরা এসে আগে আমাকে আর ছেলেকে মারুক, কাটুক, তারপর তারা আপনার গায়ে হাত দেবে। পরিবারের নির্বন্ধে তখন ঈশ্বরচন্দ্রকেও খিড়কির দোর দিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।

পরে কলকাতায় ফেরার পর হ্যালিডে সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, কি হে, পণ্ডিত, তোমার গৃহে ডাকাত পড়িয়াছিল শুনিলাম? আর তুমি কাপুরুষের মতন পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পলায়ন করিলে?

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দিলেন, আর যদি আমি একা চল্লিশজন দস্যুর সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ দিতাম, তখন আপনি কী বলতেন? বলতেন, লোকটি অতি আহাম্মক! তাই না? না মহাশয় আমি এত সহজে প্রাণ দিতে চাই না, আমার এখন অনেক কাজ বাকি আছে।

যাই হোক, সেই ঘটনার পর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামের বাড়িতে একজন লাঠিয়াল নিযুক্ত করেছিলেন। ডাকাতরা যাবার সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে রেখে গিয়েছিল, তার অর্থ তারা আবার আসবে। ঠাকুরদাসের পুত্র কলকাতায় সরকার বাহাদুরের অধীনে পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি করে, অর্থাৎ রীতিমতন বড় মানুষ, সুতরাং তাঁর গৃহের প্রতি তো দস্যু-তস্করের দৃষ্টি পড়বেই।

কিন্তু নবনিযুক্ত লাঠিয়ালটি যেমন প্রভুভক্ত তেমনই শক্তিশালী। তার নাম শ্রীমন্ত। চারপাশের আট-দশখানা গাঁয়ের লোক এই শ্রীমন্তের লাঠির জোরের কথা জানে। তা ছাড়া নিকটস্থ থানার দারোগা একবার ঠাকুরদাসের কাছে ঘুষ চেয়ে বড় নাকাল হয়েছিল। ঠাকুরদাসের পুত্রকে যে লাট-বেলাটেরাও খাতির করে, সে খবর দারোগাপ্রবর তখন জানতো না। ডাকাতির পরদিন দারোগাটি ঠাকুরদাসের সেই পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছিল প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে মহানন্দে হা-ডু-ডু খেলতে। ছোটখাটো, হেঁজিপেঁজী ধরনের এই বামুনের এক কথায় যে দারোগার চাকরি

চলে যেতে পারে, সে কথা জানার পর দারোগাটি প্রভূতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং সে গৃহের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বারবার। তারপর থেকে আর ডাকাত আসেনি।

সেই লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে ঠাকুরদাস কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন ছেলের কাছে। এখন থেকে সে কলকাতাতেই থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র তাকে দেখে বিস্মিত। কলকাতায় লাঠিয়ালের কী প্রয়োজন? কলকাতায় পুলিশ-কোতোয়ালি রয়েছে, তা ছাড়া কলকাতায় বাঘা বাঘা ধনী অজস্র, তাঁদের ছেড়ে দস্যু-তস্কররা তাঁর মতন এক শিক্ষকের দিকে নজর দেবে কেন? কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই গ্রামে ফিরে যেতে রাজি নয়। সে ছায়ার মতন লেগে রইলো ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে, দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র যখন যেখানে যান, শ্রীমন্ত ঠিক পশ্চাতে পশ্চাতে থাকে।

ঠাকুরদাস গ্রামে বসে ঠিকই সংবাদ পেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর পুত্রের প্রাণের আশঙ্কা আছে, লুণ্ঠন-অপহরণের জন্য নয়, অন্য কারণে। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ এবং আইনসিদ্ধ করবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। এইজন্য তাঁর এখন প্রচুর শত্রু।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে ঈশ্বরচন্দ্র রচিত পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুলেছিল। এই রচনার বিপক্ষে কলম ধরলেন দলে দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু যুক্তিতর্কে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরাস্ত করার ক্ষমতা কারুর নেই। লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন শাস্ত্র উদ্ধার করে। কিন্তু শাস্ত্রের সমর্থনের চেয়েও বড় কথা বিবেকের সমর্থন। প্রতিপক্ষকে বরাবর তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, ব্যভিচার, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যার চেয়ে কি বিধবার বিবাহ দেওয়া সমাজের পক্ষে বেশী উপকারী নয়? বৈধব্যের ফলে সহস্র সহস্র নারীদের পদস্খলন, অকালমৃত্যু, অপহরণ ঘটছে না? বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী করার নামে তিথি বিশেষে তাকে কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না, এমনকি তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গেলেও দেওয়া হবে না এক বিন্দু জল, এই কি বিবেকসম্মত কাজ! যে-বালিকা জ্ঞানোন্মেষের আগেই বিবাহিতা এবং বিধবা হলো, তাকে বাকি জীবন থাকতে হবে দণ্ডিতা হয়ে?

যুক্তিতে হেরে গেলেই মানুষ বেশী ক্রুদ্ধ হয়। প্রতিপক্ষরা এই ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের কাছে যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়ে যে কোনো উপায়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিবৃত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তিনি পথে বেরুলেই এক দল লোক তাঁকে বিদ্রূপ করে, দূর থেকে গোপনে ইঁট-পাটকেলও ছোঁড়ে। হঠাৎ হঠাৎ তিনি দেখতে পান তাঁকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক। তিনি সোজা তাকান তাদের চোখের দিকে। এখনো সামনাসামনি কেউ গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না। তবে অনেক বড় মানুষের বাড়িতেই মোসাহেবরা পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছে, হুজুর, অত তর্কা-তর্কিতে কাজ কী? রেতেরবেলায় ঐ বিট্‌লে বামুনটাকে এক কোপে সাবাড় করে দিলেই তো হয়। জাত-ধম্মো সব রসাতলে দিলে, ছ্যা ছ্যা!

আমাদের পূর্ব পরিচিত সিমুলিয়ার বাবু জগমোহন সরকার এখন ঘোর সনাতনপন্থী হয়েছেন। এককালে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে খেপেছিলেন। কিন্তু তাঁর দমদমার বাগানবাটিতে তাঁর ইয়ারবকশীরা একবার দুটি দশ-এগারো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে এনে খুব আমোদ ফুর্তিতে মাতে, আমোদ কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তই হয়েছিল নিশ্চয়ই, কারণ পল্লীস্থ ভদ্রব্যক্তিরা তিতিবিরক্ত হয়ে এক সময় সদলবলে এসে সেই গৃহ চড়াও করে। ইয়ারবকশীরা দুর্ভিক্ষ সময়কালীন ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক ছুটে পালায়। আর বে-এক্তিয়ার জগমোহন সরকার মুক্তকচ্ছ হয়ে

বলে ফেলেন, আপনারা নিজেই হল্লা করচেন, এখানে কোনো আনফেয়ার মিন্স নেওয়া হচ্চে না। আমরা মেয়ে দুটিকে নেকাপড়া শেকাচ্ছিলুম, আমরা অফ টাইমে ফিমেল এডুকেশনের চর্চা করি।

পল্লীর ভদ্রব্যক্তিরা সে কথায় কর্ণপাত না করে জগমোহন সরকার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উত্তম মধ্যম দেয় এবং ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেই সময় বেথুন সাহেব মীর্জাপুরে সবেমাত্র বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছেন। কিছু পত্র-পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে নানা প্রকার চটুল, অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সংবাদপত্রের মসীজীবীরা জগমোহন সরকারের মুখরোচক মামলাটি উপজীব্য করে বিদ্রূপের বন্যা বইয়ে দেয়। "বঙ্গবাসিগণ, স্ত্রী-শিক্ষার কী সুচারু পরিণতি তোমরা দ্যাখো। আজিকালি রিফর্মড বাবুগণ অবসর বিনোদনের নামে বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া প্রমোদভবনে কাঁচ দুই বালিকাদের উলঙ্গ করিয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে ২ এ বি সি ডি শিক্ষা দিতেছেন। এক হস্তে সুরার পাত্র অন্য হস্তে কেতাব। ভাবাবেগে চক্ষু মুদিয়া নাম সংকীর্তনের মতন তাঁহারা গাহিতেছেন বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। নিশিকালে পুরবাসীরা পাঁচী-বুঁচি, বিমি-ক্ষেমীদের কণ্ঠে কলতান শুনিতেছে বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। এতদ্দেশীয় নারীগণের ইমানসিপেশনের আর বাকি রহিল কি! যে কালিতে কলম ডুবাইয়া এই বাক্য সকল লিখিতেছি, ইচ্ছা করে সেই কালিতেই ডুবিয়া মরি!"

এই ঘটনার পর জগমোহন সরকার কিছুদিন জনসমক্ষে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। এখন আবার নব পরিচয়ে উদিত হয়েছেন। লিভারে ব্যথা উঠে কিছুদিন কষ্ট পাবার ফলে তিনি এখন মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে 'সুরাপান না বিষপান' নামে একটি গ্রন্থ ছাপিয়ে ফেলেছেন। তাঁর বাড়িতে সুরাপান নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানার আসরে এখন বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে দু-একবার এসেছেন এ বাড়িতে। তিনি কলকাতার বহু ব্যক্তির কাছে স্বয়ং গিয়ে বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন এখন। সামনাসামনি বোঝালে অনেক সময় কাজ হয়। জগমোহন সরকারকে বিদ্যাসাগর চিনতেন না, তবে বিশিষ্ট ধনী হিসেবে এই ব্যক্তিটির নাম আছে এবং মন্দির-বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু দানধ্যানও করেছেন। তাই বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এসেছিলেন এই জগমোহন সরকারের কাছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই বুঝেছিলেন যে এখানে সুবিধে হবে না, নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

মোসাহেব পরিবৃত হয়ে জগমোহন সরকার সগৌরবে বলেন, কেমন দিলুম ঐ সাহেবের পা-চাটা বামুনটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। আমার কাচে শাস্ত্র কপচাতে এয়েচেন। বিলেতে বেধবার বে হয় বলে এদেশেও হবে? সাহেবদের খুশি করবার জন্য আমরা আমাদের মাসী-পিসীদের আবার বে দেবো!

এক মোসাহেব বললো, হুজুর, এই বিদ্যেসাগর লোকটার জন্য মাগীগুলোর কেমন আস্পর্ধা বেড়ে গ্যাচে একবার শুনুন। যত বুড়ি ধুড়ি রাঁড়েরাও এখন বে'র জন্য ক্ষেপেচে।

অপর এক মোসাহেব বললো, আরে বুড়ি বলচিস কি! আমার আপন পিসী, পঁচাশি বচর বয়েস, বেধবা হয়েছেল সে ছ' না সাত বচরে, এতদিন মন দিয়ে পুজোআচ্চা করেচে, আহা নিরামিষ্যি রান্না আমার পিসী বড় ভালো রাঁদে, একবার

কাঁচকলা আর বড়ির সুক্তো যা খেইচিলুম. আমার বাবার দাঁত নেই, মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েচেন, পিসীর হাতের নিরিমিষ্যি রান্না ছাড়া মুখে কিচু রোচে না, মেথি ফোঁড়ন দিয়ে লাউঘণ্ট।

জগমোহন ধমক দিয়ে বললেন, আরে গেল যা, নিরিমিষ্যির সাত কাহন শুরু করে দিলে। পিসীর কতা কী বলচিলি?

মোসাহেব বললো. হ্যাঁ, আমার সেই পঁচাশি বচরের বুড়ি পিসী হঠাৎ বলে কিনা, আর আমি তোদের হেঁসেল ঠেলতে পারবো না, তোদের জন্যে তো এতকাল হাড় পচালুম, এবার ক্ষ্যামা দে। ও-বাড়ির রাইমণি আর নীরোবালা বলছেল যে বিদ্যেসাগর না কে যেন এক মহাপণ্ডিত বিধেন দিয়েচে যে বিধবা মাগীদের আবার বে হবে। তোরা পাত্তর দ্যাক, আমি আবার বে কর্বো।

জগমোহন বললেন. বলিস কি রে? পঁচাশি বচরের বুড়ি?

মোসাহেব বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর, সে একেবারে ক্ষেপে উঠেচে। বলে কি না আর রান্না কর্বো না, আজই আমার বে দে। মরার আগে একটু সুক করে নিই।

—বুড়ি মাগীর সুক করার শক হয়েচে? হে-হে-হে-হে।

—আরও বলে কিনা, আমার নুকোনো সোনার গয়না আচে, আমার বে'র খর্চা আমিই দেবো।

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়, জগমোহন সরকার মোসাহেবটির পিঠ থাবড়ে সাবাস জানান।

অপর এক মোসাহেব বললো, ঈশ্বর গুপ্ত বেড়ে লিকেচেন কিন্তু। আপনি পড়েচেন হুজুর?

জগমোহন বললেন, কী লিকেচে, শুনি, শুনি?

মোসাহেবটি মুখস্থ বলতে লাগলো :

> বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল
> বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
> কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ
> কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ।
> অনেকেই এত মত লতেছে বিধান
> "অক্ষত যোনির" বটে বিবাহ-বিধান।
> কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
> একেবারে তরে যায় যত রাঁড়ী আছে।...

সে আরও বলতে যাচ্ছিল, জগমোহন তাকে মধ্য পথে বাধা দিয়ে বললো, কী বললি, কী বললি, ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাছে?

মোসাহেবটি বলো, হ্যাঁ হুজুর, কেউ কেউ বলচে কিনা বেধবার বে হতে পারে বটে তবে শুধু অক্ষত যোনির বেধবাদের।

জগমোহন সোল্লাসে উরু চাপড়ে বললেন, ওরে ঈশ্বর গুপ্ত মশাই তো ঠিকই বলেচেন রে! ক্ষতাক্ষত কে বা আর বাচে? মেয়ে ধরে ধরে কি আগে পরীক্ষে করে দেখতে হবে নাকি যে কার অক্ষত যোনি আর কার ছিঁড়েচে? হে-হে-হে-হে।

এক রসিক মোসাহেব আবার আর একটু যোগ করলো, মেয়েছেলেদের যোনি পরীক্ষার জন্য তা হলে ইন্সপেকটর রাখতে হবে বলুন, হুজুর! সে ইন্সপেকটারি কাজের জন্য যে হাজারে হাজারে লোক লাইন লাগাবে!

কানু বিনা গীত নাই আর স্ত্রীলোকের উল্লেখ ছাড়া রসের গল্প হয় না। সে স্ত্রী-শিক্ষাই হোক আর বিধবা-বিবাহই হোক, যে কোনো একটা প্রসঙ্গ পেলেই

হলো। স্ত্রীলোকেরা যখন জড়িত তখন আদিরসের স্রোত অমনি বয়ে যায়। এই প্রকার বাক্যালাপ শুধু জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় নয়, কলকাতার বহু বড় মানুষের বাড়িতেই এ রকম চলছে।

ঈশ্বরচন্দ্র জোরালো সমর্থন পেয়েছেন ইয়ং-বেঙ্গলের দলের কাছ থেকে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মরাও তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাও তাঁর সমর্থক। কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায় তাঁর প্রতিকূলতা করে চলেছে। এবং এই ধনীদের বেতনভোগী ব্রাহ্মণরাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারক। নব্য ধনীরা আগেকার দিনের রাজসভার কায়দায় বাড়িতে একটি সভা বসিয়াছে এবং উচ্ছিষ্টলোভী ব্রাহ্মণেরা সেজে বসেছে সেই সব সভার সভাপণ্ডিত। এবং এই সব রক্ষণশীল ধনীরা তাদের মুরুব্বি হিসেবে ধরেছে রাজা রাধাকান্ত দেবকে।

রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীলতার শিরোমণি হিসেবে পরিচিত হলেও স্বয়ং কৃতবিদ্য পুরুষ এবং অনেক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। এ দেশে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রভাব খুব। তিনি প্রতিবন্ধকতা করলে সামাজিকভাবে বিধবা-বিবাহ চালু করা খুবই কঠিন কাজ হবে। সেইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবকে বিধবা-বিবাহের পক্ষে আনার।

রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সৌহার্দ্য আছে। এঁর কাছে তিনি শেক্সপীয়ার পাঠ করেছেন এক সময়। তিনি আনন্দচন্দ্রকে বললেন, তোমার দাদামশাইয়ের সমাজে ও রাজদরবারে খুব সম্মান। তিনি ইচ্ছে করলে এ দেশের বিধবাদের দুঃখ দূর করতে পারেন। তুমি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো না! আনন্দচন্দ্র রাজি হতে দ্বিধা করলেন। তাঁর দাদামশাই অতি রাশভারি মানুষ, তাঁর কাছে অন্য ব্যাপারে আবদার করা যায় যদিও, কিন্তু এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ তুলতে গেলে তিনি যদি প্রগল্ভতা মনে করেন! আনন্দচন্দ্র বন্ধুকে বললেন, তুমি বরং তোমার বই একখানি দাদামশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর মতামত চাও।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রেরিত বই পাঠ করে রাধাকান্ত দেব সুকৌশলে মতামত এড়িয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের লিপিচাতুর্যের প্রশংসা করে বললেন, দ্যাখো, আমরা বিষয়ী লোক, আমরা আর এ সম্পর্কে কী বিচার করতে পারি। বরং, তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমার সভায় পণ্ডিতদের একদিন ডাকি, তাঁদের সঙ্গে তোমার শাস্ত্র বিচার হোক।

ঈশ্বরচন্দ্র রাজি হলেন। কিছুদিনের ব্যবধানে দু-বার পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নামলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রাজা রাধাকান্ত দেব একদিন একটি শাল উপহার দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে আর একদিন দিলেন নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে। যেন তিনি দুজনের শাস্ত্রজ্ঞানেই মুগ্ধ হয়েছেন। রাধাকান্ত দেবের মনোভাব অনেকটা যেন এই যে, বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে চলুক না, ভালোই তো, এতে দু পক্ষের কাছ থেকেই অনেক শাস্ত্রবচন জানা যাচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যা জাহির করবার জন্য বিধবা-বিবাহের পক্ষে কলম ধরেননি। একে কার্যে না পরিণত করে ছাড়বেন না। এক সময় তিনি ঠিক করলেন, ধনীরা যতই বাধা দেবার চেষ্টা করুক, বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য আইন পাস করাতে হবে। ইয়ং বেঙ্গল এবং ব্রাহ্মরাও চায় সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন করা হোক। আবেদনপত্র রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র এবার ঘুরে ঘুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এবার দপ করে জ্বলে উঠলেন রাধাকান্ত দেব। তর্কাতর্কি করা এক ব্যাপার, আর বিদেশী রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে দেশের ওপর একটি আইন চাপিয়ে দেওয়া অন্য ব্যাপার। সতীদাহ বন্ধ করার সময় রাধাকান্ত দেব যে কারণে বিরোধিতা করেছিলেন, বিধবা-বিবাহের ব্যাপারেও তিনি সেই কারণেই উগ্র হয়ে উঠলেন। সমাজের পরিবর্তন যদি আসে, তবে তা আসবে জনমানসের ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, এতে রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ রাজশক্তি একবার নাসিকা গলাতে শুরু করলে তার আর কোনো শেষ থাকবে না।

বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদের মত এই যে দেশের আইন-কানুন রক্ষার দায়িত্ব রাজশক্তির। বিধবা-বিবাহ যদি আইনসম্মত না হয়, তবে সাধারণ মানুষ এই বিবাহে সম্মত হবে না। কিংবা হলেও, বিধবার পুনর্বিবাহের পর তার সন্তান সম্পত্তির অধিকার পাবে না। সন্তান যদি পিতামাতার সম্পত্তির বৈধ অধিকারী না হতে পারে, তাহলে সেই বিবাহ যে অসিদ্ধ হিসেবে গণ্য এই সরল কথাটি রাজা রাধাকান্ত দেবের দল বুঝেও বুঝলেন না। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিবাদী স্বাক্ষর জোগাড় করতে শুরু করলেন।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনে আবেদনটিই আগে পেশ করার ব্যবস্থা হলো সরকার সমীপে। এতে স্বাক্ষর করলেন নয়শো বত্রিশ জন ব্যক্তি, একেবারে শেষ স্বাক্ষর-কারীর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আবেদনপত্র জমা দেবার আগের দিন ঈশ্বরচন্দ্র সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছেন, তিনি গাড়ি-পাল্কির তোয়াক্কা করেন না, তাঁর দুই পা দুই অশ্বশক্তি, হাঁটাহাঁটি করতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পথঘাট নির্জন, ঈশ্বরচন্দ্র ঠনঠনের কাছাকাছি এসেছেন, দেখলেন কিয়ৎদূরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পথজুড়ে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, তারা অপেক্ষা করছে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্র একবার পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ছিরে আছিস তো?

লাঠিয়াল শ্রীমন্ত বললো, হ্যাঁ, তুমি থেমো না, এগিয়ে যাও। তোমার চাকর তৈরি আছে, সম্বুন্ধির ভাইদের সে দেখবে।

শ্রীমন্তের তাড়া খেয়ে লোকগুলো ভয়ে দৌড় লাগাল। ওদের মধ্যে একটি লোককে যেন ঈশ্বরচন্দ্র চিনতে পারলেন। কিছুদিন আগেই তিনি ঐ লোকটিকে কোনো এক বাবুর পার্শ্বচর হিসেবে দেখেছেন।

তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন সিমুলিয়ার দিকে। জগমোহন সরকারের গৃহের সামনে গিয়ে তিনি শ্রীমন্তকে বললেন, ছিরে, তুই বাইরে দাঁড়া!

তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সোজা উপস্থিত হলেন জগমোহন সরকারের সামনে, জগমোহন সরকার আঁতকে উঠলেন একেবারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আপনি আমাকে মারতে লোক পাঠিয়েছিলেন না? অত কষ্ট করার দরকার কী? এই তো আমি এসেছি, মারতে হয় মারুন দেখি?

শীতের এক সকালে বেণ্টিঙ্ক নামক একটি জাহাজ এসে ভিড়লো কলকাতার পোতাশ্রয়ে। জাহাজটি এসেছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সেই জাহাজ থেকে নামলেন এক কালো রঙের পাক্কা সাহেব। হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, বুট জুতো পরিহিত। এঁর ওষ্ঠে সাদা লম্বা একটি পদার্থ, যার এক প্রান্ত থেকে ধূম উদ্গীরিত হচ্ছে। কাগজের মধ্যে তামাক পাকানো এই জিনিসটির নাম সিগারেট, কলকাতাবাসীর চক্ষে এ বস্তুটি নতুন।

এই কৃষ্ণকায় সাহেবটিই স্বর্গত উকিল রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদন। তবে মধু নামে যে উচ্ছৃঙ্খল, প্রতিভাবান, কোমল, হঠকারী, উদ্ধত যুবকটি এক সময় কলকাতা শহর মাতিয়ে তুলেছিল, সে আর নেই, তার বদলে ইনি একজন স্থূলকায়, মধ্যবয়সী, ক্লান্ত চেহারার পুরুষ। মধুসূদনের বয়েস এখন বত্রিশ, কিন্তু তাঁর চেহারায় যৌবনের দীপ্তি নেই, বরং এরই মধ্যে যেন প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে।

সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল মধুসূদন মান্দ্রাজে প্রবাসী ছিলেন। একদা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন কারুকে কোনো সংবাদ না দিয়ে গোপনে তিনি কলকাতা পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন বুকে কত আশা ছিল, ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা ছিল। তার কিছুই ফলেনি। আজ কলকাতার অনেকের চোখেই তিনি মৃত, জাহাজঘাটায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজনও দাঁড়িয়ে নেই। তবু মধুসূদন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, যদি একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে। কেউ নেই। ইতোমধ্যে কলকাতার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মধুসূদন এখন কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, তারও ঠিক নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মধুসূদন মালপত্র একটি ছ্যাকরা গাড়িতে তুলে বললেন, চলো ফেরীঘাট, বিশপস কালেজ মে যায়ে গা!

মান্দ্রাজে মধুসূদনের ভাগ্যে জুটেছে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। খৃষ্টান হয়েছিলেন বিলাত যাবার লোভে, কিন্তু অদ্যাপি সে সুযোগ ঘটেনি। মান্দ্রাজে গিয়ে ভেবেছিলেন, ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে উচ্চ কোনো পদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর নেটিভ আখ্যা ঘোচেনি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল সামান্য স্কুল মাস্টারি। কবি খ্যাতির মোহে রচনা করেছিলেন মিল্টনের অনুকরণে গাথা-কাব্য, তাঁর সেই ইংরেজি কাব্যের সমাদর হয়নি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়ানি দিয়েছে মাত্র, কলকাতার সংবাদপত্র তাঁর রচনারীতি নিয়ে পরিহাস করেছে। মধুসূদন মনে করতেন বাঙালী মেয়েদের তুলনায় ইওরোপীয় রমণীরা শতগুণে শ্রেষ্ঠা, সেই মোহে মান্দ্রাজে যাবার অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর ছাত্রীস্থানীয়া এক নীলকর সাহেবের কন্যা রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন। চারটি পুত্র কন্যার জন্ম দিয়েও সে বিবাহ সুখের হলো না, স্থায়ী হলো না। পুত্র-কন্যা সমেত রেবেকাকে পরিত্যাগ করে আবার এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে পত্নীভাবে বসবাস করছিলেন।

কবি হতে গেলে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নেই, এই আহরিত বদ্ধমূল বিশ্বাসে মধুসূদন মান্দ্রাজে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই

রাখেননি। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখতেন। যে প্রাণপ্রতিম সুহৃদ গৌরদাসকে একদিন না দেখলে থাকতে পারতেন না, প্রবাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই গৌরদাসকে প্রথম দিকে নিয়মিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লিখতেন, তারপর এক সময় তাতেও ভাঁটা পড়লো। চোখের বার হলেই মনের বার হয়ে যায়। কলেজ জীবনের বন্ধুরা সকলেই সংসারী হয়ে নানা কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে, আর সেই প্রাণের টান থাকে না। পর পর কয়েক বৎসরের নীরবতার পর কলকাতার অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিল যে, মধু আর বেঁচে আছে কি নেই। সে যেমন যথেচ্ছাচারী, তার পক্ষে আকস্মিক মৃত্যু অসম্ভব কিছু নয়।

একমাত্র গৌরদাসের ভালোবাসাই অকৃত্রিম এবং একনিষ্ঠ। তিনি একদিনের তরেও তাঁর প্রিয় বন্ধু মধুকে ভোলেননি। এই আট বৎসর ধরেও মধুর জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন। পত্র লিখেও মধুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি হাল ছাড়েননি। মান্দ্রাজের ইংরেজি পত্রপত্রিকা আনিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখেন, তাতে মধুর কোনো লেখা আছে কি না। অনেক লেখাতেই মধু নিজের নাম দেয় না, কিন্তু মধুর রচনারীতি গৌরদাসের এতই পরিচিত যে গৌরদাস একটি লাইন দেখলেও চিনতে পারবেন।

খৃষ্টান হবার পর মধুসূদন প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন বিশপস কলেজের ছাত্রাবাসে। তারপর আট বৎসর মান্দ্রাজে। এই এক যুগের অধিককাল কলকাতার জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময়ের মধ্যে এ দেশে ও সমাজে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, মধু তার কোনো সন্ধানই রাখেন না।

পুত্র-বিরহে জাহ্নবী দেবী ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অকালে। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত রাজনারায়ণ জাহ্নবী দেবী জীবিত থাকতেই পর পর শিবসুন্দরী, প্রসন্নময়ী এবং হরকামিনী নামে তিনটি সদ্বংশীয়া রূপলাবণ্যবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। আর একটি পুত্র তাঁর চাই-ই, বিধর্মী মধুকে তিনি ত্যাজ্য করেছেন, তার হাতের জল তিনি নেবেন না। এবং অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর পুন্নাম নরকে তিনি কিছুতেই যেতে রাজি নন। কিন্তু পুত্র-বিরহের ওপর সপত্নী-জ্বালায় পীড়িত হয়ে জাহ্নবী দেবী অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বামীকে, আমি যদি সতী হই, তবে আর কোনো পত্নী দ্বারা তোমার সন্তান উৎপন্ন হবে না। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই, দ্বিতীয় পুত্রের মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটলো না, নিদারুণ মনস্তাপ নিয়ে রাজনারায়ণ এক সময় মৃত্যুবরণ করলেন।

পিতার মৃত্যুসংবাদ মধুসূদনের কানেও পৌঁছোয়নি এক বৎসরের মধ্যে। আত্মীয়-জ্ঞাতিরা রাজনারায়ণের বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করে নেওয়ার জন্য চুলোচুলি শুরু করেছিল। তারা রটিয়ে দিয়েছিল যে মধুসূদন মৃত, সুতরাং নিকট জ্ঞাতিরাই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে। তাছাড়া, সে জীবিত থাকলেই বা কী, হিন্দু আইনে বিধর্মী সন্তান পিতৃ সম্পত্তির অধিকার হারায়। সেই কারণেই নিম্নবর্ণের, দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দুরাই সাধারণত মুসলমান বা খৃষ্টান হয়েছে, অবস্থাপন্ন, ধনী হিন্দুরা সহসা ধর্মান্তরিত হয় না। তবে সম্প্রতি খৃষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় সরকার 'লেক্‌সলোসি' নামে এক আইন প্রণয়ন করেছেন, এই আইন বলে ধর্মান্তরিত পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির দাবীদার হতে পারে। তবে এ পর্যন্ত অবশ্য কেউ এই নতুন আইনের প্রয়োগ পরীক্ষা করেনি।

রাজনারায়ণের নিজস্ব বাসগৃহটিও অন্যেরা দখল করে নিচ্ছে শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন গৌরদাস বসাক। এ বাড়ি মধুর প্রাপ্য। অথচ কোথায় মধু? সে সময় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো কার্য উপলক্ষে মান্দ্রাজে যাচ্ছিলেন, তাঁর

হাতে মধুর নামে একটি চিঠি দিয়ে গৌরদাস তাঁকে অনুরোধ করলেন যে প্রকারে হোক মধুকে খুঁজে বার করতে। কৃষ্ণমোহনের মাধ্যমেই আবার কলকাতার সঙ্গে মধুসূদনের যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

মধুসূদন কলকাতায় এসেছেন অর্থ সংগ্রহের আশায়। মান্দ্রাজে দারিদ্র্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। পিতার কতখানি এবং কী প্রকার সম্পত্তি আছে, সে সম্পর্কে মধুসূদনের কোনো ধারণা নেই। পুত্রের মতন রাজনারায়ণও ছিলেন বিলাসী, ভোগী পুরুষ। যদৃচ্ছা দু হাতে অর্থ উড়িয়েছেন। মান্দ্রাজে দ্বিতীয়া পত্নীকে রেখে মধুসূদন একা জাহাজ ভাড়ার ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, পৈত্রিক সম্পত্তি যদি কিছু পাওয়া যায়, তবে তা বিক্রয় করে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আবার ফিরে যাবেন মান্দ্রাজে।

কলকাতায় তাঁর থাকার কোনো জায়গা নেই। তাঁর মতন খৃষ্টানকে কোনো হিন্দু বন্ধু স্বগৃহে আশ্রয় দেবে কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ আছে। সেই জন্যই মধুসূদন সোজা গিয়ে উঠলেন বিশপস কলেজে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে। পৌঁছেই দ্রুত চিঠি পাঠালেন গৌরদাস বসাকের কাছে।

গৌবদাস পত্রপাঠ হাজির। বহুকাল পর দুই বন্ধুতে দেখা।

মধুসূদন আগের মতন আর ছুটে গিয়ে গৌরদাসকে আলিঙ্গন করে তাঁর গন্ড চুম্বনে সিক্ত করলেন না। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে গৌরদাসের প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, অ্যাডসুম! আই অ্যাম হিয়ার!

বিস্ময়ে বেদনায় গৌরদাস বললেন, এ কী চেহারা তোর হয়েছে, মধু!

গৌরদাসের চোখে ভাসে সেই ছিপছিপে কৃষ্ণবর্ণ যুবকটির শরীর। তার বদলে মধু যে এখন শুধু স্থূলাকার হয়েছে তাই-ই নয়, মুখখানি ফোলাফোলা, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, সর্বাঙ্গে অমিতাচারের ছাপ। কণ্ঠস্বর ভাঙাভাঙা।

মধুসূদন হেসে বললেন, বাট্ গাউর, ইউ আর অ্যাজ হ্যান্ডসাম অ্যাজ এভার।

গৌরদাসেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক, কালপ্রবাহ কারুকেই স্পর্শ দিতে ভোলে না। গৌরদাস এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, উচ্চপদস্থ চাকুরে, হিন্দু কলেজের অন্যান্য মেধাবী ছাত্রের মতন তিনিও এখন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এরই মধ্যে তাঁর দুবার পত্নী বিয়োগ হয়েছে, সেই শোকের ছাপ আছে তাঁর চোখে। তবে তাঁর মুখশ্রী প্রায় আগের মতনই সুন্দর বটে।

মধুসূদন সমস্ত কথাবার্তাই বলছেন ইংরেজিতে। বাংলা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন। গৌরদাসকে চিঠি পাঠিয়ে তিনি ছটফট করছিলেন। কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মদ্যপানের সুবিধে নেই, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন ও ব্যাপারের ঘোর বিরোধী।

মধুসূদন বললেন, চল্ গাউর, আমরা কোথাও যাই। আর কিছু না হোক, শহরটা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসি।

গৌর বললেন, আমি গাড়ি এনিচি। আগে খিদিরপুরে যাবো। তোর নিজের বাড়ি দেকবার সাধ হয় না?

—আমায় সে বাড়িতে ঢুকিতে দিবে?

—কেন দেবে না? দু-একদিন আগে গিয়ে আমি হম্বিতম্বি করে এসিচি। প-বাবু আর ব-বাবুকে বলে দিইচি, খপরদার, মধু শিগগিরই এসে পড়বে, তার আগে আপনারা কিচ্ছুটি করবেন নাকো!

—সে কি, তুই আমার আগমন বার্তা চতুর্দিকে রটাইয়া দিয়াছিস নাকি? আমি কিছুকাল সংগোপনে থাকিতে চাই।

—না, আর কারুকে বলিনি। তবে, এত গোপনতাই বা কেন? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেকা করবিনি?

—আমার লজ্জা হয়, গাউর। পূর্বে সগৌরবে উন্নত মস্তকে হেথায় পরিভ্রমণ করিতাম। এখন আসিয়াছি ভিখারির মতন।

—কে বলে তুই ভিকিরি! তুই আমাদের সকলের প্রিয় সেই মধু!

—তোদের সকলের প্রিয় হইবার মতন আমার আর কী আছে বল, গাউর।

—তুই আমায় গাউর গাউর করিসনি তো। গৌর বল্! সব বিষয়ে ইংরেজি কেতা ধরিচিস বলে কি আমাদের নামগুলোও ইংরেজি করে ফেলবি!

—সরি, আই অ্যাম প্রফিউজলি সরি, মাই ডিয়ারেস্ট গৌর! বাঙ্গালা আমার মুখে একেবারেই আইসে না।

—তোকে আমি চিঠিতে অনেকবার লিকিচিলুম যে, তুই বাংলা শেখ্। বাংলা ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। তোর কবিত্বশক্তি তুই বাংলায় প্রয়োগ কর।

—সে আর এ জীবনে হইবে না! বন্ধুদের সংবাদ কী বল্। ভূদেব, বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, লতিফ ইহারা সব কে কেমন রহিয়াছে। উহারা আমাকে মনে রাখিয়াছে কি?

—কেন মনে রাকবে না? দেকা হবে, আস্তে আস্তে সবার সঙ্গেই দেকা সাক্ষাৎ হবে। তবে রাজনারায়ণ এখুন থাকে মেদিনীপুরে।

—আর গঙ্গানারায়ণ? দ্যাট শাই, ইনট্রোভার্ট ফেলো? আমি উহাকে খুব পছন্দ করিতাম।

—গঙ্গানারায়ণ তোরই মতন বহুদিন নিরুদ্দেশ। কেউ তার খবর জানে না।

গৌরদাসের জুড়ি গাড়ি অপেক্ষা করছিল গঙ্গার এ পারে। দুই বন্ধুতে নৌকোয় নদী পেরিয়ে এসে সেই গাড়িতে উঠলো। খিদিরপুরের কাছাকাছি আসবার পর মধুসূদন হঠাৎ গৌরদাসের হাত চেপে ধরে বললেন, না, গৌর, আমি যাইব না! ঐ গৃহে আমার মাতা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, সেই শূন্য ভবনে আমি কোন্ প্রাণে প্রবেশ করিব?

গৌরদাস ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এতদিন বুঝি মায়ের কতা মনে ছেল না? মৃত্যুশয্যায় একবার তো দেকা দিতেও আসিসনি!

মধুসূদন ভগ্নকণ্ঠে বললেন, সত্যই আমি অপরাধী। আমি কৃতঘ্ন! তুই আমাকে যা বলিবি বল্।

মধুসূদনের দু চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগলো। সাহেব মানুষদের যে যেখানে সেখানে চক্ষের জল ফেলতে নেই, সে কথা খেয়াল রইলো না তাঁর।

এক সময় মধু এ বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেই তিন চারজন ভৃত্য ছুটে আসতো তার হুকুম শোনবার জন্য। আজ সেখানে দ্বারবান, ভৃত্য একজনও নেই। বাড়ির ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে! মনে হয় জনশূন্য।

সিঁড়িতে পা দিয়ে মধুসূদন আবার কাতর হয়ে পড়লেন। এককালে তিনি সুহৃদদের নিয়ে কত প্রমোদ রঙ্গ করেছেন এ বাড়িতে, এখানে কত প্রিয় স্মৃতি লেগে আছে। আজ সব কিছুই যেন ভগ্নদশা। নড়বড় করছে সিঁড়ির রেইলিং। এক সময় চতুর্দিকে ঝাড়বাতি জ্বলতো, এখন ছিন্ন ছিন্ন অন্ধকার ঝুলছে মাথার ওপরে।

গৌরদাস হাঁক দিলেন, কই, কে আছো? কেউ এখানে আছো?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যেন পরিত্যক্ত, হানা বাড়ি।

গৌরদাস বললেন, আর তা হলে ওপরে গিয়ে কাজ নেই। বরং দিনের বেলায়

আর একদিন আসা যাবেখন।

মধুসূদন বললেন, একবার আমার শয়ন কক্ষটি দেখিব।

গৌরদাস বললেন, এই অন্ধকারের মধ্যে আর সেখানে কী দেকবি!

মধুসূদন বললেন, একবার স্বহস্তে দেওয়ালগুলি স্পর্শ করিব। দেখিতে চাই, উহারা আমাকে চিনিতে পারে কি না!

উভয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। অলিন্দটি পুরোপুরি অন্ধকার নয়, সম্মুখস্থ অপর একটি অট্টালিকার আলোকচ্ছটা কিছুটা এসে পড়েছে সেখানে। কিছুকাল আগেও এ অঞ্চল জনবিরল ছিল, এখন অনেক বাড়ি উঠছে।

মধুর ঘরের দ্বারটি ভেজানো, একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই. কারা যেন নিয়ে গেছে সে সব। শুধু চারটি শূন্য দেওয়াল। এক সময় এখানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকতো মধুর বইপত্র, যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকতো তার বকমারি পোশাকআশাক।

গৌরদাসের কাঁধে ভর দিয়ে মধুসূদন আবার ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভগ্ন-কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন, গৌর, কী ছিল, আর কী হইল! সেইসব দিন কোথায় গেল? মনে পড়ে এই কক্ষে, এক পালঙ্কে তুই আর আমি একত্র শয়ন করিয়াছি! কী উন্মাদের মতন ভালোবাসিয়াছি তোকে, কোনো নারীর প্রতিও এত আকর্ষণ বোধ করি নাই।

গৌরদাস চমকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে?

দ্বারের সামনে এক শ্বেতবসনা মূর্তি। গৌরদাসের প্রশ্নেও সেই মূর্তি নিথর নীরব।

কান্না থামিয়ে মধুসূদনও ভয় পেয়ে গেলেন। অন্ধকারের মধ্যে ঐ মূর্তিটি হঠাৎ এলো কী করে? যেন অপার্থিব কোনো কিছু—

গৌরদাস আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে?

কোনো উত্তর নেই।

তখন গৌরদাস সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বললেন, ও আপনি? সব বাড়ি অন্ধকার কেন?

মধুসূদনের তখনো ভয় কাটেনি। তিনি বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, কে? গৌর, কে?

মধু কলকাতা ত্যাগ করার পরও গৌরদাস কয়েকবার এসেছেন এ বাড়িতে। জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুশয্যায় গৌরদাস এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মধুর চেয়ে বাড়ির সংবাদ তিনি অনেক বেশী রাখেন।

গৌরদাস বললেন, ইনি হরকামিনী দেবী। মধু, ইনি তোমার একজন জননী।

মধুসূদন ঈষৎ বিরক্তভাবে বললেন, অন্ধকারে প্রেতাত্মার মতন উনি দাঁড়াইয়া হয়ছেন কেন? কথা কহেন না কেন?

গৌরদাস বললেন, শোকে দুঃখে উনি অমন স্তব্ধ হয়ে গ্যাচেন।

মধুসূদন বললেন, আমার আবার কয়টি জননী? ইঁহাকে আমি কক্ষনো চক্ষে দেখি নাই।

গৌরদাস বললেন ইনি তোমার বাপের চতুর্থা পত্নী। আমি এনাকে আগে দেকিচি।

গৌরদাস সেই রমণীকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, আপনার এখানে বাতি নেই? আপনি এখেনে একা একা রয়েচেন কেন? বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই?

এবার মহিলা বললেন, একজন চাকর থাকে, তাকে বাজারে পাঠাইছি। আপনেরা

বিধবাকে কোনো সুপথ দেখাতে?

একদিন হঠাৎ কিশোরীচাঁদের দাদা প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বাক্‌দ্বন্দ্ব বেধে গেল। সন্ধ্যায় বাগানবাড়ির এক প্রান্তে সরোবরের বাঁধানো ঘাটে আসর বসেছে। আজও কথা চলছে বাংলা ভাষার বইপত্র বিষয়ে। প্যারীচাঁদের বন্ধু, মাউন্ট এভারেস্টের সূত্রে প্রখ্যাত রাধানাথ সিকদার এখন আপন যত্নে বাংলা শিক্ষা করে নিয়েছেন এবং নিজে লিখছেনও কিছু কিছু। রাধানাথ ও প্যারীচাঁদ যুগ্মভাবে প্রকাশ করছেন একটি পত্রিকা, স্ত্রীলোক এবং অল্পশিক্ষিতরাও যাতে পড়ে বুঝতে পারে এমন সরল বাংলায় সেখানে সব কিছু লেখা হয়. পত্রিকাটির নামটিও অতি সরল, "মাসিক পত্রিকা"। মধুসূদন কিশোরীচাঁদের কাছ থেকে নিয়ে দু-একবার উল্টে দেখেছেন সে পত্রিকাটি। তাঁর বিবমিষা হয়েছে। সে পত্রিকায় প্যারীচাঁদ ধারাবাহিকভাবে লিখছেন একটি উপন্যাস, নাম 'আলালের ঘরের দুলাল', ছোট-লোক চাঁড়ালদের মতন ভাষায় লেখা। অথচ সেই লেখাটির জন্যই নাকি তুমুল সোরগোল পড়ে গেছে সারা দেশে।

মধুসূদন বিরক্তি সহকারে শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা, খানিক বাদে নেশার মাত্রা কিছুটা চড়লে তিনি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, হোয়াট ট্র্যাস ইউ আর রাইটিং, প্যারীচাঁদবাবু? ইহা কি ভদ্রলোকের ভাষা? গৃহ মধ্যে লোকে দাস-দাসীদের সহিত যে ভাষায় কথা বলে, তাহাও কি আপনি সভ্যসমাজে আনিতে চান! গৃহ মধ্যে আপনি যেমন তেমন পোশাকে থাকিতে পারেন, গামছা জড়াইয়াও ঘুরিতে পারেন, কিন্তু ভদ্রমণ্ডলীতেও কি সেই পোশাক পরিধান করিয়া আসিবেন?

প্যারীচাঁদ চমকিত হয়ে তাকালেন মধুসূদনের দিকে। তারপর একটু কৃপার হাস্য দিয়ে বললেন, আমরা কথা বলছি বাংলা সাহিত্য নিয়ে, আপনি সে বিষয়ে কিছু বুঝবেন না, মিঃ ডাট্।

মধুসূদন তবুও বললেন, আমি আপনার ঐ পত্রিকার রচনা পাঠ করিয়াছি। উহা কি সাহিত্য? এইরূপ ভাষায় সাহিত্য হয়? বাংলা তো জেলে-জোলা-তাঁতীদের ল্যাঙ্গোয়েজ! সংস্কৃত হইতে প্রচুর শব্দ আমদানি করিয়া তবু এই ভাষাকে কিছুটা ভদ্রস্থ করা যাইতে পারে।

প্যারীচাঁদ বললেন, মিঃ ডাট্, আমি বলচি, শুনে রাখুন। সংস্কৃতের দিন গ্যাচে। এই যে খাঁটি চলতি মুখের ভাষা আমি ব্যবহার করচি, দেকবেন একদিন সব্বাই আমার এই ভাষাতেই লিকবে, আমার প্রবর্তিত এই ভাষা বঙ্গে চিরস্থায়ী হবে!

মধুসূদনও তৎক্ষণাৎ সগর্বে বললেন, মোটেই তাহা নহে। ছি ছি, সাহিত্য একটি পবিত্র জিনিস, তাহা লইয়া আপনারা বাল-ক্রীড়া করিতেছেন! এই কুৎসিত বাংলা ভাষায় যদি কিছু রচনা করিতেই হয় তবে অগ্রে ইহার উন্নতি করিতে হইবে। দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই হইবে চিরস্থায়ী।

—আপনি ভাষা সৃষ্টি করবেন? কোন্ ভাষা? ল্যাটিন, গ্রীক, তামিল?

—না, বাংলা।

সকলে সমস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসির কথাই বটে, যে ব্যক্তি ইংরেজি ছাড়া বাংলাতে কথাই বলে না, দু-চারটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেও ভুল করে, সে কিনা বড়াই করে বাংলা ভাষা সৃষ্টি করার!

প্যারীচাঁদ বিদ্রূপ করে বললেন, আপনি বাংলা লিকবেন? কোন্ কালে? এই কলিকালে, না সত্যযুগে?

মধুসূদন গুম হয়ে রইলেন।
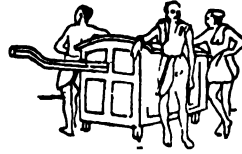
এক শনিবারের দ্বিপ্রহরে নবীনকুমারের ঘুম ভেঙে গেল কিছু নারীকণ্ঠের কল-কোলাহলে। প্রতি শনিবার বিকেলের দিকে তাকে গুরুতর কর্মে ব্যাপৃত থাকতে হয়. তাই আহারাদির পর সে খানিকটা নিদ্রা-সাধনা করে নেয়।

হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ করার আগেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছে নবীনকুমার। ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকা কিংবা শিক্ষকদের শাসন মান্য করা তার ধাতে সয় না। সে অতি মেধাবী এবং তার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। অন্য ছাত্ররা যা সাতদিনে শেখে তা নবীনকুমার একদিনেই রপ্ত করে নেয়. সুতরাং বাকি দিনগুলি যে সে ক্লাসের মধ্যে দুষ্টামী করবে. তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে সে বাড়িতে একটি ক্লাব স্থাপন করেছে, তার নাম বিদ্যোৎসাহিনী সভা। বিশিষ্ট জ্ঞানী. গুণী ও চিন্তাবিদরা এখানে এসে দেশ, কাল, সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। কলেজী শিক্ষকদের বাঁধা-ধরা লেকচারের চেয়ে তা অনেক বেশী ভাবগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। নবীনকুমার নিজেও দু-এক শনিবার কয়েকটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শ্রোতাদের বিষম চমকে দিয়েছে। চতুর্দশ বর্ষীয় এক কিশোরের মুখ থেকে এমন সুচিন্তিত কথাবার্তা কেউ আগে কখনো শোনেনি। সকলে নবীনকুমারকে ধন্য ধন্য করে, তাতে তার আত্মাভিমানে সুড়সুড়ি লাগে. তার ললাটে গর্বিত আলো ঝলসায়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা এখন নবীন-কুমারের ধ্যান-জ্ঞান। বৎসরাধিক কাল ধরে সভা নিয়মিত চলছে।

নারীকণ্ঠের সুরেলা গোলমাল শুনে নবীনকুমার বেরিয়ে এলো নিজ কক্ষ থেকে। দুই বৎসর আগে নিরুদ্দিষ্ট গঙ্গানারায়ণকে মৃত বলে ধরে নেওয়ায় তার শয়ন ঘরটিও এখন নবীনকুমার ব্যবহার করে. শব্দ আসছে সেখান থেকে। সেখানে উঁকি দিয়ে নবীনকুমার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলো।

কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর নবীনকুমার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেছে। এ সময়ে তার বিবাহে মতি ছিল না, বিদ্যোৎসাহিনী সভা নিয়েই সে মত্ত হয়ে ছিল। কিন্তু বিধুশেখরের প্ররোচনায় জননী বিম্ববতী তাকে নিয়মিত পীড়া-পীড়ি করছিলেন. তাই শেষ পর্যন্ত নবীনকুমার বিবাহে সম্মতি দিয়েছে এক সময়। কৃষ্ণভামিনীরই এক সম্পর্কীয়া ভগিনী অপর এক বসু পরিবারের কন্যা সরোজিনী এ বাড়িতে এসেছে নববধূ হয়ে।

প্রথম বিবাহের পর. বালকদশা থেকে সদ্য কৈশোরে উত্তীর্ণ নবীনকুমার যেমন স্ত্রীকে নিয়ে মেতে উঠেছিল. দ্বিতীয় বিবাহের পর সে রকম কিছুই হয়নি। তখন বাড়ির বাইরের জগতের সঙ্গে নবীনকুমারের বিশেষ পরিচয় ছিল না. তাই এক নতুন বালিকাকে সে খেলার সঙ্গিনী পেয়ে খুশী হয়েছিল।

এখন শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেই নবীনকুমারের পরিচয় হয়েছে, তার বয়স এত কম হলেও আচরণের ভারিক্কীপনায় সে নিজেও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিশেষ সুনাম হয়েছে. দেশের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে এ সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

এখন বাড়ির চেয়ে বাইরের টানই বেশী. তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে নবীন-

কুমারের ভালো করে পরিচয়ই হয়নি। মাতৃ-সনির্বন্ধে বিবাহ করতে হয়েছে, করেছে, আর যেন তার কোনো দায় নেই। স্ত্রী থাকে অন্দরমহলে। তার মায়ের কাছে। দুপুরে নবীনকুমার যখন খেতে বসে তখন বিম্ববতীর আজ্ঞায় বালিকা সরোজিনী একটি ঝালর বসানো পাখা দিয়ে স্বামীকে হাওয়া দেয়। সেই সময়টিতেই যা নবীনকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার দ্বিতীয়া পত্নীর। কৃষ্ণভামিনীকে নবীনকুমার জোর করে রাত্রে নিজ শয্যাতে নিয়ে শুত, যদিও কোনো প্রকার যৌন চেতনা তার তখন জাগেনি, খেলার সঙ্গিনীকে সে যেন নিদ্রার মধ্যেও ছাড়তে চাইতো না। সরোজিনী সম্পর্কে তার সে আগ্রহ নেই, বিম্ববতীও অল্পবয়েসী বধূকে রাত্রে ছেলের কাছে পাঠান না।

নবীনকুমার দেখলো, পাঁচ-ছটি বালিকাকে নিয়ে সরোজিনী সেই দুপুরে পুতুল খেলায় মেতেছে। সরোজিনী সমেত আর সব কটি বালিকারই বয়েস নয়-দশ বৎসরের মধ্যে, শুধু একজন একটু বড়, সে বোধ হয় দ্বাদশ বর্ষীয়া হবে।

প্রথমেই নবীনকুমারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। তার মনে পড়ে গেল কৃষ্ণভামিনীর কথা। কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক দিন নবীনকুমার খুব কান্নাকাটি করেছিল, তারপর আর অনেক দিন তার কথা মনেই পড়েনি।

ঠিক যেন একই দৃশ্য। এই বাড়িতে কৃষ্ণভামিনী তার সখীদের সঙ্গে দুপুর-বেলা পুতুল খেলতে বসতো। কয়েকবার নবীনকুমারও যোগ দিয়েছে সেই খেলায়। এখনও বালিকারা সেই রকম পুতুল নিয়ে বিয়ে বিয়ে খেলছে। শুধু এর মধ্যে কৃষ্ণভামিনী নামে সেই চঞ্চলা, মুখরা বালিকাটি নেই, সে হারিয়ে গেছে কোন মহাশূন্যে।

নবীনকুমার সে ঘরে প্রবেশ করতেই সব মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে গেল। খেলা বন্ধ করে সবাই এমনভাবে মাটির দিকে মুখ নীচু করে রইলো যেন নবীনকুমার এক মহামান্য গুরুজন, তার সামনে তারা কোনো গুরুতর দোষের কাজ করে ফেলেছে।

পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে পুরুষের দখলে হলেও সংসারে, অন্দরমহলে নারীদের একটা সাবলীল অধিকারবোধ থাকে।

সরোজিনী তার সখীদের ভয় ভাঙাবার জন্য বলে উঠলো, আমরা পুতুল খেলচিলুম, দরোজা বন্ধ করে দিচ্চি, তাহলে আর গোলমাল হবে না।

নবীনকুমার তাদের অভয় দান করে বললো, না, তোমরা খ্যালো না! আমি দেকতে এলুম।

নবীনকুমারের হঠাৎ ইচ্ছে হলো দু বৎসর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে যেতে। ওদের সঙ্গে বসে সেও কি পুতুল খেলতে পারে না? সন্ধ্যাকালে জ্ঞানীগুণীর আসরে যাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিতে হবে, তার পক্ষে দুপুরবেলা বালিকাদের সঙ্গে পুতুল খেলা কি দোষের?

যে বালিকাটির বয়েস কিছু বেশী, সে বসে ছিল খানিকটা দূরে একটি মোড়ার ওপর। অন্যরা সবাই গালিচার ওপর অনেকগুলি পুতুল ছড়িয়ে বসেছে। সুন্দর সুন্দর সব কাচকড়ার পুতুল, তাতে আবার উত্তম সিল্কের পোশাক পরানো।

মোড়ার ওপর বসা বালিকাটি সব দিক থেকেই অন্যদের চেয়ে পৃথক, তার গায়ের রঙ গোলাপ বর্ণ, তার চোখের মণি দুটি নীল।

তার দিকে দু-এক পলক তাকিয়ে নবীনকুমারের কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু আগে কোথায় কখন দেখেছে, ঠিক স্মরণে এলো না। সে মেয়েটি অন্যদের মতন ভয় পায়নি, সরাসরি চোখ ফেলেছে নবীনকুমারেব দিকে।

নবীনকুমার সরোজিনীর পাশে বসে পড়ে বললো, আমাকে তোমার খেলায় নেবে? ছেলেমেয়ের বে হয়ে গ্যাচে? আমি ভালো ঘটকালি কত্তে পারি!

সরোজিনী বললো, ওমা, ব্যাটাছেলেরা আবার এ খেলা খেলে নাকি? এতো আমাদের খেলা। ছেলেমেয়ের বে নয়, আমরা সাবিত্তির-সত্যবান খেলচি!

মোড়ার ওপর বসা হলুদ-রেশমী শাড়ি পরা মেয়েটি এবার বললো, ওলো সরোজিনী, তোর বর মেয়েও সাজতে পারে! বল না, এক্ষুনি শাড়ি পরে সাজবে!

নবীনকুমার চমকিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল। এই মেয়েটি ছিল কৃষ্ণভামিনীর মিতেনী। এ প্রায়ই কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে পুতুল খেলতে আসতো। একদিন সত্যিই নবীনকুমার শাড়ি জড়িয়ে নারী সেজে কৌতুক করে ওদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছিল। কী যেন নাম মেয়েটির!

স্মৃতি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নবীনকুমারের মনে খানিকটা ক্রোধেরও উদ্রেক হলো। এই মেয়েটির শ্বশুরালয়ে গিয়ে একদিন অপমানিত হতে হয়েছিল নবীনকুমারকে। সে এক হতচ্ছাড়াদের বাড়ি। কেউ কোনো সহবৎ জানে না, এমন কি ভৃত্যগুলো পর্যন্ত অতি বদ। এই মেয়েটি আবার এ বাড়িতে এসেছে কোন্ সুবাদে?

নবীনকুমার তাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোমায় তো আগে দেকিচি, তোমার নাম কী য্যানো?

মেয়েটি তার ওষ্ঠে অস্পষ্ট হাসির রেখা এঁকে সামান্য কৌতুক সামান্য বিদ্রূপ মিশিয়ে উত্তর দিল, মনে নেই? এরই মধ্যে ভুলে গ্যাচেন। আমার নাম বনজ্যোৎস্না।

অন্য মেয়েরা সকলেই বিস্মিতভাবে তাকালো ঐ মেয়েটির দিকে। একজন বললো, ওমা, কুসোমদিদি, তোমার আবার ঐ নাম হলো কবে থেকে?

কৃষ্ণভামিনীর সখী কুসুমকুমারী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নবীনকুমারের দিকে। নবীনকুমারের একথাও মনে পড়লো যে কুসুমকুমারীর নাম বনজ্যোৎস্না সে-ই রেখেছিল। এর মধ্যে মেয়েটি বেশ বড় হয়ে গেছে। তবু এই বালিকার প্রতি তার মন প্রসন্ন হলো না।

সরোজিনী ফিক করে হেসে ফেলে বললো, কুসুমদিদি, তুমি কী করে জানলে আমার বর মেয়ে সাজতে পারেন? সত্যি পারেন কিন্তু, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেকিচি।

কুসুমকুমারী বললো, ওমা, সে কী কথা! তোর বর মেয়ে সাজেন, আর তুই লুকিয়ে দেকিস? এমন তো কখনো শুনিনি।

অন্য বালিকারা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সরোজিনী বললো, হ্যাঁগো, উনি বেনারসী শাড়ি পরেন। মায়ের কাছ থেকে সোনার জরি বসানো একটা লাল বেনারসী চেয়ে নিয়েচেন।

অন্য বালিকারা তেমনি হাসতেই লাগলো, আর কুসুমকুমারী হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো মিতেনীর বড় বর, এ সব কী শুনচি? আপনি রোজ লাল বেনারসী পরেন?

কয়েকটি নারী, হোক তারা বালিকা, যদি একজন পুরুষকে ঘিরে ধরে কৌতুক করতে শুরু করে তখন সেই পুরুষের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। বহু যুদ্ধে জয়ী বীর পুরুষেরাও এ রকম অবস্থায় কাবু হয়ে পড়েন।

নবীনকুমার আফসোস করতে লাগলো, কেন সে এ ঘরে এই সময় এলো। যদি বা এলো, কেনই বা এদের সঙ্গে পুতুল খেলায় যোগ দিতে চাইলো। তার একবার ইচ্ছে হলো, লাথি মেরে সব পুতুলগুলো তছনছ করে দেয়। কিন্তু এই

দুষ্ট মেয়েগুলো বুঝি তাতেও হাসবে।

সে রোষকশায়িত নেত্রে নিজের স্ত্রী সরোজিনীর দিকে চাইলো। কিন্তু সরোজিনীর এদিকে দৃষ্টিই নেই। ঐ ছোট্ট লাজুক মেয়েটি যে এত কথা বলতে পারে, তাও তো নবীনকুমারের জানা ছিল না।

সরোজিনী বললো, আমাদের বাড়িতে যে থ্যাটার হবে গো। রোজ মওলা হয়। আমি অমনি চুপটি করে দরজার ফাঁক দিয়ে দেকিচি। মা বারণ করিচিলেন, তবু আমি নুকিয়ে নুকিয়ে দেক্‌তে আসি।

একটি মেয়ে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলে, থ্যাটার কী ভাই?

সরোজিনী বললে, ঐ যে রামলীলে, কেষ্টযাত্রা হয়, সেই রকম। তবে পান্তির মাঠ কিংবা ধোপার মাঠে হবে না, আমাদের ঠাকুর দালানে হবে। ম্যারোপ বাঁধা হবে!

কুসুমকুমারী বললে, সাহেবদের যাত্রাকে বলে থিয়েটার। আপনারা বুঝি ইংরিজি যাত্রাপালা করবেন?

নবীনকুমার এবার এই সব অবোধ, অশিক্ষিতা বালিকাদের জ্ঞান দান করার জন্য কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললো, শুধু সাহেবরা কেন, আগেকার কালে আমাদের রাজা-মহারাজাদের আমলেও নাটকের অভিনয় হতো। সংস্কৃত নাটক। আমরা সেই রকম নাটকের অভিনয় কচ্চি, তবে বাংলায়। সাহেব-সুবোরাও দেকতে আসবে।

—পালার নাম কী?

—বেণী সংহার।

—আপনি সে পালায় কী সাজবেন?

এবার নবীনকুমারের বদলে সরোজিনীই বলে দিল, উনি সাজবেন রাজকুমারী ভানুমতী। তাই তো অমন দামী বেনারসী পরে...।

কুসুমকুমারী বললো, সরোজ, তোর বরকে রাজকুমারী সাজলে বেশ ভালোই মানাবে! তা সে নাটক দেকা তো আমাদের কপালে জুটবে না। পুরুষ মানুষরাই দেকবে!

সরোজিনী বললো, না গো দিদি, চিকের আড়ালে বসবে মেয়েরা। মা বলেচেন, আমরা সবাই দেকবো। তোমায় গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসবো।

সে কথায় খুব একটা মূল্য না দিয়ে কুসুমকুমারী বললো, দূর, আমার ভাগ্যে ও হবে না!

নবীনকুমার উঠে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলে কুসুমকুমারী তাকে ডেকে বললো, ও মিতেনীর বর, শুনুন। আপনি ভাবলেন তো, আমি আবার কী করে এলুম? কেউ ডাকেনি। হ্যাংলার মতন এয়েচি! আপনি আমার মিতেনীর খুড়তুতো বোন সরোজকে বিবাহ করেচেন। আমার বোনেরা আবার এই সরোজের মিতেনী। ওরা আসতে চাইলো, তাই আমি নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। আপনি তো আমাদের খোঁজ খবর ন্যাননি।

নবীনকুমারের মুখে উত্তর এসে গিয়েছিল যে তোমার লক্ষ্মীছাড়া শ্বশুর-বাড়িতে কে তোমার খোঁজ নেবে? মাতাল লম্পটদের আখড়া একটা। কৃষ্ণভামিনী বেঁচে থাকলেও নবীনকুমার আর কক্ষনো তাকে ও বাড়িতে যেতে দিত না।

কিন্তু নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

কুসুমকুমারী বললো, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাদের ছেলের বে হয়েছিল, মনে আচে? তা মেয়ে জামাইকে তো আমার বাড়িতেই ফেলে রাকলেন, আনবার আর নামটিও করেন না, আমার মিতেনীও চলে গেল।

নবীনকুমার শুষ্কভাবে বললো, আর কী হবে!

কুসুমকুমারী বললো, কেন, এখুন সরোজ এয়েচে, ওর কাচেই পাঠিয়ে দেবো মেয়ে জামাইকে। আমার মেয়ে এখেনেই সুখে থাকবে। আমিও আর পুতুল খেলি না।

নবীনকুমার কিছু বললো না।

কুসুমকুমারী বললো, আর একটা কতা বলবো? আপনি নাটুকে পালায় রাজকুমারী সাজবেন, আপনাকে মানাবে ভালো। কিন্তু দেকবেন, হাঁটার সময় যেন খেয়াল থাকে।

নবীনকুমার ঠিক বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেল। হাঁটার সময় কী খেয়াল থাকবে?

তার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে কুসুমকুমারী বললো, আমাদের বাড়ির পাশে প্রায়ই কেষ্টযাত্রা হয়। একবার বিদ্যেসুন্দর পালাও হয়েছেল। একটা পানওয়ালা ছোঁড়া রাধা সাজে, আবার বিদ্যেসুন্দরে সে-ই বিদ্যে, কী সুন্দর মানায় তাকে, মাতায় ঘোমটা দিয়ে নাকের নোলক নেড়ে সে যখন গান গায়, তখন কে বলবে যে সে মেয়ে নয়কো, ছেলে। কিন্তু যেই হাঁটে, অমনি কেমন যেন বুক ফুলিয়ে গ্যাট ম্যাট করে, হি-হি-হি, তাই আপনাকেও বলে দিচ্চি...।

নবীনকুমার গম্ভীর।

--আপনি রাগ করলেন? আপনি আমার মিতেনীর বর, আপনার সঙ্গে একটু রঙ্গ করেও কতা বলতে পারবো না?

—মেয়েরা কেমন করে হাঁটে, একটু দেকিয়ে দাও তো!

—সরোজিনীর কাচ থেকে জেনে নেবেন!

—ও তো ছোট, তুমি দেকিয়ে দাও।

—এই মরেচে, বলে বিপদ হলো দেকচি। না, না, আমি পারবো না।

নবীনকুমার খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে বললো, পারবে না মানে? পারতেই হবে।

কুসুমকুমারী বললো, ওমা, এ কি লোক গো! আমায় নিয়ে জোর করে হাঁটাবেন আপনি! রক্ষে করো।

নবীনকুমার বললো, আর ছাড়চি না। মেয়েরা কেমন আলাদা হাঁটে দেকি!

—জোর করে হাঁটালে বুজি কোনো লাভ হবে? রাজকুমারী ভানুমতীকে কি কেউ জোর করে হাঁটাবে?

সরোজিনী উঠে এসে স্বামীকে বললো, আপনি কুসুমদিদিকে ধরে রেকেচেন কেন? ছেড়ে দিন।

নবীনকুমার বললো, এই মেয়েটিকে আগে দেকিচি, মুখ দিয়ে কথাই ফুটতো না। এখুন দিব্যি টরটরিয়ে কতা বলে। কেষ্টযাত্রায় কোন্ পানওলা রাধা সাজে, তার সঙ্গে আমার তুলনা!

কুসুমকুমারী অমনি বললো, যদি কিচু অপরাধ করে থাকি, যদি আকত-কুকতা বলে থাকি, মাপ করবেন। আর কখুনো বলবো না, আর কোনোদিন আসবো না।

নবীনকুমার ধমক দিয়ে বললো, হ্যাঁ, আসতে হবে। আমি নেমন্তন্নর কার্ড পাঠাবো, তোমার স্বামীকে নিয়ে আমাদের প্লে দেকতে আসবে।

—না, নেমন্তন্ন পাঠাবার দরকার নেই। আমাদের আসা হবে না। আমার বর কোথাও যান না।

—কেন, কোথাও যান না কেন? তিনি কী এমন নবাবপুত্তুর? তোমাদের বাড়ি আমি যেদিন গেস্‌লাম, সেদিনও তিনি আমার সঙ্গে দেকা করেননি।

—তিনি কারুর সঙ্গে দেকা করেন না। তাঁর সঙ্গেই অন্যদের দেকা করতে হয়।

—ও, তাই? তোমার পতি দেবতাটি দেকচি সত্যিই দেবতা।

গভীর সমুদ্রের নির্মল নীল জলের মতন দুটি চক্ষুতারকা নবীনকুমারের দুচোখের ওপর ন্যস্ত করে কুসুমকুমারী বললো, ফের একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে, তাকে দেকে যাবেন। তাঁকে লোহার শিকলি দিয়ে বেঁধে রাকতে হয় তো, সেইজন্য তিনি কোতাও যেতে পারেন না।

একটু থেমে নিষ্কম্প অম্লান কণ্ঠে কুসুমকুমারী আবার বললো, তিনি এখন বদ্ধ উন্মাদ, কেউ কাচে গেলে মারেন।

নবীনকুমার থমকে গেল। এমন কিছু শুনতে হবে সে আশা করেনি। এই রকম একটা ফুটফুটে বালিকার স্বামী উন্মাদ! সে রোগের যে চিকিৎসা নেই। হ্যাঁ, এরকম একটা কথা নবীনকুমার আগেও শুনেছিল বটে।

কিছু তো একটা বলতে হবে, তাই অন্য কিছু আর খুঁজে না পেয়ে নবীনকুমার বললো, আহা, তোমার তো খুব দুঃখ!

—বলতে পারেন, জগতে সুখী কে?

সেদিন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নবীনকুমার বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো। এই সভায় তার অনেক দায়িত্ব। সে সম্পাদক, উদ্বোধনী ভাষণ তাকেই দিতে হয়, সেদিনকার বক্তার পরিচয় এবং বক্তৃতার বিষয়ের সারমর্ম ঘোষণা করাও তার দায়িত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যেমন এই সভায় আসেন তেমনি আসে কৃষ্ণকমল ভটচায, হরীশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল ইত্যাদি প্রকৃত উৎসাহী নব্য যুবকেরা। ইংরেজ পণ্ডিত ও শিক্ষকরাও আসেন। সভায় উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দের জন্য ভূরিভোজেরও ব্যবস্থা থাকে, সে দায়িত্ব দুলালের ওপর, নবীনকুমারকেও সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়।

তবু আজ নবীনকুমারের মন ক্ষণে ক্ষণে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে কুসুমকুমারীর মুখ। এক সময় নবীনকুমার কিছু না ভেবেই মেয়েটির একটি নাম দিয়েছিল বনজ্যোৎস্না। তখন নবীনকুমার ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের নাটক ও কাব্যগুলি পাঠ করছিল, শকুন্তলা নাট্যের ঐ নামটি তার বড় পছন্দ হয়েছিল। কুসুমকুমারীর নীল রঙের চোখের দৃষ্টিতে সত্যিই যেন অরণ্য-জ্যোৎস্নার আভা আছে।

ঐটুকু মেয়ে কেমন শান্ত নিরুত্তাপভাবে বললো, বলতে পারেন, জগতে সুখী কে? এই বয়সেই কুসুমকুমারী দুঃখকে চিনেছে। তার স্বামী বদ্ধ উন্মাদ, তার সামনে পড়ে আছে অনন্ত দুঃখময় জীবন।

সেদিন সভায় কার্ক প্যাট্রিক সাহেব সমাজনীতি ও বিবেকের যুক্তি এই শিরোনামায় একটি ইংরেজি সন্দর্ভ পাঠ করলেন। সেটি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রিয়মাধব বসু নামে আর একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাদের বিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন করছেন, তার সমর্থনে বাংলায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। নবীনকুমার আজ কথাবার্তাও বিশেষ বলছে না। শেষোক্ত আলোচনা শুনতে শুনতে তার মনে হলো, বিধবাদের পুনর্বিবাহ তো চালু হওয়া উচিত বটেই, কিন্তু কুসুমকুমারীর কী হবে? বদ্ধ উন্মাদরা আর সুস্থ হয় না। কোনো ব্যক্তির স্ত্রী যদি বদ্ধ

উন্মাদিনী হয়, সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে আর একটি বিবাহ করতে পারে। তাহলে কুসুমকুমারী পারবে না কেন!

নবীনকুমার নিজে এক সময় সচেতন হলো। এ সব কী উৎকট চিন্তা তার মাথায় ঢুকছে। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত বিধবাদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে চাইছেন বলে কি দেশটা একেবারে বিলাত হয়ে যাবে নাকি! উন্মাদ হোক আর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হোক, হিন্দু নারীর স্বামীই একমাত্র অবলম্বন। পরাশরের নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে উন্মাদ বিষয়ে কিছু নেই। কুসুমকুমারীকে সারাজীবন ঐ উন্মাদ স্বামীর সঙ্গেই থাকতে হবে। তবু তার ঐ কথাটা কানে বাজে, বলতে পারেন, জগতে সুখী কে?

সভা যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মান্যবরগণ, আমি একটি নিবেদন রাখিতে চাই।

সকলে উৎকর্ণ হলো। নবীনকুমারের প্রস্তাবটি এই যে, বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কোন একটি বিষয় ঘোষণা করে দেওয়া হবে। সেই বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার দেওয়া হবে কিছু টাকা। এর ফলে শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষায় লিখতে আগ্রহী হবে।

সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

নবীনকুমার জানালো যে তবে আজই একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হোক। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে সে নিজে দুই শত টাকা পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়টি কী হবে?

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে নবীনকুমার বললো, বিষয়টি হোক, এ জগতে সুখী কে?

সভার শেষ প্রান্ত থেকে দীর্ঘকায়, খঙ্গনাশা এক প্রৌঢ় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সাধু! সাধু! এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আর বিষয়টিও বড় উপযুক্ত। এ জগতে সুখী কে? এ বড় গূঢ় কতা।

এই ব্যক্তিটি রাইমোহন। তার চেহারা ও বেশবাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর সে কুঁচোনো ধুতির কোঁচার ডগার মুখটি হাতে ধরে থাকে না, গায়ে দেয় না এণ্ডির বেনিয়ান, চোখে নেই সুর্মা, হাতে নেই গোড়ের মালা। তাকে দেখলে আর সেই আগেকার বেশ্যাবাড়ির নিশাচর বলে চেনা যায় না। তার চেহারা ও পোশাক এখন বিদ্বজ্জন সমাগমে যোগ দেবার উপযুক্ত, মাথার বাবরি চুল ছেঁটে তেল চুকচুক করে আঁচড়ানো, কাঁধে চাদর।

গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শোনার জন্য রাইমোহন এখন নিয়মিত এসে বসে থাকে। তাছাড়া সে এখানে তার উপস্থিতির কিছুটা গুরুত্বও আদায় করে নিয়েছে। বিদ্যোৎসাহী সমিতি থেকে যে নাটক অভিনয়ের মহলা চলছে, সেই বেণীসংহার নাটকে কয়েকটি গীত সংযোজন করার কথা উঠেছিল। রাইমোহনই সেজন্য তিনটি গান রচনা করে সুরও দিয়েছে। সে গান প্রশংসা পেয়েছে সকলের।

রাইমোহন এগিয়ে এসে নবীনকুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, বড় উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি! আপনার দ্বারা এ দেশের মহদোপকার হবে। দুশো টাকা পুরস্কার! এ আপনার স্বর্গত পিতার উপযুক্ত পুত্রের মতনই হয়েচে বটে! সাধু, সাধু!
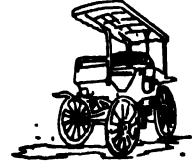
সোহাগবালার ব্যাধিটি বড় বিচিত্র। মানুষের স্থূলত্বেরও তো একটা সীমা আছে, কিন্তু সোহাগবালার ক্ষেত্রে সব কিছুই সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রত্যেকদিনই সে বেশী মোটা হচ্ছে। যৌবনে সোহাগবালা অসুন্দরী ছিল না, বরং ফর্সা, চোখ, নাক, ঠোঁট সবই গেল গোল, কিন্তু তার স্বামীর প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন তার শরীর স্থূল হতে লাগলো। একটা বয়েসের পর মানুষ আর দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, কিন্তু সোহাগবালার প্রস্থ বাড়তে লাগলো অস্বাভাবিক-ভাবে। তার এক একখানি হাতই যেন একজন মানুষের শরীরের সমান, বক্ষের ওপর দুটি দোদুল্যমান অলাবু। তার পা দেখে এক সময় মনে হতো ভীমের গদা, এখন মনে হয়, ভীমও বুঝি এত বড় গদা তুলতে পারতেন না। মোটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশী ফর্সাও হচ্ছে সে, রং একেবারে ফেটে পড়ছে।

দুখানি শাড়ি একসঙ্গে জোড়া দিয়েও তার শরীরের ঘের পায় না। তার নিতম্ব এতই বড় যে হস্তিনী বললেও কম বলা হয়। শরীরে বস্ত্রও সে রাখতে পারে না, সব সময় তার অসম্ভব গরম বোধ হয়, এক এক সময় জ্বলে গেল, অঙ্গ জ্বলে গেল গো, বলে চেঁচায়। দিবাকর তার স্ত্রীর চিকিৎসার কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু ডাক্তার বদ্যি কেউ তার রোগ ধরতে পারলে না। নিরাময় করা তো দূরস্থান।

কিছুদিন আগেও সোহাগবালাকে দুজন দাসী দুদিক থেকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে দরদালানে একটি জলচৌকির ওপর বসিয়ে দিত। সেখানে বসে বসে সোহাগবালা চালাতো তার রাজ্যপাট, এ গৃহের সব দাস-দাসীই তার অধীন। ঘি-তেল, চাল-ডাল থেকে শুরু করে মাছের মুড়োর হিসেব পর্যন্ত তার নখদর্পণে।

তারপর এক সময় সোহাগবালার চলৎশক্তিও নষ্ট হয়ে গেল। তার উরুদ্বয়ের মধ্যে আর ব্যবধান রইলো না, হাঁটতে গেলেই উরুতে উরুতে ঘর্ষণ হয়, চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে যায় পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত সোহাগবালাকে স্থায়ীভাবে শয্যা নিতে হলো। পালঙ্কের ওপর শুয়ে থাকে যেন একটি জীবন্ত মাংসের পাহাড়।

সব দাস-দাসীরাই পালা করে সোহাগবালার সেবা করে, তবে তাদের মধ্যে থাকোমণির স্থান একটু বিশেষ ধরনের। থাকোমণি আসে রাত্রে এবং তাকে সেবা করতে হয় সোহাগবালা আর দিবাকর, দুজনকেই।

দিবাকরের বয়েস এখন ষাট পেরিয়ে গেছে তবু তার শরীরের ক্ষুধা একটুও মরেনি। চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে সোহাগবালা এখন যেন শিশুর মতন অবুঝ হয়ে গেছে। দিবাকরকে সে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায়। তাই এখন আর চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, ঐ এক পালঙ্কেই দিবাকর আর সোহাগবালার মাঝখানে থাকোমণিকে মাঝে মাঝে শুতে হয়। দিবাকর যখন থাকোমণিকে সবলে আঁকড়ে ধরে তখন সোহাগবালা তার বিরাট চক্ষু দুটি মেলে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে। থাকোমণি যথোচিতভাবে দিবাকরের সেবা করার পর উঠে যাবার সময় সোহাগবালা তাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ লা, ঠিক মতোন যত্ন করিচিস তো? আগে চান করে এয়েচিস? গায়ে পা-টা ঠেকে গ্যাচে, নে, বাবুর পায়ের ধুলো নে, তারপর যা, আবার চান করে আয়।

তারপর সে ব্যাকুলভাবে স্বামীকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁগা, তোমার শরীল গতিক ভালো আচে? মাতার ধাতু ঠান্ডা হয়েচে? তোমার সুক হয়েচে, বলো না? তোমার সুকের জন্য তুমি যা চাও...আহা, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে যেন আমি যেতে পারি, তোমার মতন পতি পেয়িচি, আমার কতবড় ভাগ্যি...

বলতে বলতেই সোহাগবালা কাঁদতে শুরু করে।

সোহাগবালার মৃত্যুর পর চারজনে তার খাট বয়ে নিয়ে যেতে পারলো না, বড় খাট বানিয়ে তার তলার দিকে বাঁশ বেঁধে দশজন শববাহককে কাঁধ দিতে হলো। বড় সুখের ভাগ্য নিয়েই মরলো সোহাগবালা. তার মুমূর্ষু দশার খবর পেয়ে এ বাড়ির কর্ত্রী স্বয়ং বিম্ববতী এসেছিলেন তাকে দেখতে। গত আট-দশ বছরের মধ্যে ওপরতলার বাবুদের কেউ ভৃত্য মহলে আসেননি। বিম্ববতী তার ঠোঁটে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়ে বলেছিলেন, আহা সতী লক্ষ্মী, ও ঠিক স্বগ্যে যাবে!

তিনি নিজের একটি বহুমূল্য গরদের শাড়ি দিলেন মৃতদেহ ঢেকে নিয়ে যাবার জন্য।

সোহাগবালার মৃত্যুর পর দরদালানের শূন্য চৌকিতে থাকোমণি বসতে লাগলো। এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত তুললো না। সোহাগবালার স্থান যে থাকোমণি গ্রহণ করবে, এ যেন স্বতঃসিদ্ধ। থাকোমণি শুধু যে দিবাকরের নেকনজরে আছে, তাই তো নয়, তার ছেলে দুলালচন্দ্র এ বাড়ির ছোটবাবুর পেয়ারের ভৃত্য। না, ভৃত্য বলা ভুল হলো, দুলালচন্দ্রের স্থান ভৃত্যের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে, সে ছোটবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে কিছুটা লেখাপড়াও জানে এবং সে ভৃত্য মহলে থাকে না।

থাকোমণির যৌবনও এখন পশ্চিমগগনে হেলতে শুরু করেছে, শরীর কিছুটা ভার-ভারিক্ক হয়েছে। কোন্ শেকর-বাকড় বেটে খেলে গর্ভনাশ হয় কিংবা কোনো মূর্খ দাসী পাঁচ মাসের পোয়াতী হয়ে গেলে কোন্ দেয়াসিনীর কাছ থেকে নির্ভর-যোগ্য ওষুধ আনাতে হয়, তাও সে সব জানে। কোনো অল্প বয়সিনী সোমত্থ দাসী কাজে ভর্তি হলে তাকেও সে দু-একবার দিবাকরের কাছে পাঠায়। সেবার জন্য।

তিন বৎসর আগে থাকোমণি দুলালচন্দ্রের বিবাহ দিয়েছে। কিন্তু ছেলে-বউ নিয়ে ঘর করার সুখ তার কপালে নেই। ইদানীং দুলালচন্দ্র তার মাকে আর গ্রাহ্য করে না। মায়ের দিকে সে ঘৃণার চক্ষে তাকায় এবং তার মা যে একজন সামান্য দাসী, এই পরিচয় দিতে সে লজ্জা পায়। নবীনকুমারকে যখন একজন সাহেব শিক্ষক পড়াতো, তখন সাহেবকে যাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না হয় সেইজন্য বাগানে একটি পাকা, সুদৃশ্য পড়ার ঘর নির্মিত হয়েছিল। সেই ঘরটি এখন দুলালচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে সস্ত্রীক থাকে। আর দুলালচন্দ্রের বউটিও বড় আদুরী, শাশুড়ির যত্ন করার কথা সে একবার মনেও ভাবে না, সব সময় সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বাগানে নেচে বেড়ায়। সম্প্রতি তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।

থাকোমণি ছেলের ব্যবহারে আঘাত পায়, কখনো একলা থাকলে সে আপন মনে গজগজ করে। অবজ্ঞায় ওষ্ঠ উল্টে সে বাতাসকে শুনিয়ে বলে, ছেলে আমায় না দেকলে তো বয়েই গেল! ও ছেলে আমায় খাওয়াবে, না পরাবে? ভারী আমি তার তোয়াক্কা করি! আমার নিজের পায়ে ডাঁড়াবার ক্ষ্যামতা আছে, আমি কারুর হাত তোলা নই! কতায় বলে, 'কড়ি ফট্কা চিঁড়ে দই, বন্ধু নহি কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে।'

তা হাতে এখন বেশ কিছু টাকা কড়ি জমেছে থাকোমণির। মাস মাইনে তিন

টাকা থেকে ছ' টাকায় উঠেছে, সে টাকার তো এক পাইও খরচা হয় না। তাছাড়া, সোহাগবালার স্থান গ্রহণ করায় এখন উপ্‌রি রোজগারও যথেষ্ট। না চাইলেও অনেকে তাকে দস্তুরি দেয়। যে-রাখালটা দুধ দোয়, সে কিছুটা দুধ গোপনে বাইরে বিক্রি করে, তার কিছুটা হিস্যা সে থাকোমণিকে দিয়ে যায়। নকুড় বাজার সরকার, সে প্রতিদিন থাকোমণিকে দেয় এক সিকি। এমনকি দুটি জুড়ি গাড়ির চারটি ঘোড়ার ছোলা-দানাও যায় এখানকার ভাঁড়ার থেকে। সহিসরা সেই ছোলা-দানাও কিছুটা বাইরে বিক্রি করে এবং তারও কিছুটা ভাগ স্বেচ্ছায় তারা দেয় থাকোমণিকে। ঘি, তেল, মশলা সবই ফেরিওয়ালারা দিয়ে যায় বাড়িতে, আগে ওদের কাছ থেকে বখরা আদায় করতো দিবাকর। আজকাল আর সে এই সব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না, ওসবও এখন থাকোমণির ভাগে।

নকুড় ছিল বেশ কিছুদিন থাকোমণির আরেক নাগর। কিন্তু সে লোকটি এমনই অলপ্পেয়ে যে মিছে কথা বলায় তার জুড়ি নেই। নকুড়ের দেশ ঘরে বিয়ে করা বউ ও ছেলে-মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে সে ছুটি নিয়ে সেখানে যায়। এবার সে ঘুরে এসে বলেছিল, তার বউয়ের ক্ষরকাশ হয়েছে, আর বেশীদিন আয়ু নেই। সেই বউটা মরলে নকুড় থাকোমণিকেই বউ সাজিয়ে তার দেশের বাড়িতে রেখে আসবে। সেখানে নকুড়ের বড় সংসার, দেখাশুনোর জন্য থাকোমণির মতন একজন মানুষ চাই, নকুড় তো আর এখানকার এত রোজগার ছেড়ে সারা বছর দেশে পড়ে থাকতে পারবে না!

তা সে বউটাও মরলো, নকুড়ও সব কিছু ভুলে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। এখন সে দিবাকবেব আরেক উচ্ছিষ্ট কচি বয়েসের দাসীকে নিয়ে মেতে আছে। তা থাক, তাতে থাকোমণির এখন আর কিছু যায় আসে না। তার যৌবন চলে যেতে বসেছে, এখন পুরুষ মানুষরা তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেই, এটা সে জেনে গেছে। তবে নকুড় যদি তাকে দু-একদিন সিকি দিতে ভুলে যায়, অমনি সে ক্যাঁক করে চেপে ধরে।

গলা খরখরিয়ে সে বলে, অ্যাই নোকড়ো, আজ কত মাছ এনিচিস দেকি? এই তোর দশ সের? কাকে বুজোচ্চিস, আমি কানা? দেকি, পাল্লায় চাপা, পাল্লায় চাপা হারামজাদা মিন্সে! কতায় বলে, অতি বাড় বেড়োনাকো ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ঝাড় হয়ো নাকো ছাগলে মুড়োবে! বেশী নোলা হয়েচে, তাই না?

সোহাগবালার কাছ থেকে অবিকল এই সব কথাগুলি মুখস্থ করে রেখেছে থাকোমণি, যথাস্থানে ব্যবহার করে।

এই সব কথাতেও কাজ না হলে থাকোমণি চোখ রাঙিয়ে বলে, দ্যাক্‌ নোকড়ো, ফের যদি আমার সঙ্গে ফেরেব্‌বাজি কত্তে আসবি তো ছোটবাবুর কানে কতা তুলে দোবো!

চোখ রাঙিয়ে পীরিত আদায় করা যায় না, কিন্তু চুরির ভাগ আদায় করা যায়।

তাছাড়া, থাকোমণির হাতে আছে এই তুরুপের তাশ। সকলে জানে যে থাকোমণি ইচ্ছে করলেই দিবাকরকে এড়িয়ে তার পুত্র মারফত এ বাড়ির ছোট কর্তার কাছে নালিশ জানাতে পারে। আর ছোট কর্তা তো দুলালের কথায় ওঠেন বসেন। আর কিছুদিনের মধ্যে দুলালই যে দিবাকরের জায়গা দখল করে নেবে, তাতে কারুর কোনো সন্দেহ নেই। থাকোমণির ছেলে তার মাকে ভক্তি ছেদ্দা করে কি না, সে খবর তো সবাই রাখে না।

স্বগ্রামে দিবাকরের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। এতকাল সিংহবাড়িতে গোমস্তাগিরি করে সেই টাকায় সে নিজে বাড়ি বানিয়েছে, জমি কিনেছে, পুকুর কাটিয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন চাকরি গেলেও তার কিছু যায় আসে না, কলকাতা ছেড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে বুড়ো বয়েসটায় বহাল তবিয়তে পায়ের ওপর পা তুলে থাকবে। দিবাকর চাঁছাছোলা ধরনের মানুষ। থাকোমণিকে সে কখনো কোনো মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি, এমন কি শয্যাসঙ্গিনীকে সে কখনো কোনো নরম আদরের বাক্যও বলে না। থাকোমণি তার সেবাদাসী, ব্যস, সেইটুকুই তার পরিচয়। যখন দিবাকরের কোনো প্রয়োজন থাকবে না, তখন থাকোমণির আর কোনো স্থান নেই তার জীবনে। থাকোমণি একদিন মাত্র ভীরু কণ্ঠে দাবি জানিয়েছিল যে দিবাকর যখন দেশের বাড়িতে যায়, তখন একবার কি সে থাকোমণিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না? এর উত্তরে সে প্রচণ্ড দাবড়ি খেয়েছিল দিবাকরের কাছ থেকে।

থাকোমণির টাকা-কড়ি সব তার বিছানার নীচে। মাঝে মাঝে সে রাত্তিরবেলা পিদিম জেবলে গুনতে বসে। বারবার গুনেও আশ মেটে না। এক সময় সে গুনতেই জানতো না, স্বামী ও পুত্র-কন্যার হাত ধরে যখন সে এই শহরে আসে তখন দুই আর দুইয়ে কত হয়, সে ধারণাও ছিল না তার। সে সব কতকাল আগেকার কথা। সে সব দিনের কথা আর থাকোমণির মনেই পড়ে না প্রায়, কেমন যেন আবছা স্বপ্নের মতন। দু'পাশে দুটি তাল গাছের মাঝখানে ছিল তাদের মাটি লেপা, খড়ের চাল ছাওয়া বাড়ি, একদিন জমিদারের নায়েব এসে সে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। স্বপ্নের মধ্যে সেই আগুনও এখন নিবে গেছে।

এখন থাকোমণি গোনাগুনতিতে চৌকোশ। গোনে আর ভাবে, এত টাকা! এই টাকা তাকে যক্ষের মতন আগলাতে হবে।

টাকার ওপর শুয়ে শুয়ে থাকোমণি আজকাল একটি নতুন স্বপ্ন দেখে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দিবাকর যেখানে বাড়ি বানিয়েছে, পুকুর কেটেছে, ঠিক সেই গ্রামে কিংবা তার পাশের গ্রামে থাকোমণিও একটা বাড়ি বানাতে পারে না? বাড়ি, পুকুর, চাষের জমি...! যদিও এখনো পুরোপুরি দেয়নি, কিন্তু থাকোমণি জানে, আর কিছুদিন পর দিবাকর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সে নিজে থেকে গায়ে-পড়া হতে গেলেও সে তাকে ছুঁতে চাইবে না। এ বাড়ির বয়স্কা দাসীদের কী অবস্থা হয় তা তো এই ক'বছরে থাকোমণি কম দেখেনি। গতরের জোর কমে গেলেই যেন একটা যাই যাই রব উঠে যায়। আর সকলে নানা ছুতোয় গলাধাক্কা দিতে শুরু করে, অন্যে জিনিস ভাঙলেও দোষ হয় তার। অন্য কেউ চুরি করলেও তাকেই চোর অপবাদ নিতে হয়। তারপর একদিন কাঁদতে কাঁদতে বিদায় গ্রহণ। বাড়ির কর্তাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করেও কোনো লাভ নেই, তাদের কাছে পৌঁছোনোই যায় না, তা ছাড়া দাস-দাসীদের নিয়োগ বা বিতাড়নের ভার সম্পূর্ণত দিবাকরের ওপর। কর্তারা এ নিয়ে মাথা ঘামান না, কেউ কখনো কিছু বলতে গেলে বিরক্ত হন। ঠিক মতন কাজ না পেলে কর্তারা দিবাকরের কাছেই জবাবদিহি চাইবেন।

অনেক বৃদ্ধা দাসীকে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় চলে যেতে দেখেছে থাকোমণি। কোথায় যায় তারা? গো-ভাগাড়ের মতন কোথাও কি মানুষ-ভাগাড় আছে!

থাকোমণি নিঃসম্বল নয়, তার যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু একলা মেয়েমানুষ হয়ে সে এই টাকা নিয়েই বা কী করবে? একটু হাত-আলগা দিলেই লুটেপুটে খাবে পাঁচ ভূতে। কিছুদিন আগেও তার সব সাধ-আহ্লাদ ছিল ছেলেকে ঘিরে।

সেই ছেলে এখন পর হয়ে গেছে, সে এখন কত ব্যস্ত। তবু তন্দ্রার মধ্যে থাকোমণি মনশ্চক্ষে সেই অদেখা জায়গার অনির্মিত নতুন বাড়িটির ছবি তৈরি করে নেয়। নিকোনো অঙ্গন ছোট বাড়ি, বাতাবি লেবুর গাছ, সেখানে ছোট বয়েসী দুলাল ধুলো মেখে খেলা করছে...।

গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট হবার পর বেশ কিছুদিন এ গৃহ নিঝুম হয়ে ছিল। এখন আবার সরগরম। নবীনকুমারের দ্বিতীয় বিবাহের পর তার পত্নীর পিত্রালয়ের লোকজন সর্বক্ষণ আসে। তা ছাড়া প্রতি শনিবার অপরাহ্নে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। সিংহ সদনের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ায় জুড়িগাড়ি, হুম হাম করে পাল্কি বেহারারা অনবরত এসে পাল্কি নামায়। মজলিশ কক্ষ গমগম করে। দেশোন্নতি ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে কত ভাবগর্ভ বক্তৃতা হয়। তার সামান্যতম ঢেউও এসে পৌঁছোয় না ভৃত্য মহলে। তারা শুধু জানে, প্রতি শনিবার ছোটবাবুর কাছে তাঁর ইয়ারবক্সীরা আসেন, তাঁদের জন্য প্রচুর খাবার পাঠাতে হবে। বাড়িতে বেশী জনসমাগম হলে দাস-দাসীরা খুশী হয়। বেশী মানুষ মানেই বেশী খাবার। আর তার থেকে রাই কুড়োতে কুড়োতে বেল হয়ে যায়।

দুপুরের দিকে যখন হাতে বিশেষ কাজ থাকে না, তখন থাকোমণি এক পা এক পা করে বাগানের মধ্যে তার ছেলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ দিনই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। থাকোমণি তখন ডাকে, অ বউমা, আমার বাপধন ঘুমিয়ে আছে নাকি? অ বউমা! একবার দুয়োরটা খোলো, অ বউমা!

দুলালচন্দ্রের পত্নী সুবালা অনিচ্ছার সঙ্গে দরজা খোলে। দুপুরের নিদ্রাটি তার বড় প্রিয়। রাতে তাকে বারবার জাগতে হয়, ছেলে কখন কেঁদে ওঠে কিংবা বিছানা নোংরা করে, তার ঠিক নেই, আবার দুপুরের ঘুমটাও যদি শাশুড়ি এসে ভেঙে দেয়, তাহলে কি মেজাজ ঠিক থাকে। বউ যদি জেনে যায় যে তার স্বামীই তার মাকে তাচ্ছিল্য করে, তবে সে তো আরও বেশী করে করবেই।

শাশুড়িকে ভেতরে আহ্বান না জানিয়ে দরজার দুপাশে হাত রেখে সে বলে, কী? খোকা তো এখুন ঘুমুচ্চে! এই অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ালুম।

—তবু একবার চোকে দেকে যাই! বাপধনকে একবার না দেকলে শান্তি হয় না।

—আপনি অন্য সময় আসতে পারেন না? খোকা এতক্ষণ খেলছেল।

—সকাল থেকে কি আমার চোকের পাতা ফেলার সময় থাকে। এই তো বিকেল পড়তে না পড়তেই মশলা বাটা শুরু হবে আবার, বাতিগুনোয় তেল ঢালতে হবে, লুচির ময়দা মেপে দিতে হবে।

দুলালচন্দ্র এই সময় প্রায় কোনোদিন থাকে না জেনেও থাকোমণি জিজ্ঞেস করে, দুলাল কোথায়?

-ছোটবাবুর সঙ্গে বেরিয়েচে।

এমনও হয়, পর পর তিন চার দিন দুলালকে এক পলকও দেখতে পায় না থাকোমণি, তবু এখানে এসে একবার ছেলের খোঁজ নিয়ে যাওয়া চাই।

থাকোমণি সুবালার মুখের দিকেও আজকাল অবাক হয়ে তাকায়। সুবালার বয়েস চোদ্দ, তার বাপ একজন ছুতোর মিস্তিরি। বিয়ের সময় নাকে নোলক পরা ভীতু ভীতু মুখ বউটি হয়ে সে এসেছিল। এখন তার নোলক নেই। সে নিয়মিত শরীর মাজা-ঘষা করে আর এমনভাবে ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরে যে তাকে

ঠিক বাবুদের ঘরের মেয়েমানুষদের মতন দেখায়। এই থাকোমণির পুত্রবধূ, একে যে তারই সমীহ করতে ইচ্ছে করে।

সুবালা দরজার পাল্লা থেকে একটা হাত সরালে থাকোমণি ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঘুমন্ত নাতির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন যেন মুগ্ধতা ঝরে পড়ে তার চোখ মুখ দিয়ে। সে বলে, আহা হা, আমার বাপধন, কী সোন্দর, ঠিক চাঁদের পারা মুখখানি, চোক দুটো দেকোচো বউমা, ঠিক দুলালের মতন...।

মনের ভুলে নাতিকে সেই সময় কোলে তুলে নিতে গেলে সুবালা হা-হা করে ওঠে। ও মা, ও কী কচ্চেন! এক্ষুনি জেগে যাবে, আর অমনি চ্যাঁচাবে! কাঁচা ঘুম ভাঙলেই এমন চ্যাঁচায়।

অপরাধীর মতন মুখ করে হাত সরিয়ে নেয় থাকোমণি। ঘুম ভেঙে গেলে সে বুঝি আবার ঘুম পাড়াতে জানে না? সে বুঝি ছেলেমেয়ে মানুষ করেনি? যত আদিখ্যেতা!

একটু গম্ভীরভাবে সে বলে, বুকের ওপর হাত দিয়ে আচে, হাত দুটো পাশে নামিয়ে দাও, বউমা। ব্যাটাছেলেমানুষের বুকে হাত দিয়ে ঘুমুতে নেই, তাতে ইছলি বিছলি স্বপ্ন দেকার অভ্যেস হয়।

পুত্রবধূর সন্তান হবার সময় থাকোমণি বড় আশা করে ছিল রাত্রে সে তার নাতিকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোবে। সে আশা তার বৃথা গেছে। সুবালা এক মুহূর্তের জন্য ছেলেকে কাছছাড়া করতে চায় না।

দৈবাৎ দু-একটা দুপুরে দুলালচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় থাকোমণির। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই দুলাল মুখখানায় রাগ রাগ ভাব ফুটিয়ে থাকে, ভালো করে কথাই বলতে চায় না। থাকোমণির যেন বুক ফেটে যায়। তার খুব ইচ্ছে করে, দুলালের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুই কেমন আচিস, দুলে? ওরে, তোর জন্যে যে আমার মন পোড়ে, তুই বুঝিস না?

কিন্তু এসব বলা হয় না। মাকে দেখলেই দুলাল সটান গিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বোজে। মনে হয় যেন ইচ্ছে করে নাক ডাকে।

থাকোমণি মনে মনে কাতরভাবে বলে, ওরে, আমার ওপর তোর এত রাগ কেন? আমি কী দোষ করিচি তোর কাচে? যদি কিছু পাপ করে থাকি, সে তো তোরই জন্যে। তুই যখন ছোটটি ছিলিস, তখন তুই যাতে ভালো থাকিস, তুই যাতে ভালো করে খেতে পরতে পাস, সেই জন্যিই তো আমি...।

একদিন থাকোমণি দুপুরে দুলালকে সদ্য বাড়ি ঢুকতে দেখে তার মুখোমুখি গিয়ে বললো, অ দুলে, তোর সঙ্গে আমার ক'টা কতা আচে!

দুলাল অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, কী?

- বলচি কী, ভালো করে বোস না, অ বউমা, তুমিও এসো, তুমিও শোনো।

দুলাল মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, কী বলবে, জলদি বলো। আমায় একটু বাদেই আবার ছোটবাবুর সঙ্গে বেরুতে হবে।

থাকোমণি খুশীর সংবাদ দেবার মতন উদ্ভাসিত মুখে বললো, বলচি কী, আমার হাতে বেশ কিছু ট্যাকা জমেচে। সেই ট্যাকা দিয়ে কোনো গাঁয়ে গিয়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনলে হয় না?

দুলাল বললো, গাঁয়ে বাড়ি কিনবে? কেন, কী হবে?

- বাঃ, আমাদের একটা নিজের বাড়ি থাকবে না? সারা জেবন পরের বাড়ি কাটাবো?

—গাঁয়ের বাড়ি কিনবে, সেখানে থাকবে কে?

—কেন, আমরাই সবাই মিলে থাকবো!

—গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবো? আর খাবোটা কী? লবডংকা?

—বলচি, বলচি. একটু মন দিয়ে শোন! আমার যা ট্যাকা আচে, তা দিয়ে একটা ছোট বাড়ি আর কয়েক বিঘে ধান জমিও কেনা যায়। আর একটা পুকুর। জমিতে চাষবাস করলেই তো আমাদের খাওয়া পরা চলে যাবে। সেই ভালো না? কতকাল আর পরের বাড়িতে খেটে খেটে মরবো। আমাদের কেনা নিজের বাড়ি হবে, আমি আর বউমা বাড়ির কাজ দেকবো সব, আর তুই জমিতে...।

দু চোখে দারুণ বিরক্তি ফুটিয়ে এবং ধমক দিয়ে দুলাল বললো, আমি মাঠে গিয়ে হাল ঠেলবো? তোমার মাতা একদম খারাপ হয়ে গ্যাচে নাকি? এখেনে আমরা কী কষ্টে আচি যে গাঁয়ে গিয়ে চাষাভূষো সাজতে হবে? আমায় ছাড়া ছোটবাবুর এক পা চলে না...। হেঃ! পাগলের মতন কতা। কলকেতা শহর ছেড়ে গাঁয়ে যাবো হেদিয়ে মত্তে! তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি যাও!

বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে বেরুবার মুখে একদিন রাইমোহনকে ধরলেন বিধুশেখর। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তিনি এসে সিংহবাড়ির বৈঠকখানায় বসে থাকেন। নজর রাখেন কারা আসা-যাওয়া করছে মজলিস কক্ষে।

সভা চলাকালীন বিধুশেখর সেখানো কক্ষনো যান না। ছেলেছোকরাদের ব্যাপার, তাঁর মতন একজন প্রবীণ ব্যক্তির সামনে ওরা কখন কী অসমীচীন বাক্য বলে ফেলবে তার ঠিক নেই, তাঁর নিজের মান রক্ষা করাই দায় হতে পারে। ছোটকু অর্থাৎ নবীনকুমার এখন এই সভা নিয়ে মেতেছে, বিধুশেখর এতে কোনো বাধার সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কতকগুলি অল্প বয়েসী যুবক সন্ধ্যাবেলা এক স্থলে মিলিত হয়ে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং দেশোন্নতির চিন্তায় ললাটে ঘর্ম ছোটায়, এ যেন তাঁর কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। এ আবার কোন্ নতুন ধরনের হুজুগ?

সারা দেশেই যুবক দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনাচার ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। অতি অল্প বয়েসেই তারা সুরাপান ধরছে, এবং ধরা মানে কী, সে যেন চূড়ান্তভাবে আঁকড়ে ধরা। আগে তবু গুরুজনদের সামনে যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল এখন তারও বালাই নেই। শহর ছেয়ে গেছে বারাঙ্গনায়। পূর্বে এদের পৃষ্ঠ-পোষক ছিল মধ্যবয়েসী ধনীরা, এখন যুবকরাই সে সব কুস্থানে প্রকাশ্যে গতায়াত করে। কিছুটা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে যুবকদের মধ্যে সরকারী চাকুরি পাবার সুযোগ এসেছে, তৈরি হয়ে উঠেছে একদল চাকুরিজীবী যুব-সম্প্রদায়। অনেকে আসছে মফঃস্বল থেকে, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ফেলে রেখে শহরে মেস-বাড়িতে দল মিলে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য সন্ধ্যার পর কুলটা নারীদের সংসর্গে মত্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার পর এই অসংযমী মদ্যপ ও কামপরায়ণদের দৌরাত্ম্যে পথ চলা দায়!

আবার এক শ্রেণীর যুবক মেতেছে ধর্ম নিয়ে। সেও এক ধরনের অনাচার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খুব খৃষ্টান হবার হিড়িক উঠেছিল, এখন তা খানিকটা

প্রশমিত হলেও একদল আবার নিরাকার ব্রহ্ম ভজনার নামে এক উৎকট ধর্ম নিয়ে পাগলামি শুরু করেছে। সে ধর্মের কোনো মাথামুণ্ড নেই, সনাতন হিন্দু ধর্মকে হেয় করাই যেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিধুশেখর ভেবেই পান না যে, ধর্ম কিংবা সুরা কিংবা পরনারী নিয়েই যদি দেশের যুবকরা সকলে মেতে থাকে, তাহলে পরিবারের শুচিতা ও সমৃদ্ধি রক্ষা হবে কী প্রকারে? যারা ব্যভিচারী এবং নেশাখোর তারাও যেমন নিজ নিজ সংসারের সর্বনাশ করছে, তেমনি যারা ধর্ম-পাগল, তাদেরও জাগতিক উন্নতির দিকে কোনো মন নেই। বিষয়সম্পত্তির কথা চিন্তা করাও তাদের চক্ষে যেন পাপ। এই সুযোগে ইংরেজ লুটেপুটে নিচ্ছে দেশের যাবতীয় সম্পদ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্র ধর্মের নামে নাচাচ্ছেন এই সব যুবকদের। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্র এই দেবেন্দ্র, ওঁর পিতা পরম সাহসের সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে পর্যন্ত বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। আর দেবেন্দ্র সে সব গোল্লায় দিয়ে সঞ্চিত বিষয়সম্পত্তির অংশ বেচে বেচে ধার শুধছেন এবং ধর্ম করছেন।

এ সব কথা চিন্তা করলেই বিরক্তিতে বিধুশেখরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যায়। ধর্ম হিন্দুদের কাছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। গৃহী হিন্দু নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্ম চর্চা করবে এবং নিজের জীবনে সুনীতিগুলি যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু ধর্মের নামে একদল লোক এক স্থানে মিলিত হয়ে বক্তৃতা করবে কিংবা গান গাইতে গাইতে নৃত্য বা ক্রন্দন শুরু করবে অথবা পথ দিয়ে মিছিল করে যাবে, এ আবার কী অদ্ভুত কথা! এ যেন বোষ্টম ন্যাড়া-নেড়ীদের ব্যাপার। তা হলে সংসার ছেড়ে ওরা আশ্রম খুললেই পারে, কিংবা বনেজঙ্গলে চলে যাক না! দেবেন্দ্র তো আবার প্রতি বৎসরই একটি করে পুত্র বা কন্যার জন্ম দিয়ে চলেছেন!

নবীনকুমার অতি দুরন্ত, অতি খেয়ালী। বিধুশেখর জানেন, এ ছেলের ওপর খুব কড়া নজর রাখা দরকার, একটু রাশ আলগা দিলেই এ সম্পূর্ণ উৎসন্নে চলে যেতে পারে। নবীনকুমারের স্বভাব এমনই অস্থির যে, কোনো দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় যে-কোনো কু-কাজ করা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া, এখন থেকেই তার যেমন খরচের হাত দেখা যাচ্ছে, তাতে রামকমল সিংহের অতুল বৈভবও সে উড়িয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করলে। আইন মোতাবেক এখনও নবীন-কুমার সাবালক নয়, সম্পত্তি ও জমিদারি পরিচালনার অধিকার তার এখনো জন্মায়নি, সে অধিকার এখনো বিম্ববতী ও বিধুশেখরের। পুত্রস্নেহে অন্ধ বিম্ববতী পুত্র যখন যা টাকা পয়সা চায়, তাই তিনি দিয়ে দেন, বিধুশেখর অনেক চেষ্টা করেও এর নিবারণ করতে পারছেন না।

নবীনকুমার জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার জন্য এমনভাবে মেতে উঠেছে, এটাকে বিধুশেখর এখনো সুলক্ষণ বলে গণ্য করেননি। তাঁর ধারণা, এ উচ্ছ্বাস অতি সাময়িক, এ যেন ঠিক বয়সোচিত নয়, হঠাৎ সে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে যেতে পারে বলে বিধুশেখরের সন্দেহ হয়।

তিনি নিজে বিদ্যোৎসাহী সভার অধিবেশনে যোগদান করেন না, কিন্তু দিবাকরকে তিনি চর হিসেবে লাগিয়েছেন। দিবাকর আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। দিবাকরের মারফৎ তিনি জেনেছেন যে, ঐ সভায় শ্যাম্পেন-ব্রাণ্ডি চলে না। এমনকি গোপনেও না। স্ত্রীলোক বিষয়ে রসালাপও হয় না ওখানে। আবার ধর্ম নিয়েও কোনো প্রসঙ্গ ওঠে না ঐ সভায়। শুধু নিরস সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য আলোচনা? বিধুশেখরের খটকা লাগে।

এই সভার উদ্যোগে থিয়েটার করার কথা শুনে বিধুশেখর প্রথমে প্রবল বাধা

দিতে চেয়েছিলেন। যাত্রা, পালাগান এসব নিছক ভাঁড়ামো ও নিকৃষ্ট রসের ব্যাপার. ইতর শ্রেণীর জনসাধারণই সে সব উপভোগ করে, কচিৎ কখনো ভদ্র ব্যক্তিরা তা দর্শন করে স্বাদ বদলায় মাত্র। তা বলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা নিজেরা ঐ সব করবে?

কিন্তু নবীনকুমারের জেদের কাছে বিধুশেখরকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। যাত্রা, পালাগান আর ইংরেজদের অনুকরণে এই থিয়েটার নাকি এক নয়। উচ্চপদস্থ সাহেবরা এই প্রকার থিয়েটারের উৎসাহদাতা। কিছু কিছু হিন্দু ধনী গৃহে ইদানীং এর প্রচলন শুরু হয়েছে।

নবীনকুমার বিধুশেখরকে এড়িয়ে চলে. পারতপক্ষে সামনে আসতে চায় না। কখনো মুখোমুখি পড়ে গেলে সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে পালায়। সে প্রকাশ্যে বিধুশেখরকে অগ্রাহ্য করে না. বিধুশেখরের প্রতি মনে মনে তার এখনো কিছুটা ভয়ের ভাব আছে। কিন্তু বিধুশেখর কোনো মতামত জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দিলে সে মায়ের কাছে প্রবল আবদার জানিয়ে সেটাকে খারিজ করিয়ে আনে। এইভাবে সে থিয়েটারের অনুমতি আদায় করেছে।

বিধুশেখর বুঝেছেন, জোর জবরদস্তি করে এ ছেলেকে ঠান্ডা রাখা যাবে না। একে বশে রাখতে হবে নানাপ্রকার গোপন সুকৌশলে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনি আরাম কেদারায় বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে টানছিলেন, পায়ের কাছে দিবাকর তাঁর পদসেবায় ব্যাপৃত। বিদ্যোৎসাহী সভার কার্যক্রম শেষ হয়েছে, বক্তা ও সদস্যরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন, বিধুশেখরের চোখ সেই দিকে। একেবারে শেষের দিকে রাইমোহনকে বেরুতে দেখে বিধুশেখর চকিতে উঠে বসে দিবাকরকে বললেন, ঐ লোকটাকে ডেকে নিয়ায় তো! ঐ যে সিড়িঙ্গেটা—।

দিবাকর ডেকে নিয়ে এলো রাইমোহনকে।

বিধুশেখরের এক চোখের ওপর আজকাল একটি কালো ঢাকনা দেওয়া থাকে। ঐ নষ্ট চক্ষুটিতে তাঁর একেবারেই আলো সহ্য হয় না। বৈঠকখানা ঘরে মাথার ওপর জ্বলে একশো মোমের বিরাট ঝাড়বাতি।

সুস্থ চোখটিতে রাইমোহনের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, তোমার কী নাম যেন?

হাত দুটি যুক্ত করে বিনয়ে খানিকটা কুব্জ হয়ে গিয়ে বিগলিত হাস্যে রাইমোহন বললো, হুজুর, আমাকে বারবার দ্যাকেন আর বারবার ভুলে যান। অবশ্য আমি অতি সামান্য প্রাণী, হুজুরের মতন ব্যস্ত মানুষ আমাকে মনে রাকবেনই বা কী করে! অধমের নাম রাইমোহন ঘোষাল।

বিধুশেখর বললেন, হুঁ, মনে পড়েচে। তা তুমি আবার এখেনে এসে ভিড়লে কী করে? তোমাকে তো আমি দেকিচি সেই কমলী মাগীটার বাড়িতে!

—হুজুর আমাকে আরও অনেক জায়গায় দেকেচেন। স্বর্গীয় বাবু রামকমল সিংগী আমায় বিশেষ স্নেহ কত্তেন। তেনার অভাবে আমাদের মতন দশ-পাঁচজন একেবারে অনাথ হয়ে পড়িচি!

—বুজলুম! তুমি নিজেই একদিন বলেছিলে, তুমি হলে গে সুখের পায়রা! তা তোমার আবার বিদ্যেচর্চার মতিগতি হলো কবে থেকে? সুখের পায়রাদের তো এমন সুখ্যাতি নেই!

—হুজুর, মানুষের ভাগ্যে কখুন কী আচে, স্বয়ং কালপুরুষও বোধ হয় তা বলতে পারেন না। বয়েস হলে বেড়ালও নিরামিষাশী হয়। বয়েসে ভোগীও যোগী হয়। যে পাপী সেও ভেক নিয়ে অন্য পাপীদের তরায়। তা আমারও আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে বয়েস কম হলো না! তাই আমি একদিন নিজেকে শুধোলুম, ওরে অবোধ মন, বেলা তো যেতে বসলো, এতদিন জগতে থেকে কী সঞ্চয় কল্লি? জ্ঞান-বুদ্ধি তো কিচুই হলো না। সোনা বাইরে পড়ে রইলো, আমি শুদু আঁচলে গিরে বেঁধেচি! এখন শেষ বেলায় দুটো ভালো কতা, দেশের উন্নতির কতা অন্তত কিচু শুনে যাই, নইলে যমরাজের কাচে কী জবাবদিহি দেবো! তাই দেকলুম, বাবু রামকমল সিংগীর সুযোগ্য পুত্র নবীনকুমার বিদ্যোৎসাহী সভা খুলেচেন, তাই আমিও সেখেনে এক কোণায় ঠাঁই নিলুম।

—ওরা তোমাকে ঠাঁই দিল?

—অযোগ্যকেও তো মানুষ কখুনো কখুনো দয়া করে! কানে পাঁচটা ভালো কতা গেলেও আত্মার উন্নতি হয়। আহা ছেলে আপনার হীরের টুকরো! ধন্য রামকমল সিংগী, এমন পুত্রের জন্ম দিয়ে গ্যাচেন। প্রতিভার জ্যোতিতে এ ছেলে যেন চন্দ্র-সূর্য্যি এক করেচেন!

—তা তো বুঝলুম। কিন্তু এখানে যারা আসে তারা তো সবাই কলেজে-পড়া, ইংরেজি-জানা কেষ্ট-বিষ্টু ধরনের লোক। তাদের মধ্যে তুমি ঠাঁই পেলে কী করে? পোশাকে-আসাকে তো দিব্যি ভেক ধরেচো দেকচি, কিন্তু হাঁ করলেই যে তোমার বিদ্যে বেরিয়ে যাবে!

—আজ্ঞে আমি ইংরেজিটে জানিনি বটে, কিন্তু অল্প বয়েসে দু-চার পাতা শাস্তর পাড়িচিলুম। আমি মন্দ হতে পারি, আমার বংশটা তো মন্দ নয়। বংশের ধারায় আমার রক্তের মধ্যে কিচু নেকাপড়ার বিদ্যে আচে। মাঝে মাঝে সেই রক্তই কথা কয়ে ওঠে।

—বাঃ বলতে কইতে তো দিব্যি শিকে গ্যাচো দেকচি। কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

—তা হুজুর আর একটি সত্যি কতাও বলি। আমাদের এ সভায় নেছক ট্যাঁস-ফিরিঙ্গিদের মতন সর্বক্ষণ ইংরেজিতে কতা হয় না। বাংলাতেও কতা হয়। বাবু নবীনকুমার বাংলার বড় পৃষ্ঠপোষক, কাজে কাজেই বাংলায় যখন দেশের কতা হয়, জ্ঞানের কতা হয়, তখন মাঝেমদ্যে আমিও একটুআধটু ফোঁড়ন দিই, দু-চারটে শাস্তরের বচন উগরে দিই।

—বেশ, বেশ, তোমার যোগ্যতা বুঝলুম। কিন্তু ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে যাতায়াত করছো, সেটি বুঝলুম না এখনো। টাকা পয়সা কিছু পাবার আশা আচে নাকি?

রাইমোহন দারুণ চমকিত হয়ে জিভ কেটে বললো, আজ্ঞে না, হুজুর! পয়সার ধান্দায় তো অনেক ঘুরিচি, এখন একটু নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার সাধ জেগেচে। আমাদের সভায় সভ্যদের চাঁদা ধার্য করার কতা উঠেচে, আমিও চাঁদা দোবো। আর তাছাড়া—

বিধুশেখর ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাছাড়া?

—সভ্যরা যে থ্যাটার কচ্চেন, তার জন্য আমি তিনখানা গান বেঁধে দিইচি। সুরও আমার দেওয়া। বাবু নবীনকুমারকে আমি গান শিকোচ্চি। এখেনে অনেক ইংরেজি জানা, জ্ঞানীবাবুরা এলেও আমার মতন বাংলা গান বাঁধার এলেম তো আর কারুর নেই। কাজে কাজেই, আমিও যাকে বলে, প্রয়োজনীয়।

—এবার অনেকখানি খোলসা হয়েচে। তোমার মতন বুদ্ধিমানের যোগ্য কাজই

বটে, নিজেকে আগে প্রয়োজনীয় করে ফেলা দরকার। তারপর যত ইচ্ছে ঐ কাঁচ ছেলেটার মাতায় হাত বুলোবে, এই তো? সবাই ওর মাতাটি চিবিয়ে চুষে খেয়ে ফেলার জন্য একেবারে মুখিয়ে আচে, তাই না রে, দিবাকর? কিন্তু এ কতা জানো কি, যতদিন আমি জীবিত আচি, ততদিন সেটি হচ্চে না? সে রকম চেষ্টা যে করবে, তাকে আমি এখনো ঝাড়ে-বংশে একেবারে নির্বংশ করে দিতে পারি?

বিধুশেখরের এই হুমকিতেও রাইমোহনের মুখমণ্ডলে কোনো ভয়ের রেখাপাত হলো না। ওষ্ঠে একই রকম হাস্য লেগে রইলো।

বিধুশেখর তার দিকে তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করে একটুক্ষণ চুপ করে রইলে সে আবার বললো, হুজুর, আমার আর এখন দাঁত নেই যে কারুর মুণ্ড চিবিয়ে খাবো। বাহুতে সে শক্তি নেই, নোখে সে ধার নেই যে, কারুর ঘাড় মটকাবো। এখন পরকালের ডাক এসে গ্যাচে, এখন যতটা পারি চিত্তের বিকার সাফ করে যেতে চাই। আমার ধর্মে তেমন মতি নেই, তাই জ্ঞান চর্চার দিকে ঝুঁকিচি! আপনাকে তো বল্লুম, এ আমার নিষ্কাম সাধনা!

—এ অতি উত্তম কতা! এবার আমি তোমার গান শুনবো। দিবাকর, তুই বাইরে যা। দরোজাটা বন্ধ করে দিবি আর আমি ফের না ডাকা পর্যন্ত এখেনে আসবিনি।

দরজা বন্ধ হবার পর বিধুশেখর বললেন, বসো, সামনের ঐ কেদারাটায় বসে শোনাও, থিয়েটারের জন্য কেমন গান বেঁধেচো!

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রাইমোহন গুণগুণ করে গান ধরলো।

নিশি যায় হায় হায় করি কী উপায়
নাথ বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়
হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী
আর কি আসিবে কান্ত তুষিবে আমায়—।

শিবনেত্র হয়ে গাম্ভীর্য মাখা মুখে বিধুশেখর শুনতে লাগলেন গান। তাঁর কোনো রকম সংগীতপ্রীতি আছে বলে আগে কখনো শোনা যায়নি। এ রকম হালকা আমোদে তিনি কখনো সময় ব্যয় করেন না। আজ রাইমোহনের মুখ থেকে গানগুলি শুনবার অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

একটি শেষ হবার পর তিনি বললেন, আর একটি শুনি।

রাইমোহন আবার ধরলো :

হৃৎপিঞ্জরের পোষা পাখি উড়ে এলো কার
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে হৃদয়ের আধার।
কোন্ কামিনীর পোষা পাখি, কাহারে দিয়েচে ফাঁকি
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলিকাটা ধরা ভার।

বিধুশেখরের মুখে আরও গাম্ভীর্যের মেঘ জমাট হলো। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, শুধু এই সব ছ্যাবলামো গান তুমি শিখোচ্চো ওকে?

বিধুশেখরের গান শোনার উদ্দেশ্য রাইমোহনের বুঝতে বাকি ছিল না। সেইজন্যই সে দ্বিতীয় গানে 'প্রণয়ের আধার' গাইবার সময় বদলে দিয়ে গেয়েছে, 'হৃদয়ের আধার'।

সে নিরীহ মুখ করে বললো, হুজুর, নাটকে য্যামন য্যামন কতা, সেই অনুযায়ী তো গান বাঁধতে হবে। সবারই খুব পছন্দ হয়েচে!

—তা হবে না কেন? এ সব চটুল জিনিস আর ভালো লাগবে না ছোকরাদের? এ তো মেয়েছেলের গান, এই সব গান তুমি নবীনের মুখে গাওয়াচ্চো?

—আজ্ঞে, আমাদের নাটকে যে উনি রাজকুমারীর ভূমিকায় অ্যাক্টো কচ্চেন! সেই জন্যিই এমন গান!

—রাজকুমারী হলেই সে সর্ব সময় প্রেম লীলের জন্য হ্যাংলামি করবে? কেন, রাজকুমারীরা বুঝি কখনো ভক্তির গান গায় না? তুমি ভক্তির গান শিখোও ওকে, ভালো হয় যদি শ্যামাসংগীত—

রাইমোহন তৎক্ষণাৎ বললো, তাও আচে হুজুর, এই যে তৃতীয় গানটি শুনুন :

অনুগত আশ্রিত তোমার
রেখো মা, মিনতি আমার...

এই গানেও রাইমোহন 'নাথ' বদলে মা করে দিল এবং তার প্রণয় গীতিটি দিব্যি শ্যামাসংগীত হিসেবে চলে গেল।

বিধুশেখর এবার কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমায় দিয়ে আমার দু-চারটি কাজ আচে।

দিবাকরের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁক দিতেই দিবাকর দরজা ঠেলে উঁকি দিল। বিধুশেখর তাকে হুকুম দিলেন, খাজাঞ্চির কাচ থেকে কুড়িটে টাকা নিয়ে আয়, আমার নাম করে।

দিবাকর চলে যেতেই তিনি রাইমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, থাকা হয় কোতায়? জানবাজারে সেই ঠেঁটি মেয়েছেলেটার কাচে?

রাইমোহন বললো, না না, হুজুর, সেখেনে আমি কালেভদ্রে দু-চারবার গেচি মাত্তর। যবে থেকে শুনিচি আপনি ওকে ও বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কত্তে চান, তারপর আর আমি ও ধারও মাড়াইনি! ও বিদেয় হয়নি এখনো?

—মামলা চলচে এখনো। অমন দাগাবাজ মাগী আর দুটি দেকা যায় না! সমানে লড়ে যাচ্চে। আমার মনে হয় তলে তলে কেউ ওকে বুদ্ধি জোগান দেয়, ওর একলার এমন ক্ষ্যামতা নেই।

—তা হতে পারে, হুজুর, ওর কাচে অনেক মাতা মাতা লোকেরা আসে।

দিবাকর কুড়িটি সিক্কা টাকা এনে দিল। টাকাগুলি নিয়ে বিধুশেখর আবার দিবাকরকে ইঙ্গিত করলেন বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে।

তারপর টাকাগুলি রাইমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও।

রাইমোহন বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলো, টাকা? টাকা কিসের জন্য, হুজুর?

—কেন, তুমি টাকা ছোঁও না নাকি? টাকা অপবিত্তর জিনিস?

—আজ্ঞে না, টাকা হলো বক্ষের হৃৎপিণ্ড, নয়নের মণি, বাপ-মায়ের স্নেহ আর সন্তানের ভালোবাসা। টাকাই ইহলোকের মোক্ষ। টাকার বাণ্ডিলে বসতে পারলে কত পাপী-তাপীও মহাত্মন বনে যায়। খালি জিজ্ঞেস কচ্চি, হঠাৎ আমার ওপরে আপনার এই দয়া কেন?

—ধরে নাও, তুমি গান শোনালে তার ইনাম। বাড়ির দোরগোড়ায় ভিকিরি এসে গান শোনালেও তাকে কিচু দিতে হয়।

রাইমোহন টাকার তোড়াটি দু হাতে ধরে বারবার কপালে ঠেকাতে লাগলো।

নিবন্ত আলবোলায় কয়েকবার বড় বড় টান দিয়ে আবার চাঙ্গা করে নিয়ে বিধুশেখর বললেন, মাসে মাসে তুমি আমার কাচ থেকে কুড়ি টাকা পাবে। তবে তার বদলে শুদু গান শোনালে চলবে না। তোমাদের ঐ সভায় কী কী কতাবার্তা হয় তা সব আমায় জানাবে। পাই পয়সা পর্যন্ত, কিচু বাদ না যায়!

এবার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাইমোহন বললো, নিশ্চয় হুজুর, এ

সব কতা আপনার জানা তো দরকার বটেই!

—নবীন যাতে ভুল পথে না যায়, সেদিকে তোমায় নজর রাকতে হবে।

—অবশ্যই রাকবো!

—এর মধ্যে বেসুরো কিছু তোমার নজরে এয়েচে? ঐ থিয়েটারের হুজুগটা আমার পছন্দ নয়, তাও কতা শুনলে না।

—ওটা নির্দোষ আমোদ, ওর মধ্যে দোষের কিছু নেই। তবে ঐ নাস্তিক বিদ্যেসাগরকে নিয়ে যে এত মাতামাতি করা হচ্চে, সেটা ঠিক ভালো কতা নয়।

—বিদ্যেসাগর নাস্তিক? তাঁকে তো আমি অনেকদিন ধরে চিনি। বয়েস কম, একটু মাতা-গরম ধাঁচের, কিন্তু মানুষটি নির্লোভ। ছোটকুর হাতে-খড়ির সময় দক্ষিণা, বিদেয় কিছুই নিতে চায়নি, বড় অবাক হয়েচিলুম হে! বামুন পণ্ডিত অথোচ অর্থলোভ নেই, কলিকালে এমন হয়?

—কিন্তু হুজুর, কলিকালেই এমন হয় যে বামুন পণ্ডিত, অথচ নাস্তিক! ঐ বিদ্যেসাগর নাস্তিক ছাড়া কী? বেধবাদের বে দিতে চায়!

—কী বললে?

—আপনি শোনেননি? এই নিয়ে শহরে কত সোর উঠেচে! আপনার নবীন-কুমার কিন্তু বেধবা বে নিয়ে খুব নেচেচে।

বিধুশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিজের এই বৈকল্যে অবাক হলেন তিনি। একটু পরে মুখ তুলে অসহায় স্বরে বললেন, আমার পাঁচ মেয়ে, তাদের কারুরই ভাগ্যে সধবা হয়ে থাকা ঘটলো না। আমার প্রাণাধিকা কন্যা বিন্দু কাশীতে গিয়ে আত্মঘাতিনী হয়েচে। আমি সব সয়িচি। সমাজ ও দেশাচারের মুখ চেয়ে আমি কখনো দুর্বল হইনি। কোনো ভ্রষ্টাচারের প্রশ্রয় দিইনি। কিন্তু এখুন বয়েস হয়েচে, এখুন আর পারি না। ঘোষাল, তুমি বিধবাদের কথা আমার সামনে কক্ষনো উচ্চারণ করো না! ওরা যা কচ্চে করুক।

রাইমোহন চুপ করে গেল।

বিধুশেখর আবার বললেন, আমিই ঐ বিদ্যেসাগরকে এনে নবীনের হাতে-খড়ি দিইয়েচি, বিদ্যেসাগর ওর গুরুস্থানীয়। এখন যদি নবীন তার গুরুর কথা মান্য করে চলে তা হলে আমি কোন্ মুখে নিষেধ করবো?

—তা অবশ্য ঠিক কতা।

—তুমি একটু নজর রেকো, নবীন যেন কুসংগে না পড়ে, কুপথে না যায়। আমাদের দুই বংশে এই একটি মাত্র পুরুষ সন্তান!

—ছেলে আপনাদের একেবারে হীরের টুকরো। এতটুকুনি বয়েস অথচ কী মেধা, কত বুঝদার, এমনটি আর কেউ কখুনো দেকেনি!

বিধুশেখরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে রাইমোহন পথে বেরিয়ে পড়লো। শরীরটা বেশ উষ্ণ আর চনমনে লাগছে। লাগবেই তো, ফতুয়ার পকেটে নগদা-নগদি কুড়িটা টাকা। খুব ইচ্ছে করছে সোডা ওয়াটার দিয়ে দু-চার গেলাস নাম্বার ওয়ান এক্‌সাক্যাস্টলিয়ন ব্রান্ডী খেতে। অনেক দিন ওসব খাওয়া হয় না। আগের সে জীবন এখন নেই। নবীনকুমারের সভায় তাল রাখবার জন্য আজকাল রাইমোহনকে বইপত্র পড়তে হয়।

রাইমোহন উসখুস করতে লাগলো। আবগারির কড়াকড়ির জন্য ইদানীং সন্ধে হতে না হতেই সুরার দোকান বন্ধ হয়ে যায়। তবু দু পয়সা বেশী দাম দিলে এ সময়ও কোথায় ওসব পাওয়া যায়, রাইমোহন তা জানে, কিন্তু সেখানে গেলে

পুরোনো ইয়ার-বক্সীদের পাল্লায় পড়তে হবে।

পথে আজ গোরা-পুলিশের বড় গিসগিস। রাইমোহন প্রথমে ভাবলো, এ বোধ হয় সেই হিসির হুজুগ। শহরে তো হুজুগের অভাব নেই। কিছুদিন ধরে নগর-পালকরা শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য খুব ক্ষেপে উঠেছে, ঝোপ-ঝাড় সাফ হচ্ছে, পুকুর-ডোবা ভরাট করার কাজ চলেছে পুরোদমে, তার ওপর এক হুকুম জারি হয়েছে যে পথে কেউ প্রস্রাব করতে পারবে না। এমন অদ্ভুত আইনের কথা আগে কেউ শোনেনি, অনেক পথচারী মন্তব্য করেছিল, রাস্তায় না মুতে তবে কি লোকে শোবার ঘরে মুততে যাবে? কিন্তু মসকরার বিষয় নয়, বয়স্ক থেকে বালক নির্বিশেষে বেশ কয়েক জনকে পাহারাওয়ালারা ঐ নির্দেশ ভঙ্গ করার অপরাধে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের জরিমানা করা হয়েছে।

খানিক দূর এগিয়ে রাইমোহন বুঝলো, আজ সে ব্যাপার নয়। পথে মানুষ জন বেশী নেই। পুলিশের সংখ্যাই যেন বেশী। একদল দিশি সিপাহীর সঙ্গে কয়েকজন গোরা-সৈন্যকে কুচকাওয়াজ করে আসতে দেখে রাইমোহন দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আবার একটু এগুতে যেতেই আবার আর একটি ঐ রকম দল।

এক ভোজপুরী বিশালদেহী পাহারাওয়ালা লম্বা লাঠিটিকে বাম বগলে রেখে দু হাতে খৈনী টিপছিল, রাইমোহন তার সামনে গিয়ে মস্ত সেলাম বাজিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সিপাহীজী, আজ ব্যাপার কী, এত সেনা-পুলিশের যাতায়াত?

পাহারাওয়ালাটি তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, জানো না আজ অমুক নবাব আসবে?

সিপাহী যে নবাবের নামটি কী বললো, তা রাইমোহন ঠিক বুঝতে পারলো না। কেমন যেন অচেনা নাম। সে ভাবলো, মরুক গে, নবাব বাদশাদের খোঁজ রেখে তার দরকার কী? অমন কত রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা এই শহরে আসে যায়!

একটু রাত হলে কেরাঞ্চি গাড়িগুলো আর পাওয়া যায় না। পাল্কীওয়ালারাও উধাও। রাইমোহনকে হেঁটেই যেতে হবে বৌবাজার পর্যন্ত। সে সন্তর্পণে চতুর্দিকে চেয়ে চলতে লাগলো।

হীরেমণির ছেলে চন্দ্রনাথ সেই যে পলায়ন করেছে, আর সে ফেরেনি। রাইমোহন দু-চারবাব দেখেছে তাকে। কখনো সে জাহাজঘাটায় কুলিগিরি করে কখনো মাটি কাটার কাজ নেয়। রাইমোহনকে দেখলেই সে রক্তচক্ষে তাকায়। রাইমোহন বুঝে গেছে যে ওকে আর ঘরে আনা যাবে না। তার মা এবং রাইমোহনের প্রতি এক সময় যে তীব্র অভিমান ছিল, তা এখন জাতক্রোধ। রাইমোহন চন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়ার কথা হীরেমণিকে আর বলে না।

হীরেমণি তার পেশা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। সে আর গানও গায় না। রাইমোহন অনেক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, গানটা অন্তত না ছাড়তে, সে হীরা বুলবুল, শহরে তার গানের কত কদর! কিন্তু হীরেমণি কিছুতেই তা শুনবে না! যে বড়মানুষরা তার ছেলের সর্বনাশ করেছে, তাদেরই আবার গান শুনিয়ে সে মনোরঞ্জন করবে? তার ঘৃণা হয়!

রাইমোহন হালকা পায়ে বাড়িতে ঢুকলো। আজ তার মনে বেশ ফুর্তি। সারা বাড়ি অন্ধকার। হীরেমণি আজকাল যখন তখন বাতি নিবিয়ে শুয়ে থাকে। গন্ধক-কাঠি নিয়ে রাইমোহন কয়েকটা বাতি জেলে দিল। নিজের ঘরের পালঙ্কের

ওপর হীরেমণি শুয়েছিল উপুড় হয়ে, রাইমোহন তার পিঠে আস্তে হাত রেখে ডাকলো, হীরে, ওঠ্! আজ তোকে একটা গান শোনাবো!

হীরেমণি বললো, না।

রাইমোহন বললো, ওঠ না। এ গান বাবুদের জন্য নয়কো। এ গান শুধু তোতে আমাতে দুজনে শুনবো। ওঠ্, দ্যাক, মন ভালো হয়ে যাবে!

—না।

—হীরে আমার, মানিক আমার, সোনা আমার, আমার দিনের কমলিনী, রাতের কুমুদিনী, ওঠ্!

—না। তুমি খেয়ে নাও গে। খাবার ঢাকা আচে।

রাইমোহন এবার জোর করে হীরেমণির মুখটা ফিরিয়ে বললো, লক্ষ্মীটি, ওঠ্। দুজনে একসঙ্গে বসে খাবো। শোন, হীরে, এই আমার কতা শুনে রাক্। যারা তোর ছেলে চাঁদুর ওপর অবিচের করেচে, তাদের ওপর আমি শোধ নেবোই নেবো, নেবোই নেবো! তুই দেকিস একদিন।

হাটখোলার মল্লিক বাড়িতে জগাই মল্লিকের কনিষ্ঠ সন্তান চণ্ডিকাপ্রসাদের মনে একটাই শুধু খেদ, সে আর তার মধ্যমাগ্রজ মিলে তাদের পিতার শ্রাদ্ধ উৎসব করতে পারলো না এখনো। এ বাড়িতে বিবাহযোগ্য এমন কোনো পুত্র বা কন্যা নেই যে তার বিবাহ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করা যায়। বধূরা কোনো নতুন সন্তানও প্রসব করেনি যে তার অন্নপ্রাশনে জাঁকজমক করা যাবে। একটা কোনো সামাজিক উপলক্ষ তো চাই। খ্যামটা নাচ কিংবা বাঈ-নাচ বসত বাড়িতে ঠিক জমে না। আর দোল-দুর্গোৎসবে পোস্তার রাজবাড়ি কিংবা রানী রাসমণিকে কিছুতেই হার মানানো যাবে না। যতই ধুমধাম করো, লোকে তবু ঐ দুই বাড়িতেই ছুটবে।

লোকে কথায় কথায় বলে, শোভাবাজার রাজবাড়িতে ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়েছিলুম বটে! তেমনটি আর কেউ দেখাতে পারলে না! কিংবা হাটখোলার দত্ত বাড়িতে সেই যে মুখে-ভাত হয়েছেল, তাকেই না বলে মুখে ভাত, ধন্যি ধন্যি, হাজার হাজার লোকের মুখে পোলাও কালিয়া উঠেছিল সেদিনকে। কিংবা ছেরাদ্দ হয়েছেল সেই জোড়াসাঁকোর রামকমল সিংগীর, সে একেবারে রঙের গোলাম তুরুপ, তার ওপর আর কেউ দেখাতে পারলে না।

এই মল্লিক বাড়িতে এখন শুধু একটি শ্রাদ্ধেরই অবকাশ আছে। তখন দেখানো যায় রামকমল সিংহের ছেলেরাই বা কতখানি আর চণ্ডিকাপ্রসাদও কত বড় বাপের ব্যাটা। কিন্তু চণ্ডিকাপ্রসাদের এই অভিলাষ মেটাবার জন্য তার পিতার কোনোই তৎপরতা নেই। জগাই মল্লিক যেন অজর, অমর। তাঁর বয়েস বর্তমানে প্রায় একশো ছুঁই-ছুঁই, তবু এখনো তিনি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে রয়েছেন। কানে শুনতে পান না, তাঁর দন্তহীন মুখের বাক্য একটিও কেউ বুঝতে পারে না, তবু তিনি চলা-ফেরায় সক্ষম।

চণ্ডিকাপ্রসাদ তার বাপকে দেখে কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং কখনো কখনো

ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে। অবশ্য যতক্ষণ চণ্ডিকাপ্রসাদ সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে থাকে। ইদানীং এই চিন্তাটি যেন তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে, এক এক সময় সে ক্ষিপ্ত হয়ে পিতাকে মারতে যায় আর চিৎকার করে বলে, হারামজাদা বুড়ো, বলছি যে তোর ছেরাদ্দে দেশসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেবো। তাও মরবিনি! আয়, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

ভৃত্যরা তৈরিই থাকে, তারা যথাসময়ে চণ্ডিকাপ্রসাদকে ধরে ফেলে।

বাইরে থেকে নেশায় টপ ভুজঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে ফেরার সময় সে জড়িত গলায় হাঁক পাড়তে থাকে, মরেচে? বুড়োটা মরেচে? অ্যাঁ? যে আমায় আগে সু-সু-সু-সু-সুসংবাদ দিবি, তাকে পাঁচ মোহর বকশিস কবলাবো। মরেচে, অ্যাঁ?

সেই সময় জগাই মল্লিক দ্বিতলের বারান্দার লোহার রেলিং ধরে ঠিক দশ-মেসে শিশুর মতন পা বেঁকিয়ে নাচে আর মুখ দিয়ে ম-ম-ম-ম শব্দ করে।

একদিন জুড়ি গাড়ি থেকে চণ্ডিকাপ্রসাদকে কয়েকজন ভৃত্য মিলে ধরাধরি করে নামালো। তার বাহ্যজ্ঞান নেই কিন্তু সমস্ত শরীরটা তড়কা রোগীর মতন কাঁপছে, আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

এক যবনী বেশ্যার বাড়িতে নাচের পাল্লা দিতে গিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ চেতন হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেই থেকে আর জ্ঞান ফেরেনি।

এ গৃহে এমনই অব্যবস্থা যে কে কার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, তারও ঠিক নেই। জগাই মল্লিকের মধ্যম পুত্র কালীপ্রসাদই গৃহকর্তা, কিন্তু বিলাসিতা ও রঙ্গ-তামাশায় তিনিও কম যান না। তবে কালীপ্রসাদের একটি অন্তত গুণ আছে, তিনি মত্ত অবস্থায় কখনো গৃহে আসেন না। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর একাধিক রক্ষিতালয় আছে, মাঝে মাঝে সে-সব জায়গায় তিনি কিছুদিনের জন্য ডুব দিয়ে থাকেন। আবার স্বগৃহে, পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন সুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে যান। হয়তো সেই কারণেই বিষয়সম্পত্তি সব এর মধ্যে গোল্লায় যায়নি। কিংবা, জগাই মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্মবীর চিত্তপ্রসাদ এমন শক্ত বাঁধনে তাঁদের বিষয়সম্পত্তি বেঁধে দিয়ে গেছেন যে তার কিছু নষ্ট হবার বদলে দিন দিন যেন শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে।

চণ্ডিকাপ্রসাদকে যেদিন অচৈতন্য অবস্থায় বয়ে আনা হয় দৈবাৎ সেদিন কালীপ্রসাদ গৃহেই ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনালেন। তাঁরা একে একে সকলেই ফিরে গেলেন মুখ গোমড়া করে। ভাবগতিক দেখে মনে হয় পিতৃশ্রাদ্ধ করার সৌভাগ্য বুঝি চণ্ডিকা-প্রসাদের হলো না, বরং চণ্ডিকাপ্রসাদেরই শ্রাদ্ধ বুঝি তার পিতাকে দেখতে হবে।

একদিন দুপুরে নিজের মহল ছেড়ে কুসুমকুমারী এলো মাঝ মহলে পীড়িত খুড়শ্বশুরের অবস্থা জানতে। চণ্ডিকাপ্রসাদের পত্নী দুর্গামণির সঙ্গ তার ভালো লাগে। এ বাড়িতে একমাত্র দুর্গামণির কাছেই কুসুমকুমারী দুটো মনের কথা কইতে পারে।

দুর্গামণি চণ্ডিকাপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষ। কলকাতার ধনী পরিবারের একটি নিয়ম এই যে বাবুদের বাইরে যে-কটি রক্ষিতাই থাকুক না কেন, বাড়িতে একটি স্ত্রী রাখতেই হবে। এক স্ত্রী মরলে আবার আর একটি। কায়স্থ বা বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-বিবাহের বিশেষ চল নেই, কিন্তু এক পত্নী বিয়োগের পর আর একটি পত্নী আনতে কোনো দোষ নেই। বাবু হয়তো মাসের মধ্যে একদিনও রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু অন্তঃপুর শূন্য রাখা চলবে না। বাড়িতে একজন কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি না করলে রক্ষিতালয়ে আমোদ যেন ঠিক জমে না।

ভাগ্যবানের বউ মরে। প্রতিটি নতুন বিবাহ মানেই নতুন করে অর্থ এবং

অলংকার প্রাপ্তি। চণ্ডিকাপ্রসাদের ভাগ্য সেই হিসেবে ভালো, তার প্রথমা পত্নী মারা গেছে বিবাহের দু বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয়া পত্নী এ গৃহে এক বৎসর অবস্থান করেই আত্মঘাতিনী হয়েছিল।

দুর্গামণি কান্নাকাটি কিংবা আত্মঘাতিনী হবার মতন পাত্রীই নয়। সে অতিশয় তেজস্বিনী ও আত্মসম্মানসম্পন্না যুবতী। তার পিত্রালয় ফরাসডাঙ্গায়, সেখানে সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখেছিল। তার নরাধম স্বামীকে সে প্রথম দিকে সুপথে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এখন সে নিজেই পারতপক্ষে তার স্বামীর মুখ দেখতে চায় না।

দুর্গামণি একটি পশমী আসনে নকশা বুনছিল, কুসুমকুমারীকে দেখে বললো, আয়, বোস।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, খুড়ী, উনি কেমন আচেন গো?

দুর্গামণি বললো, ঐ একই রকম।

—জ্ঞান ফেরেনি?

—না।

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যালেন আজ?

—ডাক্তাররা কী বলে গ্যাচেন তা আমিও বুঝিনি, তুইও বুঝবিনি। যদি ওঁর নিয়তিতে থাকে, তবে বাঁচবেন!

—ওঁর নিয়তি, না তোমার নিয়তি?

—আমার নিয়তি নিয়ে আমি মাতা ঘামাইনাকো। তুই তো জানিস, আমি মাচ, মাংস খেতে ভালোবাসি না। উনি গেলেন কি রইলেন তাতে আমার ভারি এলো গেল।

কুসুমকুমারী চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা, এ কি অলুক্ষণে কতা! ছি ছি, খুড়ী, এমন কক্ষনো বলতে নেই। অন্য কেউ শুনলে কী ভাববে!

দুর্গামণি ফিক করে হেসে ফেলে বললো, আমি বুঝি অন্যের কাচে বলতে গ্যাচি! শুধু তোকেই তো বলি এ সব কতা।

—সত্যি খুড়ী, তোমার বড্ড সাহস।

দুর্গামণি মোটেই অবলা অন্তঃপুরিকাদের মতন নয়। সে বেশ লম্বা, শরীরের গড়নটিও ভালো। চণ্ডিকাপ্রসাদ প্রায়ই তাকে প্রহার করে। চণ্ডিকাপ্রসাদের তো গুণের ঘাট নেই, স্ত্রীকে প্রহার করাও তার বাসনা চরিতার্থ করার একটি অঙ্গ। দুর্গামণি একবার মাত্র একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে তার পিত্রালয় ফরাস-ডাঙ্গায় চলে গিয়েছিল। চণ্ডিকাপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে তার পত্নীকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনে। দুর্গামণির পিতার অবস্থা হঠাৎ পড়ে গেছে, তাই ধনী জামাইকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। সেবার চণ্ডিকাপ্রসাদ দুর্গামণিকে খুব প্রহার করায় দুর্গামণিও উলটে দু-এক ঘা দিয়েছিল। কুসুমকুমারী নিজের চক্ষে দেখেছে যে দুর্গামণি নেশায় সংজ্ঞাহীন তার স্বামীর গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে।

দুর্গামণির আর একটি কাণ্ড দেখেও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল কুসুমকুমারী। দুর্গামণি নিজের হাতে একটি পত্র লিখেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। সেই পণ্ডিত বিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতন লড়াই করছেন এবং এখন রাজদরবারে একটি আবেদন পাঠিয়েছেন। দুর্গামণি লিখেছিল, আপনার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম। আপনি সার্থক হইলে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগিনী আপনার পায়ে পূজা দিবে। আপনি এ অধীনার প্রণাম লউন। আপনি চিরায়ু

হউন।

নিজের হাতের একটি স্বর্ণবলয় খুলে সেই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল দুর্গামণি।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করেছিল, বিধবাদের বে'র জন্য তুমি এত আকুল হলে কেন গো, খুড়ী?

দুর্গামণি বলেছিল, 'জীয়ন্তে মরা' কতাটা শুনিচিস? আমি হলুম গে স্বামী জীয়ন্তে বিধবা। তোর দশাও তো একই।

কুসুমকুমারী দুর্গামণির পাশে বসলো। দুর্গামণির বেশ আঁকার হাত আছে। কোনো ছবি না দেখেই সে আসনের ওপর ফুল, লতাপাতা সেলাইতে ফুটিয়ে তুলতে পারে। অনেকগুলি এমন সুন্দর সুন্দর আসন সে বানিয়েছে। তবে, এই আসন সে কার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে? কোন্ হৃদয়েশ্বরকে সে এই আসনে বসাবে? তার কেউ নেই।

দুর্গামণি জিজ্ঞেস করলো, তোরটি আজ কেমন আচে? আজ তেমন চ্যাঁচানি শুনিনি যেন!

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই কুসুমকুমারীর মুখখানি ম্লান হয়ে যায়। দুর্গামণির মতন তার অবস্থা নয়। কুসুমকুমারী ইচ্ছে করলেই তার পিত্রালয়ে চলে যেতে পারে। সেখানে সে আদরের কন্যা। তার বাবা তাকে নিয়ে যেতেও চান। এবং তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনবে না, সে জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু কুসুমকুমারীর মা বলেন, ওরে কুসোম, নারীর জীবনে পতিই সব। দ্যাক, তুই এখনো সেবা যত্ন করে তাকে বাঁচাতে পারিস কি না। তাকে ছেড়ে তুই এখেনে থাকলে তোকে যে সারা জীবন দগ্ধাতে হবে!

কুসুমকুমারী বললো, তিনি আজ সকাল থেকেই ঘুমুচ্চেন!

দুর্গামণি বললো, ভালো। ঘুমুনোই ভালো। আমার এক এক সময় মনে হয়, ঐ পাগলের কাচে কাচে থেকে তুইও না এক সময় পাগল হয়ে যাস!

—ও কথা বলো না, খুড়ী। আমার ভয় করে।

—তোকে তো আমি ভয়ই দেখাচ্চি।

পাশের ঘরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলো দুজনে। তারপর ছুটে গেল সেদিকে।

ঘোরের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে পালঙ্ক থেকে নীচে পড়ে গেছে চণ্ডিকা-প্রসাদ। যদিও মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা, কিন্তু পালঙ্কটিও বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে। চণ্ডিকাপ্রসাদ অবশ্য মুখ দিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি, চোখও মেলেনি।

কুসুমকুমারী ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো, খুড়োঠাকুর পড়ে গ্যাচেন। ও খুড়ী, ধরো ধরো, তোমাতে আমাতে তুলে দিই।

দুর্গামণি কড়া গলায় বললো, দাঁড়া! এই, ছুঁবি না। কত পাঁচ জাতের মেয়ে-মানুষে ওকে ছোঁয়, সাতজন্মে চান করে না, ওকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।

কুসুমকুমারী বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

তারপর সে বাইরে বেরিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলো, চন্নবিলাসী! চন্নবিলাসী!

দুর্গামণির নিজস্ব দাসীটি ডাক শুনে উপস্থিত হতেই সে বললো, যেদো আর মেধোকে ডেকে নিয়ায়। বাবু পড়ে গ্যাচেন, তুলতে হবে।

যেদো আর মেধো এই বাবুর পেয়ারের চাকর। তাদের কাছাকাছি থাকার কথা সব সময়। কিন্তু তখুনি খোঁজাখুঁজি করে তাদের পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত

দেউড়ির বাইরে থেকে ধরে আনতে হলো তাদের, তারা সেখানে বসে গাঁজা টানছিল।

ততক্ষণ মেঝেতেই পড়ে রইলো চণ্ডিকাপ্রসাদ, দুর্গামণি তাঁর পাশে এসে একবার নাড়ি দেখলো না পর্যন্ত।

তবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

চণ্ডিকাপ্রসাদের বয়েস এখন চল্লিশ। তার জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে কুসঙ্গে পড়েছে ও সুরা ও নারীতে মজেছে বলে জীবনের অন্য কোনো ভালো দিকের কথা সে জানেই না। সে জানে না স্নেহ-মমতার মূল্য। সামান্য বিদ্যাশিক্ষাও করেনি বলে সে নিজের ঘেরাটোপের বাইরের জগতের কথাও কিছু জানে না। সে শুধু জানে, টাকা ছড়াতে পারলে কিছু লোক সব সময় ঘিরে থাকে ও নানাভাবে খাতির করে। যত টাকা ছড়াও, তত বেশী খাতির।

যতদিন তার চলাফেরার ক্ষমতা ঠিক মতন হলো না, ততদিন সে দুর্গামণিকে নানাভাবে জ্বালাতন করলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাজার গণ্ডা হুকুম। কোনো মানুষকে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা তার পছন্দ হয় না। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে সে দুর্গামণির সঙ্গে এতদিন একটানা থাকেনি। দুর্গামণি তার কাছ ঘেঁষতে চায় না বলে সে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্রোধ প্রকাশ করতে শুরু করে। এবং হুমকি দেয়, দেখিস মাগী, তোর তেজ ভাঙবো! আমি আর একটা বিয়ে করবো!

একদিন মদ্যপান না করে যে থাকতে পারে না, সেই ব্যক্তি পুরো এগারো দিন গলায় একবিন্দু ঢালেনি। চিকিৎসকদের কড়া নির্দেশ, তার কাছে যেন কোনো-ক্রমেই সুরা না পৌঁছোয়। অবশেষে যেদো ও মেধোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বাদশ দিনের মাথায় সে একটি সুরার বোতল হস্তগত করলো এবং তা থেকে কাঁচা চুমুক দিয়ে অনেকখানি টেনে নিল একসঙ্গে। সুরা নয়, যেন জাদু! তাতেই সে আবার জেগে উঠলো শেরের মতন। রীতিমতন একটি হুংকার দিল পর্যন্ত।

তখনই সে বেরুবে। তার প্রিয় পোশাক পরে নিল সে। পাজামা, রামজামা, কোমরবন্ধ, মাথায় বাঁ-কান-ঢাকা টুপী। হাতে একটি লাল রুমাল। সেই রুমাল ঘোরাতে ঘোরাতে সে 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে পরে' গাইতে গাইতে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। যাবার সময় দুর্গামণির সঙ্গে একটি বাক্য বিনিময় পর্যন্ত করলো না।

সদরে সিংহদ্বারের সামনে তার পিতার সঙ্গে দেখা হলো। জগাই মল্লিক তখন দুজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। তাকে দেখে মাথায় একটি চাঁটি মারার লোভ অতিকষ্টে দমন করলো চণ্ডিকাপ্রসাদ। শুধু রোষকশায়িত নেত্রে তাকিয়ে বললো, ভেবেছিলে আমিই আগে পটোল তুলবো! বড় মজা, না?

তারপর থেকে চণ্ডিকাপ্রসাদের নিয়মিত জীবনযাত্রা শুরু হলো। সেই দু-তিনদিন অন্তর একবার করে চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা টাকার খোঁজে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।

কয়েকদিন পর আর একটি বৈচিত্র্য ঘটালো কুসুমকুমারীর স্বামী অঘোরনাথ।

বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, এ পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিই উন্মাদ। অঘোরনাথ জ্ঞানপিপাসু মেধাবী যুবক ছিল। কাকাদের ভ্রষ্টাচার তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ধর্ম-উন্মাদনায় বিঘ্ন ঘটায় সে মস্তিষ্ক ঠিক রাখতে পারলো না।

অঘোরনাথ গোড়ার দিকে থাকতো চুপচাপ, কোনো কথা না বলা কিংবা আপন মনে অর্থহীন শব্দ উচ্চারণই ছিল তার রোগের লক্ষণ। কিছুদিন হলো সে হিংস্র হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ সে। শরীরে দারুণ শক্তি, একটি ভৃত্যের গলা টিপে তাকে প্রায় হত্যাই করেছিল একদিন। তার থেকেও ভয়াবহ কথা, সে একদিন তার ঘুমন্ত জননীকে পাঁজাকোলা করে তুলে তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল নীচে। সেদিন একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত আর একটু হলে।

অঘোরনাথকে এখন লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বাড়ির একটি অতি বৃদ্ধা দাসী ছাড়া সে আর কারুকে চিনতে পারে না। সেই দাসীটিই তাকে প্রত্যহ দু বেলা খাইয়ে দেয়। আর কেউ ধারে কাছে ঘেঁষলেই সে চোখ ঘূর্ণিত করে গর্জন শুরু করে দেয়।

হঠাৎ একদিন কোন উপায়ে যেন অঘোরনাথ শিকল খুলে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই সে একটি বৃহৎ অতি সুদৃশ্য চীনে মাটির পাত্র ভাঙলো আছাড় দিয়ে। তারপর অদূরে তার জননীকে দেখে তাড়া করে গেল।

সারা বাড়িতে একটা দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি হলো। ভূমিকম্পের সময় দিশাহারা মানুষের মতন সকলে ছুটলো এদিকে ওদিকে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখ ভর্তি গুম্ফ-দাড়ি, কোমরে শুধু একটু ফালি জড়ানো, অঘোরনাথকে দেখায় যেন ভয়ংকর রুদ্রের মতন। আজ বুঝি কারুর রক্ত না নিয়ে ছাড়বে না।

ভৃত্যকুল ও দ্বারবানরা ছুটে এলো তাকে সামলাবার জন্য। কিন্তু কেউ কাছে আসতে সাহস করে না। অঘোরনাথ যার দিকে তাকায়, সে-ই প্রাণভয়ে দৌড়োয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতেও কান পাতা দায়। কেউ ভগবানের নাম জপছে। কেউ বলছে কেল্লায় খবর পাঠাতে।

কালীপ্রসাদের দুই পুত্র শিবপ্রসাদ ও অম্বিকাপ্রসাদ দ্বিতলের বারান্দা থেকে নানাপ্রকার নির্দেশ দিতে লাগলো ঐ উন্মাদকে ধরবার জন্য। তাদের নিজেদের এগোবার সাহস নেই। অঘোরনাথ তখন নীচতলার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার জননী ওপর থেকে হাপুস নয়নে কেঁদে বলছেন, ওরে, ওকে তোরা বাইরে যেতে দিসনি। তাহলে আর ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরে, যেমন করে পারিস ধর! আমি একছড়া সোনার হার দোবো, যে ধরবে—।

শিবপ্রসাদ ও অম্বিকাপ্রসাদের নির্দেশে দ্বারবানেরা শেষ পর্যন্ত বড় বড় লাঠি এনে পেটাতে লাগলো অঘোরনাথকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মার খেতে লাগলো এবং গজরাতে লাগলো। একটা সুবিধে এই যে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতন অঘোর-নাথ কোনো অস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছে। কোনো এক ভোজপুরীর হাতের লাঠি যদি কেড়ে নিয়ে সে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে অনেকেই ঘায়েল হতো। তার বদলে, মার খেতে খেতে সে এক সময় পড়ে গেল মাটিতে। তখন দশ-বারোজনে মিলে তাকে চেপে ধরে আবার শিকল নিয়ে এসে বাঁধলো।

অঘোরনাথকে শিকল বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে ফিরিয়ে আনা হলো তার কক্ষে। যেন বিরাট একটা যুদ্ধ জয় করা গেছে, এইভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সকলে।

শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন অঘোরনাথের জননী। তিনি কপাল চাপড়ে চাপড়ে বলতে লাগলেন, কী কুক্ষণেই তোকে আমি নিষেধ করিছিলুম, বাপ আমার! আমার কী কুগ্রহ! তুই বেহ্ম হ, কেরেস্তান হ, তোর যা খুশী, শুধু একবার সাদা চোখ মেলে চা, আমায় একবার মা বলে ডাক। অঘোর, বাপ আমার, একবার চেয়ে দ্যাখ।

তাঁর পাশে পুত্তলির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কুসুমকুমারী। তার যেন কথা বলারও শক্তি নেই। অঘোরনাথ যদি তাকে তাড়া করে যেত, তবে সে বুঝি পলায়ন করতেও পারতো না। তার স্বামীকে সকলে মিলে যখন বাঁশ পেটা করে মারছিল, তখন সেও শিউরে শিউরে উঠছিল। কুসুমকুমারী যেন আর সহ্য করতে পারছে না।

শাশুড়ির কান্না শুনতে শুনতে কুসুমকুমারীরও যেন এক সময় মতিভ্রম হলো। সে হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার স্বামীর শিকল বাঁধা পায়ের ওপর। সেখানে মাথা কুটতে কুটতে সে বলতে লাগলো, আপনি ভালো হয়ে উঠুন, আপনি ভালো হয়ে উঠুন। হে ঠাকুর, ওনাকে ভালো করে দাও!

অঘোরনাথ চোখ মেলে দেখলো একবার। সেই চোখে বিস্ময়। ভাবখানা যেন, এ আবার কে? বেশ কিছুক্ষণ সে কুসুমকুমারীকে দেখলো। তারপর, পায়ের ওপর যেন কোনো পোকামাকড় পড়েছে এই ভঙ্গিতে সে দু পায়ে সজোরে ঝাঁকুনি দিল একবার। তাতেই কুসুমকুমারী ছিটকে গিয়ে দেয়ালের কাছে পড়লো এবং দেয়ালে ঠুকে তার মাথা ফেটে গেল।

তখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো কুসুমকুমারীকে।

অনেক পরে কুসুমকুমারী সুস্থ হয়ে যখন ভালোভাবে চোখ মেললো, তখন দেখলো, তার শিয়রের কাছে বসে আছে দুর্গামণি। সে কুসুমকুমারীর সারা গায়ে নরম হাত বুলোচ্ছে।

কুসুমকুমারীকে চোখ মেলতে দেখে দুর্গামণি উঠে গিয়ে ঘরের অর্গল বন্ধ করলো। তারপর ফিরে এসে শয্যার ওপর আবার বসে সে উষ্ণ স্বরে বললো, তুই ওর পায়ে পড়তে গেলি কেন?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

দুর্গামণি আবার বললো, বল্, চুপ মেরে আছিস কেন? বল্?

কুসুমকুমারী ধীরে ধীরে বললো, কী জানি, খুড়ী, মাতাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল!

—বলেছিলুম না, ঐ পাগলের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুইও একদিন পাগল হবি! শোন, আমি একটা কতা বলবো, তুই করতে পারবি?

কুসুমকুমারী তার নীল, কোমল ছলছল চক্ষু দুটি স্থাপন করলো দুর্গামণির মুখে।

—একদিন ওকে বিষ খাইয়ে দে। সব জ্বালা জুড়োক। আমার কাচে বিষ আচে, তুই খাওয়াতে পারবি?

—তুমি কী বলচো, খুড়ী?

—ঠিকই বলচি! ও পাগল আর কোনোদিন ভালো হবে না। তুই বিধবা হ, তোর আমি আবার বিয়ে দেবো। তোর জন্যই তো আমি সাগরকে চিটি দিয়েচি! আমি তো ক্‌ড়িতে বুড়ি, আমার জীবন শেষ, কিন্তু তোর অল্প বয়েস।

—খুড়ী!

—বুকে সাহস আন, কুসোম! ভালো করে বাঁচতে শেক্! মাতাল, পাগল—এদের সঙ্গে কেন আমরা ঘর করবো? আমাদের সাদ-আহ্লাদ নেই! আমি সব সময় বিষ কাচে রাকি, কারুকে আমি ভয় পাই না! তোকে যা বললুম পারবি?

পাশ ফিরে দুর্গামণির কোলে মাথা গুঁজে কুসুমকুমারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, অমন কতা বলো না, খুড়ী, ও সব কতা শুনলেও যে পাপ!
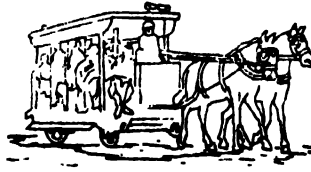
রানী রাসমণির জেদ শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন মহা সমারোহে।

সমারোহ মানে কী, তেমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি। বাংলায় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার তো কম নেই, কিন্তু আর কেউ এত বৃহৎ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেননি, এ রকম বিপুল উৎসবের আয়োজনও কেউ করতে পারেননি। শুধু অর্থ থাকলেই হয় না, সেই অর্থ ব্যয় করার মতন অন্তঃকরণও থাকা দরকার।

রানী রাসমণি দাপটের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর এই মন্দির সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করলেন এমন একটি সময়ে, যখন হিন্দুধর্ম নানাদিক থেকে বহু রকম আক্রমণে পর্যুদস্ত। অনেক হিন্দু শাস্ত্র এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রায়, ইংরেজ পণ্ডিতগণই তা উদ্ধার করেন। আবার এক শ্রেণীর ইংরেজ সেই সব শাস্ত্র ঘেঁটেই প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত রকম বর্বর প্রথা ও বিশ্বাস রয়েছে। খৃষ্টান মিশনারিরা হিন্দু ধর্মের অকাট্য সব দোষ তুলে ধরেছেন ভারতবাসীর সামনে এবং সেই সুবাদে তাদের আকৃষ্ট করছেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে। অন্যদিকে ব্রাহ্মরাও হিন্দু ধর্মের নানান ত্রুটির কথা প্রচার করছেন, দেব-দেবীরা তাঁদের চক্ষে পুতুল মাত্র, এবং এই পুতুল পুজো তাঁদের কাছে দু-চক্ষের বিষ। শুধু কি তাই, সম্প্রতি তাঁরা এমনও ঘোষণা করেছেন যে, বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং বেদ বাক্য মাত্রই অভ্রান্ত নয়। হিন্দু ধর্মের পরম পবিত্র গ্রন্থের প্রতি এই আঘাত হেনে ব্রাহ্মরা আরও দূরে সরে গেলেন।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার এবং অনৈতিক প্রথাগুলি সম্পর্কে ঘৃণা বোধ করেন। এই কি সেই মহান ধর্ম যা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার বিধান দেয়। এই ধর্মে পুরুষের বহুবিবাহ প্রশস্ত কিন্তু নারী যদি ছ-সাত বছরেও বিধবা হয়, তাহলেও তাকে সারা জীবন বঞ্চিত, অসহ দিনাতিপাত করতে হবে। এই সেই ধর্ম যেখানে একজন মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্যের চেয়ে উচ্চ হলেও শুধু সে জন্ম কারণে শূদ্র বলেই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতির সঙ্গে একাসনে বসতে পারবে না! এই সেই ধর্ম, যে ধর্মের মানুষ মুসলমান চাষীর শ্রমে ফলানো ধান অম্লান বদনে আহার করবে কিন্তু মুসলমানের হাতে ছোঁয়া জল পান করবে না।

অনেক মুক্তমনা হিন্দু, যাঁদের মনের মধ্যে ধর্মের জন্য আকুতি আছে, কিন্তু বিজাতীয় খৃষ্ট ধর্মও গ্রহণ করতে চান না, ব্রাহ্মদের সম্পর্কেও পুরোপুরি আস্থা নেই, তাঁরাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন এই ধর্মের নানা দোষের কারণে।

এই রকম সময়ই কালীপদ অভিলাষী রাসমণি দাসী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মেই নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য দক্ষিণেশ্বরে শুরু করলেন এই মহাযজ্ঞ। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিনটি শুভযোগ, সেইদিন হলো প্রতিষ্ঠা-উৎসব। বরাহনগর থেকে নাটমন্দির পর্যন্ত পথের দু-পাশে টানানো হলো ঝাড় লণ্ঠন। মধ্যে মধ্যে এক একটি বাঁধা মঞ্চে বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে।

সামনের তোরণটি যেন আকাশচুম্বী এবং বহু বর্ণ সব কুসুমে সজ্জিত।

শুধু নিমন্ত্রিতের সংখ্যাই প্রায় এক লক্ষ, এছাড়া অনাহূত, রবাহূত যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। রানী রাসমণির নির্দেশ যে কেউই অভুক্ত অবস্থায় কিংবা দান না নিয়ে ফিরে যাবে না। বারাণসী, পুরী, পুণা, মান্দ্রাজ থেকেও তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আনিয়েছেন; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কোটালিপাড়ার কোনো ব্রাহ্মণই বাকি নেই। দেশের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সকলকে। গঙ্গার বুকে পিনিস, বজরা বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান গিসগিস করছে, আবার রাজপথে গাড়িও অসংখ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে অনেকগুলি হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাঁধা, এক পাশে স্তূপাকার পট্টবস্ত্র। এছাড়াও কয়েকটি পাহাড় সাজিয়েছেন, রৌপ্য মুদ্রার পাহাড়, সন্দেশের পাহাড়, পাকা কলার পাহাড়, অন্নের পাহাড়। কলকাতার বাজার তো বটেই, পানিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি সন্নিহিত সব এলাকার বাজার সাফ করে আনা হয়েছে সন্দেশ, সব মিলিয়ে পাঁচশত মণ। আর অন্নের পাহাড়টি তো অন্নমেরু পর্বত। রানী রাসমণি সম্মান অনুসারে ব্রাহ্মণদের গোধন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং বস্ত্র দান করবেন। এবং অন্ন ও মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি উৎসর্গ করবেন দেবতাকে।

উৎসবের কয়েকদিন আগে একটি বাধা দেখা দিয়েছিল। মাহিষ্য সম্প্রদায়কে গোঁড়া ব্রাহ্মণের দল শূদ্র বলে মনে করে, সেই শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে ব্রাহ্মণরা অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করেছিল। তারপর ঝামাপুকুর টোলের রামকুমার পণ্ডিতের বিধান মতন দেবালয়টি রানী রাসমণি তাঁর গুরুদেবের নামে আগে উৎসর্গ করায় সে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মন্দিরের প্রতিদিনের পূজারী হবেন কে? কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই শূদ্রের বেতনভুক্ পূজারী হতে সম্মত হলেন না, সামাজিক অপবাদের ভয়ে। শেষ পর্যন্ত রানী রাসমণির নির্দেশে তাঁর জামাতা মথুর ঐ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন মন্দিরের পূজার ভার গ্রহণ করার জন্য।

সব ব্রাহ্মণই পূজারী নয়। বঙ্গে ভট্টাচার্যরাই বংশানুক্রমিক পূজারী। চট্টোপাধ্যায় বংশীয় রামকুমার রানীর প্রস্তাবে কিছু দ্বিধা করেছিলেন প্রথমে। জীবিকার জন্য তিনি কামারপুকুর থেকে এসে কলকাতার ঝামাপুকুরে টোল খুলেছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর রামকুমারের ওপরেই সংসারের ভার বর্তেছে। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি বেতনভুক পূজারী হবেন? এদিকে রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত ঘোষণা করে ফেলেছেন, পুরোহিতের অভাবে যে সব পণ্ড হয়ে যায়! রামকুমার শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন।

নির্যাত নির্বন্ধে রামকুমারই হলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনের হোতা। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই গদাধর, তাঁর বয়েস এখন উনিশ। গদাধর বড় লাজুক প্রকৃতির। গ্রাম থেকে এসে এখনো সে এখানকার লোকজনদের সঙ্গে ঠিক মতন মিশতে পারে না।

বারাণসীর পট্টবস্ত্র পরে রামকুমার পূজায় নিরত, এক পাশে হাত জোড় করে চক্ষু মুদে বসে আছেন রানী রাসমণি, তাঁর মুখখানি ভক্তি ও তৃপ্তির ভাবে বিভোর। অন্যদিকে বসে আছে যুবক গদাধর, মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাশ ছাড়েনি একবারও। তার দুই চোখ বিস্ময়াবিষ্ট, এত মানুষ, এত দ্রব্য, আর নবরত্নের মন্দিরটি যেন একটি পর্বত। গদাধরের এক ভাগিনেয় হৃদয়ও এসেছে সঙ্গে। সে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও গদাধরের চেয়ে অনেক চটপটে,

সে ঘোরাঘুরি করছে চতুর্দিকে।

জানবাজারের মাড় পরিবারের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের। তাই সিংহ পরিবারকে রাসমণি বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে যোগদান করার জন্য। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে নবীন-কুমারকেই। তবে সে একা আসেনি, জননী বিম্ববতীকেও সঙ্গে এনেছে।

বিম্ববতী গৃহ থেকে নির্গত হতেই চান না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় শুধু এক-বার করে যান গঙ্গাস্নানে। তাও ঘেরাটোপ পাল্কিতে, এবং সেই পাল্কি সমেতই তাঁকে জলে ডুবিয়ে আনা হয়। নবীনকুমার অনেকবার বলেছে তাঁকে কোনো তীর্থ দর্শন করে আসতে। কিন্তু বিম্ববতী তাতে সম্মত নন, পুত্রমুখ দর্শন না করে তিনি একদিনও থাকতে পারবেন না।

নবীনকুমার বলে, মা, আমি যখন মহাল পরিদর্শন করতে যাবো, তখন তুমি কী করবে? তুমিও কি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরায় ঘুরবে?

বিম্ববতী উত্তর দেন, তোর বাবা মহাল দেকতে গিয়ে কাজ নেই। সেজন্যে অনেক লোক আচে!

নবীনকুমার বলে, আমার ঠিক বয়েসটা হোক না, তখন দেকো চর্কির মতন ঘুরবো। বিষয় সম্পত্তি নিজে না দেকলে চলে?

মহাল পরিদর্শনে গিয়েই গঙ্গানারায়ণ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে, সে কথা ভেবে বিম্ববতীর এখনো বুক কাঁপে। তিনি ঐ সব কথা শুনে নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেন, না, না, তুই কক্ষুনো মহালে যাবি না! বিষয় যা আচে, ঢের আচে, দূর থেকে চালালেই যথেষ্ট চলবে।

নবীনকুমার মায়ের কথা শুনে হাসে।

নিমতলা ঘাট থেকে বজরায় চেপে অনুকূল জোয়ারে এক ঘণ্টার মধ্যেই নবীন-কুমারেরা পেঁৗছে গেল দক্ষিণেশ্বরে। সদ্য দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে, উৎসব তখন তুঙ্গে। জননীকে নিজের হাতে ধরে নবীনকুমার তীরে নামালো। বিম্ববতীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা, কোনোদিন তিনি সূর্যালোকে অচেনা মানুষের সামনে বেরোননি, এই মধ্যবয়েসেও তিনি নববধূর মতন ব্রীড়াকুণ্ঠিতা।

লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়। দুলাল এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী মিলে সামনে থেকে পথ সাফ করে দিতে লাগলো। নবীনকুমার তার মাকে ধরে ধরে নিয়ে এলো পূজামণ্ডপে।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ঘেরা জায়গায় বসবার স্থান নির্দিষ্ট আছে: একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে রমণী। নবীনকুমার বিম্ববতীকে একটি গালিচা-মোড়া কেদারায় বসিয়ে দিল। সে নিজে বসলো না, এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকার মানুষ সে নয়। সে পরে আছে কোঁচানো ধুতি এবং লম্বাহাতার জামা, এবং পরিবার-প্রধানের চিহ্ন হিসেবে সে হাতে নিয়েছে একটি ছড়ি। আর কোনো পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবককে ছড়ি-লাঠি হাতে দেখা যাবে না।

নবীনকুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সব ব্যবস্থা। রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে দেশের নাম করা ব্যক্তিরা প্রায় সবাই এসেছেন। নবীনকুমার খুঁজতে লাগলো একজনকে। তিনি আসেননি। তিনি নবীনকুমারের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই উপস্থিত. তাঁরা রানী রাসমণির অর্থ বস্ত্র দান গ্রহণ করেছেন, শুধু অনুপস্থিত তাঁদের অধ্যক্ষ।

নবীনকুমার ভাবলো, তিনি আসেননি কেন? তিনি কোনো জায়গা থেকে দান গ্রহণ করেন না বলে? কিংবা ঈশ্বরচন্দ্রকে বোধ হয় অনেকে আজকাল ব্রাহ্মণ বলেই মনে করে না। তিনি নাকি সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না, কোনো ঠাকুর-দেবতার পূজা করতেও কেউ কখনো দেখেনি তাঁকে। এ কী ধরনের ব্রাহ্মণ? তা ছাড়া তিনি এখন বিধবা বিবাহের ব্যাপারে মহা ব্যস্ত।

এত বড় নবরত্ন মন্দির, নাটমহল ও সার সার শিবমন্দির এবং এত জাঁক-জমক দেখে নবীনকুমার প্রথমটায় বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আসেননি দেখে নবীনকুমারেরও খানিকটা ভক্তি কমে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও দেখতে পেল না নবীনকুমার। ব্রাহ্মরা সদলবলে এই অনুষ্ঠান বর্জন করেছে। ইয়ংবেঙ্গলের দলও যে আসবে না, তা যেন জানাই ছিল, তবু তাদের দু-একজনকে সেখানে দেখে নবীনকুমার চমৎকৃত হলো। সাহেবী-ভাবাপন্ন ইয়ংবেঙ্গল দলেরও কয়েকজনের মধ্যে ভক্তিভাব দেখা দিচ্ছে তা হলে!

সন্ধ্যা হতে না হতেই জ্বলে উঠলো রোশনাই। উৎসব এখনো অনেক রাত পর্যন্ত চলবে। নবীনকুমারের আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল। গঙ্গাতীরের এই স্থানটি বড় মনোরম। লোকের ভিড় থেকে সরে গিয়ে যেখানে গাছপালার ঝোপঝাড়গুলি, সেখানে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগছিল তার। কিন্তু বিম্ববতী উতলা হয়ে পড়েছেন, তিনি বারবার দাসী মারফৎ খবর পাঠাচ্ছেন নবীনকুমারের কাছে।

বিম্ববতীর হাত ধরে নবীনকুমার নিয়ে এলো ঘাটের কাছে। বজরায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়লো। এতগুলি মন্দিরের কোনো বিগ্রহকেই সে প্রণাম জানায়নি। একবার তার ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে প্রণাম করে আসে। তারপর আবার ভাবলো, থাক। দূর থেকে প্রণাম জানালেও তো হয়।

সে তখনও তার জননীর হাত ধরে থমকে আছে। বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

নবীনকুমার বললো, কিছু না।

তারপর সে বজরায় উঠে পড়লো। এবং দূর থেকেও প্রণাম জানালো না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রানী রাসমণির দাক্ষিণ্য, মহানুভবতা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে ধন্য ধন্য করা হলো দেশীয় সংবাদপত্র-গুলিতে। শুধু ব্রাহ্মরা নীরব রইলো। পৌত্তলিকতা নিয়ে নতুন ভাবে এই আড়ম্বর তারা সুনজরে দেখলো না।

ব্রাহ্মদের নিজেদের মধ্যেও খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর দ্বাদশ বৎসরের একটি যুগ পার হয়েছে। এবার দেখা দিয়েছে একটি সংকট। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিষ্কলুষ ধর্ম সাধনা এবং পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে। এবং পৌত্তলিকতা ও নানারকম কুসংস্কার বর্জন করে হিন্দু ধর্মেরই একটি পরিশুদ্ধ রূপ দিতে। কিন্তু ইদানীং তাঁর সন্দেহ হচ্ছে যে কতকগুলান নাস্তিক তাঁর এই সভার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকদের অশ্রদ্ধা করেন, খৃষ্টানদের অপছন্দ করেন এবং নাস্তিকদের মনে করেন অমানুষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই পত্রিকায় বর্তমানে অধ্যাত্মতত্ত্বের বদলে শুষ্ক জ্ঞানচর্চারই বেশী পরিচয় দেখা যাচ্ছে।

সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের ঝোঁক যেন ঐ দিকেই। আর একজন রচনা-পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি তো কোনো ধর্ম-আলোচনার মধ্যেই থাকেন না। অক্ষয়কুমার আবার একটা রচনা লিখেছেন, "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"। রচনাটি দেখে বিরক্ত হয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি খুঁজছেন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর এরা মাথা ঘামাচ্ছে বাহ্যবস্তু নিয়ে? এরা কি মানুষের মনের মধ্যে ঢুকতে জানে না? ঐ অক্ষয়কুমারের শুধু বিচারের দিকে ঝোঁক। ও'রই প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বেদের সব কিছুই অভ্রান্ত নয়।

অক্ষয়কুমার আরও একটি কাণ্ড করে দেবেন্দ্রনাথকে আরও চটিয়ে দিলেন। রামমোহনের অনুসরণে অক্ষয়কুমারও একটি আত্মীয় সভা স্থাপন করেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আসেন, সেই সুযোগ নিয়ে অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে নিজের মতাদর্শ প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চান। ঐ আত্মীয় সভায় অক্ষয়কুমার একদিন বললেন, আচ্ছা, ঈশ্বর যে অনন্ত তার কী প্রমাণ আছে? আপনারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ? আচ্ছা, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না তার বিচার করা যাক। কে কে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, হাত তুলুন তো?

এ সংবাদ শুনে দেবেন্দ্রনাথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হাত-তোলা ভোটা-ভুটিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার? এতদূর স্পর্ধা! তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একেবারে বন্ধ করে দেবার অভিপ্রায় জানালেন, শুধু তাই নয়, গোটা ব্রাহ্মসমাজের ওপরেই অভিমান করে ভাবলেন এর সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছেদ করবেন। এমনকি সংসারও পরিত্যাগ করে চিরকালের জন্য চলে যাবেন হিমালয়ে। সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরচিন্তা করবেন। এবং সত্যিই সেরকম উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন।

নবীনকুমার ষোড়শ বর্ষে পা দিয়ে দু-একদিন ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে এলো। তার গৃহে বিদ্যোৎসাহী সভা এখন জমজমাট। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন সদস্য আসছে এবং নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু নবীনকুমারের জ্ঞানস্পৃহা তাতেও মেটে না। শহরের যেখানে যেখানে বিদ্বজ্জন সমাগম হয়, সেখানেই সে যেতে চায়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নবীনকুমার নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারলো না। প্রথম বাধা বয়সের। ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যেরই বয়েস নবীনকুমারের দ্বিগুণেরও বেশী। সে প্রায় বালক বয়েসী বলে সভাচলাকালীন অবস্থায়ও সকলে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চায়। তাছাড়া, ব্রাহ্মদের মুখের ভাষা অতি সুগম্ভীর, এক একজন বক্তৃতা শুরু করে আর থামতেই চান না। পরম ব্রহ্মের প্রসঙ্গে অনেকের চক্ষু থেকে অশ্রু গড়ায়। এই সব দেখে শুনে তার হাসি পেয়ে যায়। স্বভাব-চঞ্চল নবীনকুমার এ রকম সভায় আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে!

তাছাড়া একজন দলত্যাগী ব্রাহ্মও খানিকটা প্রভাবিত করলো তাকে। লোকটির নাম যদুপতি গাঙ্গুলী। নবীনকুমারের চেয়ে সে বয়সে কিছু বড়, সে রীতিমতন দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল, তারপর আবার ব্রাহ্মদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে এক পাদ্রীর কাছে গিয়ে ইউনিটারিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে। সে মাঝে মাঝে বিদ্যোৎসাহী সমিতিতেও আসে। নবীনকুমারের সঙ্গে তার বেশ সৌহার্দ্য হয়েছে।

সেই যদুপতি গাঙ্গুলী একদিন বললো, ভাই নবীন, তুমি আজকাল ব্রাহ্মদের সভায় যাতায়াত করচো, শুনচি!

নবীনকুমার বললো, ও'দের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কোচ্চি।

যদুপতি বললো, আমার ভাই বড়ই আশাভঙ্গ হয়েচে। বড় আশা নিয়ে আমি ও'দের কাচে গেসলুম। কিন্তু দেকলুম, ও'দের কতায় আর কাজে মেলে না।

--কী রকম!

ব্রাহ্মরা বলেন, ও'রা পুতুল পুজোয় বিশ্বাস করেন না। অথচ দ্যাকো, সব ব্রাহ্মদের বাড়িতেই এখনো পাথরের নুড়ি কিংবা মাটি কিংবা কাঠের দেবতা রয়েচে। ও'রা নিজেরা হয়তো পুজো করেন না, কিন্তু তাঁরা নিজের বাড়িতেই এখনো ঐসব পুজো বন্ধ করতে পারেননি, তাহলে সারা দেশে বন্ধ হবে কী করে! এমনকি, ঐসব পুজোর খরচাও ও'রা দিচ্চেন। দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যে দোল-দুর্গোৎসব হয়, তার খরচা তো ও'র এস্টেট থেকেই জোগাতে হয়।

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

—তারপর দ্যাকো, ব্রাহ্মদের মধ্যে তো জাতিভেদ নেই। সবাই এক ঈশ্বরের পুজারী। এ'দের মধ্যে আবার ভেদাভেদ কী? কিন্তু বলো, বামুন-কায়েতরা ব্রাহ্ম হতে পারে কিন্তু কোনো শূদ্রও কি ব্রাহ্ম হবে? কেনো বামুন-ব্রাহ্মের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কোনো কায়েত-ব্রাহ্মের ছেলেমেয়ের বিবাহ হয়েছে এ পর্যন্ত? আমি কিন্তু দিকিনি।

নবীনকুমার তর্কে যেতে চায় না। সে ফস করে বললো, যাই বলো, দুর্গাপুজো কিংবা দোল বা রথযাত্রার উৎসব আমার বেশ ভালো লাগে।

—তাহলে তুমি ব্রাহ্মদের কাচে যাও কেন?

—দুটো জ্ঞানের কতা শুনতে। হরেক রকম মানুষজন দেকতে!

নবীনকুমার একদিন শুনতে পেল শহরের আর একটি বাড়িতে যুবকরা বিদ্যা-চর্চার জন্য মিলিত হয়। প্রখ্যাত দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে ঘিরে বসে এই আসর।

হিন্দু কলেজে পড়বার সময় কেশবকে কয়েকবার দেখেছে নবীনকুমার। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। গম্ভীর, স্বল্পভাষী যুবক, সহজে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এমন কি কেউ কোনো প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না সহসা। নবীন-কুমারের খুব একটা পছন্দ হয়নি কেশবকে। এত কিসের অহংকার!

কিছুদিন আগে কেশব সম্পর্কে একটা গুজব শুনে নবীনকুমার একটু খুশীই হয়েছিল মনে মনে। কেশব নাকি কলেজের পরীক্ষায় টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ভর্ৎসিত হয়েছে। এই ছেলের আবার অহংকার, হেঃ!

যদুপতিই নবীনকুমারকে বোঝালো একদিন যে, না, কেশব ছেলেটিও মোটেই সাধারণ নয়। সে ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে একটা শুদ্ধতার প্রকাশ পেয়েছে। সে পড়াশুনোও করে অগাধ। বন্ধু ও পরিচিত মণ্ডলীতে সে যখন কোনো বিষয়ে কথা বলে তখন সকলে নিঃশব্দে চিত্রার্পিত হয়ে শোনে। সম্প্রতি কেশব তার বন্ধুদের নিয়ে একটি থিয়েটার করারও ব্যাপার নিয়ে মেতেছে।

নবীনকুমার একদিন যদুপতির সঙ্গে গেল কলুটোলায় কেশবদের বাড়ির আসরে। এখানকার যুবকরা সকলেই প্রায় তার কাছাকাছি বয়েসী, এদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে তার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

তবু এখানেও কারুর সঙ্গে মনের মিল হলো না নবীনকুমারের।

কেশব বক্তৃতা দেয় ইংরেজি ভাষায়, এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে ইংরেজিতে। যে নাটকের তারা মহলা দিচ্ছে, তার নাম হ্যামলেট।

ইংরেজ গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে নবীনকুমারও ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। কিন্তু এমন নির্লজ্জ পরানুকরণ তার পছন্দ হয় না। বাঙালীরা ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাও করচে ইংরেজিতে, হায়!

নবীনকুমার সেখানেও যাওয়া বন্ধ করে দিল।

হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথকে ভরতি করা উপলক্ষে হিন্দু কলেজ ভেঙে যায়। বারবনিতার সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য শহরের গণ্যমান্য অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের এ কলেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পৃথক কলেজ স্থাপন করেছিলেন। গৌরবোজ্জ্বল, ঐতিহ্যবাহী হিন্দু কলেজের হীন দশা দেখে কর্তৃপক্ষ অচিরেই তাঁদের ভ্রম বুঝতে পারেন এবং তা শুধরে নেবার জন্য বিনা আড়ম্বরে, এক কথায়, অবাঞ্ছিত কুকুরের মতন চন্দ্রনাথকে দূর করে তাড়িয়ে দেন। নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা চলতে থাকে। ছাত্ররা ফিরে আসতেও শুরু করে এবং নব প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজটি ভেঙে যায়।

কিন্তু হিন্দু কলেজ তার আগেকার রূপ আর ফিরে পেল না। হীরা বুলবুল আর তার পুত্রের ঘটনার প্রভাব মুছে ফেলা সহজ নয়। হিন্দু কলেজের নিয়ম-কানুনের আমূল সংস্কার করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অনেকেই। এবং তারই পরিণতিতে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ চলে এলো পুরোপুরি সরকারী ব্যবস্থাপনায়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রেরাই এখানে প্রবেশের সুযোগ পেল। এর স্কুল শাখাটির নাম অবশ্য রইলো হিন্দু স্কুল। অন্যান্য স্থানে আরও কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও উদ্যোগ চলতে লাগলো।

হিন্দু কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্রই পড়াশুনো করতে লাগলো প্রেসিডেন্সি কলেজে, কিন্তু চন্দ্রনাথের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হলো না। এই রকম জীবন থেকে সে চলে গেছে অনেক দূরে। এর মধ্যে তার এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে দেখে আর সহজে চেনার উপায় নেই। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে সে মাতৃ-সান্নিধ্য ছেড়ে অনেক আগেই পথ-নিবাসী হয়েছে। রাত্রিকালে যাদের মাথার ওপর ছাদ থাকে না, যাদের দু-বেলা নিশ্চিন্ত অন্ন নেই, তাদের সব সময় একটা লড়াইয়ের মনোভাব রাখতে হয়। প্রায় অধিকাংশই এই লড়াই চালিয়ে যায় নিয়তির সঙ্গে। মাত্র দু-একজনই বাস্তব যুদ্ধে জয়ী হয়।

মায়ের কাছে চন্দ্রনাথ ছিল অতি আদরের সন্তান, ননী-মাখন খাওয়া শরীর, কখনো কোনো কষ্টভোগ করেনি। জেদের বশে পথে নেমে আসায় সে সব রকম দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে, পরিবেশ অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়েছে তার শরীর। কৈশোর ছাড়িয়ে সে এখন যৌবনে উত্তীর্ণ, হঠাৎ অনেক লম্বা হয়ে গেছে, কণ্ঠস্বর বদলেছে, মাথায় বড় বড় চুল, চিবুকে দাড়ির রেখা। তার নামও এখন আর চন্দ্রনাথ নয়, শুধু চাঁদু, বা উচ্চারণ বৈগুণ্যে চেঁদো।

প্রথম কিছুদিন সে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আহার সংগ্রহ করতো,

এখন তার থেকে সহজতর উপায় পেয়েছে। এখন তার ডেরা নিমতলা শ্মশানঘাটে।

মানুষের জীবিকার এমনই বৈচিত্র্য যে কিছু মানুষ শ্মশানে মৃতদেহগুলিকে অবলম্বন করেই চমৎকারভাবে নিজেদের বেঁচে থাকার উপাদান সংগ্রহ করে নেয়। শুধু চণ্ডাল নয়, আরও কিছু কিছু লোক থাকে যাদের ওপর নির্ভর করতেই হয় মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের। কাঠ সংগ্রহ করা, পুরুত ডেকে আনা থেকে শুরু করে আরও বহুবিধ কাজ থাকে।

চাঁদু এখন ছোটখাটো একটি দলের নেতা। এই নেতৃত্ব তাকে অর্জন করতে হয়েছে। বনের মহিষের পালের মধ্যে একটি করে নেতা-মহিষ থাকে। কোনো আগন্তুক মহিষ দেখলেই সেই নেতা-মহিষটি লড়াই করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। কখনো বা আগন্তুক মহিষটিই জেতে এবং তার পরই সে-ই পালটির নেতা হয়ে যায়। দুনিয়ার সর্বত্র এই নিয়মই চলছে।

নিমতলার শ্মশানঘাটে পরগাছাদের দলে চাঁদু সহজে স্থান পায়নি। বেশ কয়েকবার মার খেয়ে তাকে পালাতে হয়েছে সেখান থেকে। তারপর একদিন সে ঐ দলের নেতা ফকিরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ে যায় জলে. সেই জলের মধ্যে ফকিরের ঘাড়টা চাঁদু ঠুসে ধরে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ফকির সেবার মারা যায়নি বটে কিন্তু দেখা গেল যে তার ডান হাতটি ঠুঁটো হয়ে গেছে। চাঁদু তার হাতটি এত জোরে পিছমোড়া করে ধরেছিল যে মটমট করে তার হাড় ভেঙে যায়।

এ সব বৎসর খানেক আগেকার ঘটনা। এখন চাঁদুর কোমরে একটা ছুরি গোঁজা থাকে। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা. হাতে একটি ডাণ্ডা। ইচ্ছে করেই সে তার চেহারাটি ভয়ংকর করে রেখেছে। মৃতদেহ নিয়ে কোনো একটি দল এসে পৌঁছোলেই চাঁদু তার দলটি নিয়ে ঘিরে দাঁড়ায়। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ডোমও কাছে এগোয় না। কেমন ধারার দাহ হবে. চন্দন কাঠ না জারুল কাঠ, কতখানি ঘি আর কর্পূর। চার ঘণ্টার চিতা না ছ' ঘণ্টার চিতা—এইসব বিষয় আগে ঠিক করে নিতে হবে চাঁদুর সঙ্গে। মৃতের গায়ের জামা-কাপড়, খাট-পালঙ্ক এসবও প্রাপ্য চাঁদুর দলের। পোস্তার বাজারে এগুলো ভালো দামে বিক্রি হয়। অবশ্য বিক্রির জন্য এসব নিয়ে চাঁদুদের পোস্তার বাজার পর্যন্ত যেতে হয় না, সেখান থেকেই নিয়মিত ফড়েরা আসে।

তেমন শাঁসালো মড়া তো আর রোজ আসে না, মাসে দু মাসে দুটি একটি। হেঁজিপেঁজি ধরনের লোকই বেশী মরে. তারা অল্প কাঠে কোনো রকমে মুখাগ্নি করে আধপোড়া শব জলে ভাসিয়ে দেয়। সে সব ক্ষেত্রে ঐ অর্ধদগ্ধ দেহ বহন করে জলে ফেলার মজুরি আদায় করে চাঁদুর দল। যার কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়।

চাঁদুর একটা বিশেষ শখ আছে। চিতায় কিছুক্ষণ জ্বলবার পর একটা সময় শবের মাথাটা জোরে জোরে লাঠির বাড়ি মেরে ফাটাতে হয়, নইলে ও জিনিসটি সহজে পোড়ে না। এই কাজটি চণ্ডালদের বদলে চাঁদু নিজে নেয়। গাঁজার নেশায় চক্ষু লাল, কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি, হাতের প্রকাণ্ড লাঠিটা ঘুরিয়ে চাঁদু লাফিয়ে লাফিয়ে দমাস দমাস করে মারে। খুলিটা চৌচির হয়ে যখন ছিটকে বেরোয় ঘিলু, তখন তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তখন তাকে দেখায় কালভৈরবের মতন। তখন তাকে দেখলে কে বুঝবে যে একদিন এই লোকটির মাথাতেই শেক্সপীয়ার, বাইরন, কালিদাসের কবিতার লাইন গজগজ করতো।

এই তো পাথুরেঘাটার মল্লিকবাড়ির ছোটবাবুর শব এসেছিল গত মাসে, আর

পরশু এসেছিল বাগবাজারের বোসেদের অকালমৃত সেজো ছেলেটি, চাঁদুই তাদের মস্তক চূর্ণ করেছে।

যখন চিতা জ্বলে না, শ্মশান জনশূন্য, তখন চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে জলের ধারে। হাতে হাতে ফেরে গাঁজার কল্কে। তখনও তাদের একটা কাজ থাকে। যতই গল্পে মেতে থাকুক, তাদের চোখ থাকে স্রোতের দিকে।

হীরা বুলবুলের কাছ থেকে একটি গুণ পেয়েছে চাঁদু, তার গানের গলাটি খাসা। নানান উৎসবে বাবুরা গঙ্গায় প্রমোদতরণী নিয়ে বাঈজীদের গান শুনতে শুনতে যায়। রথযাত্রা, লক্ষ্মী পুজোর সময় গঙ্গাবক্ষ এই সব নৌকোতে একেবারে ছয়লাপ। শুনে শুনে কয়েকটা গান চাঁদুর মুখস্থ হয়ে গেছে। তার মধ্যে এই গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় :

> যাবি যাবি যমুনাপারে ও রঙ্গিনী
> কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী
> কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরের খুন্সী খাসা
> উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামনি।

হঠাৎ এক সময় গান থামিয়ে চাঁদু চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ দ্যাক, দ্যাক! অমনি তার দলের ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, কোতা? কোতা?

গঙ্গার স্রোতে প্রায়ই একটি দুটি মৃতদেহ ভেসে যায়। অনেক দূর দূরান্ত থেকেও এমন শব আসে। কিন্তু চাঁদুর দলের ছাড়পত্র না পেয়ে কোনো শব নিমতলা ঘাট পার হতে পারে না।

চাঁদুর নির্দেশ মতন তার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং প্রায় শুশুকের মতন ডুব সাঁতার দিয়ে ঠিক সেই মৃতদেহটিকে ধরে পারে টেনে আনে। তারপর সেটি তন্নতন্ন ভাবে পরীক্ষা করা হয়। অনেক সময় শবের আঙুলে থাকে সোনার আংটি অথবা পায়ে রুপোর চুটকি। তামা বা রুপোর তাগা-মাদুলি মৃতদেহ থেকে আত্মীয়রা খুলে নেয় না, সেগুলি সবই চাঁদুদের প্রাপ্য। পাঁচটা শবের মধ্যে অন্তত একটা থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

শবদেহ পাড়ের কাছে আসলেই শকুনি আর হাড়গিলের পাল ধেয়ে আসে। তখন চাঁদুর দল লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের তাড়া করে যায়। শকুনিগুলো উড়ে পালালেও হাড়গিলেরা সহজে যেতে চায় না, তারা রীতিমতন লড়াই করে। কিন্তু হাড়গিলেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, এটা চাঁদুর দল পছন্দ করে না। জলের জিনিস তারা আবার জলকে ফেরত দেয়।

এই শ্মশানে দুটি চণ্ডাল। একজনের নাম ঝিনিয়া, আর একজনের নাম তাড়ু। তাড়ু আবার তার বউকে নিয়ে থাকে একটি গোলপাতার ঘরে। ঝিনিয়াটা যেমন গাঁজাখোর, তেমনি মাতাল, অধিকাংশ সময়েই তার চলৎশক্তি থাকে না। ঝিনিয়া যে কোথা থেকে এখানে এসেছে তা জানে না কেউ, অদ্ভুত হিন্দী-বাংলা মেশানো তার ভাষা, বয়েসও হয়েছে যথেস্ট। চাঁদুর দল ঝিনিয়াকে নিয়ে নানারকম মস্করা করে, তার গাঁজার কল্কে কিংবা মদের ভাঁড় কেড়ে নিয়ে পালায়। তারপর ঝিনিয়া যখন নতুন নতুন স্বরচিত বীভৎস গালাগালির ঝড় বইয়ে দিতে থাকে, সেই সময় ওদের একজন কেউ পেছন দিক থেকে চুপি চুপি গিয়ে তার কোমরের কষি টেনে কাপড়টা খুলে দেয়। অমনি ঝিনিয়া শুরু করে দেয় তাণ্ডব নাচ। এই নিয়ে বেশ সময় কাটে।

তাড়ু সেই তুলনায় বেশ শান্ত ও গম্ভীর, বয়েসে চল্লিশের বেশী না, কালো কুচকুচে শরীর, মাথার চুল তেল চুকচুকে। তাকে দেখে কেউ চণ্ডাল বলে মনেই

করবে না, কিন্তু ঝিনিয়ার চেয়ে তাড়ু কাজে অনেক বেশী দক্ষ। তার বৌয়ের নাম মতিয়া. কিছুদিন আগেও সে ইংরেজ পাড়ায় মেথরানী ছিল। কোন্ মন্ত্রবলে যে সে মতিয়াকে বিয়ে করে এই শ্মশানে রাখতে পেরেছে, তা তাড়ুই জানে। মতিয়ার সংগে চাঁদুর দলের সকলের বেশ ভাব আছে।

হয়তো তাড়ু স্নানটান করে খেতে বসেছে, এমন সময় কোনো একটা বড় দল এসে উপস্থিত হলো। ঝিনিয়া অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তাড়ুকেই আসতে হবে। অভুক্ত অবস্থাতেই তাড়ু চলে আসে, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের কান্নাকাটি পর্বে সে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে, নিজের লাঠিটিতে ভর দিয়ে। তারপর মুখাগ্নি হয়ে গেলে সে সাজানো চিতার তলায় ভালো করে আগুন জেবলে দিয়ে আবার খেতে চলে যায়। খাওয়া সেরে আঁচিয়ে ভেজা মুখেই সে ফিরে এসে শবের পা মুড়ে দেয়।

মতিয়ার সংগে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে যায় ঝিনিয়ার। তাড়ুর বউ আছে, আর তার নেই, এটা মাঝে মাঝে ঝিনিয়া সহ্য করতে পারে না। এক এক রাত্রে সে তাড়ুর গোলপাতার ঘরে জোর করে ঢুকে পড়ে। তাড়ু কিছু বলে না, মতিয়াই সব ব্যবস্থার ভার নেয়। ঠেলতে ঠেলতে সে ঝিনিয়াকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে, তারপর তার বাপান্ত করতে করতে একটা পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে তাকে পেটায়।

চাঁদুরা কিছুক্ষণ মজা দেখে। এক সময় অবস্থা চরমে পৌঁছোলে তারা এগিয়ে গিয়ে বলে, আরে আর পেটাসনি, বুড়োটা তো মরে যাবে।

মতিয়া বলে, মরুক, মরুক গিধ্ধরটা!

চাঁদু ওর কাছ থেকে পোড়া কাঠটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে মতিয়া চোখ পাকিয়ে বলে. তবে তোর মু ভেঙে দিব। তোহার ঘিলু ছটকাবো!

চাঁদু হাসতে হাসতে পিঠ ফিরে বলে, মার! মার দেখিনি আমায়!

সবাই মিলে ধরাধরি করে ঝিনিয়াকে গংগায় ফেলে দেয় ঝপাং করে।

সবাই জানে, ঝিনিয়া ওতেও মরবে না। বড্ড কড়া জান তার, ঠিক আবার বেঁচে উঠবে।

এইভাবে চাঁদুর দিন বেশ কেটে যাচ্ছে।

মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ দেখা গেল প্রতিদিন বিকেলবেলা একজন ভদ্রবেশী সুশ্রী চেহারার যুবক এখানে এসে জলের ধারে বসে থাকে। এখানে ঘাট বলতে কিছু নেই. কয়েকটি গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে, জোয়ারের সময় সেগুলোও ডুবে যায়। যুবকটি এসে সেখানে বসে। অপরাহ্নে নদীর জলে সূর্যাস্তের শোভা দেখতে দেখতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটি নোট বই বার করে তাতে কী সব লেখে।

লোকটিকে দেখে খটকা লাগে চাঁদুর দলের। এ আবার কী চায়? শ্মশানে তো কেউ বিনা কারণে আসে না। পাশের আনন্দময়ীতলায় অনেকে স্নান করতে আসে। এদিকে স্নানার্থীরাও আসে না। এ লোকটা যেন তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে।

চাঁদুরা লোকটির পাশে বসে খিস্তি-খাস্তা হই-হল্লা করলেও লোকটি ভ্রূক্ষেপ করে না। সে যেন ধ্যানস্থ, আপনভাবে বিভোর। লোকটির নাকে সোনালী ফ্রেমের রিমলেস চশমা। গায়ে পাতলা ফিনফিনে জামা, কাঁধে একটি গোলাপী রঙের চাদর।

কখনো জ্বলন্ত চিতার পাশে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি. তখন তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। এ যে এক তাজ্জব ব্যাপার। কার না কার

ন্যাড়া তার ঠিক নেই, সেজন্যও এ লোকটি কাঁদে!

লোকটিকে চাঁদুর সহ্য হয় না। একে জব্দ করার জন্য সে তার সঙ্গীদের নিয়ে একটি মতলব এঁটে ফেলে।

ঘাটের গুঁড়িগুলো অনেক দিন থাকার জন্য কাদার মধ্যে গেঁথে আটকে আছে। একদিন চাঁদুর দল সেই গুঁড়িগুলো তুলে তুলে আলগা করে রাখে। তারপর সেদিন বিকেলে যুবকটি এসে একটা গুঁড়ির ওপর বসেছে, একটু পরে চাঁদু তার হাতের লাঠিখানা দিয়ে পেছন দিক থেকে সেই গুঁড়িটায় একটা চাড় দেয়। অমনি লোকটি সমেত গুঁড়িটি গড়িয়ে চলে জলের দিকে। ধ্যান ভেঙে যুবকটি দু হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে বাবা রে, মা রে, গেলুম রে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এবং সটান গিয়ে পড়ে জলের মধ্যে।

বোঝাই যায় যুবকটি সাঁতার জানে না। জলে পড়ে সে দু-একবার মাত্র বাঁচাও, বাঁচাও বলতে পারে, তারপর হাবুডুবু খায়। যথেষ্ট নাকানি-চোবানির পর যুবকটি যখন স্রোতের টানে পড়তে যাচ্ছে, সেই সময় চাঁদুর দল লম্ফ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

সুদৃশ্য বস্ত্র পরিহিত যুবকটিকে এখন দেখায় ভিজে বেড়ালের মতন চোপসানো। দম নিতে তার খানিকক্ষণ সময় লাগে।

তারপর সে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এমন কেন কল্লে, ভাই?

চন্দ্রনাথের দল হো হো করে হেসে ওঠে।

লোকটি হাতজোড় করে আবার সেই রকম একই কণ্ঠে বললো, ভাই, তোমরা কেন এমন কল্লে? আমি কী দোষ করিচি?

চাঁদুর এক স্যাঙাৎ ন্যাড়া তার কাছা টেনে খুলে দেবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তখন মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কোনো রকমে মান বাঁচাবার জন্য চোঁ-চাঁ দৌড় মারলো।

চাঁদুর দলের কাছে এটা নির্মল আনন্দের ব্যাপার। ন্যাড়া হাসতে হাসতে বললো, ও বোক্‌চৈতন আর কোনোদিন ইদিকে আসবে না।

চাঁদু বলে, আসবে, আসবে। সব ব্যাটাকেই আসতে হবে। এমন ঘাঁটি আগলে আচি যে সব ব্যাটাকেই আসতে হবে একদিন না একদিন। সব ব্যাটার মাতা ফাটাবো!

এর চেয়ে অনেক বেশী রোমহর্ষক ঘটনাও ঘটে মধ্যে মধ্যে।

এক রাতে ফিনিক দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে আর বাতাস বইছে এলোমেলো। এমন রাতে গাঁজার নেশা বড় ভালো জমে আর তার সঙ্গে চেল্লামেল্লি গান। অশত্থ গাছটার গায়ে একটা গোলপাতার মাচা বেঁধে চাঁদু তার দলবল নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু গান গাইবার উপায় কী, তার মধ্যে ঝিনিয়া এসে দারুণ হল্লা লাগিয়ে দেয়, ছেলেদের চড়-চাপাটি খেয়েও সে থামতে চায় না।

সেই সময় চারজন লোক একটা শবের খাট বয়ে নিয়ে এসে শ্মশানতলায় সেটি নামিয়ে রেখেই দৌড় লাগায়।

চাঁদু ঠিক দেখে ফেলে তার সাগরেদদের বলে, আরে, আরে, লোকগুলো কোতায় গেল দ্যাক তো!

ন্যাড়া খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে জানায়, ব্যাটারা ভেগে যাচ্ছে, ওস্তাদ!

সবাই হই হই করে তাড়া করে যায় সেই শবযাত্রীদের। কিন্তু তারা দিকবিদিক শূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ধরা যায় না। অনেকের ধারণা, এই নিমতলা শ্মশানে দুটো ভূত আছে, সেইজন্য রাত-বিরেতে ভাড়া করা শ্মশানযাত্রীরাও সহজে

এদিকে আসতে চায় না। ওরা কি ভূতের ভয়েই পালালো! অথবা ওদের কাছে ঘাট-খরচা নেই!

চাঁদু তার দলবল নিয়ে ফিরে আসে মড়ার খাটের কাছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখা যায় চাদর দিয়ে ঢাকা এক আলুলায়িতকুন্তলা, গৌরবর্ণা যুবতীর মুখ। মনে হয় যেন জীবন্ত, চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা। চাঁদুর মনে হলো সেই চোখ দুটি যেন তার দিকেই চেয়ে আছে।

চাদরখানি একটুখানি সরাতেই এক দৃশ্য দেখে চাঁদু এবং তার সঙ্গীরা শব্দ করে আঁতকে ওঠে। যুবতীটির নগ্ন বুকের ঠিক মাঝখানে একটি ছুরি বেঁধা। তখনও সেখানে থকথকে রক্ত জমে আছে।

প্রতিদিন নানারকম মৃতদেহ দেখলেও চাঁদুর সঙ্গীরা ভয় পেয়ে যায়। সবাই সরে যায় দূরে।

একজন বলে, কোনো বড় ঘরের মেয়ে, খুন করেছে!

অপর একজন বলে, রেণ্ডি, রেণ্ডি!

আর একজন বলে, বেঁচে আছে, এখুনো বেঁচে আছে!

চাঁদু কাছে গিয়ে ঝুঁকে মেয়েটির গাল ধরে এপাশ ওপাশ নাড়িয়ে দেয়। জীবনের কোনো লক্ষণ তাতে প্রকাশ পায় না।

ন্যাড়া একটানে সরিয়ে দেয় চাদরটা। এবার আরও বিস্ময়ের পালা। যুবতীটির অঙ্গে এক টুকরো বস্ত্রও নেই।

কয়েক মুহূর্ত ওরা চুপ করে থেকে পরস্পরের দিকে চায়। এমন সুন্দর নারীদেহ ওরা কখনো চক্ষে দেখেনি। চাঁদের আলোর সেই শরীর যেন আরও অপার্থিব দেখায়।

হঠাৎ ন্যাড়া একটা উৎকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই যুবতীর শরীরের ওপর। পাগলের মতন সেখানে মুখ ঘষতে থাকে।

কী করছিস, কী করছিস বলে চাঁদু তার চুলের মুঠি ধরে তাকে তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ন্যাড়া কিছুতেই উঠবে না। শেষ পর্যন্ত চাঁদু এক লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলে দেয়।

তখন আরও দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মৃতদেহের ওপর। চাঁদু তাদেরও সরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কেউ আর তার কথা শুনতে চায় না। ন্যাড়া উঠে এসে বলে, তুমি সরে যাও, ওস্তাদ!

বাকি সবাই একেবারে পথের ছেলে, কিন্তু চাঁদুর এক সময় বাড়ি ছিল। সেইজন্য এ বীভৎসতা সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। সে একাই চেষ্টা করে সবাইকে সরিয়ে দেবার, কিন্তু এই উপলক্ষে যেন তার দলে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। কেউ তাকে আর মানছে না।

অবিলম্বেই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য চাঁদু বিশেষ একজনকে টেনে নেয় এবং নিজের ছুরিটা তার গলায় চেপে ধরে বলে, একদম শেষ করে দোবো। সব কটাকে আজ খতম করবো।

ন্যাড়া সেই যুবতীটির বুক থেকে ছুরিটা টেনে খুলে নিয়ে চাঁদুকে রুখতে আসে। কিন্তু হাতে একটা ছুরি থাকলেই ন্যাড়া যদি জিততে পারতো, তা হলে তো সে-ই নেতা হতো। ন্যাড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর চাঁদু যুবতীর শরীর আড়াল করে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, আয়, কে আসবি!

বিদ্রোহ প্রশমিত হলে চাঁদু বলে, ধর, সবাই হাত লাগা, একে মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

একজন তখনও দুর্বল গলায় বলে, যদি বেঁচে থাকে এখনো!

—যদি বেঁচে থাকে, মা গঙ্গা ওকে বাঁচাবেন।

ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত ওরা যুবতীর দেহটিকে নিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে। ন্যাড়া ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। এ পর্যন্ত ন্যাড়াকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি। ভাগ্যহীনা যুবতীটি কোন্ বেঘোরে, কার হাতে মারা গেছে কে জানে! কেউ তার জন্য শোক করেছে কিনা তারও ঠিক নেই। তবু তো শ্মশানঘাটে একজন তার জন্য কাঁদলো।

সম্প্রতি এখানে আরও একটি কান্ড ঘটেছে।

বর্ষার রাত্রে চাঁদুরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। সেদিন একটাও মড়া আসেনি। এক সময় শোনা গেল তাড়ুর ঘর থেকে একটা ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ। মতিয়াও যেন ভয় পাওয়া গলায় গোঙাচ্ছে। ন্যাড়া প্রথমে সেই আওয়াজে জেগে উঠে ডেকে তুললো চাঁদুকে।

নিশ্চয়ই ও ঘরে হাড়গিলে ঢুকেছে। হাড়গিলেরা মারামারি করবার সময় ঐ রকম আওয়াজ করে।

সবাই মিলে দৌড়ে গেল তাড়ুর ঘরের দিকে।

ন্যাড়া প্রথম ঢুকেই বেরিয়ে গেল জিভ কেটে। তারপর মুখের একটা অদ্ভুত ভংগী করে বললো, আরিঃ সাবাশ! মতিয়ার একটা বাচ্চা হয়েছে!

এখনো যেন পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি, ভারতবর্ষ দেশটা ঠিক কাদের। হিন্দুরা অবশ্য মনে করে এ দেশটি পুরোপুরি হিন্দুদেরই, তাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে আর্য রক্ত, সুপ্রাচীন কাল থেকে তাঁরা এই সমুদ্র-মেখলা, পর্বত-মুকুট ভূমির উত্তরাধিকারী। তাদের ধর্ম, তাদের কৃষ্টি, তাদের জীবনযাপন প্রণালী এই দেশের মাটিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। যদিও ছশো সাড়ে ছশো বছর ধরে এ দেশ শাসনের অধিকার নেই তাদের হাতে, তবু তারা মুসলমানদের মনে করে বহিরাগত। মুসলমানদের ধর্মে প্রবল আরবী গন্ধ, তারা মক্কা-মদিনার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে, তাদের আচার ব্যবহার সবই হিন্দুদের বিপরীত। যদিও কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রেখেছিল, তবু হিন্দুরা উচ্চনাশা, আত্মাভিমানী, তারা মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেশে না। গোপনে তারা মুসলমানদের অসভ্য মনে করে।

এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। হিন্দুরা শৌর্য বীর্য হারিয়েছে বহু আগেই এবং যত তারা শক্তিহীন হয়েছে, ততই তাদের মধ্যে হাজার রকমের জাতপাতের সংস্কার বেড়েছে, হিন্দুরাই হিন্দুদের নিপীড়ন করেছে সবচেয়ে বেশী। নিপীড়িত হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্ম বরণ করেছে। পাঠান-মোগল যারা এদেশে বসতি স্থাপন করেছে, তারাও কয়েক শতাব্দী পর এ দেশকেই নিজ ভূমি মনে করে। মুসলমানরা

যদি বহিরাগত হয়, তাহলে আর্যরাও বহিরাগত। এদেশের মূল অধিবাসীরা আদিবাসী নামে অভিহিত, এবং এই আদিবাসীদের হিন্দু মুসলমান উভয়েই বর্বর হিসেবে অবজ্ঞা করে। আবার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের চোখেও হিন্দুরা আধা-আদিবাসী, তারা বহু দেব-দেবী পূজক, একত্বহীন, কিছুটা বর্বর।

কয়েক শতাব্দী ধরে এ দেশ শাসনের ভার মুসলমানদের ওপর ছিল বলে তারা মনে করে এ দেশের মালিকানা শুধু তাদেরই। হিন্দুরা সংখ্যা বৃদ্ধিকারী প্রজা মাত্র। ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে রাজশক্তি কেড়ে নিয়েছে। সেজন্য মর্যাদাসম্পন্ন সমস্ত মুসলমানই আহত বোধ করে। তারা অন্দর মহলে বসে অহংকারের সেই ক্ষত চাটে এবং ক্রোধের বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইংরেজদের প্রতি।

অন্যান্য ইওরোপীয় দস্যু ও ব্যবসায়ীদের দমন করে ইংরেজ এতদিনে প্রায় গোটা ভারতবর্ষটাই দখল করে ফেলেছে। ইংরেজ মানেও ইংলণ্ডের রাজশক্তি নয়, সামান্য একটি বণিক প্রতিষ্ঠান। এত সহজে এত বিশাল একটি দেশ জয় করা গেছে বলেই এ দেশের মানুষের প্রতি ইংরেজের এত অবজ্ঞা। বিপুল জনসংখ্যা, এমনকি বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়েও যারা দেশ রক্ষা করতে পারে না, তারা মানুষ নামের অযোগ্য। নবাবী বা বাদশাহী সেনাবাহিনীর লড়াই পদ্ধতি নিয়ে ইংরেজ ব্যারাকে এখনো প্রবল হাসাহাসি হয়। সুরার ঝোঁকে ফূর্তি-পাওয়া গোরা সিপাহী মুঘল সেনাপতির অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দেখায় এবং অন্যরা অনেকে টেবিল চাপড়ায়।

ইংরেজ মনে করে, এ দেশটা তাদের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তারা এ দেশ নিয়ে যা খুশী করতে পারে, একে কামড়ে, চিবিয়ে, শুষে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলার যাবতীয় অধিকার তাদের আছে।

সরাসরি মুসলমানদের হাত থেকে রাজ-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বলে ইংরেজ এখন মুসলমানদের এড়িয়ে চলে। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বেশী, তারা হিন্দু ধনীদের বাড়ি বেশী যাতায়াত করে, আমোদ-আহ্লাদে অংশ নেয়। আহত-অহংকার নিয়ে মুসলমানরাও গুটিয়ে আছে নিজেদের মধ্যে, ইংরেজ-প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা হুড়মুড় করে এগিয়ে এলো না হিন্দুদের মতন।

দুই দশক আগেও আদালত বা সরকারি ভাষা ছিল ফারসী, তখন হিন্দুরাও মৌলবীদের কাছ থেকে ঐ ভাষা শিখতো। শিক্ষিত হিন্দু গড় গড় করে বলতো ফারসী ও উর্দু ভাষা। এখন তার বদলে পুরোপুরি এসেছে ইংরেজী। শুধু রাজ্য হারায়নি মুসলমানরা, ভাষার অধিকার হারিয়ে আরো হীনবল হয়েছে।

তার ফলে, কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে (অবশ্য সব চাকরিরই দৌড় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত, তার ওপরে আর নয়) যে এক নতুন বৃত্তিধারী শ্রেণী তৈরি হলো, তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য।

এদেশে প্রতিবেশীদের মধ্যেই বৈরিতা বেশী। হিন্দু ও মুসলমান এ সময় দীর্ঘকালের জাত-বৈরী না ভুলে যেন পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগলো। ইংরেজেরও তাতেই সুবিধে। মুসলমানরা দূরে সরে রইলো অভিমান ও ক্ষোভ নিয়ে, আর হিন্দুরা মনে করলো, ইংরেজ তাদের পরিত্রাতা। বাঙালী হিন্দুদের চক্ষে তো বটেই। তাদের মতে ইংরেজরা তাদের রক্ষা করেছে নবাবী আমলের অত্যাচার থেকে। মুসলমানও ছিল শাসকের জাতি, ইংরেজও শাসক,

তবু এদের মধ্যে হিন্দুদের চক্ষে ইংরেজই শতগুণ শ্রেয়, কারণ ইংরেজ শাসনে তবু রুল অব ল'র আবরণ অন্তত আছে। তাছাড়া ইংরেজ ধর্মে হাত দেয় না। দু-চারজন পাদ্রী এদিক ওদিক মাতামাতি করলেও অধিকাংশ ইংরেজ এবং রাজ-শক্তি মাথা ঘামায় না ধর্ম নিয়ে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন কলকাতা তথা বঙ্গে একটা নব-জাগরণের জোয়ার এসেছে। এবং সে নব-জাগরণ শুধু হিন্দুদের মধ্যেই। হিন্দুরা কেউ ধর্মসংস্কার নিয়ে ব্যস্ত, কেউ সামাজিক রীতি ও লোকাচারে পরিবর্তন আনতে চাইছে, কেউ মেতেছে ব্যবসা বাণিজ্যে, সাহিত্য রচনা ও শিক্ষা বিস্তারের দিকেও দারুণ ঝোঁক এসেছে। অবশ্য এ সবই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমানরা, অপরের চক্ষে, যেন সম্পূর্ণ নীরব। পত্রপত্রিকায় শুধু হিন্দুদেরই কথা, মুসলমানদের অস্তিত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায় কদাচিৎ।

কলকাতা শহরের এমন একটাও ইঁটের বাড়ি নেই, যা মুসলমানদের তৈরি নয়। কারণ হিন্দুরা রাজমিস্তিরির কাজ জানে না। ভদ্র ও ধনী শ্রেণীর অঙ্গে যে-সব উত্তম উত্তম বস্ত্র, তাও সেলাই করে মুসলমান ওস্তাগরেরা। হিন্দুরা এক সময় সীবন শিল্প শিখে থাকলেও এখন তা ভুলে গেছে। কলকাতায় মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি দরিদ্র। আর কিছু অতিশয় ধনী।

জনাব আবদুল লতীফ খাঁর বাড়িটি একটি দুর্গের মতন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ও গৃহে যেন কোনো মনুষ্য বসতি নেই, দরজা-জানলা সব সময় বন্ধ থাকে। যেন বাইরের বাতাসও ওখানে ঢোকে না।

দু মহলা অট্টালিকা, লতীফ সাহেব থাকেন বাইরের দিকটিতে। এ বাড়িতে পর্দাপ্রথা অতি কঠিন, এখানকার রমণীরা অচেনা লোকচক্ষুর অগোচরে তো থাকেনই এমনকি দিনেরবেলা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গেও তাঁদের দেখা হবার নিয়ম নেই।

লতীফ সাহেবের শরীরে পাঠান রক্ত আছে, কিন্তু গত দু পুরুষ ধরে তাঁরা প্রায় বাংলা ভাষাভাষী। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হিন্দু। মুর্শিদাবাদের বেশ বড় এক-খন্ড জমিদারির তিনি মালিক, এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি চিনির ব্যবসাতেও কিছু অর্থ নিয়োগ করেছেন। চিনি প্রায় সোনার মতন, শতকরা একশো ভাগ লাভ।

খিদিরপুরে জাহাজঘাটা থেকে কিছু দূরে এই অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পিতা। সেই আমল থেকেই বড় বড় জমিদারদের কলকাতায় একটি বাড়ি থাকা আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে স্বীকৃত হতে শুরু করেছে। কলকাতায় এসে ধনগর্ব না দেখাতে পারলে আর ধনী হওয়া কিসের জন্য! তাছাড়া গ্রামদেশে সুখের দ্রব্য সংগ্রহ করাই কঠিন। কলকাতায় টাকা ফেললে সব কিছু পাওয়া যায়, এমনকি বাঘের দুগ্ধ পর্যন্ত। অবশ্য বাঘের দুগ্ধ কারুর কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু বরফের মতন এক আশ্চর্য বস্তু কলকাতা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাঁর পিতা বছরে একবার করে কলকাতায় আসতেন, লতীফ সাহেব পুরোপুরি কলকাতাতেই থাকেন। জমিদারি চালনার জন্য নিজ জমিদারির থেকে ইদানীং দূরে থাকাই প্রশস্ত। কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য দায়ী থাকে, তারা যে কোনো প্রকারেই হোক প্রজাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে। জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকলে প্রজারা অনেক সময় তাঁর পায়ে এসে কেঁদে পড়ে। সে বড় উপদ্রব!

বাড়িটি এক সময় ছিল বেশ ফাঁকা জায়গায়। এখন ধীরে ধীরে চারপাশে একটি বস্তি গড়ে উঠেছে। এত ঢাকাঢুকি দিয়ে থাকা সত্ত্বেও লতীফ সাহেব

মাঝে মাঝে সেই বস্তি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। একঘেয়ে শিশু কণ্ঠের কান্না।

লতীফ সাহেব হাঁক দিলেন, মীর্জা! মীর্জা!

লতীফ খাঁর নিজস্ব হুকুমবরদার মীর্জা খুশবখ্‌ত সব সময় দ্বারের কাছে অবস্থান করে। এর অঙ্গে পুরোদস্তুর সৈনিকের পোশাক তো বটেই, এমনকি কোমরবন্ধে একটি তলোয়ার পর্যন্ত ঝোলানো।

লম্বা সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো, হুজৌর!

লতীফ খাঁ বললেন, কে কাঁদে? কারুর কান্না শুনতে পাচ্ছি না? নাকি আমি খোয়াব দেখছি?

মীর্জা বললো, না হুজৌর, আপনি ঠিকই শুনেছেন। পাশের বস্তির বে-তমিজরা এমন গোলমাল করে!

—যা ওদের দু চার ঘা দিয়ে আয়! কান্না থামাতে বল্‌।

—মার খেলে মানুষ আরও বেশী কাঁদে। মানুষের এই এক দোষ।

—ওরা এখন কাঁদছে কেন? এখন তো ওদের কেউ মারছে কি?

—হুজৌর ওরা কাঁদছে ভুখে। ভুখার মার বড় মার। কথায় বলে, ভাত এমন চীজ, খোদার চেয়ে উনিশ বিশ।

—মীর্জা খুশবখ্‌ত, ওরা ভাত খায় না কেন? ভাত তো গরিবেরই খাদ্য!

—কেয়া জানে সরকার! এই বস্তির গরিব মুসলমানরা সারাদিন ঘোরে কাজের ধান্দায়। ওদের বাল্‌বাচ্চারা ঘরে থাকে। হররোজ তো কাম মেলে না, যেদিন ওদের বাপ্‌জানেরা খাবার পয়সা না নিয়ে ফেরে, সেদিন তারা বাল্‌বাচ্চাগুলোনকে রাগ করে পিটায় আর তারা ডুকরে ডুকরে কাঁদে।

লতীফ খাঁ কাতর গলায় বললেন, অত কথা আমায় বলিসনি। খেতে পায় না তো ওরা শহরে আসে কেন? গ্রামে থাকলেই পারে। আমি কান্না একেবারে সহ্য করতে পারি না। তুই যেমন করে হোক, ওদের থামতে বল!

মীর্জা খুশবখ্‌ত সেলাম বাজিয়ে চলে যায়। যে কোনো উপায়েই হোক কান্না একটু বাদে থামে। এবং তারপরই মীর্জা হাসি মুখে সঙ্গে নিয়ে আসে এক অতিথিকে। মীর্জা জানে যে এই মানুষটিকে দেখলে তার প্রভু খুশী হয়ে উঠবেন।

ইনি মুন্সী আমীর আলী, দিওয়ানী আদালতের উকিল। কলকাতার মুসলমান সমাজে ইনিই একমাত্র উকিল এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। মানুষটি অতিশয় বিনয়ী এবং ধুরন্ধর হলেও রসিকও বটে। কথায় কথায় শের ও বয়েৎ বলেন। লতীফ খাঁর চেয়ে মুন্সী আমীর আলীর বয়েস যথেষ্ট বেশী, বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন, তবু আদি রসের দিকে এঁর খুব ঝোঁক আছে।

মুন্সী আমীর আলীকে দেখলে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে: বুঢ়াপে মেঁ ইনসান কী কুওঅতে শাহ্‌ওয়ানী যবান মেঁ আ জায়া করতী হ্যায়। অর্থাৎ বার্ধক্যে মানুষের কামনা বাসনা সব জিভের ডগায় এসে ভর করে।

আজ কিন্তু মুন্সী সাহেবের সেই মজলিশী রঙ্গীন ভাবটি নেই। শুকনো-ভাবে সেলাম আলায়কুম বলে ঘরে ঢুকে তিনি লতীফ খাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলেন। লতীফ খাঁ তাঁকে নানারকম ভাবে খাতির করে বসতে বললেন, কিন্তু তিনি যেন তা শুনতেই পেলেন না। তাঁর মুখে ক্রোধ এবং শোক একসঙ্গে মাখানো।

লতীফ খাঁ বিহ্বল হয়ে বললেন, এমন মলিন মুখ কেন জনাব, কিছু গুস্তাকি হয়েছে কি?

মুন্সী আমীর আলী চড়া মেজাজে বললেন, আজ হিন্দুস্তানে মুসলমানের চরম দুর্দিন, আর আজ তুমি ঘরে বসে নিশ্চিন্তে আলবোলা টানছো? ছিঃ!

—আজ? কেন, আজ কী হয়েছে?

—তুমি জানো না? আজ নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ কলকাতায় আসছেন, আমাদের সব মান সম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে গেল!

লতীফ খাঁ বিস্মিতভাবে বললেন, কোন্ নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ? আওধ-এর বাদশা? তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কলকাতায় আসবেন, এই ইংরেজের রাজত্বে? সে কি কথা?

মুন্সী আমীর আলী ব্যঙ্গের সুরে একটি 'রেখতী' বললেন:

চলী ওঅহাঁ সে দামন উঠাতী হুঈ
কড়ে সে কড়ে কো বজাতী হুঈ

এবার এখান থেকে আঁচল উড়িয়ে উড়িয়ে, কাঁকন বাজিয়ে বাজিয়ে ফিরে চলো!

লতীফ খাঁ তাও কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন, জনাব তশরীফ রাখুন। কী হয়েছে, সব খুলে বলুন তো? আওধের বাদশা কলকাতায় আসবেন কেন? তিনি আমাদের শেষ ভরসা!

লতীফ খাঁর তুলনায় মুন্সী আমীর আলী অনেক বেশী খবর রাখেন। তিনি ফারসী, উর্দুতে দক্ষ, বাংলা এবং ইংরেজিও মোটামুটি বলতে কইতে পারেন।

হতাশ ভাবে একটি কেদারায় বসে পড়ে তিনি আলবোলার নলে কয়েকটি টান দিলেন। তারপর বললেন, এ বছরের গোড়ায় নবাবের কাছ থেকে লক্ষ্ণৌ কেড়ে নিয়েছে ইংরেজরা। সে খবরও তুমি রাখো না? ইবলিশের দোসর ইংরেজ বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে নবাবের সঙ্গে। লক্ষ্ণৌতে একটা কামানও গর্জায়নি। একজন সিপাহীও দেশরক্ষার জন্য রাজী হয়নি, বিনা যুদ্ধে নবাবের মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। হিন্দুস্তানে মুসলমানের শেষ গৌরব যে আওধ, তাও চলে গেল ইংরেজের হাতে। আর আমাদের রইলো কী?

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে লতীফ খাঁ হতবাক হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর মস্তক ঘূর্ণিত হচ্ছে। যেন তাঁর নিজেরই জমিদারি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এই রকম নিঃস্ব বোধ করলেন তিনি।

খানিক বাদে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা কলকাতায় আসছেন কেন এত দূরে?

আমীর আলী প্রায় ধমকের সুরে বললেন, শখসে কি আসছেন তিনি? আসছেন বন্দী হয়ে। জিঞ্জিরে হাত পা বেঁধে আনা হচ্ছে তাঁকে। হিন্দুস্তানের বাদশা দিল্লিতে কাচকড়ার পুতুল হয়ে আছেন, আর লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বন্দী থাকবেন কলকাতায়।

লতীফ খাঁ কপাল চাপড়ে বললেন, কিছুই বুঝলাম না! আপনার কাছেই তো শুনেছি যে নবাব ওয়াজিদ আলী সাহেব-এর মস্ত বড় পল্টন আর রিসালা ছিল। এমন কি তিনি একটি জেনানা ফৌজও গড়েছিলেন। সেই তুলনায় ফিরিঙ্গিদের ফৌজ আর কত বেশী? তবে কেন লড়াই হলো না? কমজোর, ডরপুক হিন্দুদের মতন মুসলমানও কি লড়াই দিতে ভুলে গেছে? আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমীর আলী আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটি বয়েৎ বললেন:

পরীন হুফতা রুখাঁ-ও-দেব দরকারিশ্‌মা-ও-ন ফ
বস্যাখ্‌ত্ অকলখ হয়রত কি ঈচে বুল অজবীস্ত.

পরীরা লুকিয়ে ফেলেছে নিজেদের রূপ, এখন রাক্ষসরা দেখাচ্ছে তাদের কান্ড-কারখানা। কী করে যে এমন হলো, তা বুদ্ধিতে কূল কিনারা পাই না!

দোস্ত, লক্ষ্ণৌয়ের সিপাহীরা যুদ্ধ ভোলেনি, কিন্তু নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ মেতে ছিলেন নাচ-গান আর কবিতা রচনায়। সবই আমাদের নসীব! লর্ড ডালহাউসী একে একে সব খাবে, হিন্দুস্তানের সবটুকু না খেলে ওর ভুখা মিটবে না।

—নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কি আজই আসবেন কলকাতায়?

—হ্যাঁ। সেইজন্যই তো এসেছি তোমার কাছে। আমাদের নবাবের হাতে পায়ে জিঞ্জির বেঁধে ধুলোর মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তা দেখে দৃষ্টি সার্থক করবে না?

লতীফ খাঁর চক্ষু সজল হয়ে এলো। তিনি হায় আল্লা বলতে বলতে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

একটু পরে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, নবাব কলকাতায় এসে থাকবেন কোথায়?

—শুনেছি, মেটিয়াবুরুজে ইংরেজ সরকার দয়া করে তাঁকে জমি আর বাড়ি দিয়েছেন।

—হায়, হায়, হায়! বাদশাহ মঞ্জিল আর ক্যয়সর বাগ ছেড়ে নবাব এসে থাকবেন কলকাতার এই জলাডাঙগায়! এখানে কোথায় সেই মহলসরা আর কোথায় সেই বাগিচা?

খানিক আলাপ আলোচনার পর নবাব-দর্শনে যাওয়াই ঠিক হলো। ভাগ্যহত, অধঃপতিত হলেও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ হিন্দুস্তানের শেষ গৌরবমণি, তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখার লোভ সংবরণ করা যায় না।

তখনই লতীফ খাঁর চৌঘুড়ী গাড়ি প্রস্তুত করা হলো। সঙ্গে চারজন দেহ-রক্ষী নিয়ে তিনি মুন্সী আমীর আলীর সঙ্গে গৃহ থেকে নির্গত হলেন।

খিদিরপুর ছেড়ে কলকাতার উপান্তে এসেই তাঁরা দেখলেন যে পথে পথে অজস্র মানুষের ভিড়। সেপাই-শান্ত্রী ও গোরা পুলিশ-ফৌজও টহল দিচ্ছে এবং মাঝে মাঝে লাঠি উঁচিয়ে অবাধ্য জনতাকে তাড়া করছে।

শোনা গেল এই পথেই একটু বাদে নবাবের কাফিলা আসবে। গাড়িতে বসে নবাব-দর্শন অনুচিত বলে লতীফ খাঁ এবং আমীর আলী গাড়ি থেকে নেমে পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। দেহরক্ষীরা তাঁদের ঘিরে রইলো।

জনতার মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই রয়েছে। সমস্ত মুসলমানদের মুখ ম্লান। আর হিন্দুদের মুখে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা কৌতুক। শহরের অন্যান্য হুজুগের মতন নবাবের আগমনও যেন আর একটি বড় হুজুগ তাদের কাছে।

নবাবের কাফিলাটা বিশাল। সামনে আসছে বাদ্যকররা। তারপর পরপর অনেক-গুলি গাড়ির ওপর বড় বড় খাঁচায় নানারকম পশুপাখি। পাখিদের মধ্যে ময়ূর, পায়রা, সারস, হাঁস, বগলা করকর, চকোর ইত্যাদি। এক খাঁচা ভর্তি কচ্ছপ। তারপর হরিণ, তারপর চিতাবাঘ। তিনটি খাঁচা ভর্তি নানা জাতের বানর, উল্লুক। তারপর পায়ে হাঁটানো জিরাফ, উট, হাতি। এর পর নবাবের স্বর্ণখচিত তাঞ্জাম বয়ে আনছে চারজন কাফ্রি বাহক। তার পেছনে সার দিয়ে ঘেরাটোপ জেনানাদের পাল্কি, তার পরে দাস-দাসীরা।

মুন্সী আমীর আলীর ধারণা ভুল। রাজ্যহীন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে কলকাতায় আনা হয়নি। তিনি এসেছেন তাঁর সমস্ত

বিলাসের উপকরণ সঙ্গে নিয়ে। রাজ্য কেড়ে নেবার পর ইংরেজরা তাঁকে লক্ষ্ণৌতে থাকারও অনুমতি দিয়েছিল, সেখানে নবাব আগেকার মতন যত খুশী রঙ তামাশায় মেতে থাকুন, তাতে ইংরেজের আপত্তি নেই, শুধু রাজ্য নিয়ে মাথা না ঘামালেই হলো। কিন্তু নবাব নিজের মাথার মুকুটটি ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে এখন কলকাতায় আসছেন মামলা করতে। ইংরেজ নাকি আইনের নিয়ম মানে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টেও সুবিধে না হলে নবাব খোদ লন্ডনে গিয়ে প্রিভি কৌন্সিলে মামলা লড়বেন। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াকে প্রশ্ন করবেন, কোম্পানির ফৌজ তাঁর রাজ্য দখল করলো কোন্ আইনে?

পাতলা মশলিনের পর্দায় ঘেরা নবাবের তাঞ্জাম। রাস্তার দু'পাশের মশালের আলোয় তাঞ্জামের মধ্যে নবাবের মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যায়। তিনি সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বসে আছেন, দেখলে মনে হয় নেশাগ্রস্ত। শহরের জনতা সেই রকমই মনে করলো। কারণ তারা সন্ধের পর বড় মানুষদের নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই দেখতে অভ্যস্ত। আর ইনি তো নামকরা বিলাসী নবাব। কিন্তু নবাব ওয়াজিদ. আলী শাহ সুরা. আফিম, ভাং প্রভৃতি কোনো নেশার দ্রব্যই স্পর্শ করেন না। তাঁর প্রধান নেশা তিনটি, সুর, ছন্দ ও রমণী। এই তিন নেশাতেই তিনি আকণ্ঠ মজ্জিত।

পথশ্রমে ক্লান্ত হলেও নবাব ঘুমিয়ে পড়েননি। এই নতুন নগর দেখার আগ্রহও তাঁর নেই। তিনি গুণগুণ করে আওড়াচ্ছেন একটি গানের কলি। এই নগরে প্রবেশ করার মুখেই কলিটি তাঁর মাথায় এসেছে। রাজ্যপাটের কথা, দুর্দশার কথা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে তিনি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কলিটিতে সুর বসাচ্ছেন। নবাবের তাঞ্জাম দেখে নানাপ্রকার চিৎকার করছে জনতা, সেদিকে গ্রাহ্য নেই ওয়াজিদ আলী শাহের। তিনি গুণ গুণ করছেন, বাবুল মেরা নৈহার ছুটোহি যায়...।

নবাবের তাঞ্জাম দেখে লতীফ খাঁর চক্ষু আবার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তাঁর মতন উচ্চবংশীয় লোকের এমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করা শোভা পায় না। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না। জনাব আমীর আলী ঠিকই বলেছেন, আজ মুসলমানের চরম দুর্দিন।

নবাবের তাঞ্জাম যখন কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তিনি ভগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, খুদা নবাব সাহেবকো সালামত আর বেগম সাহেবাকি কায়েম রাখ্যে! তারপর তিনি ছুটে যেতে চাইলেন নবাবের তাঞ্জামটি একবার স্পর্শ করবার জন্য।

মুন্সী আমীর আলী এতটা আবেগপ্রবণ নন। তিনি চেপে ধরলেন লতীফ খাঁর হাত। তারপর টেনে নিয়ে এলেন ভিড়ের বাইরে।

লতীফ খাঁ ভেঙে পড়েছেন, এখন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। গোরা পুলিশরা মানীর মান বোঝে না। লতীফ খাঁ ঐভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন, আর একটু হলেই মস্তকে লাঠির বাড়ি খেতেন।

দুজনে এসে আবার বসলেন চৌধুড়ী গাড়িতে। কিছুদূরে এক স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আর পুলিশের হাতের লগুড় ধপাধপ পড়ছে লোকের মাথায়। এরকম স্থানে আর একটুও থাকা উচিত নয়।

তিনি দেহরক্ষীদের উদ্দেশ্যে বললেন, জোরসে হাঁকাতে বলো! ঘর চলো!

গাড়ির মধ্যে বসে লতীফ খাঁ সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুন্সী আমীর আলী মুখে কিছু না বলে শুধু চাপড় মারছেন তাঁর এক হাতে। তাঁর মনও ভারাক্রান্ত। আওধ-এর নবাব এসেছেন কলকাতায় অথচ তাঁর সম্মানে একটা তোপও দাগা হলো না!

একটু পরে তিনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, লতীফ, মুখ উঠাও! কান্না থামাও,

হিন্দুস্তানের মুসলমান এ অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। লাখ লাখ সিপাহী এখনো আছে এ দেশে. তারা লড়াই ছাড়া আর কিছু জানে না। তারা ইংরেজদের এ দুশ্মনীর বদলা নেবেই। আমি বলে রাখছি, শিগগিরই একটা গদর হবে. তখন আমাদের সকলকেই সামিল হতে হবে, মনে রেখো।

ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেব সরকার সমীপে পাঠালেন এক পাল্টা আবেদনপত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও কম। আর বিধবা-বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করে রাজা রাধাকান্ত দেবের আবেদনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা তেত্রিশ হাজার! শোভাবাজারের রাজা বাহাদুর নিজের বেতনভুক কর্মচারীদের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাঠিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এনেছেন।

এর পর এই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে বোম্বাই. পুণা, ত্রিপুরা. ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরও বহু স্বাক্ষরসম্বলিত আবেদনপত্র জমা পড়তে লাগলো। গণনা করলে দেখা যাবে যে, বিধবা বিবাহের সমর্থকদের চেয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ-কারীর সংখ্যা বহুগুণ বেশী। বিপক্ষীয়রা যে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি খন্ডন করতে পেরেছে তা নয়. তাদের মূল বক্তব্য এই যে. বিধবা বিবাহ হবে কি হবে না. সেটা হিন্দুসমাজের ব্যাপার. এ ব্যাপারে বৈদেশিক রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।

রাজশক্তি অবশ্য এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত রইলো না। তিন তিনবার বিবেচনার পর হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। হিন্দু বিধবার বিবাহে কোনো নিষেধ রইলো না তো বটেই. দ্বিতীয়বার বিবাহিত নারীর সন্তান তার পিতার সম্পত্তির বৈধ অধিকারী হবে।

বিধবা বিবাহের পক্ষে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা কম হলেও সরকার মনে করলেন যে এই ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজে শুধু সাহসী লোকেরাই এগিয়ে আসে এবং সব দেশেই তাদের সংখ্যা কম হয়।

আইনটি পাশ হবার পর কয়েকদিন খুব উল্লাসের মাতামাতি হলো বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই বোঝা গেল, এটি একটি পর্বতের মূষিক প্রসব! এবার বিপক্ষীয়দের উল্লাসের পালা।

অনেকেই ভেবেছিল যে, আইনটি পাশ হওয়া মাত্রই দেশে বিধবা বিবাহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। অল্পবয়সী বিধবা বালিকার সংখ্যা অজস্র, তাদের দুঃখে অনেকেই সংবাদপত্রে কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু আইন পাশ হবার পর কয়েক মাসের মধ্যেও একজনও কেউ বিধবা বিবাহ করার জন্য এগিয়ে এলো না।

জগমোহন সরকারের বৈঠকখানায় এই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হতে লাগলো খুব। ভুটুর ভুটুর শব্দে আলবোলা টানতে টানতে পরিতৃপ্তভাবে তিনি তাঁর প্রধান মোসাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে ফটিকচাঁদ, তোমাদের বিদ্যেসাগর কী কল্লে গো? এ যে শুদুমুদু মল খসিয়ে লোক হাসালে?

ফটিকচাঁদ বললো, আজ্ঞে হুজুর. কবি ধীরাজ কী গান বেঁধেচে, শুনবেন?

—কই শুনি শুনি, গাও তো!

ফটিকচাঁদ গান ধরলো :

বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েচে
পরাশরের ইয়ে মেরে দিয়েচে!

উপস্থিত পঞ্চজন বিরাট হাসির হুল্লোড় তুলে দিল!

জগমোহন বললো, আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বিদ্যেসাগরের সাগরেদরা এত করে তোল্লা দিয়ে, শেষমেষ সব ন্যাজ তুলে পালালো! কেউ একটা বিধবা বে করলে তবু আমরা খানিকটে তামাশা দেকতুম!

আর একজন বললো, হুজুর, সেই যে কতায় আচে না, "বড় বড় বানরের বড় পেট. লঙ্কায় যাইতে করে মাথা হেঁট", এ হলো গে সেই ব্যাপার!

—তা বিদ্যেসাগর নিজেই একখানা বিধবাকে বে করে তো দেকাতে পারে সব্বাইকে!

—তিনি তো বুদ্ধি করে আগেভাগেই নিজের বেটি সেরে রেকেচেন। ওঁর সাগরেদরাও সবাই নিজেরা ঠিকঠাক জাত-কুল মিলিয়ে বিবাহ-টিবাহ সেরে এখুন বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে! বুইলেন না, নিজের বেলা আঁটি শাটি, পরের বেলা দাঁত কপাটি!

—তা থাকলোই বা বিদ্যেসাগরের আগে একটি বিয়ে। আর একটিতে দোষ কী? বেধবা মানেই তো দুনম্বুরী! সেকেন্ডহ্যান্ড মেয়েছেলে যাকে বলে!

—হে—হে—হে—হে! এ কতাটি বড় ভালো বলেচেন, হুজুর! সেকেন্ডহ্যান্ড মেয়েছেলে! দোকানে গিয়ে সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস কেনার মত লোকে সেকেন্ড-হ্যান্ড বিয়ে করবে!

—ভাড়া করা মাগ্ আর রাকতে হবে না কারুকে। সরকার অতি উত্তম ব্যবস্থা করেচেন। বাড়িতে যার যার বউ রইলো, আর বাইরে বেধবা রাঁড়ের সঙ্গে একটু ফুসমন্তর পড়ে নিলেই সস্তায় কেল্লা ফতে! নেড়ানেড়িদের কণ্ঠি বদলের মতন!

—হুজুর, আর এক কেচ্ছা শুনেচেন? বিদ্যেসাগরের এক চ্যালা কী কান্ড করেচে!

—কী, কী, শুনি?

—সে বেটার নাম শ্রীশচন্দ্র। এখন সকলে বলচে ছিছিচন্দ্র!

—আরে বাপু, সবটা খুলে বলো না! কে শ্রীশচন্দ্র!

—সে যে-সে লোক নয় কো! শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মুর্শিদাবাদের জজকোর্টের পন্ডিত! মুকে তার কত বারফট্টাই! আইন পাশ হবার আগে থেকেই সে চিগরেচে. বিধবা বে কর্বো, বিধবা বে কর্বো! ‍যানো বেটা এক মস্ত বড় রিফর্মার!

—তারও আগে একটা ঠিকঠাক বউ রয়েচে বুঝি?

—তা জানি না, শুনিচি তো ব্যাচিলার! কেমনধারা ব্যাচিলার তা মা ভগাই জানেন!

—এখুন সেও পিচিয়ে গ্যাচে, এই তো? এতে আর কেচ্ছা কী আচে?

—আরও আচে, হুজুর! শুদু বে কর্বো বলে চ্যাচায়নি। আগে থেকেই সে শান্তিপুর থেকে এক বেধবা মাগীকে ভাগিয়ে এনেচে!

—অ্যাঁ? ভাগিয়ে এনেচে? ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে? কোতায় এনেচে?

—এই কলকেতাতেই কোতাও রেকেচে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাতে রেকেচে, তা জানি না।

—আ মোলো যা! তোদের নিয়ে আর পারি নে! তোদের এত খাওয়াই দাওয়াই,

ফুর্তির খর্চা দি, আর তোরা একটু ভালো করে খপরও আনতে পারিসনি! লোক লাগা, লোক লাগা, ভালো করে খপর নে, সে মাগী কোতায় আচে! খোলা-খুলি রাঁঢ় রাকবার মুরোদ নেই, বে করার নাম করে ভদ্রবংশের বাড়ি থেকে মেয়ে ভাগিয়ে আনা! সমাজ কি একেবারে রসাতলে গেল? আমরা বেঁচে নেই! এর একটা বিহিত কত্তেই হবে। বিদ্যেসাগর সব বাড়ি থেকে কচি কচি বেধবাদের টেনে রাস্তায় বার করে বাজারের মাগী করচে! মামলা দায়ের করবো। মেয়েটা কোতায় আচে খুঁজে বার কর আগে। আর সেই শ্রীশচন্দ্র কোতায় গেল?

—সেই ছিছিচন্দ্র এখন কোতায় ঘাপটি মেরে লুকিয়েচে। কেউ তার পাত্তাই পাচ্চে না!

—তাকেও খুঁজে বার কর। জেলের ঘানি ঘোরাবো তো বেটাকে দিয়ে! ভদ্র-পরিবারের মেয়েদের নিয়ে এই কাণ্ড!

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জগমোহন সরকার বলতে লাগলেন, কালই আমি এ বৃত্তান্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের কানে তুলবো, এর একটা বিহিত করতেই হবে। মামলায় ফাঁসাবো ওদের সক্কলকে!

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রোগে পড়লেন।

মানুষের কর্ম-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। একদিকে তিনি বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, অন্যদিকে রাত্রি জেগে রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে সমাজ সংস্কারের পক্ষে যুক্তির তীক্ষ্ণ শর প্রস্তুত করছেন। বিধবা বিবাহের সমর্থন আদায়ের জন্য ঘুরেছেন লোকের বাড়ি বাড়ি।

তিনি পাঁচশত টাকা বেতন পান, পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার থেকেও যথেষ্ট উপার্জন করেন, তাঁকে একজন ধনী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করছেন অকাতরে। এত ঘোরাঘুরির সময় সব জায়গায় পালকি ভাড়া করারও সামর্থ্য থাকে না, পা দুখানিই সম্বল। হাঁটিতে তাঁর ক্লান্তি নেই।

এবার আর পারলেন না। অসুখের কারণ তাঁর শরীর নয়, মন। এতদিন পর এই অনমনীয় গোঁয়ার পুরুষটিও ভেঙে পড়লেন।

শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ির পাড়ে তাঁর প্রশস্তিতে একটা গান ছেপে ছিল : সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

সেই গান-ছাপা শাড়ি এক সময় লোকে কিনেছে বেশী দাম দিয়ে। খোল কর্তাল বাজিয়ে অনেকে তাঁর বাড়ি বয়ে এসে সেই গান শুনিয়ে গেছে। এখন আবার একটি প্যারডি হয়েছে সেই গানের।

তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বিদ্যাসাগর রোগ-শয্যায় শায়িত। তাঁর শয্যাজ্বলুনি হয়েছে, ছটফট করছেন সারা পালঙ্ক জুড়ে, কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। শত দুঃখে কষ্টেও যে মানুষ কখনো টুঁ শব্দটি করেননি, এখন তাঁর বুকের একেবারে ভেতর থেকে একটা মোচড়ানো কাতর আওয়াজ ভেসে আসছে, আঃ! আঃ!

রাজকৃষ্ণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নীরব হয়ে বসে থাকেন শিয়রের কাছে। ডাক্তার বৈদ্য দেখানো হয়েছে, সব ওষুধই বুঝি ব্যর্থ।

বাইরে থেকে একটা গানের আওয়াজ আসছে, রাজকৃষ্ণ সচকিত হয়ে জানালা বন্ধ করতে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, থাক, থাক, বন্ধ করো না! ওরা গাইছে গাক। ওদের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে!

বাইরে একদল ইয়ার গোছের লোক নেচেকুঁদে গাইছে সেই প্যারডি গান :

শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে!

শুয়ে থাক বিদ্যেসাগর চিররোগী হয়ে!

ঈশ্বরচন্দ্র সেই গান শুনতে শুনতে বললেন, ওরে আমি চিররোগী হয়ে শুয়ে থাকতে চাই না। এখন মরলেই আমার জ্বালা জুড়োয়। আমি শীঘ্র শীঘ্র মরে ওদের খুশী করবো!

রাজকৃষ্ণ জানালা বন্ধ করে নিজে সেটা চেপে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ব্যবহারে। তিনি তাঁকে একজন তেজী আদর্শবাদী যুবক হিসেবে জানতেন। মুর্শিদাবাদে জজ কোর্টে তার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও ঈশ্বরচন্দ্র সুপারিশ করেছিলেন। সেই লোক এমন ব্যবহার করলো?

ইয়ং বেঙ্গল দল ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, তাঁরা সব সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাশে থাকবেন। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ বলেছিলেন, আইন পাশ হলেই তাঁরা দেশ জুড়ে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। দেশ জুড়ে দূরে থাক, একটি বিবাহও হলো না। ইয়ং বেঙ্গলের দলই বলেছিল, প্রথম বিবাহ করবে শ্রীশচন্দ্র।

শান্তিপুরের একটি মেয়েকে পছন্দও করে রেখেছিল শ্রীশচন্দ্র। মেয়েটির নাম কালীমতী, বয়েস এগারো বৎসর। মেয়েটির বাড়ির কেউই বিধবা বিবাহে সম্মত নয়, তবু ইয়ং বেঙ্গলের দল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোক্রমে কন্যার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবীকে রাজি করালেন। মাতা সমেত কন্যাকে নিয়েও আসা হলো কলকাতায়।

বিবাহের তারিখ ঠিক। এই সময় বেঁকে বসলো শ্রীশচন্দ্র।

শ্রীশচন্দ্রের জননী নাকি বুকের সামনে একটি ছুরি ধরে বসে আছেন, তাঁর পুত্র বিধবা বিবাহ করলেই তিনি আত্মঘাতিনী হবেন। তাতেই মাতৃবাধ্য, সুপুত্র সেজে গেল শ্রীশচন্দ্র।

প্রথমে এ খবর শুনে রাগে জ্বলে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কোন্ মা কবে পুত্রকে ইহ সংসারে রেখে আত্মঘাতী হয়? এ সমস্তই তো ভয়-দেখানো কথার কথা! উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে যদি কোনো কাজকে ন্যায় বলে জানে, এবং তার মা যদি বিপরীত কথা বলে, তা হলে সেই ছেলে তার মায়ের ভুল বোঝাতে পারবে না? তা হলে কিসের সুপুত্র সে? কিসের জন্য তবে বিদ্যাশিক্ষা? শিক্ষিত হয়েও যে পিতা-মাতার কুসংস্কার মেনে নেয়, সে আসলে মূর্খ!

কিন্তু শ্রীশচন্দ্র যখন সমস্ত রকম কথার খেলাপ করে একেবারে গা-ঢাকা দিল, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। রোগশয্যায় শুয়ে এখন আর তিনি বিধবা বিবাহের নাম-উচ্চারণও সহ্য করতে পারেন না। চুলোয় যাক বিধবারা! যার যা খুশী করুক। তাঁর আর কোনো দায় নেই। তিনি আর বাইরে বেরুবেন না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

এই সুযোগে রাজা রাধাকান্ত দেব বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আর একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সরকারের কাছে। তাঁর বক্তব্য হলো, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলেও সে আইন রদ করে দেওয়া হোক। সরকারের আইন যদি কার্যে পরিণত না হয়, তা হলে সরকার হাস্যাস্পদ হবেন। এ দেশে বড় জোর দুটি একটি বিধবা মেয়ে যদি বা পুনর্বিবাহের জন্য এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু তাদের বিবাহ করবার জন্য একটিও পুরুষ এগিয়ে আসবে না। এতদিনে তাই তো দেখা গেল। সুতরাং, এমন আইন রাখার মানে কী হয়!

কালীমতীর মা লক্ষ্মীমণিকেও একদল লোক বশ করে ফেললো। তারা বোঝালো যে. বিবাহের নামে যে মেয়ে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে কোনোদিন আর ঘরে ফিরতে পারবে? সমাজে আর তার স্থান হবে না, সে কলঙ্কিনী হিসেবে গণ্য হবে।

তাদেরই প্ররোচনায় ও সাহায্যে লক্ষ্মীমণি এক মামলা দায়ের করলো আদালতে। শ্রীশচন্দ্র মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কালীমতীকে শান্তিপুর থেকে কলকাতায় এনে কলঙ্কের ভাগী করেছে, এখন সে হয় কালীমতীকে বিবাহ করুক, অথবা চল্লিশ হাজার টাকা খোরপোষ দিক।

দেশের বহু সংবাদপত্র এই সময় তার ব্যঙ্গবিদ্রূপে মেতে উঠলো। সাহেবরা লিখলো, এই তো দেখা যাচ্ছে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজ সংস্কারের দৌড়। কেউ লিখলো, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না যে শ্রীশচন্দ্র, সে আবার জজ কোর্টের পণ্ডিত? এর কাছ থেকে কে সুবিচারের আশা করবে? এর চাকরি যাওয়া উচিত এবং কালীমতীর কাছে কান মুলে ক্ষমা চেয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দণ্ড দেওয়া উচিত!

রোগশয্যায় শুয়ে যথাসময়ে এই মামলার কথাও ঈশ্বরচন্দ্রের কানে এলো। তিনি বললেন. বেশ হয়েছে!

রাজকৃষ্ণের সঙ্গে দু-চারজন বন্ধু সেদিন এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। ঈশ্বরচন্দ্র দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

রাজকৃষ্ণ বললেন. তুমি অ্যাত ভেঙে পড়চো কেন, ঈশ্বর। এক জায়গায় ব্যর্থ হয়েচি, আমরা অন্য বিধবা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ছাই করবে! আর আমার কাছে ওসব কথা বলতে এসো না।

উপস্থিতদের মধ্যে একজন একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি বললেন, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করচি। সার্থক হবো নিশ্চয়!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন. সে আপনাদের যা খুশী করুন গে! আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। অনেক পণ্ডশ্রম করেছি। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

সম্পাদকটি বললেন, এ কথা বললে চলবে কী করে! আপনি আমাদের সেনাপতি!

ঈশ্বরচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনাদের এই সেনাপতি অসুস্থ, মুমূর্ষু, একে দিয়ে আর আপনাদের কাজ হবে না। আপনারা অন্য সেনাপতি ধরুন।

—না, না. আপনি এমন কিছু অসুস্থ নন। আপনার কী-ই বা বয়েস?

—দেখছেন না, চলৎশক্তি পর্যন্ত নেই! কানা খোঁড়া সেনাপতি দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? বয়েস ছত্রিশ হলো, এমন কিছু কম কী?

—সেনাপতি অসুস্থ হলেও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। সব সময় কি আর সেনাপতিকে সমরক্ষেত্রে যেতে হয়! তাঁবুতে বসেই নির্দেশ দেন। এই দেখুন না, মুলতানের যুদ্ধের সময় জেনারেল হুইকের দারুণ জ্বর বিকার হয়েছিল, তবু শুধু শিবিরে শুয়ে শুয়েই কেমনভাবে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ জয় করলেন। আপনি শুয়ে থাকুন, শুধু কলকাতা ছেড়ে যাবেন না, তাতেই আমাদের জয় হবে।

—শুধু কলকাতা কেন, আমার এখন ইহলোক ছাড়বার সময় হয়েছে!

এর দু'দিন পর একদিন দ্বিপ্রহরে ঈশ্বরচন্দ্র নিদ্রিত রয়েছেন, ঘরে আর কেউ নেই, এমন সময় একজন ব্যক্তি চুপি চুপি সে ঘরে প্রবেশ করে ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরলো।

চোখ মেলে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কে রে?

লোকটি বললো, আজ্ঞে আমি শ্রীশচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যুবক শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পা সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, আমার মরতে যেটুকু বাকি আছে, তুই বুঝি সেটুকুও শেষ করে দিতে এসেছিস?

—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—আমি তোকে ক্ষমা করবার কে! যা করবার করবে আদালত।

—আজ্ঞে, আদালতে সব মিটে গেছে। কিন্তু আপনার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশী অপরাধী। আপনি ক্ষমা না করলে আমি সারা জীবনে শান্তি পাবো না।

—দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!

—বিয়ের সব ঠিকঠাক। আপনি প্রসন্ন না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে!

ঈশ্বরচন্দ্র এবার শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ও, বিয়ের সব ঠিকঠাক! হঠাৎ রাজি হবার কারণটা কী? চাকরি যাবার ভয়, না চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা দেবার ভয়?

শ্রীশচন্দ্র আবার ঈশ্বরচন্দ্রের পা চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, আপনি যদি আমায় অবিশ্বাস করেন, তা হলে আমি বিবাগী হয়ে চলে যাবো। আপনি এতকাল আমায় দেখেছেন, সত্যভঙ্গ করা কি আমার স্বভাব? আমার মা অবুঝ হয়েছিলেন, সন্তান হয়ে মায়ের ওপর জোর করা যায় না, তাই দিবারাত্র তাঁর পাশে বসে থেকে বুঝিয়েছি, সেইজন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। মা আজ সকালে সম্মতি দিয়েছেন, তারপরই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

—শুধু আমার কাছে এলে কী হবে? আগে পাত্রীর মায়ের কাছে ক্ষমা চা গে যা!

—আজ্ঞে সেখানেও গেসলুম। তাঁরা সব বুঝেছেন। লক্ষ্মীমণি দেবীকে আমি বারবার বলে পাঠিয়েছি যে, এ বিবাহ হবেই, শুধু কিছু বিলম্ব হচ্ছে এই যা। কিছু কু-লোকের মন্ত্রণায় তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন। আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণপত্রের মুসাবিদা পর্যন্ত সঙ্গে করে এনেছি।

শ্রীশচন্দ্র ফতুয়ার পকেট থেকে একটি কাগজ বার করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, বালিশটা আমার মাথার কাছে তুলে দে!

খানিকটা উঠে তিনি বালিশে মাথা হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর চিঠিখানি মেলে ধরলেন চোখের সামনে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, শকাব্দ ১৭৭৮।

চিঠিখানি দুবার পড়লেন ঈশ্বরচন্দ্র। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "কন্যার শুভবিবাহ" শুধু লিখেছে কেন? লিখতে বল্ 'বিধবা কন্যার শুভবিবাহ'। আমি কোনো লুকোচাপা পছন্দ করি না। যারা আসবে, তারা যেন বিধবা বিবাহের কথা জেনেই আসে।

—আজ্ঞে তাই হবে।

—এ বাড়িতেই বিবাহ হবার কথা লিখেছিস, সে বিষয়ে আগে রাজকৃষ্ণের মত লওয়া প্রয়োজন নয়? রাজকৃষ্ণকে ডাক্।

—আজ্ঞে রাজকৃষ্ণবাবুকেও আগেই বলা হয়েছে। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়েছেন।

অর্থাৎ সকল কাজ পাকা করে তারপরই শ্রীশচন্দ্র এসেছে বিদ্যাসাগরের কাছে।

পক্ষকালের মধ্যেই সঙ্ঘটিত হলো কলকাতায় প্রথম হিন্দু সমাজে, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, কিন্তু তবু তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তদারকির জন্য। যেন কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়।

প্রায় দু' হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদ্যাসাগর নিজে গেছেন কয়েকটি বাড়িতে। এ যেন তাঁরই কন্যাদায়। সুকিয়া স্ট্রিটে তিনি যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িতেই বিবাহ হবে, সুতরাং তিনি কন্যা-কর্তা তো বটেই।

নিমন্ত্রণ করতে গিয়েও এক জায়গায় দারুণ আঘাত পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। যেখান থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছিলেন, আঘাত এলো সেখান থেকেই। তিনি গিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের গৃহে, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করবার জন্য। সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিগণ যত বেশী উপস্থিত থাকবেন, তত বেশী এরূপ বিবাহ সম্পর্কে লোকের বিরূপতা দূর হবে।

রমাপ্রসাদ রায় একটু যেন আমতা আমতা করতে লাগলেন। বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের আবেদনে তিনি স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন, মুখে সমর্থনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকার কথায় তিনি বললেন, আমাকে আর এর মধ্যে টানা কেন? আমি না হয় না-ই গেলাম।

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্রের। তাঁর চোখ গেল দেয়ালের দিকে। সেখানে রামমোহনের একটি আবক্ষ ছবি ঝুলছে।

সতীদাহ নিবারণের জন্য যে পুরুষসিংহ সমাজের বিরুদ্ধে এত লড়েছেন, আজ বিধবা বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পুত্রের মুখে এ রকম কথা! উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তবে আর ঐ ছবিটা ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন? টান মেরে মাটিতে ফেলে দিন! আপনি না গেলেও এ অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হবে না!

কালীমতীকে আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বর আসবে রামগোপাল ঘোষের বাড়ি থেকে।

বিবাহের লগ্ন রাত্রি দ্বিপ্রহরে। কিন্তু যদি কোনো গোলযোগ হয়, সেইজন্য সন্ধ্যাকালেই আনা হবে বরকে। রামগোপাল ঘোষের গৃহ থেকে বিবাহের মণ্ডপ পর্যন্ত পথের দু'পাশে দু'হাত অন্তর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশ। পথ একেবারে লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে কত লোক হুজুকখোর, কত লোক স্বপক্ষের আর কত যে বিপক্ষীয় তা বোঝা দুষ্কর।

রামগোপাল ঘোষের সুসজ্জিত জুড়ি গাড়ির মধ্যে বসে আছে বরবেশে শ্রীশচন্দ্র, তার সঙ্গে রয়েছেন রামগোপাল ঘোষ নিজে, তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র।

এক সময় মনুষ্যের ভিড়ে অশ্ববাহিত গাড়ি আর অগ্রসর হতে পারে না। কারা যেন তুমুলভাবে চিৎকার করছে। তা স্বপক্ষের জয়ধ্বনি না বিপক্ষের বিদ্রূপ, তা বোঝা গেল না। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা পটকা ফাটলো। শ্রীশচন্দ্র রামগোপালের হাত চেপে ধরলো।

শোনা গিয়েছিল যে, বিপক্ষীয় লোকেরা লাঠিয়াল এনে বরের শোভাযাত্রার

জন্য হামলা করবে। সেইজন্যই এত পুলিশের ব্যবস্থা।

রামগোপাল শ্রীশচন্দ্রকে বললেন, ভয় নেই।

তারপর বন্ধুদের নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন পথে। তাঁরা জুড়ি গাড়ির দু'পাশে হাঁটতে লাগলেন। কেউ অবশ্য গোলযোগ অথবা বাধা দিতে এলো না। পৌঁছে গেলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানেই বিবাহ হলো। দুপক্ষের দুজন বিশিষ্ট পুরোহিত উপস্থিত। এ ছাড়া এসেছেন বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা। ইয়ং বেঙ্গলের দল রয়েছেন, রাজা দিগম্বর মিত্র থেকে শুরু করে বাবু নবীনকুমার সিংহ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ধনীরাও প্রথম থেকে সর্বক্ষণ বসে আছেন। রমাপ্রসাদ রায়ও শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে না এসে পারেননি। এবং এসেছেন অনেক মহিলা।

সমস্ত মন্ত্র পাঠ, কন্যা সম্প্রদান, নানাবিধ অলঙ্কার ও দান সামগ্রী, উলুধ্বনি, দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটাকে প্রণাম, স্ত্রী-আচার, নাক-মলা, কান-মলা, কড়ি দে কিনলেম দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যাঁ করো তো বাপু ইত্যাদি কিছুই বাদ রইলো না। তারপর ভুরিভোজ।

পরম আনন্দে এবং বিনা বাধায় অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলো। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, উৎকণ্ঠার শেষে অবসন্ন কিন্তু পরিতৃপ্ত মুখে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিদায় নেবার জন্য তাঁর কাছে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো নবীনকুমার।

তারপর সে বললো, আপনাকে একটি কথা নিবেদন করবো?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, কী কথা বলো তো, বাপু?

নবীনকুমার বললো, এখন থেকে আমি আপনার সকল কার্যে সহায়ক হতে চাই। আমি জানি, এ বিবাহের জন্য আপনার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েচে! এর পর থেকে প্রত্যেক বিধবার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা দিতে চাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্মিতভাবে এই সদ্য যুবাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কালপ্রবাহে কমলাসুন্দরীর জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু রূপের বিশেষ হেরফের হয়নি। তার বর্ণ কালো, কিন্তু সেই বর্ণই তার বৈশিষ্ট্য। এ দেশে সৌন্দর্যের প্রথম লক্ষণই হলো গাত্রবর্ণ কতখানি গৌর, তবু সকলে এক কথায় স্বীকার করে যে কমলাসুন্দরীর মতন রূপসী ক্বচিৎ দেখা যায়। তার চিক্কণ কালো মুখখানি যেন পাথরে খোদা, এবং এমনই মসৃণ যে মনে হয় মাছি বসলে পিছলে যাবে।

কৈশোরোদ্গমের পর রামকমল সিংহের নজরে পড়ায় তার ভাগ্য ফেরে। সামান্য অবস্থা থেকে তুলে এনে রামকমল সিংহ তাকে বারবণিতা সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রামকমল সিংহ তাকে এত বড় বাড়ি দিয়েছেন, দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়ে এনেছেন এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষক আনিয়ে তাকে নৃত্যে পটিয়সী করিয়েছেন।

কমলাসুন্দরী সত্যিই তার দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিল রামকমল সিংহকে। সেই আমোদপ্রিয়, বিলাসী পুরুষটির হৃদয় ছিল বড় নরম, কখনো কারুর মনে আঘাত দিয়ে কথা কননি। রামকমল সিংহের মৃত্যুর পর দশদিক শূন্য দেখেছিল কমলাসুন্দরী এবং প্রকৃত বৈধব্য যাপন করেছিল কিছুদিন। এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি কিংবা শোনেনি। কিন্তু সব কিছুতেই একটা মাত্রা আছে। এক সুন্দরী, নর্তকী, বারাঙ্গনা কতদিন আর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে? সে নিজে চাইলেও লোকে তাকে থাকতে দেবে কেন?

কমলাসুন্দরী এখন শহরের সবচেয়ে নামকরা অবিদ্যা।

তার বয়েস হয়েছে, কিন্তু নর্তকী বলেই বোধ হয় তার শরীরের চমৎকার গড়ন এখনো অটুট আছে। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য সে খানিকটা স্ফীতোদরা হয়েছিল, আবার সচেতন হয়ে, পরিশ্রম করে মেদ ঝরিয়ে ফেলেছে। এখনও সে এক একদিন নাচের আসরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

হীরা বুলবুলের নাম রসিক ব্যক্তিরা এরই মধ্যে ভুলে যেতে বসেছে। হীরার নাম আর শোনা যায় না। বরং কিছু নতুন নাম এখন সদ্য হাওয়ায় ভাসছে। যেমন, রওশানকুমারী, শারদা মনজিলওয়ালী, রেশমা ঘুংঘটওয়ালী। লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব কলকাতায় এসে বসতি নেবার পর লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারানসী থেকে কিছু কিছু ভাগ্যসন্ধানী নর্তকী-গায়িকা-গণিকারাও কলকাতায় আসছে। নবাবের সঙ্গে দলটিও কম বড় নয়।

এই লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের প্রসঙ্গেই একটা বেশ কৌতুক হয়েছিল।

রামকমল সিংহের সেই গৃহ কমলাসুন্দরী কিছুতেই ছাড়েনি। তার এখন পয়সা হয়েছে। এ রকম দু-তিনখানা বাড়ি সে অনায়াসেই কলকাতায় হাঁকাতে পারে। কিন্তু এই গৃহ থেকেই তার সৌভাগ্যের উদয়, এখানেই রামকমল সিংহ তার কোলে মাথা রেখে দেহরক্ষা করেছেন, এ গৃহ সে কোনোক্রমেই পরিত্যাগ করবে না।

বিধুশেখর মুখুজ্যে এবং মুনশী আমীর আলীর মতন দুই ধুরন্ধর উকিল মিলেও হটাতে পারেনি তাকে। মোকদ্দমা চলেছিল টানা চার বৎসর, তারপর ওঁরাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কমলাসুন্দরী নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিশালিনী, তা ছাড়া তাকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্যও আছে তার দুজন অনুরাগী। একজনের নাম ফটিকচাঁদ মল্লিক, লোকে তার নাম দিয়েছে ফুটে মল্লিক। অন্যজন নুটুবিহারী সরকার, লোকের মুখে মুখে তার নাম ছোট নুটু, যদিও বড় নুটুটি যে কে, তা ঠিক জানা যায় না। ফুটে মল্লিক আর ছোট নুটু পালা করে নিয়মিত আসে কমলাসুন্দরীর কাছে। চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দন-বিলাসী নামে তিনটি মেয়েও থাকে এখানে, কমলাসুন্দরী তাদের নাচ-গান শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে।

একদিন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের কাছ থেকে এক দূত এলো তার কাছে। নবাব এত্তেলা পাঠিয়েছেন। এর মধ্যেই কমলাসুন্দরীর নৃত্যকলার খ্যাতি তাঁর কানে পৌঁছেচে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই শহর, জন্ম থেকেই যার কোনো রাজা-বাদশা নেই, আছে বিদেশী সরকার। সেই শহরের লোকজনও যে খানদানী নৃত্য বা সংগীত বোঝে, এ সম্পর্কে নবাবের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই নবাব দেখতে চান কলকাত্তাওয়ালীর নাচ।

নবাবের দূতের চেহারা, পোশাক, কথাবার্তা সবই অন্য প্রকারের। কমলা-সুন্দরী প্রথমে বুঝতেই পারেনি প্রস্তাবটা। যখন বুঝলো, তার বুক কেঁপে উঠলো। এ যে বিরাট সম্মান! অতবড় একজন নবাব তাকে দেখতে চেয়েছেন!

এ কোনো উটকো নবাব কিংবা বাদশা নয়, কত বড় বংশের মানুষ ইনি। হিন্দুস্তানের বুকের মণি যে আওয়ধ, সেখানকার শেষ স্বাধীন নবাব।

কমলাসুন্দরী শুধু তো দেহপসারিণী নয়, সে শিল্পীও বটে। শিল্পী সব সময় খোঁজে শিল্পরসিককে। টাকা পয়সা ছড়িয়ে অনেকেই এসে কমলাসুন্দরীর নাচ দেখে যায়। তার মধ্যে প্রকৃত সমঝদার কজন? সকলেই জানে, সারা হিন্দুস্তানে নৃত্য-গীতের শ্রেষ্ঠ সমঝদার ঐ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। তিনি ডেকেছেন কমলাসুন্দরীকে।

বিকেলে ফুটে মল্লিক আসতেই কমলাসুন্দরী চোখ মুখ উদ্ভাসিত করে বললো, আজ কী হয়েচে, জানো? বলো দিকিনি আজ কে এয়েচেন?

ফুটে মল্লিকের মুখ শুকিয়ে গেল। আবার কে উৎপাত করতে এসেছিল কে জানে! কোনো নামকরা লোক, সমাজের মাথা? নাকি তার চেয়েও আট দশ গুণ বড় কোনো নির্বোধ ধনী? বাঙাল দেশ থেকে অনেক উটকো জমিদার আসে, তারা আঁটকুড়ে ব্রতর বাতাসার মতন মুঠো মুঠো টাকা ছড়ায়, সেগুলোর সঙ্গে পারা যায় না।

ফুটে মল্লিক বললো, সক্কালে এয়েছেল সে আবার কেমন ধারা মানুষ? নিশ্চয়ই কেতা জানে না। রাতের চিঁড়িয়ার কাচে সক্কালে কেউ আসে? আর তুই অমনি দেকা দিলি? তখুন তোর চুলে কিলিপ ছেল? চোকে সুর্মা দিইচিলি?

কমলা বললো, ওগো, যে এয়েচেল, সে আসল নয় গো, আসল নয়। সে দূত। আমায় শনিবার যেতে বলেচে। কার দূত বলো দিকিনি?

চপলা, তরঙ্গিণী, চন্দনবিলাসীরাও কমলাসুন্দরীকে ঘিরে বসে আছে মজলিশ ঘরে। এখনো তাদের সাজ-পোশাক, প্রসাধন হয়নি। আসর বসবে রাত আটটার আগে নয়।

ফুটে মল্লিক প্রায়ই আগে আগে আসে গল্প-গুজব করতে। ফুটে মল্লিক মধ্য বয়েসী, বেঁটেখাটো গোলগাল ধরনের মানুষ, মাথায় সুবৃহৎ টাক, গায়ের রঙ টুকটুকে ফর্সা এবং তার টাকটিকে আরও বেশী ফর্সা দেখায়। সে সব সময় সাদা রঙের পোশাক পরিধান করে বলে একটু দূর থেকে তাকে মনে হয় একটি রসগোল্লার মতন। মানুষটি গল্প-গুজব এবং হাস্য পরিহাস ভালোবাসে এবং তাই নিয়েই সময় কাটায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে সেও একজন নিষ্কর্মা ধনী। তার পিতামহ উত্তরবঙ্গে একটি জমিদারি ক্রয় করেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে সে ঐ জমিদারির দুই-তৃতীয়াংশের মালিক। নিজের দেখাশুনো করারও প্রয়োজন হয় না। গত দশ বৎসরের মধ্যে সে নিজের জমিদারিতে একবারও স্বশরীরে উপস্থিত হয়নি। নায়েব-গোমস্তা মারফৎ নিয়মিত তার কাছে টাকা আসে।

ফুটে মল্লিক বললো, কার দূত রে বাবা? আমি, আমি তো কিচুই বুঝিচিনি!

অনেক রঙ্গ-রহস্যের পর কমলাসুন্দরী নবাবের কথা জানালো।

সে কথা শুনে ফুটে মল্লিকের চোখ এমনই বিস্ফারিত হয়ে গেল যে মনে হলো যেন ভিতরের গোলক দুটি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে!

আর্তনাদ করে সে বলে উঠলো, তোর কি মরবার সাধ হয়েচে নাকি রে, কমলা? অ্যাঁ? তুই সাধ করে ঐ নবাবের গভ্ভয়ে পা দিবি!

কমলাসুন্দরী কিছুই বুঝতে পারলো না। সে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কেন, কী হয়েচে?

—তুই শুনিসনি কিচুই। নবাবের কীর্তি-কাহিনীর খবরে যে শহর একেবারে

ম ম কচ্ছে! নবাবটি যে একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা, মেয়েমানুষ পেলেই একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালে!

—যাঃ, অতবড় একটা মানী লোক।

—মানী লোকেরা কি মেয়েমানুষের মাতা খায় না? মেটেবুরুজের চত্বরেও এদ্দানি কোনো মেয়েমানুষ যায় না!

—কী যে বলো! আশ কতা পাশ কতা। আমার তবলা বাজনদার বললে যে নবাব খুব নাচ গান ভালোবাসেন। ভালো নাচ দেখলে ভাবের ঘোরে উনি নিজেও উঠে নাচতে শুরু করেন।

—নাচ ভালোবাসেন তো বটেই। নাচ দেকে একেবারে মোহিত হয়ে যান, তোর নাচও একবার দেকবেন, তারপর তোকে খেয়ে একেবারে হজম করে ফেলবেন।

—এমন অদ্ভুত কতা কখনো শুনিনিকো। নবাব পাগল, না তুমি পাগল?

—এসব কতা আমি স্বকর্ণে শুনিচি!

ফটে মল্লিক আরও নানারকম ভয়াবহ গল্প শুনিয়ে কমলাসুন্দরীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কমলাসুন্দরীর ঠিক বিশ্বাস হলো না। ফটে মল্লিক হিংসেতেও একথা বলতে পারে।

পরদিন সে নুটুবিহারীকে খবর পাঠালো।

নুটুবিহারী কমলাসুন্দরীর চেয়ে বয়েসে কিছু ছোটো। সম্প্রতি তার পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় হাতে অঢেল পয়সা এসেছে। ফটে মল্লিকের মতন সে একেবারে নিষ্কর্মা নয়, সে আইন শিক্ষা করে কিছুদিন ওকালতি শুরু করেছিল, তা ছাড়া সে দুটি কয়লাখনিও দেখাশুনো করে। তার পিতা অতি কড়া ধাতুর লোক ছিলেন, সেইজন্য পিতা ধরাধাম ত্যাগ করার পর স্বাধীন হয়ে সে কিছুদিন শরীরের আড়-মোড়া ভেঙে নিচ্ছে।

নুটুবিহারী বেশ লম্বা ও সুদেহী। মাথা ভর্তি বাবরি চুল, অনেকটা সেনাপতি সেনাপতি ধরনের চেহারা। কিন্তু শরীরের তুলনায় তার কণ্ঠস্বরটি অস্বাভাবিক রকমের মিনমিনে। পিতার ধমক খেয়েই বোধহয় সে তার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলতে পারেনি।

ফটে মল্লিকের তুলনায় ইদানীং নুটুবিহারীই কমলাসুন্দরীর বেশী ঘনিষ্ঠ। নাগর হলেও ছোট নুটুকে সে যেন খানিকটা স্নেহের চক্ষেও দেখে।

ছোট নুটু ফটে মল্লিকের ঠিক বিপরীত। নবাবের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। কমলাসুন্দরীর সম্মান যেন তার নিজেরই সম্মান। সে স্বয়ং কমলাসুন্দরীকে মেটেবুরুজে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তখন কমলাসুন্দরী বললো, নবাব কেমন ধারা মানুষ গো? ফটিকচাঁদ কেমন সব উলটো কথা বলছিল!

ফটিক চাঁদের নাম শুনেই জ্বলে উঠলো নুটুবিহারী।

—ঐ ফটে মল্লিকটা কী জানে? ওটা একটা ছাঁচি কুমড়ো! ও ব্যাটা নবাবীর কী মর্ম বোঝে? লক্ষ্ণৌয়ের নবাব, নাম শুনলেই মাতা হেঁট হয়ে যায়। হাতি দয়ে পড়লেও হাতি। নবাব দয়ে পড়েচেন বটে কিন্তু নবাবী মেজাজ একটুও নষ্ট হয়নিকো! রহিসী কায়দা পুরোপুরি বজায় রেকেচেন।

—তবু বাপু তুমি একটু খপর নেও না! শুনলে কেমন ভয় ভয় করে। নবাব ডেকেচেন, সে ডাক উপিক্ষেও কত্তে পারি না, আবার চাল-চলন-সহবতে

যদি কিছু ভুল হয়, নবাব যদি হাতে মাতা কাটার হুকুম দেন—

—যেতে হবে তো শনিবার? এখনো চারদিন রয়েচে। আমি সব খোঁজ এনে দিচ্চি তোমায়। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব কলকাতায় এসে আর কারুকে ডাকেনি, শুধু তোমায় এত্তেলা দিয়েচেন. তার মানে বুঝলে, কমলা, এক ডাকে তোমায় সবাই চেনে! ঐ ফুটে মল্লিকটার হিংসেয় বুক ফাটচে!

দুদিন বাদে ছোট নুটু সব খোঁজখবর নিয়ে এলো। কথা বলার বদলে সে ক্রন্দন করতে শুরু করলো কমলাসুন্দরীর হাত চেপে ধরে।

কমলাসুন্দরী হতভম্ব হয়ে বললো, ও মা, এ কী? এ কী?

ছোট নুটু হাপুস নয়নে থেমে থেমে বললো, কমলা. কতা দাও, তুমি কিছুতেই মেটেবুরুজে যাবে না! নবাব তোমায় যতই হীরে-মোতির মালার লোভ দেখাক্!

—কেন গো? সত্যিই কি নবাব বাহাদুর মেয়েমানুষদের ধরে ধরে মেরে ফেলেন নাকি?

—না গো, তা নয়! ব্যাপার আরও ভয়ংকর। নবাবী প্রাসাদে কেউ ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। নবাব সবাইকে শাদী করে ফেলেন!

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ গো, আমি সব খপর এনিচি!

—এসব কতা কে শোনালে তোমায়!

—মেটেবুরুজে সব্বাই বলাবলি কচ্চে যে! সেখেনে কত মানুষের ভিড়, যত সব ফড়ে আর দালাল, গুড়ের লোভে লোভে যেমন পিঁপড়ে আসে। আর জুটেচে যত রাজ্যের পাখিওলা। নবাবের খুব পাখি কেনার শক, আর ঐ শক বিয়ে করার।

—কী বললে গো তুমি? কতা নেই, বার্ত্তা নেই, যাকে দেকবে, তাকেই ধরে ধরে বে করবে? এ কি অলুক্ষুণে লখনৌয়ের আইন?

—নবাব ধম্মে হলেন গে শিয়া! ওরা যত খুশী মুত্-আ কত্তে পারে।

—মুত্-আ কী গো?

—ঐ যে বললুম, বিয়ে বল, শাদী বল, নিকে বল, সবই ঐ মুত্-আ। নবাবের যাকে পছন্দ হয়. অমনি তাকে মুত্-আ করে ফেলেন। একজন কী বললে জানো? এক কম বয়েসী ভিশ্তিনী মাগী অন্দর মহলে জল দিতে যেত, তাকে হঠাৎ নবাবের চোখে লেগে গেল। আর অমনি তাকে মুত্-আ করে ফেললেন নবাব। সে ভিশ্তিনী এখন বেগম!

ছোট নুটুর গলা কাঁদো কাঁদো. কিন্তু কমলাসুন্দরী হেসে গড়িয়ে পড়লো একেবারে। এ যেন রূপকথা, নবাবের নেক নজরে পড়ে এক ভিশ্তিনী রাতারাতি হয়ে গেল বেগম সাহেবা!

ছোট নুটু বললো, শুধু কি ভিশ্তিনী নাকি, এক ঝাড়ুদারনীকেও অমনি মুত্-আ করে বেগম বানিয়েচেন নবাব। তার নাম আবার মুসফ্ফা বেগম।

—তার মানে কী?

—কে জানে? শুনিচি নবাব রোজই একটা করে শাদী কচ্চেন. অ্যাদ্দিনে প্রায় শ'খানেক বেগম হয়ে গ্যাচে। আগে আরও কত ছেল কে জানে! তোমার মতন আগুনের খাপ্‌রাকে দেকলে নবাব কী আর ছাড়বেন! জোরজার করে অমনি মুত্-আ করে নেবেন!

কমলাসুন্দরী ঠোঁট টিপে হেসে বললো. তা একবার নবাবের বেগম হয়ে দেকলে মন্দ হয় না!

ছোট নুটু হাত জোড় করে বললো, কমলা, তুমি এমন কতা বললে? জাত-

ধম্মো বিসজ্জন দেবে?

—আমাদের আবার জাত কী?

—ওঃ, এই তোমার মনে ছেল? তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও? আমরা কি তোমার পায়ে পড়ে থাকিনি? এখুন তোমার পায়ে মাতা কুটবো, কমল।

—আরে, আরে, করে কী, করে কী, মিন্‌সেটা! সত্যি সত্যি কি আমি ধেই ধেই করে নবাবের বেগম হতে যাচ্চি নাকি? আর গেলেই বা কি। অমনি জোর করে মুত্-আ করবে? এ কি মগের মুলুক নাকি রে বাবা!

—হ্যাঁ, সেই কতাই তো সবাই বলচে! নিজের রাজ্য রক্ষা কত্তে পাচ্ছেন না, নবাব এখন মেয়েমানুষ জয় কচ্চেন! সুন্দরপারা কোনো মাগ্ নবাবের প্রাসাদে একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। মুত্-আ করার পর বেগম বানাবে। সে ঐ নামেই বেগম, সে আর কোনোদিন দেকতে পাবে না বাইরের আলো-বাতাস, বুঝলে?

কমলাসুন্দরী ডাকলো চপলা, তরঙ্গিনী আর চন্দনবিলাসীকে। সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী লো, তোরা কেউ নবাবের বেগম হতে চাস নাকি? এমন সুযোগ আর কখুনো পাবিনি!

তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, ও মা গো, রক্ষে করো!

ছোট নুটু বললো, ঠিক বলিচিস! কেন নবাব মহলে গিয়ে বন্দিনী হবি? আমরা কি তোদের কম খাতির করি?

কমলাসুন্দরী বললো, তা হলেও বেগম বলে কতা!

চপলা বললো, ওফ্, ভাবতেও বুক কাঁপে! প্যাঁজ রসুনের গন্ধ, আর নবাবের নাকি হুমদো হুমদো কাফ্রি খোজা রয়েচে।

নবাব সম্পর্কে এই সব চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর গল্প চলতে লাগলো দু-তিনদিন ধরে। আমন্ত্রণ পেয়েও কমলাসুন্দরী যাবে না বলে নবাব যদি রাগ করেন এবং জোর করে ধরে নিয়ে যান, সেই ভয়ে ছোট নুটু একটা বজরা ভাড়া করে ওদের সকলকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য গঙ্গাবক্ষে বিহারের প্রস্তাব দিল।

অতি উত্তম কথা, কমলাসুন্দরী সানন্দে রাজি।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন সন্ধে থেকে তরঙ্গিনীকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। পরদিনও সন্ধান মিললো না তার। কমলাসুন্দরীর বজরা ভ্রমণে বেরিয়ে গেল। এবং ফিরে আসার পর শুনতে পেল, তরঙ্গিনী ঝাড়ুদারনীর ছদ্মবেশে নবাবের মহলে ঢুকেছিল এবং নবাবও তাকে মুত্-আ করে বেগম বানিয়ে ফেলেছেন।

অবশ্য এটা ঘটনা না রটনা, তার সত্য মিথ্যে জানার কোনো উপায় নেই।

বিধুশেখরের নাতি প্রাণগোপালের উপনয়ন উপলক্ষে নবীনকুমার অনেকদিন পর এলো এ বাড়িতে। অতি শৈশবে সে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের হাত ধরে এখানে অনেকবার এসেছে। তখন তাকে আদর করার জন্য নারীগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে নবীনকুমার এখন বাইরের পৃথিবীকে চিনতে শুরু

করেছে, মাসী-পিসী, দিদি-খুড়ো-জ্যাঠাদের সঙ্গে অহেতুক বিশ্রম্ভালাপ আর সে পছন্দ করে না। নিমন্ত্রণাদি ছাড়া আর আসা হয় না এখানে।

একমাত্র দৌহিত্রর উপনয়নে বিধুশেখর ধুমধামের আয়োজন করেছেন বিস্তর। প্রাণগোপালকে নিয়ে তাঁকে বিস্তর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। প্রাণগোপালের পিতামহ শিবলোচন কিছুতেই দাবি ছাড়তে চান না. তিনি তাঁর পৌত্রের ওপর অধিকার বজায় রাখতে চান। প্রাণগোপাল যেমন বিধুশেখরের একমাত্র নাতি, তেমনি শিবলোচনেরও ঐ একটিই নাতি বৈ আর নেই।

গরীব ব্রাহ্মণের এই স্পর্ধা বিধুশেখরের কিছুতেই সহ্য হয় না! শিবলোচনের পুত্রকে বিধুশেখর ঘরজামাই করেছিলেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহই হয়েছিল ঐ শর্তে। ঘর-জামাইয়ের মৃত্যু হলে তার সন্তান তো মাতুলালয়েই থাকবে স্বাভাবিক-ভাবে! ঐ পূজারী ব্রাহ্মণ শিবলোচনের কতখানি সামর্থ্য আছে প্রাণগোপালকে মানুষ করার? বিধুশেখর এরই মধ্যে ঐ অষ্টমবর্ষীয় বালকের জন্য তিনজন শিক্ষক রেখেছেন।

শিবলোচন মামলা করার আস্ফালন করেছিলেন, তাতে অবশ্য হেসেছিলেন বিধুশেখর। ঐ মূর্খটা জানে না যে. ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ওপরেই শুধু হারজিত নির্ভর করে না। ধনীর সঙ্গে মামলা করে কখনো জয়ী হতে পারে না কোনো দরিদ্র। আর কিছু না, শুধু মামলাটিকে চার-পাঁচ-ছয় বৎসর ধরে চালিয়েই বিধুশেখর ওঁকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত মামলা মোকদ্দমার দিকে যাননি শিবলোচন। কিন্তু হালও ছাড়েননি। প্রতি মাসে একবার দুবার করে এসে আর্জি জানিয়ে দেন। অন্তত একবার সামান্য কয়েকদিনের জন্যও তিনি প্রাণগোপালকে নিয়ে যেতে চান স্বগৃহে। ও ছেলে কি তার পিতার ভিটেয় একবারও পা দেবে না? ওর পিতামহী যে একবারও ওকে চক্ষেও দেখলেন না! পুত্রের শ্বশুরালয়ে কখনো জননীকে আসতে নেই, নইলে তিনি নিজেই এসে দেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু বিধুশেখর এ ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর। তাঁর মুখের বাক্য অনড়। একবারের জন্যও তিনি প্রাণগোপালকে প্রেরণ করতে রাজি নন। তাঁর মতে, দরিদ্র মাত্রেই কুটিল ও লোভী। অভাব মানুষকে নীচে নামায়। নিজের পুত্রকে ঘর-জামাই হতে দিতে রাজি হয়েছিলেন কেন শিবলোচন. অর্থলোভেই তো! নাতিকে নিয়ে যাবার আবেদনের পশ্চাতেও নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলব আছে।

শিবলোচনকে ইদানীং আর এ গৃহে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয় না। তবু তিনি আসেন এবং দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। যদি একবার দূর থেকেও নাতির মুখ দেখা যায়।

প্রাণগোপালের উপনয়নের দিনেও তার পিতৃকুলের কারুর নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবলোচন সম্পর্কটা এমনই তিক্ত করে ফেলেছেন যে. ওঁদের কারুর মুখদর্শন করতেও আর ইচ্ছে হয় না বিধুশেখরের। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কন্যা সুহাসিনীর মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না, মা! প্যাঁচালো বামুন পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বসে কোন্ কথা বলবে, তার ঠিক কী! হয়তো নাকে কান্না শুরু করবে! তারচে ওদের না ডাকাই ভালো! তুই কী বলিস?

সুহাসিনী আর পিতার কথার ওপর কোন্ কথা বলবে! তা ছাড়া. শ্বশুর-কুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। বিবাহের পর মাত্র সাতদিন সে শ্বশুরালয়ে ছিল একবার, তাঁদের কারুর মুখই তার ঠিক মতন স্মরণ হয় না।

—সে আপনি যা ভালো বুঝবেন, বাবা!

নির্লজ্জ শিবলোচন তবু কোথা থেকে খবর পেয়ে আজও দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দিনে তিনি নাতিকে একবার আশীর্বাদ করতে চান। বিধুশেখরের তুলনায় শিবলোচন আরও বেশী বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, শরীরটা ভাঙা-চোরা। একটি বহু ব্যবহৃত কাষায় বস্ত্র ও উত্তমাঙ্গে নামাবলী, এ ছাড়া অন্য কোনো পোশাক তিনি কখনো ব্যবহার করেন না।

সুহাসিনীর বিবাহের সময় অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল গঙ্গানারায়ণের ওপর। সুহাসিনীর পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় সেই ভার নবীনকুমারের ওপর বর্তেছে। নবীনকুমারকে দেখে সুহাসিনীর বার বার মনে পড়ছে তার গঙ্গাদাদার কথা। নবীনকুমারের এখন যা বয়েস, তার বিবাহের সময় গঙ্গানারায়ণেরও প্রায় এই বয়েসই ছিল। অথচ দুই ভ্রাতার মধ্যে কত প্রভেদ। গঙ্গানারায়ণ ছিল লাজুক, নম্র স্বভাবের। বেশী লোকজনের মধ্যে সে অস্বস্তি অনুভব করতো, অন্দরমহলে এসে সে নারীদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতো না। সেই তুলনায় নবীনকুমার একেবারে বিপরীত। এত সপ্রতিভ, চঞ্চল এবং সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সে হুকুমের সুরে কথা বলে। ধুতির ফুল-কোঁচাটি এক হাতে ধরে সে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ণবয়স্কদের মতন ব্যবহার করছে মাননীয় অভ্যাগতদের সঙ্গে। তার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সে সোজা অপরের মুখের দিকে তুলে ধরে।

বিন্দুবাসিনীর কথাও এদিনে কয়েকবার চকিতে মনে পড়ে সুহাসিনীর। কিন্তু দিদির মুখচ্ছবিখানি সে মন থেকে মুছে দিতে চায়। দিদি বড় মন্দভাগিনী ছিল, সুহাসিনীর মতন একটি সন্তানও সে পায়নি। বৈধব্যজীবনের নিষ্ঠাও রক্ষা করতে পারলো না সে, সবাই জানে দিদি গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কলঙ্কিনী হয়েছিল। সে মরে বেঁচেছে। এ গৃহে তার স্মৃতিরও কোনো স্থান নেই, বিশেষত আজকের মতন শুভদিনে।

অতিথিদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় নবীনকুমার একবার অন্দরমহলে এলো জল পান করবার জন্য। লোকজনের সঙ্গে অনবরত কথা বলতে বলতে কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়।

সুহাসিনী তাকে দেখে বললো, এই ছোট্‌কু, শোন্‌।

সুহাসিনী এখন বাইশ বছরের যুবতী। তার শরীর একটু ভারির দিকে, একখানা নতুন গরদের শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাকে বেশ মা-মা দেখায়।

নবীনকুমার কাছে এগিয়ে যেতেই সুহাসিনী তার কপালে একটি চুম্বন দিয়ে শুধু বললো, ছোট্‌কু—। তারপরই তার দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হতে লাগলো।

নবীনকুমার বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি, সুহাসিনীদিদি!

সুহাসিনী বললো, ছোট্‌কু, আজ বড় গঙ্গাদাদার কতা মনে পড়চে রে! আমায় কত ভালোবাসতেন! আমি গঙ্গাদাদার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে কিল মাত্তুম! গঙ্গাদাদা আমাদের ছেড়ে কোতায় চলে গেল রে!

নবীনকুমার নির্বাক হয়ে রইলো। গঙ্গাদাদাকে সেও খুব ভালোবাসতো। কারুর কারুর উপস্থিতিতেই ভালোবাসার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাদাদা কাছে এলেই

সে রকম লাগতো। একটি দিনের কথা তার এখনো মনে আছে। পিতার মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছিল, প্রায় সবই নবীনকুমারের ভাগে, গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই নিয়ে বিম্ববতী আপত্তি তোলায় গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মা, ছোট্‌কুর পাওয়া আর আমার পাওয়া তো একই কথা, তুমি অমন কেন বলচো? তখন নবীনকুমারের অনেক কম বয়েস, অতশত বোঝার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আজও স্মরণে এলে সে বুঝতে পারে, গঙ্গানারায়ণের ঐ কথার মধ্যে ঈর্ষার লেশমাত্র ছিল না। তবে, গঙ্গানারায়ণের নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত বলে ঘোষিত হবার পর আর বেশী দিন নবীনকুমার তার দাদার স্মৃতি ধরে রাখতে পারেনি।

আজ সুহাসিনীর কান্না তার কাছে এমনই আকস্মিক মনে হলো যে সে কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

সেখানে অন্য একজন স্ত্রীলোক এসে পড়ে বললো, ওমা, সুহাসিনী, তুই কাঁচিচস? কী হলো গা?

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছে বললো, না, না, কিচু না!

তারপর সে নবীনকুমারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো, আমাদের সেই ছোট্‌কু, কত বড়টি হয়েচে, কেমন সুন্দর, কেমন বুদ্ধিমান, দেকে এত ভালো লাগলো—

সেই স্ত্রীলোকটি সুহাসিনীর প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্যই যেন চক্ষে আঁচল দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আহা, আজ যদি গোপালের বাবা বেঁচে থাকতেন...ওগো তিনি থাকলে যে সব্বাঙ্গসোন্দর হতো—

এই সময় নবীনকুমার বার-বাড়ির দিকে সরে পড়লো। স্ত্রীলোকের কান্নার সামনে দাঁড়াতে তার বিষম অস্বস্তি লাগে।

বিধুশেখর আর আগেকার মতন উৎসব গৃহের সমস্ত স্থল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে পারেন না। বহুমূত্র ব্যাধিটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ইদানীং দ্বিতীয় চক্ষুটির দৃষ্টিও যেন কিছুটা ম্লান লাগে। তিনি বাইরে একটি আরাম কেদারায় বসে সব রকম খবরাখবর নিচ্ছেন। তাঁর বাড়িতে ভৃত্য-পরিচারক এবং আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া আছে। তবু তিনি মাঝে মাঝেই নবীনকুমারকে ডেকে জানতে চান সব কিছু।

ব্রাহ্মণদের দান ও নিমন্ত্রিতদের ভোজনাদি শুরু হয়েছিল দ্বিপ্রহর থেকে, শেষ হলো প্রায় রাত দশটার তোপ দাগার সময়। বিধুশেখরের জ্যেষ্ঠা কন্যা নারায়ণী এ বাড়ির কর্ত্রী, তিনি বলে রেখেছিলেন যে নবীনকুমারকে তিনি তাঁর সামনে বসিয়ে খাওয়াবেন। বৃহৎ একটি রুপোর থালায় যোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন নবীনকুমারকে।

সারাদিন ধরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ও অনেকবার ছাদে-নিচে ওঠা-নামা করে নবীনকুমার ক্লান্ত, তার আর আহারে রুচি নেই। নারায়ণী তবু জোর করে তাকে খেতে বসালেন। অনেক আত্মীয়া-অনাত্মীয়া নারী উপস্থিত সেখানে। বিম্ববতীও রয়েছেন। যারা নবীনকুমারের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা এবং অনেকদিন পর তাকে দেখছে, তারা সকলেই নবীনকুমারের হঠাৎ যৌবনে উপনীত হওয়ায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। সবাই বলছে, ওমা, এই তো ক'দিন আগেও একেবারে ছেলেমানুষটি ছেল, এখুন দিব্যি বাবু হয়ে উঠেচে যে গো! আর কত কাজের ছেলে, সব দিকে নজর!

আর যারা বয়সে ছোট, তারাও বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে নবীনকুমারকে, কেউ অন্য একজনের কানে কানে বলছে, ওমা, দ্যাক্, দ্যাক্, গোঁপ আচে! গোঁপ আচে!

কিছুদিন আগে স্বগৃহে মঞ্চ বেঁধে নবীনকুমার নাটকের অভিনয় করেছিল এবং তাতে সে রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বলে সে অনেকের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। চিকের আড়ালে বসে অনেক নারী ও বালিকা দেখেছিল সেই নাটক। নবীনকুমারের অভিনয়-কলা নৈপুণ্যের সুখ্যাতিও বেরিয়েছিল সংবাদ-পত্রে। সেই সময় নবীনকুমারের সবে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা উঠেছিল মাত্র, কিন্তু রাজকুমারীর গোঁফ থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয় বলে পরামাণিক দিয়ে চেঁছে ফেলা হয়েছিল ওষ্ঠ। তার ফলে এখন তার বেশ কালচে রঙের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

সামান্য একটু খেয়েই নবীনকুমার উঠে পড়তে যাচ্ছিল, নারায়ণী বললেন, ওমা, উঠাচস কী! খা খা, আর একটু খা, একটু পায়েস মুখে দে অন্তত—

নবীনকুমার ততক্ষণে জলের গেলাসে হাত ডুবিয়েছে। বিম্ববতী বললেন, ঐ ওর স্বভাব, এই এইটুকুনি পাখির আহার যেন!

নবীনকুমার বললো, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শিরদাঁড়া ব্যথা হয়ে গ্যাচে। এবার গিয়ে ঘুমুবো! একবার গোপালের সঙ্গে দেকা করে যাই।

এই কথা শুনে নারায়ণী তাকালেন সুহাসিনীর মুখের দিকে। ওরা কিছু বলবার আগেই বিম্ববতী বললেন, আজ আর গোপালের সঙ্গে দেকা করতে হবে না। যা শুয়ে পড়গে!

নবীনকুমার কৌতুকের সঙ্গে বললো, একবার দেকে আসি, নেড়ু মাতায় গোপ্লাটাকে কেমন দেকাচ্চে!

নারায়ণী বললেন, গোপাল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েচে!

—এই তো একটু আগে তার গলা পেলুম! বসে বসে টাকা গুণছেল! খুব টাকা চিনেচে ছেলেটা!

নারীরা চুপ করে রইলো।

যজ্ঞ সমাপ্ত হলে উপবীত গলায় দেবার পর প্রাণগোপালকে দ্বিতলের একটি কক্ষে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন সে তিনদিন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতের মানুষের মুখ দর্শন করবে না।

নবীনকুমার উঠোনে এসে দাঁড়াতেই এক ভৃত্য এলো তার হাতে জল ঢেলে দিতে। হাত মুখ প্রক্ষালন করে নবীনকুমার বললো, গোপালকে একবার দেকেই আমি চলে যাবো।

বিম্ববতী বললেন, থাক না, এখুন আর যাস্নি!

—কেন?

—এখুন ওর কাচে যেতে নেই!

ঠিক তখনই এ বাড়ির এক আশ্রিত যুবক এসে নারায়ণীকে জিজ্ঞেস করলো, ও বড়দিদি, গোপাল দুধ খেতে চাইচে। এখুন কি কিচু দেওয়া যায়?

নবীনকুমারের এবারে খট্কা লাগলো। সে তাকালো সবার মুখের দিকে। তারপর ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? তোমরা আমায় নিষেধ কচ্চো কেন? এই তো এ গেস্লো গোপালের ঘরে। আমি একবার গেলে কী দোষ?

নারায়ণী বললেন, ও তো বামুন।

বিম্ববতী তার সঙ্গে যোগ করলেন, বামুন ছাড়া আর কারুর যেতে নেই।

নবীনকুমারের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে এই প্রথার কথা বিন্দুবিসর্গ জানতো না। সে ব্রাহ্মণ নয় বলে প্রাণগোপালের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না? আজ সারাদিন সে প্রাণগোপালের পৈতের জন্য খাটলো, আজ সকালেও প্রাণগোপাল তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, ছোট্কুমামা, তুমি আমায় ইস্প্রিং-এর হাতি দিচ্চো তো, তোমায় বলেচিলুম...সেই প্রাণগোপালের মুখ দেখা তার এখন নিষেধ? এতদিন সবাই বলেছে, সে এ বাড়িরও ছেলেরই মতন, কিন্তু আসলে তা নয়, সে অব্রাহ্মণ, সে এদের চেয়ে ছোট!

আর একটিও কথা না বলে নবীনকুমার হনহন করে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে। সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি তার ক্রোধ উদ্দীপিত হলো। সে যখন আরও অনেক ছোট ছিল, একবার কৌতুক ও গোঁয়ার্তুমি করে টিকি কেটে নিয়েছিল এক ব্রাহ্মণের। সেই কথা মনে পড়ে গেল তার।

দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সে দেখলো, নামাবলী গায়ে জড়ানো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারবানদের কাছে কী বলে যেন কাকুতি-মিনতি করছে। নবীনকুমার প্রাণগোপালের ঠাকুর্দাদা শিবলোচনকে চেনে না, তার বৃত্তান্তও জানে না। শিবলোচনকে সে মনে করলো কোনো ভিখারী।

তাকে দেখে নবীনকুমারের আরও রাগ জাগ্রত হলো। সে মনে মনে বললো, এই তো ব্রাহ্মণের দশা! অনাহূত হয়েও এখানে সুখাদ্যের লোভে ছোঁক ছোঁক করচে। অথচ, এর মাতায় একটা বৃহৎ টিকি আর গলায় কালীঘাটের পান্ডাদের মতন একটা মোটা পৈতে আচে বলে এরও অধিকার রয়েচে প্রাণগোপালের মুখ দেকার!

সে দ্বারবানদের এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই বুড়োটা এখেনে কী চায়? বলে দিস্‌নি যে বামুনবিদায় দুপুরে হয়ে গ্যাচে!

শিবলোচন নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে এসে বলতে গেল, বাবা আমি শুধু একটিবার—

নবীনকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করে দ্বারবানদেরই আবার হুকুম দিল। লুচি মন্ডা দু-চারখানা এনে একে দিয়ে বিদেয় কর!

তারপর সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে।

এদিকে সুহাসিনী কেঁদে ফেললো আবার।

নারায়ণীকে জড়িয়ে ধরে বললো, দিদি, কী অলক্ষুণে ব্যাপার হলো, ছোট্কু রাগ করে চলে গ্যালো।

নারায়ণী বললেন, আমি কী করি বল! ছোট্কু হঠাৎ না জেনে এ রকম বললো—

বিম্ববতী সুহাসিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুই এমন উতলা হচ্চিস কেন মা? অলক্ষণ কেন হবে? ছোট্কু ওরকম অবুঝের মতন হঠাৎ ক্ষেপে যায়। আবার কাল দেকিস, একেবারে ঠান্ডা জল হয়ে গ্যাচে।

সুহাসিনী মুখ ফিরিয়ে বললো, ছোটমা, ছোট্কু একবার দেখতে গেলেই বা কী দোষ হতো?

বিম্ববতী বললেন, ওমা, তা আবার হয় নাকি! শাস্তরের নিয়ম...তিনদিন পরেই তো ও আবার গোপালকে দেকতে পাবে।

—শাস্তরের এমন নিয়ম কেন?

—সে কতা কী আমরা জানি?

—ছোট্‌কু আমার ছোট ভাই. আমাদের আর কোনো ভাই নেই, ছোট্‌কুই আমাদের একমাত্র ভাই. সে আবার বামুন-অবামুন কি, ছোট মা?

—তা বললে কী চলে?

নারায়ণী বললেন, আর ও নিয়ে মাতা ঘামাসনি। ছোট্‌কুকে পরে আমি ডেকে সব বুঝিয়ে বলবো'খন। এখুন চল. ভাঁড়ার বন্ধ কত্তে হবে, ছিষ্টির কাজ বাকি রয়েচে!

এই সামান্য ঘটনাতেও কিন্তু নবীনকুমারের মনে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। পরের দিন সে আর ও বাড়িতে গেলই না।

বিম্ববতী তাকে বোঝাতে এলে সে বললো, আমি আর কোনোদিন জ্যাঠা-বাবুদের বাড়ি যাবো না। তুমি আমায় অনুরোধ করো না, মা। যে-বাড়িতে গেলে আমায় পদে পদে ভেবে চলতে হবে যে কোথায় আমার যাওয়া উচিত, আর কোথায় আমার যাওয়া উচিত নয়, সেখানে আমার যাবার দরকারটা কী! এখুন মনে পড়েচে, ছেলেবেলা খেলতে খেলতে একদিন আমি ও'দের ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েচিলুম, তখুন জ্যাঠাইমা আমায় বকুনি দিয়েচিলেন!

—তা বলে কি তুই জাত-ধম্মো মানবি না নাকি ছোট্‌কু? বামুনরা হলো সবচে ওপরে, ওনারা যা পারেন, সব কি আমরা পারি?

—তোমার সঙ্গে আমি তক্কো করবো না, মা! তুমি শুধু আমায় ও বাড়িতে আর যেতে বলো না।

—অদ্ভুত কতা বলিস তুই ছোট্‌কু। ওরা আমাদের কত আপন। গোপালের পৈতে হয়ে গেল, ঐ পৈতের সময়েই যা একটু...অন্য সময় তুই ও বাড়ির যেখেনে খুশী সেখেনে যেতে পারিস!

—ঠাকুর ঘরে ছাড়া!

যথাসময়ে এ কথা বিধুশেখরেরও কানে উঠলো। তাঁর চলৎ-শক্তি কমে গেছে বটে তবু সেকালের রাজাদের মতন তিনি চক্ষু দিয়ে শোনেন এবং কান দিয়ে দেখেন।

সংবাদটি শুনে বিধুশেখর দোদুল্যমান হলেন। লোকাচার অনুযায়ী সদ্য উপবীতধারী ব্রহ্মচারীর মুখ দর্শন করার অধিকার নেই নবীনকুমারের। সেই হিসেবে তাঁর কন্যারা নবীনকুমারকে বাধা দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু নবীন-কুমার তো আসলে ব্রাহ্মণই। মহাভারতে সূতপুত্র নামে পরিচিত কর্ণ যেমন আসলে ক্ষত্রিয়।

বিধুশেখর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। ছোট্‌কু বলেছে, সে আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। বয়েস কম, মস্তিষ্ক উষ্ণ, হয়তো এই মনোভাব তার বেশী দিন থাকবে না। ছোট্‌কু এ বাড়িতে আর কখনো আসবে না, এ কখনো হয়? তাঁর সব কিছুই তো ছোট্‌কুর। আজ যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, তা হলে ছোট্‌কুই হবে প্রাণগোপালের অভিভাবক। এক সময় ছোট্‌কুকে সব সত্য কথা বলতে হবে, অন্তত মৃত্যুর আগে...অথচ বিম্ববতীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কিছুদিন কেরানীর চাকুরির পর মধুসূদনের একটু পদোন্নতি হয়েছে। তিনি নিযুক্ত হয়েছেন পুলিশ আদালতের দ্বিভাষিকের পদে। বেতনও কিঞ্চিৎ বেশী। কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাটীতেও আর অধিক দিন আশ্রিত হয়ে থাকা ভালো দেখায় না। কিশোরীচাঁদ এবং তাঁর পত্নী যতই খাতির যত্ন করুন, তবু পরের গৃহে কখনো পূর্ণ স্বস্তি পাওয়া যায় না, একটু আড়ষ্ট ভাব থাকেই। হাত থেকে পড়ে হঠাৎ একটি কাচের গেলাস ভগ্ন হলেই মনে হয়, বুঝি কোনো বৃহৎ অপরাধ হলো। গৃহস্বামী তখন যতবার বলেন, কিচ্ছু হয়নি, ততই লজ্জা বাড়ে।

কিশোরীচাঁদের জুড়ি গাড়িতেই মধুসূদন অফিস যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু দমদম থেকে সেই লালবাজারে পৌঁছোবার জন্য বাটী থেকে বার হতে হয় অনেক আগে। কিশোরীচাঁদ নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, ঘড়ি ধরে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তিনি দফ্তরে পৌঁছোতে চান। মধুসূদনের জন্য দেরি হয়ে যায় মাঝে মধ্যেই। পূর্বরাত্রে অত্যধিক সুরা পান করলে পরদিন সকালে আর মধুসূদনের চক্ষু খুলতেই ইচ্ছে করে না। স্নানটান না করেই শেষ মুহূর্তে নাকে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজে, কোনোক্রমে ধরা চূড়া চাপিয়ে মধুসূদন নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। গৃহদ্বারের বাইরে কিশোরীচাঁদ তখন গাড়ির কোচের মধ্যে অপেক্ষমান। তিনি অতিশয় ভদ্র, বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ করেন না, শুধু ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে গার্ড চেন লাগানো ঘড়ি বার করে বারবার দেখেন, তার ভুরুদ্বয়ে উতলা ভাবটি লুকোনো থাকে না। গাড়িতে উঠে মধুসূদন বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর কিশোরীচাঁদ শীতল সভ্যতার সঙ্গে বলেন, না, না, ঠিক আচে, ঠিক আচে, মিঃ ডাট্।

এ ছাড়া, প্রায়ই যে সান্ধ্য-আসরটি বসে কিশোরীচাঁদের উদ্যানে, সেখানেও মধুসূদন নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারলেন না। তাঁর স্বভাবটি প্রায় দুরন্ত শিশুর মতন, যে-কোনো সমাবেশেই তিনি চান সকলের দৃষ্টি শুধু তাঁর দিকেই থাকুক, সকলে তাঁর সঙ্গে কথা বলুক। কিন্তু কিশোরীচাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্যারীচাঁদ এবং তাঁর বন্ধুবর্গ প্রায়শই গুরুতর বিষয় নিয়ে বাক্যালাপে ব্যাপৃত থাকেন। দেশোদ্ধার, সমাজোদ্ধার ইত্যাদি ব্যাপার মধুসূদনের পছন্দ হয় না। এঁরা বড় নীরস, এঁরা কাব্য বোঝেন না। এঁরা শব্দ-ঝংকারের মাধুর্য আস্বাদন করতে জানেন না। মধুসূদন কখনো কখনো এঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে গেলে, এঁরা বিদ্রূপ করেন, তাঁর মতামতের কোনো মূল্য দেন না। হয়তো খৃষ্টান বলেই মধুসূদনকে এঁরা সম্পূর্ণ আপনজন বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন। এঁদের সঙ্গ আর ভালো লাগে না মধুসূদনের। এঁরা সকলেই তাঁর চেয়ে বয়েসে বড়, সেইজন্য খানিকটা ভারিক্কী ভাব দেখান, কিন্তু মধুসূদন কখনো বয়স্কদের ভারিক্কীপনা গ্রাহ্য করেননি। এঁরা জানেন না যে এখনকার এই পরাশ্রিত, সামান্য চাকুরিজীবী মধুসূদন এককালে এই কলকাতা শহরের বুকই অহংকারের পদপাতে কাঁপিয়ে তুলতেন।

একদিন মধুসূদন কিশোরীচাঁদকে প্রস্তাব দিলেন যে তিনি এখন পৃথক ভাবে

বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চান। এ কথা শুনে কিশোরীচাঁদ বিস্মিত, তাঁর পত্নী দুঃখিত হলেন। তাঁরা বারংবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, মধুসূদনের কী অসুবিধে হচ্ছে, ব্যবস্থাপনায় কোন্ ত্রুটি হয়েছে? অপরের বাড়িতে অতিরিক্ত আপ্যায়নও যে অনেক সময় অশান্তির কারণ ঘটায়, একথা বোঝানো ভারি শক্ত। মধুসূদন শুধু বললেন যে, অপর কোনো কারণে নয়, প্রায়ই বিলম্বে আদালতে যাওয়ায় তিনি কিশোরীচাঁদের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন তো বটেই, তাঁর নিজের চাকুরিও এভাবে রাখা দায়। চাকুরি বাঁচাতে হলে তাঁর কর্মস্থলের খুব কাছাকাছি থাকা দরকার।

সেই রকমই ব্যবস্থা হলো। মধুসূদন লালবাজার পুলিশ আদালতের অতি নিকটবর্তী লোয়ার চিৎপুর রোডের ছ' নম্বর দ্বিতল গৃহটি ভাড়া নিলেন। এখান থেকে চাকুরি রক্ষা করার কোনো বাধা নেই। তিনি ঘুমিয়ে থাকলেও আদালত চালু হলেই পেয়াদারা এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়।

মাদ্রাজে মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী আঁরিয়েত্তা স্বামীসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। তাঁর স্বামী এখন স্বাধীনভাবে পৃথক গৃহে অবস্থান করছেন এই খবর পেয়েই তিনি চলে এলেন কলকাতায়। মাদ্রাজের সঙ্গে পুরোপুরি সংশ্রব ত্যাগ করে এখানে মধুসূদনের সংসার নতুন ভাবে পাতা হলো।

পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার এখনো পাননি মধুসূদন। পিতার কলকাতার বাড়ি, সুন্দরবনের লাট এবং সাগরদাঁড়ির বংশানুক্রমিক গৃহ, সবই এখন আত্মীয়-জ্ঞাতিদের দখলে। তারা মধুসূদনকে বিরাটভাবে মামলায় জড়িয়েছে, মামলা চালাতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং সেজন্য মধুসূদনকে ঋণ করে যেতে হচ্ছে দু' হাতে। শেষ পর্যন্ত পিতৃ-সম্পত্তি যদি উদ্ধার করা না যায়, তাহলে মধুসূদনকে অগাধ সলিলে ডুবে যেতে হবে!

পুলিশ আদালতে সামান্য দ্বিভাষিকের কাজ করে যে জীবন কাটানো যাবে না তা বুঝেছেন মধুসূদন। তিনি আইন শিক্ষা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখেছেন, ইংরেজি জানা আইনজীবীদের প্রচুর উপার্জন। আইন শিক্ষা করলে তিনিও চাকুরি ছেড়ে অনায়াসে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ, দু' হাতে অর্থ ছড়াতে না পারলে কলকাতার সমাজে স্থান পাওয়া যায় না। যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করতে না পারলে মধুসূদনের মনেরও স্ফূর্তি হয় না। অভাবে অনটনে তাঁর মন যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন বাড়িতে এসে মধুসূদন কিছুদিনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে, জীবনে শৃঙ্খলা এনে, মন দিয়ে চাকুরি এবং আইন শিক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবসর সময়ে এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত চর্চাও শুরু করলেন তিনি।

গৌরদাস কার্যোপলক্ষে, কলকাতার বাইরে ছিলেন। ফিরেই পরদিন তিনি এলেন মধুসূদনের চিৎপুরের বাড়িতে।

সে বাড়ির অবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত!

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আদালতের এক পেয়াদা। দ্বিতলের এক কক্ষে আঁরিয়েত্তা ক্রন্দন করছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, অন্য এক কক্ষে একটি আরাম কেদারায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন মধুসূদন, কোমরের নিম্নের অংশ কেদারার বাইরে ঝুলছে, ঊর্ধ্বাঙ্গ মোচড়ানো। তবে মধুসূদন যে জেগে আছেন, তার প্রমাণ তাঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট। কক্ষের মেঝেতে গড়াচ্ছে অনেকগুলি বীয়ারের বোতল,

একটি ঝোল মাখা দূষিত তোয়ালে মধুসূদনের কণ্ঠে সংলগ্ন রয়েছে।

গৌরদাস ব্যাকুল ভাবে ডাকলেন, মধু, মধু!

মধুসূদন মুখ ফিরিয়ে গৌরদাসকে দেখলেন। একটুও উত্তেজিত হলেন না। নিরুত্তাপ গলায় বললেন, গৌর! হ্যালো, মাই বয়!

বেলা মাত্র এগারোটা, এই সময় মধুসূদনকে এমন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখবেন, গৌরদাস আশাই করেননি। কাছে এগিয়ে এসে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সুহৃদের বাহু স্পর্শ করে বললেন, এ কী কচ্ছিস, মধু!

মধুসূদন বললেন, একটা ফেবার কত্তে পারবি, গৌর? আস্ক দ্যাট উওম্যান টু স্টপ ক্রাইং! প্লীজ!

গৌরদাস বললেন, কী হয়েচে? আমায় সব খুলে বল! আজ মঙ্গলবার, তুই আদালতে যাবিনি? আমি তো ভেবেচিলুম, তোকে বাড়িতে পাবো না। কোর্টে গিয়েই দ্যাকা কর্বো!

মধুসূদন হুংকার দিয়ে বললেন, তোরা আমায় ভেবেচিস কী? না, যাবো না! আই ওয়াজ নট বর্ণ টু বী দা ড্যামনড্ ইনটারপ্রেটার অব দ্যাট ড্যামনড্ পুলিশ কোর্ট!

অন্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে আঁরিয়েত্তা এই কক্ষের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বরতনুটি পাতলা, ক্ষীণ, অনেকটা যেন আইভি লতার মতন। মুখখানি কান্নায় কান্নায় রক্তিম।

আঁরিয়েত্তাকে দেখেই মধুসূদন এক লম্ফে কেদারা ছেড়ে উঠে পত্নীর সামনে জানু পেতে বসে কাতর কণ্ঠে ইংরেজিতে বললেন, আঁরিয়েৎ, আমার প্রিয়তমে, তুমি অশ্রু বর্ষণ করিও না! তোমায় কাঁদিতে দেখিলে আমার হৃদয় ভাঙিয়া যায়!

গৌরদাস বললেন, মধু, তোর ওয়াইফের সঙ্গে আমায় ইনট্রোডিউস করিয়ে দির্বিনি?

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়! আঁরিয়েৎ, এই গৌর, ইহার কথা তোমাকে বহুবার বলিয়াছি! তুমি ইহাকে চক্ষে না দেখিলেও মনে মনে অবশ্যই চিনিতে পারিবে। এই গৌর, ইহার হাতেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর!

এই বলেই মধুসূদন একটি বীয়ারের বোতল তুলে অতিশয় তৃষ্ণার্তের মতন দীর্ঘ চুমুক দিতে লাগলেন।

গৌরদাস বিনীতভাবে আঁরিয়েত্তাকে অভিবাদন করে বললেন, মহাশয়া, মধু মিথ্যা বলিতেছে। সে সম্প্রতি আমাদের কথার বাধ্য নহে। আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? আপনি শক্ত হউন। আপনি আসিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। আপনি এবার শক্ত হাতে এই দুরন্ত মানুষটির রাশ ধরিবেন।

আঁরিয়েত্তা ধরা ধরা গলায় বললেন, প্রিয় বন্ধু, আমি এই নগরীতে কাহাকেও চিনি না, আমি অসহায়। ইনি কাহারো কথা শ্রবণ করিবেন না। নিজ শরীরের প্রতি অসম্ভব অত্যাচার করিতেছেন। কিছুতেই সংসারের অর্থ সংকুলান হয় না। কী করিয়া কী করিব, জানি না!

গৌরদাস শুষ্ক মুখে বললেন, নিচে একজন পেয়াদা দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। পাওনাদার নাকি?

আঁরিয়েত্তা বললেন, না, আদালত হইতে ডাকিতে আসিয়াছে। উনি যাইবেন না কহিতেছেন!

মধুসূদন ওষ্ঠ থেকে বোতলটি সরিয়ে বললেন, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রাই ইজ

এ ড্যামনড স্লো কোচ, উহার সম্মুখে আমি বকবক করিতে আর কোনোদিন যাইব না।

গৌরদাস বললেন, তুই কোর্টের কাজ ছেড়ে দিবি, মধু? এখন এই অবস্থায় তবে তোর চলবে কী করে? বউকে এর্নিচস!

মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বীয়ারের বোতলটি সক্রোধে ছুঁড়ে মারলেন ঘরের এক কোণে। তারপর বললেন, ও. আমি ঐ কেরানীর কর্ম করিলেই তোরা সুখী হইবি? তোরা দুইজনে তাহাই চাস? ঠিক আছে, তবে চাপরাসিকে দাঁড়াইতে বল, আমি এখনি যাইব।

সামনের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে ঈষৎ টলে গিয়েও মধুসূদন আবার বললেন, হ্যাঁ, যাইব, তোমাদের খুশী করিবার জন্য আমি দাসত্ব করিব!

গৌরদাস বন্ধুকে ধরে ফেলে বললেন, থাক, থাক, আজ থাক। তোর চক্ষু দুটি লাল, মধু, মুখে গন্ধ ভুরভুর কচ্ছে, এই অবস্থায় কোর্টে কেউ যায়? তুই বরং আজ ছুটি নে। একটা চিঠি পাঠিয়ে দে পেয়াদার হাত দিয়ে!

—চিঠি? কে চিঠি লিখিবে? আমি সব কিছু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি মৃত, আমি চলন্ত প্রেতাত্মা!

—দূর পাগল! আচ্ছা, আমি না হয় চিঠি লিকে দিচ্চি, তুই দস্তখৎ করে দে।

নেশার ঘোরে মধুসূদন গৌরদাসকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গণ্ডে এক প্রবল চুম্বন দিয়ে পত্নীর উদ্দেশ্যে বললেন, এই দ্যাখো, আঁরিয়েৎ, আমাদের পরিত্রাতা আসিয়াছে; আর কোনো চিন্তা নাই। সঙ্গে কিছু অর্থ আছে কি গৌর? আর কয়েক বোতল বীয়ার আনয়ন করিলে বেশ হয়! কাঁদিও না, আঁরিয়েৎ, বীয়ার পান করো, সব সমস্যা দূরীভূত হইবে।

আদালতে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে গৌরদাস জোর করে মধুসূদনকে ঠেলে দিলেন স্নানের ঘরে। তারপর দাস-দাসীদের ডেকে ঘর পরিষ্কার করালেন। আঁরিয়েত্তা সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞা এবং স্থানীয় ভাষা না জানায় দাস-দাসীদেরও পরিচালনা করতে পারেন না। গৌরদাস তাদেরও নির্দেশ দিলেন সব রকম।

মধুসূদন ও আঁরিয়েত্তাকে খাদ্য পরিবেশন করা হলো অবিলম্বে। মধুসূদন ছাড়বেন না, গৌরদাসকেও সঙ্গে খেতে হবে। অগত্যা তিনিও খেয়ে নিলেন ওদের সঙ্গে। এরপর দুজনকে ঘুমোতে দেবার জন্য তিনি বিদায় নিতে চান, কিন্তু মধুসূদন গৌরদাসের হাত টেনে ধরে রাখলেন। অনেকদিন পর গৌরদাসের সঙ্গে পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়ে থাকার বাসনা হয়েছে তাঁর।

দুই বন্ধুতে শুয়ে শুয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হলো। নেশা অনেকখানি কেটে গেছে, তবু মধুসূদনের মনখানি নৈরাশ্যে ভরা।

মাদ্রাজ থেকে ফেরবার পর মধুসূদন বাংলা কথা একেবারেই বলতেন না। যেন বাংলা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। ইদানীং ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কিছু কিছু বাংলা বলেন। আদালতে তাঁকে আসামীদের বাংলা কথা শুনেই ইংরেজি অনুবাদ করতে হয়, এমনকি হাকিমের নির্দেশে সাক্ষীদের বাংলায় জেরাও করেন তিনি। তবু বাংলার প্রতি তাঁর অবজ্ঞার ভাব এখনো রয়ে গেছে।

আজ আঁরিয়েত্তাকে দেখে গৌরদাস প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলেন। মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন গৌরদাসকে অনেক উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা দিয়েছিলেন নিজের স্ত্রীর—রেবেকাকে উদ্দেশ করে কবিতাও

লিখেছেন মধুসূদন, সুতরাং বন্ধুর স্ত্রীর সেই ছবিই অঙ্কিত আছে গৌরদাসের মনে।

কথায় কথায় গৌরদাস একবার জিজ্ঞেস করলেন, মধু, সেই রেবেকার কী হলো? আর তাঁর ছেলেমেয়ে?

মধুসূদন বললেন, সেই নীলকর সাহেবের বেটীর কতা তুই ফের আমায় রিমাইন্ড করিয়ে দিসনি! আমায় সে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েচে!

—কিন্তু মধু, আমি তো শুনিচি, ম্যাড্রাসের খৃষ্টানরা অধিকাংশই ক্যাথলিক, ওদের মধ্যে কি ডাইভোর্স হয়?

মধুসূদন গৌরদাসের হাত চেপে ধরে বললেন, গৌর, আই ফরবিড ইউ, রেবেকার প্রসঙ্গ আমার কাচে আর কোনোদিন রেইজ করবিনি! নেভার! দ্যাট চ্যাপটার ইজ ক্লোজড!

—কিন্তু তোর ছেলেমেয়ে? শুনিচি, চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছেল?

—গৌর, গৌর! প্লীজ! ও কথা থাক্! কেন তুই আমার মনে দুঃখ দিতে চাস? ওদের কতা...আই ওয়ন্ট টু ফরগেট কমপ্লিটলি, আই ওয়ন্ট টু ইরেইজ ফ্রম মাই মেমারি...আঁরিয়েৎ-কে তোর পছন্দ হয়নি? শী ইজ এ ডিয়ার...তুই যতই...দ্য মোর ইউ গেট টু নো হার...

—হেনরিয়েটা সত্যই বড় কোমল ও কমনীয়া।

—হেনরিয়াটা নয়, আঁরিয়েত্তা! শী ইজ এ ফ্রেঞ্চ উওম্যান...রিয়েল ফ্রেঞ্চ, ইউরেশিয়ান নয়।

—তুই একটা কান্ড দেকালি বটে মধু! একেবারে ফ্রেঞ্চ! এ দেশে অনেকের অনেক রকম কান্ডের কথা শুনিচি, কিন্তু আর কোনো নেটিভ কোনো ইউরোপিয়ান লেডিকে বিয়ে করেচে বলে শুনিনি! তুই-ই বোধহয় এদেশে প্রথম।

—গৌর, আরও অনেক বিষয়ে আমার এ দেশে প্রথম হবার কতা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমি নেটিভ কোর্টে মুহুরিগিরি করচি! আই উইল ডাই, অ্যাজ এ কমন ম্যান!

—অমন কতা কেন বলচিস! তোর অনেক কিচু এখনো বাকি। তোর প্রতি আমাদের কত আশা। তুই নাকি প্যারীচাঁদ মিত্তিরকে বলিচিলি, তুই বাংলায় লিখে ওনাদেরকে টক্কর দিবি?

—আরে দূর দূর!

—বলিসনি অমন কতা?

—আমি মচ্চি টাকার চিন্তায়, ওসব কতা এখন রেকে দে!

—তুই তো এখুন কিচুই লিকিস না, মধু! ইংরেজিও লিকিস না! বাংলায় একবার চেষ্টা করে দ্যাক না—আজকাল কত ভালো ভালো লোক বাংলায় লিকচেন!

—গৌর, আই ওয়ন্ট মানি। দেয়ার মাস্ট বী মোর মানি! দেয়ার মাস্ট বী মোর মানি! আমার বাপের সম্পত্তি আমায় পেতেই হবে!

—সে তো পাবিই একদিন না একদিন! কিশোরীচাঁদবাবু অনেক চেষ্টা কচ্চেন। কিন্তু তা বলে অন্য কাজকম্ম তুই কিচু করবিনি? দ্যাক, রাধানাথ সিকদারও বাংলা ভুলে গেসলেন, কিন্তু তিনি তো এখন দিব্যি বাংলা লিকচেন! তুই-ও ওঁদের মাসিক পত্রিকায় কিচু লেক না!

—গদ্য! হরিবল! ওঁরা ভয়ানক প্রোজেইক মানুষ। কাব্যের ধার কাচ ঘেঁষেন না। আর কী ডিসগাস্টিং বাংলা প্রোজ ওঁরা লেকেন! দু-পাঁচ বাক্য দেকলেই গা জ্বলে যায়। তোরা ঐ গদ্য পড়িস কী করে?

—তুই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেকা পড়ে দ্যাক! সে বড় ঝংকারময়, তেমনই সরস!

—সেও তো গদ্য! আমি গদ্যই পছন্দ করি না, তাও আবার বাংলা? ছোঃ।

—মধু, তুই বাংলাকে এমন হেলাছেদ্দা করিসনি! উচ্চশিক্ষিত, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বাংলা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন!

মধুসূদন অসহিষ্ণুভাবে বালিশে চাপড় মারতে মারতে বললেন, রাইট মী অফ! আমাকে দিয়ে কিচ্ছুটি হবে না! আমি অপদার্থ! আই অ্যাম এ ফেইলিওর! আমার কতা তোরা ভুলে যা!

—কী হচ্চে, মধু? তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

—সরি, আই অ্যাম সরি, গৌর—

—মধু, তোকে একটা কতা বলবো? তুই অ্যাতোদিন পর কলকাতায় এলি, আমি ভেবেচিলুম, সারা শহর তোকে মাতায় করে রাকবে! তুই ছিলি আমাদের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে জুপিটার। কিন্তু তুই নিজেকে এমন ভাবে গুটিয়ে রেকেচিস কেন? কোনো রকমে কোর্টের কাজ চালিয়ে যাচ্চিস, আর সারাক্ষণ বীয়ার খাস!

—আর কী কত্তে হবে?

—সোসাইটিতে তোর একটা স্থান করে নেওয়া দরকার!

—সোসাইটি মানে বড় বড় টাকাওয়ালা লোক। তাদের মধ্যে আমার মতন একটা কোর্টের ক্লার্ক! এ র‍্যাভেন অ্যামংগ দা পীককস? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

—তুই র‍্যাভেন কেন হবি, মধু? তুই কবি!

—আমার গায়ের রংটা দেকচিস না? দাঁড়কাককেও হার মানায়!

মধুসূদন ফস্ করে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুই একটা ট্রাই কর্বি নাকি? দ্যাক না!

গৌরদাস হাত নেড়ে বললেন, না, না, ও জিনিসে আমার ভয় করে! আমার বাব্বা গড়গড়াই ভালো। সে পাট তো তোর বাড়িতে রাকিসনি?

—ওসব ঝঞ্ঝাট কে রাখে! তুই একটা সিগারেট ট্রাই করে দ্যাক না, ভালো লাগবে।

—না রে, মধু, ঐ কাগজ পুরিয়ে তামাক টানা আমার সহ্য হবে না!

বাহুতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বসে গৌরদাস আবার বললেন, শোন মধু, আজকাল শুধু টাকাওলা লোকেরাই সমাজের মাতা নয়। আরও কত রকম সামাজিক কাজ হচ্ছে। কত লোক দিকে দিকে স্কুল খুলচেন। কত সাহস করে বিদ্যেসাগরমশাই বিধবাদের বিয়ে দিচ্চেন। ঠাকুরদের বাড়িতে, সিংহদের বাড়িতে বাংলা থিয়েটার হচ্চে, বিদ্যাচর্চা হচ্চে, আমরা তাতেও তো যোগ দিতে পারি। দ্যাক, ইয়ং বেঙ্গলের দল এই সব কাজে এগিয়ে এসে যোগ দিচ্চেন, কিন্তু আমাদের হিন্দু স্কুলের ব্যাচ, তাদের কারুর কোনো আগ্রহ নেই। আমাদের কিছু কি করা উচিত নয় কো? এক কাজ করবি, মধু?

—কী?

—চল, আজ আমার সঙ্গে যাবি? আজ সন্ধ্যেবেলা বিদ্যেসাগরমশাই এক কায়স্থ বংশের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিচ্চেন। চল, আমরা সেখানে যাই। বেশীর ভাগ লোকই এখুনো বিধবার বিয়ে মানতে চাইচে না, টিটকিরি কাটে, এই সময় বিদ্যেসাগর মশায়ের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত নয়?

মধুসূদন পুরো প্রস্তাবটিকেই একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে দূর, দূর! ও সব হুজুগে ব্যাপারে আমি নেই। বিধবার বিয়ে একটা ব্যাপার তাই

নিয়ে আমায় আবার মাতা ঘামাতে হবে? ছোঃ! গৌর, তুই আমায় এত অর্ডিনারি মনে করিস?

এখনো আইনত সাবালক হয়নি নবীনকুমার, তবু সে বিপুল অর্থ তছনছ করার সুযোগ পেয়ে গেছে। সে এখনও অর্থের মূল্য বোঝে না। অর্থসম্পদ যে মানুষকে উপার্জন করতে হয়, এ জ্ঞানই যেন তার নেই। তার ধারণা, ও জিনিসটি চাইলেই পাওয়া যায়, এবং বরাবরই সে পেয়ে এসেছে।

বিধুশেখরের বিচক্ষণতায় নবীনকুমারের পিতৃ-সম্পত্তি ক্রমশই বর্ধিত হয়েছে এবং অর্থনীতির এক বিচিত্র নিয়মে তা বিনা আয়াসেই এখন এ রকম বর্ধিত হতেই থাকবে। এক হিসেবে অর্থ জিনিসটা নবীনকুমারের কাছে মূল্যহীন, কারণ জল বা বাতাসের মতন চাওয়া মাত্র পাওয়া যায়।

নবীনকুমার এখন প্রায় প্রতিদিনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গী। এ বয়সেই সে অনেক জায়গায় ঘুরে, অনেক ব্যক্তিকে দেখে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রকেই সে তার সবচেয়ে বেশী আদর্শস্থানীয় মনে করেছে এবং মনে মনে তাঁকে বরণ করেছে গুরুর পদে। অন্যান্য ষোড়শ বৎসর বয়স্ক সদ্য যুবকদের মতন সেও দুঃসাহসের অনুরাগী, ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী মানুষ সে আর কারুকে দেখেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে বুঝেছে যে, এ দেশে বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহ দেওয়া কত কঠিন কাজ। সরকারী আইন পাশ হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষই এর ভয়ংকর বিরোধী. এমনকি মুখে যারা সমর্থন জানায়, তারাও অনেকেই কার্য-কালে পশ্চাদপদ হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিধবার বিবাহ হয়ে গেলেও এখনো নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এরই মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র জেদ ধরে আছেন, যদি কোনো বিধবা বালিকা পুনর্বিবাহ চায় এবং তার জন্য উপযুক্ত কোনো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সে বিবাহ দেবেনই। নবীনকুমারেরও সেই একই জেদ। ঈশ্বরচন্দ্র যেমন নিজের অর্থ ব্যয় করেন, সেই রকম নবীনকুমারও প্রত্যেক বিবাহে এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে চলেছেন।

নিজের স্বাক্ষর করার অধিকার জন্মায়নি, তাই নবীনকুমার অর্থের জন্য যখন তখন দাবি জানায় তার জননী বিম্ববতীর কাছে। বিম্ববতী একবারও প্রত্যাখ্যান করেন না। যদিও পরলোকগত রামকমল সিংহের এস্টেটের আয়-ব্যয়ের প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখেন বিধুশেখর, তবু তিনিও নবীনকুমারের এই খেয়ালী-খরচের প্রতিবাদ করেন না।

নবীনকুমারের বদান্যতার সংবাদ রটে গেছে সারা দেশে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই নবীনকুমারের কাছে একাধিক প্রার্থী আসে। প্রথম প্রথম নবীনকুমার প্রত্যেককেই টাকা দিয়ে দিত বিনা বাক্যব্যয়ে। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র তাকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। গুড়ের সন্ধান পেলেই যেমন পিঁপড়ে ছুটে আসে, তেমনি টাকার লোভে অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক কিংবা হা-ঘরে হা-ভাতে বিধবা বিবাহের হুজুগে মেতেছে। অনেক সময় তারা কোনো বিধবা বালিকার সঙ্গে কোনোক্রমে নমো নমো করে বিবাহ সাঙ্গ করার পর দু-দশদিন বাদেই পত্নীকে অসহায় অবস্থায়

ফেলে পালায়। টাকাটি আত্মসাৎ করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার টাকা নেয় কিন্তু বিবাহও করে না! সুতরাং, ঠিকঠাক অনুসন্ধান না করেই অর্থ দান করা কোনো কাজের কথা নয়। অপাত্রে ব্যয় করলে মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এক সকালে রাইমোহন এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো নবীনকুমারের কাছে।

লম্বা শরীরটিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে রাইমোহন বললো, হুজুর, পঞ্চাশ পূর্ণ কত্তে এলুম!

নবীনকুমার বুঝতে পারলো না। সে সকৌতুক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।

রাইমোহনের সঙ্গীটির বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, পরনে মলিন ধুতি ও সাদা মেরজাই, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখখানি চতুষ্কোণ ধরনের। সে একেবারে ঢিপ করে নবীনকুমারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো। ধরা গলায় বললো, হুজুর অতি মহান, অতি বিপদে পড়ে আপনার কাচে এয়িচি, আপনি না তরালে আর কোনো ভরসা নেই।

নিজের চেয়ে দ্বিগুণ বয়েসী একজন লোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও নবীনকুমার বিচলিত হলো না। এই বয়েসেই সে বুঝে গেছে যে, চতুষ্পার্শ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য ও সম্মান পাবার জন্যই সে জন্মেছে।

রাইমোহন তার সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বললো, ইংলিশে বল্, ইংলিশে বল্।

তারপর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বিগলিতভাবে হেসে সে বললো, হুজুর, এ অতি রিফর্মড লোক। ইংলিশ জানে।

লোকটি বললো, মোস্ট নোবল সার, মী এ ভেরী আমবল্ ম্যান, আই প্রে টু ইয়োর বেনাভোলেন্স।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কী?

রাইমোহন বললো, হুজুর, বেধবাদের জন্য এর মনে বড় দুঃখু! ধনুকভাঙা পণ করেছেল যে, বেধবা ছাড়া বে করবে না। ওর বাপ দাদারা ওর ওপর খড়্গহস্ত, তাই আমি বললুম, চ, হুজুরের কাচে চ একটিবার।

নবীনকুমার বললো, বিধবা বিয়ে করবে? বেশ ভালো কতা। পাত্রী কোথায়? ঠিক হয়েচে?

লোকটি বললো, পাত্রী রেডি সার। আমাদের নেবারের ডটার, সার। অ্যাট জয়নগর-মজিলপুর, মাই বার্থ প্লেস, সার!

রাইমোহন বললো, সব কথা শুনলে দুঃখে আপনার বুক ফেটে যাবে, হুজুর। সে মেয়েটির বে হয়েছেল মাত্র তিন বচর বয়েসে, আর মাত্র ছ' মাস যেতে না যেতেই তার কপাল পোড়ে, সে হতভাগী নিজের সোয়ামীকে চিনলোই না!

নবীনকুমার অস্ফুটভাবে বললো, বিধবার বিয়ের চেয়েও বেশী প্রয়োজন বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।

তারপর আবার বললো, বেশ তো, বিদ্যাসাগর মশাইকে বলবো অখন। আজ বিকেলে তোমরাও এসো সেখেনে।

নবীনকুমারের পাশে দাঁড়ানো দুলাল বললো, তিনি মেদিনীপুরে গ্যাচেন। কলকেতায় নেই এখুন।

নবীনকুমার বললো, তা হলে একটু র'সো, তিনি ফিরে আসুন।

রাইমোহন পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে বললো, অপিক্ষে করার আর উপায় নেই, হুজুর। পত্তর ছাপানো হয়ে গ্যাচে। জানাজানি হয়ে গ্যাচে তো, আর অপিক্ষে করলে মেয়ের বাপ ও বেটীকে কাশী পাটিয়ে দেবে!

—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই নেই. এখনূন বিয়ে হবে কী করে?

—সেইজন্যই তো বললনূম, হ্নজনূর, আপনি নিজেই পঞ্চাশ পনূর্ণ করনূন।

—তার মানে?

—গনূণে দেকিচি, এ যাবৎ মোট উনপঞ্চাশটি বেধবার বে হয়েচে এ দেশে। এই বে'টি হলে পঞ্চাশ হবে। কাগজে কাগজে ফলাও করে আপনাদের জয়জয়কার বেরনূবে। সাগর এখেনে নেই, আপনি নিজেই উদয্নগ করে বে'টা দিলে তিনি ফিরে এসে কত খনূশী হবেন!

—পঞ্চাশ পনূর্ণ হবে? তুমি হিসেব করে দেকেচো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খপরের কাগচেই তো হিসেব বেরিয়েছেল ক'দিন আগে!

নবীনকুমারের তরনূণ হৃদয় এই পঞ্চাশ পনূর্ণ হবার সংবাদে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ইদানীং ইংরেজি ফ্যাসানে সিলভার জনূবিলি, গোল্ডেন জনূবিলির কথা প্রায়ই শোনা যায়, এও তো সেই রকমই একটা কিছনূ ব্যাপার! সে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে দেখতে লাগলো নিমন্ত্রণ পত্রটি।

বিবাহ হবে বরাহনগর গ্রামে। বর্ষাকাল, পথঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়, নবীনকুমার নিজে বিবাহবাসরে যেতে পারবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু অননূষ্ঠানের যাতে কোনো ত্রনূটি না হয়, সে জন্য সব বন্দোবস্তের ভার সে অর্পণ করলো রাইমোহনের ওপর। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য হবে না।

এর কয়েকদিন পর রাইমোহনকে ডেকে পাঠালেন বিধনূশেখর। সিংহ বাড়িতে নয়, নিজের ভবনে। চলাফেরার শক্তি আবার আজকাল অনেকখানি কমে গেছে তাঁর, সহজে গৃহ থেকে নির্গত হন না।

বাহির-বাড়ির বসবার কক্ষে আরাম কেদারায় শনূয়ে আছেন বিধনূশেখর, হাতে আলবোলার নল। রাইমোহন এসে বসলো তাঁর সামনে, মাটিতে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে বিধনূশেখর বললেন, তোর হাত-পা বেঁধে, চাবকে পিঠের ছাল-মাংস তুলে দেবো!

রাইমোহন একটনূও চমকিত না হয়ে, বরং ঈষৎ হেসে বললো, ছাল-মাংস আর কোতায় হনূজনূর, আমার শরীরে তো শনূধনূ কয়েকখানা হাড়। মেরে সনূক হবে না!

—তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! ডালকুত্তারা শনূকনো হাড় পছন্দ করে!

—হনূজনূর ডালকুত্তা পনূষেচেন বনূঝি? শনূনিনি তো! তা সে কুত্তাগনূলোর তো শনূনিচি বকরাক্ষসের মতন খিদে. এই ক'খানা হাড়ে কি তাদের খিদে মিটবে?

—নিমকহারাম! আমার ঠেঙে মাস মাস বিশটা করে টাকা পাচ্চিস. আবার আমার সঙ্গেই ফেরেব্বাজি?

—হনূজনূর, আর যাই করি, ঐ নেমকহারামি কখনূনো আমার কাচে পাবেন না। ননূন খাই যার, গনূণ গাই তার!

—তোকে বলিচি ছোট্‌কুর ওপর চোক রাখতে, আর তুই উল্টে তার মাতায় কাঁঠাল ভাঙচিস?

—আপনি নিজেই বলেছেলেন, হনূজনূর, বেধবার বে'তে আপনার আপত্তি নেই. ও ব্যাপারে আপনার মন নরম।

—তা বলে তুই গণ্ডায় গণ্ডায় লোক এনে টাকা-পয়সা একেবারে নয়ছয় করবি! ছোট্‌কু ছেলেমাননূষ, তাকে যা বোঝাবি সে তাই বনূঝবে! কিন্তু আমি কি মরে গেচি! তুই কত করে ভাগ পাচ্চিস এক-একটা কেসে?

—একটা পয়সাও নয়। মা কালীর দিব্যি গেলে বলচি! আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, এখনো আর আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন কী?

—ঐ যে বরানগরের বিয়েটা।

—সে জন্য কম ঝক্কি পোহাতে হয়েচে আমায়? ও বাড়ির ছোট হুজুরকে তুষ্ট করার জন্যেই তো...বেধবা বে'র গোল্ডেন জুবিলি পূর্ণ হলো, কত হৈ-চৈ, বিদ্যেসাগরও খুশী হয়ে নবীনকুমারকে আশীর্বাদ করেচেন।

—তুই বিদ্যেসাগরকে পর্যন্ত ঠকিয়েচিস! অ্যাতখানি স্পর্ধা তোর! সে বামুন কলকেতায় ছেল না, তাই ফেরেব্‌বাজি ধত্তে পারেনি। বরানগরের ওটাকে কি বিয়ে বলে?

রাইমোহন জিহ্বা কেটে, চোখ বিস্ফারিত করে বললো, বিয়ে নয়? আপনি কী বলচেন, হুজুর? কত লোক দেকেচে! দুশো আড়াইশো লোক—নবীনকুমার নিজে যেতে পারেননি কো, কিন্তু দুলাল গেস্‌লো, সে দেকেচে...খাটতে খাটতে আমার জান কালি!

—চোপ!

—আপনি বিশ্বেস কচ্চেন না, হুজুর। সত্যিই ধুমধাম করে বে হয়েচে, কিসের কিরে কেটে বলবো, বলুন?

—হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে! পাত্রী এক বেশ্যার মেয়ে, তার এই নিয়ে কতবার বিয়ে হলো তার ঠিক নেই। আর পাত্র এক নামকরা মাতাল। তোরই বাড়িতে আশ্রিত! এর নাম বিয়ে, না ফূর্তির খর্চা বাগানো? অ্যাঁ?

রাইমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেল। গুণীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। বিধুশেখরের মতন এত বড় গুণী সে দেখেনি আর। এ বৃদ্ধের এক চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি নেই, অন্য চক্ষুটিও নিষ্প্রভ, পা অশক্ত, তবু ঘরে বসে বসে এই বৃদ্ধ অতখানি সংবাদ রাখে? এ যে বিস্ময়কর ক্ষমতা!

সে বিধুশেখরের পা চেপে ধরে বললো, হুজুর, আমার জাত-কুল-মান-জ্ঞান কবেই ঘুচে গ্যাচে! বেশ্যার মেয়ে কিংবা চাঁড়ালের ছেলে আমার কাচে সব সমান। দুঃখী মানুষের জাত নেই। আপনি যা বললেন, ওরা তাই, ওরা জাত ভাঁড়িয়েচে, নাম ভাঁড়িয়েচে, কিন্তু ওরা সত্যি বে করতে চেয়েছেল, তাই আমি ওদের বে দিয়িচি!

—পা ছাড়, হারামজাদা! বেশ্যার মেয়ের আবার বিয়ে কী রে? অমন কত বেশ্যা আর তাদের দালালরাই তো স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকে। তার জন্য তুই পুরুত ডাকিয়ে ধর্ম রসাতলে দিলি? ওফ্‌!

—হুজুর, ওদেরও তো একটু সাধ হয় ভদ্দরলোকেদের মতন ধুমধাম করে, পাঁচজনকে ডেকে, মন্তর পড়ে বে করার!

—আর বলিসনি, শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্চে। তোকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্চিনি, কেন জানিস? এই বিয়ের কতা বেশী জানাজানি হলে বিদ্যেসাগরের মান যাবে। তাকে লোকে আরও বেশী করে টিটকিরি দেবে, তাতে আমাদের ছোট্‌কুও দুঃখ পাবে! সেইজন্যে! নাকে খৎ দে! নাকে খৎ দে।

—দিচ্চি হুজুর।

—ঐ দরজার চৌকাঠ থেকে এই আমার পা পর্যন্ত। পাঁচবার।

বিনা প্রতিবাদে রাইমোহন শুয়ে পড়ে নাক খৎ দিতে লাগলো। বিধুশেখর দেখতে লাগলেন স্থির দৃষ্টিতে। পাঁচবার হবার পর তিনি কঠোরভাবে বললেন, ফের যদি কখনো তোকে আমার ওপর চালাকি কত্তে দেকি, তা হলে তোর

ভবলীলে তখুনি সাংগ হবে! আর একটা কতা! বিধবার বে নিয়ে ঢলাঢলি যথেষ্ট হয়েচে, আর দরকার নেই! তুই ছাড়াও আরও অনেকে ঠকাচ্চে আর ঠকাবে ছোটকুুকে। তুই এবার ওর মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা কর।

—বেধবা বে'র হুজুগ একেব্বারে বন্ধ করে দেবো, হুজুর?

—তুই তা পারবিনি! অতশত দরকার নেই, চলচে চলুক, তুই সুধু ছোট্‌কুর মন অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা কর!

—দেখুন না আমি কত কী পারি আর না পারি!

কয়েকদিনের মধ্যেই এক দারুণ গুজবে সারা শহর ম ম করতে লাগলো। সকলের মুখে ঐ এক কথা, অচিরেই এর নাম হলো, মড়া ফেরার হুজুক।

নদীয়ার রাম শর্মা নামে কে এক পণ্ডিত নাকি গুণে বলেছেন যে, আগামী পনেরোই কার্তিক মড়া ফেরার দিন। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে যে সব মানুষের মৃত্যু হয়েছে তারা সকলেই সশরীরে ফিরে আসবে।

বড় বড় উৎসব উপলক্ষে রাজা-মহারাজারা যেমন কিছু কয়েদীকে খালাস করে দেন, সেই রকমই স্বর্গের এক দেবতার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যমালয় থেকে কিছু অতৃপ্ত আত্মাকে ফেরত পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

তুষার মণ্ডের মতন, এই সব গুজব যত গড়াতে থাকে তত বড় হয়। সকলের মুখে মুখে ঐ এক কথা! ১৫ই কার্তিক রবিবার মড়া ফিরে আসবে। নদীয়ার পণ্ডিত যখন বলেছেন, তখন তো আর মিথ্যে হতে পারে না। অনেক শোক-সন্তপ্ত পরিবার সত্যি সত্যি আশায় আশায় রইলো। যে জননীর সন্তান অকাল-মৃত, কিংবা যে নারীর স্বামী গেছে, এই সংবাদ শোনার পর তাদের আর রাত্রে ঘুম আসে না! তবে কোনো এক রহস্যময় কারণে, পুরুষ মড়ারাই শুধু ফিরে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, মেয়েদের কথা কেউ বলে না। মৃত নারীরা ফিরে আসুক, তা বোধ হয় কেউ চায়ও না।

নবীনকুমার এই গুজবের কথা নিয়ে হাস্য পরিহাস করছিল, এমন সময় রাইমোহন সে ঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বললো, আপনি হাসচেন হুজুর, কিন্তু এদিকে যে লোকে আপনার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুষ্টির তুষ্টি নাশ কচ্চে!

নবীনকুমার দারুণ অবাক হয়ে বললো, সে কি! এর সংগে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সম্পর্ক কি?

—আপনি বুজলেন না? বিদ্যেসাগরের কতায় মেতে যে অ্যাত লোক বেধবা বে কল্লে, এখন মড়া ফিরলে কী হবে?

—তার মানে?

—এক নারীর দুই স্বামী হবে? বেধবা ফের একজনকে বে কল্লে, তারপর আগের স্বামীও ফিরে এলো, তখুন ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে না? ধর্মই বা কোতায় থাকবে? সব নারী অসতী হয়ে যাবে না!

—দূর, অদ্ভুত কতা যত সব! মড়া কখনো ফেরে? শ্মশানে যাকে দাহ করা হয়েচে, সে আবার ফিরতে পারে!

—আপনি বিশ্বেস না কল্লে কী হবে হুজুর, পথেঘাটে লোকে এই কতাই বলচে! ধরুন, যদি মড়া ফিরেই আসে—

—ধরো যদি কখুনো মাসীর গোঁপ গজায়, তা হলে মেসোর কী হবে? এ যে সেই ধারার কতা!

—হুজুর, আপনি পথেঘাটে একটু সাবধানে বেরুবেন। লোকে আপনাকেও বেধবা বে'র একজন মুরুব্বি বলে জানে! কী জানি কেউ যদি রাগের বশে আপনাকে হুট করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে!

বিকেলবেলা নবীনকুমার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত, বিরস মুখে বসে আছেন। পথে কিছু লোক সেদিনই তাঁকে টিটকিরি দিয়েছে। এমন সব গালিগালাজ করেছে যে, তা কানে একেবারে আগুনের মত লাগে। মড়া ফেরার মতন একটা হাস্যকর, ছেলেমানুষী গুজবও যে এত সংখ্যক বয়স্ক মানুষ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারে, তা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

আগামী সপ্তাহেই আর একটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা ছিল, লোক-জনকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়ে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দল বেঁধে লোকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর মুণ্ডপাত করছে বিদ্যাসাগরের।

ঈশ্বরচন্দ্র নিরাশভাবে বললেন, হবে না, এ দেশের কিছু হবে না! এমনিতে সবাই নিষ্কর্মার ঢেঁকি, কিন্তু তুমি কোনো সৎ কর্ম করতে যাও, অমনি বাধা দিতে ছুটে আসবে! অনেকে বলছেন, বিধবা বিবাহের ব্যাপার থেকে আমার নাকি এবার সরে দাঁড়ানো উচিত। লোকে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে তো করবে!

রাজকৃষ্ণবাবু বললেন, আগে দরকার শিক্ষা বিস্তারের। যতদিন সাধারণ মানুষ নিজের ভালো না বুঝবে...

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সেইজন্যই তো আমি ইস্কুল খোলার জন্য গ্রামে গ্রামে দৌড়ে মরছি। কিন্তু তাও বা ক'টি? সমুদ্রের তুলনায় এক গণ্ডূষ জল মাত্র!

উপস্থিত অন্য একজন বললো, এই যে বিধবা বিবাহের একটা উল্টো হাওয়া বইলো, আর লোকে সহজে বিধবা বিবাহ করতে চাইবে না।

আর একজন লোক বললো, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় নিজে গিয়ে গিয়ে বিবাহ দেবেন, তবে লোকে বিধবা বিবাহ করবে, এটাই বা কেমন রকম কথা? এমনভাবে উনি ক'টি বিয়েই বা দিতে পারবেন!

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, আমি সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বিবাহ দিতে পারবো না তা জানি! আমি বেশী দিন বেঁচেও থাকবো না। কিন্তু আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে পরপর অনেকগুলি বিবাহ সংঘটিত হওয়ালে তারপর লোকের ভয় ভেঙে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই বিধবা বিবাহের প্রচলন হবে—এটাই আমি চেয়েছিলাম।

নবীনকুমার বললো, ১৫ই কার্তিকের আর তো বেশী দিন দেরি নেইকো! সে দিনটি কেটে গেলেই লোকে বুজবে যে, ও কতা কত ভুয়ো! একটাও মড়া ফিরবে না!

রাজকৃষ্ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তা বলা যায় না। দু-চারটি মড়া ফিরতেও পারে!

নবীনকুমার বললো, অ্যাঁ?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, তা ঠিক বলেছো, রাজকৃষ্ণ ভায়া। গোছালো গোছালো জায়গায় কিছু ফন্দিবাজ, বুজরুগ প্রাক্তন মড়া সেজে যাবে, দেখো, তাই নিয়ে অনেক শোরগোল হবে। আর সস্তার কাগজওয়ালারা এই সব ঘটনা নিয়ে নাচবে!

নবীনকুমার তখনই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

১৫ই কার্তিক দিনটি এক রবিবার। সেদিন সকাল থেকেই নবীনকুমারের নেতৃত্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তরুণ সদস্যরা ঘুরতে লাগলো কলকাতার পথে। শহরের বহু লোক সেদিন পথে নেমে এসেছে, উৎসুক চোখ মুখ. মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে সমবেত চিৎকার ও হাস্যরোল। কোনো কোনো বাড়ির সামনে 'মড়া ফিরেচে', 'মড়া ফিরেচে' বলেও ধ্বনি উঠলো।

নবীনকুমার তার দলবল নিয়ে অমনি ঢুকে পড়ে সেই বাড়িতে। সঙ্গে আরও চার-ছ'জন পেয়াদা এবং একজন উকিল। সিমুলিয়ার এক বাড়িতে এক মুস্কো জোয়ান এক বিধবা নারীর মৃত পতি সেজে ফিরে এসেছে, নবীনকুমারের উকিল তাকে জেরা করতে শুরু করলো। বেশীক্ষণ লাগলো না, আধ ঘণ্টার জেরার মুখে পড়েই জাল মড়া হঠাৎ এক সময় মুক্তকচ্ছ হয়ে পলায়ন করলো।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে এরকম ন'টি জাল মড়াকে সনাক্ত করা হলো। তাদের মধ্যে তিনজনকে সমর্পণ করা হলো পুলিশের হাতে। তখন দেখা গেল, হুজুগে কলকাতার নাগরিকগণ অনেকে আবার নবীনকুমারকেই সমর্থন করছে। তারা নবীনকুমারের দলটির পিছু পিছু যায়, আর ভুয়ো মড়া দেখলেই দুয়ো দেয়।

১৫ই কার্তিকের রাত নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল. কোনো পুনর্বিবাহিতা নারীরই মৃত প্রথম স্বামী ফিরে এলো না।

এর কয়েকদিন পর নবীনকুমার অসুখে পড়লো।

শীতে শহরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে. কিন্তু এ বৎসর শীত বিলম্বিত। অঘ্রাণ মাস এসে গেল. তবু রোদ্দুরের দাহ কমে না যেন। সেই কারণেই বোধ হয় এক উৎকট উদরাময় ছড়াতে লাগলো পল্লীতে পল্লীতে। এবং টপাটপ মানুষ মরতে লাগলো সেই রোগে।

নবীনকুমারও আক্রান্ত হলো ঐ উদরাময়ে। যা কিছু আহার করে, সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়। আর বমির পরই উদরে অসহ্য যন্ত্রণা। তিনদিনের মধ্যেই যেন নবীনকুমারের দেহ একেবারে মিশে গেল শয্যার সঙ্গে।

কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আনা হয়েছে নবীনকুমারের চিকিৎসার জন্য। সারাদিনের মধ্যে সর্বক্ষণই পালা করে একজন না একজন চিকিৎসক থাকলেন গৃহে। তবু দুশ্চিন্তার শেষ নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে পরিচালনা করবার জন্য বিধুশেখর এসে রইলেন বিম্ববতীর পাশের কক্ষে। বিম্ববতীকে সান্ত্বনা দেওয়াও তাঁর প্রধান কাজ। তিনি ছাড়া আর কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে নবীনকুমার দেখলো, তার শিয়রের পাশে তার বালিকা পত্নী সরোজিনী স্থির হয়ে বসে আছে। দ্বারের কাছে বসে ঢুলছে দুজন দাসী। বাইরে চেয়ারের ওপর উপবিষ্ট মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র।

তৃষ্ণায় কণ্ঠ এমনই শুষ্ক যে. নবীনকুমার কোনো কথা বলতে পারছে না। হাতের ইঙ্গিতে সে জল চাইলো। সরোজিনী অমনি কাচের জার থেকে মিছরি ভেজানো জল ছোট পাথরের গেলাসে ঢেলে এনে দিল স্বামীকে।

সেই জল পান করে নবীনকুমার সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এখুনি বুঝি বমি হবে। জল পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বমি হলো না, পেটের মধ্যে ব্যথাটা অবশ্য চলতেই লাগলো। আরও একটু জল পান করলো নবীনকুমার। বমি হয় হোক,

তবু এই তৃষ্ণা সহ্য করা যায় না।

তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে বললো, সরোজ, তুমি শুয়ে পড়ো। আর কত রাত জাগবে?

সরোজিনী বললো, না, না, আমি ঠিক আছি। আপনি ঘুমোন!

—তুমি কতক্ষণ ঠায় বসে থাকবে? তুমি আমার পাশে শুয়ে পড়ো।

—না, না, আমি ঘুমোবো না। আপনার কষ্ট হচ্চে?

—খুব! পেটে অসহ্য ব্যথা।

—পেটে হাত বুলিয়ে দিই?

সরোজিনী এগিয়ে এসে তার কচি, নরম হাত নবীনকুমারের বুকে-পেটে বুলিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু এ এমনই ব্যথা যে, ওপর থেকে সেবা-যত্ন করলেও তার কোনো হেরফের হয় না। জাগরণের বদলে নিদ্রাই নবীনকুমারের ভালো ছিল। জেগে উঠলেই তৃষ্ণা, তারপর তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য জল পান করলেই এই ব্যথা। এই জন্য নবীনকুমারের আর জাগতেই ইচ্ছে করে না।

এক সময় সে সরোজিনীর হাতটা চেপে ধরে বললো, সরোজ, তোমায় একটা কতা বলবো?

- কী?

—তুমি শুনবে?

—ওমা, আপনার কতা শুনবো না?

—শুধু শোনা নয়। আমি একটা অনুরোধ কর্বো, তুমি রাকবে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো।

- এই তো, আপনার হাত ছুঁয়েই তো রয়িচি। আপনার সব কতা রাকবো—

ব্যথার মধ্যে ঈষৎ হাঁপাতে হাঁপাতে নবীনকুমার বললো, সরোজ, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তুমি সারা জীবন বিধবা হয়ে থেকো না। তুমি আবার বে করো। এই আমার দিব্যি রইলো। আমি যদি মরেই যাই, তা হলে আবার বে কল্লে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে!

কলুটোলার কেশবদের বাড়ির সভা থেকে বেরিয়ে যদুপতি গাঙ্গুলী এবং তার বন্ধু অম্বিকাচরণ সান্যাল পদব্রজে বাড়ি ফিরতে লাগলো। উভয়েই থাকে নিকটস্থ এক পল্লীতে। অম্বিকাচরণ সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে, যদুপতি শিক্ষকতা করে অরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে।

বৃষ্টি পড়ছে অল্প অল্প, পৌষ মাসের অকাল বৃষ্টি, বেশীক্ষণ থাকার সম্ভাবনা কম। এ বৎসর শীত কিছুতেই জাঁকিয়ে পড়লো না, বৃষ্টির মধ্যে ফিনফিনে বাতাসে তবু কিছুটা শীতের ধার আছে, সেই বাতাস ও বৃষ্টিকে উপভোগ করতে করতে দুই বন্ধুতে হাঁটতে লাগলো। দুজনেরই গায়ে র‍্যাপার, অম্বিকাচরণ এক সময় তার র‍্যাপার দিয়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে নিল। রাত্রি বেশী নয়, তবু পথ প্রায় জনশূন্য।

দুই বন্ধুরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু নিছক গ্রন্থপাঠে যেন ঠিক তৃপ্তি হয় না, বুকের মধ্যে একটা আকুতি থেকে যায়। সে আকুতি যে কিসের জন্য, তাও স্পষ্ট নয়। আসলে ভিত টলে গেছে। এতকাল ধরে বোঝানো হয়েছিল যে মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে থাকে, তার নামই ধর্ম। যারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে মত্ত, যারা যারা সাকার কিংবা নিরাকার ঈশ্বরকে অভিভাবক মনে করে, তাঁর উদ্দেশ্যে কাঁদে কিংবা প্রার্থনা জানায়, তারা কখনো একাকী নয়, তাদের জীবনে শূন্যতা নেই। তারা প্রশ্ন করে না, তারা শুধু বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসের মধ্যেই শান্তি। যদুপতি আর অম্বিকাচরণ নতুন কালের শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে বিনা প্রশ্নে কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের ধর্মের নাম যুক্তি। এবং যুক্তির আক্রমণে প্রচলিত কোনো ধর্মই তাদের কাছে টেঁকে না। কিন্তু যুক্তির যত বড় ক্ষমতাই থাক, তা কখনো মানুষের বন্ধু কিংবা সর্বক্ষণের হৃদয়-সঙ্গী হতে পারে না, যুক্তি মানুষকে বড় নিরালা করে দেয়।

শহরের যেখানে যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধির চর্চা হয় এই দুই বন্ধু সেখানে নিয়মিত যায়। এক সময় তারা দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতো। কিন্তু কিছুদিন হলো ব্রাহ্মদের সম্পর্কে এই বন্ধুদ্বয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। হিন্দু ধর্মের আড়ম্বর পরিত্যাগ করার নামে ব্রাহ্মরাও যেন এক নতুন ধরনের আড়ম্বরের প্রচলন করতে চলেছে। যুক্তির বদলে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছে তাঁদের মধ্যে। ইদানীং ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, বিশৃঙ্খলা, তাঁদের মূল আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগে ও অভিমানে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন হিমালয় পাহাড়ে।

যদুপতি ও অম্বিকাচরণ নবীন সিংহের বাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভায় যায়, আবার তরুণ বাগ্মী কেশবের বাড়ির আলোচনা সভাতেও আসে। তবু যেন ঠিক মন ভরে না।

অম্বিকাচরণের স্ত্রী থাকে তাদের দেশের বাড়িতে। ইদানীং শহরে সব দ্রব্যই অগ্নিমূল্য, বেতনের টাকায় সংসার চালনা করা রীতিমতন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতার জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, জীবিকার সন্ধানে দেশের নানান অঞ্চল থেকে মানুষ ধেয়ে আসছে এখানে। জলা জমি ভরাট করে ব্যাঙের ছত্রাকের মতন নিত্য নতুন গজিয়ে উঠছে ঘর-বাড়ি। এই অবস্থায় স্ত্রীকে এনে কলকাতায় সংসার পাতবার ভরসা পাচ্ছে না। সে থাকে একটি মেস বাড়িতে।

যদুপতি বিপত্নীক। দু বৎসর আগে তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আত্মীয়, বন্ধুদের অনেক পীড়াপীড়িতেও সে আর দার পরিগ্রহ করেনি। বিগতা স্ত্রীর স্মৃতি তার মনে প্রবলভাবে জাগরূক। যদুপতির মূল বাড়ি কুষ্ঠিয়ায়, কলকাতাতেও তার পিতা একটি ছোট বসত বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেখানে সে এখন একা থাকে।

ভদ্র গৃহস্থেরা এই শীতের বৃষ্টির রাতে সবাই এর মধ্যে পথ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ঘরে। যে দু-চারজনকে দেখা যায়, তারা প্রায় সবাই ফুর্তিখোর মাতাল। যদিও বেশী মাতাল হয়ে পথের ওপর দৌরাত্ম্য করলে তাদের গ্রেফতার করে কোতোয়ালিতে আটক করার হুকুম জারি হয়েছে। তবু তাতে মদ্যপদের হুটো-পাটি কমেনি কিছুমাত্র। পুলিশের উৎকোচ পাবার আর একটি উপায় হয়েছে শুধু। বারবনিতাদের সঙ্গে খেলেল্লা করতে করতে লম্পটরা সন্ধ্যা-রাত্রি থেকেই রাজপথের ওপর ঘুরে বেড়ায়। আজ অবশ্য তাদের সংখ্যাও কম।

দুজনে কিছুক্ষণ হাঁটলো নিঃশব্দে। আজ একটা গাড়ি নিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু এমন রাত্রে গাড়ি পাওয়াও দুষ্কর। কেরাঞ্চি গাড়িগুলি সন্ধ্যার পরই উধাও হয়ে যায়। পাল্কি-বেহারা এমন বৃষ্টি-বাদল দেখে নিশ্চয়ই কোথাও

গাঁজা টানতে বসে গেছে। পথে গাড়ি-ঘোড়াও দেখা যাচ্ছে না বড় একটা। বৃষ্টি বেশ জোরে আসছে।

যদুপতি হঠাৎ বললো, আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।

অম্বিকাচরণ চমকে উঠে বললো, সে কি কথা? কেন ভাই?

যদুপতি বললো, কেন বেঁচে থাকবো তার একটি, বেশী নয়, একটি মাত্র সুসংগত যুক্তি দেখাতে পারো?

—বাঃ, একটি কেন, অসংখ্য যুক্তি রয়েচে। সবচে বড় যুক্তি তো এই যে বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকারই জন্য!

—তোমার কথাটি একটু ব্যাখ্যা করে বলো ভাই অম্বিকাচরণ!

—এ কী উপনিষদের শ্লোক যে ব্যাখ্যা করতে হবে? এ তো অতি সাধারণ কথা।

—এমন সাধারণ কথার উপর নির্ভর করে, এমন সাধারণ ভাবে আমি বাঁচার ইচ্ছা করি না। এ কি পশুর জীবন যে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রাণ ধারণ করবো?

—তোমার এমন শ্মশান বৈরাগ্য হঠাৎ জাগলো কেন ভাই! একবার তো শ্মশানে গিয়ে নাকাল হয়েছেলে। কয়েকটা ডোম ছোঁড়া তোমায় আচমকা ধাক্কিয়ে জলে ফেলে দিসলো না?

—এর নাম কী শ্মশান বৈরাগ্য? বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা মানে কি নিছক বসুমতীর ভার বৃদ্ধি করা নয়?

—তুমি তোমার স্বর্গতা পত্নীকে নিয়ে আর কোনো নতুন কবিতা রচেছো?

—আমি আর কবিতা লিখি না। কবিতা রচনা করাও অর্থহীন। কবিতা জিনিসটা সম্পূর্ণ একটা যুক্তিহীন ব্যাপার নয়?

—হা-হা-হা—

—তুমি হাসচো, অম্বিকা?

—যদু, তোমার রোগটি বেশ কঠিন মনে হচ্চে। কোনো কবি যদি কখনো কবিতাকে যুক্তিহীন, অর্থহীন বলে, তখন বুঝতে হবে, হি হ্যাজ ক্রসড্ দি বাউণ্ডারি লাইন।

—তুমি আমার প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাচ্চো, ভাই অম্বিকা!

—ঐ দ্যাখো।

—কী?

—ওকে দ্যাখো। ও কেন বেঁচে রয়েচে বা বেঁচে থাকতে চাইছে তা বলতে পারো?

বহুবাজারে পথের মোড়ে এক ইঁটের পাঁজায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লাল শাড়ী পরা যুবতী। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী মনে হয় না। হাতের একটি লাল রুমাল সে ঘুরিয়ে চলেছে, বৃষ্টিতে যে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ সে খেয়াল নেই। এই রাত্রে সে পথের ওপর কী জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তা এক নিমেষ তাকালেই বোঝা যায়।

অম্বিকাচরণ সেদিকে একবার চেয়েই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

যদুপতি বললো, দ্যাখো, নারীকে সব্বাই বলে অবলা। অথচ ওর কোনো ভয় নেই, এমন দুর্যোগের মধ্যে পথের ওপর একলা দাঁড়িয়ে রয়েচে। একেই বলে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচা। বাঁচতে তো হবেই, কেন না, মৃত্যুর পর যে আর কিছু

নেই। তুমি যুক্তির কথা বলছেলে, মৃত্যুর পর সবই যুক্তিহীন।

মেয়েটি ওদের দেখে একটু এগিয়ে এসে বললো, এই!

দুই বন্ধু কর্ণপাত করলো না। তারা যুক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এগোতে লাগলো।

মেয়েটি আবার বললো, এই, আমায় নেবে? নাও না, তোমাদের যেখানে খুশী, যতক্ষণ খুশী, আমায় নাও না।

যদুপতি ধমক দিয়ে বললো, যাঃ! বিরক্ত করিসনি!

মেয়েটি পিছু পিছু আসতে আসতে বললো, দুজনে মিলে নাও! দুটো ট্যাকা দিও!

যদুপতি বললো, যা, যাঃ! বলচি, এখেনে সুবিধে হবে না।

—একটা ট্যাকা দিও, আর জলে ভিজতে পাচ্চিনি! দুজনে আট আনা, আট আনা।

অম্বিকাচরণ একটা আধলা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এই নে, আমাদের পিছু ছাড়!

মেয়েটি এবার রেগে গিয়ে গালাগাল শুরু করলো। আ মর মিনসে, আমায় ভিকিরি পেইচিস? ড্যাকরা, ছুঁচো, আট আনা পয়সা দেবার মুরোদ নেই, আবার কোঁচার পত্তন? আমি কি ঘাটের মড়া? দ্যাক না আমার রাঙ দুখ্যানা, দু ট্যাকার কমে যাই না—

যদুপতি অম্বিকাচরণের হাত ধরে টেনে দ্রুত এগিয়ে গেল।

প্রথমে অম্বিকাচরণের বাসস্থান পড়ে। সে দ্বারের সামনে এসে বললো, এবার তোমায় শুভনিশি জানাই ভাই, যদু। বেঁচে থাকার যুক্তি বিষয়ে চিন্তাটা আজ রাতের জন্য মুলতুবী রেখো। আমাদের স্বর্গগতা বৌঠানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েই বলচি, এবার তোমার আর একটি বিবাহ করার সময় হয়েচে। বিবাহ করলে পুত্র কলত্রে ঘর ভরে গেলে বুঝবে, বেঁচে থাকার আর একটি যুক্তিও রয়েচে!

যদুপতি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, অর্থাৎ?

অম্বিকাচরণ বললো, অর্থাৎ, তখন বুঝবে, অপরের জন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। পত্নীর প্রতি প্রেম, সন্তানের জন্য স্নেহ, এগুলিও তো বেঁচে থাকার উপকরণ।

যদুপতির আর তর্ক করার দিকে মন নেই। সে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। কী ভেবে আবার পিছনে ফিরলো। অম্বিকাচরণের গৃহের সামনে এসে দেখলো, দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সে আর ডাকলো না, চলতে লাগলো উল্টো দিকে।

বহুবাজারের মোড়ে সেই যুবতীটি আবার ইঁটের পাঁজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল ঘোরাচ্ছে। যদুপতি একেবারে তার মুখোমুখি এসে থেমে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে।

যুবতীটির মুখে ছড়িয়ে গেল খুশীর হাস্য। সে বললো, এসচো? নক্‌খী-সোনা আমার, মানিক আমার, এসচো? ভালো করে দ্যাকো, আমি ফ্যালনা নই, রোগা শালিক পক্‌খীটি নই।

যদুপতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তুমি কত রাত এখেনে দাঁড়িয়ে থাকবে?

যুবতীটি বললো, আর ডাঁড়াবো না! তুমি এসচো, আর আমার চিন্তা নেই। তুমি আমায় নেবে। আজ কেউ আমায় নেয়নি গো!

—এসো আমার সঙ্গে।

—আমায় একটা ট্যাকা দিও অন্তত!

—এসো।

যুবতীটিকে নিয়ে যদুপতি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো নিজের গৃহে। দ্বার খুলে দেবার পর বাড়ির ভৃত্যটির প্রায় বাক্‌রহিত হবার মতন অবস্থা। তার বাবুটি অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের, কখনো বাড়িতে ভিখারিণী এলেও তার সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রিবেলা এরকম একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে তার বাবু ফিরবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। স্ত্রীলোকটি কী জাতীয়, তা ভৃত্যটিও বোঝে।

যদুপতি কিছুই গ্রাহ্য করলো না। ভৃত্যকে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিল, তুই দোর লাগিয়ে শুয়ে পড়। তারপর যুবতীকে নিয়ে উঠে এলো দ্বিতলে।

দ্বিতলের এক কক্ষের চৌকাঠে পা দিয়ে যুবতীটি অনুনয়ের সুরে বললো, ওগো, একটা ট্যাকা ঠিক দেবে তো? যদি দুটো ট্যাকা দিতে পারো, তা হলে বড্ড ভালো হয়।

যদুপতি বললো, আমি তোমায় স্বর্ণালঙ্কার দেবো!

সত্যিই সে দেরাজ খুলে দুটি সোনার অঙ্গুরীয় বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, আরও দেবো।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদুপতি একটা গামছা নিয়ে এলো। যুবতীটিকে বললো, অনেক ভিজেচো, মাথা মুচে নাও। তোমার নাম কী?

—আমার একটা নাম বসন্তকুমারী আর একটা নাম ক্ষেমী।

—তোমার খিদে পেয়েচে?

—খুব। তাতে কিচ্চু হবে নাকো। আমি বাড়ি গিয়ে খাবো। আংটি দিলে, একটা ট্যাকা দেবে না?

যদুপতি আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার রাত্রির আহার ঢাকা দেওয়া থাকে। তার নিজের একটুও আহারের বাসনা নেই। সে এক বাটি ক্ষীর নিয়ে ফিরে এসে বললো, বসন্তকুমারী, তুমি এটা খাও, আমি দেখি।

ক্ষেমী বললো, ওমা, এখুন খাবো কী? না, না, এখুন না, আগে তুমি আমায় নাও।

যদুপতি জোর করে ক্ষীরের বাটিটা তুলে দিল তার হাতে। তারপর একটা জলচৌকি দেখিয়ে বললো, তুমি বসো ওটার ওপর।

মেয়েটি হতভম্বের মতন বসলো সেখানে। যদুপতি বসলো তার সামনে মেঝের ওপর। তারপর হাত দুটি জোড় করে বললো, তুমি আমার মা!

ক্ষেমীর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। তার এই ক্ষুদ্র জীবনেই অনেক রকম উন্মাদ দেখেছে, কিন্তু এটি আবার কী রকম?

যদুপতি বললো, শুধু দুটি খেতে পাওয়ার জন্য তুমি বেঁচে রয়েচো, তোমার খাওয়া আমি দেখি। হে জননী, দুটি আহারের জন্য তোমায় পথে দাঁড়াতে হয়?

ক্ষেমী বললো, কী কর্বো, বাড়িতে যে নোক আসে না রোজ। সাধে কি আর রাস্তায় ডাঁড়াই। রাস্তায় ডাঁড়িয়েচিলুম বলেই তো তোমায় পেলুম। হ্যাঁ গা, তুমি মা মা কচ্চো কেন? আমি তোমার মা হতে যাবো কেন, তুমি ভদ্দরনোক!

—তুমি যে মাতৃজাতি! লাজ-লজ্জা-ধর্ম সব বিসর্জন দেবে শুধু দুটি আহারের জন্য? এর চে কি মরণ ভালো নয়? এসো মা, তোমাতে আমাতে দুজনে গঙ্গায়

ঝাঁপ দিয়ে মরি। আমরা সন্তান হয়ে যদি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারি—

—এসব কী বলচো গো! আমার ভয় কচ্চে! আমি মত্তে যাবো কোন্ আহ্লাদে? বাড়িতে যে এক গাদা মুখ হাঁ করে রয়েচে, তাদের গুষ্টির পিণ্ডি কে জোগাবে?

—তোমার রোজগারে আরও লোক খায়?

—তবে তাদের কে খাওয়াবে? ভগবান? এঃ!

—তুমি ওদের জন্যই বেঁচে রয়েচো?

—কে জানে বাবা অত কতা? তুমি আমায় নেবে তো নাও, নইলে আমি বাড়ি যাই। মরণের কতা! তুমি আমায় মেরে ফেলবে নাকি?

—না, মা, আমি তোমায় পুজো করবো।

—শোনো কতা! কেন, আমায় পুজো কর্বে কেন? আমি কি ওলাইচণ্ডী ঠাকুর? অ্যাই যাঃ! কী বলে ফেললুম! নমো, নমো।

—তুমি সব ঠাকুরের চেয়ে বড়। তুমি মা। তোমার পুজো করবো। সন্তানের কাচ থেকে পুজো পেয়েও কি তুমি আর কোনোদিন মান খুইয়ে পথে দাঁড়াবে? এর চে যে ভিক্ষে করাও ভালো।

—কে অমনি অমনি আমায় ভিক্‌কে দেবে? ক'টা আধলাই বা পাবো?

—তুমি মা, তোমার পাপে সন্তানের পাপ, তোমরা যদি এত নীচে নামো, তবে সন্তানরা যে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই পারবে না।

—আমি তোমার কতা কিচুই বুঝচিনি! আমায় তবে বাড়ি যেতে দাও।

যদুপতি ক্ষেমীর পায়ের পাতা দুহাতে চেপে ধরলো।

ক্ষেমী আঁতকে উঠে বললো, ওমা, ওমা, ভদ্দরনোকের ছেলে, আমার পা ধরলে, আমার একেই এত পাপ...ছাড়ো, ছাড়ো।

যদুপতি ব্যাকুলভাবে বললো, আমি শুধু মুখের কথা বলিনি। আমি সত্যিই তোমার পুজো করবো। ফুল-দুর্বো দিয়ে। এতদিন লোকে তোমায় যত অপমান করেচে, সব ধুয়ে যাবে, তুমি আবার মঙ্গলময়ী মা হবে।

ক্ষেমী কেঁদে ফেলে বললো, ওগো, আমরা বড় দুক্‌খী, কেন আরও দাগা দিচ্চো আমায়? সাধ করে কেউ পাপের পথে নামে!

—আবার পুণ্যের পথে উঠে যাও!

—ওগো ছাড়ো, পা ছাড়ো। বেশ, কাল থেকে ভিক্‌কে কর্বো, পা ছাড়ো, আর পাপ বাড়িও না।

যদুপতি কেঁদে ফেলে বললো, তোমার যখন যা দরকার আমার কাচ থেকে চেয়ে নিও, কিন্তু আজ থেকে তুমি মহিয়সী হও! তুমি সন্তানের নিকট আদর্শ হও!

যদুপতির আবেগের স্পর্শে ক্ষেমীও আপ্লুত হয়ে গেল। এবং একসঙ্গে কাঁদতে লাগলো দুজনে।

বেশ কয়েকদিন আত্মীয় বন্ধুদের নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে নবীনকুমার এক সময় আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। তার আর বিপদাশঙ্কা

রইলো না বটে কিন্তু শরীর একেবারে বিছানার সঙ্গে লীন। জন্মের পর থেকে নবীনকুমারের কখনো কোনো গুরুতর পীড়া হয়নি। এই এক অসুখেই সে একেবারে কাহিল।

কয়েকদিন প্রবল জ্বরে সে পুরোপুরি চৈতন্যহীন হয়ে ছিল. জ্ঞান ফেরার পর থেকে সে কানে ঠিক মতন শুনতে পায় না। যারা কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের কণ্ঠস্বরও যেন ভেসে আসে বহু দূর থেকে। নবীনকুমার ভাবে, সে কি তবে বধির হয়ে যাচ্ছে? তার হাত পা সরু কাঠি কাঠি, উঠে বসার শক্তি নেই. সে কি অথর্ব হয়ে থাকবে বাকি জীবন! তার চক্ষে জল আসে। সারাদিন ধরে বারবার ওষুধ পথ্য সেবনে তার মুখ বিস্বাদ. কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

এই রকম ভাবে আরও সপ্তাহাধিক কাল কাটার পর সে কিছুটা শারীরিক শক্তি ফিরে পেল। কিন্তু তার শ্রবণক্ষমতা সেই রকম দুর্বল হয়েই রইল। সারাদিন নানা জন তাকে দেখতে আসে, অনেক রকম প্রশ্ন করে. কিন্তু নবীনকুমার তার কিছুই প্রায় বুঝতে পারে না। বারবার অ্যাঁ? অ্যাঁ? করতে করতে সে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং শয্যার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে গম্ভীর হয়ে থাকে।

এই ব্যাধিতে তার একটি মাত্র লাভ হলো, সে তার দ্বিতীয়া পত্নী সরোজিনীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হলো। সরোজিনী সর্বক্ষণ ছায়ার মতন থাকে তার শিয়রের কাছে। এই বালিকাটির প্রতি নবীনকুমার এতদিন বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। এখন সে দেখলো, সরোজিনী আর বালিকাটি নেই. কবে যেন হঠাৎ সে কিশোরী হয়ে গেছে। তার শরীরে এসেছে লজ্জা, তার বক্ষে উঠেছে ঢেউ। নবীনকুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সরোজিনী নিজের চক্ষু নত করে। অথচ অন্য সময় নবীনকুমার অনুভব করতে পারে যে, সরোজিনী নির্নিমেষে তার দিকেই চেয়ে আছে।

সরোজিনীর কথা একেবারেই শুনতে পায় না নবীনকুমার। সরোজিনী এমনিতে বেশী কথা বলেও না, যা বলে তাও অতি মৃদুস্বরে। একদিন সকালে পিঠে বালিশের ভর দিয়ে আধো-বসা হয়ে নবীনকুমার একটি গ্রন্থ পাঠ করার চেষ্টা করছে, সরোজিনী তাকে কী যেন বললো। নবীনকুমার কিছুই বুঝতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, তোমরা এমন নিচু গলায় কতা কও কেন? আমি এক বর্ণ বুঝতে পারি না। একটু জোরে বলো!

সরোজিনী বললো. মা কালীঘাটে চলে গ্যাচেন, আপনি তখন ঘুমুচ্চিলেন, তাই আপনার সঙ্গে দ্যাকা করে যেতে পারেননি কো।

নবীনকুমার সরোজিনীর ওষ্ঠ নাড়া দেখলো, কিন্তু কোনো কথাই তার কর্ণে প্রবিষ্ট হলো না। সে বললো, আরও কাচে এসো. আরও জোরে বলো! আমি কিচু শুনতে পাচ্চিনি যে!

সরোজিনী কাছে এগিয়ে কথাগুলি পুনর্বার উচ্চারণ করলো। নবীনকুমার এবার কিছু শব্দ শুনতে পেল মাত্র, কিন্তু সে সব শব্দের কোনো মর্ম তার বোধগম্য হলো না।

সে বললো, আরও কাচে এসো। আমার কানে মুক লাগিয়ে বলো!

সরোজিনী চকিতে একবার পিছনের দিকে তাকালো। ঘরে অন্য কেউ নেই, ঘরের বাইরে একজন ভৃত্য বসে আছে, কিন্তু সে শিয়রের এ দিকটা দেখতে পাবে না।

সরোজিনী তার স্বামীর এক কানে ওষ্ঠ স্থাপন করে বেশ জোরে বললো কথাগুলো। এবার নবীনকুমার শুনতে পেল স্পষ্ট। সে খুশী ও বিস্মিত হলো।

সে জিজ্ঞেস করলো, কালীঘাটে, কেন, মা হঠাৎ কালীঘাটে গ্যালেন কেন?

সরোজিনী বললো, বাঃ, কাল রাতে মা আপনাকে সব বললেন না? আপনার অসুকের সময় মা আপনার নামে কালীঘাটে জোড়া পাঁটা মানোত করেচিলেন।

সরোজিনী একটু সরে গিয়েছিল, নবীনকুমার বললো, আবার দূর থেকে বলচো! কানে কানে না বললে আমি শুনতে পাই না। কানে কানে বলো!

কাল রাতে মায়ের সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা নবীনকুমার একটুও বুঝতে পারেনি। সে অবশ্য কালীঘাটে পুজো দেবার ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না। সে বললো, আজ আমায় ভাত খেতে দেবে তো? বড্ড খিদে পেয়েচে! গরম গরম ভাত, এক পলা গাওয়া ঘি, নুন আর আলু সেদ্ধ খাবো। আর মাগুর মাছের ঝোল খাবো!

সরোজিনী বললো, আপনাকে ভাত দেওয়া হবে পরশুদিনকে। সেদিন ভালো তিথি আচে। আজ আপনি ওবেলা কালীঘাটের প্রসাদ খাবেন।

নবীনকুমার তার দুর্বল দক্ষিণ হস্ত দিয়ে সরোজিনীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বললো, বারবার দূরে সরে যাচ্চো কেন? সব কতা আমার কানে কানে বলো।

ভাত দেওয়া হবে না শুনে সে রেগে গিয়ে বললো, দুত্তোরি ছাই তিথির নিকুচি করেচে! আমি ভালো হয়ে গ্যাচি, আমার খিদে পেয়েচে, আমি আজই ভাত খাবো।

সরোজিনী মিনতি করে বললো, লক্ষ্মীটি, অমন কত্তে নেই, কোবরেজ মশাই বলেচেন, পর্শুদিনকে সকালেই আপনাকে ভাত দেওয়া হবে।

—না, আমি আজই ভাত খাবো!

—আজ মায়ের প্রসাদ খাবেন। আপনার নামে মানোত। আজ তো এমনিতেই ভাত খেতে নেই।

—না, আমি ভাত খাবো, আমি ভাত খাবো, আমি গরম ভাত খাবো!

সরোজিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বললো, আপনি কাঁদবেন না, আপনার শরীর খারাপ হবে!

—আমি ভাত খাবো, কোনো কতা শুনতে চাই না, আমায় ভাত এনে দাও!

—কোবরেজ মশাইকে ডাকি?

—আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

সাহেব চিকিৎসকরা তো নিয়মিত দেখছেনই, তাছাড়াও মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র এবং বিশিষ্ট কবিরাজকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থায়ীভাবে এ বাড়িতেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। সংকট উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রটি দুদিন আগে চলে গেছেন, কবিরাজমশাই এখনো রয়েছেন। লোক পাঠিয়ে সরোজিনী কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনলো।

কবিরাজমশাই মধ্যবয়স্ক, রীতিমত বলবান চেহারার সুপুরুষ। জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। দেখলে বেশ সমীহ হয়। তিনি নবীনকুমারের নাড়ি দেখে বললেন, অতি সুলক্ষণ, ভাত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, অতি সুলক্ষণ! নাড়ির গতিও স্বাভাবিক প্রায়! তবে কিনা কালিকার দিনটিতে অমাবস্যা, আর অমাবস্যায় শরীর এমনিই রসস্থ হয়, কালিকার দিনটি বাদ দিয়ে পরশ্ব ভাত দেওয়া যাউক!

নবীনকুমার বললো, আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কবিরাজ সস্নেহে বললেন, আর তো দুটি মাত্র দিন! আজ সিদ্ধ সাবু, কাগজি লেবুর রস দুই ফোঁটা, লবণ একেবারে বাদ।

নবীনকুমার বললো, আঁমি ভাঁত খাঁবো! আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কবিরাজের একপাশে দিবাকর, আর শয্যার শিয়রের কাছে মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে সরোজিনী। দিবাকর বললো, কবরেজ মশাই, আজ অন্তত চাট্টিখানি ভাত দেওয়া যায় না? ছোটবাবু অ্যাত্ত করে চাইচেন।

কবিরাজ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, বাপু, আবার জ্বরজারি এলে তুমি দায়িক হবে?

তারপর নবীনকুমারের দিকে ফিরে কোমল গলায় বললেন, আর তো মোটে দুটি মাত্র দিন। আজ সিদ্ধ সাবু, কালিকার দিনটি ফলমূল।

নবীনকুমার একঘেয়ে গলায় বলে যেতে লাগলো, আঁমি ভাঁত খাঁবো। আঁমি ভাঁত খাঁবো।

সরোজিনী মৃদুস্বরে বললো, উনি কানে শুনতে পাচ্চেন না!

কবিরাজ বললেন, তা তো হবেই, এ ব্যাধিতে পঞ্চেন্দ্রিয় দুর্বল হয়—স্বর্ণ মকরধ্বজ ঠিক মতো সেবন করলে, মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নবীনকুমার প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে বললো, আঁমায় ভাঁত দাঁও! আঁমি ভাঁত খাঁবো, আঁমি ভাঁত খাঁবো!

কেউ আর ভ্রূক্ষেপ করলো না তার আবেদনে। কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও নিষ্ক্রান্ত হলো সে কক্ষ থেকে।

মহাধনী পরিবারের পরম আদরের দুলাল, ষোড়শ বৎসর বয়স্ক নবীনকুমার সামান্য ভাতের জন্য সানুনাসিক সুরে আর্তনাদ করতে লাগলো, কেউ তাকে ভাত এনে দিল না।

দুর্বল শরীরে কান্না বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। দ্বিপ্রহরে দুজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সরোজিনী যখন এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে সাবু খাওয়াতে গেল, সাবু সমেত শ্বেতপাথরের বাটিটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল নবীনকুমার। কিছুতেই সে সাবু খাবে না। একটু পরে তুলসীপাতা ও মধু দিয়ে মাড়াই করা মকরধ্বজ খাওয়াতে এলেও সে ওষুধের খলটি ছুঁড়ে ভেঙে ফেললো। বাল্যকাল থেকেই সে দেখে এসেছে যে, তার মুখের কথাটি খসা মাত্র প্রতিপালিত হয়, দাস-দাসীরা তার প্রত্যেক হুকুম তামিল করার জন্য সদা উন্মুখ, অথচ আজ সে ভাত খেতে চাইলেও কেউ তাকে দেয় না। অন্যের কথা সে শুনতে পায় না, তার নিজের কণ্ঠের জোর নেই, সে অসহায়। ক্ষোভে, বেদনায়, অভিমানে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে রইলো।

বিম্ববতী কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরলেন প্রায় সন্ধ্যার সময়। ফিরেই যেই তিনি শুনলেন যে তাঁর পুত্র সারাদিনে কিছুই আহার করেনি, তিনি অমনি ছুটে এলেন ব্যাকুল ভাবে।

কিন্তু নবীনকুমার তার জননীর সঙ্গেও একটিও বাক্য বিনিময় করলে না। সে সর্বক্ষণ শুয়ে রইলো উপুড় হয়ে, মাকে সে দেখবেও না। সরোজিনী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো, একটিবার পাশ ফেরার জন্য, কোনো সাড়া মিললো না তাতে। বিম্ববতী পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হাজারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ছেলে তাঁর বড় জেদী তিনি জানেন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় এমন জেদ যে অতি মারাত্মক! কিছুতেই কালী-ঘাটের প্রসাদও খাওয়ানো গেল না নবীনকুমারকে। তার মুখে জোর করে গুঁজে দিলেও সে থু থু করে ফেলে দেয়। মা কালীর প্রসাদের এমন অবমাননায় বিম্ববতীর বুক কাঁপতে থাকে অমঙ্গল আশঙ্কায়।

কবিরাজের আবার ডাক পড়ে। কবিরাজও নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। কুপথ্য

খাওয়াবার চেয়ে বিনা পথ্যে রাখাও অনেক ভালো। ভাত দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বিম্ববতী সারাদিন উপবাস করে ছিলেন, রাত্রেও তিনি কিছুই মুখে দিলেন না। নিজ শয্যায় শুয়ে তিনিও চক্ষের জল ফেলতে লাগলেন অনবরত। নবীন-কুমারকে জোর করে ধমক দিয়ে খাওয়াতে পারতেন বোধহয় শুধু একজন। বিধুশেখর। কিন্তু বিধুশেখরের নিজেরই শরীরের এমন অবস্থা যে তাঁকে যখন তখন ডেকে আনানো আর যায় না। কিংবা, কে জানে, নবীনকুমারের জেদ যে-রকম বাড়ছে, তাতে সে আজ বিধুশেখরের কথাও শুনতো কিনা! বিম্ববতীর ভয় হয়, কোনোদিন যদি নবীনকুমার মুখের ওপর বিধুশেখরের কোনো আদেশ অগ্রাহ্য করে? বিধুশেখর কি তা সহ্য করতে পারবেন? সহ্য না করতে পারলে কী রকম হবে তাঁর প্রতিক্রিয়া!

মধ্যরাতে জেগে উঠলো নবীনকুমার। ঘর একেবারে অন্ধকার নয়, এক কোণে একটি সেজবাতি মিটমিট করে জ্বলছে। প্রথমে তার মনে হলো, সে যেন গভীর সমুদ্রে এক ভেলার ওপর ভাসমান। সে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। দুনিয়ায় তার কেউ নেই। তারপর তার চোখ পড়লো কক্ষের চেনা আসবাবগুলির প্রতি। সে আশ্বস্ত হলো '

ঘরের মেঝেতে পালঙ্কের খুব কাছে শয্যা পেতে শুয়ে আছে সরোজিনী। ঘুমের মধ্যে তার কোমল মুখখানি বড় করুণ দেখায়। নবীনকুমার তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না। বস্তুত পৃথিবীর কোনো শব্দই তার কানে আসে না। এই নিস্তব্ধতা তার কাছে দারুণ একটা বোঝার মতন মনে হয়।

নবীনকুমার ডাকলো, সরোজ! সরোজ!

সেই ডাকেই সরোজিনী ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কী হয়েচে? আপনার কষ্ট হচ্চে? মাকে ডাকবো?

নবীনকুমার বললো, সরোজ—আমি যে ক্ষিদের জ্বালায় মরে যাচ্চি। আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্চো?

সরোজিনী চক্ষু মুছতে মুছতে বললো, ওমা, আপনাকে খাওয়াবার জন্য অত সাধাসাধি, মা আপনাকে কত করে বললেন।

—সরোজ, তুমি ভাত রাঁধতে জানো না?

—ওমা, এত রাত্তিরে? এখুন বুঝি কেউ ভাত রাঁধে?

—কী বলচো, শুনতে পাচ্চিনি। কাচে এসে কানে কানে বলো। সরোজ, এখুন তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে, কেউ টের পাবে নাকো। তুমি চুপি চুপি আমার জন্য চাট্টি ভাত ফুটিয়ে এনে দেবে? ভাত আর আলু সেদ্ধ, আর কিচু চাই না।

সরোজিনী স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে কাতর গলায় বললো, আপনার পায়ে পড়ি, আজ নয়। আর তো মোটে মাঝে কালকের দিনটা। তারপর আমি নিজে আপনাকে ভাত রেঁধে দেবো।

—সরোজ, সবাই নিষেধ কচ্চে বলে তুমিও আমার কতা শুনবে না? ভাত খাওয়ার জন্য যে আমাব মনটা আকুলি বিকুলি কচ্চে। দুটি ভাত দাও না আমায়।

—মা গো মা, অমন করে কেউ ভাত চায়? এত রাতে আমি ভাত কোতায় পাবো?

—যাও, রেঁধে নিয়ে এসো। যাও। নইলে আর কোনোদিন আমি তোমার সঙ্গে কতা কবো না।

সরোজিনী সেজবাতিটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দ্বারের বাইরে ঘুমিয়ে আছে একজন দাসী, তাকে ডিঙিয়ে গেল সাবধানে। স্বামীর আদেশ সব সময় পালন করতে হয়। কিন্তু সে যে এক্ষেত্রে একেবারে অসহায়। এ বাড়ির সব রান্না হয় পিছন মহলে নিচের তলায়, সেখানে সরোজিনী গেছে মাত্র দু-তিনবার। সেখানকার ব্যবস্থাপত্র সে কিছুই জানে না। দ্বিতলে ঠাকুরের ভোগ রান্নার জন্য একটি ছোট রান্নাঘর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ দিনই সেটা তালাবন্ধ থাকে। তা ছাড়া, কোথায় ভাঁড়ার ঘর, কোথায় চাল-ডাল পাওয়া যায়, উনুন কীভাবে ধরাতে হয়, সেসব সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই।

খানিকবাদে সে ম্লান মুখে ফিরে এলো।

নবীনকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, চাপিয়েচো? ভাত চাপিয়েচো?

সরোজিনী কাছে এসে বললো, ভোগ রাঁধার ঘরে তালাবন্ধ। নিচ তলায় একলা যেতে আমার ভয় করে।

—সরোজ, তুমি আমায় না খাইয়ে মারতে চাও?

—আপনি সন্দেশ খাবেন?

—নাঃ।

—তা হলে...তা হলে আপনি খিচুড়ি খাবেন?

এবার নবীনকুমার চমকে উঠে বললো, খিচুড়ি? কোতায়? হ্যাঁ, খিচুড়ি খাবো। কোতায় খিচুড়ি পাবে?

—সে আচে। আমি খিচুড়ি আনচি। কেউ যেন জানতে না পারে।

সরোজিনী দেখেছিল জাল দিয়ে ঢাকা আলমারিতে কালীঘাটের প্রসাদ খিচুড়ি আর সন্দেশ আর ফলমূল রাখা আছে। খিচুড়ি আনা হয়েছিল বাড়ির অন্য লোকজনদের জন্য। অনেকেই খায়নি। মায়ের প্রসাদ যেখানে সেখানে ফেলে দিতে নেই বলে রেখে দেওয়া হয়েছে, কাল গঙ্গায় দিয়ে আসা হবে। বাসি হয়ে গেছে, এই খিচুড়ি এখন আর খাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আর চিন্তা করলো না সরোজিনী। তার জেদী পতি দেবতাটি এরকম কিছু না পেলে কিছুতেই শান্ত হবে না যে!

অতি সাবধানে জালের আলমারি খুলে সে এক বাটি খিচুড়ি বার করলো, তারপর আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে চলে এলো।

নবীনকুমার বিছানার ওপর বসে আছে। সরোজিনী ফিরে আসতেই সে ব্যস্ত ভাবে হাত বাড়িয়ে বললো, দাও। তারপর অতিশয় লোভীর মতন, পথের ক্ষুধার্ত কাঙালীদের মতন সে সেই খিচুড়ি খেতে লাগলো।

সরোজিনী একবার ভাবলো, বিছানার ওপর বসে বসে এই সকড়ি জিনিস খেলে পাপ হবে না তো? তারপরই সে ভাবলো, মায়ের প্রসাদ কক্ষনো এঁটো হয় না। আর মায়ের প্রসাদ খেলে কখনো শরীরের ক্ষতি হতে পারে না।

তৃপ্তির সঙ্গে সবটুকু খিচুড়ি আহার করে নবীনকুমার বললো, আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে সরোজ। এবার বলো তো, এর বিনিময়ে তোমাকে আমি কী দিতে পারি?

সরোজিনী বললো, কিচু না। এবার আপনি ঘুমোন, আমি আপনার মাতায় হাত বুইল্যে দিই।

রাত্রির এই ঘটনাটি বাড়ির অন্যান্যদের কাছে গোপন রয়ে গেল এবং পরদিন নবীনকুমার ফল ও মিষ্টি দ্রব্যাদি খেয়ে থাকতে রাজি হওয়ায় বিম্ববতী আবার দ্বিগুণ বিস্মিত হলেন। সত্যিই এ ছেলের মতিগতি বোঝা ভার।

অমাবস্যার পরদিন নবীনকুমার অন্ন গ্রহণ করবে, কঠিন রোগের পর প্রায়

দেড় মাস বাদে সে আবার ভাত মুখে দিচ্ছে। সেই উপলক্ষে কয়েক শত কাঙালী ভোজনেরও আয়োজন করা হলো। বিম্ববতী কাঙালীদের একটি করে মুদ্রাও দান করলেন।

নবীনকুমারের জন্য ভাত রন্ধন করা হলো দ্বিতলের ঠাকুরের ভোগ রান্নার ঘরে। সরোজিনী নিজে উপস্থিত রইলো সেখানে এবং শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিজে সে ভাতের হাঁড়ি নামালো। তারপর নিজের হাতে রূপোর থালায় ভাত বেড়ে এনে দিল নবীনকুমারকে। সেই সঙ্গে গব্য ঘৃত, সিদ্ধ আলু আর মাগুর মাছের ঝোল।

অত ভাত খাবার সাধ নবীনকুমারের, কিন্তু দু-তিন গরাসের পর আর ভাত মুখে রুচলো না। বাড়ির অনেক লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। যেন একটা উৎসব। কিন্তু একটুখানি খাওয়ার পর সে থালা ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। বিম্ববতী হা হা করে উঠলেন। কবিরাজমশাই বললেন, থাক থাক, যথেষ্ট হয়েচে, প্রথম দিন আর বেশী না খাওয়াই ভালো। তবে দেখবেন, আজ যেন দ্বিপ্রহরে নিদ্রা না যায়। জ্বরের পর ভাত-ঘুম অতি ক্ষতিকারক।

এর দু-তিন দিনের মধ্যে নবীনকুমার অনেক সুস্থ হয়ে উঠলো, আহারেও রুচি এলো। তবু তার মুখখানি সব সময় বিরস হয়ে থাকে। সে নিজেই হাঁটা চলা করতে পারে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক দুর্বল, শ্রবণশক্তি অতি ক্ষীণ। এই পৃথিবীর সঙ্গে যেন তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু খাওয়া, শুয়ে থাকা বা মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে বসা, এ ছাড়া যেন তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা কর্ম নেই।

সরোজিনী সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি থাকে এবং যাবতীয় খবরাখবর সরোজিনী মারফৎই নবীনকুমার পায়। আর কেউ তার কানের কাছে চেঁচিয়ে কথা বললে তার ভালো লাগে না। বাবার আমলের বৃদ্ধ খাজাঞ্চি সেনমশাই বদ্ধ কালা, তাঁকে কিছু বলতে গেলে ঐ রকম ভাবে চ্যাঁচাতে হয়। ষোড়শ বর্ষীয় নবীনকুমার নিজেকে ঐ বৃদ্ধের মতন ভাবতে পারে না।

সে সরোজিনীকে একদিন ছাদে বসে বললো, তুমি সব সময় কাজের কতা বলো কেন? অন্য কোনো কতা বলতে পারো না?

সরোজিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, অন্য কতা? কী কতা?

নবীনকুমার বললো, অন্য কিচু ভালো কতা? তুমি গান জানো না?

সরোজিনী লজ্জায় মুখ নিচু করে। দুদিকে মস্তক আন্দোলিত করে বলে, না।

নবীনকুমার বললো, আমি তোমায় গান শিকিয়ে দিচ্চি। তুমি আমার কানে কানে গান শোনাবে। আমি কোনো কিচুই শুনতে পাই না, গানও শুনতে পাই না, এর চে আমার মরণ ভালো। তারপর সে গুন গুন করে গান ধরে।

> সুধাই তোমায় সুধামুখী, ভুলেছ কি আছে মনে
> মনে ভেবে দেখ দেখি কী কথা ছিল দুজনে
> আমায় মন দিবে বলে আগে আমার মন নিলে
> অবশেষে এই করিলে, তুই জানিস আর তোর ধর্ম জানে।

সরোজিনী খুব মন দিয়ে শোনে। তারপর হঠাৎ সে স্বামীর কানে ওষ্ঠ চেপে ধরে গান গাইতে শুরু করে। এই গান নয়, অন্য গান, "ভালোবাসিব বলে ভালোবাসিনে..."।

অনেক দিন পর নবীনকুমারের মুখে হাস্য ফুটে ওঠে। সরোজিনীর সান্নিধ্যের

তাপ, তার উষ্ণ ওষ্ঠ তাকে এক ধরনের অনাস্বাদিতপূর্ব মাদকতা এনে দেয়। সে সরোজিনীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, সরোজ, তুমি এত ভালো গান জানো? তুমি এত সুন্দর?

রোগীকে দেখতে আসা এবং প্রবল অসুস্থ কিংবা আচ্ছন্ন অবস্থার রোগীর সঙ্গে কথা বলে আত্মপরিচয়দানের চেষ্টা, বঙ্গবাসীরা একটি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করে। নবীনকুমারের ব্যাধির সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় দলে দলে লোক আসার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে এ কথাও ছড়িয়ে গেছে যে নবীনকুমার কানে প্রায় শুনতেই পায় না। সুতরাং দর্শনপ্রার্থীরা তার একেবারে নিকটস্থ হয়ে সগর্জনে কথা বলে। নবীনকুমার কারুর কোনো উত্তর দেয় না. বিরক্তিতে মুখ কুঞ্চিত হয়ে থাকে তার। তবু দর্শনার্থীরা নিবৃত্ত হয় না, তারা পরস্পর আলোচনা করে, কোথায় কখন আর কার কার এই প্রকার অসুখ দেখেছে। কবে কোন্ বাড়িতে এই অসুখে মৃত্যু হয়েছে কার। নবীনকুমার বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। তবে এই কাল ব্যাধির নিয়মই এই, একটা কোনো অঙ্গ নিয়ে যায়। তবে হৃৎপিণ্ডের বদলে যে শুধু কান নিয়ে ছেড়েছে, এই তো নবীনকুমারের বড় ভাগ্য।

গণ্যমান্য ব্যক্তি বা বিশিষ্ট আত্মীয়স্বজনদের নিষেধও করা যায় না। নবীন-কুমারের অপছন্দ হলেও তারা আসবেই। অপরাহ্ণেই তাদের আসবার সময়। সেইজন্য এখন সেই সময়টা নবীনকুমার ঘুমের ভান করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। দুলালচন্দ্র থাকে পাহারায়। তাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছে, ঘরে কেউ এলেই সে ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, চুপ, কতা কইবেন না। ছোটবাবু ঘুমুচ্চেন। কোবরেজমশাই বলেচেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙলে খুব ক্ষতি হবে।

এর ফলে ক্রমে ক্রমে দর্শনার্থীর সংখ্যা কমতে লাগলো। রোগী দেখা নয়, রোগীর কাছে নিজেকে দেখা দেওয়াটাই বড় কথা, সেই রোগীই যদি দেখতে না পেল তা হলে আর শুধু শুধু এসে লাভ কী! এখন আর অপরাহ্ণে নবীন-কুমারকে মট্‌কা মেরে শুয়ে থাকতে হয় না। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে এখন সে কিছুটা হাঁটতে পারে। এক একদিন ছাদেও যায়।

একদিন শেষবেলায় দিবাকর এসে নবীনকুমারের কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বললো, ছোটবাবু, নিচে সভার বাবুরা সব এয়েচেন। একবার আপনার সঙ্গে দ্যাকা কত্তে চাচ্চেন, নিয়ে আসবো ওপরে?

নবীনকুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, সভার বাবুরা? কোন্ সভার বাবুরা?

দিবাকর বললো. আজ্ঞে আপনার সভা?

নবীনকুমার ভুরু কুঁচকে বললো, আমার সভা? কিসের সভা?

এবার দিবাকরের বিস্মিত হবার পালা। সে বললো, আজ্ঞে, আপনি যে সভা খুলেছেলেন! ফি হপ্তায় শনিবার শনিবার বাবুরা আসেন। অনেক ভাবের কতা হয়।

নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো. কিসের সভা বলচে রে দুলাল?

দুলালচন্দ্র বললো, আজ্ঞে ঐ আপনার বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

দিবাকর বললো, আপনি একদিন জ্বর বিকারের ঘোরে বলেছেলেন যে আপনি না যেতে পাল্লেও সভার কাজ যেন বন্ধ না থাকে। আপনি মলেও সভার কাজ চলবে। তাই আমি সব বাবুদের খপর দিয়ে আনিয়েচি। আজ শনিবার তো। এয়েচেন আজ দশ-বারো জনা।

দেখা গেল, বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কে যেন নবীনকুমারের আর কোনো আগ্রহই নেই। অথচ তার অসুখের আগের দিন পর্যন্তও এই সভাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। সভার বিবরণী লেখা, আগামী সভার জন্য কার্যসূচী নিরূপণ করা, সভার পক্ষ থেকে ইদানীং যে পত্রিকা বেরুচ্চে তার জন্য রচনা এবং গ্রাহকদের পত্রের উত্তর দেওয়া। এই নিয়েই সময় অতিবাহিত করতো সে।

নবীনকুমার নীরস কণ্ঠে বললো, অত চেঁচিয়ে কতা বলো না, দিবাকর। তোমরা কি আমার কানের পর্দাটাও ফাটিয়ে দিতে চাও?

দিবাকর জিজ্ঞেস করলো, বাবুদের ওপরে আনবো না?

—না!

দিবাকর আর দুলালচন্দ্র পরস্পর বিহ্বল দৃষ্টি বদল করলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পর্কে তাদের ছোটবাবুর হঠাৎ এই নিরাসক্তি যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিবাকর নিষ্ক্রান্ত হলো ঘর থেকে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আর একটি ঘটনা ঘটলো।

আহারাদি সমাপ্ত করে নবীনকুমার নিজের পালঙ্কে শুয়ে আছে। দিবানিদ্রা দূর করার জন্য এই সময় সে গ্রন্থ পাঠ করে। সংস্কৃত কাব্য মুখে মুখে অনুবাদ করে সে সরোজিনীকে শোনায়। সরোজিনী এখনো অন্দরমহল থেকে আসেনি। নবীনকুমার ঘন ঘন দ্বারের দিকে তাকাচ্ছে।

এক সময় সরোজিনী এসে পাঠমগ্ন নবীনকুমারের কানে কানে বললো, দেকুন, দেকুন, কে এয়েচে!

নবীনকুমার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

সে দেখতে পেল, দ্বারের কাছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক কিশোরী দণ্ডায়মান। এক গলা ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না।

নবীনকুমার আবার জিজ্ঞেস করলো, কে?

সরোজিনী বললো, অ কুসোমদিদি, কাচে এসো না। আহা হা, তোমার আবার এত লজ্জা কিসের? চেনো না য্যানো!

কিশোরীটি সে রকম ব্রীড়াবনতামুখী হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো।

সরোজিনী নবীনকুমারকে ছেড়ে সেখানে গিয়ে নিজেই কিশোরীটির মুখ থেকে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে বললো, এই দেকুন, আমার দিদির মিতেনী, আমাদের কুসোমদিদি। মনে নেই, সেই যে আপনাকে একদিন শাড়ী পরা নিয়ে ক্ষেপিয়েছেল?

কুসুমকুমারী তার নীল চক্ষুমণি দুটি নবীনকুমারের মুখের দিকে স্থির রেখে ঝরনা-লহরীর মতন সুমিষ্ট স্বরে বললো, কেমন আচেন মিতেনীর বর? আপনার অসুখ শুনে আপনাকে দেকতে এলুম।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, অ কুসোমদিদি, উনি কানে ভালো শুনতে পাচ্চেন না, কাচে গিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে হবে। ডাক্তার-কোবরেজরা বলেচেন অবশ্য আর কটা দিন পেরুলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আবার আগেকার চেয়ে বেশী কানে শুনতে পাবেন...তোমার কতাগুলোন আমি বরং ওঁর কানে কানে বলে দিচ্চি!

হাত ধরে ধরে সে কুসুমকুমারীকে নিয়ে এলো পালঙ্কের কাছে।

নবীনকুমার ধীর স্বরে বললো, এ মেয়েটি কে, চিনতে পারলুম না তো!

সরোজিনী বললো, আহা-হা, মস্করা হচ্চে, কুসোমদিদিকে চিনতে পারচেন না? সেই যে, আপনাদের থ্যাটারের আগের দিন এয়েছেল। আপনি ওর কাচ ঠেঙে শাড়ী পরে হাঁটার ধরন শিকতে চাইলেন...

নবীনকুমার কুসুমকুমারীর নীল চক্ষু দুটি দেখতে লাগলো। তারপর আপন-মনেই বললো, কই, এ মুখ আগে দেকেচি বলে মনে তো পড়ে না।

কুসুমকুমারীও নবীনকুমারকে দেখছে একদৃষ্টে। নবীনকুমারকে চিনতে তারও যেন কষ্ট হচ্ছে খুব। তার সখী কৃষ্ণভামিনীর স্বামী নবীনকুমারকে সে প্রায় দেখেছিল অতিশয় প্রাণবন্ত, অতিশয় চঞ্চল এক কিশোর, চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল। পরে সরোজিনীর স্বামী হিসেবেও তাকে প্রায় একই রকম দেখেছিল। কিন্তু এ কোন্ নবীনকুমারকে এখন দেখছে সে! শরীরই শুধু কৃশ নয়, চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ। মুখে পাণ্ডুর ছায়া, কণ্ঠস্বর নিষ্প্রাণ।

কুসুমকুমারী বললো, আমার নাম বনজ্যোৎস্না. মনে পড়ে না?

সরোজিনী স্বামীর কানে সেই বার্তা প্রেরণ করবার জন্য ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, কুসোমদিদি বলচে. ওর আর একটা নাম বনজ্যোছ্ছনা! এবার চিনতে পেরেচেন?

নবীনকুমার দুদিকে মস্তক আন্দোলিত করলো।

জলে ভরে গেল কুসুমকুমারীর চক্ষু, নীল মণিদুটি আর দেখা গেল না। একবার বুঝি তার ওষ্ঠাধর সামান্য একটু কাঁপলো, তারপরই সে পিছন ফিরে দৌড় লাগালো, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার শাড়ীর আঁচল।

সরোজিনীও চলে গেল কুসুমকুমারীর পিছু পিছু। নবীনকুমার আবার পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করলো।

সরোজিনী ফিরে এলো বেশ খানিকক্ষণ পর। আফসোসের সুরে বললো, এহ্, ছি, ছি. আপনি এমনধারা ব্যাভার করলেন কুসোমদিদির সঙ্গে? কত কাঁদলো! নিজে থেকে এয়েছেল আপনাকে দেকতে।

নবীনকুমার কথাগুলি ভালো শুনতেও পেল না, ভ্রূক্ষেপও করলো না।

সরোজিনী স্বামীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কর্ণকুহরে বললো, আপনি সত্যি করে বলুন তো, কুসোমদিদিকে সত্যি চিনতে পারেননি?

নবীনকুমার বললো, না। মেয়েটি কে? কাদের বাড়ির যেন বউ মনে হলো। মেয়েটি একলা এয়েচে? ওর স্বামী আসেনি?

—ওর স্বামী যে ঘোর পাগল! আপনি একবার গেস্লেন ওদের বাড়িতে।

—আমি গেস্লাম? কবে?

—আপনার সত্যি মনে নেই!

নবীনকুমারের মুখমণ্ডলে এবার একটু ব্যথার ছাপ পড়লো। সে অস্থিরভাবে বললো, আমার মনে পড়চে না তো আমি কী করবো বলতে পারো? আমি কী মিচে কতা বলচি?

সরোজিনী ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

আরও কয়েকটি ঘটনার পর সকলেই বুঝতে পারলো যে এই কঠিন ব্যাধিতে নবীনকুমারের শ্রবণশক্তিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তার স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। অনেক কিছুই তার মনে পড়ে না, অনেক মানুষকেই সে আর চিনতে পারে না। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কথা তার মনে নেই। যে বিধবা বিবাহের ব্যাপার নিয়ে সে এত মত্ত হয়েছিল, এখন সে ঐ প্রসঙ্গ একবারও উচ্চারণ করে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও বোধহয় তার স্মরণে নেই।

আবার অনেক চিকিৎসক বদ্যি ডেকে আনা হলো। যথারীতি, সকলেরই ভিন্নমত। তবে, সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মতামত মনে হলো এই যে, কোনো ঔষধ প্রয়োগে স্মৃতিশক্তি বা শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিছু সময় দিলে স্বাভাবিকভাবেই ওগুলি আবার ফিরে আসতে পারে। নবীন-কুমারের বয়েস কম, তার জীবনীশক্তিতেই সে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবে। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্যোদ্ধার। এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ উপায় বায়ু পরিবর্তন।

বিম্ববতী তাঁর পুত্রকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চান না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিধুশেখরও উপদেশ দিলেন, কিছুদিনের জন্য নবীনকুমারকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

কোথায় পাঠানো হবে, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা হলো কয়েকদিন। কেউ বললো, বর্ধমান, ওদিককার জল হাওয়া ভালো, ওদিকে সচরাচর ওলাওঠা হয় না। কেউ বললো, কৃষ্ণনগর, অনেকেই সেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যায়। বারানসীর নামও উঠলো। মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত ঐ বারানসী ধাম, সেখানকার তো তুলনাই হয় না। কিন্তু বারানসী বড় দূরের পথ, অতখানি ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, কোনো বিশেষ স্থলে নয়, নবীনকুমারকে ভ্রমণ করানো হবে নদীপথে। শীতকাল সমাসন্ন, এসময় নদীর বাতাস অতিশয় তেজ-বর্ধক। নদীর সজীব মৎস্য আর দু'তীরের গ্রামাঞ্চলের টাট্‌কা তরিতরকারি পরিপাকের পক্ষে অতি উত্তম।

এলাহী বন্দোবস্ত হলো নবীনকুমারের নদী ভ্রমণের। তিনখানি বজরা ও চারখানি পানসী নিয়ে একটি বহর। দাস-দাসী-পাচক-লাঠিয়াল এবং বন্দুকধারী সেপাই-এর দলবল ছাড়াও সঙ্গে নেওয়া হলো একজন কবিরাজ ও একজন অ্যালোপাথ। দিবাকর দুলালচন্দ্রের মতন বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও রইলো। আর নেওয়া হলো সরোজিনীকে। এখন সরোজিনী শুধু নবীনকুমারের স্ত্রী এবং সঙ্গিনীই নয়, বার্তাবাহকও বটে।

নদীপথে পথেই পরিভ্রমণ করা হবে, তবে যদি কখনো জলযাত্রায় ক্লান্তি বোধ হয় তা হলে একটি বিশ্রামের স্থলও নির্দিষ্ট রইলো। কুষ্টিয়ার দিকে সিংহ পরিবারের একটি জমিদারি আছে, সেখানে আছে একটি অতি মনোহর কুঠিবাড়ি। আগে থেকেই স্থলপথে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেখানে, কুঠিবাড়িটি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করে রাখবে।

শুভদিন দেখে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে নিমতলার ঘাট থেকে গঙ্গাবক্ষে শুরু হলো যাত্রা। তখন কেল্লা থেকে মধ্যাহ্নের তোপ দাগা হচ্ছে। যেন নবীনকুমারের সম্মানেই শোনানো হলো সেই তোপধ্বনি।

দু-তিনদিন নবীনকুমার বেশ উৎফুল্ল হয়ে রইলো। শহর ছেড়ে এই প্রথম তার অন্য কোথাও যাত্রা। কাব্য-সাহিত্যের মধ্য থেকে সে বহু স্থানের বর্ণনা পাঠ করেছে। তার দেখতে ইচ্ছে করে সেই সব দেশ। সে সমুদ্র দর্শন করেনি, পাহাড় দেখেনি, অথচ মনশ্চক্ষে সে সমুদ্র ও পাহাড় দেখতে পায়। এবার সে স্বচক্ষে সব দেখবে।

কিন্তু দু-তিনদিন পরেই আবার তার সব উৎসাহ চলে গেল। সে মলিন, বিষণ্ণ মুখে বোটের জানলা দিয়ে নদীর সৈকতের দিকে চেয়ে থাকে। সরোজিনী এসে ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। সরোজিনী জোর করে কথা বলবার জন্য তার হাত

ধরে টানাটানি করে, তবু সে নির্বাক।

গৃহের বাইরে এসে, বিশাল প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নবীনকুমারের আরও মন খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে না। সে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু শুনতে পায় না জল-কল্লোল। আকাশ দিয়ে কত রকম পাখি উড়ে যায়, বজরার কাছেও অনেক পাখি এসে বসে। কিন্তু সে কোনো পাখির ডাক শুনতে পায় না। সে দেখতে পায় মাঝি-মাল্লারা দাঁড়-বৈঠা চালাবার সময় মুখ ঠোঁট নাড়ছে, নিশ্চয়ই ওরা গাইছে কোনো গান কিংবা সমবেত স্বরে দিচ্ছে জোকার। কিন্তু নবীনকুমার শুধু দেখে, শুনতে পায় না কিছু। কোনো গঞ্জের সামনে এসে যখন বজরা থামে, তখন ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে ফেরিওয়ালারা আসে, তারা নবীনকুমারের গবাক্ষের কাছে ডিঙি ভিড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে অনেক কিছু বলে, নবীনকুমারের কিছুই বোধগম্য হয় না। সে বিরক্ত হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ে চিৎপাত হয়ে।

স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে বলে নবীনকুমারের কৌতূহলও কমে গেছে। বরং সরোজিনীই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, ওটা কোন গাছ, এটা কী পাখি, এখানে জলের রঙ দু রকম কেন? নবীনকুমার সংক্ষেপে উত্তর দেয়, জানি না।

স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সরোজিনী প্রায়ই তার কানে ওষ্ঠ ঠেকিয়ে গান শোনায়। তার গলাটি বেশ সুরেলা। উড়িষ্যাবাসী গোপালের যাত্রাগান তার বাপের বাড়িতে প্রায়ই হতো। তাই শুনে শুনে সে কয়েকটি গান তুলেছে। কিন্তু নবীনকুমারের এখন আর গানও ভালো লাগে না। এমনকি সরোজিনীর স্পর্শেও রোমাঞ্চ বোধ করে না সে। সে শব্দবঞ্চিত বলে যেন সব কিছু থেকেই বঞ্চিত।

এইভাবে মাসাধিককাল কেটে যাবার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলো। এই পৃথিবী যেন আবার শব্দময় হয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠলো তার সামনে। খুবই আস্তে আস্তে অবশ্য। নবীনকুমার অনুভব করলো, সমস্ত রকম শব্দ মিলিয়ে এই বিশ্ব-ভুবনে একটা ব্যঞ্জনা আছে। আগে যখন তার স্বাভাবিক শ্রবণ-শক্তি ছিল তখন এ সব চিন্তা তার মস্তিষ্কেই আসেনি। এখন সে টের পেল সব রকম ধ্বনির সমন্বয়ে একটি বিশেষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার মধ্যেই যেন ফুটে ওঠে পরিপূর্ণ জীবনের স্পন্দন।

কোনো অলৌকিক উপায়ে নবীনকুমার একদিনেই শ্রবণ-ক্ষমতা ফিরে পায়নি। একদিন সে চকিতে বুঝলো, মাঝি-মাল্লাদের মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শব্দও বেরুচ্ছে, সে শব্দের মর্ম সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু শব্দগুলি যেন দুলতে দুলতে ভেসে আসছে তার কানে। আর একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে সে যেন শুনতে পেল এক অনৈসর্গিক সংগীত। এ সঙ্গীত নদীর নিজস্ব। ছলাৎ ছল কল কল তার তান। এতদিন সে এ সংগীত শোনেনি। সে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে সে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো। সারারাত না ঘুমিয়ে সে শুনলো সেই জলস্বর।

নানান নদীপথ ঘুরে এখন তাদের বজরার বহর চলেছে পদ্মার ওপর দিয়ে। নবীনকুমারের কাছাকাছি এসে কেউ একটু উচ্চ কণ্ঠে কথা বললেই সে সব বুঝতে পারে। সে তৃষ্ণার্তের মতন বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে সব রকম শব্দ শুনবে বলে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মাথায় পৌষ মাসের হিম পড়ছে বলে নবীনকুমার এক সময় বোটের ছাদ থেকে নেমে এলো নিজের কামরায়। সে দেখলো, একটি গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সরোজিনী গুন-

গুনিয়ে গাইছে, "আমি যে লাজে মরি, মনের কতা কইতে পারি নে, কত লোকে কত কতা বলে, আমি যে সইতে পারি নে।"

নবীনকুমারের সর্বাঙ্গ অকস্মাৎ শিহরিত হলো। সাদা রেশমী শাড়ি পরেছে সরোজিনী। পিঠের ওপর চুল ছড়ানো। সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, তবু তার গানের মর্ম বুঝতে পারছে নবীনকুমার। সে যেন এই প্রথম সরোজিনীর গান শুনলো। কানে কানে গান একদিন দুদিনই ভালো লাগে, তারপর বিরক্তি বোধ হয়। এই তো প্রকৃত গান, যা আনমনা, এ যেন সরোজিনীরই মনের ভাবোচ্ছ্বাস সুর হয়ে বেরিয়ে আসছে।

নবীনকুমার এগিয়ে গিয়ে সরোজিনীর পিঠে হাত দিয়ে বললো, সরোজ, তুমি বড় সুন্দর, মনে হলো যেন তোমায় আমি আগে কখনো দেকিনি।

সরোজিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তার দুই চক্ষু জলে ভরে উঠলো।

নবীনকুমার বললো, এ কি সরোজ, তুমি কাঁদছো?

সরোজিনী বললো, আমার ভয় করে।

—তোমার কিসের ভয়?

—এই যে আপনি মাঝে মাঝে অমন কতা বলেন। আমার ভয় করবে না? আপনি অনেক কতা ভুলে যান। আপনি অনেককে চিনতে পারেন না। আমার মনে হয়, আপনি একদিন আমাকেও চিনতে পারবেন না।

—দূর পাগল! তা হয় নাকি? তোমায় চিনতে পারবো না? যাঃ!

—তবে যে আপনি ঐ কতাটা বললেন?

—কী বললাম?

—আমায় আগে কখনো দ্যাকেননি?

—আরে ও তো অন্যভাবে বলিচি, আগে দেকিনি মানে এমনভাবে দেকিনি। আজ যেন তোমায় নতুন করে এত সুন্দর দেকচি!

সরোজিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, সত্যি সত্যি সত্যি তিন সত্যি করুন যে আমায় কখনো ভুলে যাবেন না?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে সরোজিনীকে বক্ষে টেনে নিল।

সেই রাত্রে ষোড়শ-উত্তীর্ণ সম্প্রতি সপ্তদশবর্ষীয় নবীনকুমার তার দ্বাদশ-বর্ষীয়া সদ্য ঋতুমতী পত্নীকে সর্বাংশে গ্রহণ করলো।

পরদিন প্রভাতে নবীনকুমার বললো, সরোজ, শেষ রাতে আমি একটা ভারি আশ্চর্য মিঠে স্বপ্ন দেকিচি। সেই স্বপ্নের রেশ এখনো মনে লেগে আচে। সরোজ, জীবন কত সুন্দর!
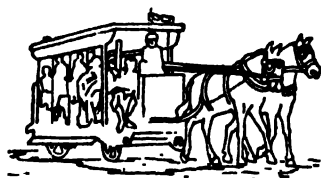
নবীনকুমার যেন এই পৃথিবীকে আবার নতুন ভাবে ফিরে পেয়েছে। বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত এখন তার কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়। শীত শেষ হয়ে গেছে, বাতাস এখন বড় মনোরম।

বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে সে সকালের রেশমী রৌদ্রের স্পর্শে যেন শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে সুখানুভব করে। একটি টিটিভ পক্ষী মাথার ওপর দিয়ে টি-টি-টি-টি করে

ডেকে চলে যায়, অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে সেই শব্দের রেশ। আকাশে শুভ্র-বর্ণ থোকা থোকা মেঘ, মাঝে মাঝে সেই মেঘের নিচ দিয়ে দলবদ্ধ হাঁসের ঝাঁক শান্তভাবে কোনাকুনি উড়ে যায় দিগন্তের দিকে। পদ্মার চরে মধ্যে মধ্যেই দেখা যায় নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে একটি দুটি কুমীর, প্রাণের কোনো চিহ্ন আছে বলেই মনে হয় না, কিন্তু বজরা নিকটবর্তী হলেই তারা সড়াৎ করে নেমে পড়ে জলে।

কুমীর দেখলেই নবীনকুমার তারস্বরে ডাকে, সরোজ, দেকে যাও, দেকে যাও' ছুটে এসো—

সরোজিনী আসবার আগেই কুমীরগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। সরোজিনী অবিশ্বাস করে। সে জীবনে কখনো কুমীর দেখেনি। কুমীর যে ডাঙগায় উঠে বসে থাকে, একথা সে কিছুতেই সত্য বলে মানতে চায় না। নবীনকুমার বলে, তুমি তাকিয়ে থাকো, আবার দেকতে পাবে! কিন্তু সরোজিনীর ভাগ্যে কুম্ভীর-দর্শন ঘটে না। সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়। তারপর হঠাৎ এক সময়ে সে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, ওমা, ওটা কী গো, ওটা কী?

ভয়ে সে নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে।

বস্তুটি নবীনকুমারও দেখেছে কিন্তু সেটি যে কী, তা সে জানে না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার জলের ওপর ভুস্ করে জেগে উঠেই একটি বেশ বড়সড় প্রাণী আবার ডুবে গেল। সেটা যে কোনো মৎস্য নয়, তা অবশ্যই বোঝা যায়।

নবীনকুমার মাল্লাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে। তারা জানায় ঐ প্রাণীটির নাম শুশুক। নবীনকুমার তাও প্রথমে বুঝতে পারে না। তারপর মনে পড়ে। তখন সে বালকের মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, জানি জানি, শুশুক, শিশুমার। বইতে পড়িচি, সরোজ, তুমি পড়োনি তো, তাই জানো না। শুশুক আর শিশুমার একই!

সরোজিনী বললো, বাবাঃ, যেমুন বিদঘুটে দেকতে, তেমুন বিতিকিচ্ছিরি নাম! শিশুমার...ছোট ছেলেপুলে ধরে ধরে বুঝি খেয়ে ফ্যালে?

নবীনকুমার তার বিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবার গম্ভীরভাবে বললো. না গো, নামই ঐ রকম, বইতে ওদের নামে ছড়া আচে!

ঐ দ্যাকো জলকপি শান্ত শিশুমার
হাঙ্গর কুম্ভীরসম নাই দন্তে ধার!

নবীনকুমারকে খুশী করবার জন্যই যেন পরপর আরও কয়েকটি শুশুক নদীর জলে ডিগবাজির কসরৎ দেখায়।

ক্রমে পদ্মা নদী ছেড়ে বজরা একটি ছোট নদীতে প্রবেশ করলো। সামনের কোনো গঞ্জ থেকে তরিতরকারি ও ডাল ক্রয় করতে হবে।

এ নদীর পরিসর ছোট হওয়ায় দু পারের গাছপালা স্পষ্ট দেখা যায়। বসন্ত ঋতুর আগমনে অনেক বৃক্ষে নতুন পাতা গজাচ্ছে। নবীনকুমার মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে দেখে যে বিভিন্ন গাছের পাতার সবুজ রঙও কত ভিন্ন ভিন্ন। কলাগাছের নতুন পাতা লাঠির মতন সোজা হয়ে গোটানো থাকে। এই সব কিছুই নবীনকুমারের কাছে অভিনব। জলের পাশে একপদী বক দেখে তার মনে পড়ে মহাভারতের ধর্ম বকের কথা, যে যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার কূট প্রশ্ন করেছিল। গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বর্ণিত দৃশ্য যেন অকস্মাৎ উঠে আসছে তার চোখের সামনে।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, গোবর দিয়ে নিকোনো ঝকঝকে মাটির কুটীর। ছোট

ছোট ছেলেরা বজরা দেখে দৌড়ে এসে হাত তুলে চিৎকার করে। দূর থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, আমিনা, অ আমিনা, ইদিকে আয় পোড়ারমুহী...। নবীনকুমারের মনে হয়, এ কণ্ঠস্বর যেন তার কত চেনা। বহু যুগ আগে, ঠিক এইখানে নদীতীরে এইরকম ভাবে সে আমিনা ডাক শুনেছিল। পরমুহূর্তেই তার শরীর একটি চিন্তায় কেঁপে ওঠে। যদি তার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়েই থাকতো, তা হলে বঞ্চিত হতো এই সব আনন্দ থেকে। না, সেরকম ভাবে বেঁচে থাকা অনর্থক, তা হলে সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হতো।

আবার এক সময় সে ভাবে, তার এই মারাত্মক ব্যাধিটি এক হিসেবে তার মঙ্গলসাধনই করেছে। ব্যাধি হয়েছিল বলেই তো তার জননী তাকে নদীপথে ভ্রমণে পাঠিয়েছেন। নইলে তো এসব কিছুই এখন দেখা হতো না। এব্যর থেকে সে প্রতি বৎসর একবার নদী ভ্রমণে আসবে।

একটা রঙীন পাখি ঝুপ করে জলে পড়ে যেতেই নবীনকুমার চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা, সরোজ দ্যাকো, দ্যাকো, একটা পাখি জলে ডুবে গেল। মরে গেল আপনা আপনি!

মাঝি মাল্লারা হেসে ওঠে তার কথা শুনে। একজন বলে, আজ্ঞে না, কত্তাবাবু। ও পাখি বড় শেয়ানা, ওগুলোনরে কয় মাছরাঙা পাখি, জল থেকে কুচো মাছ ধইরে খায়।

নবীনকুমারের আবার বিস্ময় লাগে। আকাশের পাখি জলেও ডুব দিতে পারে! সত্যিই তো পাখিটা একটা ছোট চাঁদা মাছ ঠোঁটে নিয়ে আবার উড়ে যায়। সে নির্নিমেষে পাখিটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, সরোজ, কী সুন্দর না?

সরোজিনী বলে, হ্যাঁ। আপনি ওপরে থাকবেন? আমি এখন নাইতে চল্লুম।

—সরোজ, একদিন নদীতে নাইবে? তোমাতে আমাতে।

—মাগো মা, নদীতে নাইবো কি! এত জল দেকলেই আমার ভয় করে।

—জল দেকলে তোমার ভয় হয়? কই এতদিন বলোনি তো?

—বজরার ওপরে ভয় নেই। কিন্তু জলে নামতে পারবো না।

—আমি নদীতে নামবো। আমি সাঁতার শিকবো।

পরমুহূর্তেই সে হাঁক দেয়, দুলাল, দুলাল!

বজরা কিনারে ভিড়ছে, দুলাল আর দিবাকর গঞ্জের হাটে নামবার জন্য গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। ডাক শুনে দুলাল ওপরে উঠে এলো।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দুলাল, তুই সাঁতার জানিস?

দুলাল তো বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, সে আর সাঁতার শিক্ষার সুযোগ পেল কোথায়। সে উত্তর দিল, আজ্ঞে না।

নবীনকুমার বিরক্ত হয়ে বললো, কেন শিকিসনি? তুই একটা উল্লুক।

—আজ্ঞে।

—আমি নদীতে নাইবো, তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবি। সাঁতার জানিস না, আমি যদি ভেসে যাই, তুই আমায় বাঁচাবি কী করে?

—আপনি নদীতে নামবেন? সে হবে না। কত্তামা পই পই করে নিষেধ করে দিয়েচেন, আপনাকে যেন কিছুতেই জলে নামতে না দেওয়া হয়।

—সে কতা পরে। তুই সাঁতার শিকিসনি কেন? আজ থেকেই সাঁতার শিকতে লেগে যা—

—আজ্ঞে দিবাকরদাদাও জলে নামতে বারণ করেচেন।

—তুই কার হুকুমে চলিস, আমার না দিবাকরের? কী বলিচি, মাতায় ঢুকেচে?

আজ থেকে সাঁতার শিকতে লেগে যাবি।

—আজ্ঞে।

কিয়ৎকাল পরে নবীনকুমার বোটের ছাদ থেকে নেমে আসে নিজের কামরায়। এখন তার গ্রন্থপাঠের সময়। নানাপ্রকার চাপল্য দেখালেও নবীনকুমার তার সমবয়সী যুবকদের তুলনায় অনেক বেশী পড়াশুনো করেছে। পাঠ তার নেশা। সে বই পড়ে পালঙ্কে শুয়ে, উপুড় হয়ে।

স্নান সেরে ধৌত বস্ত্র পরে সরোজিনী এলো সে কামরায়। শুষ্ক গামছা দিয়ে সে মাথার ভিজে চুলে ঝাপড় দিতে লাগলো, তাতেও নবীনকুমারের পাঠের মনোযোগ ভঙ্গ হলো না। তারপর সরোজিনী আরশির সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিন্দুর লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাল কী স্বপ্ন দেকেচেন, আমায় বললেন না?

গ্রন্থ সরিয়ে রেখে নবীনকুমার সরোজিনীর সদ্য সিক্ত প্রফুল্ল মুখখানি দেখে মুগ্ধ হলো। বাইরের প্রকৃতির মতন সে এই কিশোরীটিকেও যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করছে।

উঠে বসে সে বললো, সরোজ, কাল স্বপ্নে দেকলুম, আমি যেন স্বর্গে চলে গেচি!

সরোজিনী তৎক্ষণাৎ রাগত ভ্রূভঙ্গী করে বললো, ছিঃ, আবার ঐ কতা?

নবীনকুমার বিস্মিত হয়ে বললো, কেন, কী হলো? স্বর্গে যাওয়া দোষের?

—আপনি বলেচিলেন না, আর কক্ষুনো মরার কতা উচ্চারণ করবেন না!

—ওঃ হো। সেই কতা। না, না, মরার কতা বলিনি। এ হলো গে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া। যেমন যুধিষ্ঠির গিস্‌লেন, না, না, যুধিষ্ঠিরের মতন বুড়ো বয়েসে নয়, পুরূরবার মতন, তুমি মহারাজ পুরূরবার উপাখ্যান জানো? মহাভারতে আচে!

—না, জানি না।

—আমি তোমায় পড়ে শোনাবো। স্বপ্নে দেকলুম, মহারাজ পুরূরবার মতন আমিও স্বর্গে গেচি, দেবসভায় আমার বসবার জায়গা দেওয়া হয়েচে খাতির করে আর সেখেনে উর্বশী নাচচেন, তারপর হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করে উঠলো। দেকলুম কী জানো, উর্বশীর মুখখানা এক্কেবারে অবিকল তোমার মতন।

—যাঃ! সব মিচে কতা।

—মোটেই মিচে কতা নয়। মা কালীর দিব্যি। সত্যি দেকলুম। তুমি আমার পানে চেয়ে হাসলে।

—বুঝিচি, আপনি আমায় নিয়ে রঙ্গ কচ্চেন।

—তুমি বিশ্বাস করলে না, সরোজ? একদম হুবহু মিলে গেল...কালিদাসের নাটক আচে, বিক্রমোর্বশী, ঠিক এই রকম। তুমি এসো, আমার পাশে বসো, আমি তোমায় নাটকটা পড়ে শোনাচ্চি।

—এখুন শুনতে পারবো না। ও-বেলা। এখুন আমার কাজ রয়েচে না?

—এখন আবার কী কাজ?

—নেয়ে এলুম, এখুন পুজোয় বসবো।

—পুজো-টুজো রাকো। শুনেই দ্যাকো না, কী সুন্দর গল্প, কেমন দিব্য কবিতার ভাষা।

—পুজো ছেড়ে আমি গল্প শুনতে বসবো? শোনো কতা! আমার মা বলে দিয়েচেন, প্রত্যেকদিন যেন মন দিয়ে শিব পুজো করি। আমাদের বংশের ধারা।

—কায়েতের মেয়ের আবার অত পুজো বাতিক কেন? শিবের মতন বরই তো পেয়েচো, আবার শিব পুজো করার কী দরকার।

—ঠাকুর দেব্‌তা নিয়ে অমন ধারা কতা বলবেন নাকো!

নবীনকুমার দ্রুত পালঙ্ক থেকে নেমে এসে সরোজিনীকে আলিঙ্গন করে বললো, চেয়ে দ্যাকো, আমি তোমার জ্যান্ত শিব নয়?

সরোজিনী আর্তকণ্ঠে বললো, ওমা, এ কী করলেন, ছুঁয়ে দিলেন! আমায় আবার নাইতে হবে। পুজো করার আগে কারুকেও ছুঁতে নেই।

নবীনকুমার পত্নীর গণ্ডে ওষ্ঠ স্থাপন করে ফিসফিস করে বললো, আবার নেয়ো বরং। এখন একটুখানি আমার পাশে বসো। সরোজ, মানুষ পুজো করে কেন? ভগবানকে পাওয়ার জন্য তো। কাব্য পাঠ করলেও ভগবানকে পাওয়া যায়।

সরোজিনী ছটফটিয়ে বললো, আমায় ছেড়ে দিন।

নবীনকুমার বললো, তুমি বিশ্বাস করলে না! আমাদের শাস্তরেই বলেচে, কাব্যের স্বাদ হলো ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর। অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান সমান। এসো, আমার পাশে একটু বসবে এসো।

সরোজিনী প্রায় ক্রন্দনের উপক্রম করে বললো, পুজোর নাম করে পুজোয় না বসলে পাপ হয়। আপনার মঙ্গলের জন্যই তো পুজো করি। আবার নেয়ে পুজো সেরে আসি, তারপর আপনার কতা শুনবো।

নবীনকুমার তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, বেশ, যাও। কিন্তু ছেড়ে দিচ্চি এক শর্তে। এর পর থেকে আর আমায় আপনি বলবে না, তুমি বলবে।

সরোজিনী চক্ষু প্রায় কপালে তুলে বললো, ও মা, সে কি অসম্ভব কতা! মেয়েমানুষ কখনো স্বামীকে তুমি বলে? স্বামী গুরুজন না?

—ছাই গুরুজন। চাকর-বাকররা সব আপনি বলে, আর তুমিও আপনি বলবে! আজ থেকে হুকুম দিলুম, লোকজনের সামনে না বলো, আমার কাচে যখন একলা থাকবে, তখন শুধু তুমি করে বলবে।

—আমার পাপ হবে না?

—সব পাপ আমার। আমি তোমার শিবের মতন স্বামী, সব পাপ আমি খেয়ে ফেলতে পারি!

সরোজিনী স্নান করতে চলে যাবার পর নবীনকুমার একলাই কালিদাসের নাটকটি খুলে বসলো। কিছুক্ষণ পড়ার পর তার আবার কী খেয়াল হলো, বইটি সমেতই সে উঠে চলে গেল পাশের কামরায়।

সেখানে একটি টেবিলের ওপর দোয়াতদানি ও শকুনির পালকের কলম রাখা আছে। এবং একটি লাল রঙের খেরোর খাতা। দিবাকররা সেই খেরোর খাতায় হিসেবপত্র লেখে। নবীনকুমার একটি টুল টেনে নিয়ে বসে খাতাটি খুলে সাদা পৃষ্ঠা বার করলো। তারপর কালিতে কলম ডুবিয়ে মুক্তাক্ষরে লিখলো: বিক্রমোর্বশী। মহাকবি কালিদাস বিরচিত। শ্রীনবীনকুমার সিংহ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

তারপর সে লিখতে লাগলো চরিত্রলিপি। মনে মনে তখনই সংকল্প করে নিল যে ফিরে গিয়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে এই নাটকের অভিনয় করাবে সে। সে স্বয়ং নেবে পুরুরবার ভূমিকা।

এর পর থেকে চার দিন নবীনকুমারের আর অন্য কোনো বিষয়ে হুঁশ রইলো না। সে একটানা লিখে যেতে লাগলো নাটক। এদিকে দুলালচন্দ্র প্রতিদিন নদীতে নেমে জল দাপিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে শিখতে লাগলো সাঁতার, কিন্তু নবীন-

কুমারের আর সেদিকে একটুও মন নেই। সরোজিনী মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখে, তখনও তার স্বামী জাহাজী লণ্ঠন জেবলে লিখে চলেছে। রাত্রে নোঙর-করা বজরা ঢেউতে দুলছে সামান্য। শোনা যায় জোয়ারের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, এ ছাড়া সর্বদিক নিস্তব্ধ। সরোজিনী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা, আপনি ঘুমুবেন না? শরীর আবার খারাপ হবে যে! নবীনকুমার মুখ তুলে শুধু একবার তাকায়, একটিও কথা বলে না, আবার রচনায় মনোনিবেশ করে। কখনো কখনো বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয় তার ললাট। বজরার বহরে অনেক রকম মানুষই আনা হয়েছে, কিন্তু কোনো সংস্কৃত পণ্ডিত আনা হয়নি। নবীনকুমারের সংস্কৃত জ্ঞান ততটা প্রখর নয়, মাঝে মাঝে দু-একটি সমাসবদ্ধ পদের জটিলতায় সে দিশাহারা হয়ে যায়। তখন সে আন্দাজ মতন কোনো একটা অর্থ বসিয়ে দেয়। ফিরে গিয়ে কোনো পণ্ডিতকে দিয়ে শুধরে নিলেই হবে।

মাঝে মাঝে কোনো নগরে-বন্দরে যখন বজরা থামে, তখন লোক মারফত সমস্ত কুশল সংবাদাদি দিয়ে পত্র পাঠানো হয় বিম্ববতীর কাছে। নির্দিষ্ট কোনো বন্দরে বিম্ববতীর কাছ থেকেও পত্র নিয়ে এসে লোক অপেক্ষা করে থাকে। নবীনকুমারের স্বাস্থ্য ফিরেছে এবং শ্রবণ ও স্মৃতিশক্তিরও পুনরুদ্ধার হয়েছে জেনে বিম্ববতী আনন্দ সাগরে ভাসছেন। গতকালই তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তা হলে আর বিলম্ব করা কেন, এবার তো ফিরলেই হয়। জীবনে এই প্রথম তিনি পুত্রমুখ অদর্শন করে এত দীর্ঘদিন রইলেন। এখন তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া চৈত্র মাস পড়ে গেছে, যে-কোনো সময় কালবৈশাখী ওঠার সম্ভাবনা। এ সময় নদীপথ নিরাপদ নয়।

বজরার বহর এখন ফেরার মুখ ধরেছে। কিন্তু ফিরতে ফিরতে আরও পক্ষকাল তো লাগবেই।

নাটকের অনুবাদটি সম্পূর্ণ করতে নবীনকুমারের মোট এগারো দিন লাগলো। শরীরে একটুও ক্লান্তিবোধ নেই, বরং মনে অদ্ভুত আনন্দ। একটা কাজ শেষ করার তৃপ্তিই অন্যরকম। এর আগে নবীনকুমার ছোটখাটো দু-চার পাতার রচনা লিখেছে, কিন্তু এক সঙ্গে এতখানি লেখেনি। তার আত্মবিশ্বাস হলো, তা হলে সে গ্রন্থকার হতে পারবে।

এতগুলি দিন অনবরত শুয়ে বসে থাকার ফলে তার হাত-পায়ে খানিকটা যেন জড়তা এসেছে। তার ইচ্ছে করলো খানিকটা লাফ ঝাঁপ করতে, তীরে নেমে কিছুক্ষণ দৌড়োতে।

সেদিন অপরাহ্নে সে উঠে এলো বজরার ছাদে। আকাশময় কোদালে মেঘ। হাওয়া দিচ্ছে শন্ শন্ করে, ঝড় উঠতে পারে। দিবাকর চিন্তিতভাবে কথাবার্তা বলছে মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে।

নবীনকুমার চেয়ে দেখলো নদীর দক্ষিণ পাশে এক স্থলে একটি সুন্দর বাঁধানো ঘাট। তার কিছু দূরে একটি ছোট টিলার ওপরে একটি বেশ বড় সাদা রঙের অট্টালিকা, তার চারদিকে নিবিড় গাছপালা।

সে জিজ্ঞেস করলো, এ স্থানটির নাম কী?

দিবাকর বললো, আজ্ঞে, ইব্রাহিমপুর। সামনেই আর কিছুদূরে ময়নাডাঙ্গা, সেখেনে আমরা বজরা ভিড়োবো।

টিলার ওপরে বড় বাড়িটির এক কোণে একটি লোহার চোঙ্, সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জায়গাটি নবীনকুমারের বেশ পছন্দ হলো।

সে বললো, মেঘ উঠেচে, আর সামনে যাবার প্রয়োজন কী? এখানেই বজরা

ভেড়ানো হোক না। আমি একটু হাত পা ছড়াবো।

দিবাকর বললো, আর একটুখন অপিক্ষে করুন। ময়নাডাঙগার আর দেরি নেই। এ জায়গাটে ভালো নয়কো।

—কেন, এ জায়গাটি মন্দ কিসের?

—এখেনে বড় নীলকর সাহেবদের হেঙ্গামা। ঐ যে টিলার ওপর বাড়িটে দেকচেন, ঐটে নীলকুঠি।

—নীলকুঠি রয়েচে বলে কি এ তল্লাটে মানুষজন যেতে পারবে না? এ আবার কেমন ধারা কতা?

—আজ্ঞে, নীলকররা বড় অত্যেচার করে। মানীর মান রাকতে জানে না। এখেনকার লোকজন অনেকে ভয়ে পালিয়েচে।

—কী নাম বললে জায়গাটার? ইব্রাহিমপুর! এখেনে আমাদের জমিদারি আচে না?

—ছিল, সে সব জমি আমরা নীলকরদের ইজারা দিয়ে দিইচি। ওনাদের অত্যেচারে আর রক্ষে করা গেল না। ভালো আখের খেত ছেল, বড়বাবুর আমলে ইব্রাহিমপুর থেকে বিলক্ষণ মোটা টাকা উশুল হতো, সে সব গ্যাচে, রয়েচে শুধু কুঠিবাড়িটি।

—সেখেনে কে থাকে?

—জনাচারেক কর্মচারী রাকা হয়েচে, দেকাশুনো করে।

—বজরা ভেড়াও, আমি সেই কুঠিতে একবার যাবো।

—আজ্ঞে হুজুর, ও কতা উচ্চারণ করবেন না। সাধ করে কেউ নীলকরদের কাচ ঘ্যাঁষে? কতায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা আর নীলকরে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।

—দিবাকর, আমি কখনো নীলকর সাহেব দেকিনি। তারা কি বাঘ-সিংহীর চেয়েও হিংস্র? ইংরেজ এ দেশ শাসন কচ্চে, তা বলে কি লোককে দেশ-ছাড়া করবে? নীলকরদের ভয়ে সবাই পালালে ওদেরই বা কাজ চলবে কী করে? তুমি মিচিমিচি ভয় দেকাচ্চো! বজরা ভেড়াতে বলো, আমি একবার নেমে দেকবো।

দিবাকর হাত জোড় করে কাচুমাচু মুখে বললো. ছোটবাবু, দয়া করে এ হুকুমটে দেবেন না। দয়া করে আমার কতাটা শুনুন। কত্তামা অনেক করে বলে দিয়েচেন. যেখেনে সেখেনে যেন না নামি। মেঘের যা চেহারা, ঝড় উঠতে দেরি আচে, এর মধ্যেই বেলাবেলি আমরা ময়নাডাঙ্গা পোঁচে যাবো। তখুন আপনি ড্যাঙ্গায় নেমে হাত পা ছড়াবেন।

—তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন বলো তো, দিবাকর?

—হুজুর, জায়গাটা অপয়া!

—অপয়া? কিসের অপয়া?

—আপনার বড় দাদা গঙ্গানারায়ণ সিংহ এই জায়গা থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছেলেন।

নবীনকুমার কয়েক পলক একদৃষ্টে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো দিবাকরের মুখের দিকে।

তারপর অত্যন্ত কঠোর কর্কশ কণ্ঠে বললো, দিবাকর, আমি বলচি না বজরা ভেড়াতে? তুমি আমার সঙ্গে ছলিবলি কচ্চো?

ধমক খেয়ে ঘাড় হেঁট করলো দিবাকর। বিড়বিড় করে বললো, কত্তামা আমার ওপর ভার দিয়েছেলেন...আমাকে তিনি যা নয় তাই বলবেন।

—ফের দেরি কচ্চো?

সেই ঘাটেই লাগলো বজরা। একদা মধ্যরাতে এখান থেকেই অদৃশ্য হয়েছিল গঙ্গানারায়ণ। পুরোনো আমলের মাঝিমাল্লা কয়েকজন এখনো রয়েছে এই বজরায়, তারা সেদিনের কথা স্মরণে এনে পরস্পরের প্রতি চেয়ে নীরব হয়ে রইলো।

দুলালকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে নামলো নবীনকুমার। গঙ্গাদাদার কথা আর তেমন-ভাবে মনে পড়ে না। কিন্তু তার মনে পড়লো সম্প্রতি কালের একটি ঘটনা। বিধুশেখরের কন্যা সুহাসিনীর পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিনে সুহাসিনী অকস্মাৎ গঙ্গানারায়ণের প্রসংগ উত্থাপন করে ক্রন্দন করেছিল। সুহাসিনীও তো অনেক বালিকাবস্থাতেই দেখেছে গঙ্গানারায়ণকে। মানুষ চলে যায়, তবু কোথাও কোথাও এমন গভীর ছাপ রেখে যায়।

সুহাসিনী সেদিন গঙ্গানারায়ণের জন্য কেঁদেছিল, সেই কথা মনে পড়ায় নবীনকুমারেরও চক্ষু জ্বালা করে উঠলো। কোনো কথা না বলে সে বসলো পাথর বাঁধানো ঘাটটিতে। তার মনে হলো, যেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের আত্মা অদৃশ্য থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। স্থানটি অদ্ভুত রকমের স্তব্ধ। নীলকরদের কুঠি থেকেও কোনো আওয়াজ আসছে না।

একটু পরে হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। দুলাল ব্যস্ত হয়ে বললো, ছোটবাবু, শিগগির বোটে চলুন, একদম ভিজে যাবেন।

নবীনকুমার কোনো উত্তর দিল না। সে বসে ভিজতে লাগলো বৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ ধরে। কর্মচারীদের শত ডাকাডাকিতেও সে কর্ণপাত করলো না।

কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে যে সেনাবাহিনী, তার নাম বেঙ্গল আর্মি। কোম্পানির এই সেনাবাহিনীর মধ্যে অবশ্য বাঙালী সৈনিকের সংখ্যা অতি নগণ্য। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পেশাদার সিপাহীরা ইংরেজদের অধীনে সুশিক্ষিত হয়ে একই ক্যান্টনমেন্টে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে। এখন ব্রিটেনের রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর একটি অংশও হিন্দুস্তানে নিযুক্ত।

বিনা রক্তপাতে অযোধ্যা রাজ্যের পতন হয়েছে ইংরেজের কাছে, এখন উত্তর ও পূর্ব ভারতে কোথাও কোনো সংঘর্ষ নেই। এখন শান্তির সময়, সিপাহীরা সকালে বিকালে নিয়মমাফিক কুচকাওয়াজ করে ও অন্য সময় জটলা ও হৈ-হল্লায় মেতে থাকে। সৈন্যরা মধ্যে মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয় বলে সারা ভারতবর্ষের সংবাদ মোটামুটি তারাই কিছুটা জানে। তাছাড়া, সম্প্রতি বিলাতের অনুকরণে এ দেশেও কোনো কোনো স্থলে রেল নামে বাষ্পশকট চালু হয়েছে এবং টেলিগ্রাফ নামক এক আশ্চর্য যন্ত্রে তার মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান করা যায়।

ভারতীয় সিপাহীরা নিমকহারাম নয়। তারা কোম্পানির বেতনভুক, সেইজন্য তারা কোম্পানির জন্য প্রাণ দিতেও সর্বদা প্রস্তুত। বহুদিনের সুসম্পর্কের জন্য ঝানু ইংরেজ অফিসাররা ভারতীয় সিপাহীদের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশা করে, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়, তাদের উৎসবেও অংশগ্রহণ করে। আবার বিলাত থেকে সদ্য আগত তরুণ অফিসাররা সেনাবাহিনীতে নতুন রীতি নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী। নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেই অনুযায়ী বাহিনীকেও উপযুক্ত

হয়ে উঠতে হবে। ভারতে ইংরেজ শাসনাধীন এলাকা যত বাড়ছে, সুদৃঢ় ও সুসংঘবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে।

এখন শান্তির সময়, এখন এইসব জল্পনায় অনায়াসেই সময় কাটানো যায়।

একটি ব্যাপার নতুন ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। তারা খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনী দেখায় অভ্যস্ত, আর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে হাজার রকম জাতি ভেদ। একজন রিশালদার পদমর্যাদায় অনেক উচ্চ হয়েও উর্দি পরিধান করে না থাকা অবস্থায় একজন সামান্য লস্করকে দেখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, কারণ লস্করটি ব্রাহ্মণ, রিশালদারটি জাতে গোয়ালা। সেনাবাহিনীতে কখনো এমন চলে? একজন হিন্দু সিপাহী একজন মুসলমান সিপাহীর হুকুম তামিল করতে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু মুসলমান সিপাহী তার খাদ্য একটু স্পর্শ করলেই সে ঘৃণাভরে সম্পূর্ণ খাদ্য ফেলে দেবে। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের একটিই রন্ধনশালা আর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কত রন্ধনশালা, তার ইয়ত্তা নেই। বিরক্ত হয়ে কোনো নতুন রীতির প্রবক্তা ইংরেজ এক এক সময় বলে ওঠে, এর বদলে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়, চীন, এমনকি লাতিন আমেরিকা থেকে খ্রীষ্টানদের ভাড়া করে এনে ভারতীয় সেনাবাহিনী গড়লে হয় না?

কয়েক বৎসর আগে ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ জয় করা হয়েছে। সে-সময় সিপাহীদের এক অংশ ব্রহ্মদেশে যেতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তারা কালাপানি পার হবে না, তাতে তাদের ধর্ম নষ্ট হবে। এ তো বিদ্রোহেরই নামান্তর। লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে এর প্রতিবিধান করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি বিধান জারি করলেন যে, এর পর থেকে নতুন সৈন্য নিয়োগের সময় তাদের যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো পরিবেশে লড়াইতে রাজি হওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

এখন শান্তির সময়, এখন কুচকাওয়াজের শেষে কোনো কোনো ব্রিটিশ অফিসার সিপাহীদের কাছে খ্রীষ্টধর্মের মহিমার কথা সরলভাবে ব্যাখ্যা করে শোনায়। খানা টেবিলে অফিসাররা আলোচনা করে। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা সকলেই তাদের প্রভুর ধর্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্টান হয়েছে। ভারতীয় দাসরাও খ্রীষ্টত্ব গ্রহণ করলেই তো বহু সমস্যার অবসান হয়।

এখন শান্তির সময়, এখন সিপাহীদেরও বিশ্রম্ভালাপের প্রচুর অবকাশ। তাদের কানেও নানারকম কথা আসে। কোথাকার ব্যারাকের ফাটকে হিন্দুর উচ্ছিষ্ট পাত্রে নাকি মুসলমানকে খাদ্য দেওয়া হয়েছে। কানপুরে গোরুর হাড় চূর্ণ করে রুটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে না? নতুন টোটা ব্যবহার করতে হবে খোলসটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে, সেই খোলসটা গোরু ও শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে তৈরি নয়? সিপাহীর বেতন আট টাকা। কিন্তু ব্রিটিশ এলাকার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করলে বাট্টা দেবার কথা আরও চার টাকা। কিন্তু সেই এলাকা জয় হয়ে গেলেই বাট্টা বন্ধ হয়ে যাবে। এ কেমন নিয়ম? সিপাহী প্রাণপণে লড়াই করে নতুন দেশ জয় করবে, আর তার ফলে তার আয় কমে যাবে? বেতনই সিপাহীর নিমক, কিন্তু যে নিমক দেবে তার কেন কথার ঠিক থাকবে না? হালালখোর ইংরাজ শুধু বোঝে নিজের স্বার্থ। পলাশীর যুদ্ধের পর ঠিক একশত বৎসর কাটলো, এর পরও কি সাহেবজাতি এদেশে রাজত্ব করতে পারবে? আরে ভাই, দমদমার ছাউনিতে এই সেদিন কী হয়েছিল শুনিসনি? এক ব্যাটা লস্কর এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর কলসী থেকে পানি ঢেলে নিতে গিয়েছিল, ব্রাহ্মণ ঠিক সময় দেখতে পেয়ে সেই হারামী দুসাদটার মুখে মেরেছে এক লাথ্। সেই লাথ্ খেয়ে সেই নিচা আদমি লস্করটা কী বলেছিল

জানিস? বলেছিল, আর জাতের বড়াই করো না, নতুন টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়বে আর হিন্দু মুসলমান সবার জাত যাবে। সব সিপাহী এক পতিত জাত হয়ে যাবে।

গঙ্গার কূলে, কলকাতা থেকে কিছুটা উজানে, এক অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করে কোম্পানি বাহাদুর এক খুব বড় ক্যান্টনমেণ্ট স্থাপন করেছে। একসঙ্গে অতগুলি সিপাহী ব্যারাক দেখে কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা ঐ স্থানটির নাম দিয়েছে ব্যারাকপুর। দলিলে ডেসপ্যাচে এখন সেই নামটিই চালু। সম্প্রতি অন্যত্র থেকে চৌত্রিশ নং দেশী পদাতিক বাহিনীকে সরিয়ে এনে রাখা হয়েছে সেখানে। মার্চ মাসের শেষের দিকে এক সকালে সেই রেজিমেণ্টের সার্জেণ্ট মেজর হিউসন শুনতে পেলেন প্যারেড গ্রাউণ্ডে কে যেন বীভৎস গলায় চিৎকার করছে। ভুরু কুঁচকে গেল হিউসনের। কিছুদিন থেকেই এই রেজিমেণ্টের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক, এর সিপাহীরা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, শ্বেতাঙ্গ কোনো অফিসার দেখলেই হঠাৎ থেমে যায়। এখন উৎকট গলায় চিৎকার করছে কে?

সার্জেণ্ট মেজর হিউসন ছোটা-হাজরি খেতে খেতে বিরক্ত হলেন। তিনি পাঠালেন তাঁর আর্দালিকে। একটু পরেই, তখনো দূরে চিৎকার বন্ধ হয়নি, আর্দালির সঙ্গে এলো একজন দেশী অফিসার। তার মুখের বার্তা শুনে হিউসন সাহেব তৎক্ষণাৎ খানার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট লেফটেনাণ্ট ব-কে সংবাদ দিতে বলে, চললেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে।

সেখানে জনা কুড়িক সিপাহী নিঃশব্দ এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তাদের নেটিভ অফিসারের নাম ঈশ্বরী পাণ্ডে। সেও অল্প দূরে নিথর। আর একজন মাস্কেটধারী সিপাহী তাদের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় কী যেন বলছে।

হিউসন কঠিন মুখ করে এগিয়ে গেলেন মাস্কেটধারী সিপাহীটির দিকে। সে সাহেবকে দেখেই বড় একটি কামানের পাশে গিয়ে সুবিধেমত জায়গা গ্রহণ করলো এবং চেঁচিয়ে বললো, ভাইয়ো, দাগাবাজ দুশমনকো খতম কর দো। খতম কর দো।

বোঝা যায় অনেকক্ষণ ধরেই চিৎকার করছে সেই সিপাহীটি, তার কণ্ঠস্বর খসখসে, পদক্ষেপ নেশাখোরের মতন। সে অন্য সিপাহীদের বলছে সাহেবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। বাকি সিপাহীরা কেউ এসে তার পাশেও দাঁড়াচ্ছে না আবার তার কথার প্রতিবাদও করছে না।

হিউসন ঈশ্বর পাণ্ডেকে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করলেন, হু ইজ দ্যাট বাগার? হোয়াই ইজ হি শাউটিং?

ঈশ্বর পাণ্ডে সাহেবকে দেখে স্যালুট ঠুকলো না, সে প্রশ্নের কোনো উত্তরও দিল না।

হিউসন আবার বললেন, ক্যাপচার হিম!

কামানের পাশে লুকোনো সিপাহীটির নাম মঙ্গল পাণ্ডে। তার চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কম্পিত হচ্ছে, সে মাস্কেট তুললো হিউসনের দিকে।

তারপর সেই ব্যাপারটি সংঘটিত হলো। ইংরেজের সৈন্য-ব্যারাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন দেশী সিপাহী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে সত্যি সত্যি গুলি চালালো তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের এক প্রতিনিধির দিকে। এ এক অভাবনীয় কাণ্ড!

গুলি হিউসনের গায়ে লাগলো না, তবু আত্মরক্ষার জন্য তিনি দড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে। ভয়ের চেয়ে তাঁর চোখে মুখে গভীর বিস্ময় মাখা। বিশজন সিপাহীর সামনে এক উন্মাদ গুলি ছোঁড়ার সাহস করলো তাঁর দিকে, তবু কেউ বাধা দিল না? দেশী অফিসার তাঁর হুকুম শুনেও অমান্য করলো!

মঙ্গল পাণ্ডে মাস্কেটে আবার গুলি ভরছে, হিউসন তার মধ্যে গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। তার মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হলেন লেফটেনাণ্ট ব। মঙ্গল পাণ্ডে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়লো সেই লেফটেনাণ্টের দিকে। এবারেও সামান্য দিকভ্রষ্ট হলো, লেফটেনাণ্টের গায়ে না লেগে লাগলো ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়া সুদ্ধ লেফটেনাণ্ট ব পড়ে গেলেন মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করলেন তলোয়ার, মঙ্গল পাণ্ডেও তলোয়ার নিয়ে ছুটে এলো। এবং দেশী সিপাহীই প্রথম অস্ত্রাঘাত করলো রাজসৈনিকের ওপর। মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ার দুবার আঘাত হানলো লেফটেনাণ্ট ব-এর মাথায় এবং ঘাড়ে। ততক্ষণে হিউসনও তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে এলেন। চললো তিনজনের লড়াই, এর মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডেই বেশী শক্তিশালী এবং উন্মত্তবৎ। দুপক্ষই চিৎকার করছে যুদ্ধরত অবস্থায়, মঙ্গল পাণ্ডে বলছে, ভাইয়ো, দুশমনকো খতম্ করো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমাদের অস্ত্র কেড়ে নেবে, তার আগে তোমরা কেড়ে নাও। আংরেজের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আর হিউসন-ব চিৎকার করছে, গার্ড, ক্যাপচার হিম্। ডিজার্ম হিম্।

সিপাহীরা এই আবেদন বা আদেশের মধ্যে কোনোটাই শুনলো না। তারা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সাহেব দুজনের ওপরেই তলোয়ারের আঘাত বেশী পড়ছে দেখে সিপাহীদের মধ্যে একজন, শেখ পল্টু এগিয়ে এসে সাহেব দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো, কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডেকে বন্দী করার কোনো চেষ্টাই করলো না। মঙ্গল পাণ্ডে আবার আশ্রয় নিল বড় কামানটির আড়ালে।

ইতিমধ্যে হুড়োহুড়ি করে আরও অনেক ব্রিটিশ অফিসার এসে পড়েছে। প্রবল গোলমাল ও দিশাহারা অবস্থা। কোনো ইংরেজই আর মঙ্গল পাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস করছে না। সে কামানের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে দূর থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করা যাবে না। পুনঃপুনঃ আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সিপাহীরা কেউ মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরতে গেল না।

ব্যারাকপুরের সম্পূর্ণ ডিভিশনের কমাণ্ডার, প্রৌঢ় জেনারেল হিয়ারসে-ও এসে পড়লেন অবিলম্বে। তাঁর অশ্ব একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ায় একজন ব্রিটিশ অফিসার সাবধান করে দিল, স্যার, ওর মাস্কেট কিন্তু লোড করা আছে।

ক্রোধে হিয়ারসের মুখখানি লাল। তিনি দাঁত নিষ্পেষণ করে বললেন, ড্যাম হিজ মাস্কেট!

তারপর নিজের পিস্তল তুলে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, যে প্রথম আমার হুকুম অমান্য করবে, সে একজন মৃত সৈনিক। ঐ উন্মাদটিকে ধরবার জন্য আমার সঙ্গে এসো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা।

তারপর মঙ্গল পাণ্ডে কান্নার সুরে কী যেন বলে উঠলো, অসীম সাহসী জেনারেল হিয়ারসে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন কামানটার দিকে, সিপাহীরাও দ্বিধা ত্যাগ করে এবার অনুসরণ করলো জেনারেলকে। জেনারেলের আদেশ যেন মন্ত্র, কয়েক পুরুষ ধরে ভারতীয় সিপাহীরা এ মন্ত্র অগ্রাহ্য করতে ভুলে গেছে।

একটি বিস্ফোরণ, একটি গুলি উড়ে যাওয়ার শিসের মতন শব্দ, ধোঁয়া। কেউ একজন পড়ে গেল মাটিতে। ধোঁয়া সরে যাবার পর দেখা গেল, জেনারেল নন, মাটিতে পড়ে আছে মঙ্গল পান্ডে। তার চেষ্টা ব্যর্থ হলো দেখে এবং ইংরেজের হাতে ধরা না দেবার চেষ্টায় শেষ মুহূর্তে সে মাস্কেটের নল নিজের বুকের দিকে ফিরিয়ে ঘোড়া টিপেছিল।

তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈনিকরা সেই কুড়িজন সিপাহীকে ঘিরে ফেলে নিরস্ত্র করে ফেললো এবং হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে বন্দী করা হলো তাদের। মঙ্গল পান্ডে গুরুতর আহত হয়েও তখনও জীবিত। তার পায়ে শিকল বেঁধে একটি অশ্বের সঙ্গে সেই শিকল জুড়ে দিয়ে সমস্ত কুচকাওয়াজের মাঠটিতে ছ্যাঁচড়ানো হলো। তবু সে মরে না।

যথানিয়মে কোর্টমার্শাল হলো মঙ্গল পান্ডের এবং বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হলো। সেই কুচকাওয়াজের মাঠেই গ্যারিসনের সমস্ত সৈনিকদের উপস্থিতিতে মুমূর্ষু মঙ্গল পান্ডেকে বহন করে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসীর দড়িতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গালি-গালাজ করে গেল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সিপাহীদের উদ্দেশে বললো, দাগাবাজ দুশমন আংরেজকো খতম কর দো, ভাইয়োঁ, সিপাহীয়োঁ...

বিশজন সিপাহীর কোয়ার্টার গার্ডের অধিনায়ক ঈশ্বরী পান্ডেও ফাঁসীর হুকুম থেকে রেহাই পেল না। বাকি সিপাহীদের কারাদন্ড।

সামরিক ছাউনিতে এ অতি তুচ্ছ ঘটনা। কোর্টমার্শালে দু-একজন সিপাহীর ফাঁসী দেওয়া নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এমন কি ব্রিটিশ সৈনিকরাও কোনো অপরাধ করলে তাদেরও কোর্টমার্শাল হয়। মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় না অবশ্য, তবে কিছু না কিছু শাস্তি পায়। কিন্তু মঙ্গল পান্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো ব্যারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে। চৌত্রিশ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের সকলকেই নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর ভারতে। বাকি সিপাহীদের মুখগুলিও যেন থমথমে মনে হয়। যদিও তারা সকলেই সমবেতভাবে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তবু ইংরেজ অফিসাররা তাদের মুখের দিকে যখন তখন ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন। অদ্ভুত এই এসিয়াটিকদের মুখ। এমন ভাবলেশহীন যে কিছুতেই মনের কথা টের পাওয়া যায় না। অফিসারদের কোয়ার্টারে অতি বিশ্বস্ত আর্দালি, সহিস ও বাবুর্চিদেরও যেন আর তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন। এতদিন পর মনে হয়, ওদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গেই মঙ্গল পান্ডের মুখের যেন কিছুটা মিল আছে। ওরা কি গোপনে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে? ওদের ওষ্ঠে কি গোপনে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গের হাসি? দুজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সেনানী হিউসন এবং ব মিলিতভাবে মাত্র একজন দেশী সিপাহীকে লড়াইতে পর্যুদস্ত করতে পারেনি, বহুলোক এ দৃশ্য দেখেছে। এর পর নেটিভরা যদি মনে করে শ্বেতাঙ্গ মানেই অজেয় নয়?

এই ঘটনা গোপন রইলো না, ব্যারাকপুর থেকে ক্রমে কলকাতাতেও ছড়ালো। মঙ্গল পান্ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরী পান্ডের ফাঁসী কার্যকর করতে কয়েকদিন দেরি হলো। ফাঁসীর হুকুম দেবার এক্তিয়ার ঠিক কার, তাই নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। আর যত দেরি হয়, ততই গল্প ছড়ায়। কলকাতায় বসে এই সংবাদ জেনে বিরক্ত হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। কঠিন শাস্তি

যদি দিতেই হয়, তবে তা অতি দ্রুত সমাধা করাই উচিত। বিলম্ব হলে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। দেশী লোকদের সব সময় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ইংরেজ শাসনে কোনো প্রকার অস্থিরচিত্ততা বা সংশয়ের স্থান নেই।

খবরটি প্রথম সীমাবদ্ধ রইলো কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে। সুখী, বিলাসী ইংরেজ সমাজে গোপন মৃদু ত্রাসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। কেউ সহজে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে চোখে কথা হয়। সত্যি একজন দেশী সিপাহী ইংরেজ সেনানায়কদের হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল? মনুষ্যাধম এই জাতির কোনো একজনের এমন সাহস হয়? অন্য সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি? একশো বছর আগে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা আক্রমণ করেছিল কলকাতা, তখন সব ইংরেজকেই এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক একশো বছর আগে।

ক্রমে এই গোপন ত্রাস আর শুধু মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কানাকানি হয়। হিন্দুস্থানে, কোম্পানির রাজ্যসীমা বড় বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এত বড় রাজ্য শাসনের জন্য দেশী সিপাহী নিয়ে সৈন্য গড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কতখানি বিশ্বাস করা যায় তাদের? মঙ্গল পাণ্ডে হয়ে গেল এক বিভীষিকার প্রতীক। মঙ্গল বাদ দিয়ে শুধু পাণ্ডে, তাও ইংরেজরা পাণ্ডে ঠিক মতন উচ্চারণ করতে পারে না। হলো পাণ্ডি। এই পাণ্ডির মতন দুশমন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কতজন আছে? যদি সহস্র সহস্র হয়?

মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসী হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো রকম গোলযোগ দেখা যায়নি। তবু ঘটনাটি ভোলা গেল না। রাজধানী কলকাতার সুরক্ষার জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়? ইংরেজ সমাজের অনেকের মধ্যেই এ কথা গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

খবরটি কিছুদিনের মধ্যে বাঙালীদের মধ্যেও ছড়ালো। প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র ধরনের। কারুর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারুর কাছে এমন কিছুই না। মঙ্গল পাণ্ডে কী তীব্র নেশাগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ ছিল? একমাত্র কোনো বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাকি সিপাহীরাও নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? মঙ্গল পাণ্ডে ব্যর্থ হলেও এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল কি?

একটি তথ্য অবশ্য বেশ মনে দাগ কাটলো বাঙালী সমাজে। পলাশী যুদ্ধের পর ঠিক একশো বছর কেটেছে। এ কথা ইংরেজরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক একশো বছর, এর কি কোনো গূঢ় মর্ম আছে? ঠিক একশো বছর পার হয়ে আবার কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে?

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর ঠিক ঊনপঞ্চাশ দিন পর আগুন জ্বলে উঠলো। দমদম কিংবা ব্যারাকপুরে নয়, সেখান থেকে বহু দূরে। আম্বালায়। প্রথম প্রথম শুধুই আগুন, মধ্যরাত্রে সিপাহী ব্যারাকের এক একটি ছাউনিতে অকস্মাৎ দপ

করে আগুন ধরে যায়, তারপর হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি। কে বা কারা সেই আগুন লাগায় টের পাওয়া যায় না। তবে বোঝা যায়, যে-সব সিপাহী স্যাঁতসেঁতে চর্বির মতন জিনিস মাখানো খোলস সমেত কার্তুজ ব্যবহার করছে, আগুনের শিখা লকলক করে উঠছে শুধু তাদের ছাউনিতেই। প্রথম দিন একটি ছাউনিতে, পরদিন পাঁচটি ছাউনিতে। পরদিন আরও।

ইতিমধ্যে চাপা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। শহরে শহরে নানারূপ গুঞ্জন। দিল্লির জুম্মা মসজিদের গায়ে এই কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল এক দীর্ঘ ইস্তাহার ঝুলছে। পারস্যের শাহ হিন্দুস্তানের খাঁটি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র জেহাদে যোগ দেবার জন্য। তিনি শীঘ্রই আসছেন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে কাফের ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করতে। মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করতে চায় যে ইংরেজ, এবার তার পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। হিন্দুস্তানের মুসলমান, তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, তবে জাগো, হাতিয়ার উঠাও।

কে দিল এই ইস্তাহার? এ তো সরাসরি পারস্য থেকে আসেনি, তবে কে লাগালো? দিল্লির ইংরেজ সেনানায়ক সাইমন ফ্রেজার ইস্তাহারটি টেনে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললেন সমবেত জনতার চোখের সামনে। কিন্তু ততক্ষণে তা অনেকেরই পাঠ করা হয়ে গেছে। এবং পরদিন অবিকল ঐ রকম আর একটি ইস্তাহার লটকাতে দেখা গেল লালকেল্লার দেয়ালে।

আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মহম্মদও নাকি তাঁর ফৌজ নিয়ে পারস্যের শাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে আসছেন ভারতের দিকে। দোস্ত মহম্মদকে তো ইংরেজের মিত্র বলেই সবাই জানতো এতদিন। একটি ইস্তাহারে দেখা গেল, হিন্দুস্তানে ইসলাম বিপন্ন বলে দোস্ত মহম্মদও আর স্থির থাকতে পারছেন না। আর রুশ সম্রাটের বাহিনী যে ভারত আক্রমণ করবে, সে কথা তো অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। এবার বুঝি সময় আসন্ন। রুশী বাহিনীকে ঠেকাতে পারবে ইংরেজ? এই তো কিছুদিন আগে তারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রচন্ড মার খেয়েছে না?

কানপুরের সন্নিকটে বিঠুরে ক্ষুব্ধ, অপমানিত হয়ে রয়েছেন নানা সাহেব। তিনি পুণার বিখ্যাত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও-এর দত্তক পুত্র। ইংরেজ তাঁর জায়গির কেড়ে নেয় এবং বার্ষিক আট লক্ষ টাকার পেনসন বন্ধ করে দেয়। আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তিনি তাঁর হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। এই সময় নানা লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসে বুঝলেন, আবেদন-নিবেদনের দিন শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌয়ের তখন অদ্ভুত অবস্থা। নতুন রাজ্য শাসনের ভার হাতে নিয়ে ইংরেজ-রাজ সর্ব ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। এদিকে হাটে-বাজারে হাজার হাজার সবল সুস্থ চেহারার পুরুষ চাপা রাগে গজরাচ্ছে। এরা প্রাক্তন নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সেনাবাহিনীর কর্মচ্যুত সৈনিক। বংশানুক্রমিকভাবে এরা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পেশা জানে না। এখন এদের সামনে আর কোনো জীবিকার পথ খোলা নেই, অনেকেই অনাহারের সম্মুখীন, এদের হাত নিসপিস করছে অস্ত্র ধরার জন্য।

হাটে-বাজারে এখন শুধু একটাই আলোচনা। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এখন আর পৃথক করে দেখা চলবে না। ইংরেজ এখন যথেচ্ছভাবে হিন্দু ও মুসলমান জায়গিরদার ও ভূম্যধিকারীর সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে, বনেদী বংশগুলির সম্মান লুটোচ্ছে ধুলোয়, অর্থ-সম্পদ সবই আস্তে আস্তে ভারতবাসীর কাছ থেকে চলে যাচ্ছে ইংরেজদের হাতে। হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ধর্ম বিপন্ন। এখনো তৈমুর বংশের শিখা, আকবর-সাহজাহানের প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্কিত উত্তরাধি-

কারী বাহাদুর শাহ বেঁচে আছেন। আবার ফিরিয়ে আনা যায় না লুপ্ত গৌরব?

মৌলভী আহমদ উল্লা নগরে নগরে পরিভ্রমণ করে প্রচার করছেন বিদ্রোহের বাণী। দিন ঘনিয়ে এসেছে, দেরি করা চলবে না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক সেনা ছাউনি থেকে অন্য সেনা ছাউনিতে কারা যেন চালাচালি করতে লাগলো হাতে-গড়া রুটি। একখানা রুটি যে পাবে, সে আরও পাঁচখানা রুটি বানিয়ে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে। সঙ্গে কোনো চিঠি নেই, ঐ রুটিই গোপন আবেদনপত্র।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটলো মীরাটে।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, চর্বি মাখানো খোলস সমেত টোটার ব্যাপারে বুঝি শুধু হিন্দু সিপাহীরাই ক্ষুব্ধ। মুসলমান সিপাহীরা তো সে সময় মঙ্গল পাণ্ডেকে সমর্থন করেনি। কোনো কোনো সেনানায়ক প্রস্তাব দিলেন এনফিল্ড রাইফেলের ঐ নতুন কার্তুজ না হয় বাতিল করা হোক। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। একটা গুজবকে প্রশ্রয় দিলে তা দুর্বলতারই পরিচায়ক হবে। কার্তুজের খোলসে তো সত্যিই গোরু-শুকরের চর্বি মিশ্রিত নেই। ও রকমভাবে চর্বি মেশানোর প্রশ্নই ওঠে না।

মীরাটে তৃতীয় লাইট ক্যাভালরি এক অতি বিশ্বস্ত বাহিনী। তাদের মধ্যে থেকেও বেছে বেছে নব্বই জন অতি দক্ষ সিপাহীকে পৃথকভাবে দাঁড় করানো হলো। কর্নেল স্মিথ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেনাবাহিনীকে বোঝালেন যে, কার্তুজের খোলসে চর্বি মেশানোর কথার কোনো ভিত্তিই নেই। এমনকি, ঐ কার্তুজ ব্যবহার করার জন্য মুখে দেবারও দরকার নেই। হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিলেই চলে। এই বাছাই করা নব্বই জন সিপাহী তা সকলের সামনে দেখাবে।

মে মাসের প্রথম গরমের মধ্যে সকলে দণ্ডায়মান। আনা হলো কার্তুজ, সেগুলি সিপাহীদের মধ্যে বিলি করার জন্য সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। নব্বই জনের মধ্যে পঁচাশী জন সিপাহীই হাত গুটিয়ে রইলো। তারা গম্ভীরভাবে জানালো, ঐ অপবিত্র কার্তুজ তারা স্পর্শও করবে না। এ ব্যাপারে আর অনুরোধ করে যেন তাদের সম্মান হানি না করা হয়।

পরদিন কোর্ট মার্শাল হলো সেই পঁচাশী জন সিপাহীর। বিচারের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না মোটেই। সমগ্র বাহিনীকে আবার রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে শোনানো হলো শাস্তির কথা। ঐ পঁচাশী জন সিপাহী ব্রিটিশ রাজের হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করায় গুরুতর অপরাধী, তাদের অধিকাংশকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আন্দামানে। বাকি কয়েকজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

পঁচাশীজনের একজনও দয়া ভিক্ষা চাইলো না, একটি কথাও উচ্চারণ করলো না। তৎক্ষণাৎ তাদের উর্দি ও জুতো খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হলো। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড রৌদ্র দহনের মধ্যে তাদের প্রায় নগ্ন অবস্থায় রেখে হাতে পায়ে পরানো হলো শিকল। তারপর তাদের যখন নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো কয়েদখানার দিকে, তখন একজন বন্দী সিপাহী তার একপাটি জুতো বিচারকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ফিরিঙ্গি রাজ জাহান্নামে যাক। তার সঙ্গীরাও গর্জন করে উঠলো ঐ একই কথা।

এর পর ঐ বন্দীদের দুদিন মীরাট ক্যান্টনমেন্টে রাখা হলো খুব কড়া পাহারায়। কোনো রকম বিক্ষোভের চিহ্ন দেখা গেল না। সব কিছু শান্ত। রবিবার সন্ধ্যার সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা মেম ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে গীর্জা থেকে

ঘুরে এলো নিশ্চিন্তে। সারাদিন অসহ্য দাহের পর এই সময় একটু বাতাস বয়। এখন যথাসম্ভব স্বল্পবাস হয়ে বারান্দায় একটি ছোট পেগ নিয়ে আরাম করার সময়। মীরাট ক্যান্টনমেণ্টের জেনারেল হিউট সৈনিকের উর্দি খুলে একটি পাজামা পরে তাঁর আর্দালিকে হুকুম দিলেন, বোয়, ড্রিংকস্ লাও!

অন্ধকার নামার সংগে সংগেই ছাউনিতে ছাউনিতে জ্বলে উঠলো আগুন। যেন এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সিপাহী সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পঁচাশীজন বন্দীকে মুক্ত করা হলো তৎক্ষণাৎ, নির্বিচারে তারা গুলি চালাতে লাগলো ইংরেজ অফিসারদের দিকে।

সিপাহীদের সামনে ইংরেজরা দাঁড়াতেই পারলো না। একদিনের মধ্যেই মীরাট ইংরেজ মুক্ত হয়ে গেল। কিছু ইংরেজ প্রাণ দিল, কিছু ইংরেজ কোনোক্রমে খালি পায়ে, অর্ধ নগ্ন অবস্থায় প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো। শুধু ক্যান্টনমেণ্টেই নয়, সমগ্র মীরাট শহরই সিপাহীদের অধিকারে চলে এলো।

এর পর কী? সিপাহীদের সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না। একটিই পথ খোলা আছে। এখন থেকে দিল্লি হবে আবার স্বাধীন ভারতের রাজধানী। সুতরাং, চলো দিল্লি।

দিল্লির লালকেল্লায় বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ প্রতিদিন এখনো দরবার বসান। তাঁর বয়েস এখন বিরাশী, অতি দুর্বল, হ্রস্বকায় পুরুষ, চোখে অহংকারের জ্যোতিটুকুও নেই। সাম্রাজ্য নেই, তবু তিনি এখনো সম্রাট। শুধু লালকেল্লার ভিতরকার ছোট নগরীটিই তাঁর অধিকারে, বাইরের দিল্লি শহরটি পরিচালনার ভার পর্যন্ত ইংরেজের হাতে। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তবু এখনো প্রতিদিন একটি লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে দরবারে আসতে ভালোবাসেন। তিনি এসে বসেন ধূলিমলিন ময়ূর সিংহাসনে। বেশীক্ষণ সোজা হয়ে বসে থাকার ক্ষমতা নেই, তাই তাঁকে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে থাকতে হয়, হাতে থাকে আলবোলার নল।

রাজত্ব নেই, প্রজারা আসে। অভ্যেসবশত প্রজারা তাঁর কাছে এসে নানারকম অভিযোগ শোনায়, তিনি নিমীলিত নয়নে শুনে যান। নারীহরণ, জমি দখল, ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী। এসব শুনতে ভালোবাসেন বৃদ্ধ সম্রাট। তিনি মাথা নাড়েন, এবং তাঁরই মতন ক্ষমতাহীন সেনাপতি, আমীর বা মুন্সীদের উদ্দেশ্যে হুকুম দেন, এসব অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার জন্য। তারাও দীর্ঘ সেলাম দিয়ে বলে, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এ সভায় সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। যেন অতীতের কিছুই হারায়নি, এই রকম মুখ নিয়ে তারা বসে থাকে। সম্রাট প্রায়ই তাদের নানারকম খেতাব বিলি করেন। অথবা তাদের ইনাম দেন কল্পিত কোনো জায়গীর। তারাও মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্যের সংগে সব গ্রহণ করে।

কখনো কখনো সম্রাট আউড়ে ওঠেন কবিতা। তিনি কবি এবং গীত-রচয়িতা। তখন তিনি সম্রাট নন শুধু জাফর। তিনি একটি একটি কবিতার পদ উচ্চারণ করলেই তাঁর সভাসদরা তারিফ করে বলে ওঠে, বাহাবা, বাহাবা, বোহুৎ খুব!

বাহাদুর শাহ শুধু স্বয়ং কবি নন, কবিদের পৃষ্ঠপোষক। রাজ্য নেই, তবু রাজকবি আছে। প্রসিদ্ধ কবি জৌক বাহাদুর শাহের গুরু এবং রাজকবি। মীর্জা গালিবকেও তিনি মাসোহারা দিয়ে রাজসভায় রেখেছেন এবং তাঁকে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস লেখাচ্ছেন। গালিব আগে লিখতেন ফার্সীতে, সম্রাট তাঁকে এনেছেন উর্দু ভাষায়। ছোকরা গালিবের একটি ছত্র বড় তাঁর মনে গেঁথে

গেছে, যে-কোনো সময় তিনি অকারণে সেটা গুন গুন করে ওঠেন। ম্যায় হুঁ অপনী শিকস্ত কী আওয়াজ...আমি শুধু নিজের ভেঙে যাওয়ার শব্দ!

শুধু প্রজাদের অভিযোগ আর কাব্য আলোচনাই নয়, দরবারে অন্য অন্য পাঁচ রকম কথাও ওঠে। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহীর ইংরেজের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ কিংবা আম্বালা ক্যান্টনমেণ্টে অগ্নিসংযোগের কথাও তাঁর কানে এসেছে। সভাসদরা এইসব ঘটনার নানারকম ব্যাখ্যা করতে চায়, লোলচর্ম সম্রাট শুধু মাথা নেড়ে হুঁ হুঁ করেন। একদিন তিনি আপনমনে এক বয়েৎ আওড়ালেন : রুশীদের দেশের জার কিংবা বড় বড় সুলতানরা যা পারেনি, চর্বিমাখা এক কার্তুজ বুঝি তাই করে দিল। পারিষদরা বিস্মিত, একি কথা বলছেন সম্রাট, তাহলে এখনো কি তাঁর নির্জীব শরীরের মধ্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে?

সম্রাটের পুত্রেরা এবং আত্মীয় পরিজনবর্গ প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল থেকেই নানা-রূপ বল্গাহীন ভোগলীলা এবং নৃত্য-গীত-লাস্যে সারারাত্রি অতিবাহিত করে। দিনের অধিকাংশ সময় তারা নিদ্রা যায়। সকালের দিকে তাই লালকেল্লা প্রায় স্তব্ধ।

একদিন হঠাৎ খুব গোলমাল শোনা গেল। নগরের লোকজন বাইরে বেরিয়ে এসে হল্লা করছে, দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক ঘোড়সওয়ারবাহিনী। দিল্লির নাগরিকদের বহু অভিযানের স্মৃতি আছে। তারা সহজে বিস্মিত হয় না। তবু অনেকে ভুরু তুলে ভাবলো, এরা আবার কারা আসছে? দেখতে দেখতে হুড়-মুড় করে ঢুকে পড়লো অশ্বারোহী সেনাবাহিনী দিল্লির পূর্ব দিকের সড়ক দিয়ে। এরাই মীরাটের তৃতীয় লাইট ক্যাভালরি।

সিপাহীরা মুসলমান বলে চিনতে পারায় দিল্লির নাগরিকরাই তাদের জন্য সাগ্রহে খুলে দিল লালকেল্লার সিংহদ্বার। বিদ্রোহীরা অশ্ব টগবগিয়ে সরাসরি চলে এলো সম্রাটের আবাসের সামনে। বাহাদুর শাহ লাঠি ভর দিয়ে অলিন্দে এসে দাঁড়াতেই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো হিন্দুস্তানের বাদশা বাহাদুর শাহ্, আজ থেকে হিন্দুস্তানে আবার আজাদী এসে গেছে!

কম্পিত-বক্ষ সম্রাট প্রথমে দ্বিধান্বিত হয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। একি সত্যিই সম্ভব? সশস্ত্র সৈনিকরা তাঁকে সম্রাট হিসেবে গ্রহণ করতে চায়! ইংরেজ সেনাবাহিনী এখনো দেশে রয়েছে না? কামানের গোলায় তারা ছাতু করে দেবে এই তলোয়ার আস্ফালনকারী সিপাহীদের।

বিদ্রোহীরা তখন উল্লাসে সকলেই চিৎকার করছে একসঙ্গে। অনেকে ঘোড়া থেকে নেমে নৃত্য করতে শুরু করেছে। লালকেল্লার এতখানি অন্দরমহলে তারা কখনো আসেনি, সম্রাটকেও এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি। সম্রাট বাহাদুর শাহ যে এত বৃদ্ধ, এত দুর্বল, তা তাদের ধারণা ছিল না। এই মানুষ তাদের নেতৃত্ব দেবে? তবু যাই হোক, সম্রাট বংশের রক্ত তো আছে শরীরে, ঐ নামটিই যথেষ্ট। একজন কৌতুক করে চেঁচিয়ে বললো, বুঢ়া জাঁহাপনা আপ ডরিয়ে মাৎ। আপকো হাম লোগ ফিন সারে হিন্দুস্তানকো বাদশা বনা দেঙ্গে!

বাহাদুর শা প্রথমে আদেশ দিলেন তাদের চুপ করবার জন্য। কেউ শুনলো না। তারপর তিনি কাতর ভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন, এত সিপাহী যেন একসঙ্গে এখানে জমায়েত না হয়। তিনি দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলবেন। সিপাহীদের কণ্ঠস্বর আরও তুমুল হলো। তারা এখনি সম্রাটকে তাদের সকলের মধ্যে পেতে চায়। সম্রাট তাদের হয়ে লড়ায়ের ফরমান জারি করুন।

সম্রাটের একটি ছোট দেহরক্ষী দল আছে, তাদের অধিনায়ক এক ইংরেজ,

ক্যাপটেন ডগলাস। সম্রাট ক্যাপটেন ডগলাসকে ডেকে তার পরামর্শ চাইলেন। ডগলাস দেখলো, দেহরক্ষীর দলও ইতিমধ্যেই গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশেছে। দূরে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও দলে দলে বিদ্রোহী অশ্বারোহী বাহিনী প্রবেশ করছে নগরে। ডগলাস আর দ্বিরুক্তি না করে পেছন ফিরে পালালো এবং একটি প্রাচীর লাফিয়ে লঙ্ঘন করতে গিয়ে পা মচকালো। কিছুক্ষণের মধ্যে এক সিপাহীর তলোয়ারের এক কোপে তার মুণ্ডটি বিযুক্ত হয়ে গেল শরীর থেকে।

শুরু হলো ধ্বংসলীলা। শুধু ইংরেজ নয়, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী যে-কোনো মানুষকেই খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে লাগলো সিপাহীরা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেওয়াল ঘেরা শহর দিল্লি চলে এলো বিদ্রোহীদের করায়ত্তে। বাহাদুর শাহ জাফর দেখলেন তিনি সত্যি সত্যিই সম্রাট হয়ে গেছেন, তাঁর অধীনে আছে একটি সেনা-বাহিনী। এবং প্রতিদিনই বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও সৈন্য আসছে। এখন ইচ্ছে করলে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারেন। আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে তিনি আবার কবিতা রচনা করতে লাগলেন।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রযোগে কলকাতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছোলো অবিলম্বে। লর্ড ক্যানিং ঠাণ্ডা মাথার অভিজ্ঞ প্রশাসক। তাঁর পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি অনেকগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়ে গিয়েছিলেন। লর্ড ক্যানিং চান এখন সারা দেশের শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করে তুলতে। এর মধ্যে আবার যুদ্ধ? দিল্লি দখলের গুরুত্ব অসীম। দিল্লিতে যদি সিপাহীদের একটি বিরাট বাহিনী জমায়েত হয়, তাহলে উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শক্তির টিঁকে থাকাই অসম্ভব হবে। সিপাহীদের জয়ের সংবাদের প্রভাব পড়বে অন্যান্য ক্যাণ্টনমেণ্টে, যেখানে এখনো বিদ্রোহের ধোঁয়া দেখা যায়নি। দিল্লির কাছেই নবলব্ধ পাঞ্জাব, সেখানে যদি আবার যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে আর সামলানো যাবে না। তৎক্ষণাৎ প্রতি-আক্রমণের ব্যবস্থা না করে তিনি সারা ভারতের সিপাহীদের উদ্দেশে এক বিবৃতি দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কখনোই ভারতবাসীদের ধর্মীয় অধিকারে কোনোক্রমেই হস্তক্ষেপ করতে চান না। সুতরাং সিপাহীদের জাতিভ্রষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এবং তাদের উত্তেজিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

এ বিবৃতির ফল হলো বিপরীত। দিল্লিতে বাহাদুর শাহের চারপাশে সম্মিলিত সেনানায়করা লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। তারা বলে উঠলো, ফিরিঙ্গিরা ভয় পেয়েছে! ফিরিঙ্গিরা ভয় পেয়েছে! তারা এখন সিপাহীদের তোষামোদ করতে চায়।

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের বাসগৃহটি এক শনিবারের সন্ধ্যাকালে আলোকোজ্জ্বল। বাড়ির সম্মুখদ্বারের কাছে অনেকগুলি জুড়ি গাড়ি ও পাল্কি। বাবু নবীনকুমার সিংহ প্রবাসের নৌকোবিহার থেকে কিছুদিন আগে সুস্থ ও সমর্থ দেহে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবার পূর্ণোদ্যমে চলেছে বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা, প্রতি শনিবার চলছে বিক্রমোর্বশী নাটকের মহড়া।

বারমহলের ঠাকুরদালানে বাঁধা হয়েছে মঞ্চ। মূল অনুষ্ঠানের আর দেরি নেই। সেইজন্য পর পর কয়েকটি দিন এখন পূর্ণ পোশাকেই মহড়া চলেছে। প্রতিদিন মঞ্চ সাজানো হয় টাটকা ফুল দিয়ে। রাজা পুরুরবার ভূমিকায় দিব্যকান্তি যুবক নবীনকুমারকে ভারি সুন্দর মানায়। তার কণ্ঠস্বরও সুরেলা। একটি দৃশ্যে সে মঞ্চে প্রবেশ করে অশ্বে আরোহিত হয়, সেইজন্য কিছুদিন ধরে সে অশ্বারোহণ শিক্ষা করেছে।

মঞ্চের উপর উর্বশীর প্রতি প্রণয় সম্ভাষণ করছেন রাজা পুরূরবা, সামনে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা দর্শক. এমন সময় দারুণ উত্তেজিত ভাবে সেখানে প্রবেশ করলো যদুপতি গাংগুলী। সে সরাসরি মঞ্চের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো. এসব তোমরা কী কচ্চো, নবীন? দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব হচ্চে, আর তোমরা এখনো নাটক-নবেল নিয়ে মেতে আচো?

যদুপতির কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল যাতে মনোযোগ না দিয়ে উপায় নেই। থেমে গেল অভিনয়ের মহড়া। রাজা পুরূরবা জিজ্ঞেস করলেন, রাষ্ট্রবিপ্লব? সে আবার কী, যদুপতি?

যদুপতি সকলের দিকে ফিরে বললো, আপনারা কেউ কিছু শোনেননি? দেশে ইংরেজ রাজত্ব যে যায় যায়! দেশে আবার মোগল রাজত্ব স্থাপন হতে চলেচে। সেপাইরা দারুণ ঠ্যাঙাচ্ছে ইংরেজদেরকে।

মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসে রাজা পুরূরবা বললো, বলো কী, যদুপতি! আবার মোগল শাসন?
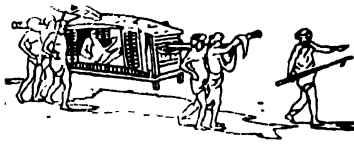
মধ্য গ্রীষ্মে শহর কলকাতায় বাস করা প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে, রোগভোগও এই সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে খুব করে, সেইজন্য জনাব আবদুল লতীফ খান বাহাদুর কিছুদিনের জন্য তাঁর জমিদারি পরিদর্শনে যাবেন ঠিক করলেন। মুর্শিদাবাদে গংগাতটে তাঁদের সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে, যতই গ্রীষ্ম থাকুক সন্ধ্যাকালে নদীবক্ষ থেকে ছুটে আসা শীতল সুবাতাস সেখানে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, এই সময় আম কাঁঠাল ওঠে খুব, জমিদারিতে থাকলে সেগুলি টাটকা পাওয়া যায়। আবদুল লতীফ ভোজনরসিক, প্রতিটি ঋতুর ফলমূল তিনি পরিপাটিভাবে উপ-ভোগ করেন।

খান বাহাদুরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে অনেক উদ্যোগ আয়োজন লাগে। অন্দরমহলে তিন বেগম, তাঁদের লটবহরই তো অফুরন্ত, তা ছাড়া প্রচুর লোক-লস্কর ও খান বাহাদুরের নিজস্ব সরঞ্জাম। সপ্তাহখানেক ধরেই গোছগাছ চলছে। খান বাহাদুরের নিজস্ব পেয়ারের ভৃত্য মীর্জা খুশবখত্ কাজকর্মে অতি দক্ষ. তার মনিবের কখন কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, সে সব তার নখদর্পণে। নবাব সব ব্যাপারে তার ওপরেই নির্ভর করেন।

যাত্রার দিন আসন্ন। একদিন বিকেলে নিদ্রাভঙ্গের পর জনাব আবদুল লতীফের মনে হলো, কী যেন একটা বাদ থেকে যাচ্ছে। কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুতেই সেটা মনে পড়ছে না।

আবদুল লতীফ হাঁক দিলেন, মীর্জা! মীর্জা!

মীর্জা খুশবখত্ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধূমায়িত আলবোলা নিয়ে উপস্থিত হলো। দিবানিদ্রার পর তার প্রভুর প্রথমেই এটা দরকার হয়।

আলবোলার নলে টান দিয়ে লতীফ সাহেব বললেন, মীর্জা. সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত্ করেছিস?

মীর্জা সেলাম ঠুকে বললো, জী হুজুর! কাল সুবে সুবে আমরা বেরিয়ে

পড়বো!

—কোনো জিনিস ভুল হয়নি তো?

—নেহি সরকার। বেগম সাহেবাদের জন্য তিন তাঞ্জাম, আপনার ল্যাণ্ডো সব তৈয়ার।

—তবু কী যেন একটা গলত্ হয়ে যাচ্ছে।

—নেহি, সরকার। হ্যামিলটন কোম্পানির কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানির লোক পাঁচ পেটি সরাব দিয়ে গেছে।

—সে তো বুঝলুম। আর কিছু ভুল হয়নি?

—আপনার চাগোশিয়া টোপী পসন্দ্ নয়, তাই পঞ্জাগোসিয়া টোপী বানানো হয়েছে। সে টোপী তো আপনি আজ সকালেই মাথায় পরে দেখে নিয়েছেন। প্রজাদের সামনে ঐ পঞ্জাগোসিয়া মাথায় দিয়ে বসবেন।

—সে তো বুঝলুম। তবু যেন কী ভুল হয়ে যাচ্ছে!

—আপনি কন্কাওআ আর পতংগ্-এর কথা বলছেন তো? তা-ও নেওয়া হয়েছে। আসলি লক্ষ্ণৌয়ের চীজ। আপনি পতংগ ওড়াবেন আর প্রজাদের তাক্ লেগে যাবে। মুর্শিদাবাদে আগে কেউ কন্কাওআ পতংগ্ দেখেনি!

—সে ঠিক আছে। আর কিছু ভুল হয়নি?

—নেহি সরকার। সব ঠিকঠাক আছে, কাল আমরা যাবো। শেখ ইমদাদ এ বাড়ি পাহারা দেবে।

—আর কিছু ভুল হয়নি, ঠিক বলছিস?

হঠাৎ মীর্জা খুশ্বখ্তের মুখখানি সাদা হয়ে গেল, দৃষ্টি একেবারে বিহ্বল। সে মাটিতে বসে পড়ে বললো, গোলামের গুস্তাকি মাফ করবেন, সরকার। এত বড় গলত্ কী করে হলো, আমি নিজেই জানি না। সব করেছি, শুধু ভকিল সাহেবকেই এখনো কোনো খবর দেওয়া হয়নি। আপনি এক দু-মাসের জন্য বাইরে থাকবেন, অথচ ভকিল সাহেব তা জানবেন-না, এ কী হয়!

আবদুল লতীফ হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, তবে! বে-তমীজ! তোর গর্দান নেওয়া উচিত! ভকিল সাহেবের পরামর্শ না নিয়ে আমি এক পা চলি না, আর সেই তাঁকেই এখনো খবর দিস্নি? আমি মনে না করিয়ে দিলে কী হতো?

মীর্জা মাটিতে শির ঠেকিয়ে অপরাধীর মতন বললো, জী সরকার, সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে।

—যা, এখনি ভকিল সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে দে!

খবর পেয়ে সেদিন সন্ধ্যার সময়েই এসে হাজির হলেন মুন্সী আমীর আলী। হাতে একটি রুপো বাঁধানো ছড়ি, মুখখানি রাগত।

বৈঠকখানা ঘরে বসে ছড়িখানা কোলের ওপর রেখে তিনি বললেন, লতীফ সাহেব, আমি জানতুম, তুমি দিলদরিয়া ভোলাভালা লোক, কিন্তু তুমি যে এমন বেওকুফ তা জানা ছিল না।

প্রথমেই এমন কঠোর ধমক খেয়ে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন লতীফ খাঁ। কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, জনাব এমন কথা বললেন কেন? কী বেওকুফী করেছি আমি?

আমীর আলী বললেন, বেওকুফী করোনি? একশোবার বেওকুফী! তুমি হুট্ করে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছো, দেশের অবস্থা জানো?

—দেশের কী অবস্থা? দেশের যাই অবস্থা হোক, আমি নিজের জমিদারি দেখতে যেতে পারবো না?

—জমিদারি দেখতে যাবে? বেগম সাহেবাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো আশা করি? তাঁদের ছেড়ে তো তুমি এক পাও নড়ো না! পাহারাদার বরকন্দাজ যাচ্ছে ক'জন?

আবদুল লতীফ হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মীর্জা! কতজন বরকন্দাজের ব্যবস্থা করেছিস?

মীর্জা খুশবখত্ জানালো যে চল্লিশজন সশস্ত্র বরকন্দাজ পাহারাদার হয়ে সঙ্গে যাবে, তাদের দশজনের কাছে বন্দুক আছে।

আবদুল লতীফ বললেন, গত বৎসর তিরিশজন বরকন্দাজ ছিল, এবার পাহারা আরও জোরদার করা হয়েছে।

মুন্সী আমীর আলী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, যত বেশী বরকন্দাজ নেবে, ততই বেশী যে তোমার বিপদ, সেকথা বোঝার মতন বুদ্ধিও তোমার নেই, লতীফ খাঁ! মুসলমান এখন হাতিয়ার নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারে? তোমার চল্লিশজন বরকন্দাজকে হাতিয়ার নিয়ে লম্ফঝম্ফ করতে দেখলে গোরা সিপাহীরা তাদের একেবারে খত্ম করে দেবে, তোমার জেনানাদের বে-ইজ্জত করবে, তাই তুমি চাও?

—এ কী কথা বলছেন, মুন্সী সাহেব? গোরা সিপাহীরা মারবে? বছর বছর খাজনার মোহর পেঁাছে দিই, তবু মারবে কেন?

—সাধে কি তোমায় বেওকুফ বলেছি? গদর শুরু হয়ে গেছে, শোনোনি? মুসলমান আর ইংরেজ এখন পরস্পরের দুশমন। একজন হাতিয়ারধারী মুসলমান দেখলেই ইংরেজ তাকে মনে করে বাগী সিপাহী। দিল্লী স্বাধীন হয়ে গেছে। সেখানে আর একজনও ফিরিঙ্গি নেই। দিল্লির লালকেল্লার মশনদে আবার বসেছেন স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, আর এখন তুমি আওরতদের নিয়ে মুর্শিদাবাদে চলেছো হাওয়া খেতে?

—মুন্সী সাহেব, আপনি বলছেন, সারা হিন্দুস্তানে আবার মুসলমান রাজ কায়েম হবে?

—আলবৎ হবে! ইংরেজ কতখানি ভয় পেয়ে গেছে তুমি জানো না? সব জায়গায় তারা পিছু হটছে। এই তো গত এতোয়ারের দিন কলকাতায় কী কাণ্ড হলো, তাও তুমি শোনোনি বোধহয়!

—বলুন, বলুন মুন্সী সাহেব, সব খুলে বলুন।

মুন্সী সাহেব সবিস্তারে মীরাটের ঘটনা, দিল্লি অভিযান এবং দিল্লি দখলের কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

এই সময় অদূরে তীক্ষ্ম কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ উঠতেই লতীফ খাঁ বিরক্ত বোধ করলেন। মীর্জাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে কাঁদে রে এই অসময়ে?

মীর্জা বললো, সরকার, ওরা পাশের বস্তির বেহুদা ছেলেমেয়ে। এই সময় ওদের বাপ মা ওদের ক্ষুধার খাদ্য দিতে না পেরে পেটায়, তাই ওরা কাঁদে!

অসহিষ্ণুভাবে আবদুল লতীফ বললেন, তুই জানিস না, আমি কান্না সহ্য করতে পারি না! থামা ওদের! যা, বস্তির সব ক'টা লোককে একটা করে টাকা দিয়ে আয়। মুন্সী আমীর আলী আজ একটা বিরাট সুসংবাদ শুনিয়েছেন। শেখ্ ইমদাদ, কত্লু আর হেদায়েৎকে ডাক, তোরাও এসে শোন। তার আগে বস্তির সবাইকে টাকা দিয়ে বলবি মেঠাই কিনে খেতে। আর বলবি, এর পর আর কোনো-

দিন যেন না কাঁদে। মুসলমানের এখন কান্নার সময় নয়, সব মুসলমানকে ইমান রক্ষার জন্য এখন হাতিয়ার ধরতে হবে। দিল্লি এখন স্বাধীন!

মীর্জা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, দিল্লি স্বাধীন? তার মানে কি, সরকার?

আবদুল লতীফ বললেন, আরে কমবখ্‌ত, স্বাধীন মানে স্বাধীন। বাদশার মাথার ওপর এখন আর কোনো ইংরেজ নেই। বাদশাহ এখন আবার শাহেনশাহ্‌। তোকে যা করতে বললাম, কর, যা, ছুটে যা!

মীর্জা চলে যাবার পর আবদুল লতীফ মুন্সী আমীর আলীর দু পা ছুঁয়ে কদমবুসী করে আনন্দাশ্রু ঝাড়িয়ে বললেন, আপনি আমায় আজ যে সংবাদ শোনালেন, তাতে আমার জীবন ধন্য হলো। এ দেশে আবার মুসলমানের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমীর আলী বললেন, এখনো পুরো হয়নি, হতে চলেছে।

—তবু দিল্লি তো আর ইংরেজের হাতে নেই। মুঘল বাদশা এখন আমাদের জান মালের মালেক্‌। আজ যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাও হবে আনন্দের!

—ঠিক বলছো কি, লতীফ সাহেব? তোমরা তো শুধু নিজেদের সুখ আর আরামের জন্যই সর্বক্ষণ মত্ত। মুসলমানের গৌরব উদ্ধারের জন্য কতখানি কী চেষ্টা করেছো এতদিন? এখন কিন্তু সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

—নিশ্চয়ই! আমি তৈয়ার। আপনি এতোয়ারের দিন কলকাতায় কী হয়েছিল বলছিলেন?

—সে কথাও তুমি শোনোনি? জানো, সিপাহীরা কখন কলকাতায় ধেয়ে আসবে, সেই ভয়ে কলকাতার সাহেবলোগ একেবারে ভীতু জানোয়ারের মতন ছটফট করছে। যতসব ডরপুক না-লায়েক ইংরেজ মাস্টন আর রডা কোম্পানি উজাড় করে বন্দুক পিস্তল কেনার ধুম লাগিয়েছে। আর কলুটোলার বানিয়া ইংরেজ কিংবা ইদ্রুস পিদ্রুস নামে যত সব হাফ-ফিরিঙ্গি জীবনে কখনো বন্দুক পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি, তারাও এখন হাতিয়ার মক্সো করতে লেগেছে। ক্যানেং সাহেবকে ধরাকরা করে তারা গড়েছে এক ভলান্টিয়ার গার্ডস বাহিনী, সিপাহীরা এলে লড়বে। তা গত শনিবারের রাতে নাকি খবর এসেছিল যে পরদিন ব্যারাকপুর আর দমদমের সিপাহীরা কলকাতা আক্রমণ করবে। জেনারাল হিয়ারসি তো তড়ি-ঘড়ি এতোয়ারের দিন সকালে সব সিপাহীর অস্ত্র কেড়ে নিলো। কিন্তু তাতে কী, সেদিন বিকালে হুজুগ উঠলো যে সিপাহীরা ব্যারাকপুর কলকাতা থেকে শহর কলকাতার দিকে ধেয়ে আসছে। ব্যস তারপর কী শোরগোল! জান মাল বাঁচাবার জন্য সব সাহেব লাগালো দৌড়। কেউ গেল ফোর্ট উইলিয়ামে, কেউ গেল জাহাজে, কেউ নৌকা নিয়েই বোধহয় বিলায়েত পাড়ি দিতে গেল। রাস্তাঘাট একেবারে ফর্সা। যারা ভলান্টিয়ার্স গার্ডে যোগ দিয়ে লড়াই করবে বলেছিল, তারাই ভেগেছে সবচেয়ে আগে, লম্বা ছুট লাগিয়েছে!

আবদুল লতীফ হো হো করে হেসে উঠলেন।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, শুধু হাসির কথা নয়, ভালো করে ভেবে দেখার কথা। এই টাউন কলকাতা হলো কোম্পানির রাজধানী। এখানে এই অবস্থা। হুজুগ শুনেই ইংরেজরা দৌড়োচ্ছে। দশ-কুড়ি হাজার সিপাহী সত্যি এলে এ শহর খুব সহজে দখল হয়ে যাবে। কলকাতা যদি দখল হয়, তা হলে ভেঙে পড়বে ইংরেজের রাজ্য। তখন হিন্দুস্তানের তেগ্‌ লন্ডন পর্যন্ত পঁহুছিয়ে যাবে।

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লতীফ সাহেবের চক্ষু দুটি। আবেগের সঙ্গে

বললেন, আসবে, সিপাহীরা কলকাতায় আসবে? আমি আজই মসজিদে গিয়ে দোয়া করবো।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, শুধু দোয়া করলেই হবে না। নিজেদেরও কিছু মদত দিতে হবে।

—কিন্তু মুন্সী সাহেব, কলকাতার হিন্দুরা কি আমাদের দলে যোগ দেবে?

—যে সব হিন্দুরা দু' পাত আংরেজি পড়েছে, তারা ইংরেজের পা-চাটা হয়েই থাকবে। ওরা যারা ডেপুটি, মুন্সেফী কিংবা কুঠিওয়ালার নোকরির জন্য হন্যে হয়ে থাকে, তারা ইংরেজকে ছাড়বে না শেষ পর্যন্ত। তা বাঙালী হিন্দুরা থাকুক না ইংরেজদের দলে, তাতে কিছু যায় আসে না! ওরা কি লড়াই করতে জানে? কোনোদিন হাতিয়ার তুলে ধরতে শেখেনি। শুধু দুধ ঘি খায় আর লম্বা লম্বা বাত মারে। ওদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

—কিন্তু ওদের সংখ্যাই বেশী। কোম্পানির সরকারে ওরাই বড় বড় পদ নিয়ে বসে আছে এখন। ওরা লড়াই করতে জানে না ঠিকই, কিন্তু ষড়যন্ত্র করতে তো ভালোই জানে। যদি ইংরেজের সঙ্গে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে লাগে?

—সেটা হবে ওদের নির্বুদ্ধিতা। এ গদরের আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা হিন্দুস্তানে। এতে যে যোগ দেবে না, সে মরবে। তবে, বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও অনেকের ইংরেজের ওপর ভক্তি চটে গেছে। প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিল বুঝি মুসলমানের বদলে ইংরেজের কাছ থেকেই তারা সুবিচার পাবে। এখন আর সকলের সে ভাব নেই। সেদিন আমি বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা নামে একটি আখবর দেখলাম। আমার আদালতের দোস্ত্ বিধুশেখর মুখার্জিবাবুর এক দোস্তের ছেলে সে আখবরে একটা সন্দর্ভ লিখেছে। ছোকরা লিখেছে যে, এই ইংরেজের শাসনের চেয়ে আকবর বাদশাহের শাসন অনেক ভালো ছিল। আকবর বাদশার আমলে হিন্দু মুসলমান সকলেই গুণের অনুযায়ী কাজ পেত। আর এখন কোনো হিন্দু ইংরেজের চেয়েও বেশী পড়ালেখা জানলেও সে কোনো ইংরেজের চেয়ে বেশী বেতনের চাকরি পায় না।

—লিখেছে এ কথা?

—হ্যাঁ, লিখেছে। তা ছাড়া, সিপাহীদের মধ্যে বাঙালী হিন্দু নেই, কিন্তু অন্য হিন্দু সিপাহীরা গদরে যোগ দিয়েছে। ব্যারাকপুরে প্রথম যে সিপাহী ইংরেজকে তাক করে গোলি চালালো, সে তো হিন্দু, তার নাম মঙ্গল পাঁড়ে। কানপুরে ধুন্ধপথ নানাসাহেব বিদ্রোহী সিপাহীদের মদৎ দিচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু সকলেরই দেশ এই হিন্দুস্তান। ইংরেজরা শোষণকারী দুশমন, তাদের হঠাতে হবে এ দেশ থেকে। তারপর একবার ইংরেজ ভাগলে সারে হিন্দুস্তানের বাদশা হবেন বাহাদুর শাহ, সমস্ত মুসলমানেরই আবার কদর বাড়বে।

—মুন্সী সাহেব, আপনি এত সব খবর জানলেন কোথা থেকে?

—তুমি তো কিছুই পড়ো না। বাংলা পড়ো না, কিন্তু ফার্সীতে এক আখবর বেরোয় কলকাতা থেকে, তার নাম 'দূরবীন', সেটা তো অন্তত পড়ে দেখতে পারো! সেই দূরবীনে ছাপা হয়েছে বাগী সিপাহীদের এক ইস্তাহার। তাতে বলেছে, হিন্দু মুসলমানকে এক হয়ে দুশমন ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। ইংরেজ হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধর্ম কেড়ে নিতে চায়। হিন্দু কখনো মুসলমানের ধর্ম কাড়ে না, মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম কাড়বে না।

—ইনসা আল্লা, এবার তবে ইংরেজের দিন শেষ। কিন্তু মুন্সী সাহেব, দিল্লির সিপাহীরা কতদিনে কলকাতায় এসে পৌঁছুবে?

—ওরা কেন আসবে? এখানকার সিপাহীদের দিয়েই কলকাতা দখল করাতে হবে। সিপাহীরা সব ফুঁসছে। একটা আগুনের ফুলকি পড়লেই সব দপ করে জ্বলে উঠবে। এখন দরকার শুধু একটিই। একজন সেনাপতি, যাঁর অধীনে থেকে সব সিপাহী লড়বে। সেরকম সেনাপতি কে হতে পারে?

—কে?

—আর পাঁচদিন পরই তেইশ তারিখ। জুন মাসের তেইশ তারিখ কী দিন জানো তো? ঐদিন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলার মশনদ। সেইদিন মুর্শিদাবাদের নবাব যদি বিদ্রোহী ফৌজদের নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করতেন, তা হলেই কি সবচেয়ে ভালো হতো না?

—নিশ্চয়ই!

—মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল গোপনে। তিনি রাজি হননি। একেবারে অপদার্থ একটি। তিনি বললেন, তিনি ইংরেজের নুন খেয়েছেন, কিছুতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যাবেন না। শুনছি, কোম্পানি নাকি ফৌজ পাঠিয়ে নবাবকে বন্দী করে আনবে। তা হলে বোঝো ব্যাপারটা!

—আর কেউ নেই?

—আর একজনই আছে, যাঁকে সবাই মানবে। তিনি হলেন আওধের রাজ্যহীন নবাব ওয়াজীর আলী শাহ্‌।

—ঠিক বলেছেন।

—এই ওয়াজীর আলী শাহই সব বিদ্রোহী সিপাহীর নেতা হতে পারেন। চলো, কালই আমরা নবাবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

শহর থমথম করছে। যে শহরের রাজপথ গলিপথ সব সময় লোকের ভিড়ে গিসগিস করে, কোলাহলে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে, টম টম, জুড়ি গাড়ি, কেরাঞ্চিগাড়ি মানুষজনের ওপর দিয়ে চলে যায়, আল্লার ষাঁড় গাঁদাফুলের মালা চিবোয়, খেঁকি কুকুরের দল কশাইয়ের দোকানের সামনে লড়ালড়ি করে, বামুন-মুন্দোফরাসে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় প্রায়ই, সেই কলকাতা আজ প্রায় জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ, অলিন্দে গবাক্ষে দেখা যায় কৌতূহলী, ভীত মুখ, কখনো কখনো এক আধজন লোক এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে তড়িৎগতিতে রাস্তা পার হয়ে অন্য বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পদভারে পৃথিবী কম্পিত করে টহল দিয়ে যায় গোরা সৈন্যের দল।

আগে শহরের মধ্যে সৈন্যবাহিনী প্রায় দেখাই যেত না। এখন অনেকগুলি সরকারী ভবনেই সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, পটলডাঙার নিকটবর্তী সংস্কৃত কলেজে গোরা সৈন্যরা আস্তানা গেড়েছে। যে-কোনো দিন বিদ্রোহী সিপাহীরা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা দখল করতে আসবে।

প্রায় প্রতিদিনই বন্দরে জাহাজ আসছে, তার থেকে নামছে খাস বিলেতি সৈন্য-দল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকেও সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছে উত্তর

ও পূর্ব ভারতের দিকে। বর্মাদেশের পেগু শহর এবং সিংহল দেশ থেকেও আনানো হচ্ছে ব্রিটিশ ফৌজ।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। কিছুদিন ধরেই বিদ্রোহের নানা ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রগুলিতে নানারূপ অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছিল। এখন সরকার সেনসর প্রথা চালু করায় ফল হলো বিপরীত। গুজব নামক বায়বীয় বস্তুটি নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীর কলসীর দৈত্যের আকার ধারণ করেছে এখন। শিশু হত্যা, নারী হত্যার দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী সকলের মুখে মুখে। ইংরেজ সংবাদপত্রগুলি এই উপলক্ষে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে বর্বর, পিশাচ, মনুষ্যেতর প্রাণী বলে সম্বোধন করতে লাগলো। কিন্তু এসব ছাপিয়েও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ইংরেজরা ভয় পেয়েছে। বে-সামরিক ইংরেজরা তো পলায়নের জন্য এক পা তুলে প্রস্তুত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদই বেশী আসছে। দিল্লি পুনর্দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লির অস্ত্রাগার যাতে সিপাহীদের দখলে না যায় সেইজন্য ইংরেজ সেনানীরা কত বীরত্বের সঙ্গে সেই অস্ত্রাগার ধ্বংস করে দিয়েছে এ কাহিনী পল্লবিত করে ছড়ানো হয়েছিল। অস্ত্রাগার বিস্ফোরণের আওয়াজ নাকি চল্লিশ মাইল দূরেও শুনতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সংবাদও কলকাতায় এসে পৌঁছেচে যে, দিল্লির অপর একটি বৃহৎ অস্ত্রাগার প্রায় বিনা যুদ্ধে সিপাহীদের করায়ত্ত হয়েছে, বিদ্রোহীদের কাছে এখন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।

যাতে ত্রাস ছড়ানো না হয় সেইজন্য লর্ড ক্যানিং কড়া হুকুম দিয়েছেন জীবন-যাত্রা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে। অফিস, কাছারি সব খোলা রাখা হয়েছে, কিন্তু কেউ যায় না। বিশেষত আজকের দিনটি পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন, আজ সর্বত্র একটা কী হয়, কী হয় ভাব।

রামগোপাল ঘোষ কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছিলেন গতকাল, তারপর তাঁরা এ বাড়িতেই রয়ে গেছেন। ইদানীং রামগোপালের শরীর প্রায়ই ভালো থাকে না, মদ্যপানের মাত্রাও বেড়েছে। প্যারীচাঁদ, রাধানাথ প্রায়ই আসেন এ বাড়িতে, অনেকদিন পর এসেছেন দক্ষিণা-রঞ্জন। আর কৃষ্ণনগর থেকে রামতনুও এসেছেন। খাটের ওপর রামগোপাল আধো শোয়া, বন্ধুরা বসেছেন কয়েকটি আরাম কেদারায়। এখন অলোচনার বিষয় একটিই, তবে কাল রাত থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক বেঁধে যাচ্ছে রামগোপালের।

রামগোপাল মুক্তকণ্ঠে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থক। তাঁর ধারণা, এবার ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে।

রামগোপালের সবচেয়ে বেশী বিরোধী রাধানাথ। যদিও রাধানাথ অন্য সময় ইংরেজদের কড়া সমালোচক, কিন্তু এখন তিনি পুরোপুরি সিপাহীদের বিপক্ষে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলছেন, তুমি বলো কী হে রামগোপাল, তোমার মাতা-টাতা সব গণ্ডগুলে হয়ে গেল নাকি ব্যাধিতে? দুকড়ায় সব তালপাতার সেপাই, তারা লড়ুয়ে জিতবে ইংরেজের সঙ্গে? হেঃ! আমি দেকিচি, বুজলে, আমি হিন্দুস্তানের এ মাতা থেকে ও মাতা পর্যন্ত ঘুরিচি, আমি তো দেকিচি এই সাহেবদের। এ ব্যাটাদের ধাতুই আলাদা। সেপাইরা ইংরেজ মাগীদের গায়ে হাত তুলেচে, কানপুরে কুয়োর মদ্যে মেম আর শিশুগুলোনকে ফেলে মেরেচে, এর যে কী শোধ নেবে ওরা তা তো জানে না! ইংরেজরা তাদের ফিমেলদের সম্মানরক্ষার

জন্য জান্ দিতে রাজি। এক খৃষ্টিয়ানকে বাঁচাবার জন্য সব খৃষ্টিয়ান এককাট্টা হয়। হিঁদু কিংবা মোছলমানদের কখনো নিজের জাতের জন্য এককাট্টা হতে দেকোচো?

রামগোপাল বললেন, মাই ডিয়ার রাধু, হিন্দু আর মুসলমান তো এখন এক-কাট্টা হয়েই লড়চে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট। আগে কখনো যা হয়নি, তা যে কখনো হবে না, তার তো কোনো মানে নেই।

রাধানাথ বললেন, ছাই লড়চে! আর একটু গুঁতো খেলেই দেকবে সব ভয়ে উর্দি নষ্ট করে ফেলবে, আর তখন হিঁদু দোষারোপ করবে মোছলমানদের ওপর, আর মোছলমান দুষবে হিঁদুদের। এ লড়াইয়ের আয়ু আর বড়জোর সাত দিন। আমি বলচি, লিকে রাকো।

রামগোপাল বললেন, না, তা হতেই পারে না। ইংরেজ লড়চে একটা ইম্‌মরাল ওয়র। একটা জাগ্রত জাতিকে তারা দমিয়ে রাকবার চেষ্টা করচে। আর সেপাইরা লড়চে স্বাধীনতার জন্য। শুধু তাই নয়, তোমরা আরো ভালো করে বুঝে দ্যাকো। এ লড়াই শুধু সেপাইরা লড়চে না, সাধারণ মানুষরাও যোগ দিয়েচে, অনেক জায়গায় চাষীরাও সেপাইদের পাশে দাঁড়িয়েচে। ইতিহাসের মর্মে গিয়ে দ্যাকো, যে-দেশে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কৃষকরা হাত মেলায়, সে দেশে বিপ্লব সফল হবেই। মনে করো আমেরিকায় ওয়র অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের কতা।

রাধানাথ বললেন, তুমি বিচিত্র কতা বললে। আমেরিকায় লড়াই হয়েছেল সাহেবদের সঙ্গে সাহেবদের। আর এখানে লড়াই হবে সাহেবদের সঙ্গে নেটিবদের। সাহেবদের সঙ্গে নেটিব কখনো পারে?

রামগোপাল ক্লিষ্টভাবে হেসে বললেন, রাধু, আমি যদি ইংলণ্ডে যাই, তখন ইংরেজরাই হবে সে-দেশের নেটিব আর আমি হবো সাহেব। আমেরিকায় আমেরিকানরাও নেটিব। তুমি নিজেই তো প্রমাণ করেচো যে নেটিব হয়েও তুমি সাহেবদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, কিন্তু ভাই, রামগোপাল, সিপাহীরা জয়ী হলে আমাদের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গলই বেশী হবে? আমরা সবেমাত্র পশ্চিমী সভ্যতার সুফল পেতে শুরু করিচি, আবার আমরা পিছু পানে ছুটবো? বুড়ো বাহাদুর শাহ করবেন এই দেশ শাসন? তাঁর ছেলেগুলোও এক একটা অকাল কুষ্মাণ্ড! মোগল শাসনের শেষ দিকে কি এ দেশে অন্ধকার যুগ নেমে আসেনি? এতদিনের মোগল শাসনে আমরা কী পেয়েচি? অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভোগ-বিলাসের নক্কারজনক চিত্র, অবিচার, অত্যাচার! মোগল-পাঠানরা কখনো এদেশের সর্বত্র ইস্কুল খোলার কতা ভেবেচে? সর্বক্ষণ ধর্ম ধর্ম করে না চেঁচিয়েও যে সুস্থ সামাজিক জীবন গড়ে তোলা যায়, সে আদর্শ আমাদের চোখের সামনে রেকেচে? নবাবী আমলের কোনো ভালো দিক তুমি দেকতে পাও? সব তো একেবারে রসাতলে যেতে বসেছেল। আমি ভাই জোরগলায় বলবো, ইংরেজ আমাদের রক্ষাকর্তা।

রামগোপাল বললেন, শোনো, বিপ্লবের পর একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। তখন বাহাদুর শা শাসক হবেন, না কে শাসক হবেন, তা ঠিক করবে এ দেশের নিয়তি। আর, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটা নবযুগ এসেচে, বিশ্বের নানা দিকেব জানেলা খুলে গ্যাচে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আমাদের দেশেও এসে পৌঁচোতোই। আবার পেচোন পানে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। স্বাধীন দেশ নিজে থেকেই এগিয়ে যায়।

রাধানাথ বললেন, এ সব কতা যে বলচো এ সবও তো শিকেচো ইংরেজের

লেকা বই পড়েই।

রামগোপাল বললেন, কোনো বই কোনো জাতের নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

প্যারীচাঁদ বললেন, সেপাইরা কিন্তু তোমার মতন বই পড়েনি। তোমার ঐ বাহাদুর শা কিংবা ধুন্ধপন্থও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোয়াক্কা করে না, তারা জিতলে মধ্যযুগই আবার ফিরে আসবে, তারা বর্বরতারই পুনঃপ্রবর্তন করচে।

রাধানাথ অট্টহাস্য করে বললেন, জিতবে? ছোঃ! ছোঃ! এই সেপাইরা জিতবে, এমন কতা স্বপ্নেও ভেবো না।

রামগোপাল একটু আহতভাবে বললেন, তোমরা মহান ডিরোজিও'র শিষ্য হয়েও তোমাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে না? বিদেশীর পদানত হয়ে থাকাটাই তোমাদের কাচে সুখের? হেয়ার, বীটনের মতন দু-চারটে ভদ্র ইংরেজের কতা আলাদা, কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজ আমাদের কী চোখে দ্যাকে, তা কি তোমাদের জানতে বাকি আচে?

প্যারীচাঁদ বললেন, মোগল আমলে আমরা হিন্দুরা কি স্বাধীন ছিলুম? তুমি বলো কি রামগোপাল? তখুনো তো আমরা পদানতই ছিলুম। যদি পদানত থাকাই আমাদের নিয়তি হয়, তা হলে একটু ভদ্রগোচের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পায়ের তলায় থাকাটাই ভালো নয়?

এবার দক্ষিণারঞ্জন ওদের কথায় বাধা দিয়ে কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা এই লড়াইটাকে শুধু সেপাই আর ইংরেজদের লড়াই বলেই ভাবচো কেন। এ তো লড়াইয়ের একটা দিক মাত্র। সারা হিন্দুস্তান আজ ইংরেজ শাসনে বিক্ষুব্ধ। দেশটাকে চুষে একেবারে ছিবড়ে করে দিচ্চে ইংরেজ। ভারত এই সেদিন পর্যন্ত ছিল একটা পণ্য উৎপাদনকারী দেশ, আর আজ কী অবস্থা! আগে দেশ-বিদেশে ভারতের দ্রব্যের চাহিদা ছিল আর আজ আমাদের দেশ সারা ইওরোপের কাঁচা বাজার। আমাদের তাঁতশিল্পকে ইংরেজ একেবারে ধ্বংস করে বিলিতি কাপড় এখন চালাচ্চে এদেশে। ভাই প্যারী, আমি একদিক থেকে রামগোপালের সঙ্গে একমত। তুমি মোগল শাসনের সঙ্গে তুলনা করলে, কিন্তু তুলনাটা একটু ভাসা ভাসা হয়ে গেল না? তুমি ইংরেজের ভদ্রগোচের ফর্সা পা দেখেই ভুললে। কিন্তু ঐ পা যে দশ গুণ ভারী সেটা ভেবে দেকলে না? মানচি যে মোগল আমলে অত্যাচার অবিচার ছিল, কিন্তু মোগল শাসকেরা এদেশের ধনরত্ন অপহরণ করে সব দৌলত আরব পারস্যে পাটিয়ে দেয়নি। তারা এদেশেরই লোক হয়ে গ্যাচে। মোগলরা ব্যবসা করতে নামেনি, সাধারণ চাষীর উৎপাদনে হাত দেয়নি। আর দ্যাকো, নীলকরদের জ্বালায় সাধারণ চাষী তার মাঠে ধান না ফলিয়ে নীল চাষে বাধ্য হচ্চে। পেটের মার সবচে বড় মার। মোগলরা অত্যাচার করতো, নারীহরণ, লুঠপাট করতো, কিন্তু ইংরেজ সুকৌশলে গোটা দেশের মানুষকে পেটে মেরে দিচ্চে।

রামগোপাল বললেন, ঠিক বলেচো, দক্ষিণা।

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, এ লড়াই শুধু সেপাইরা লড়চে না। কিচুদিন আগে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছেল, ইংরেজ তাদের পিটিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা করলেও তারা শান্ত হয়নি, যে-কোনো সময় তারা আবার ফুঁসে উঠবে। ফরাজীরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেল, তাদের নেতা দুদ্দু খাঁ এখন জেলে, কিন্তু তাঁর হাজার হাজার চ্যালা আচে বলে শুনিচি, তারা যে-কোনো দিন ইংরেজের বিরুদ্ধে আবার অস্ত্র ধরতে পারে। নীল চাষীরাই বা কতদিন এই অত্যাচার মেনে নেবে? লড়াই লাগবে নানা দিক দিয়ে। ইংরেজ কী ভাবে সবাইকে ঠেকাবে?

রামগোপাল বললেন, তোমরা বুজতে পাচ্চো না কেন, এটা কত বড় একটা

শুভ লক্ষণ যে হিন্দু আর মুসলমান একসঙ্গে মিলে দেশের স্বাধীনতা চাইচে।

প্যারীচাঁদ বললেন, যদি কোনোক্রমে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যায়, তা হলেই আবার দেকবে, হিন্দুর ভাগ্যে লবডঙ্কা! হাতিয়ার তো মুসলমানদের হাতে, শাসনভারও তাদের হাতেই থাকচে।

রাধানাথ বললেন, যাবে না, যাবে না, ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাবে না, কোনো চিন্তা নেই। কী বলো, তনু? তুমি চুপ করে রয়েচো, কিচু বলচো না?

স্বল্পভাষী রামতনু বললেন, আমি শুনচি তোমাদের কতা। তবে আমার মত যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলি, আমি ইংরেজ শাসনের পক্ষে। এ দেশ সবেমাত্র জেগে উঠচে, এখনো স্বাবলম্বী হবার মতন ঠিক উপযুক্ত হয়নি।

রামগোপাল উত্তেজনার সঙ্গে উঠে বসে বললেন, তোমরা যাই বলো, আজ যদি সেপাইরা কলকাতায় এসে পড়ে, আমি নিজে তাদের স্বাগতম জানাবো, তাদের বুকে জড়িয়ে ধরবো।

প্যারীচাঁদ বললেন, তার আগেই সেপাইরা তোমায় কচুকাটা করবে!

রাধানাথ আবার হেসে উঠলেন।

রামগোপাল বললেন, কেন? সেপাইরা নিজের দেশের লোকদের মারচে, এমন তো শুনিনি।

প্যারীচাঁদ বললেন, বাঙালীদের ওপর তাদের ভারি রাগ। তুমি তো প্যান্টালুন না পরে রাস্তায় বেরোও না, প্যান্টালুন পরা লোক দেকলেই নাকি সেপাইরা ঠ্যাঙাচ্চে।

রাধানাথ বললেন, আর মেদ্‌নীপুর থেকে রাজনারায়ণ চিঠিতে কী লিখেচে, বলো?

প্যারীচাঁদ বললেন, রাজনারায়ণ বড় মজার কতা লিকেচে। ও তো মেদিনী-পুরের হেড মাস্টার। ওকে স্কুল আওয়ারে সর্বদা প্যান্টালুন-কোট পরে থাকতে হয়। এদিকে মেদিনীপুরে সেপাইদেরও একটা ছাউনি আচে। কখুন সেপাইরা বিদ্রোহী হয়ে রে-রে করে ছুটে আসবে তার ঠিক নেইকো। তাই রাজনারায়ণ প্যান্টালুন কোটের নিচে ধুতি আর পিরান পরে থাকে। সেপাইদের আসতে দেকলেই প্যান্টালুন-কোট ছেড়ে ভিড়ে মিশে যাবে।

রাধানাথ বললেন, একদিন শুধু হুজুকেই নাকি ইস্কুলের সব মাস্টাররা প্যান্টালুন-কোট খুলে একেবারে...।

প্যারীচাঁদ বললেন, দু দিন আগে বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি গেসলুম। তিনিও মুখ চুন করে বসে আচেন, দেকলুম।

রামগোপাল বললেন, কেন? বিদ্যাসাগর মশাই তো প্যান্টালুন পরেন না!

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভয়ের কারণ আচে বটে, এমন আমিও অনুমান করিচি।

রামগোপাল আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা আইনের প্রবক্তা এ কতা সারা ভারতে কারুরই অবিদিত নেই। সেপাইরা বিধবা বিবাহের ব্যাপারটা খুবই কু-নজরে দেকেচে। তারা মনে করে, সতীদাহ নিবারণ, বিধবার বিবাহ, এই সব আইন পাশ করে ইংরেজ আমাদের ধর্মে আঘাত হেনেচে। আর কলকাতার ইংরেজী-জানা বাঙালীরা ইংরেজকে মদত দিয়েচে। তাই শিক্ষিত বাঙালীদের ওপর তাদের রাগ।

প্যারীচাঁদ বললেন, শুনচি নাকি বিদ্যাসাগর মশাই সরকারের কাচে গিয়ে বলবেন, বিধবা বিবাহ আইন আবার রদ করে দিতে।

রামগোপাল গলা চড়িয়ে বললেন, কক্ষনো না। তা হতে পারে না। বিদ্যাসাগর একটা মহৎ কাজ করেচেন, আবার সেটা বন্ধ হবে? যারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছেল, তাদেরই মধ্যে কিছু মতলববাজ সেপাইদের নামে এ সব রটাচ্ছে।

রাধানাথ বললেন, তবেই বোঝো, রামগোপাল, তুমি তো খুব সেপাইদের নামে সাফাই গাইছেলে। তারা ইংরেজদের হটালে এই সব ভালো ভালো কাজ রদ করে দেবে। ইংরেজী পড়ার ইস্কুলগুলোও বন্ধ করে দিয়ে আবার আরবী-ফার্সী পড়াবে।

রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা ডিরোজিও'র শিষ্যরা নানান ব্যাপারে আমাদের মত প্রকাশ করেচি, উপযুক্ত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েচি, আর এখন দেশে এত বড় একটা কান্ড হচ্চে, আমরা কোনো কতা বলবো না? কোন্‌টা মন্দ তাও জানাবো না?

দক্ষিণারঞ্জন বললেন, ইংরেজ শাসনের দোষ-ত্রুটি ও অবিচার দেকিয়ে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে হবে তো বটেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সংকটের সময় প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরোধিতা না করাই ভালো। ঘটনার গতি কোন্‌ দিকে যায়, সেদিকে আমাদের এখন শুধু লক্ষ্য রাখাই উচিত কাজ হবে।

জোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়িতেও এই একই সময় একই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কয়েকজন সভ্য এ বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য বসতি নিয়েছেন। নাটক অভিনয়ের নেশা এমনই লেগে গেছে যে কিছুতেই আর মহলা বন্ধ করতে তাদের মন চায় না। মাঝে মাঝেই অবশ্য বিদ্রোহের কথা ওঠে।

অনেক আলোচনার পর বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যরাও সিদ্ধান্ত নিল যে বর্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ইংরেজদের অনেক দোষ আছে সত্য, তবু ইংরেজরা এদেশে মোটামুটি সুশৃংখল, সভ্য শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তার বদলে শিক্ষাহীন, নীতিহীন সিপাহীদের শাসন চালু হলে দেশের চরম দুর্দিন আসবে, চরম অরাজক অবস্থা চলবে। যদুপতি গাঙ্গুলী ও নবীনকুমার সিপাহীদের এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে দু-চারটি কথা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যে যুক্তিপূর্ণ, তীব্র ভাষায় তাদের একেবারে নিরস্ত করে দিল। হরিশের কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিল সকলে।

সেদিন ওদের বৈঠক শেষ হলো অনেক রাতে। পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিনটিতে কলকাতা শহরে কিছুই ঘটলো না। অন্যরা সকলে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো মজলিশ কক্ষে, নবীনকুমার গেল নিজের ঘরে।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল নবীনকুমারের। পার্শ্বে শায়িত সরোজিনীকে ঠেলা দিয়ে ডেকে নবীনকুমার বললো, সরোজ, সরোজ, ওঠো, ওঠো।

সরোজিনী ধড়ফড় করে জেগে উঠে বললো, কী, কী হয়েচে?

নবীনকুমার বললো, আমি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেকলুম। স্বপ্ন কিনা কে জানে। তুমি বাইরে রাস্তায় কোনো শোরগোল শুনতে পাচ্চো? আমি যেন এখুনো শুনচি!

সরোজিনী বললো, কই, কোনো শব্দ নেই তো! সব তো একেবারে শুনশান!

নবীনকুমার বললো, তা হলে স্বপ্নই। আমি কী দেকলুম জানো, সেপাইরা এসে পড়েচে আর কলকেতা শহর একেবারে কব্জা করে নিয়েচে এক লহমায়।

সরোজিনী বললো, ওমা, এ কী সব্বনেশে কতা! এমন স্বপন কেউ দ্যাকে? সেপাইরা এলে আমাদেরও মেরে কুটে শেষ করবে না?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, হরিশ তো তাই বললে। সবাই বললে। আমি স্বপ্ন দেকলুম একেবারে সত্যের মতন। সেপাইরা সব সাহেব মেমদের কচুকাটা কচ্চে। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো।

—কী?

—আমি তো বুঝে গেচি যে ইংরেজই আমাদের পক্ষে ভালো। সেপাইরা বর্বর। ইংরেজ শাসন না থাকলে আমাদেরই বিপদ। কিন্তু স্বপ্নে যখন দেকলুম, সেপাইরা ইংরেজদের মারচে, ইংরেজরা ভয়ে হাউ মাউ কচ্চে আর পোঁ পোঁ দৌড়চ্চে, তখন আমার খুব আনন্দ হলো। আমি আনন্দে নাচতে লাগলুম। বলো, ভারী আশ্চর্য না?

লক্ষ্ণৌ নগরী আবার ইংরেজমুক্ত। দিল্লিতে স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর প্রতিদিন কোলাহলমুখর দরবারে বসছেন এবং এখন সত্যিকারের ফরমান জারি করছেন। সারা উত্তর ভারত জুড়ে চলছে হানাহানি, কাটাকাটি। বিদ্রোহী সিপাহীরা যে ঠিক কতখানি এলাকা দখল করেছে কিংবা ইংরেজ বাহিনী কত জায়গায় পরাজিত হয়েছে বা কোন্ কোন্ শহর পুনর্দখল করতে পেরেছে, তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। ঘটনার চেয়ে রটনার রূপ অনেক বেশী বিচিত্র এবং গতিবেগও প্রচণ্ড।

ইংরেজরা যাকে সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়েছে, ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেকের কাছে তা বিপ্লব বলে প্রতিভাত হচ্ছে। নিস্পন্দ, ঘুমন্ত, অতিকায় ভারত বুঝি জেগে উঠলো এইবার। ভারতীয় বিপ্লবের ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করছে এশিয়ায় ইওরোপীয় উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানব-প্রেমিক এবং বিপ্লববাদীরা প্রকাশ্যে সমর্থন ও অভিনন্দন জানাচ্ছেন ভারতীয় যোদ্ধাদের। কার্ল মার্কস নামে এক ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ইহুদী দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অত্যন্ত উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভারতের সিপাহী যুদ্ধের ঘটনায়। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এই দার্শনিকটি জীবিকার জন্য মাঝে মাঝে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর লেখনী যেমনই ক্ষুরধার, তাঁর মতামতও সেরকমই সুচিন্তিত। ভারতে না এসেও তিনি ভারত সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই পড়াশুনো করছেন। তাঁর মতে, ইংরেজ যদিও জঘন্য, বর্বরোচিত স্বার্থ নিয়েই ভারত শাসন ও শোষণ করতে এসেছে, তবু এই ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে। ভারতের মৃতকল্প, গ্রামকেন্দ্রিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন যুগে। ব্রিটিশের আনা বাষ্পযান, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে ভারতীয় জীবনযাত্রায়। ইংরেজ বুর্জোয়া শিল্পপতিরা নিজেদের প্রয়োজনেই রেলপথ এবং নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করছে, তার ফলে এক শিল্প প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ভারতে। এর পর ভারতের

জনগণ সবল হয়ে ইংরেজের শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে পারলেই পরিপূর্ণ-ভাবে আসবে জনগণের মুক্তি। আর ভারত তথা এশিয়ায় সমাজ সংগঠনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলে তবেই মানবজাতি পৌঁছোতে পারবে পরিপূর্ণ লক্ষ্যে।

কার্ল মার্কস ভাবলেন, ভারতে এই সেই মুক্তির সময়। সিপাহীদের সংগ্রাম সার্থক হবে। তিনি দারুণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন যুদ্ধের অগ্রগতি। তিনি লিখলেন :

"There cannot, however, remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindusthan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindusthan had to suffer before."

এত নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় এবার মুক্তি আসবেই।

মুঘল ভারতের রাজধানী দিল্লি এখন আবার মুঘল সম্রাটের অধিকারে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা কবে মুক্ত হবে? বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের কোনো আস্থা নেই। বাঙালীদের মধ্যে বিশেষত হিন্দুরা ইংরেজের তল্পিবাহক, তাই বাঙালীদের নাম শুনলেই সিপাহীদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। উত্তর ভারতে সিপাহীরা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শোষণের প্রতিনিধি বাঙালী হাকিম-উকিল, ডাক্তার-মোক্তার-কেরানীদেরও পেটাবার জন্য ধাবিত হয়।

খিদিরপুরে জনাব আবদুল লতীফের বাড়িতে এক অপরাহ্ণে একটি নিভৃত বৈঠক বসেছে। মুন্সী আমীর আলী দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। একজন বেশ তরুণ বয়স্ক, অত্যন্ত সুপুরুষ, ধপধপে সাদা চুস্ত্ ও শেরওয়ানী পরা, মাথায় আলমপসন্দ, অর্থাৎ সঁুচোলো টুপী, গলায় একটি মোতির মালা। এঁর নাম আগা আলী হাসান খাঁ, ইনি এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে এবং এঁর বেশভূষা দেখলে বোঝা যায়, ইনি খাস নবাবী দরবারের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অন্য জনের পরনে ধুতি এবং সবুজ রঙের বেনিয়ান, মাথায় ফেজ, মধ্যবয়স্ক, এঁর নাম মুহম্মদ গরিবুল্লা।

এ কক্ষের জানালা ও দ্বার বন্ধ, বাইরে আবদুল লতীফের বিশ্বস্ত নিজস্ব ভৃত্য প্রহরায় রয়েছে। এঁরা কথা বলছেন ফিসফিস করে। আগা আলী হাসান খাঁ গোপনে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন বিদ্রোহীদের দূত হয়ে। কলকাতা দখল করতে না পারলে হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা যাবে না। সেজন্য কলকাতাবাসীরা কী করছে? কলকাতার হিন্দুরা কী বলে?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, বেয়াদব, বাঙালী হিন্দুদের ওপর কোনো ভরসা করে লাভ নেই। বাঙালী হিন্দু একে তো লড়তেই জানে না, তার ওপর কলকাতার মাথা মাথা বড় মানুষ হিন্দুরা সবাই ইংরেজের তাঁবেদার। যত সব হাঁড়ি, মুচি, শুদ্দুর আর গরীব বামুন-কায়েত ইংরেজের গোড় চেটে দশ আধ্‌লার লায়েক হয়েছে। ও হারামখোরদের কথা বাদ দাও! আমাদের মুসলমানদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য আবদুল লতীফের মতন খানদানী ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য চাই।

আবদুল লতীফ বললেন, আমি তৈয়ার। মুসলমানের ইমান রক্ষার জন্য আমি যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

আগা আলী হাসান খাঁ উর্দুতে বললেন, লক্ষ্ণৌতে, কানপুরে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে লড়ছে। আপনারা জানেন বোধ করি, আওয়ধে অনেক হিন্দু

তালুকদারের নিজস্ব রাজোয়ারা বাহিনী আছে। সেইসব রাজোয়ারা বাহিনী এখন সিপাহীদের সঙ্গে লড়ছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হিন্দুদের খুশী করার জন্য আমরা ওদিকে এখন গো-হত্যা নিষেধ করে দিয়েছি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন সে আপনাদের ওদিকে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এদিকের হিন্দুরা বড় বেয়াড়া, বদ-নসীব।

গরিবুল্লা গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমি একটা কথা কইতে পারি?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, হাঁ হাঁ, বলুন, বলুন।

তারপর অন্যদের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, এই জনাব গরিবুল্লা এসেছেন ঢাকা থেকে। ইনি একজন ফরাজী। দুদু মিঞার সাগরেদদের সব খবরাখবর ইনি রাখেন। ইনি গ্রাম দেশের কথা ভালো বলতে পারবেন। আমারও বিশ্বাস, গ্রামদেশ থেকেই আগে লড়াই শুরু করতে হবে।

গরিবুল্লা বললেন, আপনেরা কইলকেতার লোক, আপনেরা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে আমাগো দুদু মিঞারে পুঙ্গিরপুত ইংরাজরা কইলকাতার জ্যালখানায় আটক কইরা রাখসে? হ্যারে আমরা ছাড়ামু, জ্যালখানা ভাইঙ্গা, দুদু মিঞারে বাইর করুম। আমাগো পঁচিশ হাজার লাইঠ্যাল আসে, এক সাথে সব হুড়মুড় কইরা আইস্যা পড়ুম।

মুন্সী আমীর আলী মোটামুটি এই বক্তব্য অনুবাদ করে বোঝালেন আগা আলীকে। তিনি জানালেন যে বাংলার মুসলমানরা কিছুকালের মধ্যে দু'বার বিদ্রোহে মেতে উঠেছিল। প্রথমে তাদের বিদ্রোহ স্থানীয় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে হলেও ক্রমে সরকারের সঙ্গেও সংঘর্ষ হয়। বারাসতে আর নদীয়ায় কৃষকরা তীতু মীরের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান করেছিল। এই তীতু মীর বিখ্যাত ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্য। আগা সাহেব সৈয়দ আহমদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।

আগা আলী বললেন, উনি তো সুন্নি?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি। দয়া করে এখন আর শিয়া সুন্নির প্রশ্ন তুলবেন না। সৈয়দ আহমদের শিষ্য এই ওয়াহাবীরা হিন্দু জমিদার আর নীলকরদের বিরুদ্ধে তো লড়েছেই, এমনকি ইংরেজ কম্পানির ফৌজের সঙ্গেও মুখোমুখি লড়াই দিয়েছে। যুদ্ধে তীতু মীর মারা যান আর তাঁর সহকারীর ফাঁসী হয়। ওয়াহাবীরা সাময়িক ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বটে কিন্তু এখন তারা আবার জমায়েত হচ্ছে। বিদ্রোহী সিপাহীরা বাঙ্গলা আক্রমণ করলে ওয়াহাবীরাও তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। ঠিক কিনা, গরিবুল্লা সাহেব?

গরিবুল্লা বললেন, হ ছায়েব, আপনে ঠিকই কইসেন। এবার শোনেন, আমাগো ফরাজীগো কথা কই।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, দাঁড়ান, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি। ফরিদপুর থেকেই এই আন্দোলনের শুরু। শরিয়ৎউল্লা নামে এক তেজী মুসলমান মক্কা থেকে হাজী হয়ে আসেন, তারপর তিনি প্রচার করতে থাকেন যে আল্লার রাজত্বে সব মানুষই সমান, গরীবের ওপর কর বসাবার কোনো অধিকার জমিদারদের নেই। জমিদার যেমন দরিদ্র প্রজাদের দুশমন, সেই রকম জমিদারদের মদৎ দেয় যে ইংরেজ সরকার, তারাও সাধারণ মানুষের দুশমন। হাজী শরিয়ৎউল্লার ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ফরাজীদের নেতা হন। শুনেছি প্রায় লাখখানেক ফরাজী এই দুদু মিঞার নেতৃত্বে জান দেবার জন্য তৈয়ার ছিল। কয়েক জায়গায় লড়াইয়ের পর দুদু মিঞা ইংরেজের হাতে ধরা পড়েছেন এবং জেলে আছেন। কিন্তু দুদু

মিঞার শিষ্যরা এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রস্তুত। কী, ঠিক বলেছি?

গরিবুল্লা বললেন, হ। জ্যালখানা থিকা দুদু মিঞা তেনার দামাদরে পত্তর ল্যাখসেন যে তেনারে একবার বাইর করাইতে পারলেই তিনি পুঙ্গির পুত ইংরাজদের ঘেটি ভাঙবেন! আমি সেই খবর লইয়া আইসি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, খুব ভালো কথা!

গরিবুল্লা বললেন, আরও একটা কথা আসে। ছায়েব, আপনেরা হিন্দুগো বাদ দেওয়ার কথা কইলেন না? তাইলে শোনেন। আমি মাহেদিগঞ্জ থানার করপায়া গেরামে গোলাম নবী কাসেদের বাড়ি গেসিলাম। হেহানে গিয়া দেহি, ফরাজীগো মইধ্যে কিছু হিন্দু লাইঠ্যালও বইস্যা আছে। তারাও ফরাজীগো লগে লগে ইংরাজদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। তারাও গরীব পরজা। গোলাম নবী কাসেদ কইলেন, হ, আমরা হিন্দুগোও দলে নিমু। আমরা ফরাজীরা মনে করি, সব গরীব মানুষই সমান। তয় হিন্দু গো বাদ দিমু ক্যান? হিন্দু জমিদার, মুসলমান জমিদার হক্কলডিই আমাগো দুশমন।

জনাব আব্দুল লতীফ সন্দেহসংকুল নয়নে চাইলেন গরিবুল্লার দিকে। এ যে অন্য সুরে কথা বলে! মুন্সী আমীর আলী অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো কথা। কিছু হিন্দু লাঠিয়ালকে যদি আমরা সঙ্গে পাই তো বেশ কাজে লাগানো যাবে তাদের। এখন আমাদের প্রধান শত্রু ইংরেজ, সেই কথাই ভাবুন, অন্য প্রসঙ্গ আনবেন না। আমরা হিন্দুস্তানে আবার মুঘল শাসন কায়েম করতে চাই।

আগা আলী বললেন, না, লক্ষ্ণৌতে আমরা মুঘল শাসন চাই না। মুঘলরা সুন্নি। আমাদের আয়ওধে পবিত্র শীয়া ইসনা অশীরী ধর্ম মানি। মুঘলরা দিল্লিতে থাক, কিন্তু আওয়ধ পৃথক থাকবে।

মুন্সী আমীর আলী বিচলিত ভাবে বললেন, আগা সাহেব, ও কথাও এখন তুলবেন না। শীয়া হোক, সুন্নি হোক, ইংরেজ হটিয়ে ইসলামেরই তো জয় হবে। আওয়ধের নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ তো কখনো শীয়া-সুন্নির বিভেদ মানেননি শুনেছি। ওসব থাক, এখন লক্ষ্ণৌয়ের কী হাল আমাদের বলুন।

আগা আলী বললেন, লক্ষ্ণৌ এখন পরিপূর্ণ স্বাধীন। মীরাট থেকে বাগী সিপাহীরা গেছে দিল্লি দখল করতে আর এলাহাবাদ-ফয়জাবাদ থেকে বাগী সিপাহীরা লক্ষ্ণৌতে এসে লাগিয়ে দিয়েছিল গদর। স্থানীয় লোকরাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। ইংরেজরা ভয়ে পালিয়ে বেলি গারদে আশ্রয় নিয়েছে। বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিল নবাব ওয়াজীদ আলী শাহেরই এক পুত্রকে। তার নাম বীরজীস কদ্রু, তার উমর মাত্র দশ বৎসর।

আবদুল লতীফ বললেন, দশ বৎসরের বালক নবাব? বলেন কী?

আগা আলী বললেন, শাহী বংশের কারুকে তো বসতে হবে। লক্ষ্ণৌয়ে আর কেউ নেই ও বংশের। বীরজা কদ্রুসের জননী বেগম সাহেবা হযরত মহল হয়েছেন তার মুগতার। তিনিই আড়াল থেকে দরবার চালাচ্ছেন।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, কিন্তু এক বালক আর এক নারী কতদিন আয়ওধের স্বাধীনতা রক্ষা করবে? সৈন্যদের পরিচালনা করবে কে?

আগা আলী বললেন, সিপাহীদের সামলানোই মুশকিল। প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করছে নবাব। ফয়জাবাদের বিদ্রোহীদের নেতা এহমদউল্লাহ শাহ একজন নাম-করা যোদ্ধা। তিনি নিজেই সেনাপতি হয়ে পৃথক দরবার বসাচ্ছেন। বেগম সাহেবা হযরত মহল এক রকম ফরমান দিচ্ছেন আবার এহমদউল্লাহ অন্য রকম ফরমান

দিচ্ছেন। প্রচুর গোলমাল। আমি চেষ্টা করেছি দুই দরবারের সংযোগ সাধন করতে। তবু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এই সময় আমায় কলকাতায় আসতে হলো।

বাকি সকলে নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। কল্পনায় অঙ্কিত করবার চেষ্টা করলেন লক্ষ্ণৌয়ের দৃশ্য। মুন্সী আমীর আলী সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, সেইজন্য অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। কিন্তু অন্য দুজন বাংলার বাইরের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ।

আগা আলী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দুটি। সুবে বাংলায় সিপাহী গদরের শুরু। কিন্তু তারপর আর কিছু হলো না। এখানকার সিপাহীদের জাগাতে হবে এবং তাদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। এবং বাদশা ওয়াজীদ আলী শাহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে লক্ষ্ণৌ নগরীতে। সবচেয়ে ভালো হয়, তিনি যদি এখানকার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, তাদের সাহায্যে কলকাতা দখল করেন। তা হলে বিজয়ীর বেশে তিনি ফিরতে পারবেন লক্ষ্ণৌতে।

মুন্সী আমীর আলী এবং আবদুল লতীফ পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মুন্সী আমীর আলী আড়ষ্টভাবে বললেন, জনাব, এ চিন্তা আগেই আমার মাথায় এসেছিল। বাংলার মুসলমান আর সিপাহীদের নেতৃত্ব দেবার প্রস্তাব নিয়ে আমরা দুজন দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম নবাব সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে।

আগা আলী জিজ্ঞেস করলেন, বাদশা আপনাদের প্রস্তাব মানলেন না?

মুন্সী আমীর আলী বললেন, ওয়াজীদ আলী শাহের কাছে পহুঁছোতেই পারলাম না। নবাবের সুযোগসন্ধানী দোস্ত শাগির্দ-এর অন্ত নেই। তারা অন্য লোকদের নবাবের কাছ ঘেঁষতে দেয় না। আপনাকে কী বলবো আগা সাহেব, ইসলামে নাচগান অতি গুনাহ্। আর নবাব কি না সর্বক্ষণ তা নিয়েই মেতে আছেন। আরে ছিয়া ছিয়া তোবা তোবা!

আগা আলী বললেন, ও সব কথা আমি জানি। বাদশাহের ওখানে গিয়ে আর কী দেখলেন বলুন।

মুন্সী আমীর আলী বললেন. দেখে শুনে মনে হয়, নবাব আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা মনে করছে. তারা যেন লক্ষ্ণৌয়ের কায়সর বাগেই রয়েছেন। শুধু বিলাসিতার স্রোত। রাজ্য গেচে সেদিকে হুঁশ নেই, নবাব এখনো রমণী সম্ভোগেই মত্ত। চাকরাণী মেথরাণী জাতীয়া স্ত্রীলোকদেরও তিনি মুত্আ করে বেগম মহলে স্থান দিচ্ছেন।

আগা আলী বললেন, নবাবকে এই পঙ্কিল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। আপনারা একটু ব্যবস্থা করে দিন, যাতে নবাবের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে পারি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, সে বড় শক্ত কাজ হবে।

আগা আলী বললেন, শুনুন, স্বয়ং বাদশাহ আমাকে দেখলেই চিনবেন। তাঁর শাগির্দরাও অনেকেই আমাকে চেনে। মুখ দেখে না চিনলেও নামে চিনবে। আমার পক্ষে দেখা করা শক্ত কাজ নয়। কিন্তু আমার ওপর ইংরেজদের নজর আছে। জানেন, আমি এখানে এসেছি অতিশয় গোপনে। ইংরেজ একবার আমার সন্ধান

পেলে আমার এই প্রিয়তম মুন্ডটি আর আমার ধড়ের ওপর শোভা পাবে না। সেইজন্যই আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আপনারা এমন কোনো ব্যবস্থা করুন, যাতে আমি কোনো কৌশলে, ইংরেজের অগোচরে বাদশাদের নূরে মহলে পৌঁছুতে পারি। আমি শুধু বিলাসপ্রমত্ত বাদশাহের সামনে গিয়ে বলবো, "অ্যায় খুল বতুখুর সনদম তু বুঅ্যায় কসে দারী" (ওগো ফুল এখনো আমি তোমার প্রতি মুগ্ধ, তোমাতে ও কিসের সৌরভ!)

মুন্সী আমীর আলী একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, একটি মাত্র উপায়ই বাৎলানো যায়। আমি যতদূর জানি, নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ যে এই বিলাসের স্রোতে ডুবে আছেন, এতে কোম্পানির সরকারের প্রশ্রয়ই আছে। নবাব এখনো ইংরেজের কাছ থেকে খোরপোশ গ্রহণ করেননি, নিজেকে এখনো তিনি রাজ্যচ্যুত স্বাধীন নবাবই মনে করেন। নবাবের জননী ইংলন্ডে গেছেন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে।

আগা আলী বললেন, এ সব তো আমরা জানি, আপনি এখন কী করা যায়, সেই কথা বলুন!

মুন্সী আমীর আলী পেশায় আইনজীবী, তাই যে-কোনো বক্তব্যই তিনি সবিস্তারে এবং পটভূমিকা অঙ্কিত করে বলতে ভালোবাসেন। অন্য সকলকে তাঁর চেয়ে অজ্ঞ মনে করাও তাঁর স্বভাব। তিনি হাত তুলে বললেন, আগে সব শুনুন, তা হলে বুঝবেন। যা বলছিলাম, ব্রিটিশ আদালত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলে না। কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে জেনারেল উট্রাম বেআইনীভাবে আয়ওধ দখল করেছে। ব্রিটিশ আদালতের মামলায় কোম্পানি হেরে যেতে পারে। নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ আবার ফিরে পেতে পারেন তাঁর রাজ্য। সেইজন্য কোম্পানি চাইছে...

—মুন্সীজী, এ সব কূট কথা পরে শোনা যাবে। আমি চাই তুরন্ত বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে।

—কোম্পানির ফৌজ ওয়াজীদ আলী শাহের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। দেখা করতে গেলেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন। সেইজন্যই বলছিলাম, দেখা করার একটাই উপায় আছে। কোম্পানি চায় নবাব যত খুশী বিলাসে মত্ত থাকুক। নবাবের সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যাক।

—আমাদের বাদশাহের কাছে প্রচুর ধনরত্ন আছে।

—আপনি ওয়াজীদ আলী শাহকে বাদশাহ বলছেন। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ একজনই, তিনি বাহাদুর শাহ জাফর। সে যাই হোক, আপনি নবাবের বিলাসের বহর দেখেননি, দেখলে বুঝবেন, দৈনিক কত মুদ্রা ব্যয় হয়। তাঁর শত শত মুসাহিব আর শাগির্দ। আর আছে হাজার হাজার জানোয়ার আর চিড়িয়া আর স্ত্রীলোক। এ সব পুষতে কত খরচ হয় জানি না। যেখানে আয় নেই শুধু ব্যয় সেখানে অফুরন্ত ধনরত্নও একদিন ফুরিয়ে যায়। ইংরেজ কোম্পানি চায় নবাবের অর্থ ফুরিয়ে যাক। তারপর নবাব কোম্পানির কাছে খেসারত আর পেনসনের তনখা চাইতে বাধ্য হোক। ব্যস, একবার নবাব কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিলেই মামলা চুকে গেল। আয়ওধের ওপর নবাবের আর কোনো দাবি থাকবে না। বীরজীস কদ্র যতদিন লক্ষ্মৌয়ের সিংহাসনে আছে, তার মধ্যে এটা হয়ে গেলেই ইংরেজের লাভ। কারণ, লক্ষ্মৌ এখন ইংরেজের অধিকারে নেই। সুতরাং লক্ষ্মৌ ফিরিয়ে দেবার মামলা এখন অচল।

—আমরা দেশ থেকে ইংরেজকেই তো উচ্ছেদ করে দিচ্ছি। তার মধ্যে এত

মামলা মোকদ্দমার কথা কেন? মামলায় কিছু হবে না। তলোয়ার বন্দুকে ফয়সালা করতে হবে। আপনি ওয়াজীদ আলী শাহের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন আমার।

—নবাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে রেন্ডী কিংবা নাচনেওয়ালী সাজতে হবে, পারবেন? আপনার চেহারা খাপসুরৎ আছে, আপনাকে মানিয়ে যাবে, কিন্তু এই বুড়ো বয়েসে আমি মাগী সাজবো কী করে? রেন্ডী, নাচনেওয়ালী ছাড়া আর অন্য কারুকে এখন ইংরেজের প্রহরীরা নবাবের বাড়ির কাছ ঘেঁষতে দিচ্ছে না!

আগা আলী অধীরভাবে বললেন, মুন্সীজী, আপনি অযথা সময় বরবাদ করছেন। শহর কলকাত্তায় কি ঘুংঘটওয়ালী, নটকনওয়ালীর অভাব আছে? শুনেছি তো রাতের সময় এখানে হুরীর মেলা বসে। যত টাকা লাগে লাগুক, আপনি দু-চারটি বেশ মনজিলওয়ালী ধরনের রেন্ডী ভাড়া করুন। তাদের সঙ্গে আমরা দুজন তবলিয়া, সারেঙ্গিয়া সেজে বাদশার নূর মহলে ঢুকে যাবো।

—আপনি খানদান বংশের লোক, আপনি কি ওরকম ভেক ধরতে পারবেন?

—ইংরেজ হঠাবার জন্য আমি এখন সব কিছু করতে পারি।

অল্পক্ষণ পরে সেদিনকার মতন গোপন সভা ভঙ্গ হলো। ঠিক সুবিধা মতন রূপসী নর্তকী সংগ্রহ করতে সময় লেগে গেল আরও দুদিন। মৌলা আলীর দরগার কাছেই চাঁদবিবি নামে এক নামকরা মালকান আছে, তার কুঠীতে সে দশ-বারোটি বিদ্যুৎ প্রভাময়ী রূপসী গুণবতী তয়ফাওয়ালী পোষে। তার মধ্য থেকে বেছে বেছে, এক নজরেই মস্তক ঘূর্ণিত হবার মতন চেহারার দুটি যুবতীকে ভাড়া করা হলো অগ্নিমূল্যে।

মুন্সী আমীর আলী এবং আগা আলী নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। দুদিন তাঁরা মুখমুন্ডন করেননি, পরণে ঢোলা পাজামা ও শস্তা সিল্কের বেনিয়ান। মুখ ভর্তি পান, সেই পানের পিক গড়িয়ে পড়েছে জামায়, গলায় লাল রঙের রেশমী রুমাল বাঁধা, মাথায় চকচকে জরির টুপী উল্টাভাবে বসানো। মুন্সী আমীর আলী জীবনে কখনো সুরা পান করেননি, তবু চক্ষু দুটি ঢুলু ঢুলু করে রেখেছেন, হাতে সারেঙ্গী, কিন্তু তিনি ছড় টানতেও জানেন না।

মেটিয়াবুরুজে পর পর অনেকগুলি বাড়ি নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গো সমেত আস্তানা গেড়েছেন নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ। পাল্কি থেকে সেখানে নেমে আগা আলী বুঝলেন যে মুন্সী আমীর আলী ঠিক কথাই বলেছেন। একদল গোরা সৈন্য সেখানে পাহারা দিচ্ছে, উটকো লোক নবাব মহলে প্রবেশ করতে চাইলে জিজ্ঞেসবাদ করা হচ্ছে তাদের।

মুন্সী আমীর আলীর কাজ পাকা। তিনি সঙ্গে করে একটি নকল এত্তেলা পত্র নিয়ে এসেছেন। গোরা সৈন্যরা কিছু প্রশ্ন করার আগেই তিনি পত্রটি দাখিল করে বোঝাতে চাইলেন যে নবাবের দরবারের আহ্বানেই তাঁরা এসেছেন। গোরা সৈনিক দেখে আগা আলীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, জোর করে তিনি মাতালের ভান করতে লাগলেন। ইংরেজ প্রহরীরা অবশ্য বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করলো না, পত্রখানি যাচাই করলো না তারা, জড়ির চুমকি বসানো নীল ওড়না পরা দুই সুন্দরীকে দেখেই তারা মৃদু হাস্য করলো এবং হাতের ইঙ্গিতে জানালো, যাও, যাও।

সদর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলী হাঁফ ছাড়লেন। আর কোনো ভয় নেই, নবাব মহলের মধ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা, কে কোন্ দিকে আসছে না যাচ্ছে, তাতে কারুর কোনো খেয়াল নেই। এখন প্রশ্ন, নবাবকে খুঁজে বার করা। এর মধ্যে একটি উৎপাত এই যে, যার কাছেই কিছু প্রশ্ন করা যায়, সে-ই আগে টাকা চায়। উৎকোচ বা বখশিশ না পেয়ে কেউ মুখ

খুলবে না। যাই হোক, কোনোক্রমে জানা গেল যে নবাব এখন আছেন সুরসেস্ মঞ্জিলে। পাশের উদ্যানটি পার হলেই সেই মঞ্জিল।

সেই মঞ্জিলে প্রবেশ করার পর সমস্যা হলো, কোন্ কক্ষে নবাব আছেন সেটা জানা। পর পর দুজন ভৃত্যকে উৎকোচ দেবার পর, তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে আগা আলী উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সেই ভৃত্যের টুঁটি চেপে ধরে আগা আলী বললেন, বেওকুফ্, বল কোথায় বাদশা আছেন? সে ভৃত্যটি জোর করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই আগা আলী বসনের অভ্যন্তর থেকে একটা ছুরি বার করে বললেন, এখনি তোর কলিজা ছিঁড়ে নেবো!

ভৃত্যটি কাঁপতে কাঁপতে তখন দ্বিতলের একটি কক্ষের কথা জানালো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় আরও দু-একজন লোক বাধা দেবার চেষ্টা করতেই আগা আলী সবলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন তাদের। তারপর নর্তকী দুটির দিকে চেয়ে চক্ষু নরম করে বললেন, তোদের কাম ফতে হয়ে গেছে, এখন যেখানে খুশী যা। খবর্দার কারুর কাছে মুখ খুলবি না।

আগা আলী গলা থেকে রুমাল খুলে ফেললেন এবং ছুরিকাটি আবার গোপন করলেন। তারপর এক ধাক্কায় খুলে দিলেন নির্দিষ্ট কক্ষটির দ্বার।

বিকেল ও গোধূলির সন্ধিক্ষণে নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ পাঁচজন সঙ্গীসহ সেই কক্ষে নামাজ আদায় করছিলেন। আগা আলী ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে টুপী খুলে নত মস্তকে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই নামাজ শেষ হলো, নবাব মুখ তুলে চাইলেন আগন্তুকদের দিকে। আগা আলী কুর্নিশ করতে করতে পাঁচ পা এগিয়ে তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং নবাবের পা ছুঁয়ে কদমবুসী করলেন। তারপর ফারসী ভাষায় বললেন, বাদশাহের ভৃত্য আগা আলী হাসান খাঁ অনেক কষ্ট করে হুজুরের সমীপে হাজির হয়েছে। বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন। হুজুর তাঁর এই ভৃত্যটিকে চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই।

নবাবের অঙ্গে সাদা রেশমের আঙরাখা, তার তলায় হালকা নীল রঙের শলুকা (ছোট জামা)। প্রখর গ্রীষ্মে তাঁর ললাট ঘর্মসিক্ত। আগা আলীর কথা শোনার পর তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মুন্সী আমীর আলীর দিকে। এত রকম উত্তেজনার মধ্যে মুন্সী আমীর আলী গলায় রুমাল এবং মাথায় টুপী খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি সেগুলি খুলে বারবার কুর্নিশ করতে লাগলেন।

নবাব দণ্ডায়মান দুই আগন্তুকের উদ্দেশে বললেন, বয়ঠো!

আগা আলী বললেন, হে বাদশা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি অতি জরুরী ও গোপন কথা আছে, সেগুলি আমি আপনাকে নিভৃতে বলতে চাই।

নবাব এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না এবং তাঁর সঙ্গীদেরও যেতে বললেন না। আগা আলী নিজেই গরম চক্ষে লোকগুলির দিকে তাকালেন। সেই লোকগুলি সম্ভবত আগা আলীকে চিনতে পেরেছে, তাই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেরাই উঠে গেল।

আগা আলী নবাবের উদ্দেশে বললেন, হুজুরে আলম নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছেন? যে মসীহউদ্দীন খাঁ-কে আপনি মুখতার-এ আম দিয়ে বিলায়েতে পাঠিয়েছেন মামলা দাখিল করবার জন্য, আমি সেই মসীহউদ্দীন খাঁ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হুজুরে আলম অনেকবার আমাকে দেখেছেন।

নবাব নীরব রইলেন।

তারপর আগা আলী শোনালেন বর্তমান লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থা। ওয়াজীদ আলীর

সন্তান বিরজীস কদ্র এখন লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনে আসীন, তার নামে মুদ্রাও বার করা হয়েছে, প্রজারা আবার কর দিচ্ছে। এখন সকলেরই ইচ্ছা বাদশাহ আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসুন। বাঙ্গালায় মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। হুজুরে আলম একবার ডাক দিলেই সকলে তাঁর অধীনে জমায়েত হবে, তখন সহজেই কলকাতা দখল করা যাবে।

মুন্সী আমীর আলী এবার শোনালেন ফরাজী এবং ওয়াহাবীদের প্রস্তুতির কথা। চট্টগ্রাম, ঢাকা, মেদিনীপুরের সিপাহী ব্যারাকেও উত্তেজনা চলছে, যে-কোনো দিন সিপাহীরা বিদ্রোহ করতে পারে। শুধু শাহী বংশের কারুর নেতৃত্বের অপেক্ষা।

নবাব সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি দুই বক্তার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করতে লাগলেন, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

আগা আলী আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তুললেন বিদ্রোহের চিত্র। দিল্লিতে সিপাহীদের জয়লাভের কাহিনী। লক্ষ্ণৌতে এখন বইছে খুশীর জোয়ার। নবাবেরই বেগম হযরত মহলের নামে প্রজারা দিচ্ছে জয়ধ্বনি।

মুন্সী আমীর আলী বললেন, নবাব যদি এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গোপনে কোথাও অবস্থান করতে চান, তাহলে সে ব্যবস্থাও করা আছে।

নবাব ওয়াজীদ আলী শাহ সময় বিশেষে বাক্‌সংযমী হিসেবে বিখ্যাত। এখন তিনি একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নীরব নিথর হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে কোনো ভাবের রেখাই ফুটলো না।

আগা আলী কাতরভাবে বললেন, হুজুরে আলম, কিছু বলুন!

কোনো উত্তর না দিয়ে নবাব উঠে দাঁড়ালেন। পেছনের দরজা দিয়ে তিনি চলে গেলেন পাশের কক্ষে। তারপর সেখানে একেবারে সাদা একটি দেয়ালের কাছে চলে গিয়ে, দেয়ালে নাসিকা ঠেকিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন উচ্চস্বরে।

নবাবের কান্নার আওয়াজ শুনে তাঁর অনেক সহচর-অনুচর ভিড় করে দাঁড়ালো সেই কক্ষের কাছে। আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলীও অপ্রস্তুত।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেয়ালের দিকে মুখ করে ক্রন্দন করলেন নবাব। তারপর মুখ ফেরালেন এক সময়। তাঁর বস্ত্র ভিজে গেছে অশ্রুধারায়। নবাব অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "খোআব থা জো কুছভী দেখা, জো সুনা আফসানা থা।" যা কিছু দেখেছি, সবই স্বপ্ন, যা কিছু শুনেছি, সবই কাহিনী।

তারপরই তিনি ডাক পাঠালেন কলমচীর উদ্দেশে। সে হাজির হতে তৎক্ষণাৎ মুসাবিদা করা হলো একটি পত্রের। নবাব কোম্পানির সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে বিদ্রোহীরা এসে তাঁকে উস্কানি দিচ্ছে, তিনি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চান না একটুও। ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি আগেও লড়াই করেননি, এখনো লড়াই করবেন না। এবং এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে বাইরে থাকাও নিরাপদ নয়, সরকার বাহাদুর যেন তাঁকে কেল্লার মধ্যে স্থান দেন।

পত্রপাঠ ইংরেজ সরকার নবাবকে নিয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়ামে। আগা আলী এবং মুন্সী আমীর আলীও বন্দী হলেন তাঁদের রাখা হলো ফৌজি গারদে।

কেল্লায় নিরাপদে অবস্থানের জন্য নবাবের নিজস্ব জিনিসপত্রের সঙ্গে এলো সতেরোটি বালিশ। দুদিকে পাশ ফিরে শোবার সময় নবাবের দুই কানের জন্যও ছোট দুটি কান-বালিশ লাগে। সেই বালিশের স্তূপের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে থেকে নবাব আবার মন দিলেন কবিতা রচনায়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের মহানুভবতার জন্য তাঁর প্রতি প্রশস্তিমূলক এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন।

হীরা বুলবুলের তীর্থ দর্শনের সাধ দিন দিন বেড়েই চলছিল। রাইমোহন নানারূপ ওজর আপত্তি তুলে টালবাহানা করছিল বলে এক সময় জেদ ধরল যে রাইমোহনকে বাদ দিয়ে সে নিজেই সব ব্যবস্থা করবে। এখনো তার অর্থের অকুলান নেই। দেহ-ব্যবসায় এবং সংগীত-বৃত্তি পরিত্যাগ করার পর এখন সে তার বেশভূষার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না. সাধারণ আটপৌরে শাড়ি পরে বাড়িতে থাকে। কলকাতার মাথা মাথা বাবুদের দেওয়া বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার তার কাছে রয়ে গেছে। রাইমোহনের অগোচরেই একদিন সে তার অনেকগুলি বিক্রয় করে দিয়ে এলো গুপী স্যাকরার দোকানে। এই অর্থ দিয়ে সে এবার বজরা ও লোক-লস্কর ভাড়া করবে। সে মনস্থ করেছে, সে যাবে জগন্নাথধামে। পতিতপাবন সকলকেই আশ্রয় দেন, তার মতন পতিতাকেও কি তিনি উদ্ধার করবেন না!

যথাসময়ে সব জানতে পেরে রাইমোহন একেবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। হীরা বুলবুলকে সে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে এই সময় কি কেউ বিদেশ বিভূঁয়ে যায়! সেপাইদের হেঙ্গামা চলছে। চতুর্দিকে নানা রকম উৎপাত, দেশে একেবারে যেন অরাজক অবস্থা। এই সময় পথে-ঘাটে পদে পদে বিপদের ভয়। কিন্তু হীরা বুলবুল এসব কিছুই বুঝবে না। সে অনাথিনী, তীর্থযাত্রিণী, তার আবার ভয় কি!

এই পড়ন্ত যৌবনেও যে তার শরীরে মোহ উদ্রেককারী রূপ রয়েছে, সে বিষয়ে সে একেবারেই উদাসীন।

শেষ পর্যন্ত হীরা বুলবুলের একগুঁয়েপনার কাছে রাইমোহনকে বশ্যতা স্বীকার করতে হলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভায় ইদানীং তার যাতায়াত একটু কমে গিয়েছে, সেখানকার নাট্য-অভিনয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত আছে। সিপাহী যুদ্ধের যে-কোনো রকম নিষ্পত্তি না হলে নতুন করে কিছু শুরু করা যাবে না। রাইমোহন নিজে কখনো শ্রীরামপুরের ওদিকে কোথাও যায়নি। সুতরাং হীরার সঙ্গে যাওয়াই সে মনস্থ করল। জগন্নাথক্ষেত্র অতি প্রাচীন তীর্থস্থান, দেখাই যাক না গিয়ে একবার।

রাইমোহনের খুব একটা দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই। জীবনের বহু রকম ঘূর্ণি-পাকে পড়ে সে বুঝেছে যে যথাসময়ে যথারীতি কৌশল প্রয়োগ করাই জীবন ধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা। যার পুরুষকার থাকে, সে সমাজের তুঙ্গে ওঠে, যার থাকে না, কোনো ঠাকুর দেবতা তার কান ধরে টেনেও তাকে ওপরে তুলতে পারে না। যে-যাতে আমোদ পায় তাই নিয়েই সারা জীবন মজে থাকে। কেউ ভালোবাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, কেউ অর্থ, কেউ সন্তান উৎপাদন, কারুর থাকে রূপ-লালসা, কারুর বা শুধুই ফক্‌কুড়ি। রাইমোহনের ঝোঁক এই শেষোক্ত দুটির দিকেই। তাই নিয়েই তো প্রায় এতখানি জীবন কাটলো।

একটা বড় বাসনা ছিল রাইমোহনের, কিন্তু হীরা বুলবুলের জন্য সেটি পূর্ণ হলো না। সে চেয়েছিল সর্বসমক্ষে এই শহরের কিছু বড় মানুষের মুখোশ খুলে দিতে। তাদের কীর্তি কাহিনী নিয়ে সে গান বাঁধবে, আর হীরা বুলবুল গাইবে।

জনসাধারণ ধিক্কার দেবে তাদের, এইভাবে হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া যেত। কিন্তু হীরা বুলবুলের আর ওসবে মন নেই, গান গাওয়াও সে সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে। পুত্রশোক তার বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে, জীবনের আর কিছুতেই তার আর সাধ নেই, কথাবার্তার মধ্যেও একটু যেন পাগল পাগল ভাব।

রাইমোহনের নিজের কণ্ঠ সুরেলা নয়, সে সঙ্গীত শিক্ষক, কিন্তু গায়ক নয়, তার গান কেউ শুনবে না। সেইজন্য সে এখন মধ্যে মধ্যে ভাবে যে বড় মানুষের কেচ্ছা সমন্বিত গানগুলি সে লিখে পুস্তকাকারে ছাপাবে বেনামীতে, তারপর হাটে-বাজারে বিলি করবে।

একটি বজরা ভাড়া করা হলো আসা-যাওয়ার চুক্তিতে। দুজন হিন্দুস্থানী বরকন্দাজও নেওয়া হলো সঙ্গে। শুভদিন শুভ লগ্ন দেখে এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়। যাত্রার প্রাক্কালে হীরা বুলবুল রাইমোহনকে বললো, তুমি যে আমার আঁচল ধরে যাচ্চো, একটা কতা কিন্তু মনে রেকো, আমি আর না ফিত্তেও পারি। যদি মন চায়, আমি সেখানেই ঠাকুরের চরণে পড়ে থাকবো।

রাইমোহন বললো, তুই কি জগন্নাথ ক্ষেত্তরে গিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হবি নাকি রে বেটী? না ফেরার কতা বলচিস! যাবো, দেকবো, ফুত্তি করবো, ফিরে আসবো, এই হলো গে কতা!

—তিথ্যির এস্থানে গে ফুত্তি? ফের ও-কতা বললে ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো একেবারে।

—আরে ফুত্তি তো তোর সঙ্গে, অন্য কারুর কতা কি বলচি! অরে শোন, তিথ্যিস্থানে বেশী দিন থাকলে পুণ্যের ফল হয় না। কতায় বলে তিথ্যি দর্শন, তিথ্যি থাকন কেউ বলে?

—তোমার ওসব ছেঁদো কতায় আমি ভুলচিনি। আমার মন না চাইলে আমি আর ফিরবো না। এই আঁস্তাকুড়ের জায়গায় আমার কি ফেরার ঠেকা? তোমার খুশী হয় তুমি ফিরো।

—আমায় ছেড়ে তুই থাকতে পারবি? তোর মন কাঁদবে না?

—মরে যাই, মরে যাই! থু থু থু! তোমায় দেকলে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়। অলপ্পেয়ে, ঢ্যামনা! বেম্মদৈত্যির মতন আমার ওপর চেপে আচে, সারাটা জেবন একেবারে জ্বালিয়ে খেলে গা! কতায় বলে, যে বেটা রাঁড়ের ভাতার, তার নেই গুণের ওধার!

—আহা রে, মধু, মধু! আরও বল! রাগলে তোর মুক দিয়ে মণি মুক্ত ঝরে, কান যেন জুড়িয়ে যায়। একেই বলে শ্রবণ সাত্থক, নয়ন সাত্থক!

—তোমার তো দু কান কাটা, নাকও কাটা। ঐ হাড়গিলের মতন চোক দুটো যদি কেউ গেলে দিত!

—এ যে সেই গান হলো গে, 'ওরে প্রাণ প্রাণ রে বাকি নেই আর/নাক কাটাতে নাক কান কাটা প্রাণ তোমার হলো লাজে মরে যাই...' একটু শোনাবি?

—চোপ। যা বললুম মনে রেকো, পরে যেন আমায় দুষো না। আমি যদি আর না ফিরি...

—ওরে আমার হীরেমণি, তুই না ফিরলে কি আমি ফিরতে পারি? তোর ছিচরণে প্রাণ মন সঁপে একবার যখন ঠাঁই নিয়িচি, তখন তোর সঙ্গে তো আমি নরকেও যাবো! তিথ্যিস্থান তো ভাগ্যের কতা।

—ঠিক আচে, দেকো বাবু, যেন তখন পেঁচপাও হোয়ো না।

—তোকে যদি আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি তা হলে আমার নাম রাইমোহন ঘোষালই নয়। তখন দেকিস, আমি সত্যিই নাক কান কাটবো!

শরৎকাল, ঝড় বাদলার তেমন ভয় নেই, বজরা চললো তরতরিয়ে। একবার ভাবা হয়েছিল, জলপথের বদলে স্থলপথে গেলে কেমন হয়। রাজা সুখময় রায় পুরী যাত্রীদের জন্য উলুবেড়ে থেকে কটক পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে ধর্মশালা। স্নান ও পানীয়ের জন্য পুষ্করিণী ও কূপ-ও খনন করিয়েছেন অনেকগুলি, সেইজন্য এখন স্থলপথ দিয়েই জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু হীরা বুলবুল এবং রাইমোহন দুজনেই বেশ কয়েকবার বাবুদের সংগে গংগাবক্ষে বজরা ভ্রমণে এসেছে, জলপথে তারা অভ্যস্ত, সেই তুলনায় ডুলি-পাল্কিতে যাত্রা তাদের কাছে আরামদায়কও মনে হয়নি।

রাইমোহন আশা করেছিল যাত্রাপথটি বজরা বিহারের মতন মনোরম হয়ে উঠবে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কোন বাবু নেই, কিন্তু সে নিজেই বা কম কী, বিশেষত হীরা বুলবুলের মতন সঙ্গিনী রয়েছে যখন। জ্যোৎস্নার রাতে হীরা বুলবুল আবার আগেকার মতন জড়ির চুমকি বসানো গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে সজ্জিত হবে, কপালে থাকবে চন্দনের টিপ। আর সে নিজে কোঁচানো ধুতি ও হলুদ রেশমী বেনিয়ানটি পরে বসবে। হাতে গোড়ের মালা, সামনে সুরার পাত্র। মুখের রঙ জ্বলে গেছে, ত্বক কুঞ্চিত হয়েছে, তবু এই বৃদ্ধ বয়েসেও তার চেহারাটি একেবারে ফেলে দেবার মতন নয়। হীরা বুলবুল গানে বাতাস মাতোয়ারা করবে, আর সে নেশার ঝোঁকে, মেরে ফেল, মেরে ফেল, মেরি জান বলে উঠবে! হীরেমণির কণ্ঠে সুরের তিন লহরী খেললে সে মোহর ছুঁড়ে উপহার দেবে তাকে। এই উপলক্ষে সে বেশ কয়েক বোতল ব্র্যাণ্ডি এবং একজন তবলিয়াকেও সংগে করে এনেছে।

কিন্তু হীরা বুলবুল এর কিছুই হতে দিল না। সে একখানা সামান্য কস্তা ডুরে তাঁতের শাড়ি পরে থাকে। কিছুতেই আগের মতন বসন ভূষণ অংগে চাপাতে রাজি নয়। গানের কথা শুনলে সে মুখ ঝামটা দেয়। এমনকি, এক রাত্রে দীপ্ত নক্ষত্রময় নীল আকাশ দেখে মোহিত হয়ে রাইমোহন ব্র্যাণ্ডি ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে যেই নিজের ভাংগা গলায় একটা গান গেয়ে উঠলো, অমনি বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হীরা বুলবুল তার হাত থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল কেড়ে নিয়ে শূন্যে তুললো। রাইমোহন আহা হা করচিস কী, করচিস কী বলতে বলতেই হীরা বুলবুল সে বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে। রাইমোহন কোনো ভর্ৎসনা না করে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো হীরা বুলবুলের দিকে। তার চোখে অন্য দৃশ্য ভেসে উঠলো। দু-তিন পাত্র সুরা পান করলেই একেবারে চনমনে হয়ে উঠতো হীরেমণি, গান গাইতে গাইতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোমর দোলাতো, ওষ্ঠাধর একটু স্ফীত, স্বেচ্ছায় ওড়না খসিয়ে দিত বুক থেকে। দু চোখে যেন দুটি বাগদাদের ছুরি, সুরার পাত্রটি একহাতে মাথার ওপর ধরা...। মাত্র তো কয়েক বৎসর আগেকার কথা, সেই রমণীর এ রকম পরিবর্তন!

কলকাতা থেকে যতই দূরে সরে যাচ্ছে, ততই উতলা হয়ে উঠছে হীরা বুলবুল, কতক্ষণে পৌছোবে। এখন জগন্নাথদেবই তার ধ্যান জ্ঞান, মুখে আর অন্য কথা নেই। মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল ভাবে রাইমোহনকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ গা, যদি আমি ঠাকুরের কাচে হত্যে দিই, যদি বুক চিরে রক্ত দিয়ে ঠাকুরের পুজো দিই, তবু কি ঠাকুর আমার বুকের ধন চাঁদুকে ফেরৎ দেবেন না? বলো না গো?

রাইমোহন শুষ্ক কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়। গত দু তিন বৎসর অনেক অনুসন্ধান

করেও চন্দ্রনাথের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাইমোহনের ধারণা, চন্দ্রনাথ শহর ত্যাগ করে পশ্চিমে পালিয়েছে। এই যুদ্ধের ডামাডোলে তার ভাগ্যে কী ঘটেছে কে জানে!

বজরা যাবে কটক পর্যন্ত, তারপরে পদব্রজে যাত্রা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। মাঝি-মাল্লারা যেদিন জানালো যে কটক আর মাত্র তিন বেলার পথ দূরে, সেইদিন শেষ রাত্রেই চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে গেল। দুটি ছিপ নৌকো ভর্তি ডাকাত পড়লো এ বজরায়। বরকন্দাজ দুজন যথানিয়মে বন্দুক পাশে রেখে নিদ্রিত ছিল, তারা কোনো বাধা দেবার আগেই মৃত্যু বরণ করলো। অন্য লোক-লস্কররা কেউ বা আহত হলো, কেউ ভয়ে লাফিয়ে পড়লো জলে। হীরা বুলবুলের সঙ্গে এক কামরাতেই শুয়ে ছিল রাইমোহন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখলো, দ্বারের কাছে মশালধারী কয়েকটি যমদূত। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়াবার আগেই মস্তকে প্রবল আঘাত পেয়ে সে সংজ্ঞাহীন হলো। নিশীথের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল হীরা বুলবুলের তীক্ষ্ম আর্তনাদে।

মার্জারের মতন বোধহয় নয়টি জীবন রাইমোহনের। তাই সে প্রাণে বেঁচে গেল। পরদিন সকালে সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলো বজরাটি একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় মহানন্দা নদীর বক্ষে ভাসছে। বাইরে পাটাতনের ওপর একটি মৃতদেহ ও দুটি মুমূর্ষু শরীর আর দুজন লোক জবুথবু হয়ে গলুইয়ের কাছে বসে আছে। হীরা বুলবুলের কোনো চিহ্ন নেই। কিংবা তার একটি মাত্র চিহ্নই পড়ে আছে। তার দক্ষিণ হস্তের একটি লাল রঙের ভাঙ্গা বালা।

রাইমোহনের সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি। কাঁধের ওপর মাথাটি যেন অতিশয় ভারী হয়ে গেছে একদিনেই, মুখের মধ্যে বমনের স্বাদ। তবু কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে এসে সে গলুইয়ের কাছে বসে থাকা লোক দুটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, বাপধনরা, বোটটাকে একটু কিনারে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর, নইলে যে পচে গলে মরবো।

বজরা যেখানে তীরে ভিড়লো, সে স্থল জনমানবশূন্য। অক্ষত লোক দুটি ভয়ে এমন আধমরা হয়ে আছে যে তাদের উদ্যোগে কোনো সাহায্যের জন্য কোথাও যাবার আশা নেই। ওদের মধ্যে একজনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিহত হয়েছে, সেইজন্য এই সময় সে বিকট স্বরে জুড়ে দিল কান্না। ইতিমধ্যে রাইমোহনের চেতনা আবার লুপ্ত হয়েছে।

খানিক বাদে দুটি খড়ের নৌকো এলো সেই পথে। তার মাঝিরা চিৎকারে আড়ষ্ট হয়ে বজরার নিকটবর্তী হলো এবং সব বৃত্তান্ত শুনে বজরাটি তারা বেঁধে নিল তাদের নৌকোর সঙ্গে। অপরাহ্নে তারা পৌঁছোলো একটি ছোট গঞ্জে। সেখানে একটি পুলিসচৌকি আছে। গঞ্জে সেদিন হাটবার, শত শত লোক ভিড় ভেঙ্গে ছুটে এলো দস্যু-লুণ্ঠিত বজরাটি দেখতে। এক সহৃদয় ওড়িয়া বণিক দয়াপরবশ রাইমোহনকে স্থান দিলেন নিজের গৃহে। এবং শুশ্রূষার গুণে সে পরদিনই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

হীরা বুলবুলকে দুদিন পর পাওয়া গেল মহানন্দার পার্শ্ববর্তী এক মনুষ্য-বসতিহীন জঙ্গলে। কাঠুরেরা তাকে দেখতে পেয়েছিল। তার শরীরে কোনো বস্ত্র নেই, কোনো হিংস্র পশু যেন তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। যদিও কাঠুরেদের অভিমত এই যে, সে অরণ্যে কোনো হিংস্র পশু থাকে না।

হীরা বুলবুলও অবশ্য প্রাণে মরলো না। তাকেও চিকিৎসার জন্য আনা হলো গঞ্জটিতে। খবর পেয়ে রাইমোহন যখন তাকে দেখতে গেল, তখন হীরা বুলবুল শয্যায় উঠে বসেছে বটে কিন্তু নির্বাক, নিস্পন্দ। দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই। পুলিসের লোক শত চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে একটি কথাও বলাতে পারেনি। রাইমোহন তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হীরে, আমি এসিচি! যা হবার তো হয়েচে, তবু যে প্রাণটা যায়নি...

হীরা বুলবুল রাইমোহনকে চিনতে পারার কোনো ভাব প্রদর্শন করলো না, যেমন দেয়ালের দিকে চেয়ে ছিল, তেমনই রইলো। রাইমোহনের চক্ষে জল এলো, কিন্তু হীরা বুলবুলের দু চক্ষু শুষ্ক।

তারপর রাইমোহন অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু হীরা বুলবুলের মধ্যে কোনো বোধের সঞ্চার করানো গেল না। এর আগে অনেক পেড়াপেড়ি করেও তাকে কবিরাজি ওষুধ খাওয়ানো যায়নি। যে বাড়িতে সে রয়েচে, সেখানকার গৃহকর্তাটি বললেন, আহা, দেখলেই বোঝা যায়, কোনো বড় ঘরের বউ। তাঁর এমন দুর্দশা!

অচেনা, অজানা স্থানে এই অবস্থায় বেশীদিন থাকা যায় না। আশ্রয়দাতা ওড়িয়া বণিকটির কাছ থেকে রাইমোহন কিছু টাকা ঋণ নিয়ে পাল্কি ভাড়া করে আবার রওনা হলো কলকাতার দিকে।

পাল্কির মধ্যে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগলো রাইমোহন। সে অতি পোড়-খাওয়া কুশলী মানুষ, সহজে ভেঙে পড়ে না। কিন্তু এখন যেন সে আর পারছে না। হীরা বুলবুলকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগলো, হীরে, একবার আমার পানে চা, একটা কতা বল, ওরে, দু-পাঁচটা গুণ্ডো তোর শরীর ছেঁড়াছিঁড়ি করেচে, সে সব ভুলে যা, আমি তো রয়িচি, আবার ঠিক হয়ে যাবে সব। আমি তোকে বাহান্ন তিথ্যি ঘুরিয়ে দেকাবো, হীরে, অমন অবুঝপনা কোরসনি। হীরে, দ্যাক, আমাকেও ওরা কেমন মেরেচে, আমার মাতাটা একবার দ্যাক হীরে, ওরে আমার হীরে...।

হীরা বুলবুল তবু কোনো শব্দ করে না। তার দেহে একটি শাড়ি কোনো-ক্রমে আলু-থালুভাবে জড়ানো, তার কোনো হায়া বোধ নেই। রাইমোহন জোর করে তার হাত দুটি তুলে, ধরে, নিজের গালে ঠেকায়, হীরা বুলবুল বাধা দেয় না। আবার রাইমোহন ছেড়ে দিলেই ঝপ করে পড়ে যায়।

ধর্মশালায় হীরা বুলবুলকে নিয়ে রাত্রি যাপন করাও হলো এক সমস্যা। পাল্কি থেকে তাকে নামিয়ে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়, তার গায়ের কাপড় খসে পড়ে। অন্য লোকেরা কৌতূহলী হয়ে তাকায়। নানা প্রশ্ন করে। লোকচক্ষে হীরা বুলবুল এখনো এক আকর্ষণীয়া রমণী। তার অঙ্গ থেকে শাড়ি খসে পড়লে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। বারিপদার ধর্মশালায় এক সুরাপায়ী অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়ে। দুটি পাশাপাশি ছোট খুপরির একটিতে রাইমোহন অন্যটিতে হীরা বুলবুল রয়েচে। ধর্মশালার দুটি বড় ঘরে একসঙ্গে অনেক যাত্রী থাকে। সেখানে হীরা বুলবুলকে রাখা যায় না। সুরাপায়ীটি হীরা বুলবুলের কক্ষের সামনে ঘুর ঘুর করে, সেজন্য রাইমোহনকে সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়। তার শরীর যেন আর বয় না।

মধ্যপথে, মেদিনীপুর দিয়ে আসবার সময় একবার সিপাহী-সন্ত্রাসের গুজব উঠলো। পাল্কিবাহকরা ভয় পেয়ে রাজপথ ছেড়ে আশ্রয় নিল পার্শ্ববর্তী এক

গ্রামে। সেখানে একটি দিন গেল।

পঞ্চম দিন সকালে হঠাৎ আবার এক পরিবর্তন হলো হীরা বুলবুলের। রাইমোহন ওর পাশে বসে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ এক চিৎকারে তার চটকা ভেঙে গেল। তারপরই বিস্ময়ে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল তার মুখ।

বাঁ কান একহাতে চেপে ডান হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে জোরালো গলায় গান ধরেছে হীরা বুলবুল :

সিঙ্গিবাগানে মাথা মুড়োলো এ কোন্ ভৃঙ্গীরে
কানে ধরে তাদের চর্কি নাচায় সে কোন্ ধিঙ্গি রে

আহ্লাদে তখন রাইমোহনের নিজেরই যেন নাচতে ইচ্ছে করলো। এ যে তারই রচিত। তারই শেখানো। শত চেষ্টা করেও কয়েক বছর ধরে সে হীরা বুলবুলকে দিয়ে এই গান গাওয়াতে পারেনি।

সে হীরা বুলবুলের ঊরুতে চাপড় মেরে বললো, বাহবা, গা, গা, আর একবার গা—

হীরা বুলবুল আবার অন্য গান ধরলো,—

ভিতরেতে ভোয়া ফলে,
কত কষ্টে দিন চলে
কোনোদিন অর্ধাশন,
কভু রহে শুকায়ে
পরিধেয় বাস যাহা,
রজকে দেখে না তাহা
তথাপি কি উঁচু চাল
চলে বুক ফুলায়ে
মরি, মরি, চলে বুক ফুলায়ে

অতি উৎসাহে রাইমোহন হীরা বুলবুলকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, আহা হা, আর কোনো চিন্তে নেই। হীরে, তুই গান ধরিচিস, তোর গলা শুনে আবার বুক জুড়োলো—।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠলো হীরা বুলবুলের চক্ষে। কাকাতুয়ার মতন কর্কশ কণ্ঠে বললো, তুই কে রে আবাগীর পুত? কে তুই গতর খেকো! কোন্ হতচ্ছাড়া মিনসে আমার গায়ে হাত দেয়! যা, দূর হয়ে যা।

তারপরই সে সজোরে এক লাথি কষালো রাইমোহনকে। দু হাতের নোখ দিয়ে তার চোখ গালতে এলো। রাইমোহন অনেক প্রকারে শান্ত করার চেষ্টা করলো তাকে। কিন্তু হীরা বুলবুল আঁচড়ে কামড়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করলো তাকে। সে এখন অতি হিংস্র এক বন্ধ উন্মাদ। শেষ পর্যন্ত পাল্কি বেহারাদের সাহায্য নিয়ে রাইমোহন কোনোক্রমে বেঁধে ফেললো তাকে।

প্রকৃতি কিংবা নিয়তির বিচিত্র পরিহাসে হীরা বুলবুল এবং রাইমোহন এই দুজনের কথাই সত্য হল। হীরা বুলবুল চেয়েছিল, সে আর কলকাতায় ফিরবে না, তাই সে ফিরে এলো না। রাইমোহন শপথ করেছিল, হীরা বুলবুলকে সে যে-কোনো প্রকারে ফিরিয়ে আনবেই, সত্যিই সে ফিরিয়ে আনলো।

হীরা বুলবুলের মধ্যে বিস্ময়করভাবে দ্বৈত সত্তার প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো। তার দুরকম ভাব, দু প্রকার কণ্ঠস্বর, এমনকি মুখের চেহারাও ভাব অনুযায়ী পৃথক হয়ে যায়। সে সম্পূর্ণ উন্মাদিনী, কিন্তু তার উন্মাদ দশারও দুটি রূপ।

কখনো কখনো সে সম্পূর্ণ চুপ করে থাকে। দণ্ড, প্রহর, এমনকি সম্পূর্ণ দিনের মধ্যেও একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। ঠায় বসে থাকে এক স্থানে, যেন কোনো জড় মূর্তি। তার দৃষ্টি তখন উদাস হয়ে যায়, ঔদাসীন্য মাখা মুখখানি অপূর্ব সুন্দর দেখায়। সে স্নান করে না, চুল বাঁধে না, পোশাক পরিবর্তন করে না, এমনকি কিছু খায় না পর্যন্ত। রাইমোহন তার কাছে এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করে, কিন্তু হীরা বুলবুলের ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন সে কোনো গভীর ধ্যানে নিরত।

মাঝে মাঝে তার ধ্যান ভাঙে, তখন সে গাইতে শুরু করে আপন মনে। হীরামণি নামে যে সঙ্গীত পটিয়সী বারাঙ্গনা এক সময় বুলবুল নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল, এখন তার কণ্ঠে সপ্তসুর যেন আরও বর্ণাঢ্য হয়ে ভর করেছে। অতি সূক্ষ্ম মীড় ও টপ্পার কাজ।

হীরা বুলবুল যখন গান শুরু করে তখন রাইমোহনের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। এমন মধুর গান। এমন সুরের মূর্চ্ছনা, অথচ অন্য কারুকে শোনানো যাবে না! হীরা বুলবুল এই গান গেয়ে তো কলকাতার বাবুসমাজকে মাতোয়ারা করে দিতে পারে আবার।

কলকাতায় ফিরিয়ে আনার পর প্রথম কয়েকদিন রাইমোহন অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে ওকে। এখন রাইমোহন শান্ত স্তব্ধ হীরা বুলবুলের সামনে গিয়ে যদি বা কিছু বলাবলি করেও, কিন্তু হীরা বুলবুল গান শুরু করার পর সে আর ভয়ে সামনে থাকে না।

গান গাইতে গাইতে অকস্মাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে হীরা বুলবুল তার দ্বিতীয় মূর্তি ধারণ করে। তখন তার চক্ষু দুটি থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়, মুখখানা হয়ে যায় কালী মূর্তির দু পাশের ডাকিনী যোগিনীর মতন, গলার আওয়াজও হয়ে যায় সানের মেঝেতে টিনের কৌটো ঘষার মতন। সামনা-সামনি কেউ না দেখলে বা শুনলে বিশ্বাসই করবে না যে এই রমণীই একটু আগে এমন অপূর্ব সুরেলা গলায় গান গাইছিল।

তখন সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে ওঠে সে, মুখ দিয়ে কুৎসিত কদর্য গালি-গালাজের ঝড় বইতে থাকে, চোখের সামনে যাকেই দেখতে পায় তাকেই মারতে ধেয়ে আসে। যে-কোনো কারণেই হোক তার সবচেয়ে বেশী আক্রোশ রাইমোহনের ওপর। হাতের সামনে যা পায়, তাই ছুঁড়ে মারে রাইমোহনের দিকে। একবার পান ছেঁচার পিতলের হামানদিস্তে সজোরে নিক্ষেপ করেছিল রাইমোহনের কপাল লক্ষ্য করে, সেটি ঠিক মতন লাগলে রাইমোহনকে আর পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করতে হতো না।

সেই অবস্থায় হীরা বুলবুল কোনো ষণ্ডকায় পুরুষের মতন দুপদুপিয়ে

সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, খাদ্যদ্রব্য পেলে মুঠো মুঠো মুখে ভরে, দু দিকের কষ দিয়ে লালা গড়ায় এবং অকারণে হা-হা করে হেসে ওঠে। তখন তাকে দেখলে রাক্ষসী বলে মনে হয়, অথবা অপ্রাকৃত কোনো ভীতিপ্রদ রমণী।

দাস-দাসীরা পালিয়েছে এ গৃহ ছেড়ে। রাইমোহনের এক সহচর হারাণচন্দ্র এখনো রয়ে গেছে শুধু। দুজনে মিলে এ পাগলিনীকে কোনোক্রমে সামলায়। এখন সন্ধ্যার সময় অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলে না। একতলার এক ছোট কুঠুরিতে হারাণচন্দ্র বসে বসে সুরা পান করে, রাইমোহন চুপ করে বসে থাকে সেখানে। সে যেন এখন আর সুরাপানেও স্বাদ পায় না। হঠাৎ একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল জীবনটা।

আজ হারাণচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে রাইমোহন সুরার পাত্রে দু-একটা চুমুক দিয়েছে। বাতাসে শীত শীত ভাব, তাই সুরার প্রভাবে শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হলে বেশ আমেজ আসে। রাইমোহন আক্ষেপের সঙ্গে বললো, সব কেমুন ভেব্‌লে গেল রে, হারাণে, সব ভেব্‌লে গেল!

হারাণচন্দ্রের আবার ছিলিমও চলে। চরসেই সে বেশী টং হয়। কল্কেটা রাই-মোহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললো, দু' টান দিয়ে দ্যাকো দাদা, রিদয়টা একদম খোলসা হবে। দিনরাত ভেবে ভেবে তুমি যে একেবারে কাহিল হয়ে গেলে!

এই সময় ওপর থেকে ভেসে আসে হীরা বুলবুলের সুমিষ্ট কণ্ঠের গান। গত দেড়দিন যাবৎ সে টুঁ শব্দটিও করেনি। এই সন্ধেবেলা আবার তার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে।

গান শুনতে পেয়ে হারাণচন্দ্র বলে উঠলো, আহা, আহা, দিদি আমার সাথক বুলবুল।

রাইমোহন মন দিয়ে খানিকক্ষণ গানটা শুনলো। হীরা বুলবুল গাইছে :

পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা
আমারে মজালে আমার নয়নের তারা
বাসনা করিয়ে মনে
চাব না তাহার পানে
আঁখি নিষেধ না মানে
বহে বারিধারা...

রাইমোহন বললো এ গান আমি শিক্যেচি ওকে। এ গান কার রচনা জানিস? কালী মীর্জার। নাম শুনিচিস?

হারাণচন্দ্র মাথা নেড়ে জানালো যে ঐ নাম সে শোনেনি।

রাইমোহন আফসোসের সুরে বললো, তা শুনবি কেন, তোরা তো সবাই নিধুবাবুর নামে নাচিস। কালী মীর্জাও কম বড় গায়ক ছেলেন না। লক্ষ্ণৌ, দিল্লি থেকে গান শিকে এয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজা বাহাদুর প্রতাপচাঁদের সভায় গাইতেন। সেই যে রে, যাঁর নামে আর এক জাল প্রতাপচাঁদ বেইরেছেল। কালী মীর্জা কলকেতায় এসে গোপীমোহন ঠাকুরের আখড়াতেও গাইতেন। যেমন ভালো গান বাঁধতেন, তেমন ঢেউ খেলানো গলা, আর চ্যায়রা খানা ছেল কি, যেন নবাব আমীর কেউ হবে।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওনাকে দেকোচো, দাদা?

রাইমোহন বললো, হ্যাঁ, দেকিচি, গান শুনিচি। খানাকুলের রামমোহন রায়, ঐ যে রে যিনি এখুনকার বেম্যজ্ঞানীদের গুরু ঠাকুর, সেই তিনিও কিচুদিন গান শেকার জন্য এই কালী মীর্জার কাচে নাড়া বেঁধেছেলেন। আমি যখন কালী

মীর্জার গান শুনি, আমার বয়েস তখন অনেক কম, ধর চাঁদুর মতন বয়েস, আমি বাপ-মরা ছেলে, কেউ দেকবার নেই, ঘুরে ঘুরে বেড়াই...এই যা, কার নাম করলুম।

—কার নাম করলে দাদা?

—চাঁদুর নাম? হঠাৎ কেন মনে এলো?

—বাদ দাও ওসব কতা। আর এক ছিলিম টানো, গান শোনো।

হীরা বুলবুল তখন অন্য গান ধরেছে:

ভালবাস, ভালবাসি, লোকে মন্দ বলে তাতে
কাহারও নই প্রতিবাদী, তবু কেন মিছে তাতে।
কি নৃপতি কি দীন
সবে দেখি প্রেমাধীন
কেউ ছাড়া নয় কোন দিন
ভেবে দেখ যাতে-তাতে।

হারাণচন্দ্র বললো, আহা-হা, আহা-হা!

রাইমোহন বললো, এ গানটা হীরে অনেকদিন পরে গাইলে। আমিও প্রায় ভুলেই গেস্‌লাম। বড় খাসা গান। এটি কার বাঁধা বলতে পারিস?

—এটা আর বলতে হবে না। টপ্পার টান শুনেই বুঝিচি! এ গান নিধুবাবু ছাড়া আর কার?

রাইমোহন ক্ষেপে উঠে বললো, নিধুবাবু আর নিধুবাবু! সবই তোদের নিধুবাবু। সাধে কি আর দাশু রায় মশাই রেগে গিয়ে বলেচেন, "জুতোর চোটে ঘুচাব তোর নিধুর টপ্পা গাওয়া!"

—দাদা, তবে এ গান কার?

- শ্রীধর কথকের। কত বড় গায়ক ছেলেন শ্রীধর কথক, আবার তেমনই দিল-দরিয়া মানুষ। শুনিচি, কত গান বেঁধেচেন আর লোকের মধ্যে বিলি করে দিয়েচেন। তোদের নিধুবাবু শ্রীধর কথকের কত গান চুরি করেচে, জানিস?

—দাদা, শোনো, শোনো, এবার অন্য গান। আহা, আর পাঁচজন যদি এ গান শুনতো!

—সেই দুঃখেই তো আমারও বুক ফাটে রে, হারাণে! এ কী হলো? কেন এমন হলো? দুটো উটকো দস্যু ওর শরীর ঠুগরেচে বলে মাতাটাও এমন বিগড়ে যাবে? আগে কলকাতার বড় মানুষরা ওকে ঠোগরায়নি!

—দাদা, শোনো, মন দিয়ে শোনো।

হীরা বুলবুল এবার গাইছে:

রাজার দুলালী বটে আমি কাঙালিনী
লোকে যা জানে জানুক, আমি যে নিজেরে জানি
ধন রত্ন সবই মিলে
মন যদি নাহি দিলে
মনে যদি মরু গড়িলে,
তারেই কব রাজধানী?

শুনতে শুনতে রাইমোহনের দুই চক্ষু দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। এক সময় শব্দ করে কেঁদে উঠলো সে।

হারাণচন্দ্র জড়িত স্বরে বললো, এ কি হলো, দাদা? ভাবের ঘোরে একেবারে কেইন্দে ভাসালে যে! তা এ গানটে কার বাঁধা একটু বলে দাও।

—কার বাঁধা, বল তো হারাণে? বল কার বাঁধা? আমার! আমার বাঁধা গান,

আমার সুর। বল্, খারাপ বেঁধেচি? ভালোবাসা যদি না পায়, তবে রাজ-কুমারীরেও আমি কাঙালিনী বলিচি। কোন্ বাপের ব্যাটা আগে এমন লিকতে পেরেচে বল্?

—অতি মধুর লিকোচো দাদা। বড় সরেস! কিন্তু তুমি কাঁদচো কেন?

—আমার কী হলো, বল্! হীরেকে সব গান শেকালুম, কিন্তু আর কি কেউ তা শুনতে পাবে? সবই আমার গুখুরি হলো! আহা, হীরে এত করে চেয়েছেল জগন্নাথ ক্ষেত্তরে যেতে, তা সেখেনেও তাকে নিয়ে যেতে পারলুম নাকো।

কথাবার্তার মধ্যে ওপরে কখন যে গান থেমে গেছে, তা ওরা দুজনে খেয়াল করেনি। হঠাৎ রাইমোহন চোখ তুলে দেখলো, কুঠরির দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হীরা বুলবুল। আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে মাটিতে, বক্ষে কোনো অন্তর্বাস নেই, ঘটির মতন বৃহৎ-বর্তুল স্তন দুটি উন্মুক্ত, মাথার চুল খোলা, মুখ চোখে রক্ত-পিপাসুর মতন হিংস্রভাব, ঠিক যেন একটি ডাকিনী। হাতে আবার একটি আঁশ-বঁটি, সে স্থিরভাবে চেয়ে আছে রাইমোহনের দিকে।

রাইমোহনের সারা শরীর একবার কেঁপে উঠলো। তারপর সে অশ্রুজড়ানো কণ্ঠে বললো, কী হয়েচে, হীরে? আমার ওপর তোর এত রাগ কেন? আমি তোকে এ সময় যেতে কত নিষেধ করিচিলুম...তুই আমায় মারতে চাস্ কেন, হীরে আমি কি তোর ডান?

হীরা বুলবুল মুখে হাসি ফুটিয়ে অদ্ভুত বিকৃত গলায় বললো, ওরে ড্যাকরা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

সে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। রাইমোহন বললো, বেশ, আয়, আমাকে মার, তাতে যদি তোর সাধ মেটে!

হারাণচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দিদি, হীরে দিদি, ও কী কচ্চো?

হীরা বুলবুল হারাণচন্দ্রের কথায় কানই দিল না।

মাতাল এবং চরসখোর হলেও হারাণচন্দ্রের শরীরে এখনো শক্তি আছে। সে পাশ থেকে লাফিয়ে পড়লো হীরা বুলবুলের ওপর। আঁশবঁটিটা কোনক্রমে হীরা বুলবুলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর সে শুরু করে দিল যুদ্ধ এবং চ্যাঁচাতে লাগলো, রাইদাদা, ধরো, ধরো!

এই সব সময় হীরা বুলবুলকে জোর করে মাটিতে ঠেসে ধরে নির্মমভাবে প্রহার করতে হয়, তা ছাড়া তাকে নিবৃত্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

হীরা বুলবুলকে কিল চড় মারতে রাইমোহনের বুক ফেটে যায়, তবু হারাণকে সাহায্য করার জন্য সে বাধ্য হয় এগিয়ে আসতে। হারাণচন্দ্র বেশ জোওয়ান, কিন্তু এই সব সময়ে হীরা বুলবুলের শরীরে যেন অসুরের শক্তি ভর করে। রাইমোহন একলা কখনো হীরা বুলবুলের মুখোমুখি এই অবস্থায় পড়লে খুনই হয়ে যেত।

মারতে মারতে হীরা বুলবুলকে নিস্তেজ করে দেবার পর তারপর দুজনে তাকে ধরাধরি করে ওপরে শুইয়ে দিয়ে আসে।

এইরকম ভাবে কি দিনের পর দিন চলে? রাইমোহন এখন সর্বক্ষণ চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকে। হীরা বুলবুলের চিকিৎসার জন্য এর মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। এনেছে সাহেব ডাক্তার, এনেছে মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা অ্যালোপাথ, এনেছে একাধিক কবিরাজ, এমনকি দুজন ওঝাকেও এনেছিল। সকলেই গুচ্ছের টাকা

নিয়েছে এবং কাঁড়িকাঁড়ি ওষুধ দিয়ে গেছে, কিন্তু সেই ওষুধ যে কী করে হীরা বুলবুলকে খাওয়ানো হবে, সে দিশা কেউ দিতে পারেনি। ওঝারা ওষুধ দেয় না কিন্তু উৎকটভাবে প্রহার করে। একজন কবিরাজ শুধু পরামর্শ দিয়েছিল, হীরা বুলবুলকে আর বাড়িতে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই. এই পাগলিনীকে এখন পথে ছেড়ে দেওয়া হোক ভগবানের নামে উৎসর্গ করে, এখন ভগবানই এর একমাত্র ভরসা। আর, স্বেচ্ছাচারীদের পথই সঠিক আশ্রয়।

কিন্তু রাইমোহন প্রাণে ধরে হীরা বুলবুলকে ঘরের বার করে দেয় কী করে? বিশেষত, এ তো তার বাড়ি নয়. সে নিজেই বরং হীরা বুলবুলের আশ্রিত। হীরা বুলবুলের বিকৃত রূপ দেখে এক এক সময় তার নিজেরই ইচ্ছে. করে বিবাগী হয়ে যেতে। অথচ এই বৃদ্ধ বয়েসে সে যাবেই বা কোথায়. পুরোনো অভ্যেসগুলি ছাড়াও সহজ নয়।

ইতিমধ্যে অর্থেরও অকুলান হতে শুরু করেছে। বজরায় দস্যুরা তাদের সর্বস্বান্ত করে গেছে। হীরা বুলবুলের আরও কিছু লুকোনো সম্পদ আছে কি না রাইমোহন তা জানে না, আর জানবার উপায়ও নেই। তার নিজেরও রোজগারপাতি নেই ইদানীং. হীরা বুলবুলের চিকিৎসার জন্যে যথেষ্ট ব্যয় করেছে, এর পর দিন চলা দুষ্কর হয়ে উঠবে।

হারাণচন্দ্রের ওপর নজর রাখার ভার দিয়ে রাইমোহন একদিন বেরুলো। বিদ্যোৎসাহিনী সভা আবার চালু হয়েছে কি না, সে সন্ধান নিতে হবে। সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা হিন্দুস্তানে মুঘল শাসন পুনঃ প্রবর্তনের আশা এখন মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয়। নায়কহীন. শৃঙ্খলাহীন সিপাহীরা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, ইংরেজবাহিনী একের পর এক শহর পুনর্দখল করে চলেছে এবং চলেছে নিষ্ঠুর প্রতিশোধের পালা।

অনেকদিন পর রাইমোহন এলো গুপী স্যাকরার দোকানে। সে গুপীও নেই, সে দোকানও নেই, যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের প্রভাবে সব কিছুর ভোল পাল্টে গেছে চমকপ্রদভাবে। এককালে ছিল মাঠকোঠার দোকান. এখন সাতখানি কুঠরিসমন্বিত পাকা বাড়ি. এবং প্রত্যেক কুঠরিতে লোহার দরজা। বিক্রয় কক্ষটির চারদিকের দেয়াল জোড়া ভেনিশিয়ান আয়না। আগে গুপী নিজেই দুর্গাপ্রদীপ জ্বেলে কাজে বসতো. এখন তার অধীনে কয়েক গন্ডা কারিগর. সে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে থাকে গদীর ওপর, থলথলে চর্বি এবং নেয়াপাতি ভুঁড়িটির জন্য তাকে দেখায় গণেশ ঠাকুরটির মতন। এখন আর কেউ তাকে গুপী স্যাকরা বলে না. বর্তমানে সে গোপীমোহন সরকার. স্বর্ণকার ও মণিকার নামে পরিচিত। উত্তরোত্তর যতই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে গুপীর. ততই রামবাগানে নতুন নতুন রক্ষিতা বদল করেছে। রঙ্গী নামে তার নবতম রক্ষিতাটিকে সে নাকি ছিনিয়ে নিয়েছে কালীপ্রসাদ দত্তের খপ্পর থেকে।

রাইমোহন গুপী স্যাকরার এতখানি শ্রীবৃদ্ধি দেখে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেও অবিলম্বে সামলে নিয়ে আগেকার মতন শ্লেষের সুরে বললো, কী রে, গুপী, কেমন চালাচ্চিস? ঐ নাদা পেটটা যে একদিন ফেটে যাবে ফটাস্ করে!

গুপী স্যাকরা সামান্য একটু ওঠার ভান করে খাতির দেখিয়ে বললো. আসুন, আসুন, ঘোষালমোয়াই. আসতে আজ্ঞা হোক. বস্তে আজ্ঞা হোক। কতদিন পর আপনার পদধূলি পড়লো এই গরিবের দোকানে—

রাইমোহন ভেতরে এসে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো, তুই গরিব? তাহলে রাজা দিগম্বর মিত্তির কিংবা জমিদারের ব্যাটা নবীন সিংগী তো দেউলে রে! তা কেমন আচিস বল্?

—আজ্ঞে আপনার মতন পাঁচজনের আশীর্বাদে কোনো রকমে কষ্টে ছিষ্টে আচি! বসুন ঘোষালমোয়াই, পান তামাক খান। এই যে এখেনে, আমার পাশটাতে এসে বসুন।

আসন গ্রহণ করে রাইমোহন বললো, তুই কষ্টে ছিষ্টে আচিস? আহারে, আমায় আগে বলিসনি কেন? মানুষের কষ্টের কতা শুনলে আমার বড় দুঃখু হয়, বিশেষত তোর মতন চেনাশুনো মানুষের। তা তোর কিসের কষ্ট?

—আজ্ঞে এদানি রোজগারপাতি কিচু নেই বললেই হয়। সাহেব মেমরা ইদিকে ঘ্যাঁষে না, আর সেপাইর হেঙ্গামার ভয়ে সব বড় মানুষদের বাড়ি বিয়ে-শাদী এ বছর বন্ধ। তা হলে আমাদের চলে কী করে বলুন?

—ভয় নেই, তোর আবার সুদিন আসচে। সাহেবরা সেপাইদের মাজা ভেঙে দিয়েচে, এখন শুদ্দু দুরমুশ করা বাকি! তা তোর কাচে আজ এলুম একটা বিশেষ মন নিয়ে।

—বলুন। মানে, ইয়ে, আজ্ঞা করুন।

—শতখানেক টাকা দিতে হবে যে, একটু টানাটানির মদ্যে পড়িচি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আর কী এমন কতা? আপনার টাকা আর আমার টাকা কি আলাদা? আপনার দয়াতেই তো করে খাচ্চি!

পান তামাক সেবা ও কিছুক্ষণ রহস্য কৌতুক করার পর গুপী স্যাকরা বললো, দোকান বন্ধ করার সময় হলো, কই ঘোষালমোয়াই, মালটা দেকান!

রাইমোহন বললো, আজ আর সঙ্গে কোনো মাল নেই রে, টাকাটা তোকে হাওলাৎ দিতে হবে।

বোকাসোকার মতন দেখালেও আজকাল গুপী স্যাকরা অনেক কিছুর সংবাদ রাখে। সে বললো, আপনার ইয়ে, মানে ঐ হীরে বুলবুল মাগীটার নাকি একেবারে মাতা বিগড়ে গ্যাচে, ঘোষালমোয়াই? ও মাগীর তো অনেক আচ্চা-সাচ্চা হীরে-মুক্তোর গয়না আচে, এই বেলা যা পারেন হাতিয়ে নিন, নইলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খাবে!

রাইমোহন বললো, সে সব কতা পরে হবে। তুই আজ টাকাটা দে, আমায় যেতে হবে।

গুপী স্যাকরার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ঘোষালমোয়াই, আপনি নিশ্চয় অন্য কারুর সংগে কারবার শুরু করেচেন? তাই অনেকদিন এদিকে আসেন না। জগু সরকারের কাচে যাচ্চেন? ভালো ভালো মাল জগু সরকারকে দিয়ে আমার কাচে এয়েচেন খালি হাতে টাকা চাইতে!

রাইমোহন ক্লান্তভাবে বললো, আমি আর মাল সরাবার কারবার করি না রে, গুপী! তুই টাকাটা দিবি না? শোধ দেবো, আমি কতার খেলাপ করি না।

গুপী সরকার ভালো ভাবে দেখলো রাইমোহনকে। মানুষটা বুড়ো হয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে। সেই খড়্গনাসা, শাণিত চক্ষু, অতি ধুরন্ধর মানুষটার বদলে যেন পড়ে আছে তার কঙ্কাল। এবার রাইমোহন টপ করে একদিন মরে যাবে। এইসব লোককে গুপী স্যাকরা বাতিল করে দিতে দ্বিধা করে না!

—এই মাগ্‌গিগন্ডার বাজারে অত টাকা কোতায় পাবো, ঘোষালমোয়াই, আপনি পাঁচটা টাকা নিন্! নেহাৎ আপনি বলেই আমি খালি হাতে...

রাইমোহন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সেই গুপী? কত বড় মানুষের বাড়িতে রাইমোহন নিজে তদবির করে গুপীকে ঢুকিয়েছে। সেই সব কাজ পেয়েই তো আজ তার আঙুল ফুলে কলাগাছ, সেই থেকেই তার নাম ছড়িয়েছে। সেই গুপী আজ তাকে একশোটা টাকা দিতে চায় না!

রাগে রাইমোহনের শরীর জ্বলতে লাগলো। প্রতিশোধের স্পৃহা লকলক করে উঠলো বুকের মধ্যে। কিন্তু একটু পরে সে নিজেই বুঝতে পারলো, এ শুধু অক্ষমের ক্রোধ, এই প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন শুধু তাকেই পোড়াবে, গুপীকে স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থ মানেই ক্ষমতা, সেইজন্য গুপী এখন অনেক ক্ষমতাবান, সেই তুলনায় রাইমোহন একজন সামান্য ক্রুদ্ধ বৃদ্ধমাত্র। গুপী স্যাকরা এখন তার দোকান থেকে রাইমোহনকে সবলে বিদায় করে দিলেও রাইমোহনের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। কৃতজ্ঞতা? রাইমোহন কৃতজ্ঞতা দাবি করবে গুপীর কাছে? কিন্তু কৃতজ্ঞতা তো শর্ত কিংবা লিখিত চুক্তি নয়।

অনেক কথাবার্তার পর গুপী পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকায় উঠতে রাজি হলো। টাকাটা রাইমোহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে হাত জোড় করে বললো, আর কতা নয়, ঘোষালমোয়াই, এবার আমার তবিল মেলাতে হবে যে, এবার আপনি আসুন!

রাইমোহনের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, টাকাটা গুপীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে আসবে। কিন্তু নিজেই সে বিস্মিতভাবে আবিষ্কার করলো, যৌবনের সেই দর্পও আর নেই, হাতের টাকা ছুঁড়ে ফেলার মতন তেজ তাকে ছেড়ে চলে গেছে, বরং দশ টাকায় যে অন্তত বিশ-পঁচিশ দিনের খাদ্য সংস্থান হবে, সে কথাই মনে পড়তে লাগলো বারবার।

ক্ষুব্ধ, অপমানিত মুখে রাইমোহন বেরিয়ে এলো। একটুখানি গিয়ে পেছন ফিরে রাইমোহন গুপীর দোকানের দিকে চেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, এত বাড় বেড়োনাকো, ঝড়ে পড়ে যাবে! তুই ঝাড়ে বংশে উৎসন্ন হবি, গুপী, এই আমি বামুনের ছেলে বলে রাকলুম, তোর হাড় গো-ভাগাড়ে পচবে, শকুনে তোর চোক খুবলে খাবে...।

বিধুশেখর মুখুজ্যের কাছ থেকে রাইমোহন কিছু মাসোহারা পায় নবীনকুমারের ওপরে নজর রাখার বাবদে। কয়েক মাস সে টাকা পায়নি। সে বাড়িতে গিয়ে খবর নিয়ে জানলো, বিধুশেখর অসুস্থ, তাঁর খাজাঞ্চি কার্যান্তরে শহরের বাইরে গেছেন, সুতরাং এখন কিছু পাবার আশা নেই।

বিরক্ত হয়ে হাতের দশ টাকা থেকে নগদ চারটি মুদ্রা খরচ করে রাইমোহন এক বোতল খাস্ ফরাসী ব্র্যান্ডি কিনে ফেললো। অনেকদিন পর আজ সে ভালো করে নেশা করবে।

দু একদিন পরেই হীরা বুলবুলের পাগলামি একটি তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছোলো। এই স্তরে আর গান নেই কিংবা ডাইনীপনাও নেই, শুধু বুক ফাটানো কান্না। আর সে কি কান্না, সেই করুণ স্বর শুনে পথের পথিকরাও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এখন আর রাইমোহনকে সামনে দেখলে হীরা বুলবুল মারতে আসে না, ডুকরে ডুকরে পুরোনো কথা বলে শুধু কাঁদে। তখন রাইমোহনও তার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করে।

রাইমোহনের ধারণা হলো, এইবার হীরা বুলবুল আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। তার বুকের মধ্যে যত কান্না জমেছিল, সব নিষ্কাশিত হয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। এর পর বুক খালি হলে সে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হবে।

তিনদিনের মধ্যেই হঠাৎ মিটে গেল সব সমস্যা। হীরা বুলবুল নিজেই আত্ম-

ঘাতিনী হলো কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা নিশ্চিত ভাবে আর জানার কোনো উপায় রইলো না অবশ্য। হীরা বুলবুলের দেহটা পাওয়া গেল বাড়ির প্রাঙ্গণ সন্নিহিত কুয়োর মধ্যে। বাঈজী কন্যা হীরা বুলবুলের বহু ঘটনাসমন্বিত জীবনের পরিসমাপ্তি হলো এইভাবে। এক সময় তার গুণগ্রাহীর অন্ত ছিল না এই শহরে, মধুলোভী ভ্রমরের মতন অনেক বড় মানুষের ছেলেই উড়ে এসেছে তার কাছে। এখন একজনও এলো না। রাইমোহন এবং হারাণচন্দ্র পল্লীস্থ কয়েকটি যুবকের সাহায্য চাইল মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার জন্য। যতই দুষ্ট প্রকৃতির বা উচ্ছৃঙ্খল হোক, এই সব যুবকদের এই একটি গুণ। শবদাহের ব্যাপারে সাহায্য চাইলে অন্তত কখনো তারা বিমুখ করে না।

শীতকালের বেলা অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসে। হীরা বুলবুলকে শ্মশানে নিয়ে যেতে যেতে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। দুটি চিতায় দুটি শব দাউ দাউ করে জ্বলছে, রাইমোহনদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অন্য শ্মশানবন্ধুরা চলে গেল নিকটবর্তী গঞ্জিকার আখড়ায়। হারাণচন্দ্র উসখুস করতে লাগলো, রাইমোহনের অনুমতি পেলে সে-ও একটু দম দিয়ে আসে। কিন্তু রাইমোহন একহাতে হীরা বুলবুলের শব ছুঁয়ে চুপ করে বসে আছে। সে কান্নাকাটি করেনি, বরং সে যেন একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আর তো তার কোনো বন্ধন রইলো না।

একটি চিতা খালি হবার পর হীরা বুলবুলকে তোলবার উদ্যোগ করা হচ্ছে, এই সময় হই হই করে এসে পড়লো শ্মশান-পরগাছার দল। তারাও ঘাটে বসে এতক্ষণ কল্কেতে দম দিচ্ছিল। মৃতের খাট কোথায়? মৃতের বস্ত্র পাবার অধিকার তাদের। কাঠ কেনার টাকা কাকে দেওয়া হয়েছে? এসব তাদের প্রাপ্য।

শ্মশান-পরগাছার দলপতি একজন বলিষ্ঠকায় যুবা, গুম্ফ-দাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা, হাতে একটি ডান্ডা, যেন সে স্বয়ং মহাকাল। রাইমোহন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। চেহারা দেখে চেনাব উপায় নেই, কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর ভুল হবে কী করে?

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দলপতির হাত চেপে ধরে আবেগ-কম্পিত গলায় বললো, চাঁদু!

গুম্ফ-দাড়ি সমন্বিত দলপতি হা-হা করে হেসে উঠে বললো, ছুঁয়ে দিলে তো? চাঁড়ালকে ছুঁয়ে দিলে? এবার যে গোবর খেতে হবে!

তার চ্যালারা সেই হাস্যের সঙ্গে দোয়ারকি ধরলো।

রাইমোহন বললো, ভগবান আচেন তাহলে! ঠিক সময় তোকে মিলিয়ে দিয়েচেন। আমি তোর কতাই ভাবচিলুম। চাঁদু, চেয়ে দ্যাক, ও যে তোর মা! ওরে হারাণে, মুকের কাপড়টা সরা।

হারাণচন্দ্র মৃতের মুখের ওপর থেকে চাদরটি সরিয়ে দিল। পাশের চিতার আগুনের আলো এসে পড়লো হীরা বুলবুলের মুখে। চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, যেন চন্দ্রনাথকেই দেখছে সে।

চন্দ্রনাথ কয়েক পলক চুপ করে চেয়ে রইলো।

রাইমোহন বললো, বড় কষ্ট পেয়ে গ্যাচে রে হতভাগিনী। যাক, তবু একটু শান্তি যে শেষ সময়ে তুই...ওরে, চাঁদু, তোর শোকেই তোর মা ম'লো...

নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য অন্যান্য শ্মশানবন্ধুরা এবং চণ্ডালরাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তাদের সকলকে বিস্মিত করে চাঁড়ালগুণ্ডা ছেলেদের নেতা চাঁদু সর্দার পরিষ্কার ইংরেজিতে জন কীটসের চার লাইন কবিতা আবৃত্তি

করলো :

টু সরো
আই বেইড গুড-মরো
অ্যান্ড থট্ টু লীভ হার ফার বিহাইন্ড
বাট চীয়ারলি, চীয়ারলি
শী লাভ্স মি ডিয়ারলি;
শী ইজ সো কনস্টান্ট টু মী, অ্যান্ড সো কাইন্ড...

তারপরই সজোরে রাইমোহনের কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিল উল্টো দিকে।

রাইমোহন আর্ত গলায় বললো, ওরে চাঁদু, দাঁড়া, যাসনি, তুই মুখাগ্নি করবি...শেষ সময়টায় তোর মা তবু শান্তি পাবে—

চন্দ্রনাথ কর্ণপাত করলো না। তার সঙ্গীদের ছেড়ে, শ্মশান ছেড়ে সে দূরে চলে যেতে লাগলো তীব্র গতিতে।
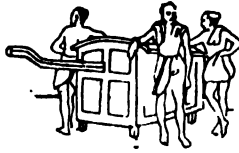
'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানেই, তা এখানেই!' ফারসী লিপিতে এই বাণী লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসের অলঙ্কৃত দেওয়ালে উৎকীর্ণ। সেই স্বর্গে সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করলো বিজয়ী ইংরেজ সেনানী। তাদের মুখে অসম্ভব ক্রোধ ও অস্থিরতা ঘাম ও রক্তের মতন মাখা। বিকটভাবে চর্ম পাদুকার শব্দ তুলে তারা ছোটাছুটি করতে লাগলো চতুর্দিকে, তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত অস্ত্র।

লালকেল্লা জনশূন্য। কয়েক মাসের বাদশাহ বাহাদুর শাহ সপরিবারে পলাতক। ইংরেজ সৈন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁদের কারুকে না পেয়ে অপরিসীম ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করে করে ভাঙতে লাগলো দেওয়ান-ই-খাসের স্বর্গোপম দেওয়ালসজ্জা। দুর্লভ প্রস্তরের কারুকাজ টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগলো মেঝেতে। সেনাপতি কোনোক্রমে শান্ত করলেন তাঁর বাহিনীকে। প্রাঙ্গণে উড়িয়ে দেওয়া হলো ইউনিয়ন জ্যাক, যুদ্ধ বিজয়ের জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সেখানে অনুষ্ঠিত হলো থ্যাঙ্কস গিভিং প্রার্থনা।

লালকেল্লা থেকে চার মাইল দূরে হুমায়ুনের সমাধি ভবনে সম্রাট তখন সদলবলে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে তখনও হাজারখানেক সিপাহী। তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে পরস্পর-বিরোধী উস্কানি দিচ্ছে তখনও। কেউ বললো, এখনো সময় আছে, জাঁহাপনা দিল্লি ছেড়ে পলায়ন করুন, লক্ষ্ণৌয়ের দিকে সিপাহীরা আজও আত্মসমর্পণ করেনি, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। কেউ বললো, বাদশাহ বরং দূত পাঠান ইংরেজের কাছে, তিনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার জন্য বলুন যে এ বিদ্রোহে তাঁর সম্মতি ছিল না, সিপাহীরা জোর করে তাঁর ওপর কর্তৃত্বের ভার চাপিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ, বিমূঢ় সম্রাট এর কোনোটাই করলেন না, বিহ্বল ও জড়ের মতন তিনি

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন তাঁর পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সুবিশাল সমাধিভবনে। সেই হুমায়ুন, যিনি একবার সাম্রাজ্য হারিয়েও আবার তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

ইংরেজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর একচক্ষু কানা রজব আলী সম্রাটের গতিবিধির সম্পূর্ণ বিবরণ এসে দাখিল করলো। পরদিনই ইংরেজ বাহিনীর সবচেয়ে দুঃসাহসী এবং হঠকারী সেনাপতি হডসন মাত্র পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে এগিয়ে গেল হুমায়ুনের সমাধির দিকে। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ এই যে সম্রাট বাহাদুর শাহকে সশরীরে বন্দী করতে হবে। সেইজন্য হাত নিসপিস করলেও হডসন সন্ধি করার আদেশ পাঠালেন সম্রাটের কাছে। পূর্ণ তিন ঘণ্টা রোদ্দুরের মধ্যে অপেক্ষা করতে হলো হডসনকে, কোনো উত্তর এলো না। যে সহস্রাধিক সশস্ত্র সিপাহী হুমায়ুনের সমাধি প্রহরায় রয়েছে, তারা ইচ্ছে করলে হডসনের ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে অল্পকালের মধ্যেই পর্যুদস্ত করতে পারে, কিন্তু তাদেরও আক্রমণ করার নির্দেশ দিল না কেউ।

তারপর এক সময় মসলিনের পর্দাঘেরা একটি পালকি খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। তার মধ্যে শুয়ে আছেন এক ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ, যাঁর গুম্ফ, দাড়ি ও মুখের রঙ একই রকম শ্বেত! ওষ্ঠে আলবোলার নল। সম্রাট সম্পূর্ণ বাক্যহীন।

বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রাখা হলো লালকেল্লার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। তাঁর খাদ্য পানীয়ের জন্য সাময়িকভাবে ভাতা বরাদ্দ হলো দৈনিক দু আনা। সদা বাক্যহীন, খেতাবহীন বাদশা সেখানে প্রায়ই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, হিন্দুস্তানীওমে কুছ দোস্ত, কুছ শাগির্দ, কুছ আজীজ কুছ মাসুক, উও সব কে খাকমে মিল গ্যয়ে...। সব বন্ধু, প্রিয়, দোসর, আত্মীয় শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল।

সম্রাটকে বন্দী করেই ক্ষান্ত হলো না হডসন এবার রাজকুমারদের পালা। উচ্ছৃঙ্খল, হঠকারী শাহী বংশের দুলালরা এই কয়েক মাস দিল্লিতে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। এবারে হডসন সঙ্গে নিল একশো জন অশ্বারোহী, ওদিকে হুমায়ুনের সমাধির সামনেও প্রচুর ভিড় জমেছে। জনতা মাঝে মাঝে ধ্বনি তুলছে জেহাদের। কিন্তু রাজকুমারেরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার বদলে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল। রাজকুমারেরা বেরিয়ে আসার পর তাদের সামনে পিছনে সৈন্য সাজিয়ে অগ্রসর হবার হুকুম দিল হডসন। আর তাদের পাশে পাশে বিলাপ করতে করতে চললো দিল্লির মুসলমানেরা।

খানিক দূর যাবার পর আর ধৈর্য রাখতে পারলো না হডসন। রাজপুত্র নামধারী এই বর্বর যুবকদের এখনো দিনের পর দিন বন্দী অবস্থায় খাইয়ে পরিয়ে তোয়াজ করে রাখতে হবে! খ্রীষ্টান নারী ও শিশুদের হত্যার জন্য এরাও দায়ী নয়? রাজকুমারদের মান সম্ভ্রম ধূলিসাৎ করবার জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গরুর গাড়িতে, নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো হডসন। রাজকুমারদের পথে নামিয়ে হডসন কর্কশ গলায় হুকুম দিল তাদের সব বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ তখনই খুলে ফেলবার জন্য। প্রায় নগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান সেই রাজকুমারদের একেবারে বুকের কাছে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে নিজের হাতে প্রত্যেককে খুন করলো হডসন। তারপর উন্নত গ্রীবা ঘুরিয়ে হডসন তার অনুচরদের হুকুম দিল মৃতদেহগুলো কোতোয়ালির সামনে পথের উপর ফেলে রাখা হোক। দেখুক দিল্লির লোক!

সেখানেও শেষ নয়। কোনো এক অতিরিক্ত ইংরেজ-তোষামুদে দুই রাজ-কুমারের মুণ্ড কেটে নিয়ে তারপর সেই দুই ছিন্নমুণ্ড থালায় সাজিয়ে উপহার

হিসেবে প্রেরণ করলো বাহাদুর শাহের কাছে।

রাজকুমারদের হত্যার পরই শুরু হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পর্ব। সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হলো নির্বিচার হত্যা ও অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার। দিল্লি নগরী নারকীয় রূপ ধারণ করলো, পথে পথে ছড়ানো মৃতদেহ, গৃহে গৃহে তান্ডব ও হাহাকার। খ্রীষ্টান হত্যার বদলা নেবার জন্য ইংরেজ জাতির মনে আর কোনো বিবেকের বাধা নেই। রুল অব ল এখন মুলতুবি। দিল্লির পর অন্যান্য বিদ্রোহী নগরীও একে একে ফিরে আসতে লাগলো ইংরেজের করায়ত্তে, সেসব স্থলের সামান্য সিপাহী-গন্ধযুক্ত হাজার হাজার মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হতে লাগলো। ফাঁসীতে ঝোলাতে সময় অযথা ব্যয় হয় বলে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে মনুষ্য শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া অনেক বেশী সুবিধাজনক। মানুষই এমনভাবে মানুষকে মারতে পারে।

বিজয় অভিযান শুরু হওয়ার পর কোম্পানির রাজত্বের রাজধানী কলকাতা নগরীতেও দেখা গেল প্রবল প্রতিক্রিয়া। ইংরেজ সমাজ এবং তাদের সংবাদপত্রগুলি হিংসা-ক্রোধে লেলিহান ভাষায় দাবি তুললো প্রতিশোধের। ভারতীয়দের তারা সম্বোধন করতে লাগলো কুকুর, বাঁদর, নরকের কীট এবং আরও কদর্য ভাষায়। কোনো ভারতীয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং যে-হেতু ভারতীয়রা পুরোপুরি মনুষ্য পদবাচ্য নয়, তাই তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব খোঁজারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যে-সব ইংরেজ এতদিন ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, কোনো ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, তাদের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হতে লাগলো প্রচন্ড বিদ্রূপ। একবার যখন ভারতীয়রা বিদ্রোহ করেছে, এর পর থেকে তাদের একেবারে পায়ের তলায় চেপে রাখতে হবে। কেউ সরকারকে পরামর্শ দিলে, সৈন্যবাহিনীতে আর একজনও ভারতীয় রাখা উচিত নয়, আফ্রিকা থেকে ভাড়াটে সৈন্য এনে এ দেশটাকে চাবকানো হোক। কেউ বললে, এবার এই সুযোগে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের ধরে ধরে জোর করে খ্রীষ্টান করে দেওয়া হোক। যেমন করা হয়েছে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের, তা হলে আর তারা কখনো খ্রীষ্টান প্রভুত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। কেউ বললে, ভারতীয় রমণীদের বাধ্য করা হোক ইংরেজদের সঙ্গে রমণ-সহবাসে, তা হলে কিছুদিনের মধ্যেই এদেশে গড়ে উঠবে এক বেজন্মা জাতি, তারা আর নিজেদের হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারবে না, তারা রক্ত সম্পর্কে ইংরেজদের কাছে বশ্যতা মেনে থাকবে।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের অবশ্য যুক্তিসঙ্গত আইন প্রতিষ্ঠার বাতিক আছে। সারাজীবন তিনি সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য খ্যাতি পেয়েছেন, সব দিক বিচার করে ঠিক সুষ্ঠুভাবে তিনি সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিতে চান। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এই অসম্ভব বিশৃঙ্খলা, প্রতিশোধের পাগলামি এবং অকারণ নর-হত্যার দাবিতে তাঁর শিক্ষিত স্বদেশবাসীর এমন চিৎকার, হট্টগোল—এসবে তিনি সায় দিতে পারলেন না। তিনি কড়া-হাতে রাশ টানবার চেষ্টা করলেন এবং ইংরেজদের অনুরোধ করলেন মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য। কিন্তু তাতে যেন আরও ভস্মে ঘি ঢালা হলো, ইংরেজদের মধ্যে হিংসার আগুন আরও বেশী জ্বলে উঠলো লকলক করে। তারা ক্যানিংকে মনে করলো স্ত্রীলোকদের মতন দুর্বল, বিদ্রূপ-মিশ্রিত করে তাঁর নাম রাখলো ক্লিমেন্সি ক্যানিং, বিলেতে দরবার পাঠালো, যেন ক্যানিংকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভারত থেকে। ইতিমধ্যে ভারত জুড়ে হত্যালীলা চলতে লাগলো যথেচ্ছভাবে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরও ইংরেজদের এই প্রতিক্রিয়া দেখে কলকাতার

বাবু ও ধনী সমাজ হতভম্ব হয়ে গেল একেবারে। বাঙালীদের প্রতিও ইংরেজদের সমান রাগ। বাঙালীদের প্রতি তাদের কটূক্তির মাত্রা যেন আরও বেশী। অথচ, বাঙালীরা তো সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহীরা ফুঁসে উঠলেও বাংলার ধনী ও জমিদারশ্রেণী তো তাদের কোনোরকম সাহায্য করেনি! এই তার পুরস্কার? ইংরেজের তল্পিবাহক বলে উত্তর ভারতে সিপাহীরা বাঙালীদের ঠিক খ্রীষ্টানদের সমান গণ্য করেই মারধোর করেছে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত সিমলা পাহাড়ে সিপাহীদের ভয়ে পলায়নের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, আর এখন সেই বাঙালীদের ওপরই ইংরেজদের এত রাগ?

ইংরেজের রাজত্বে বাংলায় এই প্রথম গড়ে উঠেছে একটা চাকুরিজীবী সমাজ। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আর খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা নেই এবং এই চাকুরির প্রভাবেই তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তারা এদেশে ইংরেজের বদলে সিপাহীতন্ত্র চাইবে কেন? আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ এ দেশের জমিদারশ্রেণী আগের চেয়ে অনেক বেশী ধনী হয়েছে, তাদের ধনাগমের অনিশ্চয়তাও কেটে গেছে, এমন সুখের অবস্থায় তারা ইংরেজ-বিরোধিতা করবে কোন্ মূঢ়তায়? আপামর জন-সাধারণকে ইংরেজ যথাসাধ্য শোষণ করছে আর জমিদারদেরও শোষণ করার সুযোগ দিয়েছে, অতএব ইংরেজ ও দিশি জমিদার তো এক পক্ষে থাকবেই! তবু আজ জমিদার-তালুকদারদের ওপর ইংরেজের এত উষ্মা কেন?

কোনো অনিচ্ছাকৃত দোষ করে ফেলার ফলে প্রভু যদি লাথি ঝাঁটা মারে তাতে আক্ষেপের কিছু থাকে না। কিন্তু কোনো দোষ করা হয়নি, বরং প্রভুর মনো-রঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রভু যদি প্রহার করার জন্য উদ্যত হন, তা হলে সেটা বড়ই মনস্তাপের ব্যাপার হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সমান খড়্গহস্ত হওয়ায় এবং প্রতিশোধের নানান হৃৎকম্প উদ্রেককারী প্রস্তাব শুনে বাঙালীবাবু ও ধনীরা প্রথমে বিস্মিত, তারপর ম্রিয়মান, তারপর প্রতিকারের চেষ্টায় তৎপর হলো।

বাঙালীরা অনেকেই ইতিমধ্যে ইংরেজি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়েছে। তারাও কয়েকটি ইংরেজী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে। সেই সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগলো নানান কাহিনী, কোথায় কোথায় ভারতীয়রা ইংরেজের পক্ষ নিয়ে প্রতিহত করেছে সিপাহীদের। কোথায় কোন্ তড়া খাওয়া, বিপন্ন ইংরেজ রাজপুরুষ আশ্রয় নিয়েছে দরিদ্র কৃষকের ঘরে। ইংরেজ রমণীদের মা ও ভগিনীজ্ঞানে আশ্রয় দিয়েছে কত পরিবার।

বাংলা সংবাদপত্রগুলিও পিছিয়ে রইলো না। অনেক ইংরেজ বাংলা পড়তে পারে কিংবা বাংলা সংবাদপত্রের মন্তব্য রেভারেণ্ড লঙ-এর মতন বাংলা-বিদ্দের কাছ থেকে জেনে নেয়। বাংলা পত্রপত্রিকাগুলিতেও শুরু হলো ইংরেজের কাছে কাতর ভাবে দয়া ভিক্ষার জন্য ভাষার কারিকুরি। কবিকুল-চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বরাবরই ইংরেজের পক্ষ সমর্থনকারী, এবার তিনি সিপাহীদের সর্বনাশ কামনা করতে লাগলেন অকুণ্ঠভাবে। ইংরেজরা সিপাহীদের হত্যা করার ফলে উত্তর ভারত হাজার হাজার বিধবা রমণীর কান্নায় ডুবে যাচ্ছে শুনে তিনি কৃত্রিম সমবেদনা জানিয়ে লিখলেন, আহা, ওদের ওখেনে একটি বিদ্যেসাগর থাকলেই তো সমস্যা চুকে যেত। বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের আবার বিবাহ দিতেন, আর অমনি ওরা গায়ে নতুন গয়না পরে আবার আমোদ আহ্লাদ করতো আর সাধ মিটিয়ে খাওয়া দাওয়া করতো। সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের প্রত্যেকের নামে গালি-গালাজ

করে তিনি তাদের একেবারে বাপ-পিতামহ-চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে নারীবিদ্বেষী ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন :

পিপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
হ্যাদে কি শুনি বাণী?
হ্যাদে কি শুনি ঝান্সীর রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকী
নানা তার ঘরের ঢেঁকী মাগী খেঁকী
শেয়ালের দলে
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে

এসবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আবেদন নিবেদন। রাজা মহারাজার দল আগে থেকেই বিনয় বিগলিত স্মারকপত্র পাঠিয়ে তাদের ইংরেজ-আনুগত্য জানাতে শুরু করেছিল, দিল্লি পতনের পর তারা নবোদ্যমে অভিনন্দন জানাতে লাগলো সরকার বাহাদুর সমীপে।

বর্ধমানের মহারাজার উদ্যোগে সভা ডেকে ইংরেজের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করা হলো এবং সুদীর্ঘ পত্রে তা জানানো হলো লর্ড ক্যানিংকে। সেই পত্রে বর্ধমানের মহারাজা ছাড়াও স্বাক্ষর করলেন কলকাতার ধনী শিরোমণি রাজা রাধাকান্ত দেব এবং আরও আড়াই হাজার হোমরা চোমরা। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্রও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে পাঠালেন পৃথক পত্র। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি আগেভাগেই চিঠি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি শুধু ইংরেজদের সমর্থনই করেননি, তাঁর প্রজাদের মধ্য থেকে আগুরি, গোয়ালা, বাগদী এবং ডোমদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে রেখেছিলেন এক ইংরেজ সার্জেনের নেতৃত্বে, যাতে সিপাহীরা এসে পড়লে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। হিন্দুরা একতরফাভাবে ইংরেজের দয়া আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো কলকাতার মুসলমান সমাজ। তারাও একযোগে একটি আবেদনপত্র দাখিল করে জানালো যে বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি তাদের কোনোই সমর্থন ছিল না। তারাও ইংরেজ-রাজ-ভক্ত প্রজা, ইংরেজ রাজত্ব তাদের কাছেও খুব সুখের। ঢাকার নবাব জানালেন, তিনি হাতি দিয়ে সাহায্য করেছেন ইংরেজ সরকারকে, সেখানকার অন্যান্য জমিদার ও মৌলবীরাও ইংরেজের পক্ষেই তো রয়েছে বরাবর।

নবীনকুমার সিংহের বাড়িতেও জমায়েত হয়েছে অনেকে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকেও একটি আবেদন পাঠানো দরকার। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে তার-স্বরে চিৎকার করা হচ্ছে, দায়িত্বপূর্ণ চাকুরি থেকে বাঙালীদের সরিয়ে দেওয়া হোক। বাঙালী ধনীদের সশস্ত্র বরকন্দাজ রাখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও নতুন ধনীদেরও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন।

নবীনকুমার চুপ করে বসে আছে এক পাশে। তার মুখমণ্ডল থমথমে। যদুপতি গাঙ্গুলী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ যুবকের মুখও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। এরা কেউ একটিও বাক্য বিনিময় করছে না পরস্পরের সঙ্গে। ইংরেজের বিজয়ে এরা খুশী-প্রস্তাব পাঠাতে বলেছে। কিন্তু এদের মুখে খুশীর চিহ্নমাত্র নেই।

দরখাস্তটি রচনা করেছে কৃষ্ণদাস পাল, সে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং

নিজের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান সে নিজেই খুব তারিফ করে। লেখা সাঙ্গ হবার পর কৃষ্ণদাস মুগ্ধভাবে সেদিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর পড়ে শোনাতে লাগলো। কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করলো না।

নিজের স্বাক্ষরটি দেবার পর নবীনকুমার স্বগতভাবে বললো, আমি এতে সই কচ্চি বটে, কিন্তু আমার মন এতে সায় দিল না।

তারপর মুখ তুলে সে যদুপতিকে বললো, ব্রাদার, সত্যি কতাটি বলবো? আমরা সবাই মুখে সেপাইদের দুষেচি বটে কিন্তু এই যে-কটা মাস দিল্লি স্বাধীন ছেল, ততদিন আমিও যেন মনে মনে স্বাধীন মানুষ হয়ে গেসলুম। হাজার হোক, ইংরেজ আমাদের বিজাতি, তাদের অধীনে আমরা পরাধীন হয়ে থাকা কি আমাদের বুকের ওপর একটা পাষাণভার রাখা নয়কো?

যদুপতি বললো, আমি তো এ কতা তোমায় আগেই বলিচিলুম। তখন উড়িয়ে দিলে—।

নবীনকুমার বললো, ঐ যে হরিশ আমাদের বোজালে—।

হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যের মুখখানিও বিমর্ষ। সে বললে, নবীন, আমি স্বীকার কচ্চি আমার ভুল হয়েছেল। ইংরেজকে আমরা চিনতে পারিনিকো। হাজার তোষামোদ করেও ইংরেজের মন পাওয়া যাবে না। আজ আমার মনে হচ্চে, সেপাইদের যুদ্ধুকে আমরা যে চোকে দেকিচি, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে চোকে দেকবে না। এই আমি বলে গেলুম, দেকো, মেলে কিনা। আমাদের জীবদ্দশাতেই সব উল্টো হয়ে যাবে। তোমাদের কাচে আজ আমি আর একটা কতাও বলে যাচ্চি, আর কখুনো আমার লেখনি দিয়ে ইংরেজের গুণগান করবো না। যদি করি তা হলে আমি খানকিরও অধম!

কথা শেষ করেই হরিশ কুর্তার জেব থেকে একটা ব্রাণ্ডির শিশি বার করে সেই তরল আগুন ঢক ঢক করে ঢেলে দিল গলায়।

ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া যেদিন হিন্দুস্তানের সম্রাজ্ঞী হলেন, সেদিন নবীনকুমারের জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো।

সিপাহীদের দমনকার্য এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে, এর মধ্যেই অকস্মাৎ ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা এসে পৌঁছোলো এ দেশে। কোম্পানির আমল শেষ। এখন থেকে ভারতবর্ষীয় নাগরিকেরা সকলেই সরাসরি ব্রিটিশ রাজবংশের প্রজা। রানী ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিলেন যে, যে-সব দেশীয় নৃপতিদের অধীনে ছোট ছোট রাজ্য আছে সেইসব রাজ্য আর গ্রাস করা হবে না এবং "ভারতীয় সীমানার মধ্যেকার অধিবাসীরা আমাদের অন্যান্য সমস্ত প্রজাদের মতন সমানভাবে গণ্য হইবে এবং তাহাদের প্রতি আমাদের সমান দায়িত্ব থাকিবে, আমরা ইহাতে দায়বদ্ধ রহিলাম।"

এই উপলক্ষে বিরাট উৎসব হলো লাট প্রাসাদে। মিষ্টান্ন বিতরিত হলো সমস্ত স্কুলের বালকদের মধ্যে। পথে পথে মহা ধুমধাম। রানীর ঘোষণার বয়ানের বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পাঠ করে শোনালেন

জেলা শহরগুলির জনসাধারণের কাছে। এর ফলে ভারতবর্ষীয়দের অবস্থার কতখানি উন্নতি হলো তা এখনই সঠিক বোঝা না গেলেও অনেকেরই মনে হল, একটা যেন বিরাট কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। রাজা-বাদশার অধীনে থাকাই এ দেশীয় মানুষের বহুকালের অভ্যেস. প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এ দেশে সঠিক কোনো সম্রাট ছিল না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য চালালেও তাদের গায়ে খানদানী রাজবংশের গন্ধ নেই. ব্যবহারেও বেনিয়া সুলভ ভাব-ভঙ্গী প্রকট। এতদিন পর সত্যিকারের একজন মহারানীকে পেয়ে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। স্থূলকায়া কুরূপা রমণী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া অনেকের চক্ষে পরিত্রাতা দেবী হিসেবে প্রতিভাত হলেন।

শহর কলকাতার অনেক বিশিষ্ট পরিবারেও আনন্দ উৎসব হলো এইদিন। প্রবেশদ্বার সজ্জিত হলো ফুলমালায়, ছাদে উড়িয়ে দেওয়া হলো ইউনিয়ন জ্যাক এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে খানাপিনা। জোড়াসাঁকোর সিংহ-সদনে অবশ্য এর ব্যত্যয় হলো। নবীনকুমার কোনো উৎসবের ব্যবস্থা করেনি। মল্লিক, ঠাকুর, দত্ত এবং বসুদের বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ ছিল, শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে কোথাও যায়নি সে। দুদিন আগে একটি ঘটনায় বড় অপমানিত বোধ করেছে নবীনকুমার।

নবীনকুমার অর্থের কথা কখনো চিন্তা করে না। তার জননীর ঢালাও অনুমতি দেওয়া আছে, সে যখন যা চাইবে. সব পাবে। নবীনকুমার অর্থের মূল্য বোঝে না। সে দু হাতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাজকর্মের জন্য সে কত যে ব্যয় করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ইদানীং নাটকের মহলার জন্য আরও বেশী ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু গত পরশ্বাদিন তার ইচ্ছায় প্রথম বাধা পড়েছে।

নাটকের কুশীলবদের জন্য পোশাক নির্মিত হবে সেইজন্য সভার এক সদস্য কিছু সিল্ক বস্ত্রের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে। তার মধ্যে এক প্রকার ইতালীয় সিল্ক সকলেরই খুব পছন্দ হলো। সে সিল্ক বস্ত্র অবশ্য খুবই মহার্ঘ, কিন্তু নবীনকুমার মূল্যের জন্য আবার কবে রেয়াৎ করেছে! তখনই দিবাকরকে ডেকে সে হুকুম দিল এক সহস্র মুদ্রা নিয়ে আসবার জন্য।

দিবাকর ঘাড়-মাথা চুলকে, শঙ্কায়-লজ্জায়-বিনয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে জানালো যে এখন টাকা দেওয়ার কোনো উপায় নেই। স্বয়ং বিধুশেখর সব হিসাব-পত্র পরীক্ষা করছেন এখন কয়েকদিন তহবিল থেকে টাকা তোলা বন্ধ।

নবীনকুমার প্রথমে কথাটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। চাওয়া মাত্র সে টাকা পাবে না, এমন অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি।

সে কড়া স্বরে বললো, বাবুকে বলো, আমি নিইচি, এখন টাকা নিয়ে এসো। যাও।

দিবাকর বললো, আজ্ঞে তার উপায় নেইকো, তবিল বাক্সের চাবি বড়বাবু নিজের কাচে রেকেচেন।

নবীনকুমার তখন বললো, তা হলে যাও মায়ের কাচ থেকে আমার নাম করে নিয়ে এসো গে!

বিম্ববতীর কাছ থেকে ঘুরে এসে দিবাকর জানালো যে বিম্ববতীর হাতও একেবারে খালি। যা ছিল তা নবীনকুমারকেই দিয়েছেন। তহবিল থেকে না তুললে তিনিও কিছু দিতে পারবেন না।

বন্ধুবান্ধবদের সামনে বড় অপদস্থ হতে হলো নবীনকুমারকে।

পরের দুদিন সে আর শয্যা ছেড়ে উঠলোই না, কারুর সঙ্গে কথাবার্তাও বললো না বিশেষ।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত গ্রহণ ঘোষণার দিনেও নবীনকুমার শয্যা ত্যাগ করেনি। সন্ধ্যার পর শোনা যেতে লাগলো পটকা ফাটার শব্দ, মাঝে মাঝে আকাশে ঝলসে ওঠে বাজির রোশনাই, পথে পথে মানুষের ফূর্তির হল্লা। রাত্রি নটার তোপ দাগার পর যখন নবীনকুমারকে আহার গ্রহণ করার জন্য ডাকতে এলো তার পত্নী, সেই সময় সে পালঙ্ক থেকে নামলো। কিন্তু আহার গ্রহণ করতে গেল না। পত্নীর সঙ্গে একটি কথাও না বলে সে চলে এলো তার জননীর কক্ষের দিকে।

অতি প্রাতঃকালেই বিম্ববতী ইদানীং প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যান সেইজন্য শুয়ে পড়েন সন্ধ্যা রাত্রেই। তাঁর কক্ষের বন্ধ দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো, মা, মা!

বিম্ববতীর সঙ্গে এখন আর প্রত্যহ তাঁর পুত্রের দেখা হয় না। সে তার বন্ধু-বর্গের সঙ্গেই আলাপে বেশী ব্যাপৃত থাকে। পারিবারিক আদিখ্যেতা সে বিশেষ পছন্দও করে না। বিম্ববতী লোক মারফত প্রতিদিন তার খবরাখবর নেন। আধো ঘুম আধো তন্দ্রার মধ্যেও নবীনকুমারের ডাক শুনে বিম্ববতী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। প্রিয়জন সম্পর্কে প্রথমেই কোনো বিপদের কথা মনে আসে। তিনি দ্রুত এসে দরজা খুলে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে?

নবীনকুমার বললো, মা, আমার কত সালে জন্ম, তোমার মনে আচে?

প্রগাঢ় বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, কেন? এত রাত্রে সে কতা কেন?

- রাত বেশী হয়নি, মা। তোমার মনে আচে কি না বলো?

—সেই যেবার আমাদের ইব্রাহিমপুরের তালুকটা কেনা হলো, সেটা কত সন, ছেচল্লিশ না সাতচল্লিশ?

– আমার মনে আচে মা, আমি হিসেব কষে দেকিচি, এই পরশুদিন আমার আঠোরো বছর পূর্ণ হয়েচে।

—ওমা তাই নাকি! আমি খেয়ালই করিনি, তোর জ্যাঠাবাবুও কিচু বলেননি তো?

—কেন, তোমরা খেয়াল করোনি? এখুন থেকে এই বিষয় সম্পত্তির মালিক কে? আমি না জ্যাঠাবাবু?

—ওমা, তুই-ই তো সব কিচুর মালিক!

—আমি মালিক, আর তবিল বাক্সের চাবি থাকবে জ্যাঠাবাবুর কাচে?

নবীনকুমার হুংকার দিয়ে ডাকলো, দুলাল? যা তো দুলাল, জ্যাঠাবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

দুলাল প্রায় অষ্টপ্রহরই নবীনকুমারের কাছাকাছি থাকে। বারান্দায় এক কোণে সে বসেছিল, ডাক শুনে কাছে এগিয়ে এলো।

বিম্ববতী বললেন, এ কি কতা বলচিস ছোটকু? এত রাতে তোর জ্যাঠাবাবুকে ডাকতে যাবে?

নবীনকুমার উত্তর দিল, বললুম না রাত বেশী হয়নি! রাস্তায় কত মানুষজন।

—উনি যে সন্ধের পরই শুয়ে পড়েন!

—শোবার পরও দরকার পড়লে মানুষ ওঠে।

—এখন কী দরকার পড়লো, ছোটকু?

—তবিল বাক্সের চাবি আমার এক্ষুনি চাই। আমি আর কচি খোকাটি নই।

আমি টাকা চাইলে দিবাকর আমার মুখের ওপর না বলে। এবার দেকাচ্চি!

—ওরকম করিসনি, ছোটকু। তুই বরং কাল সকালে গিয়ে ওনার সঙ্গে দেকা করিস। উনি তোকে কত ভালোবাসেন।

—আমি দেকা করতে যাবো? কেন? ওঁকেই আসতে হবে। আজই, এক্ষুনি। এই দুলাল, হাঁ করে ডাঁড়িয়ে দেকচিস কী? যা—

—তুই কি পাগল হলি? এই রাত্তিরেই তোর চাবি চাই?

—হ্যাঁ চাই। আর তুমি ভেবো না মা, আমি কখনো জ্যাঠাবাবুর বাড়িতে চাবি চাইতে যাবো। তাঁকে নিজে এসে দিতে হবে।

বিম্ববতী অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু নবীনকুমারের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দুলালকে এক প্রকার জোর করে পাঠিয়ে ছাড়লো সে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী সরোজিনী তাকে আহার সেরে নেবার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু চাবি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নবীনকুমার অন্ন গ্রহণ করবে না। বিম্ববতী তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ঝটকা মেরে সরে যেতে লাগলো। সে এমনই ছটফট করছে যেন তাকে কেউ তপ্ত কটাহে বসিয়ে দিয়েছে।

দুলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ফিরে এসে জানালো যে বিধুশেখর অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন তাঁকে জাগানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

ঠিক উন্মাদেরই মতন চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল নবীনকুমারের, তারকা দুটি যেন ঘূর্ণিত হতে লাগলো। প্রচণ্ড জোরে দুলালকে এক চপেটাঘাত করে সে হিংস্র কণ্ঠে বললো, সম্ভব নয়? তাঁর বাড়িতে আগুন লাগলেও তিনি ঘুম থেকে উঠবেন না? এই সময় যদি আমি মরে যাই, তবুও তাঁকে ডাকা সম্ভব নয়? আহাম্মুক কোথাকার!

বিম্ববতী দুলাল আর নবীনকুমারের মাঝখানে এসে পড়ে বিপন্ন, করুণ কণ্ঠে বললেন, কেন এমন করচিস, ছোট্‌কু! আমার কতা শোন, কাল সকালে...

নবীনকুমার বললো, মা, জমিদার কে, আমি না জ্যাঠাবাবু? জমিদারের রক্ত আচে আমার শরীরে। উনি তো শুদু উকিল, আমাদের সম্পত্তির অছি, যখন ডাকবো, তখুনি ওঁকে আসতে হবে।

বিম্ববতী নিথর হয়ে গেলেন, অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়লো তাঁর দুচোখ দিয়ে। বাষ্পজড়িত স্বরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমার দিব্যি রইলো, আজকের রাতটার মতন ক্ষ্যামা দে, কাল সক্কালেই—

নবীনকুমার চিৎকার করে উঠলো, আমার চাই না। কাল সক্কালেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। বিষয় সম্পত্তি সব তোমাদের রইলো।

একটা চীনে মাটির সুদৃশ্য ভাস তুলে মাটিতে আছড়ে চুরমার করে সে বললো, চাই না! আমার কিচু চাই না! সব জ্যাঠাবাবু নিক।

বারান্দায় সার দেওয়া খাঁচাগুলি থেকে ডেকে উঠলো কয়েকটি পাখি। বিম্ববতী এবং সরোজিনী দুজনে মিলে ধরে রাখবার চেষ্টা করলো নবীনকুমারকে। কিন্তু সে সবলে নিজেকে ছাড়িয়ে আরও কিছু জিনিস ভাঙার জন্য ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিছু না পেয়ে সে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল অর্গল। ভিতরে শোনা যেতে লাগলো দুম দাম শব্দ। সে অনেক কিছু ভাঙছে।

বিম্ববতী এবং সরোজিনী দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে যায়—

বার তাকে অনুরোধ করতে লাগলো খোলার জন্য। কিন্তু নবীনকুমার ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। খেয়ালী পুত্রটির জেদের পরিচয় বিম্ববতী এর আগেও পেয়েছেন কিন্তু এতখানি বাড়াবাড়ি কখনো দেখেননি। তিনি খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

বহু কাতর সনির্বন্ধ অনুরোধেও নবীনকুমার কর্ণপাত না করায় বিম্ববতী দুলালকে বললেন, বাবা দুলাল, তুই আর একবার যা। দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে যা। যেমন করে হোক ও বাড়ির বড়বাবুকে জাগিয়ে তোল। আমার নাম করে বলবি, বড় বিপদে পড়ে আমি তাঁকে ডেকিচি। সব বুঝিয়ে বলিস, যা দৌড়ে যা—

বিধুশেখর এলেন আধঘণ্টা পরে।

বারান্দায় একটি কেদারায় বিম্ববতী নিঝুম হয়ে বসেছিলেন, আর সরোজিনী তাঁর পায়ের কাছে। লাঠিতে ভর দিয়ে একটা পা টেনে টেনে বিধুশেখর এগিয়ে এলেন সেদিকে। বিধুশেখরকে দেখে সরোজিনী মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে চলে গেল আড়ালে।

বিধুশেখর একেবারে বিম্ববতীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েচে, বিম্ব?

বিম্ববতীর মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তাঁর শরীরের সেই অপরূপ রূপলাবণ্যরাশিতে যেন মেঘের ছায়া পড়েছে ইদানীং, নাকের ওপর একটু একটু মেছেতার দাগ, চিবুকের নিচে ভাঁজ। বিধুশেখরকে দেখে মাথায় অবগুণ্ঠন টানার কথাও তাঁর মনে এলো না। তিনি বিধুশেখরের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিধুশেখর বললেন, ঐ দুলালটা একটা বেল্লিক। আগেরবার গিয়ে আমায় ডাকতে পারেনি? ওপরে উঠে গেলেই তো পারতো। এমন কিছু রাত হয়নিকো, ছোটকু কোতায়?

বিম্ববতী হাত তুলে বন্ধ ঘর দেখিয়ে দিলেন।

বিধুশেখর সেখানে গিয়ে ডাকলেন, ছোটকু, ছোটকু!

কক্ষের মধ্যে আপাতত কোনো শব্দ নেই। বিধুশেখরের ডাকের পর আবার কিছু একটা ভাঙার শব্দ হলো। বিধুশেখর গলা চড়িয়ে বললেন, ছোটকু খোল, আমি চাবি এনিচি!

তৎক্ষণাৎ সশব্দে দরজা খুলে গেল। নবীনকুমার হাত বার করে বললো, কই দিন।

সারা ঘরের মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা, বিছানা বালিশও পড়ে আছে মেঝেতে। বিধুশেখর একটুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন নবীনকুমারের দিকে। তারপর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন, এত রাতে চাবি নিয়ে কী করবি? কাল সকাল পর্যন্ত তর সইছেল না?

নবীনকুমার জেদী বালকের মতন বললো, চাবি এখুন থেকে আমার হেপাজতে থাকবে। পরশু থেকে আমিই সব কিছুর মালিক।

বিধুশেখর বললেন, তা তো বটেই। শুধু তোর বাপের সম্পত্তি কেন, আমার যা কিছু আচে, সে সবও তো বলতে গেলে তোরই। আমার তো থাকবার মধ্যে আচে ঐ নাতি, আমি চোক বোজবার আগে তার ভার তো তোর হাতেই দিয়ে যাবো।

—আমি পর্শু থেকে সাবালক হয়িচি, তবু দিবাকর আমার মুখের ওপর না বলে কেন? আপনি ওকে ব'লে দেননি কেন?

—ঠিক, আমাদের অন্যায় হয়েচে, বুজলে বিম্ব, আমাদের অন্যায় হয়েচে সত্যি, আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত রইচিলুম, সেইজন্য দিনক্ষণের হিসেব করিনিকো। তবে আমি ভেবে রেকিচিলুম, তোর কোনো সন্তানাদি হলে তারপর সব বিষয়-আশয় তোর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবো। সন্তান না হলে সংসারে মন বসে না। তা যাই হোক, তুই বড় হইচিস, জমিদারির কাজকম্ম শিকেনে, নিয়ম করে রোজ হৌসে বেরো। আমিও এবার সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাই—

বিধুশেখর চাবির গুচ্ছ নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু এত হাতে টাকা নিয়ে তুই কী করবি, বললি না? তোর এখুনি টাকার দরকার?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ। আমার এখুনি টাকা চাই। আমার টাকার তোড়া নিয়ে লোপালুপি খেলার ইচ্ছে হয়েচে।

বিধুশেখর হা হা করে হেসে উঠলেন। সহজে হাসেন না তিনি। তাঁর অসময়ের হাসি শুনে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু তিনি যেন আজ নবীনকুমারের গোঁয়ার্তুমি বেশ উপভোগ করছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আর যাই করিস বাপ, টাকা নিয়ে কখনো লোপালুপি খেলতে যাস না। বড় পিছলে যায়। একবার হাত পিছলে গেলে আর ধরা যায় না।

বিম্ববতীর দিকে ফিরে তিনি আবার বললেন, আমাদের ছোটকুর কতক-গুলোন দোসর জুটেচে, তারা বিজ্ঞের মতন খুব গেরেমভারি কতা বলে বটে, কিন্তু সবগুলোনেরই মতলোব ছোটকুর মাতায় কাঁটাল ভাঙা। আমি সবই টের পাই। সব কিচুরই খপর রাকি। আমি যে এখুনো মরিনি, সেটা তারা জানে না।

তারপর লাঠিটি বাগিয়ে ধরে তিনি বললেন, চলিগো, বিম্ব, আমার মাতা থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্দি। রামকমলের জিনিস তার ছেলের হাতে তুলে দিইচি।

বিম্ববতী বললেন ছোটকু, তোর জ্যাঠাবাবুকে পেন্নাম করলিনি?

বিধুশেখর বললেন, থাক থাক, রাত্তিরের দিকে আর পেন্নামের দরকার নেই। এই সামান্য কারণে রাগ করে ছোটকু খাওয়া-দাওয়া করেনি শুনলাম। যা এখুন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়গে যা।

নবীনকুমার অবশ্য মায়ের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো না। বিধুশেখর যে এই রাত্রেই নিজে এসে এত সহজে তার হাতে চাবি তুলে দেবেন, এজন্য সে ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বিধুশেখরের পায়ে হাত ছোঁয়ালো।

বিধুশেখর নবীনকুমারের চিবুক স্পর্শ করে হাতটি নিজের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। তারপর বললেন বাবা ছোটকু, একটা কতা আমি বলে যাই। তবিলের চাবি শুধু নিজের কাচে রাকলেই হয় না। তবিল ভরাবার কৌশলটাও শিকতে হয়।

নবীনকুমারের বুকটা কেঁপে উঠলো। তা হলে কি তহবিল একেবারে শূন্য? চাবির গুচ্ছ হাতে নিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বিধুশেখর লাঠি ঠুকে ঠুকে পা টেনে টেনে চলতে লাগলেন, সিঁড়ি পর্যন্ত শোনা গেল তাঁর চলে যাওয়ার শব্দ।

সেই রাত্রেই নবীনকুমার দিবাকরকে ডেকে তহবিল খোলালো। না। বিধুশেখর

মিথ্যেই ভয় দেখিয়েছেন, তহবিল যথেষ্টই পূর্ণ।

পরদিন থেকে সে খোলামকুচির মতন অর্থ ছড়াতে লাগলো। বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের জন্য যত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল, সে ব্যয় করলো তার প্রায় চতুর্গুণ। এমন সুসজ্জিত মঞ্চ এ শহরে কেউ কখনো দেখেনি। পোশাকের চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসে যায়। নিমন্ত্রণ করা হলো সমস্ত মান্যগণ্য মানুষদের তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বহুমূল্য গালিচামোড়া আসন এবং নানা বর্ণের পুষ্প-স্তবক। বেশ কয়েকজন সাহেব সুবোকেও নিমন্ত্রণ করা হলো, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এলেন না, কয়েকজন এলেন। মঞ্চের ওপর সাদা রঙের অশ্বের পৃষ্ঠে পুরোপুরি রাজোচিত পোশাকে ভূষিত নবীনকুমারকে পুরূরবার ভূমিকায় দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। যেমন সুন্দর তার মুখশ্রী, তেমনই মধুর তার কণ্ঠ। দর্শকদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পরদিন সংবাদপত্রগুলিতেও এই নাট্য অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হলো।

শুধু সামান্য একটু ত্রুটি হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। কুশীলবদের কারুর যখন গান গাওয়ার কথা, তখন প্রসেনিয়ামের পাশ থেকে আগেই জড়িত গলায় গান ধরছিল একজন। এরকম একবার নয়, দুবার। তাতে খানিকটা হাস্যের সঞ্চার হয়েছিল। যাই হোক, মঞ্চ ব্যবস্থাপকরা ঠেলাঠেলি করে রাইমোহনকে একেবারে পথে বার করে দিয়ে আসে।

পরদিন বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যরা আবার সমবেত হয়ে যখন তাদের সার্থকতার জন্য উল্লাস করছে, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি কোন্ ভূমিকা সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন সেই আলোচনা চলছে, সেই সময়ে আবার এসে উপস্থিত হলো রাইমোহন। একেবারে চুরচুর মাতালের দশা। পোশাকে লেগে আছে ধুলো কাদা, বোধহয় রাস্তায়ও কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়েছে। ঢুকে জড়িত গলায় সে গান ধরলো, "লোকে যা বলে বলুক, আমি তো নিজেরে জানি...হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা..."

রাইমোহনকে দেখেই নবীনকুমার একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। কাল রাইমোহনের ব্যবহারে সে বড়ই মনে আঘাত পেয়েছিল। তার নিজের সভার সদস্যের এই ব্যবহার! মনে মনে নবীনকুমার এবং আরও অনেকের ভয় ছিল, পাইকপাড়ার সিংহ কিংবা প্যাথুরেঘাটার ঠাকুররা বোধহয় ভাড়াটে লোক পাঠিয়ে বিঘ্ন ঘটিয়ে নাটক পণ্ড করার চেষ্টা করবে। সে সব কিছুই হয়নি, আর রাইমোহনের এত সাহস!

নবীনকুমার লাফিয়ে এসে রাইমোহনের টুঁটি চেপে ধরলো। চিৎকার করে বললো, উল্লুক, তুমি আবার এসোচো! বেরোও! বেরোও!

রাইমোহন বললো, মাচ্চো কেন বাপ? কাল রাজা আর আজ জল্লাদ! অ্যাঁ? বড় খাসা হয়েছেল কিন্তু, সব বড় মানুষদের চোক টাটাচ্চে...এমন খেলা কেউ দেকায়নি...হে হে হে...কত টাকার খেলা...

নবীনকুমার তাকে মারতে উদ্যত হলে হরিশ মুখুজ্যে এসে বাধা দিয়ে সরিয়ে নিল তাকে। সে বললো, আহা আজ আনন্দের দিনে বেচারিকে মারধোর করো না। ও আনন্দের চোটে একটু বেশী খেয়ে ফেলেচে। মাতালকে মারতে দেকলে আমার বড় কষ্ট হয়।

রাইমোহন হরিশ মুখুজ্যের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললো। তারপর বললো, শুদু শুদু ফুকো দয়ার কথা কেন বাওয়া! কিচু দাও। এখুন দু ঢোক না পেলে...গলাটা বড় শুকো্য গ্যাচে!

হরিশ মুখুজ্যে একজন, যাকে বলে, নিজেই নিজেকে গড়া মনুষ্য। সমাজ-সংসার থেকে তিনি কখনো কোনো সাহায্য বা দয়া পাননি, কখনো কারুর মুখাপেক্ষীও হননি। কুলীন বংশের সন্তান, তাঁর পিতার মোট তিনটি পত্নী এবং হরিশ পিত্রালয়ে বাস করার সুযোগ থেকে জন্ম থেকেই বঞ্চিত। তাঁর পিতা পুত্রোৎপাদন করেই তাঁর মাকে ধন্য করেছেন, সেই পুত্রের জন্য কোনো দায় তিনি নিজে কখনো বহন করেননি।

মামাবাড়িতে অনাদরে অবহেলায় মানুষ হয়েছে হরিশ। মামারাও দরিদ্র, ভাগিনেয়র পড়াশুনোর জন্য পয়সা খরচ করতে তাঁরা পরাঙ্মুখ। এবং যেহেতু তারা নিজেরাও কুলীন, সুতরাং তাঁদের নিজেদেরও তো সন্তানাদি কম নয়! বিদ্যালয়ে বিনা বেতনের ছাত্র হয়ে কিছুদিন পড়াশুনো করলো হরিশ, তারপর বিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই এক সময় তাকে বিদায় নিতে হলো। মামারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজের ভাব নিজেদের বুঝে নিতে বলেছেন। হরিশের ওপরে একটি ভাই আছে, কিন্তু সে একটি অপদার্থ। কোনোরকম জীবিকার পথ না পেয়ে সে ইতিমধ্যেই একটি বিবাহ করে ফেলেছে। কুলিন-সন্তানের পক্ষে এটাই সহজতম কাজ।

সংসার প্রতিপালনের জন্য হরিশকে চোদ্দ বছর বয়েসেই চাকুরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হলো। কিন্তু যে-বালক একটিও পাশ করেনি, তাকে কে কাজ দেবে? ইংরেজের কেরানি উৎপাদনের জন্য প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীর কুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। অনেক পাশ করা যুবকই চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে, কিন্তু সকলের উপযোগী চাকুরি নেই। বাড়তে থাকে বেকারের সংখ্যা।

হরিশ নিরুদ্যম না হয়ে ডাকঘরের সামনে দোয়াত-কলম নিয়ে বসতে লাগলো নিয়মিত। সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে লোকের মানি-অর্ডার ফর্ম পূরণ করে কিংবা দরখাস্ত বা চিঠিপত্র লিখে দেয়। তার হস্তাক্ষর সুন্দর, ইংরেজি বানান নির্ভুল। এই জন্য সে কিছু কিছু কাজ পায়। কয়েক বছর এইভাবে কাটাবার পর এক নিলামওয়ালার নজর পড়লো হরিশের ওপর। ছেলেটি চিঠিপত্র খুব ভালো লেখে। সেইজন্য নিলামওয়ালা হরিশকে ডাকঘরের দরজা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের অফিসে কাজ দিল। মাস মাহিনা দশ টাকা।

কৈশোর বয়স থেকেই হরিশের বুকের মধ্যে প্রবল অভিমান ও ক্ষোভ জমে আছে। তার মনে হলো, এই সমাজ যেন ষড়যন্ত্র করে তাকে একজন দশ টাকা বেতনের কেরানি বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে কিছুতেই এই ব্যবস্থা মেনে নেবে না। বংশ মর্যাদা কিংবা বিত্ত কোনোটাই তার নেই, শুধু রয়েছে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার। সে বুঝলো এখনো বিদ্যার কদর আছে, এ যুগ ইংরেজি বিদ্যার যুগ, উত্তমরূপে ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারলে সাহেবদের কাছে সমাদর পাওয়া যায়। বিদ্যাচর্চাই ব্রাহ্মণের বৃত্তি, সুতরাং শূদ্দুর-কায়েতদের তুলনায় সে-ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

হরিশ নিজের উদ্যমে বিদ্যাচর্চার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো। সারাদিন আপিসের পরিশ্রমের পর সে চলে যায় পাবলিক লাইব্রেরিতে। হাতের কাছে যে-বই

পায়, সেই বই-ই পড়ে ফেলে। খানকয়েক এডিনবরা ক্রনিকল পড়ে থাকে সামনের তাকে, সেগুলিই রোজ এসে পড়ে পড়ে মুখস্ত করা শুরু করলে সে। কবিতা মুখস্ত করার বদলে সংবাদপত্র মুখস্ত করলে দ্রুত ভাষা শিক্ষা করা যায়। বাড়িতে গিয়ে শুয়ে শুয়ে হরিশ বিড় বিড় করে, সেইদিন অধীত সংবাদপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ আবৃত্তি করে।

ইংরেজি ভাষায় কিছুটা দক্ষতা অর্জনের পর হরিশ পড়তে শুরু করলে ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। এই সদ্য যুবকের আর কোনো বাসনা নেই, আহার পরিচ্ছদ বিষয়ে হুঁশ নেই, একমাত্র নেশা বই পড়া।

দশ টাকা বেতনে আর কিছুতেই সংসারে ব্যয় সংকুলান হয় না। আবার সেই টাকা থেকেই কখনো কখনো হরিশ লোভ সংবরণ করতে না পেরে দু-একখানা পুস্তক ক্রয় করে ফেলে। নিলামওয়ালাকে একদিন হরিশ অনুরোধ জানালো কিছু বেতন বৃদ্ধি করার জন্য। নিলামওয়ালা সে প্রস্তাবে তো কর্ণপাত করলোই না, উল্টে দু-একটা কটু কথা বলে ফেললো। সেদিনই এক কথায় কর্মত্যাগ করে বেরিয়ে এলো হরিশ।

আবার ডাকঘরের সামনে বসে দু-এক পয়সার বিনিময়ে দরখাস্ত ইত্যাদি লেখা। সেই সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে গ্রন্থপাঠ চলতে লাগলো সমান উদ্যমে। শিক্ষার ব্যাপারে তার কোনো গুরু নেই, সে নিজেই নিজের শিক্ষক। তার প্রধান সম্বল তার জেদ। এদিকে গৃহে ঘোর অশান্তি, অনিয়মিত উপার্জনে সংসার একেবারে পর্যুদস্ত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জননীর শুচিবাতিক বাড়ছে এবং আরও বেশী মুখরা হচ্ছেন। ভ্রাতৃজায়াটিও তেমন শান্ত প্রকৃতির নয়, সেইজন্য শাশুড়ি-বধূর ঝগড়ায় বাড়িতে আর কাক-চিল বসতে পারে না।

ডাকঘরের সামনে আসন পেতে দোয়াত-কলম নিয়ে বসে থাকতে থাকতে সদ্য যুবক হরিশের মনে হয়, এই সমাজ তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখার চেষ্টা করছে। হৃদয়বৃত্তি প্রসারের তো সুযোগ দেবেই না, বরং প্রতিদিনই অনাহারে থাকার আশঙ্কা। তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে. পারবে না, কিছুতেই পারবে না। সে এই সমাজকে একহাত দেখে নেবার জন্য প্রতিদিন তীব্র শপথ গ্রহণ করে মনে মনে।

এক একদিন দ্বিপ্রহরে কোনো খাদ্য জোটে না, তবু অপরাহ্ণে পাবলিক লাইব্রেরিতে সে যাওয়া বন্ধ করে না। গ্রন্থপাঠের ক্ষুধা তার দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। প্রবল আত্মাভিমানের জন্য সে আর চাকুরির উমেদারিতে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে না ঠিক করেছে। এই সময় একদিন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়লো তার। মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে একজন কর্মীর পদ খালি হয়েছে। সে পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। মাহিনাও ভদ্রগোছের, মাসে পঁচিশ টাকা। হরিশ সেই পরীক্ষায় বসলো এবং প্রথম স্থান অধিকার করলো।

চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অনেকখানি স্থিতি এলো হরিশের জীবনে। এর পর সাধারণ মধ্যবিত্তদের জীবন যেভাবে চলে সেভাবেই হরিশের জীবন চালিত হবার কথা ছিল। কিন্তু হরিশ সে ধাতুতে গড়াই নয়। মায়ের অনুরোধে বিবাহ করতে হলো তাকে, কিন্তু সেই পত্নীর মৃত্যু হলো অবিলম্বে। অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলো। কিন্তু এ বিবাহও সুখের হলো না। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হরিশ বাল্যকাল থেকেই মাতৃভক্ত। কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে বনিবনাও হলো না তার স্ত্রীর। তার মা পুত্রের বিবাহ দেবার জন্যও ব্যগ্র ছিলেন আবার বিবাহিত পুত্রকেও বধূর কাছ থেকে সরিয়ে তিনি নিজে একলা আগলে রাখতে

চান। বাঙালী পরিবারের সেই চিরকালীন শাশুড়ি-বধূর বিবাদ হরিশের বাড়িতে একেবারে সংহার মূর্তি ধারণ করলো। হরিশ মাকে কটু কথা বলতে পারে না আবার স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দেবার কোনো উপায় নেই। আস্তে আস্তে সে সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যেতে লাগলো।

তখন কিছুদিন ধর্মের দিকে ঝুঁকলো হরিশ। ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। তার মতন এক সহায়সম্বলহীন বালকের প্রতি ঈশ্বর নজর রেখেছেন, তাই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। নতুন আপিসে যোগ দেবার এক বৎসরের মধ্যেই পদোন্নতি হয়েছে তার। বেতন হয়েছে দ্বিগুণ, ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কি এমন সম্ভব! মাত্র উনিশ বৎসর বয়েসী ক'জন যুবক এত টাকা মাহিনার চাকুরি করে? প্রিন্স দ্বারকানাথের বিদ্রোহী পুত্র দেবেন্দ্রবাবু একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার শুরু করলে হরিশ আকৃষ্ট হল সেদিকে। জননীর প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করেও সে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হলো এবং তার বাসস্থান এলাকা ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা স্থাপন করে প্রবল উৎসাহে প্রচার করতে লাগলো এই নতুন ধর্মের বাণী।

কিন্তু শুধু ধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়েই তার মন শান্ত হলো না। তার আরও কিছু চাই। ইতিমধ্যে সে আর একদিকে পরীক্ষা চালাতে লাগলো। তার নিজের যত্নে শেখা ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান ঠিক কতখানি হয়েছে, সেটা তার জানা দরকার। তার যে স্কুল-কলেজের কোনো ডিগ্রি নেই, সে চিন্তা প্রায়ই তাকে পীড়া দেয়। সে কিছু কিছু ইংরেজি রচনা পাঠাতে লাগলো পত্র পত্রিকায় ছদ্মনামে। সেগুলি সবই ছাপা হলো অনায়াসে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় ছাপা হলো তার বেশ কয়েকটি রচনা। বাবু কাশীপ্রসাদ বিখ্যাত ইংরেজ নবীশ, তবু হাজার হোক তিনি একজন নেটিব। এবার হরিশ তার রচনা প্রেরণ করলো সাহেবদের বিখ্যাত পত্রিকা 'ইংলিশম্যান'-এ। সেই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কব্ হ্যারি সেই রচনা শুধু যে সাগ্রহে প্রকাশ করলেন তাই নয়, তিনি অনুসন্ধান করলেন এই অজ্ঞাতনামা লেখকটি কে, যার লেখনী এত ক্ষুরধার, যার ইংরেজি ভাষাজ্ঞান একেবারে সাচ্চা ইংরেজদের মতন। এবার হরিশের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো। সমাজে আর কেউ তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না!

বিলাত থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজি গ্রন্থরাজি গোগ্রাসে গেলার ফলে একদিকে যেমন সে ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস, তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেল, সেই রকম অন্যদিকেও তার এক নতুন জ্ঞানের উন্মেষ হলো। প্রায় বাল্যকাল থেকেই সে ইংরেজি সভ্যতার অনুরাগী। কিন্তু তাদের সম্পর্কে অনেকখানি জ্ঞান আহরণের পর সে এই সভ্যতার কিছু বৈপরীত্যেরও হদিশ পেল। ইংরেজরা স্বাধীনতা নামক বস্তুটিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করে, স্বদেশে ইংরেজ তার সন্তানদের স্বাধীনচেতা এবং স্বাধীনতার প্রহরী হবার শিক্ষা দেয়, কিন্তু সেই ইংরেজই অন্য জাতির স্বাধীনতার কোনো তোয়াক্কা করে না। ইংরেজদের রচনা পড়েই হরিশের মনে আস্তে আস্তে স্বাধীনতার বোধ জাগতে লাগলো। সে চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে বুঝতে পারলো, তার দেশবাসীর মধ্যে এই বোধের এত অভাব! সেইজন্যই বুঝি ইংরেজ আজ ভারতবাসীকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। ইংরেজ এ দেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু এ দেশ শাসন করার ব্যাপারে কোনো ভারতীয়ের কোনো মতামত ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। এমনটি তো মুঘল আমলেও হয়নি! হরিশ ঠিক করলো, ইংরেজের কাছ থেকে দেশের জন্য যতখানি সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায় সেজন্য সে কলম ধারণ করবে। কিছুদিন পরে সাংবাদিক হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জনের পর

তার হাতে এসে গেল হিন্দু পেট্রিয়ট নামে একটি পত্রিকার পুরোপুরি সম্পাদনার ভার। এবার তার লেখনী থেকে আগুন ঝরতে লাগলো।

এখন হরিশ মুখুজ্যে দেশের কেউকেটাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, এক ডাকে সকলে তাঁকে চেনে। স্বয়ং লর্ড ক্যানিং পেয়াদা পাঠিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টের কপি অগ্রিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা হরিশকে স্কন্ধে তুলে নাচতে পারলে যেন বর্তে যান। সমাজের একেবারে নিম্নতলা থেকে হরিশকে এক পা এক পা করে এই শীর্ষস্থানে উঠতে হয়নি, তাঁর উত্তরণ লম্ফে লম্ফে। সেই একই অফিসে তিনি এখন চারশত টাকা বেতনে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। হিন্দু পেট্রিয়ট চালাবার জন্য তিনি নিজে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে শুধু জমিদার এবং অতি ধনাঢ্য এবং অতি খ্যাতিমান মানুষরাই সভ্য, সেখানে হরিশকেও সভ্য পদে বরণ করে নেওয়া হয়েছে এবং হরিশ সেখানে কিছু রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন আইন।

সিপাহী যুদ্ধ চলাকালীন হরিশের পত্রিকা একদিকে যেমন সিপাহীদের দুষ্কর্মের সমালোচনা করেছে, সেইরকমই প্রতিশোধ স্পৃহায় ইংরেজরা যখন উন্মত্ত হয়ে উঠলো, তখন তাদের সংযত হবার জন্য হরিশ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেছেন নিপুণভাবে। সেই সময় লেখনী চালনার জন্য তিনি আহার নিদ্রারও সময় পাননি।

সিপাহী যুদ্ধ নিবৃত্ত হবার পর হরিশের মধ্যে আর একটা পরিবর্তন এলো। ইংরেজের হাতে এই দেশ যে কতখানি অসহায়, তা যেন তিনি নতুনভাবে অনুভব করলেন। ইংরেজ দু-চারটি ভারতীয়ের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে কিন্তু আবার যে-কোনো সময়ে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে অবমাননা করতে কিংবা যে-কোনো প্রকার শাস্তি দিতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই ইংরেজের হাতে।

সিপাহীদের বিদ্রোহ এক হিসেবে ব্যর্থ হলো না। সিপাহীরা যুদ্ধে হেরে গেল বটে, কিন্তু এই উপলক্ষে অনেক মানুষের মনে জেগে উঠলো দেশাত্মবোধ।

হরিশ ধনী সমাজের নয়নের মণি হয়ে উঠলেও তাদের সঙ্গ তাঁর বেশীদিন ভালো লাগলো না। তিনি যে অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাঁর যখন অর্থ ছিল না, প্রতিপত্তি ছিল না, তখন কেউ তো তাঁর দিকে ফিরেও চায়নি। এখন ধনীরা তাঁদের গৃহে খানাপিনার জন্য হরিশকে ডাকেন। কিন্তু হরিশ তখনো তাঁদের কঠোর কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। একমাত্র নবীনকুমার সিংহের সঙ্গেই তাঁর বেশ সৌহার্দ্য জন্মে গেল। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করেন।

ধনীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে হরিশ মনোযোগ দিলেন দেশের সাধারণ মানুষের দিকে। সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার ঠিক পরেই হরিশ ঘুরে এলেন নদীয়ার যশোহরের কয়েকটি স্থান। পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা তিনি দেখে এলেন স্বচক্ষে। নানাপ্রকার নিপীড়ন, নির্যাতন তো আছেই, ইদানীং কয়েক বৎসর ধরে নীলকরদের অত্যাচারে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। তাদের কথা কেউ জানে না। সেই সব অসহায় মানুষদের আর্তনাদ শহরে এসে পৌঁছয় না। হরিশ ঠিক করলেন, এবার থেকে এইসব মানুষদের কথা তিনি লিখবেন। কলম হাতে নিয়ে তিনি নীলকর সাহেবদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

সারাদিন আপিসে পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন, তারপর

সন্ধ্যাকালে এসে বসেন তাঁর পত্রিকার দফতরে। একাই তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ভরিয়ে দেন।

নবীনকুমার একদিন এলো হরিশের পত্রিকা কার্যালয়ে। বিক্রমোর্বশী অভিনয়ের সাফল্যের পর সে আবার নতুন কিছু করতে চায়। এ বিষয়ে সে পরামর্শ চায় হরিশের। কিন্তু সম্প্রতি হরিশ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আসা বন্ধ করেছেন।

নবীনকুমারকে দেখে হরিশ বললেন, বসো। আগে লেখাগুলো শেষ করে নেই, তারপর তোমার সঙ্গে কতা কইব।

নবীনকুমার চুপ করে বসে দেখতে লাগলো। এবং তার বিস্ময় বর্ধিত হতে লাগলো উত্তরোত্তর।

একটি ছোট টেবিল ও একটি কেরাসিন কাঠের চেয়ারে হরিশ বসেন। ঐ রকমই আর তিনটি চেয়ার ও একটি আলমারি এই নিয়ে হরিশের বিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়টের দফতর। নিচের তলায় ছাপাখানা। হরিশের টেবিলের ওপর একটি সেজ বাতি জ্বলছে। তার পাশে একটি গেলাস ও একটি বড় ব্র্যাণ্ডির বোতল। হরিশ গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে লিখে চলেছেন আর মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে চোখ না ফিরিয়েই তিনি বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করছেন। নবীনকুমার এত দ্রুত হাতে লিখতে আর দেখেনি কখনো কারুকে। মুক্তার মতন হস্তাক্ষর, একটি কাটাকুটিও করছেন না হরিশ, ইংরেজি বাক্যগুলি যেন তাঁর মস্তিষ্ক থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে।

এক সময় একটু লেখা থামিয়ে হরিশ বললেন, অঃ, একটা তো ভারি ভুল হয়ে গ্যাচে! তোমায় কোনো আপ্যায়ন করা হয়নি, ভাই নবীন। তা আর একটা গেলাস আনাই, তুমি ব্র্যাণ্ডি খাবে তো!

নবীনকুমার বললো, মাপ করো, আমি সুরাপান করি না।

হরিশ আর বাক্যব্যয় না করে নিজ গেলাসে আবার পানীয় নিয়ে গলায় ঢাললেন।

নবীনকুমার বললো, বন্ধু, তুমি যে এমন করে খাচ্চো...কিছুদিন আগেই পেটের ব্যামোয় কষ্ট পাচ্চিলে!

হরিশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাঁ হাতটা নেড়ে বললেন, পিসীমাদের মতন লেকচার ঝেড়ো না! আমি কেন মদ খাই, তা আমি জানি! তুমি খেতে চাও না, খেয়ো না। আমায় মদ্যপান কে শিকিয়েচেন জানো? স্বয়ং রামগোপাল ঘোষ। তিনি কত বড় মানুষ তুমি জানো! ব্যস আর বেশী কতা কয়ো না!

আবার লেখা শুরু করলেন হরিশ। তাঁর লেখা শেষ হবার আগেই পুরো ব্র্যাণ্ডির বোতলটি শেষ হলো। শেষের দিকে হাত কাঁপতে লাগলো হরিশের। ছাপাখানার এক কর্মচারীকে ডেকে কপি সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জড়িত স্বরে নবীনকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তোমার কী বৃত্তান্ত বলো!

নবীনকুমার বললো, বন্ধু, তুমি আর আজকাল আমাদের বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে যাও না!

হরিশ বললেন, আর যাবোও না...তোমরা ধনীর দুলাল, তোমরা ঐ সভায় বক্তিমে মেরে কিংবা থিয়েটার করে দেশোদ্ধার করো, ওতে আর আমি নেই। আমি যদি দেশের গরিব দুঃখীর কিছুমাত্র উবগার কত্তে পারি, তাতেই আমার জীবন ধন্য হবে। আমি গরিবের ছেলে, এখন যদি অন্য গরিবদের ভুলে যাই, তা হলে আমি নিমকহারাম! চলো, আর এখেনে ভাল্লাগচে না! চলো—

নবীনকুমার বললো, বাড়ি যাবে তো? চলো।

হরিশ বললেন, বাড়ি? আমার আবার বাড়ি আচে নাকি? সে তো এক তপ্ত কটাহ, তার মধ্যে টগবগ করে তেল ফুটচে। তুমি সেখেনে আমায় পাটাতে চাও! কেন?

নবীনকুমার বললো, তা হলে এখন কোতায় যাবে, বন্ধু? তোমার শরীর ভালো নয়তো—

হরিশের মুখে এক অদ্ভুত হাস্য ফুটে উঠলো। ঢুলুঢুলু নেত্রে তিনি নবীনকুমারের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আমি যাবো এখুন রামবাগানে, হরিমতি নামে একটা ভালো মেয়েমানুষ এয়েচে, টাট্‌কা তাজা, চমৎকার নাচে! চলো, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি? চলো, চলো, এখুন তুমি সাবালগ হয়েচো, চলো—।

নবীনকুমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, ছিঃ। আমায় তুমি মাপ করো, বন্ধু!

হরিশ বললেন, কী? কি বললে আমায়? অ্যাঁ? জানো, প্রতিভাবান পুরুষরা যদি ঠিক আশ মিটিয়ে যোষিৎ সংসর্গ না কত্তে পারে, তা হলে তাদের বুদ্ধিতে মরচে পড়ে যায়? চলো না, একবার আমার সঙ্গে গিয়েই দেকো না—।

নবীনকুমার বললো, না!
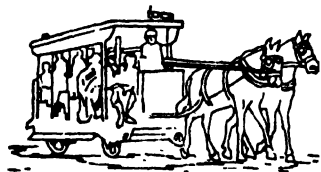
সরোজিনীর ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে নবীনকুমারকে যেতে হয়েছে বর্ধমানে। কিছুকাল আগে সরোজিনীর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় জ্যেষ্ঠ জামাতা হিসেবে নবীনকুমারই কন্যাকর্তা। পাত্রের বাড়ি ঠিক সদর বর্ধমানেও নয়, ঐ জেলার অন্তঃপাতী এক প্রাচীন গ্রামে। পাত্রের পিতা একজন ধনাঢ্য জমিদার, কলকাতায় তাঁদের একাধিক অট্টালিকা আছে, কিন্তু গ্রামের বসতবাড়ির কুলদেবতার সামনে বিবাহ যজ্ঞ সম্পন্ন করাই তাঁদের পারিবারিক প্রথা। কুলদেবতাকে কলকাতায় আনয়ন করা সম্ভব নয়, সেইজন্য কন্যাপক্ষকে সদলবলে যেতে হয়েছে সেই সুদূর গ্রামে। অবশ্য বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি নেই, মোট একচল্লিশটি পাল্কি সারবন্ধভাবে রওনা হয়েছে কলকাতা থেকে। নবীনকুমার এখন বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য ছাড়া থাকতে পারে না, তাই কয়েকজন বন্ধুকেও সে সঙ্গে নিয়েছে। যদুপতি আর উমানাথ তো আছেই, তা ছাড়া হরিশ মুখুজ্যেকেও সে জোর করে নিয়ে গেছে।

সরোজিনী বেশ কিছুদিন ধরেই পিত্রালয়ে। তাদের বাড়িতে এক একটি বিবাহের উদ্যোগপর্ব শুরু হয় অন্তত এক মাস আগে এবং পরে তার জের চলে আরও এক মাস। নবীনকুমার এবং সরোজিনীর সঙ্গে তাদের নিজস্ব দাসদাসীরাও চলে গেছে, তাই জোড়াসাঁকোয় সিংহ বাড়ির অন্দরমহলের দ্বিতল প্রায় শূন্য।

মধ্যরাত্রে বিম্ববতীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তাঁর মনে হয়, তিনি যেন নির্জন নিশুতি কোনো প্রান্তরে শুয়ে আছেন। সে সময়ে তিনি তাঁর বুকের কাছে অনেকখানি শূন্যতা অনুভব করেন। এক সময় তাঁর বুকের পাশটিতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতো তাঁর খোকা, তখন মনে হতো এই বিশ্বসংসারে তাঁর আর কিছুই চাইবার নেই। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। আট নয় বৎসর

বয়েস থেকেই নবীনকুমার বড় বেশী স্বাতন্ত্র্যবাদী, তখন থেকেই সে আর তার মায়ের পাশে শোয় না, তার শয্যা স্থাপিত হয়েছিল পৃথক কক্ষে। এখন নবীন-কুমার তার পিতা রামকমল সিংহের বিরাট কক্ষটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বিম্ববতী তাঁর স্বামীকে যেমন কখনো সেরকম আপন করে পাননি, তাঁর সন্তানও তেমনই যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

নবীনকুমার বাড়িতে নেই বলেই যেন এই চিন্তা কয়েকদিন ধরে বিম্ববতীকে বেশী পীড়া দিতে শুরু করেছে। অন্য সময় ছেলে একই বাড়িতে কাছাকাছি কোথাও আছে, এই অনুভব অনেকখানি শান্তি দেয়। সন্তান কামনায় এক সময় বিম্ববতী প্রায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সেই সন্তান পেয়েও তাকে নিয়ে তাঁর নিজের জীবন তো পূর্ণ হয়ে উঠলো না।

অথচ সন্তান সম্পর্কে অভিযোগ করারও কিছু নেই। এমন হীরের টুকরো ছেলে ক'জনে পায়? এই বয়েসে ছেলেদের গৃহের বন্ধনে আটকে রাখা যে কতখানি দুষ্কর তা বিম্ববতী ভালোই জানেন। কর্তাদের ধরনই এই, সাবালক হবার আগে থেকেই পাখা গজায়, তখন আর তারা কিছুতেই বাড়িতে রাত কাটাতে চায় না। কিন্তু নবীনকুমার সে ধরনেরই হয়নি। ইয়ার মোসাহেবদের নিয়ে সে ফূর্তি করে না, একটি দিনও সে বাড়ির বাইরে থাকে না। সে বিদ্বান-সজ্জনদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, জ্ঞানের চর্চায় সময় কাটায়। সে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য মেতে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে পিতৃ-পিতামহদের ধর্মে কালি দেয়নি। শুধু তার জেদ বা গোঁ বড় বেশী, এই যা। এই বয়েসেই তাঁর ছেলের যে কতখানি সুনাম রটেছে, সে কথা বিম্ববতীরও কানে এসেছে। শুধু দিনে একবার দুবার ছেলে যদি তাঁর কাছে এসে পাশটিতে বসে মা বলে ডাকতো, দুটো মনের কথা কইতো! গত কয়েক বৎসর ধরে নবীনকুমার মায়ের কাছে এসেছে শুধু টাকা পয়সা চাইবার জন্য। সম্প্রতি সাবালক হয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পর থেকে সে আর একবারও আসে না।

জা হেমাঙ্গিনী ছিলেন বিম্ববতীর অনেকখানি সঙ্গিনী, গত বৎসর তিনিও ধরাধাম পরিত্যাগ করেছেন। এখন আর বিম্ববতীর সময়ই কাটে না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান আর ঠাকুরঘরে ধ্যান করে আর কত সময় কাটানো যায়! যদি একটি নাতিও থাকতো! কতদিন এ গৃহে কোনো শিশুর কলহাস্য শোনা যায়নি। নাতির চিন্তা করলেই বিম্ববতীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চক্ষে জল আসে। মনে পড়ে আর একজনের কথা। নবীনকুমারের এখনো কিছুই বয়েস নয়, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বেঁচে থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই তিনি নাতি-নাতনীর মুখ দেখতেন। তাদের বুকে জড়িয়ে তিনি আবার জীবন ধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারতেন।

দুজন ভৃত্য ঝাড়পোঁছ করার জন্য নবীনকুমারের কক্ষের তালা খুলেছে, সে সময় বিম্ববতী এসে দাঁড়ালেন সেখানে। ভৃত্যদের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, তোরা যা, আমি বন্দো করে দেবো'খন।

বিম্ববতী ঢুকলেন সেই কক্ষে। কয়েক যুগ আগে নববধূর সাজে এই কক্ষে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন বিম্ববতী, এখানেই তাঁর ফুলশয্যা হয়েছিল। তখন বিম্ববতী নিতান্তই অবোধ বালিকা, পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে সেই প্রথম দিন এক অচেনা বাড়িতে রাত্রি যাপন। ভয় পেয়ে বিম্ববতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন আর তাঁর স্বামী পরম স্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন,

সেই স্মৃতি এখনো বিম্ববতীর মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক।

রামকমল সিংহ পত্নীর জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট করেছিলেন দাম্পত্য-জীবনের শুরু থেকেই। সেই সময়েই তিনি বিম্ববতীর চেয়ে বয়েসে অনেক বড় এবং অভিজ্ঞও ছিলেন, বিবাহের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মাসে কয়েকদিন, শেষের দিকে বৎসরে দু-একদিন রাত্রিকালে বিম্ববতীকে তিনি আহ্বান জানাতেন তাঁর শয্যার অংশভাগিনী হবার জন্য। তাও সারা রাত্রির জন্য নয়। রামকমল সিংহের নাসিকাগর্জন ছিল সুবিখ্যাত, সেই গর্জনে এক এক সময় তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যেত, তিনি কে রে? কে রে? বলে চিৎকার করে উঠতেন। অধিকাংশ নাসিকা গর্জনকারীরাই নিজেদের এই গুণপনাটি বিষয়ে অবহিত নন। কিন্তু রামকমল সিংহ জানতেন বলেই তিনি পছন্দ করতেন একাকী শয়ন। অবশ্য, যে-কটি দিন তিনি স্বগৃহে রাত্রি যাপন করার সময় পেতেন। নবীনকুমার অবশ্য পিতার স্বভাব পায়নি, সে পত্নীর সঙ্গে এক পালঙ্কেই ঘুমোয়।

শিয়রের কাছে দেয়ালের অভ্যন্তরে একটি বড় লোহার সিন্দুক। এর চাবি থাকতো কর্তার কাছে, মধ্যে এতগুলি বছর ছিল বিধুশেখরের জিম্মায়, এখন নবীনকুমারের কাছে। বিম্ববতী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, নবীনকুমার কক্ষটির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। রামকমলের আমলে ছিল দরজার ঠিক ওপরেই এক বিলাতী শিল্পীর আঁকা জলকেলিরত তিন নগ্ন রমণীর চিত্র। রামকমল বিম্ববতীকে বুঝিয়েছিলেন যে ঐ রমণী তিনটি অপ্সরা, সেইজন্য তাদের পোশাক পরিধান করতে নেই। নবীনকুমার সে ছবি সরিয়ে ফেলেছে, সেখানে কালিঘাটের পটুয়াদের আঁকা কয়েকটি পট সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো। পালঙ্কের দক্ষিণ পাশেই ছিল কর্তার আলবোলা, তার রূপা বাঁধানো নলটি খুবই সুদৃশ্য। নবীনকুমার ধূমপানের অভ্যেস করেনি। সে আলবোলাটি আর স্বস্থানে নেই, সেইজন্যই ঘরে ঢুকে কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল বিম্ববতীর। আলবোলাটির স্থানে এখন একটি মেহগনি কাঠের এবং কাচের ছোট আলমারি, তার মধ্যে কয়েকটি বই রাখা। রামকমল সিংহ বইপত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতেন না। নবীনকুমারের আরও একটি শখ আছে, যা তার পিতার ছিল না। দুটি বড় ফুলদানিতে তার কক্ষে প্রতিদিন টাটকা ফুল সাজানো থাকে। বিম্ববতী আগেও শুনেছেন যে নবীনকুমার প্রতিদিন সকালে উদ্যানের মালিকে ডেকে ফুল বাছাই করে। পূজা অর্চনার জন্য ছাড়া কেউ প্রতিদিন নিজের শয়ন কক্ষ ফুল দিয়ে সাজায়, তা বিম্ববতী আগে কখনো জানতেনই না। তাঁর পুত্র কোথা থেকে এসব শিখলো?

ফুলদানি দুটি নতুন, খাগড়াই কাঁসার। আগে ছিল দুটি পোর্সিলিনের। সেই যে এক রাত্রে নবীনকুমার অত্যন্ত রাগারাগি করে অনেক জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছিল, সেদিন ঐ ফুলদানি দুটিও গেছে। বিম্ববতী কাছে এগিয়ে এসে দেখলেন, ফুলদানিতে কয়েকদিনের বাসী ফুলের স্তবক শুকিয়ে আছে। ঘরের মালিক নেই, তাই কেউ ফুল বদল করেনি। বাসী ফুলগুলি তুলে নিয়ে কেন জানি বিম্ববতীর অকস্মাৎ কান্না পেয়ে গেল। অশ্রু মোচন করতে করতে তিনি নিজেই বিস্মিত হতে লাগলেন। কেন কাঁদছেন, তা তিনি জানেন না।

দ্বারের কাছে একটি শব্দ শুনে চমকিত হয়ে ফিরে তাকালেন বিম্ববতী। তিনি দেখলেন, কখন বিধুশেখর এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কখন এয়েচেন?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিধুশেখর। তাঁর ওষ্ঠে মৃদু হাস্য। পার্বতীর মতন ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইলেন বিম্ববতী। বিধুশেখরকে এই কক্ষে

প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করতে বলবেন, না তিনি নিজেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারলেন না।

লাঠি ঠকঠকিয়ে বিধুশেখর এগিয়ে এলেন কয়েক পা। জরিপ করার ভঙ্গিতে চতুর্দিকে মাথা ঘুরিয়ে কক্ষটি দেখলেন কয়েকবার। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, এগারো বচর, প্রায় এক যুগ আগে এ ঘরে আমি শেষ এয়েচিলুম। সেবার রামকমলের সান্নিপাতিক হলো, তোমার মনে আচে, বিম্ব?

বিম্ববতী নিঃশব্দে ঘাড় হেলালেন।

বিধুশেখর আবার বললেন, ছোট্‌কু বন্ধোমানে গ্যাচে শুনিচি, কবে ফিরবে? আজকাল লোকমুখে আমায় এসব খপর পেতে হয়।

বিম্ববতীও জানেন না যে নবীনকুমার ঠিক কবে প্রত্যাগমন করবে। তাই তিনি নিরুত্তর রইলেন।

বিধুশেখরের কণ্ঠে সামান্য অভিযোগের সুর এসেছিল, এবার সেটি মুছে ফেলে তিনি আবার হাসলেন। তারপর বললেন, বিম্ব, তোমার সঙ্গে এ ঘরে আমার কখনো দেকা হয়নি কো।

সে কথা ঠিক। মধ্যে মধ্যে রামকমল সিংহের সুদীর্ঘ প্রবাস কালে বিধুশেখর আসতেন বিম্ববতীর খোঁজ খবর নিতে। তখন বিম্ববতীর নিজস্ব কক্ষেই দেখা হতো।

সম্পূর্ণ অকারণেই প্রায়, বিম্ববতী গলায় আঁচল জড়িয়ে বিধুশেখরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। বিধুশেখর বিস্মিত হলেন না, তিনি ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, চির-আয়ুষ্মতী হও, সৌভাগ্যশালিনী হও! তুমি একা একা এ ঘরে ডাঁড়িয়ে কাঁদছেলে কেন, বিম্ব?

বিম্ববতী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী জানি।

বিধুশেখর এগিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে বললেন, তুমি আমায় কখনো কাঁদতে দেকেচো? আমি পুরুষকারে বিশ্বাসী, কান্নায় বিশ্বাসী নই। কিন্তু এদানি আমার কী হয়েচে কে জানে, আমারও চোকে জল আসে, যকন তকন। আমি ভাবি, এ আবার কী জ্বালা? বোধ হয় বুড়ো বয়সে আমার ভীমরতি ধরলো!

বিম্ববতী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শরীর ভালো আচে?

বিধুশেখর বললেন, হ্যাঁ, ভালো, বেশ ভালো, হটাৎ যেন বেশী ভালো হয়ে গ্যাচে! পিদিমের সল্‌তে নেববার আগে একবার বেশী করে জ্বলে ওঠে না? এ বোধ হয় সেই দশা! তুমি ভালো আচো বিম্ব?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। যতদিন বাঁচবো, তোমায় দেকে যাবো। তুমি তো জানো বিম্ব, আমি ইচ্ছে করলে এ বাড়ির মালিক হতে পাত্তুম! এইসব বিষয় সম্পত্তি আমার হতে পাত্তো! এই ঘরে, এই ছাপরখাটে আমার জন্য বিছ্‌না পাতা হতো—

মধ্যপথে কথা থামিয়ে বিধুশেখর হাসতে লাগলেন। রীতিমতন খুশীর, উপভোগের উপহাস্য।

বিম্ববতী আকুল নয়নে চেয়ে রইলেন বিধুশেখরের মুখের দিকে।

এক সময় হাসি থামিয়ে বিধুশেখর বললেন, দ্যাকো, এই আমার এক নতুন উপসর্গ। আগে কখনো আমায় অকারণে হাসতে দেকোচো? কান্নার মতন হাসিও আমার এক নতুন ব্যাধি।

বিম্ববতীর মনে হলো, এই বিধুশেখর তাঁর অচেনা। ইনি একজন নতুন মানুষ। ডাকসাইটে পুরুষ বিধুশেখর মুখুজ্যের পক্ষে হঠাৎ হাসি বা কান্না অন্যদের কাছে অকল্পনীয়।

—এবার মনে পড়েচে, বিম্ব, কেন হাসলুম। পরে বলচি। তোমার সঙ্গে কটা কতা আচে, সেইজন্যই এয়েচি। ছোট্কু যে বড় ভাবিয়ে তুললে! এ ছেলেকে সামাল না দিলে যে সব যাবে!

বিম্ববতী আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী করেচে ছোট্কু?

—কলুটোলায় তোমাদের যে সাত বিঘে জমি ছেল, তা বেচে দিয়েচে! এমন গোখুরির কাজ কেউ করে? নগরের একেবারে মদ্যিখানে, ও তো জমি নয়, সোনা, দিন দিন দাম বাড়চে! মেডিকেল হাসপাতালের একেবারে গায়ে। আমায় ঘুণাক্ষরে কিচু জানায়নি। কেন এমন কান্ড করলো, জানো?

—কেন?

—আমার ওপর টক্কর দেবার সাধ। সবাইকে দেকালে যে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেও সে তার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যা খুশী করতে পারে। এই যদি যা খুশীর নমুনা হয়, তা হলে দু'দিনেই তো সব ফুঁকে দেবে!

—ছোট্কু আমাকেও কিচু বলেনি।

— বিম্ব, গঙ্গাকে আমি সহ্য করতে পাত্তুম না, তুমি সেজন্য মনে ব্যথা পেতে, আমি জানি। কিন্তু গঙ্গা বড় অসমীচীন কাজ করেছেল, আমার বিধবা মেয়ে বিন্দু, সে তার ভগ্নীর মতন, তার প্রতি সে কু-নজর দিয়েছেল। ছিঃ! সেজন্য আমি তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। কিন্তু ছোট্কু, সে তো আমার বুকের ধন, তার কোনো আবদারে আমি বাধা দিই না, সে আনন্দ ফুর্তি করতে চাইলেও...

—ছোট্কুর কোনো বদ অভ্যেস নেই।

কিন্তু আমার সঙ্গে সে কেন আকচা-আকচি করতে চায়? আমি তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিলেও সে দূরে সরে যায়। আমি কি তার প্রতিপক্ষ হতে পারি? তাকে আমি দু' চক্ষের মণি করে রাকতে চাই, আর সে আমার চোকে ধুলো দিতে চায় কেন? আমার বড় কষ্ট হয়—

—ছোট্কু এখনো ছেলেমানুষ!

—কিন্তু তার ধরন ধারণ যে পাকা! সে তবিলের চাবি চাইলে, আমি এক কতায় দিয়ে দিলুম। সে টাকা চাইলে, যত লাখ টাকা চাক, আমি এক কতায় দিতে পারি। তবু তাকে জমি বেচতে হবে, আমায় লুকিয়ে? আমার এ দুঃখু আমি তোমায় ছাড়া আর কাকে জানাবো?

বিধুশেখর তাঁর একটু আগেকার উক্তির সত্য প্রমাণিত করার জন্য নিরত হলেন এবং তাঁর চক্ষু থেকে জল ঝরতে লাগলো।

বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চক্ষু মুছে তিনি বললেন, কেন হাসচিলুম জানো? এই দ্যাকো—

বিধুশেখর দলিলের মতন একটি লম্বা তুলোট কাগজ বাড়িয়ে দিলেন বিম্ববতীর দিকে। সে কাগজ দেখে আর বিম্ববতী কি বুঝবেন, তিনি উৎসুক-ভাবে বিধুশেখরের কাছ থেকে আরও কিছু শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

—কলুটোলার সেই জমি আমিই কিনে নিইচি। বলচিলুম না। তোমাদের এই সব বিষয়-সম্পত্তি আমিই কিনে নিতে পাত্তুম! এবার বুঝি তাই-ই হলো, ছোট্কু যা বেচবে, তা আমাকেই কিনে নিতে হবে! হে-হে-হে-হে! হাসির ব্যাপার নয়!

—আপনি না দেকলে ও যে একেবারেই ভেসে যাবে!

—দেকবো! ওকে দেকার জন্যই আমায় আরও বেঁচে থাকতে হবে! কিন্তু আমি আর আগের মতন নির্লোভ নই। তোমার ছেলের ভালোমন্দ আমি দেকবো, কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার কাচ থেকে প্রতিদান চাই। প্রদীপের সলতে নেববার আগে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেচে, আমার কামনা বাসনা বেড়ে গ্যাচে, পাপ-পুণ্যের চিন্তে ঘুচে গ্যাচে! লোভী, আমি আবার বিম্ব লোভী হয়িচি, আমি আবার তোমাকে চাই।

বিম্ববতীর মুখখানি রক্তশূন্য, বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্তের মতন একবার দ্বারের দিকে চাইলেন।

বিধুশেখর ওষ্ঠে হাসি অঙ্কিত রেখে বললেন, বার্ধক্যে মানুষ দ্বিতীয়বার শিশু হয়, আমারও সেই দশা। উদ্ভট সব শক হয় আজকাল। যেমন, আমার ইচ্ছে হয়েচে, আমার বন্ধু রামকমলের এই পালঙ্কে আমি শয়ন করবো, আর তুমি এসে আমার সেবা করবে!

—না!

—বিম্ব—

—দয়া করুন, আমায় ক্ষমা করুন, আপনি কতা দিয়েচিলেন—

—সে সব কতা ভেসে গ্যাচে! এ যুগে কেউ কতা রাকে না। এ এক হতচ্ছাড়াদের যুগ এয়েচে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হতচ্ছাড়া হবো। এসো, বিম্ব, আমার বুকে এসো—

—না, আমায় ক্ষমা করুন। সে বিম্ব নেই, সে মরে গ্যাচে—

বিধুশেখর এবার মুখের রেখা কঠোর করলেন, তারপর নিজের পাশটা চাপড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, এসো, এখেনে এসে বসো। তার আগে দোরটা দিয়ে এসো, যাও—

নবীনকুমার সিংহের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের প্রবল সুখ্যাতির ফলে কলকাতার ধনী সমাজে বেশ একটা আলোড়ন পড়ে গেল। বাংলায় নাটকের অভিনয় ব্যাপারটি তো বেশ অভিনব। এর আগেও দু-চারটি জায়গায় হয়েছে বটে কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যরা যেন একেবারে মাৎ করে দিয়েছে। সাহেব-মেমরা পর্যন্ত এসে দেখেছে এবং ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই তো বেশ একটি প্রকৃষ্ট উপায়! শহরের বিভিন্ন স্থানে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার ধুম পড়ে গেল।

পাইকপাড়ায় রাজ ভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সংগীত-নৃত্যাদি সম্পর্কে খুব উৎসাহী। তাঁরা নব্য ধরনের বিলাসী পুরুষ। নবাবী আমলের রেশ ধরে এক দল ধনী এখনো বিকৃত আনন্দে মত্ত, সুরা, বারবনিতা ও কদর্য রস ছাড়া তাদের তৃপ্তি হয় না। নব্য ধরনের বিলাসী পুরুষরা পছন্দ করেন না ওসব কিন্তু রুচিশীল আমোদ প্রমোদে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। দেশীয় সংস্কৃতির উদ্ধার, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন ও নারীশিক্ষার প্রসার—

এইগুলিই নতুন আমোদ প্রমোদ, তার সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলা নাটকের অভিনয়। স্বদেশ ও মাতৃভাষার উন্নতি ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে এঁরা পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে চিঠি চালাচালি করেন এবং এই সব বিষয়ে সাহেবদের কাছ থেকে বাহবা না পেলে বড় অধীর হয়ে পড়েন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলা ক্রয় করেছেন এবং সেখানে 'আওয়ার ওউন ক্লাব' নামে একটি সংগীত ও যন্ত্রবাদনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সেখানে সপ্তাহে কয়েকটি সন্ধ্যা আসেন সংগীত সুধালহরী আস্বাদনের জন্য। এবার তাঁরা ঠিক করলেন একটি মৌলিক বাংলা নাটকের মঞ্চাভিনয় করবেন নিজেরাই। অকালপক্ব যুবক নবীনকুমার সিংহ নিজেই সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে বিক্রমোর্বশী, কিন্তু বেলগাছিয়া ভিলার ক্লাব-সভ্যদের কারুরই বাংলাজ্ঞান এমত নয় যে একটি বাংলা নাটক খাড়া করতে পারবেন, তাই তাঁরা গ্রহণ করলেন সম্প্রতি প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী। প্রবল উৎসাহে শুরু হলো মহড়া।

গৌরদাস বসাক এই আওয়ার ওউন ক্লাবের একজন সদস্য এবং তিনি অতিশয় সুপুরুষ ও সুকণ্ঠের অধিকারী বলে তাঁকেও দেওয়া হলো একটি ভূমিকা। গৌরদাসও বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। মহড়া দেখতে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আসেন, অনেক উচ্চমার্গের কথাবার্তা হয়, রামগোপাল ঘোষের মতন প্রবীণ পুরুষেরা নানাবিধ পরামর্শ দেন, সময়টা বড় সুন্দর কাটে।

বেশ কয়েকদিন মহড়া দেবার পর একটি প্রশ্ন উঠলো। নাটক মঞ্চস্থ করার দিন ভূরি ভূরি রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হবে সাব্যস্ত হয়েছে আগে থেকেই। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সাহেবরা এমন অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছেন, তাঁরা নিমন্ত্রণ পেলেও আসবেন তো? বাংলা নাটকের তো কিছুই বুঝবেন না তাঁরা। নবীন সিংগীর বিক্রমোর্বশীতে তো সাহেবরা সাজপোশাক আর মঞ্চের চাক-চিক্যই শুধু দেখেছে, নাটকের কথাবস্তু কিছুই তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাও সেখানে এসেছিলেন গুটি কয়েকমাত্র সাহেব।

রামগোপাল ঘোষ বললেন, একটি কাজ করলে হয়। এ নাটকের যদি একটি ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে এবং ছাপিয়ে আগে থেকেই সাহেবদের মধ্যে বিতরণ করা যায়, তা হলে সাহেব দর্শকরা নাটকের কাহিনীটিও সম্যক অবগত থাকবেন, অভিনয় অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না।

অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কে করবে সেই অনুবাদ? রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং করলেই কি সবচেয়ে ভালো হয় না?

রামগোপাল হেসে বললেন, আমি বড় জোর উগ্র ভাষায় কোনো প্যামফ্লেট রচনা কত্তে পারি, নাটক কাব্যে হাত দেওয়ার স্পর্ধা করি না। ও রসে আমি বঞ্চিত।

তখন গৌরদাস বললেন, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কতা কয়ে দেকতে পারি। সে রাজি হলে এ কাজ সে ভালোই পারবে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বন্ধুটির নাম কী?

গৌরদাস বললেন, তার নাম মধুসূদন দত্ত। ইংরেজি সে অতি দক্ষতার সঙ্গে লেখে, ইংরেজিতে সে অনেক পোয়েট্রি রচনা করেচে।

রাজা প্রতাপচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কে মধুসূদন দত্ত? কোন বাড়ির ছেলে? এককালে রাজনারায়ণ দত্ত খুব ফেমাস ল ইয়ার ছেলেন, তাঁর নাম শুনেছেন

নিশ্চয়ই। তাঁর ছেলে এই মধু, অনেকদিন মাড্রাসে ছেল—

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, ছাত্র বয়েসে আমি এঁর নাম শুনিচি বটে। খুব ডাক-সাইটে ছাত্র ছেলেন, কেরেস্তান হয়েছেলেন না? মাইকেল না কী যেন নতুন নাম হলো—

গৌরদাস বললেন, হ্যাঁ, তিনিই।

রামগোপাল বললেন, আমিও এর কতা শুনিচি। প্যারীর ভাই কিশোরীর বাগানবাটিতে কিচুদিন স্টে করেছেলেন। তা তিনি তো বাংলা জানেন না, পাক্কা সাহেব, তিনি বাংলা নাটক কী ভাবে ট্রানশ্লেট করবেন?

গৌরদাস বললেন, তিনি বাংলায় একেবারে অজ্ঞ নন। ইচ্ছে করে লোকসম্মুখে বাংলায় কনভার্স করেন না। ইদানি তিনি সংস্কৃত চর্চা কচ্চেন, তাই বাংলা নাটক বুঝতে তাঁর খুব একটা ডিফিকালটি হবে না বোধ করি।

প্রতাপচন্দ্র বললেন, বসাকভায়া যখন বোধ কচ্চেন যে এই ব্যক্তিই এ কাজ ভালো পারবেন, তা হলে সেমতই চেষ্টা করা যাক। বসাকভায়ার ওপরই ভার রইলো, একদিন সেই বন্ধুটিকে এই মহড়ায় নিয়ে আসুন বরং।

মধুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি গৌরদাসের, এই উপলক্ষে একদিন গেলেন মধুর চিৎপুরের বাড়িতে। যে ব্যক্তি প্রথম যৌবনেই নিজেকে মহাকবি বলে ঘোষণা করেছিল, বন্ধুদের বলেছিল একদিন তারা তার জীবনী রচনা করবে, সেই মধুসূদন এখন পুলিশ আদালতের একজন সামান্য দোভাষী মাত্র। কবিতা রচনা একেবারেই পরিত্যাগ করেছে। ফিরিঙ্গি পত্নী এবং নিত্যসঙ্গী অর্থাভাব নিয়ে একেবারে জেরবার অবস্থা। পত্নী সদ্য গর্ভবতী হয়েছেন, এ গৃহে দাস-দাসী টেঁকে না, সংসারে পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। অসামাজিক, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন মধুসূদন, গৌরদাস ছাড়া অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব তাঁর কাছে আসে না। তিনিও যান না কারো কাছে। চাকুরিটি কোনোক্রমে রক্ষা করে তিনি দিনের অন্য সময় সুরাপান ও গ্রন্থপাঠে ডুবে থাকেন। বাকি জীবনটা এই ভাবেই কেটে যাবে।

গৌরদাসকে দেখে মধুসূদন বললেন, তুমিও ব্রুটাস? তুমিও আমায় ভুলে গেলে! একবার খোঁজও নিস না, হোয়েদার আই অ্যাম ডেড অর অ্যালাইভ!

গৌরদাস আসন গ্রহণ করে বললেন, বাঃ, বেশ কতা! তুই-ও তো একবারটি আমার খোঁজ নিতে পারিস!

মধুসূদন বললেন, আমি খোঁজ কর্বো! হু উইল পে মাই গাড়ি ভাড়া? আমি গরিব কেরানী, আমি তো তোর মতন সাকসেসফুল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নই।

গৌরদাস উচ্চহাস্য করলেন। ছাত্র বয়েসে মধু কতবার গৌরদাসকে গাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, এখন তাঁর মুখে এই প্রকার দারিদ্র্যের কথা শুনলে বিসদৃশ লাগে।

মধুসূদন আবার বললেন, তা ছাড়া, ডিয়ার গৌর, আমি কেরেস্তান, হুটহাট করে যখন তখন তো তোমার বাড়িতে যেতে পারি না!

গৌরদাস বললেন, এও যে নতুন কতা শুনচি। তুই আমার বাড়িতে আগে যাসনি? সেখেনে থাকিসনি? আমার মায়ের হাতের রান্না খাসনি? তুই ক্রিশ্চান বলে আমাদের বাড়িতে কোনো অসুবিধে হয়েচে?

মধুসূদন হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বললেন, ওঃ, তোর মায়ের রান্না! সেই রুটি আর ফুলকপির ঘণ্ট! সে যে অমৃত! কতদিন খাইনি! গরু-শুয়োর খেতে খেতে জিব আউলে গেল, একদিন তোর মায়ের হাতের নিরিমিষ্যি রান্না খাওয়াবি, গৌর?

—চল না, আজই চল!

—অ্যাট ওয়ান্স! চল, আই অ্যাম রেডি, তোর জননীকে সাক্ষাৎ করে আসি।

—চল, ম্যাডামকেও সঙ্গে নে। তিনি কোতায়?

—না, না, আঁরিয়েৎ যাবে না। ও রুটি ঘণ্টের মর্ম বুজবে না। তা ছাড়া শী ইজ আনওয়েল, ও ফ্যামিলি ওয়েতে আচে।

—তা হলে তুই একলাই চল।

কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোটটি পরিধান করতে গিয়েও আবার খুলে ফেললেন মধুসূদন। নিরাশভাবে বললেন, নাঃ, হবে না! আমার ঘন ঘন তেষ্টা পায়। তোর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবো না!

—তেষ্টা পায় মানে?

—তোর বাড়িতে গিয়ে মা জননীর সামনে কি তুই আমায় বীয়র সার্ভ করতে পার্বি? আমি তোদের এই ক্যালকাটার ফিলদি ওয়াটার পান করি না। আই ডোনট টেক ওয়াটার অ্যাট অল। আমি জলের বদলে বীয়র পান করি!

—তুই একেবারেই জল খাস না?

—এই কনটামিনেটেড ওয়াটার খেয়ে কি শেষে ওলাউটোয় মর্বো বলতে চাস? না, না, সেটি হচ্চে না!

—আশ্চর্য কাণ্ড! এই জল খেয়ে আমরা বেঁচে আচি কী করে?

—তোদের সহ্য হয়! তোদের হিন্দু পেটে গঙ্গার জলে সব শুদ্ধ হয়ে যায়! গত মাসে আমি পেট ব্যথায় ধুম ভুগলুম! বাপরে বাপ, লীবর, স্প্লীন, কিডনি যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে!

—তোর এই রোগের কতা জানতুম না তো? চিকিৎসে করিয়েচিস?

—নাঃ!

—আমার বেশ খুব ভালো একজন কোবরেজ আচেন, পেটের ব্যামোর মোক্ষম দাওয়াই দেন।

মধুসূদনের মুখমণ্ডলে যেন একটা দারুণ বিভীষিকার চিহ্ন ফুটে উঠলো। দুই ভুরু উত্তোলিত করে তিনি বললেন, কোবরেজ? হাউ হরিবল! আমি করাবো কোবরেজি চিকিচ্চে! দোজ কোয়াকস! তুই ভুলে যাসনে, গোর, আমি তোদের একজন রাজার জাতের মানুষ, আমি আনসিবিলাইজড হতে পারি না!

—তবে তোর যা খুশী কর! কিন্তু পেটের ব্যথা পুষে রাকা মোটেই সিবিলাইজড কাজ নয়।

—ও সব কতা থাক। এতদিন ফিগস ফ্লাওয়ার হয়ে কোতায় ছিলিস?

—আমার একটা নতুন নেশা হয়েচে। বেলগেছেতে পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে আমরা নাটক করচি।

—নাটক? কী নাটক? কারা যেন মার্চেন্ট অব ভেনিস কচ্যে, শুনিচি বটে!

—আমাদের নাটক বাংলা।

—বাংলা? সে তো যাত্রা! তুই শেষ পর্যন্ত গেঁয়ো যাত্রায় মেতিচিস, গোর? ছি, ছি, এই তোর নতুন নেশা!

—যাত্রা কেন হবে। ইওরোপীয় ঢঙে নাটক, স্টেজ বাঁধা হবে, পেছনে ব্যাক ড্রপ, দু পাশে প্রোসেনিয়াম, সামনে ফুট লাইট থাকবে নুকোনো হ্যাজাক বাতির। সাঁ সুসি থিয়েটারে যেমন দেকিচিস—

—জ্বালালি তুই আমায় গোর! ওসব কতা থাক, তুই অন্য কতা বল্!

—অন্য কতা বললে তো চলবে না। আমরা তোর ঠেঙে একটু সাহায্য চাই।

আমাদের নাটকটি তোকে ইংরেজিতে ট্রানশ্লেট করে দিতে হবে, ইংরেজ দর্শকদের জন্য।

—শুনিচি, যারা ভাঙ্ খায়, তারা অনেকে উদভট্টি কতা বলে। তুই কি আজকাল ঐসব নেশাও ধরিচিস নাকি? যদি নেশা কত্তেই হয়, আমার মতন সিভিলাইজড নেশা—

—কেন, উদভট্টি কী বললুম? ইংরেজদের খুশী করার উপযোগী ইংরেজি তোর মতন আর কে লিকতে পারবে?

—নো ডাউট, আমার থেকে ভালো ইংলিশ আর কেউ লিকতে পারে না। বাট হোয়াট ইমপার্টিনেন্স! আমি ট্রানশ্লেট কর্বো বাংলা থেকে ইংলিশে? বড় ভাষা, গ্রেট ল্যাংগুয়েজ থেকে ছোট ভাষায় ট্রানশ্লেসান হয়। যেমন হয় ইংলিশ থেকে বাংলায়।

—কিন্তু মধু, এটা যে আমাদের দরকার! তুই সাহায্য না করলে—

—আমি সরি, গৌর, এ ধরনের প্রস্তাব দিয়ে তুই আমায় ইনসল্ট করিস না!

—কিন্তু আমি রাজাদের কতা দিয়িচি। তুই নাটকটা একবার অন্তত নেড়ে-চেড়ে দ্যাক। আমি বইটার কাপি এনিচি।

—কে লিকেচে ওটি।

—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

—তিনি আবার কিনি? কোনো টুলো পণ্ডিত নিশ্চয়!

—তুই নাটুকে রামনারায়ণের নাম শুনিসনি? কুলীনকুল সর্বস্ব লিকে খুব নাম করেচেন।

—হেঃ, হে-হে-হে-হে, হে, হে, তুই ভারি মজার কতা বলিস গৌর! একে তো এই নেটিব ল্যাঙ্গুয়েজ, তাতে লিকে আবার নাম করা! হে-হে—

—তুই যতই হাসিস মধু, নেটিভ ল্যাংগোয়েজেরও কদর বাড়চে! দ্যাক, প্যারী-চাঁদবাবু টেকচাঁদ ঠাকুর এই পেন নেম নিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে নবেল ছাপালেন। আমাদের দেশে প্রথম নবেল, খুব বিক্রি হচ্চে সে বই।

—চাঁড়াল, মুচিরাও আজকাল দু পাত বাংলা শিকচে, তারা ও বই ছাড়া আর কী-ই বা পড়বে, কী-ই বা বুজবে!

গৌরদাস রত্নাবলী নাটকটির একটি কপি তার হাতের মোড়ক খুলে বার করে বললেন, একবার একটু পড়ে দ্যাক। শক্ত কিচু নয়। তোর পক্ষে ট্রানস্লেট করা খুব সহজ।

মধুসূদন অতি অবজ্ঞার সঙ্গে বইটি নিয়ে প্রথম পাতা খুললেন। তারপরই নাক বেঁকিয়ে বললেন, প্রোজ! একে তো বাংলা ভাষা একটি উইকলিং, তার ওপর এর প্রোজ আমার দু চক্ষের বিষ! তোমাদের প্যারীবাবুই বলো আর বিদ্যেসাগরই বলো, কারুর প্রোজই আমার এই স্টমাক ডাইজেস্ট করতে পারবে না।

বইটা গৌরদাসের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মধুসূদন বললেন, অবনক্সাস রচনা, দু ছত্তর পড়েই বুঝিচি। প্লীজ ফরগিভ মী, গৌর, আই বিসীচ ইউ—

গৌরদাস বইটি নুড়ে রাখলেন। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই কিশোরীচাঁদবাবুর বাগানবাড়িতে একদিন প্যারীবাবুর সামনে জাঁক করে বলিচিলি যে বাংলাতে কত ভালো লেকা যায় তা তুই লিকে দেকিয়ে দিবি! তখন ভেবেচিলুম, বাংলার প্রতি তুই মনোযোগী হবি—

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মধুসূদন বললেন, সে নেশার ঝোঁকে কী বলিচিলুম, তুই অমনি সেটা ধরে বসে আচিস! তা ছাড়া আমার সে উৎসাহও

নেই, উদ্যমও নেই !

—তুই আমাদের রিহার্সালে একদিন তো এলেও পারিস, হপ্তায় দুদিন সন্ধে-বেলা আমরা বেলগেছে ভিলায় জড়ো হই, জায়গাটিও মনোরম।

—ইভনিং-এ বাড়ির বাইরে থাকা আমার সয় না!

—তা হলে আমি উঠি, মধু। রাজারা তোকে ভালো অনারেরিয়াম দেবেন বলেছিলেন। এটা ট্রানস্লেট করলে ও'রা তোকে পাঁচশো টাকা দিতেন।

মধুসূদন চমকিত হয়ে বললেন, কী? কী বললি? কত টাকা?

—পাঁচশো টাকা।

—শোন্ গৌর, বোস, বোস, ভালো করে শুনি ব্যাপারটা। পাঁচশো টাকা? সত্যি দেবেন?

—সত্যি নয় কি রাজারা মিছে কতা বলবেন?

—ওয়েইট এ মিনিট, ওয়েইট এ মিনিট। দ্যাট মেকস এ গ্রেট ডিফ্রেন্স? পাঁচশো টাকা? সে যে আমার চার মাসের মাইনে! অ্যান্ড আই ক্যান ফিনিস দিস ড্যাম থিং ইন ফোর ডেইজ! ওরে বাপরে বাপ, পাঁচশো টাকা পেলে আমি বর্তে যাবো! পাওনাদাররা আমায় ছিঁড়ে খাচ্চে!

—তুই করবি তা হলে কাজটা?

—নিশ্চয়ই! আলবাৎ! কিন্তু গৌর, সব বাংলা যদি আমি বুঝতে না পারি?

—আমি চেষ্টা করবো বুজিয়ে দেবার। কিংবা তুই আমাদের রিহার্সালে আয়, অ্যাকটরদের মুখ থেকে কতাগুলো শুনলে তোর আরও বোজবার সুবিধে হবে!

মধুসূদন জোর করে গৌরদাসকে টেনে তুলে তার দুই গণ্ডে ফটাফট শব্দে কয়েকটি চুম্বন দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, হুর-রে, হু-ররে, আঁরিয়েৎ ডিয়ার, হোয়াট এ গ্রেট নিউজ...আমি পাঁচশো টাকা আর্ন কচ্চি, আই উইল বাই ইউ এ ফ্রেঞ্চ গাউন।

উল্লাস একটু প্রশমিত হলে মধুসূদন আবার কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, গৌর, তুই আমার প্রকৃত সুহৃদ, ঠিক সময়টিতে তুই সাহায্য করতে আসিস, পাঁচশো টাকা...লাইক এ গ্রেট ফুল আমি এ কাজটা রিফিউজ কচালুম...

এর পরও মধুসূদনের কণ্ঠস্বর ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে লাগলো। একবার তিনি গর্বের সুরে বললেন, কাজটা যে অতি রেচেড, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কাজ আমি কল্লে লজ্জারও কিচু নেই। অনেক গ্রেট রাইটারকেও হ্যাক রাইটিং কত্তে হয়েচে টাকার জন্য...।

তারপরই আবার ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, আমি জানি, আমি গ্রেট রাইটার নই, আই অ্যাম নো লংগার এ রাইটার অ্যাট অল, আমি এখন আর কিছুই না, আই অ্যাম এ রেক, তাই না, গৌর?

খোলস ছাড়া নতুন প্রাণীর মতন অন্ধকার গুহা ছেড়ে কারুর বাইরের আলোকিত জগতে আসার মতন, লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ির স্বেচ্ছা নির্বাসন ছেড়ে বেলগাছিয়া ভিলার বিশিষ্ট জনসমাগমে একবার এসে পড়ার পর মধুসূদনের জীবনে একটি বেশ বড় পরিবর্তন এলো। মানসিক জড়তা কেটে গেল, ফিরে এলো তাঁর কর্মে উদ্যম, জেগে উঠলো তাঁর অহঙ্কারী সত্তাটি। সকলের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, কিংবা আলাপচারির সময়ে তিনিই শুধু কথা বলবেন, অন্যরা শুনবে, যৌবনের এই স্বভাবটি যেন আবার ফুটে উঠলো মধুসূদনের মধ্যে।

প্রবল উৎসাহ নিয়ে মধুসূদন নিয়মিত আসতে লাগলেন বেলগাছিয়া ভিলায় মহলা দেখতে। গৌরদাস দু-একদিন অনুপস্থিত হলেই বরং তিনি গৌরদাসকে ভর্ৎসনা করেন। রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদ সাঙ্গ হয়ে গেল অবিলম্বে, রাজারা বেশ পছন্দ করলেন সেই অনুবাদ। মধুসূদন বেলগাছিয়া ভিলার থিয়েটারের দলের একজন সদস্যই হয়ে গেলেন প্রায়।

নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের ব্যবস্থার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন পাইক-পাড়ার দুই রাজা। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র আনা হয়েছে সুরসৃষ্টির জন্য। অভিনয়ের সার্থকতার জন্য সকলে অদম্য আগ্রহে অপেক্ষমান। কিন্তু মধুসূদন একটা কথা এখনো সকলের মুখের ওপর বার বার শুনিয়ে দিতে কসুর করেন না। এত আয়োজন, এত অর্থ ব্যয় করে এমন একটি দুর্বল নাটকের অভিনয় করা কেন? এ নাটকে না আছে কোনো গভীর ভাব, না আছে ভাষার সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনা। অনেকে স্বীকার করেন যে রত্নাবলী নাটকটি প্রকৃতপক্ষে তেমন উচ্চাঙ্গের নয় কিন্তু উপায় কী? বাংলায় আর ভালো নাটক কোথায়? মধুসূদন এক এক সময় বলে ওঠেন, ভালো নাটক থাকবে কী করে? একমাত্র আমি লিখলেই তা ভালো নাটক হবে। গৌরদাস তখন তাঁকে বিপাকে ফেলার জন্য বলেন, তুই বাংলা লিকবি, মধু? ভূদেবের মুখে শুনিচি, কিচুদিন আগে তুই একটা চাকুরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে পৃথিবী বানান লিকেচিলি, প্রথিবী।

মধুসূদন কারুকে কিছু না বলে একদিন সত্যিই লিখতে শুরু করে দিলেন। মহাভারতের কাহিনী ঘেঁটে শর্মিষ্ঠা-দেবযানী আখ্যান নিয়ে ফাঁদলেন নাটক। তার কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হতেই পড়তে দিলেন গৌরদাসকে। গৌরদাস এক কথায় চমৎকৃত। এ যে নতুন ধরনের ভাষা, সম্পূর্ণ নতুন ভাব। গৌরদাস আবার সেই পৃষ্ঠা কটি পড়তে দিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দত্তক পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে। এই যতীন্দ্রমোহন অতি সজ্জন। বিদ্বান এবং সাহিত্যরসিক। তিনিও সেই শর্মিষ্ঠা নাটকের অংশ পড়ে মুগ্ধ হলেন এবং আলাপ করতে চাইলেন মধুসূদনের সঙ্গে। বেলগাছিয়া ভিলাতেই সাক্ষাৎ হল উভয়ের এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো। কখনো যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে নিয়ে যান তাঁর এমারেল্ড বাউয়ার নামক বাগানবাটিতে। তাঁর উৎসাহে মধুসূদনের নাটক রচনা এগিয়ে চললো। এখন ঠিক হলো যে রত্নাবলীর পর মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকই মঞ্চস্থ হবে বেলগাছিয়া ভিলায়।

বাংলা কবিতা সম্পর্কে একদিন কথায় কথায় মধুসূদন বললেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দেই একমাত্র বাংলায় সার্থক ও দৃঢ়সংবদ্ধ কবিতা রচিত হতে পারে। যতীন্দ্র-মোহনের ধারণা, বাংলার মতন দুর্বল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সহ্য হবে না। অন্য একজন বললেন, বাংলার চেয়ে ফরাসী ভাষা অনেক বেশী সমৃদ্ধ, কিন্তু সে ভাষাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নেই, সুতরাং বাংলায় তার প্রয়োগ তো আরও দুষ্কর। দু-একজন তো আগে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

মধুসূদন সগর্বে বললেন, যদি কেউ পারে তো একমাত্র একজনই পারবে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষাতেই তো অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে, বাংলায় থাকতে পারবে না কেন?

যতীন্দ্রমোহন বললেন, আপনি লিখবেন? তা হলে সেই বই মুদ্রণের ব্যয়ভার আমি বহন করবো।

কয়েকদিনের মধ্যেই মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব নামে এক কাব্য রচনা শুরু করলেন এবং তার প্রথম সর্গ পড়তে দিলেন যতীন্দ্রমোহনকে। যতীন্দ্রমোহন সে রচনা পড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন এবং সাগ্রহে সে রচনা দেখাতে লাগলেন

অন্যদের। সকলেই মুগ্ধ, এ এক সত্যিকারের নতুন স্বাদের কবিতা।

প্রশংসায় মধুসূদনের সব সময়ই আত্মাভিমান বৃদ্ধি পায়। তাঁর প্রতিভার অগ্নিতে প্রশংসা যেন ঘৃত, এর অভাবে তা ঠিক মতন জ্বলতে পারে না। এতদিন পর কলকাতার উচ্চ সমাজের এক অংশে মধুসূদন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলেন।

রত্নাবলী মঞ্চাভিনয়ের দিন সমাসন্ন, তার আগে একদিন চূড়ান্ত মহড়া উপলক্ষে বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে আহ্বান করা হয়েছে। মধুসূদন অন্তরে খুব চঞ্চল হয়ে আছেন, কবে রত্নাবলীর পালা চুকে যাবে, তারপর তাঁর স্বরচিত নাটকের মহড়া শুরু হবে। আজ মধুসূদন বেশ সুসজ্জিত হয়ে এসেছেন এবং অল্প সুরাপান করে শরীরটিকে চাঙ্গা রেখেছেন। এক সময় তাঁর মনে হলো, পাইক-পাড়ার রাজাম্বয় আজ যেন তাঁকে তেমন সমাদর করছেন না, অন্য একজন অতিথিকে খাতির করতেই ব্যস্ত। রাজাদের সঙ্গে সেই ব্যক্তিটি বসে আছে একেবারে সামনের সারিতে, পরনে ধুতি এবং মোটা সুতোর চাদর, পায়ে চটি, মাথার সামনের অংশ কামানো। লোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, পোশাক ও চেহারা দুই-ই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশে বে-মানান।

মধুসূদন এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে হে, গৌর?

গৌরদাস সেদিকে চেয়ে বললেন, সে কি, ওঁকে চিনিস না? উনিই তো স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মশাই!

মধুসূদন মৃদু হাস্য করে বললেন, ও, ইনিই তিনি। সেই বিধবা-কাণ্ডারী? তা চেহারাখানা তো দেকচি আমারই মতন প্রায়, কন্দর্পকেও হার মানায়। আমি ভাবলেম বুঝি কোনো পাল্কি বেহারা ভুল করে গিয়ে ওখেনে বসে আচে!

গৌরদাস বললেন, ওঁর চোখ দুটো তো দেকিসনি, তা হলে বুঝতিস। একে-বারে বীরসিংহের খাঁটি সিংহ। চ, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

মধুসূদন বললেন, না না। আমার আর পরিচয় কর্বার দর্কার নেই। অমন মহাপণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতি বাংলায় আমি কতা কইতে পারবো না কো!

গৌরদাস বললেন, তুই ভুল কচ্চিস মধু। বিদ্যেসাগরমশাই ইংরেজিও খুব ভালো জানেন।

একপ্রকার টানতে টানতেই গৌরদাস মধুসূদনকে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরের সামনে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আমার বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইনি একজন কবি এবং নাটক লিকচেন—

অভ্যেসবশত মধুসূদন করমর্দনের জন্য দক্ষিণ হস্তটি বাড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের দিকে।

বিদ্যাসাগর বয়েসে মধুসূদনের চেয়ে মাত্র বৎসর চারেকের বড়। কিন্তু মধুসূদনের মুখমণ্ডলে একপ্রকার শিশুসুলভ চাপল্য আছে, সে তুলনায় বিদ্যাসাগরের মুখের রেখাগুলি অনেক পরিণত, চক্ষের দৃষ্টি স্থির, তাঁর আত্মাভিমান অপরের প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। তিনি এই ইংরেজি পোশাক-দুরস্ত, কৃষ্ণকায় মানুষটির মুখের ওপর তাঁর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করলেন। তিনি মধুসূদনের প্রসারিত দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করলেন না। নিজের দুই করতল যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার।

আর দ্বিতীয় কোনো বাক্য বিনিময় হলো না তাঁদের মধ্যে।

বিক্রমোর্বশী নাটকের দারুণ সাফল্যের পর নবীনকুমার কিন্তু বর্ধিত উৎসাহে আরও একের পর এক নাট্য-অভিনয়ে উদ্যমী হলো না। নাটকের দিক থেকে তার মনই চলে গেল বরং। দেশের আরও অনেক গণ্যমান্য ধনীরা নাটক নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছেন, সুতরাং সে আর সেই দলে মিশতে চায় না। তার মন নতুনতর কোনো বিষয় খুঁজতে লাগলো।

ছাপাখানা থেকে বিক্রমোর্বশী বই হয়ে এলো, নবীনকুমার এখন গ্রন্থকার। বইখানি উৎসর্গ করা হলো বর্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদকে। প্রথম দিন টাটকা নতুন গন্ধমাখা বইটা হাতে নিয়ে সে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ বোধ করলো। বড় বিস্ময়ও লাগলো তার। এই পুস্তকটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সে আপন খেয়ালে একদিন নদীবক্ষে বজরা ভ্রমণের সময় লেখনী হাতে নিয়েছিল বলেই এই পুস্তকটির জন্ম হলো। এখন এই গ্রন্থ চিরস্থায়ী হবে, অজানা-অচেনা মানুষেরা তার রচনা পাঠ করবে, কেউ বাহবা দেবে, কেউ করবে নাসিকা কুঞ্চন, সে এসব কিছুই দেখতে বা জানতে পারবে না। ভারি আশ্চর্য না?

নবীনকুমার ঠিক করলো, সে গ্রন্থকারই হবে, সে রচনা করে যাবে একটির পর একটি বই, দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত হবে তার খ্যাতি। তবে আর অনুবাদ নয়, এবার সে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী রচনা করবে। বিক্রমোর্বশী নাটক গ্রন্থটি সে বিভিন্ন খ্যাতিমান ধীমান ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করলো, একটি কপি সে একদিন স্বহস্তে গিয়ে দিয়ে এলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর বেশ আগ্রহ ভরে বইটি নেড়েচেড়ে দেখলেন এবং তাকে অনেক স্নেহসূচক কথা বললেন। তার ফলে নবীনকুমারের আরও গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা বলবতী হলো। অবিলম্বেই সে শুরু করে দিল পরবর্তী গ্রন্থ রচনা।

অপরাপর লেখকদের মতন বহু চিন্তা সহকারে এবং বারবার পরিমার্জনা করে সাহিত্য নির্মাণ তার ধাতুতে নেই। সে যখন লিখতে শুরু করে তখন ঝড়ের মতন লিখে যায়, সাত আটদিনে একটি গ্রন্থ সমাপ্ত করে। এমনভাবে রচিত হলো তিন চারখানি গ্রন্থ। সেগুলি প্রকাশ করার জন্য সে নিজেই ক্রয় করে ফেললো একটি ছাপাখানা। অপরের ছাপাখানায় গিয়ে প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকার ধৈর্য তার নেই। নতুন বিলাতী যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত সেই ছাপাখানায় মুদ্রিত হবে শুধু তার নিজের রচিত গ্রন্থ।

কিন্তু গ্রন্থকার হবার গৌরবেচ্ছা তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারলো না। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, এও যেন খুব সাধারণ পাঁচপেঁচি ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া। নবীনকুমারের শৈশবে বাংলা বই ছিল অতি দুর্লভ বস্তু, কিন্তু ইদানীং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্থকতা দর্শনে রাতারাতি যেন অসংখ্য গ্রন্থকার গজিয়ে উঠেছে শিলিন্ধ্রের মতন। কার উদরে ক ছটাক বিদ্যে আছে তার ঠিক নেই, কিন্তু অক্ষরজ্ঞান থাকলেই যে-কেউই যেন লেখক হয়ে যেতে পারে! কোনো না কোনো ধনীর কাছে কাকুতি মিনতি করে তারা গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়ভার আদায় করে। তারপর একবার গ্রন্থকার সাজলেই তাদের বগলবাদ্যে কান পাতা

দায়। নবীনকুমারকে এই সব পরভৃতদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নাম উচ্চারণ করবে লোকে? যদিও এ কথা সত্য যে, বাংলা-ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে তার সব কটি গ্রন্থ সম্পর্কেই দীর্ঘ প্রশংসামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু প্রশংসায় ইতিমধ্যেই নবীনকুমারের অরুচি ধরে গেছে। একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজী পত্রিকা তার বিক্রমোর্বশী গ্রন্থ সম্পর্কে লিখলো যে, এই গ্রন্থটি কার রচনা সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, নিশ্চয়ই এটি কোনো প্রবীণ পণ্ডিতের রচনাই হবে, নিশ্চয়ই সংস্কৃত কলেজের কোনো প্রাজ্ঞ শিক্ষক এটি রচনা করেছেন। সে মন্তব্য পড়ে খুব একচোট হেসেছিল নবীনকুমার। বস্তুত, বিক্রমোর্বশী রচনার সময় তার বয়েস সদ্য সপ্তদশ বৎসর!

যাই হোক, এসব প্রশংসাও তাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। সে বুঝতে শুরু করেছে যে, বেশির ভাগ প্রশংসাই স্তুতিবাদের নামান্তর মাত্র। কেউ তো তার কখনো নিন্দা করে না। তার রচনার কিয়দংশ যখন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যদের পড়ে শোনায়, তখন তারা একবাক্যে ধন্য ধন্য করে। নবীনকুমারের মনে সংশয় জাগে, তার রচনার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি কি কিছু নেই? সে সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, আপনারা আমাকে সুপরামর্শ দিন, আমার ভাষার দোষগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করুন, তার ফলে আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারবো। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলে, আপনার রচনা অতি উচ্চাঙ্গের! এর মধ্য থেকে ত্রুটি বার করে কার সাধ্য! নবীনকুমার নিরাশ হয়।

একমাত্র ব্যতিক্রম হরিশ মুখুজ্যে। নবীনকুমার তার প্রত্যেকটি গ্রন্থই উপহার দেয় হরিশকে, তারপর এই কয়েক মাস সে হরিশের মতামত জানার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছে, কিন্তু হরিশ সেসব বই পড়েই দেখেননি। হরিশ বলেছেন, বেরাদর নবীন, আমার মাতাটি এখুন পাঁচ রকম সমিস্যের কতায় ঠাসা, তোমাদের ঐ নাটক-কাব্য পড়ার সময়ও আমার নেই, ধৈর্যও নেই। এমনকি রুচিও নেই বলতে পারো!

একদিন নবীনকুমার প্রায় জোর করেই হরিশকে তার রচনার কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করে শুনিয়েছিল। মধ্য পথে বাধা দিয়ে হরিশ বলেছিলেন, ব্যস, ব্যস, থামো। আমার মাতা ঝিমঝিম করে! এসব কি বিদঘুটে সংস্কৃত ভাঙ্গা বাংলা লিকোচো? যেমনভাবে মুখে কতা কও তেমনভাবে, তেমন ভাষায় লিক্‌তে পারো না, যাতে পাঁচ-জনে বুজতে পারে? আমি বাংলা ভাষার ধার ধারি না কেন জানো? তোমাদের এই বাংলাভাষাটি বড় বুজরুগ! কতা কইবে এক ভাষায় আর লিক্‌বে দাঁত ভাঙ্গা ভাষায়, যাতে ঠাকুর-দেব্‌তার গন্ধ! ইংরেজীতে ওসব ছলাকলা নেই!

নবীনকুমার বলেছিল, বন্ধু, তবে অন্য সকলে আমায় প্রশংসা করে কেন? তারা কেন আমায় সর্বদা উৎসাহ দেয়?

হরিশ উত্তর দিয়েছিলেন, এটুকুও বোঝো না? তুমি একটি বেশ কচি, নধর বড় মানুষের ছেলে। তুমি দু'পা হাঁটলে ঝম্‌ঝম্ শব্দ হয়। তোমার টাকায় পাঁচজনে লুচি মণ্ডা মেঠাই খাচ্ছে, তোমায় কেউ অসুখী করবে কোন্ সাধে? আমি গরিব বামুনের ছেলে, কোনোদিন কারুর খাইওনি, পরিওনি, কারুর ঝাড়ে বাঁশ কাটতেও যাইনি, সেইজন্য আমি সাফ সাফ কতা বলি! তোমার ঐ টুলো পণ্ডিতী বাংলা আমার পোষাবে না!

নবীনকুমার বলেছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ও তো এ-রকম বাংলাই লেকেন!

এরকমই তো বর্তমান কালের আদর্শ!

হরিশ হাত জোড় করে বলেছিলেন, বিদ্যেসাগর মাতায় থাকুন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর লেকা সম্বন্ধে কিচু বলতে চাইনে! তবে ঐ যে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়ে প্যারীবাবু 'আলালের ঘরের দুলাল' না কী যেন একটা লিকেচেন, তার কয়েকপাত পড়ে দেকিচি, বড় খাসা লেগেচে! পড়ামাত্তর বোজা যায়। হ্যাঁ, আর একটা কতা। বিদ্যেসাগর লিকচেন লোকশিক্ষার জন্য, তোমাদের মতন রসের হাট খুলে বসেননি।

যত দেখছে ততই হরিশ মুখুজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে নবীনকুমার। মানুষটি বড়ই বিচিত্র। একই মানুষের মধ্যে যেন নানান বৈচিত্র্যের সমাহার। যেমন তেজী এবং জেদী আবার তেমনই কোমল। কখনো কখনো কারুর প্রতি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে অশ্রাব্য কু-কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন। আবার সেই মানুষই দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে অশ্রু বর্ষণ করেন। এক সময় তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু এখন তিনি যথেষ্ট অবস্থা ও সঙ্গতিসম্পন্ন, কিন্তু আজও তিনি নিজের কৈশোর-যৌবনের দারিদ্র্যের কথা অহংকারের সঙ্গে বলে বেড়ান। এইটি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! এ-শহরের নিয়মই এই, অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা গোপন করে। যার যা অবস্থা, তার থেকে চালচলন অন্য রকম। যার ঘরে দিবারাত্রি ছুঁচোর কেত্তন চলছে, সেও বাইরে বেরুবার সময় কোঁচার পত্তন করে। একমাত্র হরিশ মুখুজ্যেই যেন ব্যতিক্রম। দারিদ্র্য তাঁর কাছে শ্লাঘার ব্যাপার। যা আয় করেন, ব্যয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

হরিশ মুখুজ্যের চরিত্রে আরও অনেক রকম বৈপরীত্য আছে। দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি তাঁর লেখনীকে তরবারি করে তুলছেন দিন দিন। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে নিয়মনিষ্ঠ। সপ্তাহে অন্তত দুদিন তিনি রসাপাগলা অঞ্চল সন্নিহিত ভবানীপুরে ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনার পূর্বে বক্তৃতা করেন। হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি তিনি ভরাট করেন প্রায় একাই লিখে। আবার সেই মানুষই প্রতিদিন গলায় ঢালেন সুরা রূপী অগ্নি, ঢালতেই থাকেন। যতক্ষণ পদক্ষেপ ও কথাবার্তা অসংবদ্ধ হয়ে না যায়। প্রায় রাত্রেই তিনি নিজ ভবনে না ফিরে যান বেশ্যালয়ে। দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি, আবার দেশের মানুষকে এত বেশী গালিগালাজও আর কেউ দেন না তাঁর মতন।

লেখার নেশাটা খানিকটা কমে গেলে হরিশের কাছে নিত্য যাতায়াত করতে লাগলো নবীনকুমার। হরিশ সারাদিন আপিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন, সন্ধ্যার পর তিনি কোনোদিন কোনো মিটিং, কোনোদিন ব্রাহ্মসভায় অথবা হিন্দু পেট্রিয়টের কার্যালয়ে কর্মে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যেখানেই যান, নবীনকুমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কেল্লা থেকে রাত্রি ন'টার তোপ দাগার পর হরিশ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন, তারপর কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে তির্যক আলাপ করেন, সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সুরাপান। তারপর এক সময় কণ্ঠস্বর জড়িত হয়ে এলে হরিশ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, বেরাদর নবীন, এবার লেট আস পার্ট আওয়ার ওয়েজ, এখুন আমি যিদিকে যাবো, তুমি তো আর সিদিকে যাবে না, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরো! আমি এখন কোনো সুন্দরীর রূপসাগরে অবগাহন কর্বো, আর তার ঠোঁটের, না, তোমরা কী যেন বলো, অধরের অধরামৃত পান করে আমি

অমর হবো।

দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠকায় হরিশ এর পর আপন বুক চাপড়ে সগর্বে বলেন, আমি কত বছর বাঁচবো জানো? তিনশো বছর! আমার এত কাজ, তার আগে ফুরুবে না!

নবীনকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার খুব বাসনা আরও কিছুক্ষণ হরিশের সঙ্গে সময় যাপনের, কিন্তু হরিশ অবিলম্বেই এমন দাপাদাপি শুরু করবেন যে তাঁর সঙ্গে আর তাল রাখা যাবে না। তা ছাড়া তিনি যেখানে যাবেন, সেসব স্থানে যেতে নবীনকুমাব ঘৃণা বোধ করে। মাঝে মধ্যে হরিশ কৌতুক ছলে মদের পাত্রটি নবীনকুমারের মুখের একেবারে সামনে এনে বলেন, খাও না বেরাদর, এক চুমুক নিয়েই দ্যাকো না। এ তোমাদের ঐ অধরামৃতের চেয়ে কিছু কম সরেশ নয়। বুদ্ধির জানলা খুলে দেয়। দারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে মুখ সরিয়ে নেয় নবীনকুমার। এই সুরা বস্তুটির প্রতিও তার দারুণ ঘৃণা। এই বস্তুটি সেবনের পর কত মানুষকে সে অমানুষ হয়ে যেতে দেখেছে।

একদিন সে হরিশকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বন্ধু, তুমি তো অ্যাত ভগবানকে মানো, ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনার সময় চোক বুজে বসে থাকো, সেই তুমিই এত সুরা পান করো কেন?

হরিশ বললেন, ভগবদভক্তির সঙ্গে সুরাপানের কী বিরোধ? ঈশ্বর কি কারুকে বলে দিয়েছেন, এটা খাবে না, ওটা খাবে না? আমি তেমন ঈশ্বরের কতা জানি না। তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও তো অর্জুন আর পাণ্ডব-পুরস্ত্রীদের নিয়ে খাণ্ডব বনে পিকনিক কত্তে গিয়ে মদ খেয়ে খুব ফুর্ত্তি করেছেলেন! যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের সুরা পরিবেশন করেচেন, পড়োনি এসব? হেঃ হেঃ হেঃ!

নবীনকুমার বললো, যত লুচ্চা লম্পট মদ খেয়ে ঝুম মাতাল হয়। তারা আর তুমি সমান তা হলে?

হরিশ বললেন, অন্যদের সঙ্গে আমার তুলনা করো না! আমি প্রতিভাবান, আমি যা খুশী কর্বো! আমি জানি, মাতার ওপরে ঈশ্বর আচেন, তিনি দেকচেন! আমি কোনো ভুল কর্লে তিনি আমায় অন্য পথে নিয়ে যেতেন। নবীন ভায়া, আমি ঈশ্বরকে মানি কেন জানো? আমি জানি, আমার সব রকম বিপদ-আপদে তিনি আমায় রক্ষা করেন। একটা দিনের ঘটনা তোমায় বলি। তখুন আমার বয়েস কত, এই পোঁয়োরো-ষোলো হবে। লোকের চিঠি চাপাটি, দলিলপত্তর লিকে দিয়ে দু-এক গণ্ডা পয়সা পাই, তা দিয়ে সংসার চলে! মাজখানে দিনকাল খুব খারাপ পড়লো, কোনো রোজগারপাতি নেই, দিন আর চলে না, দুদিন বাড়িতে চুলো জ্বলেনি। পেটে একটা দানা পড়েনি, মা শেষমেষ বললেন, যা হরু, আমাদের এই শেষ কাঁসার থালাটা বন্দক দিয়ে যা পাবি দুটো চাল কিনে নিয়ে আয়! বেরুতে যাবো, এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি! সে কী বৃষ্টি, তোমায় কী বলবো বেরাদর, যেন আকাশ একেবারে ফেটে গ্যাচে! তিন চার ঘণ্টাতেও সে বৃষ্টি থামে না। আমি না হয় সে বৃষ্টি মাতায় করেই বেরুতে পারি, কিন্তু কোনো দোকানপত্তর তো খোলা থাকবে না! বন্দকের দোকান আগেভাগেই ঝাঁপ গুটোবে। নিরুপায় হয়ে এক সময় কাঁদতে শুরু করলুম! পেটে খিদের অমন জ্বালা, কান্না আসবে না! কাঁদতে কাঁদতে বললুম, হে ভগবান, তুমিও আমায় দেকলে না? তারপরই কী হলো জানো, বেরাদর নবীন? সেই ঝড় জলের মধ্যেতেই এক বড় জমিদার আর তার মোক্তার আমার বাড়ি খুঁজে এসে হাজির। তাদের এক দলিলের ইংরেজী কত্তে হবে, খুব জরুরি, পরদিন সক্কালেই আদালতে জাহির করার কতা।

আমি সে কাজ করে দিলুম, আর অমনি নগদানগদি দুটো টাকা পেলুম। বল, ভগবানের দয়া ছাড়া এমন হয়?

নবীনকুমার চুপ করে রইলেন।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জীবনে এমন হয়নি কখনো?

নবীনকুমার বললো, না।

—তুমি বয়েসে এখনো বালক, তোমার সামনে অনেক দিন পড়ে আচে, কোনো না কোনো সময়ে হবেই, এমনিতেই ঈশ্বর তোমায় সোনার চামচ মুখে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাটোয়েচেন তো, তাই বুজতে পাচ্চো না!

—বন্ধু, আমি ব্রাহ্মদের সভায় অনেকবার গেচি। কখনো অবশ্য বাপ-পিতেমো'র ধর্ম ছাড়বার কতা আমার মনে আসেনি। কিন্তু একটা কতা আমি স্বীকার কর্বোই, যদিও মিষ্টান্ন ভোজন কিংবা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁদের নোলা সকসক করে তবু অন্য অনেকের চেয়ে ব্রাহ্মরা সচ্চরিত্র। তাঁরা সুরাপান কিংবা...

—রামমোহন রায় সুরাপান কত্তেন। দেবেন্দ্রবাবুও কত্তেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ীর মতন পূজনীয় ব্যক্তিরা কে করেন না বলতে পারো?

—কিন্তু তুমি এই যে অবিদ্যার বাড়ি যাও?

—তুমি দেকচি মরালিটির এপিটোম একটি! অবিদ্যা কাদের বোলচো? স্ত্রীলোক মাত্রই এক-একটি রত্ন! তুমি জানো, প্রাচীন গ্রীস রোমে বড় বড় দার্শনিকরা সন্দে-বেলা বারবনিতা পল্লীতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দর্শন তত্ত্ব আলোচনা কত্তেন! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং নিষেধহীন কোনো রমণী নিকটে থাকলে পুরুষের শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়, তাতে তার বুদ্ধি ও প্রতিভা বেশী খোলে!

—বেশী রক্ত চলাচলের জন্যই শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন হয়েচেন বোধহয়।

—হা-হা-হা-হা! এটি বেশ বোলোচো! খাসা বোলোচো! তা ঠিক। সেইজন্যই নিভৃতে এক রমণীর কাচে একাধিক পুরুষের থাকতে নেই। থাকলেই বিবাদ, মন কষাকষি, কিংবা রক্তারক্তি। কিন্তু বারাঙ্গনাদের কাচে সব পুরুষই অনন্য, দ্যাট ইজ দি বেস্ট পার্ট অফ ইট! তারা প্রত্যেকেই তোমার, আমার। তুমিও তাদের সকলের, কোনো ভেদাভেদ নেই। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল!

এইভাবে তর্ক বিতর্ক চলে, কোনো নিষ্পত্তি হয় না। গৃহে মা ও স্ত্রীর বিবাদের ফলে কোনো শান্তি নেই, তাই হরিশ কাজের শেষে যায় কোনো নর্তকীর বাড়িতে, আর নবীনকুমার ক্ষুণ্নমনে ফিরে আসে নিজের আলয়ে। হরিশ তাকে চুম্বকের মতন টানেন, আবার হরিশ নিজেই তাকে এক সময় ছেড়ে চলে যান বলে সে দুঃখ পায়।

প্রায়ই হরিশের কাছে এসে বসে থাকে রাইমোহন, হরিশ এই লোকটিকে খুব প্রশ্রয় দেন। রাইমোহনের দশা এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ চুরচুর নেশাগ্রস্ত, পোশাক-পরিচ্ছদে ধুলোকাদা মাখা, চক্ষুদ্বয় ঘোলাটে, দেখলেই বোঝা যায় তার আর বেশীদিন আয়ু নেই। অবশ্য, যে লোক নিজের প্রাণের মায়া একেবারে ত্যাগ করে বসে থাকে, তার মৃত্যু সহজে আসে না। হরিশের একটি স্বভাবের কথা নবীনকুমার আগেই শুনেছিল। যে-সব রাতে তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন, তখনও তিনি একলা ফেরেন না। হয় রাস্তার কোনো ঘেয়ো কুকুর অথবা কোনো ভিখারিকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং মাতা কিংবা পত্নীর আপত্তি

শুনলেই তিনি তুমুল হল্লা করেন। এমনকি একদিন এক কুষ্ঠরোগীকেও তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সেই একই রকম মনোভাব নিয়ে তিনি রাইমোহনের জন্য অবারিত দ্বার রেখেছেন। রাইমোহন সুরাপানের জন্য হরিশের কাছে আসে, অনেকখানি জিভ বার করে সে হ্যাংলার মতন বলে, কই মুকুজ্যে মশাই, একটু সেবন করান। কণ্ঠতালু পর্যন্ত যে শুকিয়ে গেল! কাজ ফেলে রেখে হরিশ তৎক্ষণাৎ বোতল বার করে দেন। আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন, আহা, ওর আত্মার শুক পক্ষীটি সব সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে, তাকে কষ্ট দেওয়া পাপ!

নবীনকুমারকে দেখলে রাইমোহন আর ভয় পায় না। সে যেন সব ভয় ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে পুরোনো মোসাহেবী সুরটি আর নেই, বরং মাঝে মাঝে সে বেশ খোঁচা দিয়েই কথা বলে। এক একদিন এমন হয় যে হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য লেখা শেষ করতে হরিশের দেরি হচ্ছে, পাশে নিঃশব্দে বসে আছে নবীনকুমার। অদূরে বসে সুরাপান করে চলেছে রাইমোহন, সে কিন্তু নিঃশব্দ নয়, প্রায়ই সে গান গেয়ে ওঠে আপন মনে। হরিশ কিন্তু তাতে বিরক্তও হন না বা তাকে চুপ করতেও বলেন না। সুরার বোতলটি নিঃশেষ হয়ে গেলে রাইমোহন হরিশকে তাড়া দিয়ে বলে, কই, মুকুজ্যে মশাই, এবার উঠুন। এই দুধের বাছাটিকে এবার বাড়ি যেতে বলুন! চলুন আমরা দুজনায় মিলে তির্থিস্থানে যাই! কমলীর কাচে যাবেন? কমলী? সে আবার দোকান খুলেছে! শেষবেলায় বড় চমৎকারিণী হয়েচে, চলুন, আমি যে যাবো!

এক একদিন সে নবীনকুমারকে বলে, ছোটবাবু, আপনার এত বড় বংশ, আপনি তার মান রাকলেন না? আপনার পিতা উদার ছেলেন, মদ-মাগীর জন্য কম পয়সা ঢেলেচেন! ওফ্! সে-জন্য কত নাম ছড়িয়েছেল তাঁর! এক ডাকে সবাই চিনতো! হ্যাঁ, বাবু বটে রামকমল সিংগী! বিংশ পঞ্চাশটা মাতালের মুখের অন্ন না জোগালে আর বড় মানুষ কিসের? তা আপনার হাতে যে বিষয় সম্পত্তি এলো, আপনি আমাদের জন্য কী কল্লেন! একদিন একটা মচ্ছবও লাগালেন না? বেশ দু-দশ গন্ডা বাঈ নাচবে, বিশ পঞ্চাশটা বোতল মাটিতে গড়াবে, আর আমরাও গড়াবো, তবে না মচ্ছব!

নবীনকুমার ঘৃণাভরে রাইমোহনের অধিকাংশ কথারই উত্তর দেয় না। রাই-মোহনকে দেখলে বেশির ভাগ দিনই সে বিরক্ত হয়ে চলে আসে। এক একদিন অসহ্য হলে সে রাইমোহনকে প্রচন্ড ধমক দেয়, রাইমোহন হা-হা করে হাসে। হরিশও যোগ দেন সেই হাস্যে।

নবীনকুমার একদিন ঠিক করে, সে আর যাবে না হরিশের কাছে। কিন্তু দুদিনের বেশী স্থির থাকতে পারে না। চতুর্দিকে অসংখ্য চাটুকার, শুধু হরিশ আর রাইমোহনই তোয়াক্কা করে না তার সামাজিক মর্যাদার। তবু ঐ দুজনের কাছেই তার যেতে ইচ্ছে হয়। দু-তিনদিন রাগ করে থাকার পর সে আবার যায়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্যদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে নবীনকুমারের বেশী হৃদ্যতা ছিল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং যদুপতি গাঙ্গুলী। এর মধ্যে কৃষ্ণকমল কিছুদিন যাবৎ আর একেবারেই আসে না, যদুপতি আসে, কিন্তু সেও নবীন-কুমারের রচনার দারুণ অনুরাগী। প্রায় চাটুকারেরই মতন শোনায় তার কথা, যদিও নবীনকুমার লক্ষ করেছে, যদুপতি নির্লোভ স্বভাবের মানুষ। যদুপতি প্রায়ই বলে, এসো ভাই নবীন, আমরা দেশের জন্য বেশ বড় কোনো একটা কাজ করি। কিন্তু কি যে সেই বড় কাজ, সে সম্পর্কে যদুপতির নিজেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সে বড় জোর গ্রামে স্কুল খোলার কথা ভাবে।

যদুপতি হরিশকে পছন্দ করে না। হরিশের উগ্র কথাবার্তা এবং প্রকাশ্যে লজ্জাহীনভাবে মদ্যপান দেখে সে শিউরে ওঠে। আগে হরিশ আসতেন নবীনকুমারের বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী সভায়, এখন আর আসেন না। এখন নবীনকুমারের মতন উচ্চবংশের মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ যে হরিশের কাছে যায়, এটা যদুপতির পছন্দ হয় না। সে নবীনকুমারকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু উজ্জ্বল বাতি যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, সেইভাবে হরিশের কাছে বারবার ছুটে যায় নবীনকুমার। হরিশের মতন এমন প্রজ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব সে আর কারুর মধ্যে দেখেনি। ক্ষুরধার বুদ্ধি হরিশের, এ দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তার মতন আর কেউ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না।

একদিন হরিশও বড় অপমান করলো নবীনকুমারকে। কোনো কারণে সেদিন তাঁর মর্জি সাফ ছিল না, সম্ভবত সারাদিন ধরেই তিনি কিছু কিছু মদ্য পান করেছিলেন; সেই কারণে নিজের লেখাও মনঃপূত হচ্ছিল না তাঁর। এক একটি পৃষ্ঠা লিখেই ছিঁড়ে ফেলছিলেন। একটু পরেই উপস্থিত হলো রাইমোহন। তখনই তার টপভুজঙ্গ অবস্থা, তার ওপর এসেই সে বোতল দাবি করলো। হরিশও বোতল এগিয়ে দিলেন বিনা বাক্য ব্যয়ে। রাইমোহন পান করতে করতে শুরু করে দিল বেসুরো-বেতালা কণ্ঠে গান। নবীনকুমার আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, চুপ করো। বন্ধু, তুমি এ লোকটাকে সহ্য করো কী করে? এটাকে বিদায় করে দিতে পারো না!

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলেন হরিশ। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, কেন বার করে দেবো ওকে? তুমি ওর দুঃখ কী বুজবে! আমি ওর সব কতা বুজিচি! তুমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদরের দুলাল, তুমি বুজবে না! তুমি সত্যিই দুধের বাছা, মনুষ্য জীবনের কিচুই জানো না! তুমি মাতালদের ঘেন্না করো। কিন্তু তোমার সাহস আছে? কোনদিন জিভে ছুঁইয়ে দেকোচো, মদ জিনিসটা কী?

নিজের বুকে চাপড় মেরে হরিশ বললেন, এই দেকচো আমার এই লোহার দরজার মতন শক্ত বুক, আমি পারি। আমি মুর্দোফরাসদের পাশে বসে অন্নগ্রহণ কত্তে পারি, ভিখারীর সঙ্গে বসে নেশাও কত্তে পারি। তোমরা দুধ ঘি খাওয়া ধনী-র দুলাল, তোমরা কিচুই পারো না। তুমি মাতালকে ঘেন্না করো, কিন্তু কোনোদিন সাহস হলো না মদ জিনিসটা কী তা চেকে দেকতে! বেরাদর, আমার অতিথিদের তুমি কক্ষনো অপমান কর্বে না।

ধুতির কোঁচাটা সযত্নে বাঁ হাতে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার বললো, আমি যাই।

হরিশ বললেন, আচ্চা! গুড ন্ন ইট!

অপমান ও বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনায় নবীনকুমারের মুখটি বিবর্ণ হয়ে গেল। কারুর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাওয়ার অভ্যেস তার নেই। ক্রোধ যেন তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে ফুঁড়ে বেরুতে চাইলো। একবার তার মনে হলো, এখুনি গিয়ে কয়েকটি পাইক ডেকে এনে এই লোক দুটিকে পিটিয়ে একেবারে ছাতু করে দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, সে হবে শুধু শারীরিক শক্তির প্রকাশ। অর্থবলে হরিশ এবং রাইমোহনের মতন লোকদের জব্দ কিংবা চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু এদের কাছে সে বুদ্ধিতে কিংবা কথায় কি হেরে যাবে?

মুখ ফিরিয়ে সে কাতরভাবে বললো, বন্ধু, মদ্যপানের মধ্যেই কি খুব বীরত্ব বা সাহসের পরিচয় আছে?

হরিশ বললেন, মদ্যপান না করার মধ্যেও কোনো বীরত্ব বা সাহসের পরিচয় নেই!

নবীনকুমার কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললো, দাও!

হরিশ একটুও বিস্মিত বা বিব্রত হলেন না। তৎক্ষণাৎ একটি গ্লাসে খানিকটা সুরা ঢেলে সেটি নবীনকুমারের হাতে তুলে দিলেন।

নবীনকুমার এক চুমুকে তরল পদার্থটি শেষ করে বললো, এই তো খেলাম, কী হলো?

হরিশ এবং রাইমোহন দুজনেই হেসে উঠলো উচ্চ স্বরে।

রাইমোহন বললো, এক গেলাসে তো শরীরের নোনা কাটবে গো, নোনা কাটবে!

হরিশ বললেন, ঠিক!

নবীনকুমার আবার হাত বাড়িয়ে বললো, দাও।

দ্বিতীয় গেলাসটিও সে এক নিশ্বাসে শেষ করে জিজ্ঞেস করলো, এবার?

হরিশ বললেন, দ্বিতীয় গেলাসে তো মাত্তর মুখের দুধের গন্ধ ছাড়বে। আমরা তো শিশু বয়েসে মায়ের বুকের দুধ খাই, সে গন্ধ অনেকদিন মুখে লেগে থাকে।

হাতের বোতলটি উঁচু করে তিনি বললেন, এটা কী জানো? টাট্‌কা, নতুন জিনিস এয়েচে। এতকাল তো এস্‌কাটিলিয়ান ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জিব খস্‌খসে করিচি, এটা একেবারে খাস ফরাসিস্‌ দেশের, এর নাম কন্যাক। এর প্রতি ফোঁটায় রক্ত। এর চার গেলাস খেলে তবে না গা গরম হয়।

নবীনকুমার বোতলটি হরিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সরাসরি নিজের গলায় ঢালতে লাগলো সবটুকু তরল আগুন।

রাইমোহন হরিশের দিকে তাকিয়ে দারুণ কৌতুকের ভঙ্গিতে খচাং করে টিপে দিল এক চক্ষু। তার তোবড়ানো গালে ভেসে উঠলো এক ধরনের হাসি।

হরিশও হাসতে হাসতে নবীনকুমারকে বললেন, বন্ধু, আমায় মদ্য পানে দীক্ষা দিয়েচিলেন রামগোপাল ঘোষ। তোমাকেও দীক্ষা দিল আমার মতন একজন প্রতিভাবান, বিখ্যাত লোক। সুতরাং তোমার দুঃখ করার কিছু নেই তো।

হঠাৎ এমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েও নবীনকুমার শেষরক্ষা করতে পারলো না। কয়েক ঢোঁক তীব্র কনিয়াক গলায় যেতেই সে বিষম খেল, যতখানি সে পান করেছিল তার অনেকটাই উল্টে বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। চক্ষে এসে গেল জল।

হরিশ তার হাত থেকে বোতলটি নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেও সে দিল না। বোতলের গলাটি শক্ত করে চেপে ধরে রইলো।

গৃহটি মনে হয় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার আমলের কিংবা তারও আগের, বয়সের যেন কোনো গাছ পাথর নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা শহর কলকাতা আক্রমণ করে অনেক ঘর বাড়ি তোপ দেগে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই বাড়িটিও বোধ হয় নবাবী সেনার তোপের মুখে পড়েছিল। দেউড়ি ভগ্ন, ছাদের এক পাশ হেলে পড়েছে, কোনো কোনো ঘরের দরজা-জানালা নেই। নিচেয় চাতালের যেখানে সেখানে শ্যাওলা-ধরা ইঁট-সুর্কির স্তূপ জমে আছে। কয়েকটি দেয়ালের পঞ্জর ভেদ করে

মাথা চাড়া দিয়েছে বট-অশ্বত্থ গাছ। এককালে বাড়িটি বিশালাকারই ছিল অন্তত তিরিশটি প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে কিছু কিছু এখনো অক্ষত আছে, সেইসব প্রকোষ্ঠে ভারতের নানান প্রান্তের, নানান জাতির, নানান ভাষার কিছু কিছু মানুষ বাসা বেঁধে আছে। জানবাজারের রানী রাসমণির প্রাসাদের পিছনে কিছু সংখ্যক খুপ্‌রি খুপ্‌রি দালান, কিছু গোলপাতার কুঁড়েঘর। আর কিছুটা দূরে নতুন নতুন সুদৃশ্য ভবন নির্মিত হয়েছে, যেসব ভবনে ইদানীং সাহেব ভাড়াটিয়ারা থাকে। এরই মধ্যবর্তী এই ভগ্ন অট্টালিকাটি।

এর দ্বিতলের অনেকগুলি ভাঙা ঘরের মধ্যে দুটি ঘর বেশ সাফ সুতরো করা। একটি ঘরে ঢালাও ফরাস ও তাকিয়া পাতা, সে ঘরটি যেন হট্টমন্দির, সেখানে কে কখন আসছে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক নেই। অন্য ঘরটি আয়তনে অনেক বড়, তার এক পাশে সোফা কৌচ, অন্য পাশে পরস্পর যুক্ত কয়েকটি তক্তাপোশের ওপর জাজিম পাতা, মধ্যস্থলে লাল গালিচা, সেখানে কখনো কখনো নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

নবীনকুমার একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে দেখছে এক পশ্চিম দেশীয়া যুবতীর নৃত্য। যুবতীটিকে ঠিক লাস্যময়ী বলা চলে না, তার নৃত্যের মধ্যেও মোহবিলাস নেই। প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা অতিশয় আঁট পোশাক পরিধান করে আছে যুবতীটি, এক তবলিয়ার বোলের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় অঙ্কের ছক মেলানোর মতন পদক্ষেপ করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সমের মুখে এসে সে এবং তবলিয়াটি একসঙ্গে বলে উঠছে, ধা!

এ জাতীয় নৃত্যবাদ্য বিশেষ দেখার বা শোনার অভ্যেস নেই বলে নবীনকুমার এর ঠিক রস গ্রহণ করতে পারছে না। সে হাতের মদিরার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে, তার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত। কোনো কিছু ঠিক মতন বুঝতে না পারলেই সে বিরক্ত হয়। এই নৃত্য পদক্ষেপ এবং তবলার বোলের অঙ্কগুলি তাকে অবশ্যই শিখতে হবে।

মাঝে মাঝে গোলোকরাম মুলুকচাঁদ এসে বলছেন, আরে লুবিনবাবু, গেলাস একদম খালি। আবার লিবেন তো! হামায় বুলাবেন তো!

নবীনকুমার আপত্তি করে না, শূন্য গেলাসটি এগিয়ে দেয়। মুলুকচাঁদ আবার ভর্তি করে আনেন। মুলুকচাঁদের রসগোল্লার মতন গোল মুখখানি সদা হাস্যময়।

এই গোলোকরাম মুলুকচাঁদ হরিশ মুখুজ্যের বিশেষ প্রিয়পাত্র। হরিশ যখন প্রথম যৌবনে এক নিলামওয়ালার গুদামে চাকুরি করতেন, সেখানে ইনি ছিলেন তাঁর সহকর্মী। সেই জীবন থেকে হরিশ অনেক দূর সরে এসেছেন, নিলামওয়ালার গুদামের সামান্য কেরানীর বদলে হরিশ এখন কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের শিরোমণি। যেমন এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, তেমনই ইংরেজরা এক ডাকে তাঁর নাম জানে, তবু হরিশ এই পুরাতন সহকর্মীর সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চলেছেন। গোলোকরাম মুলুকচাঁদও আর সেই নিলামওয়ালার কর্মচারী নন, এক সময় তিনি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে নিলামের কুঠি খুলেছিলেন, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর আগে হঠাৎ তাঁর ভাগ্য একেবারে ফিরে গেছে। এই জরাজীর্ণ অট্টালিকাটি তিনিই ক্রয় করেছেন। কিন্তু এটা মেরামত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই।

গোলোকরাম মুলুকচাঁদ মানুষটি বড় বিচিত্র। অপরের সেবা করাই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই পোড়া বাড়ির মধ্যে কী করে যে অঢেল খাদ্য পানীয়ের সরবরাহ হয়, তা বোঝা দুষ্কর। মুলুকচাঁদ নিজে নিরামিষাশী, কিন্তু অতিথিদের জন্য তিনি নানাপ্রকারের সুপক্ক মাংসও পরিবেশন করেন। এক একদিন রাত বেশ গভীর হলে, যখন শুধু অন্তরঙ্গ কয়েকজনই উপস্থিত থাকে, সেই সময় বসে

নৃত্যগীতের আসর। এই পল্লীর আশেপাশে বারাঙ্গনা-নর্তকী-তয়ফাওয়ালীর কোনো অভাব নেই, একজন কারুকে ডাক পাঠালেই হলো। সকলেই জানে, মুলুকচাঁদ কোনোদিন কোনো রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করেন না, কিন্তু তাঁর কোনো অতিথি এক একদিন এইসব রমণীদের সঙ্গে যতই বাড়াবাড়ি করে ফেলুক, মুলুকচাঁদ কোনো আপত্তি না করে মৃদু মৃদু হাসবেন। বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে। মুলুকচাঁদের গৌরবর্ণ শরীরটি বেশী দীর্ঘ নয়, উদরদেশ বেশ স্ফীত, কপালে ও দুই কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা। সারা বৎসর তাঁর পোশাক এক, আটহাতি ধুতি ও সাধারণ ফতুয়া, শীতকালে বড়জোর একটি মুগার চাদর জড়িয়ে নেন।

মুলুকচাঁদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি এই শহরের জীবন্ত গেজেট। গঙ্গার আর্মানিঘাট ও তক্তাঘাটে প্রতিদিন কোন্ কোন্ জাহাজ ভেড়ে, তা তাঁর নখ-দর্পণে। হাওড়া-হুগলি রেলপথে কী কী মাল চালান যায়, তাও তিনি জানেন। চেতলার বন্দরে কিংবা পোস্তার বাজারে জিনিসপত্রের দর কেমন ওঠা-নামা করছে তার সঠিক সংবাদও মুলুকচাঁদের কাছ থেকেই জানা যাবে। শুধু তাই নয় ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের ভিতরের খবর, বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতে কার কখন উত্থান-পতন হচ্ছে, সে সবও জানেন তিনি। আরও কত খুচরো খবর। রাজস্থান থেকে মুলুকচাঁদের তিন ভাই এসে ইদানীং বড়বাজার অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে, কিন্তু তারা শুধুই ঘোরতর ব্যবসায়ী। আর মুলুকচাঁদজী সদানন্দ, হাস্য-ময়, অতিথিপরায়ণ, মজলিশী মানুষ।

হরিশের মুখে অনেকবার এই মুলুকচাঁদের কথা শুনেছিল নবীনকুমার। গল্প শুনলেই এরকম মানুষকে দেখতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই সন্ধ্যার পর এখানে হরিশ আসে, নবীনকুমার একদিন হরিশের সঙ্গে এখানে আসতে চাওয়ায় তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করেছিলেন হরিশ। বাঁকাভাবে হেসে হরিশ বলেছিলেন, বলো কী হে, তুমি যাবে সেখানে! সে এক ভাঙাচুরো পড়ো বাড়ি, আঁস্তাকুড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা, সেখেনে কী আর তোমার মতন মানুষ যায়! আর মুলুকচাঁদেরও কী খেয়াল কে জানে, ও বাড়ি কিচুতেই মেরামত কর্বে না!

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করেছিল, বন্ধু, তুমি যেতে পারো, আর আমি যেতে পারি না?

হরিশ কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিলেন, তোমাতে আমাতে তুলনা? কীসে আর কীসে, চাঁদে আর হুলো বাঁদরের পোঁদে! তুমি হলে গিয়ে জমিদার, আর আমি এক হা-ঘরে বামুনের বাড়ির ছেলে!

নবীনকুমার বলেছিল, জমিদারের পরিচয় কি কারুর গায়ে লেখা থাকে? জমিদার হয়িচি বলে কি যেখেনে খুশী সেখেনে যেতে পারি না?

হরিশ বলেছিলেন, তুমি জমিদারকুলের নাম ডোবাবে দেকচি! জমিদার কখনো যেখেনে সেখেনে যায়? তুমি নিজের বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে, তোমার কাচে সবাই এসে হাত জোর কর্বে, এই হলো গে জমিদার! হ্যাঁ, তুমি যাবে কার কাচে, যে বংশমর্যাদায়, ধনে-মানে তোমার সমান কিংবা তোমার চেয়েও বড় তার কাচে। সেখেনেও যাবে হেঁক্কড়ের সঙ্গে, যত দামী শাল-দোশালা আচে সব গায়ে চাপিয়ে, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার আংটি-হার-মাদুলি সব পরে, সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে হইহই করে জুড়ি-চৌঘুরী হাঁকিয়ে। তা না হলে আর জমিদার কিসের! একমাত্র ব্যতিক্রম মেয়েমানুষের বেলায়। শুনিচি অনেক জমিদার হাঁড়ি-মুচি-ডোমের ঘরেও মেয়েমানুষের টানে নুক্যে নুক্যে যায়, সে কতা আলাদা! আমার মতন এক খবরের কাগুচের কাচে তুমি যাতায়াত কর্চো, এতেই তোমার বদনাম রটবে, তার ওপর

তুমি যেতে চাও জানবাজারের মুলুকচাঁদের আখড়ায়!

যেখানে বাধা, সেখানেই নবীনকুমারের জেদ। বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমার মদ্যপানকে ঘৃণা করে এসেছে। তা কারুর উপদেশে বা নিষেধে নয়, নিজেরই রুচিতে। কিন্তু হরিশ যেদিন বললেন যে নবীনকুমার মদ্যপান করতে ভয় পায়, অচেনা কোনো জিনিসকে জানার সাহস তার নেই, সেদিনই সে ক্ষেপে উঠলো। নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে সুরা গলাধঃকরণ করলো। প্রথম কয়েকদিন তার ঠিক সহ্য হয়নি, বমি হয়েছে বারংবার, কিন্তু হরিশের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে সে বমি মুছে আবার পান করেছে। কয়েক মাস কেটে যাবার পর এখনো সুরাপান তার ঠিক ধাতস্থ হয়নি, প্রথম প্রথম স্বাদ অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, তবু জোর করে চালিয়ে যায়।

মুলুকচাঁদের আখড়া সম্পর্কেও নবীনকুমারের জেদ জেগে উঠলো। সে জমিদার হলেও অন্যান্য জমিদারদের রীতিনীতি সে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। সে সব পারে। একদিন জোর করেই হরিশের সঙ্গে চলে এসেছিলো এখানে।

প্রথম দর্শনেই, হরিশ পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই, মুলুকচাঁদ চিনতে পেরেছিলেন নবীনকুমারকে। সত্যিই বিস্ময়কর এই লোকটির ক্ষমতা। নবীনকুমারকে দেখেই বললেন, আসুন, আসুন। রামকমল সিংগী বাবুজীর পুত্‌রা হামার কোঠিতে এসেছেন, কী সৌভাগ্‌ হামার! এ গরিবখানায় আপনাকে লিয়ে কুথায় বসাবো? বিন্ধু মুকারজিবাবু কেমন আছেন? আপনার মা-জননীর তবিয়ৎ স্বাস্থ্য ভালো আছে তো?

হরিশ বলেছিলেন, এ আমার বেরাদর, দোস্ত, সব কিছু। দেকো, এর যেন কোনো রকম অযত্ন না হয়। বড় মানী লোক।

মুলুকচাঁদ বলেছিলেন, আরে রাম রাম! হামাদের এই ভাঙা কোঠিতে বাবুজী লিজে এসে পা দিয়েছেন, সে কি আমাদের খাতিরের পরোয়া করবেন উনি? সব কুছ লিজের বলে ধরে লিবেন।

প্রথম দিনই মুলুকচাঁদের আখড়ায় দুটি চমকপ্রদ খবর শুনল নবীনকুমার।

পানীয় খাদ্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করার পর মুলুকচাঁদ বললেন, আজ তো নানা সাহেব দশ্‌ বার মরে গিলেন!

হরিশ হাসতে হাসতে বললেন, তাই নাকি? তুমি গুনেচো, মুলুক?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ, জরুর। তুমহার মনে নেই হরিশ, নওবারের বার নানাজী মরলেন গয়া টৌন মে। আঠবার মরলেন মুথুরায়—।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, তা এবার মরলেন কোথায় নানা?

মুলুকচাঁদ বললেন, আজ খওবর এসেছে কি নানা সাহেব আউর একবার মরলেন নেপালে!

হরিশ বললেন, আরও কতবার মরেন উনি, দ্যাকো। আমি তো বোধ করি, উনি অন্তত একশো বার না মরে ছাড়বেন না!

মুলুকচাঁদ বললেন, তা ভি হতে পারে! ধুন্ধুপন্থ বহুৎ ধুরন্ধর আদমি আছে।

নবীনকুমারের এ সব কথাবার্তা সবই ধাঁধা বলে মনে হচ্ছিল। নানা সাহেবের বারংবার মৃত্যু সংবাদ রটনার বিষয়ে সে অবহিত ছিল না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ। কাফ্রিদের মতন চেহারার এক ব্যক্তি নাকি এক দরিয়ার ঘোড়া এনেচে কলকাতায় বড় মানুষদের কাছে বেচতে।

হরিশ জিজ্ঞেস করলেন, দরিয়ার ঘোড়া আবার কী বস্তু?

মুলুকচাঁদ বললেন, সমুন্দর থেকে উঠে এসেছে এই ঘোড়া। বিলকুল পাক্কা সোনার মতন রঙ। এমুন চমকদার ঘোড়া আর কেউ কভি দেখেনি।

হরিশ বললো, ধ্যেৎ! সমুদ্র থেকে আবার ঘোড়া উঠে আসে নাকি?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ আসে। কেনো আসবে না। সমুন্দর মন্থনে ঘোড়া উঠে এসেছিল।

নবীনকুমারও অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠলো।

হরিশ নবীনকুমারের দিকে ফিরে বললেন, মুলুকচাঁদ কিন্তু কখনো পুরো আজগুবি কোনো সংবাদ বলে না। কিছুটা ভিত্তি থাকেই। মুলুক, তুমি ঘোড়াটা নিজের চোকে দেকোচো?

মুলুকচাঁদ বললেন, হাঁ, আপনা আঁখসে দেখেছি। পাশীবাগানে বান্‌ধা আছে, তুমিও দেখতে পারো! দরিয়ার ঘোড়া কিনা জানি না, লেকিন এ এক আজিব জানব্‌র। আসলি সোনার মতন রঙ। দাম কত মাঙ্‌ছে জানো?

—কত?

—এক লাখ্‌ রুপিয়া!

—তা হলে তো কালই একবার সন্ধান কত্তে হচ্চে! এক লাখ টাকা দিয়ে ঘোড়া কে কিনবে?

—সব ইমানদার বাবুরা দাম শুনে পিছু হটছে। লাখো রুপিয়া, বাপ্‌ রে বাপ! কাফ্রি লোকটা বলছে কি সে বর্ধমানের মহারাজার কাছে যাবে!

ঘরের একপাশ থেকে রাইমোহন নবীনকুমারকে উদ্দেশ করে বললো, আমাদের ছোটবাবু ইচ্ছে কল্লে কিনতে পারেন। এক লাখ টাকা তো ওঁর হাতের ময়লা!

নবীনকুমার ঘাড় ঘুরিয়ে রূঢ়ভাবে উত্তর দিল, না, ঘোড়া কিনে বাজে খর্চা করার মতন ইচ্ছে আমার নেই!

হরিশ বললেন, দ্যাকো গে, ও ঘোড়ার গায়ের চামড়ায় একটু ঘষা দিলেই সোনার বদলে পোড়াকাঠের বর্ণ বেরিয়ে আসে কি না!

মুলুকচাঁদ বললেন, বহুৎ লোক দলাই মলাই করে দেখেছে। রং একদম পাকা! ঝিল্‌কি দিচ্ছে। এইসান ঘোড়া আগে কেউ দেখেনি এ বাৎ ঠিক।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তা আবার চলে গেল বিষয়ান্তরে।

এখানে রাইমোহন নিয়মিত আসে। এই বৃদ্ধের এখন আর কোনোখানে গতি নেই, যেখানেই মিনি মাগনায় সুরাপান করতে পারে সেখানেই গিয়ে পড়ে থাকে। হরিশ যে একে কী চক্ষে দেখেছেন কে জানে, এর সব দোষ তিনি ক্ষমা করেন। রাইমোহন মাতাল অবস্থায় হেড়ে গলায় গান শোনায়, হরিশ মুগ্ধ হয়ে তাই তারিফ করেন। রাইমোহনের নেশার টান পড়লে হরিশ অবলীলাক্রমে তার হাতে টাকা তুলে দেন। এখন রাইমোহন এ জায়গাটির সন্ধান পেয়েছে, এখানে তার নিত্য আনাগোনা। নবীনকুমার এ লোকটিকে সহ্য করতে পারে না কেন যেন, কিন্তু হরিশের জন্য ওকে কিছু বলবারও উপায় নেই।

হরিশ অতিশয় কাজের মানুষ। সকাল থেকে সন্ধ্যাব্যাপী তাঁর কাজের অবধি নেই, অথচ রাত্রের দিকে এখানে এসে যখন গা এলিয়ে বসেন, তখন মনে হয় পৃথিবীর আর কোনো ব্যাপারে তাঁর শিরঃপীড়া নেই। মুলুকচাঁদের উদ্ভট গল্প, রাইমোহনের বাজে রসিকতা এবং বেসুরো গান তিনি বেশ উপভোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান। এই সব পরিবেশেই হরিশের চিত্ত-বিশ্রাম হয়।

মাঝে মাঝে হরিশ বলে ওঠেন, হ্যাঁগো মুলুক, এখানে যে বড্ড মন্দামানুষের গায়ের গন্ধ! আমি বেশীক্ষণ এত মন্দা গন্ধ সইতে পারি না। একটু সুরভী

আনাও!

মুলুকচাঁদ অমনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দু-তিনজন নোকরকে পাঠিয়ে দেন। তারা কোনো নর্তকী ও তবলিয়াদের ডেকে আনে। এ পল্লীর সকলেই মুলুকচাঁদের আখড়া চেনে, অতিরিক্ত ইনামের আশায় তারা সাগ্রহে আসে।

ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী রচনা নিয়ে হরিশ সারাদিন নিযুক্ত থাকলেও এখানে এসে হরিশ পারতপক্ষে একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না আলাপচারির সময়। এবং তিনি দেশীয় গান ও উচ্চাঙ্গের নৃত্য-গীতের সমঝদার। তিনি ঠিক সমের মুখে মাথা ঝাঁকাতে পারেন, কখনো কখনো বাহবা দিয়ে নর্তকীদের উদ্দেশে টাকা ছুঁড়ে দেন।

নবীনকুমার এখানে আসে শুধু হরিশের টানে। সন্ধ্যা হলেই সে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিতা রাধার মতন হরিশের টানে উচাটন হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কার্যালয়ে হরিশের দেখা না পেলে সে নিজেই সটান মুলুকচাঁদের আখড়ায় চলে আসে। ক্রমে ক্রমে মদের নেশাটিও জমে আসছে। এখানকার রঙ্গ রসিকতা এবং চতুর কথাবার্তাও তার বেশ পছন্দ। প্রথম প্রথম অবশ্য স্ত্রীলোকদের আগমনে সে আড়ষ্ট বোধ করতো। স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার মনে কোনো বিকার জন্মায়নি। তার পত্নী সরোজিনীকে সে যথেষ্ট পছন্দ করে, সরোজিনীর কাছ থেকে সে যতটুকু পায়, তার বেশী নারীসঙ্গলিপ্সা তার নেই। কিন্তু সরোজিনীর সঙ্গে খুব বেশীক্ষণ মানসিক আদান-প্রদান চলে না। সরোজিনীর জগৎটি বড় ক্ষুদ্র। পছন্দ মতন পুরুষ মানুষদের সাহচর্যেই নবীনকুমারের আত্মার স্ফূর্তি হয় বেশী।

যেহেতু সব ব্যাপারে নবীনকুমার এখন হরিশের অনুকরণ করতে শুরু করেছে, তাই সে এখন নৃত্য-গীতের সমঝদার হবারও চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণে। গোড়ার দিকে এখানে এসে সে স্ত্রীলোকদের মুখের দিকে চাইতোই না, নাচের পালা এবং মাতালদের হল্লা এক সময় খুব বেড়ে উঠলে সে এখান থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিত বাড়ির দিকে। এখন সে সোজাসুজি এই সব স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাতে পারে, তারা হাসি ছুঁড়ে দিলে সে উত্তর দেয় এবং হাততালি দিয়ে তাল দিতেও শিখেছে।

এই সব নর্তকীরা প্রায়ই বদলে যায়। ঘন ঘন নতুন মুখ দেখাই হরিশের পছন্দ। যে-কোনো নতুন রমণীর সঙ্গেই হরিশ ব্যবহার করেন অতি ঘনিষ্ঠের মতন, প্রথমেই তিনি তাদের নাম জেনে নেন এবং তারপর তাদের তুই সম্বোধন করে কথা বলেন। নবীনকুমারের মনে হয়, হরিশ বোধ হয় আসলে অন্তরে অন্তরে নারী বিদ্বেষী। জননী ও পত্নীর কাছ থেকে শান্তি পাননি বলেই সম্ভবত হরিশ পৃথিবীর আর কোনো রমণীকে শ্রদ্ধা করেন না। নারী তাঁর কাছে শুধুই যেন ভোগের সামগ্রী, তাদের আর যেন কোনো মূল্য নেই। প্রায়ই তিনি বলেন, মেয়েমানুষ হবে দু' রকম, হয় নিজের সন্তানের গর্ভধারিণী অথবা নাচুনী। যে নর্তকীকে হরিশের খুব পছন্দ, যাকে বাহবা দেন অনেকবার। পরের দিন তাকেই আবার আনবার কথা উঠলে হরিশ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠেন, কেন, আর কি নাচুনীর অভাব! একটা নতুন মুখ আনো না!

মুলুকচাঁদ সন্ধানও রাখে প্রচুর। হরিশ নতুন মুখ চাইলেই তিনি অমনি নতুন স্ত্রীলোক এনে দেন। হরিশের জন্য তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত। শুধু এক জায়গায় মুলুকচাঁদ হার মেনেছেন। রাইমোহন একদিন বললো, এত নাচনেওয়ালী তো দেকচি বাওয়া, কিন্তু এরা কেউই একজনের নোখের যুগ্যি নয়! তাকে তো আনতে পাল্লে না!

মুলুকচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জানি, আপনি কার কথা হামাকে বলছেন। চেষ্টার কোনো কসুর করিনি, কিন্তু সে কেনো আসবে হামার এই গরিবখানায়। শুনেছি তো কোতো কোতো রাজা-মোহারাজাকেও সে দরওয়াজা থেকে ভাগিয়ে দেয়।

হরিশ প্রশ্ন করেন, কে? কে সে?

রাইমোহন বললো, কমলি! সে মাগী বড় দেমাকী। বুড়ি হতে চল্লো, তবু দেমাক ছাড়ে না।

মুলুকচাঁদ বললেন, কোমলাসুন্দরী নাম আছে সে জেনানার। হাঁ, উমর হয়েছে ঢের, তবু বড় খুবসুরৎ! আর নাচ করে খুব ভালো।

রাইমোহন রহস্যময় ভাবে চোখ মটকে বলে, এখেনকার একজন পারে তার দেমাক ভাঙতে! ইচ্ছে কল্লেই পারে।

এই কথা বলে সে নবীনকুমারের দিকে তাকায়। নবীনকুমার এ কথার অর্থ বুঝতে পারে না। সে চোখ সরিয়ে নেয়।

একদিন হরিশ এলেন বেশ দেরি করে। তাঁর কাগজের জন্য অনেক লেখা বাকি ছিল, সব সমাপ্ত করে তিনি ছাপাখানায় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন। নবীনকুমার আগেই পোঁছে গিয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই তার দু-তিন গেলাস সুরা পান করা হয়ে গেছে। হরিশ এসে যোগ দিলেন তার সঙ্গে। প্রথমে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, নেশাটি ঠিক মতন না জমলে হরিশ নর্তকী আনবার কথা বলেন না।

নেশা মধ্য পর্যায়ে এসেছে, নর্তকীর প্রসঙ্গ উঠেছে এবং একজনকে আনবার জন্য নোকররাও বেরিয়ে গেছে। এই সময় মুলুকচাঁদ হরিশকে বললেন, ও একটা ভারি জবর খোবর তোমায় বলতে বিলকুল ভুলে গিয়েছিলুম, হরিশ। এইমাত্র ইয়াদ হলো। কি, হামাদের লেফটেনান্ট গভরনর যো ছিল না, কালসে তার বদল্ হোয়ে গেলো। হ্যালিডে সাহেব আর থাকছেন না।

হরিশ চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ? হ্যালিডে আর লেফটেনান্ট গাভ্নার থাকছেন না? কে আসছেন সে জায়গায়?

মুলুকচাঁদ বললেন, গ্রাণ্ট নামে সাহেব আছেন না? সে ওহি সাহেব।

হরিশ বললেন, জন পিটার গ্রাণ্ট। তিনি আসছেন? তুমি ঠিক জানো, মুলুকচাঁদ?

মুলুকচাঁদ বললেন, আমি ঠিক ছাড়া কি ঝুট বলি তোমাকে? কালই তো পহেলা তারিখ আছে না? কাল সে বদল্ হোচ্চে!

হাতের গেলাসটি মাটিতে ঠক করে নামিয়ে রেখে হরিশ বললেন, ওরে বাপ রে বাপ! এত বড় খবরটা তুমি আমায় এতক্ষণ বলোনি মুলুক? আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

নবীনকুমার অতি বিস্মিত হলো। লেফটেনান্ট গভর্নরের বদলের সংবাদে এতখানি কী গুরুত্ব আছে সে কিছুই বুঝলো না। এক সাহেবের জায়গায় আর এক সাহেব আসবে, এতে আর নতুনত্ব কোথায়?

তার প্রশ্নের উত্তরে হরিশ বললেন, তুমি বুঝতে পারলে না, নবীন? অবস্থা অনেক বদলে গেল! এই হ্যালিডে আমাদের কম ক্ষতি করেচে? আমি আশাও করিনি যে এ বিদায় নেবে! আমি নীলচাষীদের হয়ে লড়চি আর ঐ হ্যালিডে নীলচাষীদের দুশমন! সে সব সময় নীলকর সাহেবদের স্বার্থ দ্যাকে। সে সবচেয়ে বদমাস নীলকরদের বেছে বেছে তাদের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটি ক্ষমতা দিয়েচে।

বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট চাষীদের দুঃখ বোঝেন, তিনি চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটা আইন জারি করেছিলেন, এই হ্যালিডে ব্যাটা তার চাকরি খাওয়ার তালে ছেল! আমি চল্লুম, তোমরা থাকো।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এত রাতে তুমি এজন্য কোথায় যাবে?

হরিশ বললেন, তুমি বুজতে পারচো না, অবস্থা কত বদলে গেল! আমার কাগজের সব লেখাগুলো পাল্টাতে হবে। এখুনি আবার নতুন করে লিকবো। জন পিটার গ্রান্ট বিচক্ষণ ভালোমানুষ, তাঁর সামনে নীলচাষীদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধর্তে হবে। গ্রান্ট সাহেবকে যদি দলে পাই তবে এবার নীলকরদের সঙ্গে শুরু হবে আমাদের সত্যিকারের লড়াই।

কর্তব্যের ডাক পড়লে হরিশ আর দ্বিধা করেন না। হাতের মদের পাত্র ফেলে, নাচ গানের আসর ছেড়ে তিনি তখনই আবার চ'লে গেলেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অফিসে।

সে রাতে নবীনকুমারেরও আর বাড়ি ফেরা হলো না।

চক্ষু মেলে নবীনকুমার প্রথমে বুঝতেই পারলো না যে সে কোথায়? ঘরের ছাদ অন্য রকম, এত সরু সরু কড়িকাঠের ছাদ সে আগে কখনো দেখেনি। জানলায় চৌকো সবুজ-রঙা কাঠের গরাদ, সেই জানলার বাইরে দিয়ে আকাশের ভাসমান মেঘ দেখা যাচ্ছে। নবীনকুমারের শয়নকক্ষ থেকে তো এমনভাবে আকাশ দৃশ্যমান নয়।

হঠাৎ তোপ দাগার শব্দ হতে সে বিষম চমকে উঠলো। এত জোরে তোপের শব্দ তো সে কোনোদিন সকালে শোনেনি, মনে হয় যেন খুব কাছে। পর পর সাত বার তোপ দাগা হলো কেল্লা থেকে, অর্থাৎ সকাল এখন সাত ঘটিকা। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। এ তার নিজ গৃহ নয়, এ তো মুলুকচাঁদের সেই ঘর। দিনের আলোয় কোনোদিন এখানে নবীনকুমার আসেনি বলে সব কিছুই তার অচেনা বলে বোধ হলো।

জাজিম পাতা তক্তাপোষের ওপর শুয়ে ছিল সে, মেঝেতে লম্বা ঠ্যাং দুটি গুটিয়ে শরীরটাকে 'দ'-এর আকৃতি দিয়ে এখনো ঘুমোচ্ছে রাইমোহন, ফাটা বাঁশীর শব্দের মতন নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে তার। মেঝেতে আর এক পাশে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে আর এক ব্যক্তি, তার ওষ্ঠের পাশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। উচ্ছিষ্ট মাখা একটি খাবারের পিরীচের ওপর ভন্ ভন্ করছে এক রাশ নীল ডুমো মাছি, তার পাশেই পড়ে আছে শস্তা জরি বসানো একটি ঝ্যালঝেলে লাল ওড়না।

নবীনকুমার দু' হাতে চক্ষু ঘর্ষণ করলো। এখানে সে রাত্রি যাপন করেছে, এই নোংরা পরিবেশে? কেন? কী হয়েছিল গত রাত্রে! তার কিছুই মনে পড়লো না। শরীরে একটা বিবমিষার ভাব। অন্যের ব্যবহৃত এমন অপরিচ্ছন্ন শয্যায় অন্য নীচু শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একই কক্ষে সে কখনো শয়ন করেনি।

নবীনকুমার তক্তাপোষ থেকে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। সে বসেছিল কৌচে, সেখান থেকে রাত্রে তক্তাপোষের ওপর গেল কী করে? কী যেন একটা খবর পেয়ে

হরিশ হঠাৎ চলে গেলেন। তারপর একটি নর্তকী এলো। এ নর্তকীটি অন্য ধরনের, অঙ্কের ছকে পা মেলানর বদলে ঘাগড়া ওড়াচ্ছিল বেশী, একটি সুরা ভর্তি গেলাস রেখেছিল মাথার ওপরে। হরিশ এ রকম নাচ পছন্দ করেন না, সেইজন্যই কি হরিশের অনুপস্থিতিতে চটুল নৃত্য শুরু হয়েছিল। হরিশ নেই বলে নবীনকুমারকেই সকলে প্রধান অতিথি হিসেবে খাতির করছিল। নর্তকীটি বার বার তার সামনে এসে অঙ্গভঙ্গি করছিল নানারকম। তারপর আর কিছু স্মরণে আসে না। সে কি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল একেবারে?

মুলুকচাঁদ এই সময় সেই কক্ষে ঢুকে উৎফুল্লভাবে বললেন, এই তো, আপনি উঠিয়ে পড়েছেন? তবিয়ৎ ভালো আছে তো? লিন, মুখ ধুয়ে লিন, তারপর একটু গরম গরম দুধ আর জিলাপি খান।

মুলুকচাঁদ এরই মধ্যে স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছেন। কপালে তিলক, দু' কানের লতিতে টাটকা চন্দনের ফোঁটা, মুখে বেশ একটা পরিতৃপ্তির ভাব। যেন তিনি সারাদিনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

নবীনকুমার আচ্ছন্নের মতন জিজ্ঞেস করলো, আমার কী হয়েছিল কাল? আমি বাড়ি যাইনি কেন?

মুলুকচাঁদ বললেন, কুচ্ছু তো হয়নি। অচানক আপনার নিদ এসে গেলো, হাত থেকে গিলাসটা খসে পড়লো, তখন হামিলোক সব ধোরাধোরি করে আপনাকে শুইয়ে দিলাম। কোষ্ট হয়েছে খুব? আহা-হা, বহুৎ মচ্ছর কেটেছে! শালা, ইত্না মচ্ছর—

নবীনকুমার বললো, আমার ঘুম এসে গেসলো, তো আমায় ডেকে তুলে বাড়িতে পাটিয়ে দিলেন না কেন? আমি কখুনো বাড়ির বাইরে থাকি না—

মুলুকচাঁদ বললেন, অনেক তো ডাকাডাকি করলুম। লেকিন সরাবের নিদ্ কি সহজে ভাঙে! আপনি তো স্রিফ পাত্থর বনে গেলেন। হামি তখুন নাচা-গানা সোব বন্ধ করে দিলুম। বললুম কী, বাবুজীর নিদ্ এসে গেছে, আভি সব চুপ যাও! হরিশেরও এমুন হয়, সে তখুন শুয়ে যায়।

নবীনকুমার আর কথা না বাড়িয়ে বললো, আমি বাড়ি যাবো, আমার জন্য গাড়ি ডাকতে হবে।

মুলুকচাঁদ বললেন, আপনার গাড়ি তৈয়ার আছে।

মুলুকচাঁদ শ্বেত পাথরের গেলাসে গরম দুধ এবং শাল পাতায় মোড়া এক চাঙ্গাড়ি জিলিপি এনে হাজির করলো, কিন্তু নবীনকুমারের কোনো খাদ্য গ্রহণেরই প্রবৃত্তি নেই এখন। সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

লম্বা টানা অলিন্দের একেবারে শেষ প্রান্তে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বসে ঘুমুচ্ছে দুলালচন্দ্র। সারারাত্রি সে এইভাবেই কাটিয়েছে। নবীনকুমার তার কাছে গিয়ে দুবার নাম ধরে ডাকতেই সে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো। নবীনকুমার বললো, চল্! হাঁটতে গিয়ে নবীনকুমার টের পেল, তার এখনো পা কাঁপছে, মস্তিষ্কের মধ্যে টলোমলো ভাব। ভাঙাচুড়ো প্রাসাদটির বহির্দ্বারে নবীনকুমারের জুড়ি গাড়িটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সহিস এবং পিছনের ভৃত্যটি ছাদের ওপর ঘুমন্ত। দুলাল তাদের ডেকে তুললো। মুলুকচাঁদ প্রত্যুৎগমন করার জন্য দ্বার পর্যন্ত এসেছেন, কিন্তু নবীনকুমার আর কোনো কথা না বলে উঠে বসলো কোচের মধ্যে।

জোড়াসাঁকোর সিংহ সদনের সামনে সেই একই সুদৃশ্য, জমকালো জুড়ি গাড়িটি থামলো, যে গাড়ি ঠিক এমনই ভাবে অনেক বৎসর আগে এ রকম সকালে

ফিরে আসতো রামকমল সিংহকে নিয়ে। আজ রামকমল সিংহের বদলে গাড়ি থেকে নামলো তাঁর অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র। পোশাক মলিন, চক্ষু দুটি আরক্ত, চুল অবিন্যস্ত। মুখ নিচু করে গাড়ি থেকে নেমে নবীনকুমার চলে এলো ভিতরে। সে কারুকে ভয় পায় না, তবু নিজেকে তার মনে হচ্ছে অপরাধী। তার সর্বাঙ্গে যেন অশুচি হয়ে গেছে। গলার মধ্যে যেন জমে আছে বাষ্প, কান্না দমনের সময় এ রকম হয়।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে পালঙ্কে বসা মাত্র সরোজিনীও এলো সেই ঘরে। নবীনকুমারের পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে সে জুতো খুলে দিতে লাগলো। তারপর মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্নানের জল দিতে বলবো কি?

নবীনকুমার শুধু বললো, হুঁ।

সরোজিনী আবার জিজ্ঞেস করলে, আজ তেল মাকাবেন? যদুকে ডাকবো?

নবীনকুমার পুনরায় বললো, হুঁ।

সরোজিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি স্নান সেরে নিন, আমি ঠাকুরকে খাবার দিতে বলচি।

সরোজিনী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নবীনকুমার বিমূঢ়ের মতন বসে রইলো। সরোজিনী তো একবারও প্রশ্ন করলো না, কাল ফেরেনি কেন, কিংবা কোথায় ছিল। তার কথায় কোনো অভিমানের ছায়া পর্যন্ত নেই!

অনেকক্ষণ একই অবস্থায় বসে রইলো নবীনকুমার। সামনের আয়নায় সে তার মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। এক রাত্রেই যেন অনেকখানি বদল হয়েছে তার। মুখভর্তি মশার কামড়ের দাগ, ওষ্ঠের ওপর যে সব গুম্ফের রেখা দেখা দিয়েছিল, এখন যেন তা হঠাৎ গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে।

একটু পরে সরোজিনী এসে তাড়া দিল, ও কি, আপনি চান কত্তে গেলেন না? নুচি ভাজা হচ্চে, ঠান্ডা হয়ে যাবে যে?

নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, যাই।

ভালো করে শরীরে সরষের তেল দলাই মলাই করিয়ে স্নান সেরে নিল সে। আহারে রুচি নেই, তবু কিছু খেতে হলো। মে মাসের আকাশ গুমোট হয়ে আছে, শরীরে জ্বালা ধরানো গ্রীষ্মের উত্তাপ, সরোজিনী পাখার বাতাস করতে লাগলো তাকে।

এক সময় নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আমি যে কাল রাত্রে বাড়ি ফিরিনি, মা সে কতা জানেন?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ, জানেন।

—মায়ের দাসীকে খপর দাও, মায়ের পুজোআচ্চা সারা হলে আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেকা কর্বো।

খাওয়া শেষ হলে সরোজিনী একটি রুপোর রেকাবিতে করে কয়েকটি সাজা পানের খিলি তার সামনে ধরলো। নবীনকুমার বাড়িতে কোনোদিন পান খায় না, ধূমপানের অভ্যেসও তার নেই। কিন্তু মুলুকচাঁদের ওখানে কয়েকদিন সকলে বারংবার পীড়াপীড়ি করায় সে দু-একটি পান মুখে দিয়েছে। আজ সকালে তার ওষ্ঠাধর তাম্বুল রসে রক্তিম ছিল, তা দেখেই সরোজিনী পান এনে দিয়েছে।

নবীনকুমার হাত দিয়ে রেকাবিটা সরিয়ে দিয়ে বললো, থাক্!

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবার সে প্রায় সারাদিনের মতন অদৃশ্য হয়ে যাবে। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে বাড়ির নারীদের দিবাভাগে দেখা সাক্ষাতের প্রথা নেই। কিন্তু নবীনকুমারই এ প্রথা ভেঙেছিল, সে কোনো দাস-দাসীর কাছ

থেকে তার নিজস্ব পরিচর্যা পছন্দ করে না। তার স্নানাহারের সময় সরোজিনীর উপস্থিতি চাই।

মস্তিষ্ক এখনো ঠিক পরিষ্কার হয়নি, তব ইচ্ছে করছে শুয়ে থাকতে। কিন্তু সে দুর্বলতা দমন করে সে দেখা করতে গেল তার মায়ের সঙ্গে।

বিম্ববতী পুত্রের জন্য প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন। নিজের হাতে দই, লেবুর রস ও মধু দিয়ে সরবৎ বানিয়েছেন, রাত্রি জাগরণের পর এই সরবৎ খেলে শরীর ঠান্ডা হয়। তাঁর স্বামীও এই সরবৎ পান করতে ভালোবাসতেন। নবীনকুমারের হাতে গেলাসটি তুলে দিয়ে তিনি বললেন, নে, এক চুমুকে খেয়ে নে।

কোঁচার ফুলটি বাঁ হাতে ধরে মায়ের ঘরের একটি কেদারায় বসলো নবীনকুমার। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আচো, মা? অনেক দিন তোমার শরীর গতিকের খপর নেওয়া হয়নি কো।

বিম্ববতী মুগ্ধ, বিগলিত হয়ে প্রায় ছলোছলো নেত্রে বললেন, আমি ভালোই আচি রে, খুব ভালো আচি। তোদের ভালোতেই আমার ভালো। আমার বউমাটি অতি সতীলক্ষ্মী, ভালো বংশের মেয়ে তো, খুব উঁচু নজর, আমায় খুব দ্যাকে, পান থেকে চুনটি খসলেই একেবারে হা-হা করে আসে।

নবীনকুমার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে চেয়ে রইলো। যেন এই রমণীটি তার অচেনা, সে এঁর অন্তর যাচাই করার চেষ্টা করছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সে বললো, মা, ইব্রাহিমপুরে আমাদের কুঠিবাড়িটা আমি বেচে দোবো ঠিক করিচি!

বিম্ববতী বললেন, সে কি, তুই আবার সম্পত্তি বেচবি? কেন, তোর টাকার খামতি পড়লো কিসে?

—ইব্রাহিমপুরে আমাদের সব জমি নীলকর সাহেবদের ইজেরা দেওয়া হয়েছে, সুদু সুদু কুঠিবাড়িটা টিঁকিয়ে রেখে লাভ কী? চারটে লোকের মাসমাইনে ফালটুস খর্চা।

—ইজেরায় জমি তো আবার ফেরত পাওয়া যায় শুনিচি!

—বাঘের মুখ থেকে কেউ কখনো ছাগল ছ্যানা ফেরত এনেচে, শুনেচো? ও জমি ইজেরা দেওয়াই ভুল হয়েছেল।

—এ সব বিষয় সম্পত্তির কতা আমার সঙ্গে ক্যানো বাপু? তোরা যা ভালো বুজিস করবি। তোর জ্যাটাবাবু রয়েচেন, তাঁর পরামর্শ নিয়ে চললে...

—হ্যাঁ ও বিষয়েও একটা কতা আচে, মা। জ্যাঠাবাবুকে যদি আমি এ বাড়িতে কখনো ডেকে পাটাই, তাতে তাঁর কি অপমানিত বোধ হবে? উকিলের পরামর্শ আমার তো দরকার বটেই, কিন্তু আমি শপথ করিচি, ও বাড়িমুখো আমি কোনোদিন হবো না।

—ওমা, এমন শপত...তুই কী বলচিস ছোট্‌কু? কেন, যাবি না কেন ও বাড়িতে?

—তোমার মনে নেই, সেই যে জ্যাঠাবাবুর নাতির উপনয়নের দিনকে আমায় অপমান করেছিলেন? ওঁরা বামুন, আমরা কায়েত, আমরা কখনো এক হতে পারি না।

—তোর জ্যাটাবাবুর সঙ্গে আমাদের আবার বামুন-কায়েতের সম্পর্ক কী? তুই কী সব অলুক্ষণে কতা কইচিস!

—আমি ঠিকই বলচি মা। আমি শিবুকে দেখতে যাচ্ছিলুম, আমায় বারণ করা হয়েছেল, কারণ আমি বামুনের ছেলে নই। ও বাড়িতে আর আমি কোনোদিন

পা দোবো না।

বিম্ববতী একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখখানিতে বিষাদের ম্লান ছায়া একবার পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি মিনতি মাখা আর্দ্র স্বরে বললেন, বাবা ছোটকু, তোকে একটা কতা বলবো? তুই রাকবি বল? আমার মাতার দিব্যি, তুই আমার এই একটা অনুরোধ যদি রাকিস...

নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ কোমল কণ্ঠে বললো, কেন রাকবো না, মা? তোমার কতা কি আমি ফেলতে পারি? তুমি যা বলবে নিশ্চয়ই মানবো!

—তুই তোর জ্যাটাবাবুর সঙ্গে অসৈরণ করিসনি। লক্ষ্মী মানিক আমার, উনি গুরুজন, আমাদের সোংসারের মাতার ওপর ছাতা ধরে আচেন অ্যাতোদিন, তাঁকে তুই অচ্ছেদ্দা করিসনি! উনি তোর ভালো বই মন্দ কখনো চাইবেন না...

নবীনকুমার একটুক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইলো জননীর দিকে। তারপর বললো, তুমি ভয় কেন পাচ্চো, মা! আমি কতা দিলুম, জ্যাঠাবাবুর সামনে কখনো অশ্রদ্ধার ভাব দেকাবো না।

আর কিছুক্ষণ কথা হলো এই বিষয়ে। নবীনকুমার বার বার আশ্বস্ত করলো বিম্ববতীকে, এমন কি একবার সে উঠে কাছে এসে জননীর বাহু ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি কেন উতলা হচ্চো, মা? আমি কি তোমার অবাধ্য ছেলে?

মাতা পুত্রের এই আলাপচারির পর দু'জনের মনে প্রতিক্রিয়া হলো দু' রকমের। অনেকদিন পর বিম্ববতী আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। নবীনকুমারের এমন মধুর ব্যবহার তিনি প্রত্যাশাই করেননি। ছেলে ঠিক তার বাপের ধাত পেয়েছে। রামকমল সিংহও দু-চারদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়ে এলে তারপর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে খুব নরম ব্যবহার করতেন, এমন কি ঝি চাকরদের সঙ্গেও কথা বলতেন মধু ঢালা কণ্ঠে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর সোহাগ উথলে উঠতো। বিধুশেখরের সঙ্গে সন্ধি করতে নবীনকুমার এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এবার বিম্ববতী নিশ্চিন্ত, এখন তাঁর প্রয়োজন শুধু বিধুশেখরের কাছ থেকে তাঁর নিজের মুক্তি। এবার তিনি এই সংসার থেকে বিদায় নেবেন, এবং বিধুশেখরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবেন।

নবীনকুমার তার ঘরে ফিরে এলো ক্ষুব্ধ হয়ে। মনের মধ্যে চাপা ক্রোধ ও অপমান। তার মায়ের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তির আলোচনা করার বাসনা তার বিন্দুমাত্র ছিল না, বিশেষত আজ। কিন্তু একটা কিছু প্রসঙ্গ তুলে তো কথা শুরু করতে হয়, তাই সে ইব্রাহিমপুরের কুঠির কথা বলেছিল। সে অপেক্ষা করছিল, মা তাকে অন্য কথা বলবেন। সে নিজে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, মা কি এর মর্ম বোঝেননি? কাল রাত্রে সে বাড়ি ফেরেনি, সেজন্য একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না? মা তাকে কখনো ভর্ৎসনা করেন না, কিন্তু স্নেহের সুরে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা তো করতে পারতেন। তুললেন কিনা বিধুশেখরের প্রসঙ্গ! মায়ের কণ্ঠে তার জন্য একটু উদ্বেগও প্রকাশ পেল না, এতই স্বাভাবিক গৃহের বাইরে রাত্রি যাপন? সবাই ধরে নিয়েছে, সে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?

সেই রাত্রেই নবীনকুমার আবার গেল মুলুকচাঁদের বাড়িতে। তারপর প্রতি রাতে। সুরাপানের নেশা শুরু হলো বল্গাহীন ভাবে। নৃত্য গীতের আসরে সে

জাঁকিয়ে বসে। হরিশ নেই, তিনি গেছেন বারাসতে, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন রায়ত প্রজাদের জন্য যে রুবকারি জারি করেছিলেন, সেটা কার্যকর করবার জন্য তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়ছেন। হরিশের অনুপস্থিতিতে নবীনকুমারই মুলুকচাঁদের রাত্রি বাসরের প্রধান ভোক্তা। সে নিজেও অর্থব্যয় করতে লাগলো অফুরন্ত। প্রতি রাত্রেই বারাঙ্গনা-নর্তকী আনা হতে লাগলো একাধিক। প্রায়ই নবীনকুমার রাত্রে স্বগৃহে ফেরে না। একবার যখন শুরু করেছে, তখন সে এর চূড়ান্ত না দেখে ছাড়বে না।

বাঘের সঙ্গে ফেউ-এর মতন রাইমোহন ঠিক তার সঙ্গে লেগে আছে। আরও বেশ কয়েকজন ইয়ার বক্সীও জুটেছে। সদ্য বখামি ধরা ধনী যুবকদের কীভাবে উস্কানি দিতে হয়, সে ব্যাপারে তাদের পেশাদারী দক্ষতা আছে। তারা নানাপ্রকারে নবীনকুমারকে নাচাতে লাগলো এবং প্রমোদ আসরটি এর পর আর শুধু মুলুক-চাঁদের আখড়াতেই সীমাবদ্ধ রইলো না। রাইমোহন কিছুদিন রামকমল সিংহের মোসাহেবী করেছিল, এখন তাঁর পুত্রের মোসাহেব হতে যেন তার আরও বেশী উৎসাহ।

রাইমোহন একটা কথা বলে প্রায়ই নবীনকুমারকে খোঁচা দেয়। সে যতই বড়-মানুষী করুক, যতই নৃত্যগীতের সমঝদার হোক, এ শহরের সবচেয়ে নামকরা নর্তকীর নাচ তো সে এখনো দেখেনি! কমলাসুন্দরীর নাম দেশসুদ্ধ সব মানুষ জানে, বয়েস একটু হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কী রূপ, এখনো কী কোমরের ছন্দ!

একদিন রাইমোহনের চেষ্টার ফল ফললো। সেদিন বেশ গোলাপী গোছের নেশা হবার পর নবীনকুমার রাইমোহনকে বললো, যাও নিয়ে এসো সেই বেটীকে; কত টাকা নেয় সে? গাধার মুখের সামনে যেমন গাজরের টোপ ধরে, তেমনি তার সামনে টাকার তোড়া তুলে ধরো গে!

রাইমোহন জিভ কেটে বললো, ওরে বাপ্‌রে রে বাপ! তার কাচে টাকার গরমটি দেকাবার উপায় নেই কো! সে এদানি কারুর বাড়িতে যায় না। তার কুঠীতে যেতে হয় নাচ দেকবার জন্যে। তাও সকলকে দেয় না। শুনিচি, স্বয়ং লক্‌নৌয়ের নবাব নাকি ডেকে পাটোছেলেন, ও মাগী যায়নি!

নবীনকুমার বললো, সে আসে না, কিসের তার এত দেমাক? নাচুক কুঁদুক যাই করুক, বাজারে-অবিদ্যা ছাড়া তো আর কিচু নয়!

রাইমোহন বললো, তাকে আর পাঁচটা মেয়েমানুষের মতুন ভাববেন না। তা হলে কি আর এত করে নাম কচ্চি! কালো কষ্ঠিপাথরে গড়া যেন একখানি প্রতিমা, বয়েসের ছোঁয়া তার গায়ে লাগে না। কত রাজা-রাজড়া তাকে বাঁধা রাঁড় কত্তে হা-পিত্যেশী হয়েছেন, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! দেকতে অমন সুন্দর হলে কী হবে, তার কতাগুলো বড় চ্যাটাঙে। আপনার নাম শুনলে বোধ করি আপনাকে ঢুকতেই দেবে না!

—কেন, আমার নাম শুনলে ঢুকতে দেবে না কেন? আমি কি ব্রহ্মদৈত্য না মাম্‌দো ভূত?

—সে একটা গূঢ় কতা আচে। সে আপনাকে বলা যাবে না!

নবীনকুমার টলতে টলতে উঠে এসে রাইমোহনের কণ্ঠ চেপে ধরলো দু হাতে। গর্জন করে বললো, তুমি আমার কাচে কী নুকোচ্চো? সব সময় তুমি আমার কাচে ঐ মেয়েমানুষটার নাম বলো কেন? আবার কেনই বা বলচো আমার নাম শুনলে সে ঢুকতে দেবে না?

রাইমোহন বললো, আগে সে মাগীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট এয়ার্কি ছেল, আমি

অনেকবার ওখেনে গতায়াত করিচি। এদানি আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা কচ্চি শুনে সে ক্ষাপচুন্নি হয়ে আচে, আমায় আর ঢুকতে দেয় নাকো!

নবীনকুমার আরও কুপিত হয়ে বললো, আমায় সে চেনে? আমি এর মধ্যে এত নামজাদা হয়ে পড়িচি!

অন্য একজন ফোঁড়ন দিল, এত কতার দরকার কী, সব্বাই মিলে একবার তার কাচে গেলে তো হয়, তা হলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে খন!

নবীনকুমার রাইমোহনকে ছেড়ে দিয়ে বললো, চলো! এখুনি চলো!

সদলবলে হই হই করে বেরিয়ে পড়লো সকলে। কমলাসুন্দরীর গৃহ অদূরেই। হেমপীরের গলির মধ্যে সেই উদ্যান সমন্বিত বারান্দাওয়ালা বাড়ি। নবীনকুমার এলো জুড়ি গাড়িতে, অন্যরা পায়ে হেঁটে। রাত প্রায় এগারোটা। কমলাসুন্দরীর বাড়িতে আজ কোনো আসর বসেনি, অধিকাংশ কক্ষই অন্ধকার, দেউড়ির লোহার গেট বন্ধ, সেখানে পাহারা দিচ্ছে দুজন দ্বারবান।

দ্বারবানরা জুড়ি গাড়িটি দেখেই চিনতে পারলো। বিস্মিত মুখে গাড়ির দরজা খুলে দিল তারা। রাইমোহন তার ওপরে তড়পে বললো, ব্যাটারা হাঁ করে দেকচিস কী, চিনতে পারিসনি? বড়বাবু রামকমল সিংহের একমাত্র ছেলে নবীন-কুমার। দেউড়ি খোল!

দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিল দ্বারবানেরা। নবীনকুমারের বেশ বেসামাল অবস্থা, কোঁচার ওপরে পা পড়ে যাওয়ায় সে হুমড়ি খাচ্ছিল, রাইমোহন তাকে ধরলো। নবীনকুমারের চেতনাও প্রায় লোপ পাবার পথে, সে এর মধ্যেই ভুলে গেছে যে কোথায় এসেছে। সে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার বাড়ি?

রাইমোহন রঙ্গ করে বললো, এই তো কমলাসুন্দরীর বাড়ি। এটা আপনার নিজের বাড়িও বলতে পারেন!

অন্য একজন ইয়ার বললো, তবে যে বাওয়া বলেছেলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না! আগেই তো জাঁক করে বাবুর নাম শোনালে! চিচিং ফাঁকের মতন দোরও খুলে গেল!

রাইমোহন তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, চোপ! তারপর নবীনকুমারকে বললো, আসুন ছোটবাবু, আসুন।

নবীনকুমার বললো, নাচ দেকবো না? নাচ?

নিশ্চয় দেকবেন! এসে পড়িচি যখন...আসুন, ওপরে আসুন।

দ্বিতলে সিঁড়ির মুখে দু-তিনটি যুবতী আলথালু বেশে দাঁড়িয়েছে এসে, রাইমোহন জিজ্ঞেস করলো, কই, বিবিসাহেবা কোতায়?

একটি মেয়ে বললো, এত রাতে তোমরা কে গা? দ্বারোয়ান ব্যাটারা তোমাদের দোর খুলে দিলে?

রাইমোহন ধমকে বললো, চুপ কর বেটী। জানিস কে এসেচে? কার বাড়িতে তোরা আচিস, জানিস? স্বয়ং বাড়ির মালিক এয়েচেন! কমলী কোতায়?

—সে তো দোর আটকে শুয়ে পড়েচে!

নবীনকুমার জড়িত স্বরে বললো, নাচ কোতায়, নাচ? কে নাচবে? গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!

রাইমোহনের সঙ্গেই বোতল ছিল, নবীনকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ভিজ্যে নিন গলা, শুকো গলায় কী আর নাচ জমে?

কমলাসুন্দরীর নিজস্ব কক্ষ কোন্‌টি তা রাইমোহনের অজানা নয়। সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে রাইমোহন চেঁচিয়ে বললো, কম্‌লী, অ্যাই কম্‌লী, ওট্‌, দ্যাক কাকে এনিচি।

হল্লা শুনে কমলাসুন্দরী আগেই জেগে উঠেছিল, দ্বার খুললো সঙ্গে সঙ্গেই। তার অঙ্গে ইহুদী-আনা কিংখাপের লম্বা ঝোলা পোশাক, গলায় এক ছড়া সবুজ পান্নার মালা, চুল খোলা। রাইমোহন মিথ্যে বলেনি, কমলাসুন্দরীর রূপ এখনো আগেকার মতন নিটোল আছে, শুধু বয়েসের জন্য খানিকটা মেদ লেগেছে।

রাইমোহন সাড়ম্বরে বললো, ওরে কম্‌লী, শাঁক বাজা, আজ তোর কত ভাগ্যি! বড়বাবুর ছেলে এয়েচেন, দ্যাক, পাদ্যার্ঘ্য দে!

কমলাসুন্দরী তখনও ঠিক বুঝতে পারেনি। ভুরু দুটো তুলে জিজ্ঞেস করলো, কাকে এনোচো? কার ছেলে বললে? বড়বাবু কে?

—বড়বাবু আবার ক'জন রে, অ্যাঁ? বড়বাবু একজনই হয়। তোর বড়বাবু, যিনি কোলে শুয়ে মল্লে তুই বেধবা হইচিলি! তেনার ছেলে তোর পীরিতের জন্যে এসেচেন!

নবীনকুমার বললো, নাচ কোতায়, নাচ? আমার যে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে!

কমলাসুন্দরী সত্যিই প্রস্তরমূর্তির মতন নিস্পন্দ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চক্ষে জল এসে গেল তার। রাইমোহনের দিকে চেয়ে বললো, হ্যাঁ গা, তোমার শরীলে কি মানুষের রক্ত নেই? অনেক পাপ করিচি জীবনে, তা বলে আমায় এমন শাস্তি দেবে?

রাইমোহন বললো, ডাঁড়া ডাঁড়া, এখুনি কী হয়েচে! তোর পাপের সরা পূর্ণ হতে এখুনো ঢের বাকি আচে। চুল বাঁদ, পায়ে ঘুঙুর দে, বাবু তোর নাচ দেকবেন!

নবীনকুমার বললো, ধ্যাৎ! আমার ঘুম পেয়ে যাচ্চে! বিছানার ওপর কেউ নাচ দেকায় তো শুয়ে শুয়ে দেকি!

রাইমোহন হো হো করে হেসে উঠে বললো, বাঃ খাসা বলেচেন! বিছ্‌নার ওপর নাচ! তাই দেকা কম্‌লী, ছোটবাবুকে তুই বিছ্‌নার ওপর নাচ দেকা, আমরা পাঁচপেঁচি লোক, আমরা বাইরে থাকবো।

কমলাসুন্দরী বললো, তোমার মুকে এবার আমি মুড়ো ঝ্যাঁটা ভাঙবো! পাহারাওয়ালাকে দিয়ে তোমায় চাবকাবো!

নবীনকুমার সম্পূর্ণ আচ্ছন্নের মতন মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, আমি যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পাচ্ছি না, আমায় কেউ একটা বিছানা দাও।

কমলাসুন্দরী নিজেই এগিয়ে এসে নবীনকুমারের এক হাত ধরে বললো, আহা রে, সাত রাজার ধন এক মানিক, তার কি দশা করেচে এই পাষণ্ডেরা! বাবু, তুমি বাড়ি যাও। তোমাকে এখানে থাকতে নেই।

নবীনকুমার বললো, আমায় বিছানা দাও! আমায় এরা বেশী খাইয়ে দিয়েচে।

কমলাসুন্দরী বললো, আহা রে! তোমায় আমি দুধের ফেনার মতন নরম বিছ্‌না দিতে পারি, সারারাত তোমার মাতায় পাখার হাওয়া কত্তে পারি। কিন্তু তেমন ভাগ্যি করে যে আসিনি। এ পাপের জায়গায় থাকলে তোমার বদনাম হবে!

রাইমোহন বললো, যা যা বেটী, বেশী বকিসনি। ওকে তোর বিছ্‌নায় শুয়ে নাচ দেকা! কী ছোটবাবু, বিছ্‌নায় শুয়ে এখুনো নাচ...বেশ ভালো লাগবে না?

নবীনকুমার তার কথার প্রতিধ্বনি করে বললো, হ্যাঁ...বিছ্‌নায় শুয়ে...নাচ... আমায় দাও বিছ্‌না...

কমলাসুন্দরী বললো, ছি, বাবু, তোমায় অমন কতা বলতে নেই। আমি তোমার কে হই, তুমি জানো না? আমি যে তোমার মায়ের মতন!

নবীনকুমার অতিকষ্টে চোখ খুলে বললো, কই? যাঃ! কে বললে তুমি আমার মায়ের মতন! আমার মা ভগবতী ঠাকুরকে যেমন দেকতে সেইরকম।

কমলাসুন্দরী বললো, তা হোক, তবু আমিও তোমার মায়ের মতন। তোমার বাপ যে আমার কাচে আসতেন, আমায় তিনি দয়া কত্তেন!

রাইমোহন বললো, তাতে কী হয়েচে, বাপ বেটায় কী এক জায়গা থেকে সওদা করে না? তুই দোকান খুলে বসিচিস, কখন বাপ এলো, কখন ছেলে এলো, অত হিসেবে তোর দরকার কী?

কমলাসুন্দরী বললো, তোর মুকে পোকা পড়বে! শেয়াল-কুকুরে তোমায় ছিঁড়ে খাবে!

রাইমোহন সে অভিশাপে ভ্রূক্ষেপ না করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললো, মা! তোর বড় মা হবার শক, না রে কম্‌লী! কুলটা স্বৈরিণী, বাজারের মাগী! তোর মতন বেশ্যারা কখ্‌নো কারুর মা হয় না, ভগ্নী হয় না, কন্যা হয় না! যে বেশ্যা সে বেশ্যাই, আর কিছু না। বেশ্যার সন্তান কখ্‌নো ভদ্দরলোক হয় না। এখন ছোট-বাবুকে ঘরে নিয়ে যা! বিছ্‌নায় তোল! চলুন ছোটবাবু।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কোতায়? আমি কোতায় যাবো!

রাইমোহন বললো, বিছ্‌নায়। শুয়ে শুয়ে নাচ দেকবেন।

রাইমোহন পিছন থেকে সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই নবীনকুমার টলতে টলতে এগিয়ে গেল। কমলাসুন্দরী দরজার কাছে দু' হাত ছড়িয়ে বললো, না, কিছুতেই না, ওগো তুমি এমন ভালো মানুষের ছেলের এমন সব্বোনাশ করো না—

রাইমোহন যেন প্রতিশোধস্পৃহায় একেবারে মেতে উঠেছে। রুক্ষভাবে কমলা-সুন্দরীকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, সর! দেকচিস না বাবুর কষ্ট হচ্চে! বাবু তোর বিছ্‌নায় শোবেন।

নবীনকুমার বললো, আমি শোবো...ওগো আমায় শুতে দাও—

নবীনকুমারকে কমলাসুন্দরীর বুকের ওপর ঠেলে দিয়ে রাইমোহন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে বাইরে থেকে শিকলি তুলে দিল।

তারপর সে নাচতে লাগলো ধেই ধেই করে। সে কি প্রবল নাচ! যেন কোনো রোগা, চিমসে ধরা বৃদ্ধ মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য। সেই সঙ্গে হাসি এবং হাততালি।

অন্য ইয়াররা যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা বললো, এ কি, মাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি বুড়োটার? অ্যাঁ?

রাইমোহন নাচ থামিয়ে ফেললো অবিলম্বেই। এখনো তার কাজ ফুরোয়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। এখন তাকে বিধুশেখরের বাড়ি যেতে হবে। এত বড় একটা সংবাদ তাকে না জানালেই নয়। আর বিধুশেখর যদি এই রাত্রেই এসে স্বচক্ষে দেখে যেতে চান, তা হলে তো সোনায় সোহাগা!

ইব্রাহিমপুর পরগণার বিরাহিমপুর গঞ্জের নদীতীরে বাঁধানো ঘাটের হাতলায় বসে আছে একজন মানুষ। মানুষটি বেশ দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠকায়, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, মুখে গুম্ফ-দাড়ির জঙ্গল, শরীরের বর্ণ তামাটে। লোকটির পরণে একটি ধুতি লুঙ্গির মতন ফেরতা দিয়ে বাঁধা, কোমর থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। শীতের প্রাতঃকাল, বাতাসে বেশ শিরশিরে ভাব, কিন্তু লোকটির সেদিকে কোনো হুঁসই নেই, সে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছে জলের দিকে।

লোকটিকে দেখলে কোনো সন্ন্যাসী বা দরবেশ বলে বোধ হয়, কিন্তু অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য তার কোনো প্রয়াস নেই। সে স্থাণুবৎ ঐ একই জায়গায় বসে আছে দীর্ঘ সময় ধরে, চক্ষু জলের দিকে নিবন্ধ, যেন সে পাঠ করতে চায় নদীর তরঙ্গের ভাষা।

বিরাহিমপুরের গঞ্জ এক সময় ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে আশপাশের বিশ পঞ্চাশখানা গ্রাম থেকে মানুষজন আসতো এখানে সওদা করতে। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে সেই গঞ্জ ভেঙে গেছে, হাটখোলায় কতকগুলি চালা এখনো টিঁকে আছে, কিন্তু মানুষজন আর আসে না। নদীর পাড় ভাঙলে অনেক সময় গঞ্জ-বাজার স্থান বদল করে, কিন্তু এখানে নদী বেশ শান্ত, তবু অন্য গ্রামের লোক পারতপক্ষে বিরাহিমপুরে এখন পা দিতে চায় না। ভয় পায়।

ঘাটে কিছু কিছু নারী-পুরুষ স্নান করতে আসে। নদীর পাড়ের মানুষের তো নদীকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না। তবু স্নানের চেয়ে বিশ্রম্ভালাপে আর বেশী সময় কাটায় না কেউ আগের মতন, রমণীরা কলসী নিয়ে জল ভরতে এসে বারবার জল ফেলে জল ভরে না, ত্রস্তে চলে যায়। এরকম সকাল থেকেই আসছে তারা, চকিত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখছে এই আগন্তুককে। কিন্তু লোকটির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিরাহিমপুর পরগণাটি মুসলমান প্রধান, দু-চার ঘর হিন্দু পরিবারও রয়েছে। সকলেরই এখন ছন্নছাড়া দশা। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কৌতূহলও বাড়তে লাগলো। একই স্থানে ঠায় বসে থাকা এই মানুষটি কে? গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, বাহুতে তাবিজ মাদুলি নেই, ললাটে চন্দন নেই, চুল চূড়া করে বাঁধা নয় বলে মুসলমানরা তাকে স্বজাতীয় কোনো ধর্মিষ্ঠ মানুষ বলে ধরে নেয়। কয়েকজন নিম্নস্বরে লোকটি বিষয়ে আলোচনা করে। শেষ পর্যন্ত দু-একজন এগিয়ে এসে বললো, ছালাম আলেকুম, ফকির ছায়েব! এহানে বেশীক্ষণ বসবেন না, আমাগো গেরামে আছেন।

লোকটি কয়েকবার ডাকাডাকির পর মুখ তুলে তাকালো। ভাষাহীন নিথর দৃষ্টি, শান্ত কিন্তু জোরালো। কোনো উত্তর দিল না। লোকগুলি বারংবার ঐ একই কথা বললো, তবু এই মানুষটির কোনো সাড়া নেই। আবার তার চক্ষু জলের দিকে নিবন্ধ।

প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মানুষটি একটি বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। মন্ত্রচালিতের মতন এগিয়ে গেল জলের দিকে। বুক জলে যাবার পর সে ডুব

দিল। ঘাটে স্নানরত কয়েকজন নারী-পুরুষ সবিস্ময়ে দেখছে লোকটিকে। কিন্তু সে ডুব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠলো না. বেশ সময় কেটে গেল. তবে কি সে আত্মঘাতী হলো? প্রায় নদীর মধ্যস্থলে ভুস্ করে জেগে উঠলো তার মাথা, ধীর, সাবলীল-ভাবে সন্তরণ করে আবার সে ফিরে এলো তীরে। তারপরও সে আর একটি বিস্ময়কর কাজ করলো, ঘাটের পাশ থেকে একটুখানি মাটি তুলে জিভে ঠেকালো। এতক্ষণে যেন শীত বোধ হলো তার শরীরে, প্রবল ঝাঁকুনি লাগলো তার সর্বাঙ্গে।

এবার সে নিজে থেকেই স্নানার্থীদের কাছে এগিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো. শেখ জামালুদ্দীনকে চেনো? তার বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিতে পারো?

লোকগুলি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতাকি করলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, কোন্ শ্যাখ জামালুদ্দীনের কথা কইত্যাছেন, ছায়েব? হে কেডা?

আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলো. শেখ জামালুদ্দীন এ গেরামে থাকে না? তোমরা তাকে চেনো না?

চিনবে না কেন, সবাই চেনে। কিন্তু শেখ জামালুদ্দীন এমনই একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ যে তার সম্পর্কে বিদেশ থেকে আসা কোনো ব্যক্তি শুদ্ধ ভাষায় খোঁজ করবে, এ কথা বিশ্বাসই হয় না। শেখ জামালুদ্দীনের মতন লোকেদের নিজের পরিবারের বাইরে কোনো মূল্যই নেই। তবে কি এতদিন পর জামালুদ্দীনের নসীব বদলালো? আল্লাতালার কাছ থেকে কোনো ফেরেস্তা এসেছেন তার সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেবার জন্য?

তখন সকলে সেই আগন্তুককে নিয়ে চললো গ্রামের দিকে। খবর ছুটে গেল আরও দ্রুত। নদী-তীরের এক রহস্যময় পুরুষ এসেছে জামালুদ্দীনের সন্ধানে. গ্রামের ঘর বাড়ি থেকে অনেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লো ওই লোকটিকে দেখবার জন্য। বলবান, নগ্নগাত্র পুরুষটি সিক্ত বসনে হেঁটে চলেছেন. চারদিকে দেখছেন মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। গ্রামের অনেকগুলি বাড়ি ভাঙা, অনেক গৃহ পরিত্যক্ত, কেমন যেন একটা শ্রীহীন ছন্দহীন ভাব। গোরুগুলি এত কৃশকায় যে ওদের দেখলেই ওদের মনিবদের অবস্থা টের পাওয়া যায়।

জামালুদ্দীন শেখ নিজের বাড়ির উঠোনে বসে নারকোল ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল, বাইরে মনুষ্যকণ্ঠের গোলযোগ শুনেই সে সব কিছু ফেলে দৌড়ে গোয়াল ঘরের পিছনে লুকোলো। লোকেরা তাকে ডাকতে লাগলো, জামাল? এ জামাইল্লা, বাড়ায়ে আয়, দ্যাখ আইস্যা...। কয়েকজন হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ভেতরে, এদিক ওদিক খুঁজে গোয়ালঘর থেকে টেনে নিয়ে এলো জামালকে। সে তখন ভয়ে শালিক পাখির মতন থরথর করে কাঁপছে।

জামালুদ্দীনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়, অতিশয় শীর্ণ চেহারা, বক্ষের পাঁজরা ক'খানা পরিষ্কার গোনা যায়, পরণে একটি নেংটি। সবচেয়ে বেশী দৈন্যের ছায়া তার তৈলাক্ত মুখখানিতে মাখানো। সে বোধ হয় জীবনে কখনো কারুর সামনে, এমনকি নিজের সন্তানের সামনেও একটিও অহংকারের বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি।

আগন্তুকটি জামালুদ্দীনকে দেখে যেন অত্যন্ত নিরাশ হলো। সবিস্ময়ে বললো, তুমি...তোমার নাম জামালুদ্দীন শেখ?

জামালুদ্দীন হাত জোড় করে বললো, আইজ্ঞা হুজুর, মুই জামালুদ্দীন শ্যাখ...ছায়েবগো হুকুইম কহনো অমাইন্য করি নাই।

আগন্তুক আবার বললো, তুমি সত্যি জামালুদ্দীন? তোমার টানে আমি এসিচি।

জামালুদ্দীন বললো, আমার কিছু গোস্তাকি হইলে মাফ্ করবেন, হুজুর!

—তোমার বিবিকে ফিরে পেয়েচো?

সবাই আবার তাজ্জব। বাইরের জগৎ থেকে একজন মানুষ এসে জামালুদ্দীনের পত্নীর কথা বলছে। ইনি জামালুদ্দীনের পত্নীকে ফিরিয়ে দেবেন, ইনি কি জাদুকর?

জামালুদ্দীন বিড়বিড় করে বললো, আমার বিবিরে ফিরা পামু...ক্যামনে?

—তোমার বউ হানিফাবিবিকে ওরা ধরে নিয়ে গেস্‌লো।

—আইজ্ঞা না, হুজুর, আমার বিবির নাম ফতিমা...গত সনে ইন্তেকাল হইয়ে গ্যাছে তার...তিনডা পোলাপানরে থুইয়া।

—ফতিমা? তবে কি আমি নাম ভুলে গেচি? আমার যতদূর মনে পড়ে... জামালুদ্দীন শেখ...তার অন্য রকম চেহারা...তার বিবির নাম হানিফা।

এবার একজন মাতব্বর গোছের বৃদ্ধ এগিয়ে এসে লুঙ্গির গিণ্ট ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, আপনে কার কথা জিগাইত্যাছেন? জামালুদ্দীনের বিবির কথায় আপনের কাম কী?

আগন্তুক কিছুক্ষণ মাটির দিকে নীরবে চেয়ে রইলো, তার ললাট কুঞ্চিত। একটুক্ষণ পর মুখ তুলে সে বললো, এই গ্রামে একজন জামালুদ্দীন শেখ ছিল না? যার বউ হানিফা বিবিকে নীলকর সাহেবদের কুঠিতে জোর করে ধরে নিয়ে গেস্‌লো?

এবার সকলে হই হই করে উঠলো। এ যে অনেক পুরোনো কথা। হ্যাঁ, ম্যাকগরগর সাহেবের গোমস্তা গোলোক দাস হানিফা বিবিকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল বটে। তখন তাগড়া জোয়ান জামালুদ্দীন শেখ কারুর নিষেধ না শুনে গোঁয়ারের মতন সাহেবদের কুঠিতে গিয়েছিল বিবির খোঁজ নিতে। তারপর থেকে কেউ আর তাদের খোঁজ জানে না। কেই বা তাদের কথা মনে রাখবে, তারপর আরও কত ঘটনা ঘটেছে এ গ্রামে। এই যে কাদের মিঞা, এক চক্ষু কানা, এর চক্ষুটা গেল গত শীতে, ডানকান সাহেব ঠিক এর ঐ চক্ষুটার ওপর সপাটে চাবুক কষিয়েছিলেন। এই যে মইনুদ্দিন সর্বক্ষণ পাগলের মতন বিড়বিড় করে, তারও তো এমন দশা হয়েছে মারের চোটে, আর তোরাব মিঞা, সে এখানে নেই অবশ্য, তার বিবিকেও ধরে নিয়ে গেছে সাহেবদের অনুচরেরা...তোরাব মিঞারও দেওয়ানা হবার মতন অবস্থা...।

অনেক লোকের চিৎকার হট্টগোলের মধ্যে আগন্তুক এই সব কথা শুনলো। সে ভুল জামালুদ্দীন শেখের কাছে এসেছে। এবার তাকে নিয়ে যাওয়া হলো নিরুদ্দিষ্ট জামালুদ্দীন শেখের বাড়িতে। সেখানে জামালুদ্দীনের বৃদ্ধ পিতা এখনো জীবিত, চোখে একেবারেই দেখতে পায় না। আগন্তুক সেই বৃদ্ধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শান্তভাবে বললো, আমি তোমার ছেলের সন্ধান করবো বলে কথা দিয়েচিলুম, তারপর আমার কী যেন মতিভ্রম হলো, সে কথা রাখিনি, কিন্তু সেই টানে আমি আবার ফিরে এসিচি।

বৃদ্ধ এই আগন্তুকের কথা প্রায় কিছুই বুঝতে পারলো না। তার হাত জড়িয়ে ধরে খুঁ খুঁ শব্দে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আগন্তুক এদিক ওদিক চাইতে

লাগলো অস্থিরভাবে। যেন তার পরবর্তী কর্মটি কী হবে তা সে ঠিক করতে পারছে না।

এই সময় কিছু দূরে শোনা গেল হট্টগোল। গ্রাম্য পথ দিয়ে আসছে দুজন অশ্বারোহী, তাদের সামনে দিয়ে সভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটছে কিছু ছেলে-মেয়ে। এখানকার এরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো অশ্বারোহীদের দেখে। তারা আগন্তুকটিকে অনুরোধ করতে লাগলো কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে লুকোতে, কারণ সবল চেহারার মানুষ দেখলে নীলকররা অকারণে অত্যাচার করতে প্রলুব্ধ হয় কিংবা জোর করে মজুরি খাটাবার জন্য কুঠিতে ধরে নিয়ে যায়। আগন্তুক সে সব অনুরোধে কর্ণপাত করলো না, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইলো সেই একই জায়গায়।

অশ্বারোহী দুজনেই সাহেব, তাদের পেছনে পেছনে পদব্রজে আসছে নীলকুঠির গোমস্তা গোলক দাস এবং কয়েকজন লাঠিয়াল। তারা যে এই গ্রাম পরিদর্শনেই বেরিয়েছে তা নয়, কিছু দূরেই নদীতে চড়া পড়েছে এবং স্বভাবতই সে চর গেছে সাহেবদের দখলে, সেই চরে যেতে হলে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলে পথ কম হয়। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে সাহেবদের চেহারা দেখিয়ে গ্রামবাসীদের ভয় পাওয়ানো দরকার।

ভিড়ের অনেকেই ছুটে গিয়ে লুকোলো, দু-চারজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইলো আগন্তুকের পাশে। সাহেব দুজন পরস্পর কথাবার্তায় মগ্ন, গ্রামের লোকের দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। কিন্তু গোলক দাসের তীক্ষ্ন চোখ ঠিক পড়লো এদিকে। থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, এ বেটা আবার কেডা রে? এডারে তো আগে দেহি নাই!

একজন বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললো, হুজুর, এ আমার ফুফাতো ভাই। ভেন্ন গেরামে থাকে।

গোলক দাস লোকটির আপদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বললো, হুঁ, চ্যাহারাখান তো দেহি ষন্ডার মতন, ডাকাইতি করে নাকি? এই, তোর নাম কী?

আগন্তুক কোনো উত্তর দিল না।

সেই বৃদ্ধটি আবার বললো, হুজুর, অর মাথার ঠিক নাই, বায়ু রোগ হইছে, পাকিমুড়া গেরামে মোর ফুফার বাড়িতে...

গোলক দাস একটুক্ষণ দ্বিধা করলো। তারপর মনস্থির করে পেছনের লাঠিয়ালদের উদ্দেশে বললো, ল, ল, দৌড়াইয়া আগা—।

ভয়-দেখানো দলটি চলে যাবার পর উপযাচক উপকারী বৃদ্ধটি বললো, বড় বাঁচা বাঁইচ্যা গ্যালেন, ছায়েব! এবার কন্ তো আপনি কেডা, কোন্ দ্যাশ থনে আইছেন?

—আমি গঙ্গানারায়ণ সিংহ।

এই নাম গ্রামবাসীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো না। সাধারণ প্রজারা জমিদারের নাম মনে রাখে না, বা সে ব্যাপারে মাথাও ঘামায় না। তারা জমিদারকে চেনে জমিদারের কর্মচারীদের দিয়ে। কর্মচারীরা যাকে খাতির করে নিয়ে আসে সে-ই জমিদার। জমিদার বদলায় কিন্তু কর্মচারীরা তো বদলায় না। তা ছাড়া জমিদারের সঙ্গে এ গ্রামের সম্পর্কও নেই অনেকদিন। তাদের জমিদার তাদের বিপদের সময় নীলকর সাহেবদের দিকে ঠেলে দিয়ে দূরে সরে গেছে।

তবে হিন্দু নাম শুনে অনেকের মধ্যে নতুনভাবে বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। দু একজন বৃদ্ধ সিংহ পদবীটিতে জমিদারী গন্ধ পেল কিছুটা, কিন্তু এই নগ্নদেহ,

উন্মাদের মতন চেহারার মানুষটিকে জমিদার পরিবারের একজন মনে করার মতন স্মৃতি অতদূর প্রসারিত হলো না।

গঙ্গানারায়ণ আপনমনে বললো, আমি থাকবো এখেনে...আমি কোতায় থাকবো? তোমরা আমায় থাকতে দেবে? আমি তৃষ্ণার্ত, তোমরা কেউ একটু জল খাওয়াবে আমায়?

একজন বললো, আপনে হেঁদু, আপনে আমাগো মইধ্যে থাকবেন ক্যামনে? হেঁদু পাড়ায় যান গিয়া।

আর একজন বললো, আপনে পলান এহান থিকা, আপনে বিপদে পড়বেন!

গঙ্গানারায়ণ তখনও চিন্তিত। অন্যদের কথা ভালোভাবে শুনছে না। ললাট কুঞ্চিত করে বললো, এখেনে আমাদের কে যেন থাকতো? কী যেন নাম! ও, ভুজঙ্গ, সে আচে এখনো?

অনেকেই ভুজঙ্গকে চেনে। বছর পাঁচেক আগে জমিদারী আমলে সেই-তো আসতো খাজনা আদায় করতে। তারা হই-হই করে উঠলো। হ্যাঁ, আছে। ভুজঙ্গ নায়েব এখনো আছে কুটিবাড়িতে।

এবার গ্রামবাসীরা গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে চললো কুঠিবাড়ির দিকে।

কুঠিবাড়িটি গ্রামের এক প্রান্তে। এক সময়ে এখানে বেশ কয়েকজন কর্মচারী ছিল, জমিদাররা মহাল পরিদর্শনে এলে এখানে দু-একদিন অবস্থান করতেন। এখন জমিদারী কাজকর্ম এ অঞ্চলে কিছুই নেই, কুঠিবাড়িটি টিঁকে আছে কোনো-ক্রমে, বেতনভুক কর্মচারীর সংখ্যা চারজনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন কুঠি ছেড়ে নিজ গ্রামেই বসবাস করছে। ভুজঙ্গ নায়েব অবশ্য কুঠিবাড়িতেই মৌরসীপাট্টা গেড়ে আছে, তার ধারণা জমিদাররা এ অঞ্চলে আর কোনোদিন আসবে না, কুঠি সংলগ্ন বিষয়-সম্পত্তি তারই ভোগে লাগবে। নীলকররাও এদিকের সমস্ত জমিই কুক্ষিগত করলেও জমিদারী কুঠিতে হস্তক্ষেপ করেনি।

অনেকদিন বাদে প্রজাদের দল বেঁধে এদিকে আসতে দেখে ভুজঙ্গ নায়েব বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলো। দৈর্ঘ্য কিছু কম হলেও তার শরীরটি সুগঠিত, ডান বাহুতে একটি বড় রুপোর তাগা বাঁধা, ওষ্ঠের ওপর পাকানো গুম্ফ। লাল পেড়ে ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো, গলায় মালার মতন ভাঁজ করা মোটা সাদা ধপ-ধপে উপবীত। ভুজঙ্গ তন্ত্রসাধনা করে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাকে তান্ত্রিক হিসেবেও সমীহ করে খানিকটা।

ভিড় ছেড়ে এগিয়ে এসে গঙ্গানারায়ণ বললো, কেমন আচো, ভুজঙ্গ? আমি আবার ফিরে এসিচি।

ভুজঙ্গ চক্ষু সরু করে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো এই লোকটির দিকে। তারপর ওষ্ঠের কোণে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়ে বললো, তুই কেডা? ফিরা আইছস মানে? বেহ্মদৈত্যি নাকি? তা দিনের বেলা কী মনে কইর‍্যা?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি আমায় চিনতে পারচো না? আমি তোমার মনিব।

ভুজঙ্গ বললো, আমার মনিব? হেঃ, হে-হে-হে-হে! দিনের বেলা এক বেহ্ম-দৈত্যি আইস্যা কয় কি না আমার মনিব।

প্রজাদের দিকে ফিরে সে ধমক দিয়ে বললো, ব্যাটারা কোন্ পাগলা-ছাগলারে ধইরা আনছস! অ্যাঁ? খেলা পাইছস?

গঙ্গানারায়ণ এক পা এগিয়ে এসে বললো, ভুজঙ্গ, তোমার মনে নেই? আমি

গঙ্গানারায়ণ সিংহ। এক রাত্রে বোট থেকে হটাৎ চলে গিসলুম, আমার মতিভ্রম হয়েছিল—

ভুজঙ্গ এবার হাত জোড় করে বললো, হুজুর, আমার মাথাডা গরম করাইবেন না। এই চাষাভূষারা জানে, আমি একবার ক্ষ্যাপলে বড় সাংঘাতিক। এ পইর্যন্ত পাঁচ ছয়জন আইসা কইছে, মুই গঙ্গানারায়াইন, তোমাগো মনিব! হেঃ! হে-হে-হে! আরে, হারামজাদা কোঁৎকা খাইতে না চাস তো আহনো পলা!

গঙ্গানারায়ণ হাসলো। মুখের জঙ্গল ভেদ করে দেখা গেল তার ধবল দন্ত-পঙক্তি। মৃদু স্বরে সে বললো, অনেক দিন হয়ে গ্যাচে, চিনতে না পারারই কথা। আমি নিজেই তো তোমায় দেকে ঠিক চিনতে পারিনি, ভুজঙ্গ। তোমার চুলে পাক ধরেচে! কুঠিবাড়ির পাশে এমন জঙ্গলও আগে দেকিনি। একটা কামরা সাফ সুতরো করো, আমি এখন এখেনে থাকবো।

—থাকবে? এটা কি তোমার বাপের জমিদারি?

—আমার বাপের জমিদারিই বটে! আমার না হোক, আমার বাপের তো নিশ্চয়ই। আমি রামকমল সিংহের পুত্র গঙ্গানারায়ণ!

—তুমি যদি রামকমল সিংহের ছেলে হও, তা হলে আমি নবাব সিরাজদৌল্লার নাতি! যত সব! গঙ্গানারায়ণ সিংহী মইরা ভূত হইয়া গ্যাছে কবে! তেনার ছেরাদ্দ-শান্তি পইর্যন্ত হইয়া গ্যাছে।

—আমি মরে যাইনি, ভুজঙ্গ। সন্ন্যাসী হয়ে গিসলাম। কেন মিচিমিচি সময়ের অপচয় কর্চো!

—এ যে দেহি জাল পরতাপ চান্দের মামলা। তুমি যদি গঙ্গানারায়ণ হও, তা হলে এহানে ক্যান, কইলকাতায় যাও, সিংহ পরিবারের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা লড়ো? সেহানে গিয়া নিজের জমিদারির হিস্যা বুইঝ্যা লও, আমি কী করুম!

মামলা-মোকদ্দমা লড়বার দরকার হবে না। আমার মা বেঁচে আছেন আশা করি, তাঁকে খবর পাঠাতে হবে একটা।

ভুজঙ্গ আরও কিছুক্ষণ ধরে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো একজন পরামানিক ডেকে আনতে। প্রজারা এতক্ষণ গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে এই নাট্যকৌতুক উপভোগ করছিল। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে এমন আমোদ সহসা আসে না। তারাই কয়েকজন ছুটে গিয়ে হিন্দুপাড়া থেকে ধরে আনলো একজন পরামানিক।

কুঠির সামনে একটি বকুল গাছের নিচে মাটিতেই জোড়াসন করে বসলো গঙ্গানারায়ণ। পরামানিকের কাঁচিতে তার পাচ বৎসরের বর্ধিত কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু খসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো প্রজারা। এই চেহারা আর কোনোক্রমেই চিনতে ভুল হবার কথা নয়। এই গঙ্গানারায়ণকে তারা শুধু যে আগে দেখেছে তা নয়, ভূতপূর্ব জমিদার রামকমল সিংহের সঙ্গেও এর মুখের যথেষ্ট আদল আছে।

ভুজঙ্গ নায়েবেরও আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই সে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তার সামনেই। নিতান্ত ব্রাহ্মণ বলেই সে জমিদারের পদধূলি গ্রহণ করলো না।

এই গঙ্গানারায়ণকে দেখে সকলে নির্ভুলভাবে চিনতে পারলেও আগেকার গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে অমিলও অনেক। সেই লাজুক, অন্তর্মুখী, নমনীয় শরীরের

যুবকটি আর নেই। এখন সে মানুষের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারে. তার কণ্ঠস্বর গভীর ও ভরাট, তার নীরবতার মধ্যেও অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নেই।

ধীর পায়ে হেঁটে সে এগিয়ে গেল কুঠিবাড়ির দিকে।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও বিন্দুবাসিনীর আর নাগাল পায়নি গঙ্গানারায়ণ। তখন সে নিজেও বিশেষ সন্তরণ পটু ছিল না, রাত্রির অন্ধকারে মধ্য গঙ্গায় এক নিমজ্জিতাকে উদ্ধার করার সাধ্যও ছিল না তার। বিন্দু হারিয়ে গেল এবং সে নিজে যে কী প্রকারে বেঁচে গেল, তা সে আজও জানে না। জলে পড়ার একটু-ক্ষণের মধ্যেই সে চেতনা হারিয়েছিল, জ্ঞান হবার পর দেখলো সে নদীর ধারে কর্দমাক্ত এক ঝোপের মধ্যে শুয়ে আছে। জীবন ধারণের বাসনা আর ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু মৃত্যুর দেবতা তাকে কৃপা করেনি।

এর পর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছে সে। বারানসীতেও কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিল, তারপর সে অগ্রসর হয়েছে গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণের দিকে। পাটনা পর্যন্ত এসে সে আবার গতি পরিবর্তন করেছিল, বাংলাদেশে ফিরতে তার একটুও ইচ্ছে হয়নি। সে মুখ ফিরিয়েছে উত্তর ভারতের দিকে। হরিদ্বার-লছমনঝোলা পেরিয়ে সে গঙ্গোত্রি পর্যন্তও গিয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল, হিমালয়ের ক্রোড়েই বাকি জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে।

বিস্ময়ের কথা এই যে বিন্দুবাসিনী সম্পর্কে সে আর তেমন শোক ব্যথা অনুভব করেনি। বারানসীতে বিন্দুবাসিনীকে দেখার আগে পর্যন্ত যে তীব্র ব্যাকুলতা বোধ ছিল, পরবর্তী কালে তা কোথায় হারিয়ে গেল। জলের অতলে বিন্দুবাসিনীর মৃত্যু যেন তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। লছমনঝোলা-গঙ্গোত্রী, যেখানে পাহাড় ও আকাশের মতন বিশালদের রাজত্ব, সেখানে আর অন্য ক্ষুদ্র কথা মনে স্থান পায় না।

কিছুদিনের জন্য গেরুয়া ধারণ করেছিল গঙ্গানারায়ণ। এই দেশে গেরুয়া-ধারী সন্ন্যাসীদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না। নদীতীরে চুপ করে বসে থাকলেও কেউ না কেউ এসে কিছু দিয়ে যায়। হরিদ্বারে বড় বড় সাধুদের আখড়া আছে. সেখানে ভিড়ে গেলে কেউ কোনো প্রশ্ন করে না। ডাল-পুরী ভোজের সময় অনায়াসে বসে পড়া যায় এক ধারে। কয়েক বৎসর সে তার মনকে যেন ছুটি দিয়ে শুধু শরীর নিয়ে বেঁচে ছিল। তখন গঙ্গানারায়ণকে দেখা যেত হৃষীকেশে পূর্ণাবতার বাবার আখড়ায় প্রতি সন্ধেবেলা অন্যান্য চেলাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভজন গান গাইছে।

কিন্তু মনের ঘুম এক সময় ভাঙবেই। জাগ্রত অবস্থায় না হোক স্বপ্নে। মানুষ অভ্যেসের দাস হতে হতেও একদিন হঠাৎ শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে গতানুগতিকতার বন্ধন। সুমহান প্রকৃতিও এক সময় আকর্ষণহীন হয়ে যেতে পারে। গঙ্গানারায়ণও একদিন শরীরে সেই রকম চাঞ্চল্য বোধ করলো। নিজেকেই নিজে এক সময় সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, তারপর থেকে দেব-দ্বিজের প্রতি সে আর কিছুতেই ভক্তিমান হতে পারে না। হিমালয়ের অধিকাংশ সাধুকেই তার

আচারসর্বস্ব, উদ্দেশ্যহীন মানুষ বলে মনে হয়। প্রায়ই আখড়াগুলিতে ধুমধাম করে নানারকম যজ্ঞ হয়, তাতে অনেক ঘি পোড়ে, গঙ্গানারায়ণের কাছে এ সবই নিছক শিশু-ক্রীড়ার মতন। বিশাল চেহারার এক-একজন সাধু যেন এক-একটি শিশু, তবু শিশুর সাহচর্যই বা পূর্ণবয়স্ক মানুষের কতক্ষণ ভালো লাগে? নিরাকার, নির্বিকল্প ঈশ্বরের উপলব্ধিই যদি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তার জন্য পাহাড় কন্দরে কৃচ্ছ্রসাধনের তো কোনো প্রয়োজন নেই।

একদিন গঙ্গানারায়ণ পাহাড় ছেড়ে আবার সমতলে ফিরে আসা মনস্থ করলো। কিন্তু কোথায় ফিরবে? এতগুলি বৎসর পর সে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে কোন্ মুখে? জননী বিম্ববতীর সামনে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে নাটকীয় ভাবে বলবে, মা, আমি এসেছি। বিম্ববতী এখনো জীবিত আছেন কিনা তারই বা ঠিক কী! বরং যেখান থেকে সে ছেদ টেনেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করা যেতে পারে।

হৃষীকেশে পূর্ণাবতার বাবার আশ্রমে থাকার কালে সে পর পর দু রাত্রি একই স্বপ্ন দেখেছিল। একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান হাপুস নয়নে কাঁদছে, আর গঙ্গানারায়ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে যে আমি তোমার পুত্রের সন্ধান পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা করবো। এরূপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর গঙ্গানারায়ণ খুব অবসন্ন বোধ করে। তার জীবনের ঐ পর্বটির স্মৃতি তার কাছে খুবই আবছা। এক মধ্য নিশীথে সে বজরা থেকে নেমে স্বপ্নচালিতের মতন এক দল তীর্থযাত্রীর সঙ্গ নিয়েছিল, ঠিক যেন ঘোরের দশা তখন তার, সেই ঘোর ভেঙেছিল প্রয়াগ তীর্থে এসে স্নান করার পর।

সে এক বৃদ্ধের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, স্বপ্নলব্ধ এই বোধ তাকে পীড়া দেয়। তার মনে পড়ে ইব্রাহিমপুরের কথা। যেন তার বজরা এখনো সেখানকার ঘাটে বাঁধা আছে তার অপেক্ষায়। সে আবার সেখানে ফিরে গেলেই নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করা যাবে। গঙ্গানারায়ণ তাই ইব্রাহিমপুর ফিরে আসে।

কুঠিবাড়িতে আশ্রয় নেবার পর গঙ্গানারায়ণ দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে যে সিপাহী বিদ্রোহের মতন একটা এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে, তাও সে জানে না। কোম্পানির রাজত্ব শেষ, এখন চলছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য বহুদর্শী লোক, অনেক কিছুর খবরা-খবর রাখে। সে ইতিমধ্যেই গঙ্গানারায়ণের আগমনবার্তা জানিয়ে একজন বিশ্বাসী লোক মারফত পত্র পাঠিয়েছে কলকাতায় বাবুদের কাছে। গঙ্গানারায়ণের সে খাতির যত্নও করছে যথেষ্ট।

গঙ্গানারায়ণ দেখলো, এই এলাকায় তাদের জমিদারি কাজকর্ম আর কিছুই নেই এখন। সব জমিই সাহেবদের কাছে ইজারা দেওয়া। তাদের নিজস্ব যে কিছু খাস জমি ছিল, সেখানে আখের চাষ দেওয়া হতো এবং কয়েকজন চায়নাম্যান সেখানে খুলেছিল একটা চিনি কল। সে সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই আর। আখের জমিতেও নীল চাষ হয়, চায়নাম্যানরা পালিয়েছে, চিনির কল তছনছ করে দিয়েছে কেউ। অথচ এক সময় ইব্রাহিমপুর পরগণাটি ছিল সিংহদের এস্টেটের প্রায় একটি সোনার খনি। এখন এর সবই নীলকরদের খপ্পরে।

নীলকর সাহেবরা যে সম্প্রতি কী করালরূপ ধারণ করেছে, সে খবরও ভুজঙ্গ

ভট্টাচার্য শোনায় তাকে। পোশাক রঞ্জিত করার জন্য ইওরোপের বাজারে নীলের খুব চাহিদা, আর বাংলাদেশের নীল অতি উৎকৃষ্ট ধরনের, তাই এর চাহিদাও বেশী। নীল চাষ করে চাষী যদি ন্যায্য দাম পায় তা হলে অন্য চাষের চেয়ে সেটা তার পক্ষে লাভজনকই হবে। সেইজন্যই রামমোহন-দ্বারকানাথের মতন মানুষও মনে করেছিলেন, নীল চাষ বাংলার চাষীদের উন্নতির সহায়ক হবে। কিছু কিছু জমিদারও নিজ জমিদারিতে নীল চাষে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসা অবিলম্বেই কুক্ষিগত করে নিল সাহেবরা এবং লাভের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তারা পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও জানে। কয়েক দশকের মধ্যেই চাষীদের শোষণ করতে করতে একেবারে ছিবড়েতে পরিণত করেছে তারা। সব চাষীই নীলকরদের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ এবং বছরের পর বছর সেই ঋণের বোঝা বাড়ছে। চাষীর জমিতে উৎপাদন যতই হোক, তাতে তার লাভ কিছুই নেই। নীলের বদলে ধান চাষ করলে চাষী তবু অন্তত সম্বৎসরের খোরাকী পায়, কিন্তু তার উপায় নেই, সাহেবদের অত্যাচারে তারা শুধু নীল চাষ করতেই বাধ্য। ব্যাপার এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, কোনো কোনো চাষী মরীয়া হয়ে চাষ করাই বন্ধ করে দিয়েছে এ বৎসর। চাষ করলেও অনাহার, না করলেও অনাহার, দুটোই যখন সমান, তখন চাষ না করাই তো ভালো। বর্তমানে অবস্থা সেইজন্য থমথমে।

গঙ্গানারায়ণ প্রতিদিনই একবার করে নিকটস্থ গ্রামগুলিতে পদব্রজে বেড়াতে যায়। ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য এটা পছন্দ করে না মোটেই। সে বরং গঙ্গানারায়ণকে পরামর্শ দেয় কলকাতায় চলে যাবার জন্য। তার ধারণা, খুব শীঘ্রই গ্রামদেশে একটা ব্যাপক গোলযোগ শুরু হবে, সুতরাং এখন এখান থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এ পরামর্শে কর্ণপাত করে না, এমন কি ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য তার সঙ্গে দু-একজন রক্ষী দেবার প্রস্তাব করলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। জমিদারি চাল-চলনে সে অনেকদিন অভ্যস্ত নয়, সে-জীবনের প্রতি আর কোনো মোহও তার নেই। একবার যে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছে সে আর কোনো রকম পোশাকী বন্ধনই মেনে নিতে চাইবে না। এখন সে স্বচ্ছন্দে নগ্ন পায়ে চলাফেরা করে, শুধু ধুতি পরিধান করে খালি গায়ে বাইরে বেরুতেও সে লোক-লজ্জা অনুভব করে না। ভুজঙ্গর অনেক পীড়াপীড়িতে সে গায়ে একটি উত্তরীয় জড়াতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু জুতো আর পায়ে দেয় না।

গঙ্গানারায়ণ নিজে আর জমিদার বলে পরিচয় দিতে না চাইলেও গ্রামবাসীদের চক্ষে সে জমিদার। তার চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রামে রটে গেছে, লোকের মুখে মুখে কাহিনী আরও পল্লবিত হয়। সাধারণ চাষী গৃহস্থেরা তার দিকে সম্ভ্রম ও ভয়ের দৃষ্টিতে তাকায়। চোখাচোখি হলে সেলাম জানায়। কেউ তার কাছে অন্তর খোলে না।

কয়েকদিন গঙ্গানারায়ণ এরকম গ্রামে ঘোরাঘুরি করার পর বৃদ্ধের দল তাকে সানুনয় অনুরোধ করলো আর তাকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করতে। তার জন্য নিরীহ লোকরা বিপদে পড়তে পারে। পাশের গ্রামের নবীনমাধব নামে এক দৃঢ়-চেতা যুবক এবং এ গ্রামের মহম্মদ রেজা খাঁ নামে এক বর্ধিষ্ণু চাষী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সদরে মামলা দায়ের করেছিল। তার ফলে সাহেবরা একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। মামলায় দুজনেই যদিও পরাজিত হয়েছে, তবু সাহেবদের ধারণা কেউ একজন এসব ব্যাপারে গ্রামের লোকদের প্ররোচনা দিচ্ছে। এবং গঙ্গানারায়ণের মতন একজন ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে সাহেবদের সন্দেহ হবেই।

বিপদ সত্যিই একদিন এলো।

বিরাহিমপুর কুঠিতেই একদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার একটি সংখ্যা হঠাৎ হাতে এলো গঙ্গানারায়ণের। আদ্যোপান্ত পত্রিকাটি পড়ে সে চমৎকৃত হলো, এ পত্রিকার প্রতি লাইনই যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সম্পাদকের নাম একজন কে হরিশ মুখার্জি, গঙ্গানারায়ণ তাকে চিনতে পারলো না। এমন চোস্ত ইংরেজি লেখে, নিশ্চয়ই হিন্দু কলেজের কোনো কৃতবিদ্য ছাত্রই হবে, কিন্তু হিন্দু কলেজের এ নামের কোনো ছাত্রের কথা গঙ্গানারায়ণের স্মরণে আসে না। পত্রিকার নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু মুসলমান চাষীদের সমস্যার কথাও সবিস্তারে লিখেছে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পড়েই গঙ্গানারায়ণ বারাসতের হাকিমের হুকুমনামার কথা জানতে পারলো। সরকার নীল চাষীদের প্রাণান্তকর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং নীলকর ব্যবসায়ীদের জোর জুলুম নীতির জন্য উদ্বিগ্ন। বারাসতের হাকিম সেইজন্যই তাঁর এলাকার থানার দারোগাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যে চাষীর নিজস্ব জমি আছে, সে তার জমিতে তার খুশীমতন ফসল চাষ করতে পারে। জবরদস্তি করে তার জমিতে যদি নীল চাষ করাতে যায় কেউ, তা হলে পুলিস তা প্রতিরোধ করবে।

এ সংবাদ পড়ে গঙ্গানারায়ণ যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। হানিফা বিবি এবং তার স্বামী জামালুদ্দীন শেখকে সে ফিরিয়ে আনতে পারেনি বটে কিন্তু হানিফা বিবি কিংবা জামালুদ্দীন শেখের মতন আর কেউ যাতে নীলকুঠিতে গিয়ে গুম খুন না হয়, সে ব্যবস্থা সে করতে পারে। তা ছাড়া পুলিসের সাহায্য যদি চাষীরা পায় তা হলে নীল-ফসলের বদলে বাংলার মাঠ আবার সোনার ধানে ভরে যাবে।

গঙ্গানারায়ণের প্রথমেই মনে হলো, গ্রামে গিয়ে চাষীদের সে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানাবে। সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে যদি নীল চাষ অস্বীকার করে তা হলে মুষ্টিমেয় নীলকর সাহেবরা কী করবে? বারাসতের চাষীরা যদি নীল চাষে বিরত হতে পারে তা হলে নদীয়াতেই বা পারবে না কেন?

পরে সে মাথা ঠান্ডা করে আরও কিছুক্ষণ ভাবে। এখনই নিরীহ, নির্জীব চাষীদের উস্কানি দিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে টেনে আনা ঠিক হবে না। আগে প্রস্তুতি দরকার। সবচেয়ে নিকটবর্তী থানাই এখান থেকে দশ মাইল দূরে। গঙ্গানারায়ণ নিজে যাবে সেখানে। তার আগে এই এলাকার চাষীদের মনোভাব যাচাই করে নিতে হবে। চাষীরা যদি একযোগে নীল চাষে অস্বীকার করতে রাজি থাকে, তা হলে পুলিস-সেপাইদের উপস্থিতিতে তারা একই দিনে সকলের জমিতে মই দেবে।

পরদিন সকালে এক বাটি দুধ ও কিছু ফলাহার করে গঙ্গানারায়ণ গেল গ্রামের দিকে। ছোট একটি ডোবার পাশে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, তার বক্ষটি এমনই লোমশ যে আর কোনো পোশাকের দরকার হয় না। চোখের দৃষ্টিতে একটা পাগল পাগল ভাব। লোকটির নাম তোরাপ। এর শরীরের গড়ন দেখলে মনে হয় যে এককালে সে বেশ বলশালী পুরুষ ছিল, এখন খাঁচাখানি মাত্রই সার। লোকটিকে গঙ্গানারায়ণ বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেছে একটি কারণে। অন্য গ্রামবাসীরা তাকে দেখলেই 'বাবু ছালাম' বলে সম্বোধন করে কপালে হাত তোলে, কিন্তু এই লোকটি কোনোদিন তাকে সেলাম জানায়নি, বরং গঙ্গানারায়ণের চোখের দিকে চোখ পড়লেই সে উল্টো দিকে

ঘুরে যায়।

আজ গঙ্গানারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এগিয়ে এলো তোরাপের দিকে। সে-ও অমনি পিছন ফিরে দাঁড়ালো এবং উৎকট গলায়, যেন অশ্বত্থ বৃক্ষটিকেই উদ্দেশ করে একটি গান ধরলো।

গঙ্গানারায়ণ গানটির কথার ঠিক মর্ম বুঝতে পারলো না। অনেকটা যেন এই রকমঃ

ব্যারালচোকো হাঁদা হেমদো
নীলকুটির নীল মেম্‌দো!

এই দুটি লাইনই সে গাইতে লাগলো বারবার। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই গান শুনে তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, কী মিঞা, কী গান গাইচো। ইদিকে ফিরে একটু ভালো করে গাও না, শুনি।

তোরাপ একটুখানি পাশ ফিরে ত্যারছা ভাবে দেখলো গঙ্গানারায়ণকে। তারপর বক্রস্বরে বললো, আমি পাগ্‌লা ছাগ্‌লা মনিষ্যি, আমি কী গান জানি! গান শোনবেন তো বেগুনবেড়েতে ঝান না ক্যান!

অপরকে প্রসন্ন করার জন্য মানুষ যেমন কণ্ঠস্বরে একটা কৃত্রিম অতিরিক্ত মিষ্টতা আনে, সেইভাবে গঙ্গানারায়ণ বললো, তুমি পাগল কেন হবে? বেশ তো গান গাইচিলে।

তোরাপ বললো, হ, পাগল হইছি, নীলির ঘায়ে পাগল হইছি।

তারপর সে সম্পূর্ণ ফিরে বললো, আগে জমিদারে মারছে, অহন মারে নীলির সাহেব। আমাগো ঝা জেবন, তায়ের আর বাচা আর মরা। পাগল হওনই সবঝে ভালো, খাই না খাই বগোল বাজাই। গান শোনবেন কইলেন, শোনেন তয়ঃ

ঘর ভাঙ্গিলে জমিদারে
জাত মাল্লে পাদরি ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।

গঙ্গানারায়ণের মুখে একটু অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠলো। সে যে জমিদার বংশের সন্তান একথা কেউ তাকে ভুলতে দেবে না। সে ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, জমিদার তোমার ঘর ভেঙেছেল? কবে?

তোরাপ এবার হা হা করে হেসে বললো, আমার তো ঘরই নাই, তা ভাঙবে কী? এ গানডা রচেছে আমার নানা বচোরদ্দি শ্যাখ। মোর ছ্যালো মোটে পাচ বিঘা জমি, তাও সাহেবরা নীলির জন্য দেগে দিয়েলো। হাল গরু ব্যাচে দেয়েছি, চাষই করমু না, তাও সুমুন্দির পো-রা ছাড়ে না।

এবার গঙ্গানারায়ণ উৎসাহের সঙ্গে বললো, শোনো, তোরাপ, তোমার জমিতে যদি তুমি নীল রুইতে না চাও, ধান রুইতে চাও, আমি তোমায় সাহায্য করবো।

কিন্তু এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। গ্রামে একটা হই হই রব উঠলো। দাবানলের তাড়া খাওয়া জন্তু-জানোয়ারদের মতন উদ্ভ্রান্ত ভাবে ছুটতে লাগলো মেয়ে-পুরুষ-শিশুরা। কুঠিয়াল সাহেবরা দলবল নিয়ে আসছে, সব জমি নীল চাষের জন্য দাগিয়ে দেবে। এবারে নাকি সাহেবরা এক ছটাক জমিও ছাড়বে না।

এমনকি পাগলা তোরাপও বুঝলো যে এই সময় গঙ্গানারায়ণ সাহেবদের নজরে পড়লে বিপদ ঘটবে। সে বললো, ও বাবু, যদি পরানে বাচতি চাও তো হুই পগারের পানে দৌড়ি পলাও! তুমি ভদ্দরনোক, তোমারে আগে বান্‌ধবে!

গঙ্গানারায়ণ তবু দাঁড়িয়ে রইলো। সে পালাবে কেন? ব্রিটিশ রাজত্বে

মহারানীর সমস্ত প্রজারই সমান অধিকার। লোভে উন্মত্ত কিছু ব্যবসায়ী যদি আইন ভাঙতে চায়, তা হলে তাদের শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। এরা রুল অব ল' মানতে বাধ্য।

যেমন প্রথা, সেই মত তিনজন সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে এবং তাদের দেওয়ান-গোমস্তা ও লাঠিয়ালের দলবল পিছন পিছন দৌড়ে দৌড়ে আসছে। অশ্বত্থ গাছের তলায় দণ্ডায়মান গঙ্গানারায়ণকে তারা দেখতেও পেল না, সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, তার পাশ থেকে তোরাপ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সাহেবরা সব কাজই অতি দ্রুত সারে। তাদের দলটি অবিলম্বেই বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। একটু পরেই গঙ্গানারায়ণ শুনতে পেল কান্নার রোল।

খুব বেশী দূরে নয়। সামনের আম বাগানটির ওপার থেকেই কান্নার শব্দ আসছে। গঙ্গানারায়ণ আর থাকতে পারলো না, এগিয়ে গেল সেদিকে।

সেখানে একজন সাহেব, একজন আমীন ও তিনজন লাঠিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন চাষী সাহেবের জানু ধরে কেঁদে কেঁদে বলছে, ও সাহেব, এ জমিডা ছেড়ে দেও, এডা মোগো পুকুর ধাইর্যা জমি, গেরামের মাইয়া মানষেরা এহানে গোছল করতে আসে, ও সাহেব!

সাহেব বারবার লাথি দিয়ে লোকটিকে ফেলে দিচ্ছে, সে আবার উঠে আসছে মিনতি জানাতে। গঙ্গানারায়ণ হন হন করে এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, স্টপ দিস! লিসন, ডু ইউ নো দি রিসেণ্ট পরোয়ানা অব দি গবরমেণ্ট?

কুঠিয়াল ম্যাকগ্রেগর বেশ কয়েক বৎসর এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তার বাংলা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হয়েছে। গঙ্গানারায়ণের ইংরেজীর উত্তরে সে বললো, এ বাঞ্চৎ কোন্ আছে?

গঙ্গানারায়ণ মুখ তুলে ভালো করে দেখলো সাহেবটিকে। স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে ক্রমশ মুখখানি স্পষ্ট হলো। এই সেই ম্যাকগ্রেগর। এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই গঙ্গানারায়ণ চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছিল। কোনো উত্তরই দিতে পারেনি সেদিন। হঠাৎ রক্ত উঠে এলো তার মাথায়।

কয়েকজন চাষী চিৎকার করে উত্তর দিল, সাহেব, ইনি আমাগো জমিদার!

ম্যাকগ্রেগর হেসে বললো, এ না-লায়েক বেটা কোন্ জমিন্দার! শ্যামচাঁদ খেলেই জমিন্দার ভাগবে! দেকো, তুমলোগ সব দেকো।

হাতের চাবুকটি শূন্যে ঘুরিয়ে ম্যাকগ্রেগর সজোরে এক ঘা কষালে গঙ্গানারায়ণের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পিঠ দিয়ে রক্ত ফুটে বেরিয়ে এলো। সে তবু অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মেঘমন্দ্র স্বরে বললো, নতুন আইন হয়েচে, তোমরা জানো না, এই অত্যাচারের জন্য তোমায় গারদে পাঠাবো। এই আমি এখেনে সকলের সামনে শপথ নিলুম। তুমি এই চাষীর জমিতে ট্রেসপাস করেচো—

ম্যাকগ্রেগর বললো, বজ্জাত, নিগার। তুই আমায় আইন ডেখাইটে চাস্? এই ড্যাখ্ তবে আমার আইন।

ম্যাকগ্রেগর আবার চাবুক কষাতেই গঙ্গানারায়ণ সেটা ধরে ফেললো। অতিরিক্ত মদ্যপ ও ভোগী ম্যাকগ্রেগরের চেয়ে সে অনেক বেশী শক্তিমান পুরুষ। হ্যাঁচকা টান দিয়ে চাবুকটা কেড়ে নেবার পর সে আর ক্রোধ দমন করতে পারলো না। পর পর কয়েক ঘা চাবুক সজোরে মেরে সে প্রতিদান দিল ম্যাকগ্রেগরকে। ম্যাকগ্রেগর পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

তারপর একটি ছোটখোটো বিদ্রোহের ব্যাপারই ঘটে গেল সেখানে। লাঠিয়ালরা এগিয়ে আসতেই অনেক চাষী একত্রে গর্জন করে উঠলো, খবর্দার, ওনার গায়ে কেউ হাত লাগাবি না। একজন অত্যাচারী সাহেবকে ভূপাতিত হতে দেখে তাদের আনন্দ ও সাহস যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। কোথা থেকে একটা প্রকান্ড লাঠি নিয়ে এসে পড়লো তোরাপ। সকলে মিলে লাঠিয়াল তিনজনকে ঘায়েল করে ফেলল এবং অন্য সাহেবদের কাছ থেকে সাহায্য আসার আগেই ওরা গঙ্গানারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে দূরে পালিয়ে গেল।

সেইদিন মধ্যরাত্রে গ্রামের কয়েক স্থানে লক্ লক্ করে উঠলো অগ্নির লেলিহান শিখা। সবচেয়ে প্রথমে ভস্মসাৎ হলো জমিদার সিংহবাবুদের কুঠিবাড়িটি।

বিরাহিমপুর গ্রামটি একেবারে জনশূন্য। এ গ্রামের কিছু বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, দু একটিতে এখনো ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। যেসব বাড়িতে আগুনের স্পর্শ লাগেনি, সেখানেও আছে তান্ডবের চিহ্ন, যেন একপাল ক্রুদ্ধ দৈত্য সব কিছু তছনছ করেছে। শিশুদের ক্রন্দন বা হাস্যমুখর প্রাঙ্গণগুলিতে এখন শুধু বসে আছে ছন্নছাড়া, বিস্মিত দু-একটি বিড়াল বা কুকুর। এই দুটি প্রাণী মানুষের সঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। অকস্মাৎ মনুষ্য-পরিত্যক্ত হওয়ায় তারা হতভম্ব; মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের অদ্ভুত করুণ ডাক।

এ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দূরের গ্রামগুলির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিছু সক্ষম জোয়ান পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে পাতিসরের জঙ্গলে। উজানী নদীর দক্ষিণ দিকে এই জঙ্গল খুব প্রাচীন নয়। এককালে পাতিসর নাকি ছিল বেশ সমৃদ্ধ এক জনপদ, কোনো এক সময় মারাত্মক বিসূচিকা রোগ সেখানে মহামারী রূপে দেখা দেয়। প্রতিদিন একশো-দেড়শো করে চিতা জ্বলতো, তারপর আর চিতা জ্বালাবার লোক পাওয়া যায়নি। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তারা তো কেউ আর ফিরে আসেইনি, বহু বৎসর ধরে ভয়ে কেউ আর পাতিসরে পা দিত না। পরিত্যক্ত সেই জনপদে ধীবে ধীরে গজিয়ে ওঠে জঙ্গল। এখনো সেখানে দেখা যায় ইতস্তত কিছু কিছু গৃহের ভগ্নস্তূপ। বিষধর সাপ আর হিংস্র পশুরা সেখানে বাসা বেঁধে আছে।

পাতিসরের জঙ্গলে পলাতকদের মধ্যে রয়েছে গঙ্গানারায়ণ। তাকে এখন দেখায় কোনো দস্যু দলপতির মতন, তার হাতে বন্দুক। নীলকর সাহেবরা যখন তাদের কাছারি বাড়িতে আগুন দিতে আসে, তখন নায়েব ভুজঙ্গ ভটচাজ্ চম্পট দেবার আগে এই সাবেকী বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল। গোঁয়ারের মতন গঙ্গানারায়ণ চেয়েছিল তখনই প্রতিরোধ করতে, কিন্তু ভুজঙ্গ ভটচাজ্ সে সময় তাকে উচিত পরামর্শই দেয় যে, সাহেবদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নামা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভুজঙ্গ ভটচাজ্ অবশ্য ওই জঙ্গলে আশ্রয় নেয়নি, সে সপরিবারে এই জেলা ছেড়েই চলে গেছে। বন্দুকটা এবং কিছু কার্তুজ রয়ে গেছে গঙ্গানারায়ণের কাছে।

চারপাশ ঘন গাছপালায় ঘেরা একটি ভগ্ন গৃহের চাতালে আস্তানা গেড়েছে গঙ্গানারায়ণ। তার সঙ্গে রয়েছে জনা পনেরো বলিষ্ঠকায় চাষী। একটি ব্যাপারে গঙ্গানারায়ণ রীতিমতন বিস্মিত। তারই জন্য বিরাহিমপুর গ্রামে যে এমন বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো, সেজন্য কেউ কিন্তু তাকে দুষছে না। বরং গঙ্গানারায়ণের প্রতি তাদের সমীহ অনেক বেড়ে গেছে এই জন্য যে, সে সর্বসমক্ষে একজন সাহেবকে প্রহার করেছে। কয়েক পুরুষ ধরে তারা মার খেয়ে শুধু সহ্য করতেই শিখেছিল। এই প্রথম দেখলো একজন অন্তত অত্যাচারীকে ভূপাতিত হতে। ম্যাকগ্রেগর সাহেব একেবারে যমের দোসর, তার গায়েও হাত দিয়েছে গঙ্গানারায়ণ।

বস্তুত, বিরাহিমপুর গ্রামে এ আগুন জ্বলতোই, গঙ্গানারায়ণ যেন নিমিত্ত মাত্র। এই অঞ্চলের চাষীরা একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছিল যে এ বৎসর তারা কিছুতেই নীল চাষ করবে না। ভিতরে ভিতরে তারা ধূমায়িত হচ্ছিল, গঙ্গানারায়ণ শুধু আগুনের শিখাটি জ্বেলে দিয়েছে। বিঘা প্রতি দাদন মাত্র দুটি টাকা, অথচ নীল উৎপাদনের ব্যয় তার চেয়ে বেশী। এর পরও আছে প্রতি পদে পদে নীলকুঠির কর্মচারীদের উৎকোচ। উৎপাদন বেশী হলেও ফাজিলটুকু যাবে সাহেব ও তাদের কর্মচারীদের উদরে আর উৎপাদন কম হলে বা নীলফসলের মান নিকৃষ্ট হলে সহ্য করতে হবে বেদম প্রহার, ধারাবাহিক অত্যাচার, ঘরে যুবতী স্ত্রী বা কন্যা থাকলে তার শরীর দিয়ে মেটাতে হবে ঘাটতি। যে অবস্থায় হেলে সাপও ফণা তোলে, চাষীরা সেই অবস্থায় পৌঁছেচে।

গঙ্গানারায়ণের কাছে বন্দুক থাকায় লুক্কায়িতদের বুকে এসেছে বিপুল বল। তারা জানে, নীলকরদের কুঠিতেও একটি মাত্র বন্দুক আছে, সুতরাং তারা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে কুঠি আক্রমণ করলে সাহেবদের এবার একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্বংশ করে দিতে পারবে। বনের মধ্যে দু-তিনদিন থাকার পরই তারা ক্রমশ এই পরিকল্পনায় উত্তেজিত হতে লাগলো। তারা শুধু তাদের গ্রাম, বড়জোর পরগণাটুকুর কথা চিন্তা করে, বাকি পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই তাদের কাছে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য রূপকথার গল্পের নায়ক হতে চায় না। তার মস্তিষ্ক অনেক ঠান্ডা, রুল অব ল'-তে তার এখনো দৃঢ় বিশ্বাস। তার হাতে একটি বন্দুক আছে বটে কিন্তু বন্দুক চালনায় তার দক্ষতা নেই। এই চাষা-ভূষোর দল প্রত্যেকেই হাতে একটা করে ডান্ডা বা লাঠি নিয়েছে বটে কিন্তু নীলকুঠির সুশিক্ষিত লাঠিয়ালদের তুলনায় এরা কিছুই না। এদের নিয়ে হই হই করে নীলকুঠি আক্রমণ করা কাজের কথা নয় মোটেই। ধরা যাক, যদি বা এখানকার নীলকুঠি দখল করেই নেওয়া যায়, তাতেই বা কী লাভ হবে?

গঙ্গানারায়ণের এখনো ধারণা, আইনের আশ্রয় নিয়েই চাষীরা নিজস্ব জমিতে ইচ্ছামত চাষের অধিকার ফিরে পেতে পারে। শুধু সেই আইনের কাছে একবার পৌঁছোনো দরকার। নীলকর সাহেবরাও এ কথা জানে বলে দরিদ্র হীনবল চাষীদের ওপর হাজার রকম অত্যাচার চালিয়ে পদানত করে রাখে যাতে তারা আইনের আশ্রয়ে পৌঁছোতে না পারে।

ম্যাকগ্রেগর এবং তার চ্যালা-চামুণ্ডারা বিরাহিমপুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, এটা বেআইনী কাজ। এর উত্তরে রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে রূপকথার নায়কের মতন গঙ্গানারায়ণও যদি নীলকুঠি আক্রমণ করে তবে সেটাও হবে একটা বেআইনী কাজ। অত্যাচারিতেরও অধিকার নেই আইনের বিচারভার স্বহস্তে গ্রহণ করার।

তবে আগেকার তুলনায় অন্তত একটি বিষয়ে গঙ্গানারায়ণ দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছে, চোখের সামনে কোনো অন্যায় সঙ্ঘটিত হতে দেখলে তখুনি তার প্রতিবাদ করতে হবে। পরে কখন বিচার হবে এই জন্য অন্যায় সহ্য করে গেলে মনুষ্যত্বের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্যই সে ম্যাকগ্রেগরের চাবুক সহ্য করেনি।

সঙ্গে কিছু চাল-ডাল যে যা পারে নিয়ে এসেছিল, তাই ফুটিয়ে কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু যে সব মানুষ মরীয়া হয়ে সর্বস্ব খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েছে, তারা কখনো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কিছু একটা করার জন্য, এমন কি সর্বনাশের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যও তারা চঞ্চল।

গঙ্গানারায়ণ ঠিক করলো, আগে এই এলাকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আইন প্রয়োগের ভার পুলিসের হাতে, পুলিস সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে আবার গ্রামে ফিরবে। তখন যদি নীলকর সাহেবরা আবার ধেয়ে আসে, তখন তাদের মোকাবিলা করবে পুলিসের সেপাইরা। থানা আছে কালীগঞ্জে, পাতিসর জঙ্গল পার হয়ে সেখানে যাওয়া যায়।

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গীরা তাকে অনেকভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে পুলিস ফৌজ তাদের মতন সাধারণ মানুষের কোনো উপকারে আসবে। পুলিস বরাবর জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে আর নীলকর সাহেবরা তো পুলিসের বাপ। কোনো সাহেবের গায়ে কোনো দেশী পুলিস সেপাই কখনো হাত তুলতে পারে? এটা অসম্ভব কথা নয়?

গঙ্গানারায়ণ কোনো কথা শুনলো না, সে যাবেই। অবশ্য সে পথ চেনে না। একা যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তার সঙ্গে কে যাবে? শেষ পর্যন্ত তোরাপ বলল, লয়েন কত্তা, মুই আপনেরে রাস্তা দেখামু। মরলে আপনের লগে এক সাথে মরুম!

বন্দুকটা উঁচু একটি বৃক্ষচূড়ায় লুকিয়ে রেখে রাতের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরুলো গঙ্গানারায়ণ আর তোরাপ। উজানী নদীর ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে গেলেই কালীনগর পড়বে। এই কালীনগরে তোরাপের এক ফুফাতো ভাই থাকে। আগে তার কাছে গিয়ে ওরা জেনে নেবে এদিককার হালচালের সন্ধান।

ওরা যখন পোঁছোলো তখন কালীনগর গঞ্জটি ঘুমন্ত। এমনই চুপচাপ, নিঃসাড় যে ঘুমন্তের বদলে মৃত বলে ভ্রম হয়। তোরাপের পিসীর সন্তানকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সেখান থেকে জানা গেল যে কালীনগরের অনেক যুবকই গা ঢাকা দিয়েছে। নীলকর সাহেবরা এখানেও খুব জোর-জুলুম শুরু করেছে। গঙ্গানারায়ণ একটুখানি দমে গেল। কালীনগরে থানা আছে। সেখানে পুলিসের নাকের ডগার ওপরেই যদি এ রকম কাণ্ড হয়, তা হলে আর ভরসা কোথায়?

তোরাপ চাইলো জঙ্গলে ফিরে যেতে। জঙ্গলই একমাত্র নিরাপদ স্থান। সেখানে নীলকর কিংবা পুলিস কেউই যায় না। গঙ্গানারায়ণ একটা খিরিশ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিল একবার অন্তত থানার দারোগার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অসহায়, অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা সরকারের নতুন নির্দেশের কথা কিছুই জানে না, তারা কিছু দাবি করে না বলেই পুলিস থেকেও তাদের অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অথচ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় গঙ্গানারায়ণ পড়েছে যে কৃষকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জুলুম করে নীল চাষ চালাবার পক্ষপাতী নয় সরকার।

কালীনগর থানার দ্বারের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটি মশাল, পাশে

বর্শা হাতে নিয়ে বসে বসে ঢুলছে একজন সিপাহী। গঙ্গানারায়ণ তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সিপাহীটি জেগে ওঠার পর গঙ্গানারায়ণের বক্তব্য শুনে সে বাড়িয়ে দিল বাম হস্তটি। অর্থাৎ কিছু দর্শনী বা পার্বণী না দিলে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনেক বাক-ধস্তাধস্তির পর শেষ পর্যন্ত তাকে ভবিষ্যতে কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে সে গা মোচড়া-মুচড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দারোগাবাবুর বাসগৃহ সন্নিকটেই। গায়ে একটা মলিদা জড়িয়ে তিনি একজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের মতন সেজবাতির আলোকে একটি ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। এই রাতে আগন্তুকদের দেখে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন না বা সেপাই ডেকে ফাটকে পুরে দেবার আদেশ দিলেন না। গ্রন্থটি মুড়ে রেখে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী, ঘর পুড়িয়েচে তো? কোন্ গা? ক' বছরের দাদন? এলাকা চাষ, না বে-এলাকা?

গঙ্গানারায়ণ বিনীতভাবে বললো, আজ্ঞে, গোটা গ্রামেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচে। গাঁয়ের নাম বিরাহিমপুর। ওদের অত্যেচারে গাঁয়ে আর একটাও মানুষ নেই।

দারোগাবাবু বললেন, বসো, ওখেনেই বসে পড়ো, তারপর বলো। প্রাণ খুলে বলো। কত আর শুনবো, এই নিয়ে আজ পাঁচজনা এলো।

তোরাপ দাঁড়িয়ে আছে বাইরের অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে, সে দারোগাবাবুকে দেখাই দেয়নি। গঙ্গানারায়ণ উবু হয়ে বসলো, তারপর বললো, আমি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগচে একটা খবর পড়িচি...।

দারোগাবাবুর দৃষ্টি তখনও সামনের বইটির ওপর ন্যস্ত ছিল, এবার তিনি চমকিত হয়ে মুখ তুললেন। তারপর তীক্ষ্ম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়োচো বললে? কে তুমি? তুমি কি চাষী?

গঙ্গানারায়ণ বললো, না, আমি চাষী নই বটে, তবে কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী। আপনি যদি সবিস্তারে শোনেন—।

সেজবাতিটি উঁচু করে তুলে গঙ্গানারায়ণের মুখের সামনে ধরে দারোগাবাবু বললেন, তুমি...তুই...গঙ্গা না?

এবার গঙ্গানারায়ণেরও স্তম্ভিত হওয়ার পালা। সেও দারোগার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

দারোগাবাবু বললেন, তুই...গঙ্গা...আমাদের গঙ্গানারায়ণ নোস্? গলার স্বর শুনেই কেমন কেমন বোধ হচ্ছিল। আমায় চিনতে পাচ্ছিসনি? আমি ভগীরথ। হিন্দু কলেজে আমরা একসাথে পড়তুম...মধু, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বেণী, গৌর... আমার বাড়ি থেকে ভূদেবের বাড়ি খুব কাচেই—।

এবার গঙ্গানারায়ণের মনে পড়লো। এই মধ্যবয়স্ক, স্ফীতোদর, গুম্ফবান ব্যক্তিটি তার সহপাঠী ভগীরথই বটে। তবে ছাত্র হিসেবে তার তেমন চাকচিক্য ছিল না বলে সে ঠিক গঙ্গানারায়ণের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল না।

ভগীরথ বললো, এ কী চেহারা করিচিস তুই? খালি গা, খালি পা...তোর মতন বংশের সন্তান...তোদের বাড়িতে কত খেয়েচি! কী ব্যাপার বল্ তো! এ কী বিচিত্র বিধিলিপি, এমনভাবে, এমন অবস্থায় তোর সঙ্গে দেকা হবে—।

গঙ্গানারায়ণ কিছু বলতে শুরু করার আগেই ভগীরথ আবার বললো, থাম, থাম! বিরাহিমপুরে এক ইন্ডিগো প্ল্যান্টারকে একজন কেউ মেরেচে, সে কি তুই? ওরে বাপ রে বাপ! তা নিয়ে যে হুলুস্থুলু পড়ে গ্যাচে রে! সিংগীবাড়ির এক

ছেলে এই কীর্তি করেচে, এমন শুনিচিলুম বটে, কিন্তু তুই কখনো কারুর গায়ে হাত তুলবি, সে যে অকল্পনীয়!

গঙ্গানারায়ণ এবার সব বৃত্তান্ত খুলে বললো।

মাঝখানে বার বার বাধা দিচ্ছিল ভগীরথ। সে এ ব্যাপারের অনেক কিছুই জানে। সব শুনে সে বললো, গঙ্গা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোকে দেকলে অ্যারেস্ট করার কতা! ইন্ডিগো প্ল্যান্টারদের কতখানি প্রতাপ এদিকে তুই জানিস না, তুই তো মাত্তর একজন দুজনকে দেকিচিস।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই বারাসতের হাকিমের পরোয়ানার কতা কিছু শুনিসনি? তিনি থানার দারোগাদের নির্দেশ দিয়েচেন—।

ভগীরথ বললো, শুনিচি, সব শুনিচি। ঐ হাকিমের বদলি হলো বলে! অমন দু-একটা আইডিয়ালিস্ট ছোক্‌রা সদ্য বিলেত থেকে এসে এখানকার নেটিবদের হেল্প কত্তে চায়। তারপর ধান্ধারা গোবিন্দপুরে বদলি হয়ে কয়েক বচর পড়ে থাকার পরই তাদের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়। ঐ বারাসতের আরও দুজন হাকিম এমনধারা চাষীদের সাপোর্ট কত্তে গেস্‌লো। তারাও বদলি হয়ে গ্যাচে!

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু দেশের এত চাষীকে জমি ছাড়া করে সরকারের কী লাভ? নীলকরদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য সরকার কি নিজের ক্ষতি করবে?

ভগীরথ বললো, এ নীলের বাণিজ্যে অনেক সরকারী হোম্‌রা-চোমরার স্বার্থ আচে। তোকে আরো একটা কতা বলি, এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ম্যাকগ্রেগরের কতায় ওঠেন বসেন। মাসে দুবার তিনি ম্যাকগ্রেগরের কুঠিতে আসেন খানা খেতে। লোকে বলে ম্যাকগ্রেগরের ওয়াইফের সঙ্গে নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রোমান্স চলচে অনেকদিন। তুই এই জেলায় বসে ম্যাকগ্রেগরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি কী করে? চাষীদের মারধোর খাওয়া কিংবা এ ধরনের অত্যাচারের অভ্যেস আচে, কিন্তু তুই এর মধ্যে জড়ালি কেন? তোকে পেলে ওরা তো একেবারে শেষ করে দেবে!

গঙ্গানারায়ণ একটু রেগে গিয়ে বললো, তুই বলতে চাস, এ সব অত্যোচারের কোনো প্রতিকার নেই? তা হলে তোরা রয়িচিস কেন? কুইনের প্রোক্লামেশানের পর প্রজা হিসেবে একজন নীলকর আর একজন চাষীর তো সমান অধিকার।

ভগীরথ হেসে উঠে বললো, তুই এখনো তেম্নিই রয়ে গেচিস, গঙ্গা! ইমপ্র্যাকটিক্যাল, রোমান্টিক...। বিজয়ী আর বিজিত মানুষ কখনো সমান হয়? সাহেবরা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে?

হাসি থামিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে গেল ভগীরথ। মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। আস্তে আস্তে বললো, এতকাল পর তোর সঙ্গে দেখা, কত কী মনে পড়চে, কিন্তু প্রাণ খুলে যে তোর সঙ্গে দুটো কতা কইবো, এখুন সে সময় নেই। তুই আমার এখেনে এসেছিলি, এ কতা পাঁচ কান হলেই আমার গর্দান যাবে। তোকে আমি এক পরামর্শ দিচ্চি, শোন। এই রাতেই তুই নৌকো ধরে কেষ্টনগরের দিকে পাড়ি দে। তারপর যত শিগগির সম্ভব কলকেতায় চলে যা। একমাত্র কলকেতায় গেলেই তুই নীলকরদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারবি। আমি তোর জন্যে নৌকোর ব্যবস্থা করে দিচ্চি।

গঙ্গানারায়ণ বিবর্ণ মুখে বললো, আমি পালাবো?

ভগীরথ বললো, তা ছাড়া তুই এখেনে আর কী করবি? এখেনে তোর প্রাণ সংশয়। আমি মিথ্যে মিথ্যে তোকে ভয় দেখাচ্চিনি, একজন মানুষকে গুমখুন করা ওদের পক্ষে কিচুই না।

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ নীরব রইলো। বিরাহিমপুরের চাষীদের ভাগ্যের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এখন সে ওদের ছেড়ে শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবে?

ভগীরথ বললো, আর দেরি করিসনি, গঙ্গা, গা তোল্, এই রাতের মধ্যেই তোকে কেষ্টনগর পোঁচে যেতে হবে!

গঙ্গানারায়ণ অস্ফুট কণ্ঠে বললো, আমি এসেচিলুম ভাগ্যহত চাষীদের পক্ষ নিয়ে বলবার জন্য। যদি তাদের প্রতি অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করতে পারি। এখন তাদের সেই একই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি চলে যাবো?

ভগীরথ বললো, চাষীদের তুই সাহায্য কত্তে চাস্, বেশ তো ভালো কতা। এখেনে তুই কী করবি ওদের জন্য? বেশ তো কলকেতায় গিয়ে তুই ওদের হয়ে লড়ে যা। যদি মাম্‌লা কত্তে চাস, কলকেতায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মাম্‌লা দায়ের কর। সাহেবদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মাম্‌লা কি মফস্বলে হয়? তুই এটাও জানিস না? ওদের সাহায্য কত্তে গেলে তোকে কলকেতায় যেতেই হবে!

গঙ্গানারায়ণ একবার ভাবলো, এটাই বোধ হয় একমাত্র পন্থা। তোরাপকে দিয়ে সে চাষীদের কাচে খবর পাঠিয়ে দেবে। কলকাতায় মামলা দায়ের করে সেখান থেকে সে সাহায্য পাঠাবে।

পরক্ষণেই গঙ্গানারায়ণের সারা শরীরটাতেই একটা ঝাঁকুনি লাগলো। আবার প্রতিশ্রুতি? কয়েক বছর আগে সে এ রকমই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর মধ্যরাতে উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার সে ওদের এই অবস্থায় ফেলে চলে গেলে আর ওরা তাকে বিশ্বাস করবে? কলকাতায় গেলে তার নিজেরই কোন্ রূপান্তর ঘটবে কে জানে!

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, ভগীরথ, আমার কলকাতায় যাওয়া হবে না এখন। আমি ওদের সঙ্গেই থাকবো।

আরও কিছুক্ষণ ধরে নানান যুক্তি দেখিয়েও ভগীরথ আর টলাতে পারলো না গঙ্গানারায়ণকে। গঙ্গানারায়ণ বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, কই তোরাপ, চল রে!

ভগীরথও বেরিয়ে এলো বাইরে। জমিদারনন্দন গঙ্গানারায়ণের এই পরিবর্তন এখনো যেন সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না। গঙ্গানারায়ণকে চলে যেতে দেখে সে বললো, গঙ্গা, এই শীতের রাতে তুই যাবি...তোর খালি গা, এটা তুই অন্তত নে।

নিজের অঙ্গ থেকে শীতবস্ত্র খুলে সে তুলে দিল গঙ্গানারায়ণের হাতে। গঙ্গানারায়ণ এতে আর আপত্তি করতে পারলো না। অবিলম্বেই সে আর তোরাপ আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়কের মত কোনো ভূমিকা নেবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না গঙ্গানারায়ণের, কিন্তু পাকেচক্রে তাকে প্রায় সেরকমই হতে হলো। জঙ্গলের আস্তানা থেকে সে দু-একবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা করেই বুঝলো, আবহাওয়া অতিশয় উষ্ণ, চাষীদের সঙ্গে নীল কুঠীয়ালদের সংঘর্ষ লাগছে প্রায়ই। ম্যাক-

গ্রেগরের চ্যালা-চামুণ্ডারা শিকারী কুকুরের মতন গঙ্গানারায়ণের সন্ধানে চতুর্দিকে শুঁকে শুঁকে ফিরছে, গঙ্গানারায়ণের প্রহারে নাকি ম্যাকগ্রেগরের একটি চক্ষু বিষমভাবে জখম হয়েছে, এর প্রতিশোধ তারা নেবেই। গঙ্গানারায়ণের চেহারার বর্ণনা এবং পরিচয় এ তল্লাটে কারুর আর অজানা নেই। কোনো অপরিচিত গ্রাম-বাসীও গঙ্গানারায়ণকে দেখলে কাছে এসে মিনতি মাখা কণ্ঠে বলেন, বাবু, আপনে শিগগৈর পালান, আপনেরে ধরতি পাল্লি সাহেবরা আপনের কইল্‌জা টাইন্যে ছিড়ে ফেলবে!

তারা এই কথা বলে, আবার গঙ্গানারায়ণকে দেখবার জন্যও গ্রামসুদ্ধু লোক ভিড় করে আসে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পায়ে। সে ম্যাকগ্রেগরের মতন একজন চরম অত্যাচারী সাহেবের চাবুকের মার ফিরিয়ে দিয়েও এখনো সশরীরে টিঁকে আছে, এ বিস্ময়ের আবেগ তারা কী করে প্রকাশ করবে, বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে তাদের কাছে গঙ্গানারায়ণ মানুষের বদলে অতিমানুষ হয়ে যায়।

গঙ্গানারায়ণ বুঝতে পারলো জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে বাইরে আসা তার পক্ষে এখন সত্যিই বিপজ্জনক। কলকাতায় সে কিছুতেই পালাবে না। এখানে থেকে আইনের আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব নয়, কারণ পুলিসবাহিনীকে ক্রয় করে রেখেছে নীলকুঠীয়ালরা। জঙ্গলের মধ্যেও তারা যে-কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারে বলে তোরাপ এবং অন্য সঙ্গী-সাথীরা ভাঙা ইঁট ও গাছের ডালপালা দিয়ে প্রায় ছোটখাটো একটা দুর্গের মতন বানিয়ে ফেলেছে, গঙ্গানারায়ণের বন্দুক তাদের ভরসা জোগায়।

মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তার দু-একজন চর পাতিসর অরণ্য ছেড়ে বাইরে যায়, অত্যাশ্চর্য সব সংবাদ সংগ্রহ করে তারা ফিরে আসে। কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই গ্রামের পর গ্রামের নিরীহ, দুর্বল চাষীরা কোথা থেকে এমন শক্তি পেল কে জানে! এতকাল অত্যাচার সহ্য করবার পর তারা হঠাৎ ঠিক করেছে, এ বৎসর কিছুতেই আর নীল চাষ করবে না। তার জন্য প্রাণ যায়, তাও সই। চতুর্দিকে আগুন জ্বলছে। কোন্ গ্রামে কবে কী ঘটনা ঘটছে, তা গঙ্গা-নারায়ণের জানা হয়ে যায়।

আহার্য সংগ্রহের জন্যও তোরাপ ও তার সঙ্গীদের যেতে হয় গ্রামে। গ্রাম-বাসীরা স্বেচ্ছায় তাদের মুষ্টিভিক্ষা দেয়। সে সময় ওরা জঙ্গলের গুপ্ত আখড়া সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কী বোঝায় কে জানে, কিন্তু এক নিরুদ্দিষ্ট জমিদারপুত্র বহুদিন পর ফিরে এসে বন্দুক হাতে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে চাষীদের নিয়ে দল গড়েছেন, ইংরেজ এখন তাঁর নামে ভয়ে কাঁপে। এই সব কাহিনীর সঙ্গে আরো অনেক কল্পনা মেশে। ফলে নানারকম অলৌকিক কাহিনীও ছড়াতে শুরু করে গঙ্গানারায়ণের নামে। অনেকের বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেল যে গরিবের উদ্ধারের জন্য এই মানুষটি দৈব প্রেরিত।

গঙ্গানারায়ণের নির্দেশে তার চরেরা হিন্দু পেট্রিয়টের কপিও সংগ্রহ করে আনে। লোকের মুখে এর নাম 'হরিশের কাগজ', অতিশয় দুর্লভ, কিন্তু নিষিদ্ধ গোপন ইস্তাহারের মতন, যার দরকার তার হাতে ঠিক পৌঁছেও যায়। সেই পত্রিকার পৃষ্ঠায় সারা দেশের চিত্রটি দেখতে পায় গঙ্গানারায়ণ। নীল চাষের ফলে বাংলার অনেক জেলা যে একেবারে ছারেখারে যাচ্ছে, সে কথা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সবিস্তারে বুঝিয়ে চলেছেন হরিশ মুখুজ্যে। সরকারী কর্মচারী ও নীলকর সাহেবরা যোগসাজস করে যে একই সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের এবং সরকারের

কীভাবে ক্ষতি করে চলেছে, তারও বাস্তব বিবরণ দিচ্ছেন তিনি প্রতি সংখ্যায়। যশোর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তিও নীলকরদের অত্যাচার এবং বঞ্চিত চাষীদের জীবনের মর্মন্তুদ সংবাদ পত্রাকারে পাঠাচ্ছেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে। কে এই শিশিরকুমার ঘোষ! সে পরিচয় জানা যায় না, কিন্তু ইনি নিজ উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সত্য ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে জানিয়ে দিচ্ছেন দেশবাসীকে।

এই পত্রিকা পড়ে গঙ্গানারায়ণ কিছু বিস্মিতও হয়। নীল চাষ সম্পর্কে এই সব ব্যক্তিদের এমন আগ্রহ কেন? নীল চাষের জন্য দুর্ভোগ তো শুধু গ্রামের চাষীদের, এমন কি জমিদাররাও এর সঙ্গে তেমন জড়িত নয়। তাদের কিছু কিছু জমি নীলকরদের ইজারা দিয়ে জমিদাররা এ ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে, এখন এই চাষের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কিছুই যাবার আসবার কথা নয়। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে না, গ্রামের কৃষকদের নিয়ে এত রচনা সে আগে কখনো কোনো ইংরেজী কাগজে দেখেছে। হরিশ মুখুজ্যে বা শিশিরকুমার ঘোষের মতন ব্যক্তিদের এত উদ্বেগ কেন নীল চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে? যদি হরিশ মুখুজ্যে নামের লোকটির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, গঙ্গানারায়ণ এই প্রশ্নটি করবে। গঙ্গানারায়ণের নিজস্ব একটা দায় আছে, সেইজন্য ওদের ভাগ্যের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়েছে। কিন্তু সে দায় তাদের জমিদারির কিংবা বংশের ঐতিহ্যের কাছে নয়, সম্পূর্ণই নিজস্ব।

একদিন দ্বিপ্রহরে তোরাপ 'বন্দুক' 'বন্দুক' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো গোপন আস্তানায়। সে দেখে কয়েকজন সশস্ত্র লোক এসে প্রবেশ করেছে এই জঙ্গলে। নিশ্চয়ই নীলকরদের বাহিনী অথবা পুলিস। এ জঙ্গলে কেউ কেউ শখ করে শিকারের জন্যও আসে বটে কিন্তু বর্তমানের বিপজ্জনক সময়ে কে শিকারের শখ পুষে রাখবে!

তোরাপ ও তার সঙ্গীরা লাঠি নিয়ে গোপন আনাচে কানাচে মুখ লুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। গঙ্গানারায়ণ দাঁড়ালো বন্দুক হাতে নিয়ে। তার বক্ষ কম্পিত হচ্ছে। বন্দুক চালিয়ে তাকে মানুষ মারতে হবে? শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, তার সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য সে অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য। তার মুহুর্মুহু মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে হৃষীকেশের শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পাহাড়তলীর জীবন কি অনেক শ্রেয় ছিল না?

কিছু দূরে গাছপালার ফাঁকে দেখা গেল তিনটি লোককে। তাদের হাতে লাঠি আছে। কিন্তু বন্দুক রয়েছে কিনা বোঝা গেল না। তোরাপ উত্তেজিত চাপা স্বরে বললো, মারেন, বড়বাবু, হুম্মুন্দির পোগুলানরে নিকটে আইতে দিবেন না! মারেন!

গঙ্গানারায়ণ তবু বন্দুক উঁচিয়ে স্থির হয়ে রইলো।

দূরের দলটির মধ্য থেকে একটি লোক বেশী সামনে এগিয়ে এলো। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটির গায়ে হলুদ রঙের নিমা, মালকচ্ছ দিয়ে ধুতি পরা, হাতে একটি পিতলের গাঁট দেওয়া লাঠি। সে চেঁচিয়ে বললো, সিংগীবাবু! সিংগীবাবু!

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গীরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময় বিনিময় করলো। তোরাপ বললো, ও হালায় ফুইন্দাবাথ, ওডারে শ্যাষ কইর‍্যো দ্যান।

দূরের লোকটি এবার দু হাত তুলে বললো, আমি সিংগীবাবুর সাথে দ্যাখা করতে আইছি, আমার নাম দিগম্বর বিশ্বাস!

গঙ্গানারায়ণ এবার জোরে উত্তর দিল, তুমি যেই হও, হাতের লাঠিটা ফেলে

দাও, তারপর একা এগিয়ে এসো!

লোকটি লাঠিখানাকে আস্তে, খুব সন্তর্পণে শুইয়ে দিল মাটিতে, তারপর মুখ তুলে গম্ভীর স্বরে বললো, আমি চৌগাছার দিগম্বর বিশ্বাস, আমার সময় অতি অল্প, দু' চারডি কথা কয়ে চলে যাবো। রাজি থাকেন তো বায়রায় আসেন, নচেৎ ফিরে যাই।

গঙ্গানারায়ণ বন্দুক নামিয়ে বললো, আসুন, আপনার বাঁ দিকে একটু ঘুরে আসুন, ওদিকে ঢোকার পথ।

দিগম্বর বিশ্বাসের বয়েস তিরিশের নিচে, মুখখানি তেজোদ্দীপ্ত। যে ভাঙা গৃহটিতে গঙ্গানারায়ণদের আস্তানা, সেখানে প্রবেশ করে সে প্রথমে গঙ্গানারায়ণের দিকে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, আপনিই সেই লোক! লোকে তা হলে মিছে কথা বলে না। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সবই গল্প কথা।

গঙ্গানারায়ণ বললো, আপনি কে? চিনলুম না তো!

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, খাড়াইয়া সব কথা হবে না। আপনে বসেন, আমিও বসি। অনেক দূর থনে আসতেছি।

শুকনো পাতা জড়ো করে শয্যা প্রস্তুত করা আছে গঙ্গানারায়ণের, সে তার ওপর বসলো। দিগম্বর বিশ্বাস বসলো মাটিতেই, খানিকটা দূরত্ব রেখে। অন্যরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের। দিগম্বর বিশ্বাস তাদের দিকে হাত তুলে বেশ ব্যক্তিত্বসহকারে বললো, এই, তোরা যা করতেছিলি কর। আমার সাথে কয়েকজন লোক আছে, কেউ গিয়া তাদের ডাইক্যে আন। এখান থিকা যা, বাবুর সাথে আমার কথা আছে।

তারপর দিগম্বর বিশ্বাস মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে গঙ্গানারায়ণকে প্রণাম জানালো। মুখ তুলে বললো, আমি আপনেরে আগে দেখি নাই। তয় আপনের পিতা রামকমল সিংগীরে দেখছি বাইল্যকালে।

গঙ্গানারায়ণ নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, আপনে আমারে দেইখ্যে অবাক হইছেন। আমিও কম অবাক হই নাই। হাটে-বাজারে সর্বত্র লোকে কয় যে সিপাহী বিদ্রোহের এক নেতা হিমালয় পাহাড়ে অ্যাতদিন পলাইয়া রইছিলেন, অখন নীল চাষীগো লইয়া বিদ্রোহ করবার জন্যে এদিকে আসছেন। তিনি আবার জমিদার সিংগবাবুগো বাড়ির এক পোলা!

গঙ্গানারায়ণ এবার হাসলো। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা? লোকেদের কল্পনার দৌড় এতদূর পর্যন্ত গেছে! সিপাহী বিদ্রোহের কথা গঙ্গানারায়ণ জানতোই না, হরিদ্বার হৃষীকেশে সে বিদ্রোহের কোনো তরঙ্গই পৌঁছোয়নি।

এবার কাজের কথা বলুন!

হ, কাজের কথা তো আছেই। আমি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আসি নাই। আগে আমার পরিচয়ডা দিয়া লই। আমারে পাঠাইছেন আমার দাদা। তাঁর নাম বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। তিনি দেবতুল্য মানুষ। তিনি মেহেরপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান আছিলেন।

তোরাপ এবং তার সঙ্গীরা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা শুনে তাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। নীলকুঠীর দেওয়ান একটি অতিশয় ঘৃণ্য পরিচয়। এই লোকটি তো তা হলে নীলকুঠীর সাহেবদেরই চর।

দিগম্বর বিশ্বাস তাদের উদ্দেশে ধমক দিয়ে বললো, আরে ব্যাটারা, কইলাম তো আছিলেন, এখন নাই। আমিও ছিলাম, ঐ কুঠীর গোমস্থা, ছিলাম, এখন নাই।

দাদায় আর আমি চাকরিতে ইস্তফা দিছি। কেন দিছি জানেন? আগে ঐ কুঠীর ম্যানেজার ছিলেন ম্যাকফরসন সাহেব। তিনি মানুষ ভালো, ইস্কুল-হাসপাতাল কইরা দিছেন নিজ ব্যয়ে। সব ইংরেজই খারাপ না, ইংরাজগো মইধ্যেও ভদ্দরলোক, ছুটলোক, চোর, ছ্যাচোড় আছে। যত ছুটলোক আর ছ্যাচোড় সাহেবরাই নীলের ব্যবসা করে। অখন মেহেরপুরের কুঠীর ম্যানেজার ইয়ার্ডলি ঐ রকম এক ছুট-লোক। দেওয়ান-গোমস্থাগো দিয়া হ্যায় চাষীগো অইত্যাচার করাইতে চায়। চক্ষুর চামড়া নাই, পিশাচ, সাদা পিশাচ, এ দ্যাশের মানুষরে মানুষ বইলা গইন্য করে না। রক্ত চুইষা খাইতে চায়। সেই দেইখ্যাই দাদায় আর আমি চাকরিতে ইস্তফা দিছি।

—বেশ, ভালো কতা। আমার কাচে এসেচেন কেন?

—আপনে ছাড়া আর কেউ পরিত্রাতা নাই।

—পরিত্রাতা? আমি? আপনি কী বলতে চান খুলে বলুন তো!

—আপনের মতন আমারে পাইলেও মাথা কাটবে নীল বান্দররা। আমার দাদার নামে পুলিসের হুলিয়া। চাকরি ছাড়ার পর চাষীরা আমাগো কাছে আইস্যা ধর্না দিত। খালি কান্দে আর কয়, বাঁচান কত্তা, আমাগো বাঁচান! জীব মাত্রেই বাঁচতে চায়। সাহেবের জীবন, জমিদারের জীবন, চাষার জীবন, সবই তো ভগবানের সৃষ্টি। আমরা দুই ভাই চাষীগো কইছি, যদি বাঁচতে চাও, নীলের চাষ দিও না। তোমাগো রক্তে জমি লাল হউক, তবু নীল য্যানো না হয়! চৌগাছা, মেহেরপুর—এইসব অ্যালাকায় কোনো চাষী এবার নীল চাষ দেয় নাই।

—এরকম কিচু কিচু খবর আমি শুনিচি।

—শুধু আমাগো অ্যালাকা নয়, অইন্য অ্যালাকাতেও আমরা চাষীগো গিয়া কই. নীল চাষ বন্ধ করো। এই বৎসরেই একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত হইয়া যাবে।

দিগম্বর বিশ্বাস একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর খানিকটা আবেগের সংগে বললো, এবার আপনের উপর ভরসা!

এই লোকটির সংগে আরও কিছু সময় ধরে কথাবার্তা বলে গংগানারায়ণ বুঝলো, তার অজ্ঞাতসারেই সে একটি বেশ বড় ব্যাপারের কেন্দ্রে এসে গেছে। দিগম্বর বিশ্বাসের মনের জোর আছে, সে একবার যখন এই ব্যাপারে নেমেছে, এর শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। ঠিক কোনো স্বার্থে নয়, এক ধরনের আত্ম-সম্মানবোধেই সে এত দৃঢ়। লোকটির ব্যক্তিত্ব গংগানারায়ণকে বেশ স্পর্শ করে।

দিগম্বর বিশ্বাসের বক্তব্য এই যে, শুধু নীল চাষ বন্ধ রাখলেই এই আন্দো-লনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই বৎসরের ক্ষতি সহ্য করার ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের আছে। কিন্তু তারা উৎপীড়ন, অত্যাচার আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চাষীদের মনোবল ভেঙে দেবে, পরের বৎসর চাষীরা আবার নীল চাষে বাধ্য হয়ে প্রবৃত্ত হবে। সুতরাং সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করা দরকার। বারবার সাহেবদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলার মানুষ তাদের জোর জুলুমের বাণিজ্য আর কিছুতেই মেনে নেবে না। গ্রামে গ্রামাঞ্চলে কুঠী স্থাপন করে তারা আর নিরাপদে বাঁচতে পারবে না।

কিন্তু এই পাল্টা আক্রমণের জন্য চাষীদের সংঘবদ্ধ করবে কে? নির্যাতিত, গরিব চাষীরা কখনো কি একযোগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখেছে? যোগ্য নেতৃত্ব না থাকলে কার নির্দেশে তারা লড়াই করার জন্য এগিয়ে যাবে? বিশৃংখল-ভাবে লড়তে গেলে তারা শুধু মার খেয়েই মরবে! দিগম্বর এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাষীদের বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সকলে তাদের চেনে না কিংবা বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে ফরাজীরাও নীল চাষীদের লড়াই করার ডাক দিয়েছে। সব

দিকে যদি একসঙ্গে শুরু হয় লড়াই, তবে নীল ব্যবসার ভিত্ ধসে পড়তে পারে। এখন পাকেচক্রে এই নেতৃত্বের ভার গঙ্গানারায়ণের ওপরই বর্তেছে।

ইতিমধ্যেই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সংঘর্ষ বাঁধছে। কুঠীয়ালদের পাইকদের আক্রমণ করছে গ্রামবাসীরা। এক অত্যাচারী আমিনের লাশ ভাসতে দেখা গেছে নদীর জলে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন এক সাহেব, দূর থেকে কে তীর নিক্ষেপ করেছে, সে তীর সাহেবের গায়ে না লাগলেও ঘোড়াটি তীরবিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হয়, সাহেবের পা ভেঙে যায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে সমস্ত মানুষের বিশ্বাস, এই সব কীর্তিই গঙ্গানারায়ণের। মধ্যরাতে শোনা যায় দূরে কোথাও গোলাগুলির শব্দ। গৃহস্থরা ঘুম ভেঙে উঠে বসে বলে, ঐ গঙ্গানারায়ণ সিংগী যাচ্ছে সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর কিছুদিন পরেই বোধ হয় লোকে গঙ্গানারায়ণের কাল্পনিক মূর্তি গড়িয়ে পুজো করবে!

গঙ্গানারায়ণ বললো, কিন্তু আমি তো এসব কিছুই করিনি।

দিগম্বর বিশ্বাস বললো, আপনের নামে তো রটেছে। সেইতেই আমাগো লাভ। আপনের নামে এবার মন্তরের মতন কাজ হবে। আপনের ডাক শুইনলে সকললাডি এক স্থানে এসে খাড়াবে, আপনে হুকুম দিলে এক দিকে ধেয়ে যাবে। লোকে ভাবে আপনের অলৌকিক শক্তি আছে। আপনে হিমালয় পাহাড়ের থনে আইছেন... বোঝলেন না, কুসংস্কারাচ্ছইন্য বদ্ধ জীব সব, তুক্-তাক্, মন্তর-তন্তর, এই সবের দিকে অন্ধের মতন টান। আপনে সেডারে কামে লাগান। আপনের নামে এত কিছু রটছে, এবার কিছু ঘটান।

গঙ্গানারায়ণের তবু জড়তা কাটে না। যতই হোক সে একজন অন্তর্মুখী মানুষ। এক সঙ্গে এতগুলি মানুষের জীবন-মরণের ঝুঁকি নিয়ে এত বড় একটা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাকে। এক একবার সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আবার ভেতর থেকে কেউ যেন রাশ টেনে ধরে। তখনি কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সে দিগম্বর বিশ্বাসকে বললো, আরও পরামর্শের জন্যে সেখানেই দিন দু-এক থেকে যেতে।

পরের দিনই একদল গ্রামবাসী এসে উপস্থিত। দূর দূরান্তর থেকে যেমন লোকে কোনো জাগ্রত ঠাকুরের কাছে ধর্না দিতে আসে, সেইরকম তারাও এসেছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গঙ্গানারায়ণের কাছে তাদের দুঃখের কথা জানাতে। তারা গঙ্গানারায়ণের পায়ের কাছে কেঁদে পড়লো। নীলকুঠীর পাইকরা তাদের গ্রাম থেকে দুটি যুবতী বধূকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা। এই অবস্থায় কোনো গৃহবধূর ধর্মনাশ হলে সবংশে নির্বংশ হবার অভিশাপ লাগে। গঙ্গানারায়ণ কি এর প্রতিকার করবে না?

তোরাপ ও তার দলবল হই-হই রই-রই করে উঠলো। বেশ কিছুদিন বন-বাসের ফলে তাদের মধ্যে যেন বন্য আদিম শক্তি জেগেছে। তারা আঘাত হানবার জন্য উন্মুখ। ইদানীং নারী হরণের ঘটনা বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ কুঠীয়ালদের ধারণা, চাষীদের ঘরের লক্ষ্মী কেড়ে নিয়ে গেলে তারা কাঁদতে কাঁদতেই আধমড়া হয়ে যায়। তখন সামান্য অঙ্গুলি হেলনেই তারা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পা চাটে।

দিগম্বর বিশ্বাস গঙ্গানারায়ণকে বললো, চলেন না, একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়া যাক্।

নানা কোলাহলের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ সম্মতি জানাতে বাধ্য হলো।

সেই রাতেই প্রায় চল্লিশজন লাঠিধারী কৃষকের একটি দল নিয়ে তারা আক্রমণ করলো একটি নীলকুঠী। এবং প্রথমবারেই তাদের জয় হলো অতি সহজে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই নীলকুঠীতে হয় বন্দুক ছিল না অথবা চালাবার মতন সম্বিৎ কারুর ছিল না। দুজন সাহেবই ছিল অত্যন্ত নেশাগ্রস্ত।

গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কিছু করতেই হলো না। বন্দুক হাতে নিয়ে সে শুধু গেল আগে আগে, আর হিংস্র উন্মাদনায় ছুটে এলো চাষীরা তার পিছু পিছু। এর আগে কোনো নীলকুঠী আক্রমণ করার মতন সাহস কেউ দেখায়নি, এরা সোজা গিয়ে ভেঙে ফেললো নীলকুঠীর দ্বার। একজন সাহেব কোনোক্রমে পলায়ন করলো, অপর সাহেবটিকে ভূপাতিত করে তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়াল তোরাপ। যুবতী বধূ দুটিকে পাওয়া গেল অর্ধমৃত অবস্থায়।

যে-সব ঘটনায় গঙ্গানারায়ণের কোনো অংশ ছিল না, তারও কৃতিত্ব জমা হচ্ছিল গঙ্গানারায়ণের নামে। এবার তার সত্যিকারের একটি জয়-কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো দশগুণ হয়ে। গ্রাম্য কবিয়ালরা গান বাঁধলো গঙ্গানারায়ণের নামে :

এবার নীলের ক্যাঁতায় আগুন লেগেছে
গঙ্গা সিংগী ঝাঁপিয়ে পড়েছে,
ওরে ওরে নীল হনুমান, দাঁড়া দাঁড়া
গঙ্গা সিংগী দুয়োরে আছে খাড়া।

কর্মযজ্ঞ একবার শুরু হবার পর আর দ্বিধার দোলাচলের সুযোগ রইলো না। গঙ্গানারায়ণ ঘন ঘন বদল করতে লাগলো তার আস্তানা। এবং এক একদিন এক এক গ্রামে সদলবলে ঝটিকার মতন উপস্থিত হয়ে কৃষকদের বিদ্রোহের দীক্ষা দিতে লাগলো। যে দু-চারজন চাষী তাদের জমিতে নীল চাষ করেছিল, সে সব জমি থেকে উপড়ে ফেলা হলো নীল-ফসল। নীলকুঠীর পাইকদের সঙ্গেও সংঘর্ষ হলো কয়েকবার। দিগম্বর বিশ্বাস ঠিকই বলেছিল, তার উপস্থিতিই অলৌকিক শক্তির মতন কাজ করে। যেখানেই সে যায়, সেখানেই জোয়ারের স্রোতের মতন ছুটে আসে চাষীরা, তাদের বিরুদ্ধে নীলকুঠীর পাইকরা কী করবে!

একটি ক্ষেত্রে বন্দুকের গুলি চালাতে হয়েছিল গঙ্গানারায়ণকে। বিপরীত দিক থেকে এক সাহেবও গুলি ছুঁড়েছিল। উভয়পক্ষের কেউই হতাহত হয়নি, তবু তাতেও যেন গঙ্গানারায়ণের অলৌকিক শক্তির আরও বেশী করে প্রকাশ পেল। আকাশ ফাটানো চিৎকারে গঙ্গানারায়ণের নামে জয়ধ্বনি তুললো তার অনুগামীরা।

প্রায় মাসাবধিকাল গঙ্গানারায়ণের জয়যাত্রা অব্যাহত রইলো। মনে হলো যেন সাহেবরা পশ্চাৎ অপসরণ করেছে অনেক আগেই। কোনো জায়গাতেই গঙ্গানারায়ণের দলকে তেমন বড় বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নীলকর ও পুলিস হাত মিলিয়ে চলে, তেমনও দেখা গেল না। চাষীদের অনেকখানি মনোবল ফিরে এলো। ভিটেমাটি ছেড়ে যারা পলায়ন করেছিল, তারাও আবার ফিরে এলো বাস্তুভূমিতে। বহু বছর পর অনেক চাষী তাদের জমিতে নীলের বদলে আবার ধান চাষের উদ্যোগ শুরু করলো।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল গঙ্গানারায়ণ।

কিছু কিছু রায়তের নিজস্ব জমিতে সাহেবরা জোর করে নিজেদের মুনীষ দিয়ে নীল চাষ করেছিল। সেইসব জমি আবার দখলে এনে, নীলের চারা উৎপাটিত করে চাষীদের অধিকার ফেরত দেবার তদারক করছিল গঙ্গানারায়ণ। হঠাৎ এসে পড়লো অশ্বারোহী পুলিস বাহিনী। গত কয়েকদিন কোনো রকম পুলিস বা নীলকুঠীর পাইকদের সাড়া শব্দ না পেয়ে গঙ্গানারায়ণের সাহস বেড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে নিজের পুরো দলটি আনেনি, আর দিনের আলোয় এমন ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো তার উচিত হয়নি।

পুলিস বাহিনী দূর থেকেই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে আসছে। গঙ্গানারায়ণ দেখলো, ওদের কাছে অনেকগুলি বন্দুক। অসম যুদ্ধ চালিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই অনর্থক রক্তপাত এড়াবার জন্য গঙ্গানারায়ণ তার সঙ্গীদের বললো, তোরা সরে পড়, চাষীদের মধ্যে মিশে যা ধীরে ধীরে, আমি দেকচি।

গোঁয়ারের মতন সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে কিংবা পলায়ন করতে গিয়ে পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরলে চাষীদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং সসম্মানে আত্মসমর্পণ করা ভালো। এর পর যদি আইনের আশ্রয় নিয়ে লড়াই করা চালিয়ে যাওয়া যায়।

বন্দুক সমেত দক্ষিণ হস্তটি উঁচু করে গঙ্গানারায়ণ এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

পুলিস বাহিনীটি পরিচালনা করছিল গঙ্গানারায়ণেরই স্কুলের সহপাঠী সেই ভগীরথ দারোগা। ঘোড়া থেকে নেমে সে নিজের হাতে গঙ্গানারায়ণের হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধলো। দড়ির অগ্রভাগটি নিজের হাতে রেখে হাঁটতে হাঁটতে সে চুপি চুপি বললো, তোর ভালোর জন্যই তোকে অ্যারেস্ট কল্লুম রে, গঙ্গা। এছাড়া তোকে বাঁচাবার আর উপায় ছেল না। কলকেতা থেকে আরও ফৌজ আসচে, তোকে দেকা মাত্তরই গুলি করার অর্ডার বেরিয়েচে। এই কটা চাষাভুষো নিয়ে তুই এদের সঙ্গে লড়তে চাস! আমি কলকেতায় তোদের বাড়িতে চিটি লিকে দিইচি। সেখেন থেকে কেউ এসে তোকে জামিনে খালাস করে নেবে। আর যদি কেস লড়তে হয় লড়বে। আর একদিনও বাইরে থাকলে তোকে প্রাণে বাঁচানো যেত না!

গঙ্গানারায়ণের মুখখানি ভাবলেশহীন। বাল্যের সহপাঠীর মুখের দিকে সে একবার তাকিয়েও দেখলো না।

সেই রাত্রিটা গঙ্গানারায়ণকে আটক করে রাখা হলো হাজতে। পরদিন বিকেলে এত্তেলা এলো যে তাকে পাঠাতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে দেখতে চান।

শৃঙ্খলিত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণকে আনা হলো সেখানে। ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে আরও একজন উপস্থিত ছিল। সাহেবের বিশেষ বন্ধু নীলকর ম্যাকগ্রেগর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর স্বদেশবাসী সুহৃদকে জিজ্ঞেস করলেন, ইজ দিস দা ম্যান?

ম্যাকগ্রেগরের একচক্ষে ঠুলি পরানো। চিবুকে এখনো চাবুকের দাগ। সে প্রায় গর্জন করে উঠলো, ইয়েস!

ম্যাজিস্ট্রেট সহাস্যে বললেন, বীট হিম।

সঙ্গে সঙ্গে চাবুক নিয়ে ম্যাকগ্রেগর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো গঙ্গানারায়ণের ওপরে। চাবুকের শব্দে বাতাস শিহরিত হতে লাগলো, আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চুমুক দিতে লাগলেন চায়ের পেয়ালায়। খানিকবাদে তিনি বললেন, উহাকে একেবারে প্রাণে মারিও না, ম্যাকগ্রেগর। আমাদের এখানকার দারোগার ও বাল্যবন্ধু। উহাকে একেবারে হত্যা করিলে সে দুঃখ পাইয়া কিছু লিখিয়া ফেলিতে পারে। অবশ্য অচিরাৎ সে দারোগাকে বরখাস্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। তাহার পর সেই দারোগার উপরেও কয়েক ঘা মারিয়া হস্তের সুখ মিটাইও।

অচেতন, রক্তাক্ত অবস্থায় গঙ্গানারায়ণ পড়ে রইলো সেখানে।

বিধবা বিবাহের প্রচলন করাবার সংগে সংগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বিদ্যাসাগর। অকস্মাৎ তাতে বাধা পড়লো।

সরকারী কর্মচারীরা তাঁর কাজকর্মের তারিফ করেন, বিলাতের সংবাদপত্রে তাঁর প্রশস্তি ছাপা হয়, সেইজন্য বিদ্যাসাগর ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁর সব প্রগতি-মূলক কাজে তিনি সরকারের সমর্থন পাবেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার দায়িত্ব দিয়ে সরকার তাঁকে স্পেশাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে নিযুক্ত করেছেন, সেইজন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর স্কুল খুলে চলেছেন। শুধু ছেলেদের জন্য নয়, বালিকাদের জন্যও। বেথুনের নামে কলকাতার স্কুলটি চলছে নানান বাধা বিপত্তি এড়িয়ে, বিদ্যাসাগর সেই স্কুল কমিটির সম্পাদক. কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, গ্রামের অবলাদেরও মুখে ভাষা না জোগাতে পারলে দেশের নারী সমাজের অন্ধকার কিছুতেই দূর হবে না।

স্কুল খোলা খুব কষ্টসাধ্য কিংবা ব্যয়সাধ্য নয়। যে গ্রামের লোকেরা স্কুলের জন্য জমি দিতে চায় এবং গ্রামবাসীরাই চাঁদা তুলে একটি স্কুল ঘর নির্মাণ করে দিতে প্রস্তুত, সেখানেই বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে একটি স্কুলের পত্তন করে আসেন। সেই স্কুলের শিক্ষকের মাস মাহিনা দেবে সরকার। এক একটি স্কুলের জন্য মাসে পনেরো-কুড়ি টাকা, বড় জোর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়ায় ঘুরে ঘুরে বিদ্যাসাগর একটার পর একটা বালিকা বিদ্যালয় খুলে যেতে লাগলেন। এই রকম ভাবে পঁয়তিরিশটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সরকারের টনক নড়লো।

সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে বিদ্যাসাগরকে ডেকে বলা হলো, এত স্কুল খুলে যাচ্ছো, এর খরচ দেবে কে?

বিদ্যাসাগর আকাশ থেকে পড়লেন। এই অশিক্ষিত মূর্খদের দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করার জন্য ইংরেজরা কত বাণী দিয়েছে, এখন খরচের নামে তারা পিছিয়ে যাবে? আর কতই বা খরচ, এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পঁয়তিরিশটি স্কুলের জন্য মাসিক মোট ব্যয় আট শো পঁয়তাল্লিশ টাকা। রাজকোষে এই সামান্য টাকার অকুলান?

কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দেশে শিক্ষার প্রসার চায় কিছু কেরাণী বা নিম্ন-শ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টির জন্য। স্ত্রীলোকদের শিক্ষিত করে সরকারের কোনো লাভ নেই, কারণ স্ত্রীলোকরা তো চাকরি করতে আসবে না। এমন অকাজে অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছে সরকারের থাকবে কেন? বিদ্যাসাগর লম্বা লম্বা চিঠিতে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করলেন, তবু সরকার অটল। এদিকে মাসের পর মাস চিঠি চালাচালির ফলে ঐ পঁয়তিরিশটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে আছে। বিদ্যাসাগর নিজে ঐসব শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছেন, সরকার বেতন না দিলে তাঁকেই দিতে হবে।

আর একটি ব্যাপারও বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করলেন। দক্ষিণ বাংলার ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদটি খালি হওয়ার পর সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে এবার ঐ পদটি বিদ্যাসাগরকেই দেওয়া হবে। গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি

অভিজ্ঞতা আর কারুর নেই। কোনো সাহেবের তো থাকতেই পারে না। তবু ঐ পদটি দেওয়া হলো আর একজন সাহেবকে। চাকুরির ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা আছে, তার ঊর্ধ্বে কোনো নেটিভকে বসানো হবে না।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে আগত এই জেদী পুরুষটির আর একবার ঘাড় বেঁকা হলো। বিদ্যাসাগর পাঁচশো টাকা মাইনের সরকারী চাকরি থেকে পদত্যাগ করলেন।

এখন অবস্থা এমন নয় যে চাকরি ছাড়লে বিদ্যাসাগরকে দারিদ্র্য বরণ করতে হবে। গ্রন্থ রচনা করে তাঁর নিজস্ব আয় যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর মন ভেঙে গেল। শুধু এই ঘটনায় নয়, পর পর আরও কয়েকটিতে।

কয়েক বৎসর আগে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু প্যারীচরণ সরকারের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন রসালাপ করতে। প্যারীচরণ বারাসতের স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, সেখান থেকে তখন হিন্দু স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এসেছেন। প্যারীচরণ ইংরেজিতে যথেষ্ট পণ্ডিত। বারাসতে থাকার সময় একেবারে শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি বই লিখেছিলেন, তার নাম ফার্স্ট বুক—হিন্দু স্কুলে এসে সেই বইটিরই একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য ঘষামাজা করছেন তখন। কথায় কথায় তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, ঈশ্বর, তুমিও একটা শিশুশিক্ষার জন্য বাংলা বই লেখো না কেন! বিদ্যাসাগর প্রথমে কোনো উত্তর দেননি। প্যারীচরণ আবার বলেছিলেন, তুমি কি ভাবছো, তোমার মতন এতবড় পণ্ডিত অ-আ-ক-খ'র বই লিখলে তোমার মান যাবে? কিন্তু শিশুকালে যদি শিক্ষার ভিত্তি পোক্ত না হয়, তাহলে বড় হয়ে পণ্ডিতী বই পড়বেই বা ক'জনা? এসো, তুমি আর আমি মিলে শিশুদের বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ পরিচয়ের ভার লই।

কথাটা বিদ্যাসাগরের মনে লেগেছিল। এর পর একদিন পাল্কীতে যেতে যেতে তিনি অতি সরল কয়েকটি বাংলা বাক্য লিখলেন। "পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফুল ফুটিতেছে।...গোপাল বড় সুবোধ, গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালো বাসে...।" লিখতে লিখতে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা এমন সহজভাবেও লেখা যায়? যুক্তাক্ষর ব্যতিরেকেও বাক্য হয়? সংস্কৃতের অভিভাবকত্ব ছাড়াও বাংলাভাষা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে!

কিছুদিন পরে তিনি প্রকাশ করলেন বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ। প্রকাশের সংগে সংগে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। ঠিক এই রকমই একটা গ্রন্থের যে অভাব ছিল, সেটা বোঝা গেল যখন বিদ্যাসাগর এই রকম একটি বই লিখলেন। বিক্রয় হতে লাগলো হাজারে হাজারে। বিদ্যাসাগর নিজেই প্রকাশক, সুতরাং অর্থাগম হতে লাগলো প্রচুর। তারপর রচনা করলেন বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। পর পর আরও কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক লিখে ফেলার পরে তাঁর নিয়মিত অর্থাগম হতে লাগলো। তিনি রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

চাকরি ছাড়ার পরও তিনি ধনী, কিন্তু অর্থশূন্য এবং ঋণগ্রস্ত। আয়ের চেয়ে তাঁর ব্যয় বেশী। বিধবা বিবাহের জন্য তাঁকে ঋণ করতে হয়েছে প্রচুর। বিধবাদের বিবাহের জন্য তিনি শুধু আইনের প্রবর্তন করিয়েই নিরস্ত হননি। সামাজিক ভাবে এই বিবাহ চালু করার জন্য তিনি নিজে একের পর এক বিবাহের ব্যবস্থা করে যাচ্ছিলেন। ক্রমে দেখা গেল, এটি যেন তাঁরই একার দায়। খরচ বহন করতে হয় তাঁকেই। এমনও রটে গেল যে কলকাতায় গিয়ে কোনো বিধবা কন্যাকে বিবাহ করলে বিদ্যাসাগরই নববধূর গয়না-গাঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিজে কিনে দেন। বিধবা বিবাহের নামে কেউ কেউ তাঁকে তঞ্চকতা করতেও ছাড়লো না।

যেসব মান্যগণ্য ব্যক্তি এ কাজে তাঁকে সাহায্য করার আন্তরিক আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁরাও একে একে পিছিয়ে গেছেন প্রায় সকলেই। অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভুলে গেছেন। এমনকি তাঁর সুহৃদরাও অনেকেই উদাসীন এখন এ-ব্যাপারে।

চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, যে-কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে কিছুতেই বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। তাঁর একার পক্ষে এতগুলি স্কুলের ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য। তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে চালাবেন। কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি সবিস্ময়ে টের পেলেন যাঁরা মুখে সর্বদা বলেন যে, স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে কোনো সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন না। এ-দেশের মানুষের মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই।

আঘাত শুধু এরকমই নয়, আঘাত আসে অতি কাছের মানুষের কাছ থেকেও। যাদের তিনি সাহায্য করেন, তারাই আড়ালে গিয়ে তাঁর নামে অপবাদ ছড়ায়। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন সামান্য টাকা পয়সার প্রশ্ন তুলে ঝগড়া করলেন কিছুদিন আগে। অথচ, প্রথম যৌবনে এই মদনমোহনকেই তিনি ডেকে এনে সংস্কৃত কলেজে তাঁর থেকে উঁচু পদে চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিছুদিন অবসন্ন, নিরুদ্যম হয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। মনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভগ্ন হলো। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকেন এবং গ্রন্থ পাঠ করেন।

কিন্তু এরকম অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। এক সময় তিনি ভাবলেন, আমি কি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি? মানুষের কথা ভেবে, মানুষের জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রতিও মনোযোগ দেননি। এখন মানুষের ওপর থেকেও যদি বিশ্বাস চলে যায়, তাহলে তিনি কী অবলম্বন করে বাঁচবেন? আবার জোর করে ঝেড়ে ফেললেন মানসিক বিষাদ। ঠিক করলেন যে একটা কিছু কঠিন কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলে জড়তা কেটে যাবে। কিছুদিনের জন্য লেখার কাজ নিয়ে থাকবেন তিনি। এ পর্যন্ত টুকিটাকি ছোটখাটো বই লিখেছেন কতকগুলি কিন্তু বড় কিছু লেখার সময় পাননি। তিনি মহাভারতের অনুবাদ শুরু করলেন, এটি শেষ না করা পর্যন্ত থামবেন না।

মহাভারতের কিছু কিছু অনুবাদ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছেন এই সময় একদিন এক যুবক এলো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যুবকটি তাঁর পূর্ব পরিচিত, কিন্তু তাকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন না। মুখখানি কালি বর্ণ, চক্ষু দুটি কোটরগ্রস্ত, এর ধুতি ও কুর্তা যথেষ্ট মূল্যবান হলেও পা দুটি খালি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে, বাপু?

যুবকটি বললো, গুরুদেব, আমায় বিস্মৃত হয়েচেন? আমি নবীনকুমার সিংহ।

বিদ্যাসাগর নাম শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন। তাঁর ক্রোধের সঞ্চার হলো। এই সব অস্থিরমতি ধনীর দুলালদের সঙ্গে তিনি কোনো সংশ্রব রাখতে চান না। এই নবীনকুমার সিংহ অত্যুৎসাহ নিয়ে এক সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম প্রথম প্রতিটি বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানে সে নিজে উপস্থিত থাকতো। প্রতিটি বিবাহে সে এক সহস্র টাকা সাহায্য করবে, এমন ঘোষণা করেছিল সংবাদ-পত্রে। তারপর হঠাৎ ভোঁ ভাঁ। আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এক সহস্র টাকা দূরে থাক, এক পাই পয়সা দিয়েও আর সাহায্য করে না। অন্যান্য বনিয়াদী ঘরের ছোকরাদের মতন এরও যে পাখা গজিয়েছে এবং উড়তে শিখেছে, সে

সংবাদ একটু একটু কানে এসেছে তাঁর। যতই মুখে আদর্শের বুলি আওড়াক, রক্তের দোষ যাবে কোথায়, সুরা আর বারনারী ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না।

অপ্রসন্ন মুখে তিনি বললেন, চেহারা দেখে চিনবার উপায় নেই, তবে নাম শুনে চিনেছি। তবে আমি তোমার গুরু হলাম কিসে? তোমার মতন দু-চারটে চ্যালা দেখলেই লোকে টের পেয়ে যাবে আমি কী দরের গুরু।

নবীনকুমার বললো, আমি আপনার অতি অযোগ্য শিষ্য। আমি কি আপনার চরণারবিন্দ একবার স্পর্শ করতে পারি?

বিদ্যাসাগর বললেন, যদি ব্রাহ্মণকে প্রণামের মতি থাকে, তবে করতে পারো।

উপবিষ্ট অবস্থায় প্রণাম গ্রহণ করতে নেই বলে বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নবীনকুমার একেবারে তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আমি পাপী, আমি অপবিত্র...।

হু-হু করে কাঁদতে লাগলো সে।

বিদ্যাসাগর এরকম কান্নাকাটি খুবই অপছন্দ করেন। অপরকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখলেই তাঁর চক্ষু সজল হয়ে আসে, এই তাঁর এক মহা দুর্বলতা। এই বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে তিনি অপছন্দ করেন, তবে এর কান্না দেখে তাঁকে কাঁদতে হবে, এ এক জ্বালা!

তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওঠো, উঠে বসে যা বলতে চাও বলো। আমি কোনো মানুষকেই অপবিত্র মনে করি না। তবে তোমার মতন ধনী ব্যক্তিদের আবার কখনো পাপ হয় নাকি? পাপ তো শুধু গরিব-হা-ভাতেদের জন্য।

নবীনকুমার তবু কান্না সামলাতে পারছে না। তার মতন তেজস্বী অহংকারী যুবক এরকম দুর্বলতা আগে কখনো দেখায়নি। কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্যই যেন টলে গেছে। কমলাসুন্দরীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করার পর তার যখন চৈতন্য হয়, তখনই সে কেঁদে উঠেছিল। নিজের কাছে নিজের এমন নিদারুণ পরাজয় সে সহ্য করতে পারেনি। সেদিন বাড়ি ফেরার পথেই সে সংকল্প নিয়েছিল সে আত্মহত্যা করবে।

প্রায় দশদিন সে নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল নিজের শয়নকক্ষে। বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা করেনি। জননী কিংবা পত্নীর অনুরোধে সামান্য কিছু আহার মুখে তোলার ভান করেছে মাত্র। সে আত্মনিগ্রহের চরম দেখতে চেয়েছিল। ক্রমশই বেড়ে উঠছিল তার জেদ, সে ভেবেছিল আত্মহত্যাই তার একমাত্র পরিণতি হতে পারে। নির্জন দুপুরে সে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের গৃহের পিছনের দিকের পুকুরে। সন্তরণ জানে না সে, জলের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে বুক ফাটা যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সে তৃপ্তিতেও বলতে চেয়েছিল, আঃ! আমার শাস্তি শুধু আমি নিজেই দিচ্ছি। আর কেউ না! অবশ্য পরম বিশ্বস্ত এবং সদা অনুগামী দুলালচন্দ্র তাকে ঠিক সময় দেখতে পেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ে এবং উদ্ধার করে আনে। নবীনকুমার দুলালচন্দ্রকে পাঁচবার চপেটাঘাত করে বলেছিল, আমার হুকুম ছাড়া তুই কেন আমাকে তুলিচিস, হারামজাদা!

এর পর সে একদিন দুপুরে বাবার আমলের পুরোনো কেলভিন কোম্পানির একটি পিস্তলে গুলি ভরে তার নলটি নিজের গলায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দেয়। বহুকাল অব্যবহৃত পিস্তলটি নিজেই ফেটে যায় বিকট শব্দ করে, নবীনকুমারের দুটি আঙুল কিছু জখম হয় মাত্র। দু'বার প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় নবীনকুমার প্রাণ হননের চেষ্টা থেকে বিরত হয় বটে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সামাজিক জীবন থেকে। মুলুকচাঁদের আখড়ায় সে আর কখনো পদার্পণ করেনি। তার বন্ধুরা

তাকে কতবার এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে, কিন্তু সে দেখা করেনি কারুর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেই তার চক্ষে সেই দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। স্থূলকায়া কমলাসুন্দরী অতিশয় কাতরভাবে আকুলি বিকুলি করে বলছে, ওগো, আমায় ছুঁয়োনি, আমায় ছুঁতে নেই। আমি যে তোমার মায়ের মতন...আর নেশার ঝোঁকে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য নবীনকুমার তাকে আলিঙ্গন করে জড়িত স্বরে বলছে, নাচ দেকাবে না, নাচ? শুয়ে শুয়ে নাচ? প্রতিবার দৃশ্যটি মনে পড়লে ঘৃণায় তার শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগে। এক বিগতযৌবনা বারবনিতার দূষিত শয্যায় রাত্রি যাপন করতে হয়েছে তাকে। লোকপরম্পরায় সে জেনেছে যে ঐ স্ত্রীলোকটিই ছিল তার পিতার রক্ষিতা। সহ্য হয় না, কিছুতেই সহ্য হয় না! এজন্য সে কারুকে দোষ দিতে পারে না নিজেকে ছাড়া। হরিশকে সে দায়ী করতে পারে না কিছুতেই, কারণ হরিশ কোনো দিন নিজে থেকে তাকে ডাকেনি, তাছাড়া নিজের কাজের সময় ঠিক সে উঠে যেতে পারে, তার মতন গা ভাসিয়ে দেয়নি।

চার পাঁচ মাস এই অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছে নবীনকুমার। গ্রন্থপাঠ করে সে মন ভোলাতে চেয়েছে। তারপর শুরু হলো একাকিত্বের যাতনা। তার পাপের কথা সে কারুকে জানাতে চায়। কিন্তু কাকে? ক্যাথলিকরা যেমন গীর্জায় গিয়ে সব কথা উজাড় করে দিতে পারে, সেইরকম ভাবে। বারবার একটি নামই মনে পড়ছিল তার, কিন্তু তাঁর কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বুঝলো যে, ওঁর কাছে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

এতদিন পর বাড়ির বাইরে এসে নবীনকুমার অনুভব করলো যে মানসিক বৈকল্যের প্রভাব তার শরীরের ওপরেও পড়েছে। চলতে গেলে তার পা কাঁপে, মস্তিষ্কের মধ্যে ঝিম ঝিম শব্দ। কয়েক বৎসর আগে সে গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিল, তখন তার বাঁচার জন্য ব্যাকুলতা ছিল প্রবল। এবারে সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকবলিত হতে গিয়েছিল। এখনো সে জীবন সম্পর্কে বীতরাগ। জুড়ি গাড়িতে ওঠার অনেক পরে দেখলো যে তার দু' পায়ে দু' রকম পাটির জুতো।

বিদ্যাসাগর তার হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, তোমার শরীরের এ অবস্থা হয়েছে কেন? বেশ দিব্যকান্তি ফুটফুটেটি ছিলে! কী পাপ করেছো তুমি শুনি?

অশ্রু সংবরণ করে নবীনকুমার স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। তখনো তার শরীর কাঁপছে।

বিদ্যাসাগর বললেন, বসো। শান্ত হও!

নবীনকুমার তারপরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। চক্ষু শুষ্ক হবার পর ধীর স্বরে সে বললো, আমাকে শাসন করার কেউ নেই। আমি স্বেচ্ছাচারীর মতন চলতে পারি, আমি কুপথে যাই না সুপথে যাই, সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন! কিন্তু আমি আমার মনকে নিজের বশে রাকতে পারিনি, এই আমার পাপ।

এই নবীন যুবকটির কথা শুনে বিদ্যাসাগর খানিকটা সকৌতুক বিস্ময় অনুভব করলেন। এই রকম কাঁচা বয়েসের অধিকাংশ যুবকই তো নিজের মনকে সবশে রাখতে পারে না, এ আর নতুন কথা কী! সদ্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে, এদের পিছনে অজস্র ইয়ার-বক্সী-মোসাহেব জুটে যায়, তারপর মুণ্ডটি চিবিয়ে খায়।

তিনি বললেন, পুরুষকার থাকলেই মনকে নিজের বশে রাখা যায়। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কী প্রকারে সাহায্য করতে পারি, বলো তো বাপু?

—আমার মতন ব্যক্তির কি জীবন ধারণের প্রয়োজন আছে? আমি মরতেও রাজি আচি, যদি আপনি বলেন।

—আমি বললেই মরবে, এ যে বড় বিষম কথা! কেন, মরবে কেন? কী এমন গর্হিত কাজ করেছো? তোমার মতন যুবকের কোনো দিকেই কোনো অভাব নেই, তবু মৃত্যুচিন্তা, এ তো ভারি আশ্চর্যের!

—আমায় কেউ সুরাপান কত্তে নিষেধ করেনি, আমি ঐ নেশা ধল্লে সবাই ভাবতো স্বাভাবিক, তবু আমি বাল্যকাল থেকে সুরাপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিচি। অথচ কখন এক সময়ে আমি সুরাপায়ী হয়ে গেলুম। কুপল্লীতে নষ্ট মেয়েমানুষদের অঙ্গ আমি কখনো কামনা করিনি, অথচ এক রাত্রি অবসানে আমি দেকলুম, আমি সেখেনে শুয়ে আচি। কেন আমার এরূপ বিপরীত মতি? যে কাজে আমার অনুশোচনা হয়, সে কাজ আমি নিজেই করি কেন? আপনি আমায় আত্মস্থ করে দিন।

—তুমি কি আমায় গুরুঠাকুর ঠাওরেছো নাকি? আমি কোনো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে তোমায় সারাতে পারবো না। যদি সুপথে থাকতে চাও, নিজেকে শোধরাতে চাও, নিজের মনকে শক্ত করো!

—মন যার নিজের বশে থাকে না সে কোন্ উপায়ে মন শক্ত করবে?

—শোনো, যারা নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে শেখে, তারা কখনো পরের কথায় নাচে না। তোমার এখনো বুদ্ধি পাকেনি বোঝা যাচ্ছে। বয়সোচিত দুর্বলতায় যদি কিছু কুকর্ম করে থাকো, এখনো ফেরো। সময় বয়ে যায়নি। তোমার অর্থ আছে, দেশের কথা ভাবো, লোকহিতের জন্য কিছু করো। মদ টেনে বয়াটেগিরি করা অতি সহজ, গণ্ডায় গণ্ডায় বড় মানুষের ছেলেরা তো তাই করছে। তুমি যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, তবে নিজের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করো।

—আপনি বলচেন, আমার জীবন ধারণের সার্থকতা আচে?

—কোনো সৎ কাজ করতে পারলেই জীবন ধারণ সার্থক হয়। তুমি তো দু-একখানা বই লিখেছিলে, সেদিকেই আবার মন দাও!

—সামান্য গ্রন্থ রচনায় আমার আর আগ্রহ হয় না। গত পরশু থেকে আমি অন্য একটা কতা ভাবচি। আমি যদি সম্পূর্ণ মহাভারত বাঙ্গালাতে অনুবাদিত করি, তাতে কি আমার পাপস্খালন হতে পারে? মুসলমানরা পুণ্য অর্জনের জন্য কোরান নকল করে, আমিও যদি সেই মতন—

বিদ্যাসাগর নবীনকুমারকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। তাঁর ওষ্ঠে হাস্য ফুটে উঠলো। সদ্য গুম্ফরেখা দেখা দিয়েছে এই যুবকের, এ সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করবে? বলে কী?

—কী বললে? তুমি মহাভারত হাতে লিখে নকল করবে, না বাঙ্গালায় রূপান্তর করবে?

—বাঙ্গালা গদ্যে সমগ্র মহাভারত রচনা করবো।

—তুমি সমগ্র মহাভারত পড়েছো? জানো সে গ্রন্থখানি কত বিশাল?

—আজ্ঞে, বাল্যকাল থেকেই মহাভারত গ্রন্থ আমার বড় প্রিয়, কাশীদাস নয়, মহাত্মা ব্যাসদেব বিরচিত যেটি। সম্প্রতি গত কয়েক মাসে গৃহবন্দী থাকাকালীন আমি আবার আদ্যোপান্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিচি। এ কাজ বিপুল পরিশ্রমসাধ্য আমি জানি, কিন্তু এই শ্রম আমার প্রাপ্য।

বিদ্যাসাগর উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

কয়েক মাস ধরে তিনি নিজেও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, তা কাটিয়ে ওঠার জন্যই তিনি মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই যুবকও সম্পূর্ণ

অন্য কারণে কিছুদিন যাবৎ মনোরোগী, সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এ-ও মহাভারত অনুবাদের কথা চিন্তা করেছে। এই আকস্মিক মিলটি কৌতুক-জনকই বটে।

আরও কিছুক্ষণ নবীনকুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর তাকে বললেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে যেন কয়েক পৃষ্ঠা অনুবাদ করে এনে দেখায়। সেই লেখা দেখে তিনি নবীনকুমারের আন্তরিকতা বিচার করতে পারবেন।

এক সপ্তাহ লাগলো না, দুদিন পরেই নবীনকুমার সঙ্গে নিয়ে এলো স্বরচিত তিন পৃষ্ঠা বাংলা মহাভারত। বিদ্যাসাগর মনোযোগ সহকারে পৃষ্ঠা তিনটি পড়লেন কয়েকবার। তারপর বললেন, তুমি তো সত্যি বড় বিস্ময়কর ছোকরা দেখছি! তোমার রচনায় কয়েকটি ভ্রম আছে, তিন জায়গায় তুমি শ্লোকের ঠিক মতন অর্থ অনুধাবন করতে পারোনি, স্পষ্টই বোঝা যায়, তোমার সংস্কৃত জ্ঞান তেমন নেই। কিন্তু তোমার বাঙ্গালা গদ্যভাষাটি তো বড় চমৎকার। যেমন সাবলীল, তেমনই ঝংকারময়। অপরাপর লেখকদের রচনা আমি পড়ে দেখেছি, এমন গদ্য-ভাষা সহসা চোখে পড়ে না। এরকম প্রাঞ্জল অনুবাদ লোকে আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করবে। তুমি সত্য বলছো, তুমি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করবে?

নবীনকুমার বললো, আপনার পা ছুঁয়ে শপথ কর্তে পারি।

বিদ্যাসাগর বললেন, উত্তম কথা। তুমি এ কাজ একা কিছুতেই পারবে না। সংস্কৃত উত্তমরূপে না জানলে তোমার সারা জীবনের পরিশ্রমেও কোনো কাজ হবে না। তোমার অর্থ আছে, তুমি কিছু পণ্ডিত নিযুক্ত করো। আমিই সেরকম কিছু পণ্ডিত ঠিক করে দিতে পারি। তাঁদের দিয়ে সংস্কৃত শ্লোকগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় করিয়ে নেবে, কিন্তু ওঁদের ঐ অং বং ওয়ালা বাঙ্গালা গদ্য চলবে না, তোমার এই সুন্দর ভাষায় সেই রূপ দাও।

নবীনকুমার বললো, আপনি যেরকম বলচেন, সেরকমই হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, দেরি না করে কাজে লেগে যাও অবিলম্বে। লঘু আমোদ ছেড়ে তুমি এই কঠিন কর্মে নিযুক্ত হলে তোমার উপকার হবে, এবং তা আমারও আহ্লাদের বিষয় হবে। সেইজন্য, আমি নিজে মহাভারতের যে অনুবাদ শুরু করেছিলুম, তা বন্ধ করে দিলুম। তোমার মহাভারতই দেশে প্রচারিত হোক।

নবীনকুমার বললো, আপনি...আপনি মহাভারতের রূপান্তর শুরু করে-ছিলেন? আমি জানতুম না, তবে তো আমার...

বিদ্যাসাগর বললেন, আমি অল্পই করেছি, সেখানেই ক্ষান্ত হবো। ভালোই হলো, আমি অন্য কাজে মন দিতে পারবো। তোমার ভয় নেই, আমি মধ্যে মধ্যে তদারক করে আসবো তোমাদের অগ্রগতি। আমার যেটুকু সাধ্য, তা দিয়ে তোমায় সাহায্য করতে বিরত হবো না।

বাহির বাড়ির একটি অংশকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সজ্জিত করে একটি কর্ম-যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এনে রাখা হয়েছে সেখানে, তাঁদের

সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে কয়েকজন ভৃত্য। ব্রাহ্মণ পাচক নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন রন্ধন করে তাঁদের পরিবেশন করে, যেসব পণ্ডিত স্বপাকে আহার করতে চান, তারও ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত মহাভারতের অনেকগুলি পুঁথি, ছাপা বই, এমনকি পুণা থেকেও আনানো হয়েছে নির্ভরযোগ্য সংস্করণ। নীলকণ্ঠের টীকা সমন্বিত একটি ভাষ্যের পুঁথি নবীনকুমার ক্রয় করেছে বহু টাকা দিয়ে। ক্লৈব্য বা অবসাদ একেবারে দূরীভূত হয়ে গেছে, নবীনকুমার আবার এক অতি চঞ্চল যুবা। সে যেন ঝড়ের আরোহী, অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের বাংলা রূপান্তরের মতন বৃহৎ কাজ সে অনতিবিলম্বে শেষ করতে চায়। তার নিজস্ব ছাপাখানাটি পরিবর্ধিত হয়েছে, কাগজ কেনা হয়েছে রাশি রাশি, সিংহ এস্টেটের সকল কর্মচারী এখন এই কর্মে ব্যস্ত। টাকা-পয়সা যত লাগে লাগুক, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে সবকিছু পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গেছেন।

বাড়ির অন্দর মহলের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ঘুচে গেছে নবীনকুমারের। সে সর্বক্ষণ এখানেই পড়ে থাকে। যদুপতি গাঙ্গুলী এবং বিদ্যোৎসাহিনী সভার আরও কয়েকজন বন্ধু নবীনকুমারের এই নতুন উদ্যমে খুব খুশী হয়েছে, তারা প্রায়ই আসে। অনেকদিন সাক্ষাৎ হয়নি বলে হরিশ মুখুজ্যে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, নবীনকুমার যায়নি।

কয়েকজন পণ্ডিত মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির আক্ষরিক বাংলা তর্জমা করে দেন, কয়েকজন সেগুলিকে সাজিয়ে দেন বাংলা গদ্যে, তারপর নবীনকুমার সেই ভাষার ওপর ঘষামাজা করে। মূলের গাম্ভীর্য রক্ষা করেও সুবোধ্য এবং সাবলীল ভাষা সৃষ্টির যেন জাদু আছে তার হাতে। দুটি-একটি শব্দের বিকল্প এবং কোথাও কোথাও ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন করলেও যেন নতুন রূপ এসে যায়।

এক অপরাহ্নে নবীনকুমার এই কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন, এমন সময় তার ডাক এলো অন্দর মহল থেকে। ডেকে পাঠিয়েছেন বিম্ববতী। ঈষৎ বিরক্ত হলেও নবীনকুমার জননীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। কলম নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো। স্ত্রী সরোজিনী কিছুদিন হলো পিত্রালয়ে গেছে বলে নবীনকুমার রাত্রে নিজকক্ষে শুতেও আসে না ইদানীং। অধিক রাত্রি পর্যন্ত পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করার পর সেখানকারই একটি কক্ষে শুয়ে পড়ে। এখন মহাভারতই তার ধ্যান জ্ঞান।

নতুন থান বস্ত্র পরে একটি হরিণের চামড়ার আসনে বসে আছেন বিম্ববতী। তাঁকে দেখে সবিশেষ বিস্মিত হলো নবীনকুমার। স্বতই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, একি, মা?

স্বামীর মৃত্যুর পর কেশচ্ছেদন করেছিলেন বিম্ববতী। তারপর তাঁর পিঠ-ছাওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ চুল আবার ফিরে এসেছিল অনেকদিন আগেই। আজ নবীনকুমার দেখলো, বিম্ববতী আবার মস্তক মুণ্ডন করেছেন, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দনের তিলক, সম্পূর্ণ বৈরাগিণীর বেশ। তাঁর চক্ষু দিয়ে দর দর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অন্তত আট নয় দিন এক পলকের জন্যও বিম্ববতীর সঙ্গে দেখা হয়নি নবীনকুমারের। মায়ের এই পরিবর্তনের ব্যাপার সে কিছুই জানে না। যতই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোক, তবু এখনো প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় দুর্গা প্রতিমার মুখের সঙ্গে সে তার মায়ের মুখের মিল খুঁজে পায়। তার মায়ের মতন রূপসী সে আর একজনও দেখেনি এ পর্যন্ত।

মায়ের এই বেশ এবং চক্ষে জল দেখে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সে ছুটে এলো মায়ের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে বিম্ববতী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন, ছুঁসনি! ছুঁসনি! ওরে ছুঁসনি আমাকে!

নবীনকুমার স্থাণুবৎ হয়ে গেল। তার মা তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করছেন? এই সেদিনও কাছাকাছি এলেই মা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, ছোট্‌কু, তোকে বুকে ধরলে আমি যা শান্তি পাই, তেমন শান্তি ভগমান আর কিছুতে দেননি আমায়।

বিহ্বল কণ্ঠে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি আমায় ছুঁতে বারণ করচো? আমি পাপ করিচি বলে?

বিম্ববতী বললেন, ওমা, তুই পাপ কর্বি কেন? বালাই ষাট। চর্তুর্দিকে এঁটো কাঁটা, সকড়ি, কেউ ছুঁয়ে দিলে আমায় আবার চ্চ্যান কত্তে হবে। তুই একটু দূরে বোস, তোর সঙ্গে আমার কতা আচে।

—তুমি কাঁদছিলে কেন মা? আমি তোমার মনে নতুন কোনো দুঃখ দিয়িচি?

—নারে, তুই কেন দুঃখ দিবি? তুই আমার মানিক, আমার সোনা, আমার সাত রাজার ধন...আমি কানচিলুম মনের সুখে...ভগমান আমায় ডেকেচেন তাঁর ছিপাদ-পদ্মে আমার ঠাঁই হবে।

—ভগবান তোমায় ডেকেচেন? ভগবানের কোন সাধ্য আচে মা, যে এক্ষুনি তোমায় ডেকে নেবেন? আমি আচি না? ডাকলেই হলো!

—শোনো ছেলেমানুষের কতা। আমি কি মরার কতা বলচি। ছোট্‌কু, আমি কাল হরিদ্বারে রওনা হবো।

—কাল?...হরিদ্বারে? তুমি কী বলচো, মা? কোন্ হরিদ্বার?

—তুই বাবু একটু ভালো করে বোস দিনি। অমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে কতা হয়? আমি মনস্থির করে ফেলিচি, ছোট্‌কু। জগদ্‌গুরু একনাথজীর কাচে আমি দীক্ষা নিইচি, গুরু কৃপা করে তেনার ছিচরণে আমায় স্থান দেবেন বলেচেন। গুরু বলেচেন, আমায় সোংসার ধম্মো এবার ত্যাগ কত্তে। চর্তুর্দিকে এত নোংরা, কলকেতা শহরটা বড় অশুচি, কেউ এখন আর পাইখানা যাবার পর চ্চ্যান করে না, দাসী মাগীগুলো বাসী কাপড়ে বাসন মাজে, সেই বাসনে আমরা খাই, ঠাকুর পুজো হয়, এঃ, ঘেন্না, ঘেন্না! ম্যাগোঃ! এত অশুচি!

সত্যিকারের ঘৃণায় কেঁপে উঠলো বিম্ববতীর সর্বাঙ্গ। নবীনকুমার বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলো জননীকে। মাত্র এই কয়েকটি দিনে এত পরিবর্তন? এরই মধ্যে অনেক শীর্ণা হয়ে গেছেন তিনি, চোখ দুটি অস্বাভাবিক।

বিম্ববতী বললেন, এখেনে আমার শরীল এমন অশুচি হয়ে গ্যাচে যে ঘষে ঘষে ছাল চামড়া তুলে ফেললেও দোষ কাটবে না। আমি হরিদ্বারে চলে যাবো। কালই।

—হরিদ্বার কতদূরে, তুমি জানো, মা? বেশ তো, সেখেনে যেতে চাও, ব্যবস্থা করা যাবে। কালই কেন?

—তোকে আর কোনো ব্যবস্থা কত্তে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি নিজেই করে ফেলিচি, পোঁটলা পুঁটলি বাঁদা হয়ে গ্যাচে। গুরুদেব কাল রওনা হচ্চেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাবো। তোর যদি ইচ্ছে হয় আমায় দশ বিশ ট্যাকা মাসোহারা পাটাস, আর না পাটালেও আমার চলে যাবে। ঈশ্বর যা জোটাবেন তাই খেয়ে থাকবো।

—তুমি কার ওপরে রাগ করেচো বলো তো মা? আমি অনেক দোষ করিচি

জানি।

—ওমা, ফের ঐ কতা। তুই কেন দোষ কর্বি, ছোট্‌কু। তুই পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত লেকাচ্চিস, এ তো কত বড় পুণ্যের কাজ। তোর জন্যে এ বাড়ি ধন্য হলো, এই বংশ ধন্য হলো। স্বগ্যো থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ কর্বেন। কিন্তু আমায় চলে যেতেই হবে যে, ছোট্‌কু।

—তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে?

—তোকে কোতায় ফেলে যাবো? তুই আমার বুকের ধন, বুকের মধ্যে থার্কবি। ভগমানের পর গুরুদেব, তারপর তুই। একনাথজী বলেচেন, মায়ার বাঁদন না কাটালে প্রকৃত ভালোবাসা হয় না। দূরে চলে গেলে তুই সবসময় আমার নয়নে নয়নে থার্কবি।

—তোমার যাওয়া হবে না। এই একনাথজী সাধুটি আবার কে? কবে সে এ বাড়িতে এলো? তেনার সঙ্গে আমি দেকা করতে চাই।

—দেকা কর্বি, নিশ্চয়ই কর্বি। বাবা তোকে আশীর্বাদ কর্বেন। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। হরিদ্বারে নির্মল গঙ্গাজলে চ্চ্যান কর্বো, আমার শরীর মন পবিত্র হয়ে যাবে, আর ভগমানের কাচে প্রার্থনা কর্বো, যাতে তোরা সুখে থাকিস, ভালো থাকিস।

—মা, আমি যদি তোমায় জোর করে ধরে রাকি? যদি কান্নাকাটি করি, না খেয়ে থাকি, তাও তুমি যেতে পারবে?

—ছিঃ, অমন কতা বলতে নেই, ছোট্‌কু। ভগমান যাকে ডেকেচেন, তাঁকে কি আটকাতে আচে?

অনেক পীড়াপীড়ি, অনুনয় বিনয়েও নিবৃত্ত করা গেল না বিম্ববতীকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তিনি যাত্রার পাকাপাকি ব্যবস্থা আগে থেকেই করে তারপর খবর দিয়েছেন নবীনকুমারকে। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা নিজের উদ্যোগে এতখানি ব্যবস্থা জীবনে আগে কখনো করেননি বিম্ববতী। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অনড়।

যাবেনই যখন তখন আর কয়েকটি দিন সময় চাইলো নবীনকুমার বিম্ববতীর কাছে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। আগামী কাল যাত্রার পক্ষে অতি শুভ দিন। তখনই নবীনকুমার মহাব্যস্ত হয়ে বন্দোবস্তের জন্য লেগে গেল। সাতজন দাস-দাসী যাবে বিম্ববতীর সঙ্গে। একজন গোমস্তার হাতে টাকা দিয়ে দেওয়া হলো যেন পৌঁছেই সে বিম্ববতীর জন্য হরিদ্বারের শ্রেষ্ঠ বাড়িটি ক্রয় করে ফেলে। তেমন বাড়ি না পাওয়া গেলে একনাথজীর আশ্রমেই যেন একটি পাকা বাড়ি তৈরি করে ফেলা হয়। সারা বাড়িতে একটা হুলুস্থূলু পড়ে গেল।

এর পর বিধুশেখরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। তাঁকে কেউ ডেকে পাঠায়নি। কিন্তু সেই বৃদ্ধের কানে সব খবরই যথাসময়ে পৌঁছোয়। তিনি এলেন বেশ গভীর রাত্রে।

তখন নবীনকুমার মায়ের ঘরে উপস্থিত। বিধুশেখরকে সে সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। যথারীতি বিধুশেখর এক কথায় প্রস্তাবটি উড়িয়ে দিলেন প্রথমে। আবার বাদ-প্রতিবাদ চললো। কিন্তু যে বিম্ববতী ভয়ে বিধুশেখরের সামনে এতদিন কথা বলতেই পারেননি, আজ তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথায় আজ আর ঘোমটা দেননি তিনি, সব কথার উত্তরে তাঁর এক কথা, তাঁকে যেতেই হবে।

বিধুশেখর এক সময় নবীনকুমারকে বললেন, তুই একবার ঘরের বাইরে যা তো, তোর মাকে আমি একটু বুঝিয়ে বলি।

বিম্ববতী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, ছোট্‌কু থাক।

তারপরেই উচ্ছ্বসিত কান্না এসে গেল বিম্ববতীর চক্ষে। তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ধরা গলায় বললেন, আপনি...আপনি ছোট্‌কুকে স্নেহের চোকে দেকবেন...তার যাতে মঙ্গল হয়...সে কতা দিয়েচে কখুনো আপনার অবাধ্য হবে না, আপনায় সঙ্গে তার অসৈরণ হবে না!

ধীর, শান্ত কণ্ঠে বিধুশেখর বললেন, এ কী কথা বলচো, বিম্ব। ছোট্‌কু আমার প্রাণাধিক, তার সঙ্গে আমার বিবাদ হবে কেন? বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে মতভেদ হয়, কিন্তু ছোট্‌কু যে আমাদের সকলের বড় আদরের, তার কোনো ইচ্ছেতে আমি বাধা দি? কি রে ছোট্‌কু বল?

নবীনকুমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

বিধুশেখর নবীনকুমারের কাঁধে হাত রেখে নরমভাবে বললেন, তোর মায়ের সঙ্গে আমি একটু একলা কতা বলবো, একবার শেষ চেষ্টা করে দেকি, বোঝাতে পারি কিনা। তীর্থ করতে হয় নবদ্বীপ যাক না, কিংবা বৈদ্যনাথধাম ঘুরে আসুক, ভালো রাস্তা! কী, ঠিক বলিচি কিনা? তুই একটু বাইরে যা। দেকিস, ইদিকে যেন কেউ না আসে।

নবীনকুমার এই সন্ধ্যার ঘটনায় বড় দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সে বাইরে বেরিয়ে গেল। বিধুশেখর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বিম্ববতীর বিছানায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন গলার কাছে।

বিম্ববতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঠিক করে ফেলেছেন যে বিধুশেখরের স্পর্শ করা পালঙ্কে তিনি আর ঘুমোবেন না। আজ রাতটা তিনি ভূমিশয্যায় কাটাবেন।

হাতের ছড়িটা মেঝেতে কয়েকবার ঠুকে বিধুশেখর বিম্ববতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। তিনি এমনভাবে বিম্ববতীর দিকে চেয়ে আছেন যেন বনের ব্যাঘ্র দেখছে তার পলায়মান শিকারকে।

কড়া গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো? তোমার ছেলেকে, না আমাকে?

বিম্ববতী অন্যদিকে মুখ রেখেই বললেন, ভগমান আমায় ডেকেচেন, তাই আমায় যেতে হবে।

বিধুশেখর শুকনোভাবে হাসলেন। তারপর ছড়িটা আবার ঠুকতে ঠুকতে বললেন, অদ্ভুত কতা। ভগবান কখনো কোনো স্ত্রীলোককে ঘর ছাড়াবার জন্য ডাকেন না। স্ত্রীলোকদের ঠাঁই শুধু সংসারে।

- তিনি মীরাবাঈকে ডেকেচিলেন!

- হুঁ। মুখে বুলি ফুটেচে দেকচি। এসব বুলি ঐ একনাথজীর শেকানো। ও ব্যাটা বোষ্টম। ও বোষ্টম হয়ে শাক্ত বাড়ির বৌকে দীক্ষে দেয় কোন্ সাহসে? আর তুমিই বা আমার মতামত না নিয়ে ওর কাচে গ্যালে কেন?

এবার বিম্ববতী মুখ ফেরালেন। এখনো তাঁর দুই নেত্রে অবারিত জলোচ্ছ্বাস। এত কান্নাও বিম্ববতীর বুকে জমা ছিল!

তিনি হাত জোড় করে বললেন, আপনি দয়া করুন। যাবার সময় আপনি ভালো মনে আমায় বিদায় দিন। আমায় আশীর্বাদ করুন। আমি ঠাকুরের কাচে আপনার নামে ..

বিধুশেখর বিছানার ওপর চাপড় মেরে বললেন, ইদিকে এসো। আমার পাশে এসো। আমার বুকের ওপরে মাতা দিয়ে কাঁদো। আমার বুক খালি করে তোমার

জন্যে সব ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়িচি।

বিম্ববতী দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, না। না। অশুচি। আমায় আর কেউ ছোঁবে না।

—বিম্ব, কেন আমায় দুঃখ দিচ্চো? তোমায় ছেড়ে আমি যে আর থাকতে পারবো না, তা বুঝতে পারো না? কেন খেলচো আমায় নিয়ে? তুমি চলে গিয়ে আমায় মেরে ফেলতে চাও? এই শেষ বয়েসে, তোমার জন্যে সব ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়িচি আমি। বহুদিন চেপে রাখা কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলচে। শুধু সামাজিকতা আর বিষয় সম্পত্তির কতা চিন্তা করে নিজেকে বঞ্চিত করিচি আমি। এ শরীরের আর কিচু নেই। এ চোখে দেখি না। বাঁ পায়ে জোর নেই, তবু এ শরীর তোমাকে চায়। বিম্ব, এসো, আমার বুকে মাতা রেকে একটু কাঁদো। আমিও কাঁদবো তোমার সঙ্গে।

বিম্ববতী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বৃদ্ধ বয়েসে বিধুশেখরের লালসার চরম রূপ দেখেছেন তিনি। কোনো রকম খবর না দিয়ে যখন তখন বিধুশেখর চলে আসেন বিম্ববতীর কক্ষে। বিনা দ্বিধায় দ্বার বন্ধ করে দেন। চতুর্দিকে দাস-দাসী গিস্ গিস্ করছে, তারা কি দেখে না? নবীনকুমার এদিকে বিশেষ আসে না, কিন্তু পুত্রবধূর চোখে তো পড়তে পারে। বাধা দেবার সাধ্য নেই বিম্ববতীর, ভয়ে এবং লোকলজ্জায় তিনি চিৎকার করে উঠতে পারেননি। বিম্ববতীর শরীরে আর যৌবন নেই, রূপ নষ্ট করার জন্য তিনি চুল কেটে ফেলেছেন, তবু তাঁর প্রতি বিধুশেখরের অসম্ভব লোভ। ভোগ করার শক্তিও নেই বিধুশেখরের, যেন তাঁর উদরাময় রোগীর মতন ক্ষুধা! সব সময় আলিঙ্গনের জন্য হাহাকার করেন।

বিম্ববতীকে নীরব দেখে বিধুশেখর বললেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের শত দোষ ক্ষমা করিচি। আমি চাইলে অ্যাতোদিন তোমাদের পথের ভিকিরি করে দিতে পাত্তুম! সেজন্য একটু কৃতজ্ঞতা নেই তোমার? শোনো, আমার উইলে আমার সম্পত্তির অর্ধেক লিকে দিইচি ছোট্কুর নামে। আমি মলে সে আমার মুখাগ্নি করবে, আমায় পুন্নাম নরক থেকে বাঁচাবে। যতই সে উড়িয়ে পুড়িয়ে খর্চা করুক, এত সম্পত্তি পেলে সে রাজসুখ ভোগ করে যাবে। তার বিনিময়ে তুমি আমায় কিচু দাও, বিম্ব। আমি ভিকিরি হয়ে তোমার কাচে হাত জোড় করে চাইচি, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তুমি আমায় দয়া করো। আর যে কটা দিন বেঁচে আচি তোমার ঐ নরম হাতের সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

বিম্ববতী তার কোনো উত্তর দিলেন না। বিধুশেখর আরও অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু বিম্ববতী প্রস্তর মূর্তি। অকস্মাৎ আবার রূপ বদলে গেল বিধুশেখরের।

—ইদিকে আয়, হাবামজাদী!

বিম্ববতী মুখ থেকে সমস্ত ভয় মুছে ফেললেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, না। আর আমি পাপ কর্বো না।

—তোকে আমি ছেকল দিয়ে বেঁদে রাকবো। তুই কোতায় যাবি ভেবিচিস? চতুর্দিকে তোর কেলেঙ্কারির কতা রাষ্ট্র করে দোবো। ছেলে পাবার লোভে তুই একদিন স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে ব্যাভিচার করিসনি? এখুন সতীপনা দেকানো হচ্চে? পাছায় কাপড় নেই, মাতায় ঘোমটা? আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবি! দেকি তোর কেমন সাধ্য?

অকম্পিত কণ্ঠে বিম্ববতী বললেন, হ্যাঁ, আমি চলে যাবো, আমায় কেউ আর আটকাতে পার্বে না।

বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বিধুশেখর। লাঠি ভর দিয়ে এক পা এক পা এগুতে এগুতে বললেন, আজ হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বাইরে তোর ছেলে রয়েচে, সবাই রয়েচে, তাদের সবার সামনে বলে যাবো, তুই আসলে বিধু মুকুজ্যের রাঁড়। ভালো চাস তো এখনো আমার বুকে আয়।

বিম্ববতী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। বিধুশেখর খুব কাছাকাছি এসে পড়তে তিনি বললেন, ছোঁবেন না, আমায় ছোঁবেন না, নোংরা, নোংরা, সব নোংরা—

বাঁ হাতটি উঁচু করে মধ্যমার একটি আঙটি দেখিয়ে বিম্ববতী বললেন এর মধ্যে বিষ আচে, ক'দিন হলো জোগাড় করে রেকিচি, আর একবার অশুচি হলেই আমি বিষ খাবো।

দাঁতে দাঁত চেপে বিধুশেখর বললেন, তবে তাই খা। বিষ খেয়ে ছটপটিয়ে মর আমার সামনে, আমি তাই দেকি।

বিম্ববতী আঙটির ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে ইষ্টদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আঙটিটা ওষ্ঠে ঠেকাতে গেলেন।

ডান হাতের ছড়িটা তুলে বিধুশেখর খুব জোরে মারলেন বিম্ববতীর বিষময় আঙটি সমন্বিত হাতটিতে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি। আমি জানি। কামের দ্বারা কামের উপশম হয় না। বল-প্রয়োগে নারীকে ভোগ করা পশুর প্রবৃত্তি। সবই জানি। শুধু এটাই জানতুম না, মানুষের মন সব সময় যুক্তি মানে না। এক এক সময় ন্যায়-নীতি-ধর্ম সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। বিম্ব, যদি হরিদ্বারে গিয়ে শান্তি পাও, তবে তাই যাও। আমি এখেনেই জ্বলে পুড়ে মর্বো, সেই আমার নিয়তি। আমা দ্বারা তোমার ছেলের কোনো ক্ষতি কখনো হবে না। তুমি সেই কতাটাই শুনতে চাও তো? কতা দিলুম।

বিম্ববতী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সাতদিনের মধ্যে পরপর দুজন বাহকের হাতে দুটি পত্র এসে পেঁৗছোলো। একটি লিখেছে বিরাহিমপুর কুঠীর নায়েব ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য আর একটি লিখেছে পুলিশের এক দারোগা। দুটি চিঠিতেই গঙ্গানারায়ণের সংবাদ আছে, কিন্তু দুজনের সংবাদ দু'রকম।
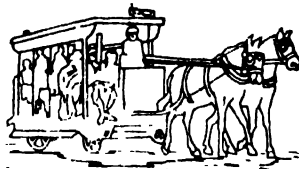
দাঁত পড়ে গেলে অনেকেই নিরামিষাশী হয়। হাটখোলার মল্লিকবাড়ির প্রবল বিলাসী পুরুষ কালীপ্রসাদ মল্লিক নিদারুণ উদরের ব্যামোয় ভুগে একেবারে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। পেটে আর এক ফোঁটাও সুরা সহ্য হয় না। সেজন্য তিনি এখন ঘোরতর সুরানাস্তিক। মদ্য-পান রূপ অনাচারের ফলে দেশ যে একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে, একথা তিনি এখন সর্বত্র বলে বেড়ান। সিমলের জগমোহন সরকার মদ্যপান বর্জনের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছেন, কালীপ্রসাদ মল্লিক তার জন্য চাঁদা দেন উদার হস্তে।

একটা কিছু নেশা তো দরকার। তাই কালীপ্রসাদ মল্লিক এখন মেতেছেন পুজোআর্চায়। ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে আর মদের আসর বসান না বলে কালীপ্রসাদ মল্লিক তো আর দরিদ্র হয়ে যাননি। বাড়িতে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

তাঁর পিতার আমলেই, এক বেতনভোগী বামুন দু বেলা ঘণ্টা নেড়ে ফুল-বেলপাতা ছুঁড়ে দিয়ে যেত এতদিন। এবার কালীপ্রসাদের আনুকূল্যে সেই কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ডটির ভাগ্য ফিরলো। অবিলম্বেই সেই নারায়ণ-শিলাকে বসানো হলো সোনার সিংহাসনে। তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো শ্বেতপাথরের নতুন মন্দির, প্রতিদিন মহা ধুমধামে পুজো হয় সেখানে। সন্ধ্যেবেলা সেখানে চক্ষু মুদে দু হাত জোড় করে ধ্যানাসনে বসে কালীপ্রসাদ উদাত্ত গলায় বলেন, প্রভো, দয়া করো! তুমিই মোক্ষ, তুমিই মুক্তি! রাখে হরি, মারে কে?

এছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রইলো। এত কম পার্বণে কালীপ্রসাদের মন ভরে না। ইতু, মঙ্গলষষ্ঠী, সুবচনী, ত্রিনাথ, মনসা ইত্যাদি পুজারও প্রচলন করলেন তিনি। প্রায়ই ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ইত্যাদি পবিত্র বাজনার শব্দে পল্লীর বাতাস কাঁপে। শত শত কাঙাল-আতুর প্রসাদ পায়।

শতবর্ষ পার হয়েও বৃদ্ধ জগাই মল্লিক এখনো বেঁচে আছেন। আর তাঁর সান্ধ্যভ্রমণের ক্ষমতা নেই। সন্ধ্যাকালে ভৃত্যেরা তাঁকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় বারান্দার রেলিংয়ে। দন্তহীন মুখখানি নেড়ে বৃদ্ধ শুধু ম-ম-ম-ম শব্দ করে চলেন। পুত্রের যে মতি ফিরেছে, এটা বেশ বুঝতে পারেন জগাই মল্লিক, কানে কিছুই শুনতে পান না তিনি, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি একেবারে যায়নি। নতুন মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢাকী ঢুলীদের নৃত্য করতে দেখলেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

কনিষ্ঠপুত্র চণ্ডিকাপ্রসাদের অবশ্য বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কালী-প্রসাদ ছোট ভাইকে মদ-মেয়েমানুষের পথ থেকে সরিয়ে ধর্মকর্মের দিকে আনার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এ পথেও আমোদ কম নেই। অনেকে বাহবা দেয়, অনেকে ধন্য ধন্য করে, বিশেষত হজমশক্তিটি ঠিক থাকে। আর মধ্যরাত্রে বুক-জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘটি ঘটি জল পান করতে হয় না কালীপ্রসাদকে। এখন প্রতিরাত্রেই তাঁর সুস্থির নিদ্রা হয়। কিন্তু চণ্ডিকাপ্রসাদ এ সব কথায় কর্ণপাত করেনি, এখনো তার যৌবন আছে, শরীরে শক্তি আছে এবং তার মস্তিষ্কে মগজ নামক বস্তুটি বরাবরই কম। উপরন্তু, দু বৎসর আগে সে একটি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিল। এক যবনী বারাঙ্গনার বাড়িতে তার নিজস্ব রক্ষিতার শয্যায় তারই বেতনভুক্ এক তবলাবাদককে অসমীচীন অবস্থায় অকস্মাৎ দেখে ফেলে সে এমনই কুপিত হয়ে উঠেছিল যে, প্রকাণ্ড একটি জল-ভর্তি কলসী ওর মাথায় নিক্ষেপ করে। তবলাবাদকটির মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে। এর ফলে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হয় চণ্ডিকাপ্রসাদকে। কালীপ্রসাদ অনেক অর্থ ব্যয় করে সেবার ছোট ভাইকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন কিন্তু এর পরও চণ্ডিকাপ্রসাদ সুপথে আসতে চায়নি।

বিরক্ত হয়ে কালীপ্রসাদ বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে চণ্ডিকাপ্রসাদকে পৃথগন্ন করে দিয়েছেন। এক সঙ্গে অনেক টাকা হাতে পেয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ একেবারে কান্নিক খাওয়া ঘুড়ির মতন আরও বেশী লাট খেতে লাগলো। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় হাতের লাল রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে গান গায়, 'অব্ হজরত জাতে লণ্ডন কো...' আর বেসামাল অবস্থায় বাড়ি ফেরার সময় তার মুখে লেগে থাকে এই গান, 'পরেরো মনেরো ভাবো বুঝিতে কি পারে পরে...।'

এই তিন মহলা বাড়িটির তিনটি দৃশ্য এখানে উপস্থাপিত করা যাক।

কালীপ্রসাদের দুই পুত্র। এদের মধ্যে শিবপ্রসাদ বিবাহাদি করে সংসারী হয়েছে। এত ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও সে স্বভাব-কৃপণ। হাত দিয়ে তার সহজে একটি আধলাও গলতে চায় না। এই কৃপণতার জন্যই সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হতে পারলো না, সে তার জীবনীশক্তিও ব্যয় করতে ভয় পায়। বাপের বিষয়-

সম্পত্তি এখন সে-ই দেখে। কালীপ্রসাদের তিন কন্যার মধ্যে একজন মাত্র বিধবা, সে তার জননী ক্ষেমংকরীর ছত্রছায়ায় থাকে। ক্ষেমংকরীর এখন বড় সুখের দিন, তাঁর স্বামী কালীপ্রসাদ সর্বক্ষণ বাড়ি থাকেন।

কালীপ্রসাদের কনিষ্ঠপুত্র অম্বিকাপ্রসাদ কিছুদিন কলেজে পড়েছিল, তার ফলে সে একজন অতিমাত্রায় নব্য যুবক। প্রিন্স অব ওয়েলসের ছবি দেখে সেই কায়দায় সে চুলের টেরি কাটে এবং গলায় একটি সিল্কের স্কার্ফ বাঁধে। তার স্বাস্থ্যটি বেশ ভালো এবং তার শিকারের খুব শখ। প্রায়ই সে বন্দুক ও বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে শিকারে যায়। কিছুদিন আগেই সে জয়নগর-মজিলপুরে গিয়ে একটি বাঘ মেরে এসেছে।

এই অম্বিকাপ্রসাদ তার পিতার আকস্মিক পরিবর্তনে তেমন প্রসন্ন হয়নি। আর কোনো কারণে নয়, এত ঢাক-ঢোল, খোল-কর্তালের শব্দ তার সহ্য হয় না। এর আগে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎকারই হতো কদাচিৎ। এখন পিতার এই সরব উপস্থিতিতে সে ব্যতিব্যস্ত। প্রায়ই সে তার ফ্রেন্ডদের নিয়ে ঘরে বসে ফিলজফি কিংবা সোসিয়াল প্রব্লেম বিষয়ে আলোচনা করে নিজের ঘরে। তার বন্ধুরা দু-একজন ব্রাহ্ম, কয়েকজন নিরীশ্বরবাদী, তারা এ বাড়িতে এত পুজোর ধুম দেখে হাসে, তাতে অম্বিকাপ্রসাদের বড় অপমান হয়।

স্বাস্থ্যচর্চার দিকে ঝোঁক বলে অম্বিকাপ্রসাদ এতদিন নেশা-ভাঙ্ কিছু করেনি, পিতার প্রতি বিরক্ত হয়ে এক সময় শুরু করে দিল। প্রথমে একটু-আধটু, তারপর অবাধ। তার বন্ধুদের মধ্যে যারা নিরীশ্বরবাদী তাদেরই বোতল-আসক্তি বেশী। দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার সময় সহসা তারা কোটের পকেট থেকে চ্যাপ্টা ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে চুমুক দিতে শুরু করে।

একদিন বিধবা বিবাহের গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা এবং ব্র্যাণ্ডিপান বেশ জমে উঠেছে। ক্রমে নেশার মাত্রাটি বেশ চড়ে যাবার পর বাইরের মন্দিরে সাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো। অম্বিকাপ্রসাদের এক বন্ধু মুখ বিকৃত করে বলল, আঃ, একটু শান্তিতে ডিপ থিংকিং করারও উপায় নেই! আর এক বন্ধু বলল, অম্বিকে, তোমার ফাদারের এই সাত্ত্বিক ড্রাম বিটিংয়ে যে আমাদের কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। আর একজন বললো, ওরে বাপ রে বাপ! উইণ্ডোগুলো সব ক্লোজ করে দে এক্ষুনি! আর একজন বললো, গুগ্‌গুলের ধোঁ আমার সহ্য হয় না। আমার হাঁচি আসচে—

বন্ধুদের বিদ্রূপে নিদারুণ মর্মপীড়া বোধ করে না, এমন পুরুষ দুর্লভ। তখন পিতা মাতা তুচ্ছ। অম্বিকাপ্রসাদ দারুণ চটে উঠে হাতের অর্ধসমাপ্ত ব্র্যাণ্ডির বোতলটি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে মারলো বাইরে। সেই সঙ্গে বললো, ধুর শালা!

ব্র্যাণ্ডির বোতলটি কারুকে আহত করলো না বটে, কিন্তু সেটি অদূরে ভেঙে যাবার পর ভিতরের তরল পদার্থটির গন্ধ কালীপ্রসাদের নাকে আসতেই তিনি দারুণ চমকে উঠলেন। মন্দিরের চাতালে মোসাহেব পরিবৃত হয়ে চক্ষু বুজে বসে তিনি তখন প্রভো, প্রভো করছিলেন, এমন সময় সেই পরিচিত গন্ধ, যা নাকে এলেই তাঁর বিবমিষা আসে। আজ বিবমিষার বদলে এলো রাগ। তিনি সোজা চলে এলেন ছেলের ঘরে।

তার ছেলে বাড়িতেই সুরার আসর বসিয়েছে দেখে ক্রোধে তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। তিনি নিজে বাড়িতে কখনো এ জিনিস স্পর্শ করেননি।

আর এখন তো তিনি মদ্যপানের ঘোর শত্রু, তাঁর ছেলে সে কথা জেনেও মান্য করেনি? তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বেল্লিক! ছুঁচোর দল! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা ফেঁদিচিস! আমি...আমি...আমি...

আর কথা বলতে পারলেন না কালীপ্রসাদ, ছুটে এসে সজোরে এক চড় কষালেন ছেলের গণ্ডদেশে।

চপেটাঘাত খেয়ে প্রথম কয়েক মুহূর্ত দিশাহারা হয়ে গেল অম্বিকাপ্রসাদ। বন্ধুদের সামনে এতখানি অপমান! বন্ধুরা তাকে মনে করছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

পরক্ষণেই উল্টে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিতার ওপরে। ইস্টুপিট, ওল্ড ফুল বলতে বলতে সে প্রাণপণে মারতে লাগলো কিল-চড়-ঘুঁষি। ব্যাপার বেগতিক দেখে বন্ধুরা দুদ্দাড় করে ছুটে পালালো। এর মধ্যে শব্দ শুনে এসে পড়লেন অম্বিকা-প্রসাদের জননী ক্ষেমঙ্করী। তিনি দু হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে বলতে লাগলেন, ওরে কী কচ্চিস! এ কী সব্বোনাশ! ও ছোটখোকা, ও বাপ আমার!

এক সময় নিবৃত্ত হয়ে হাঁপাতে লাগলো অম্বিকাপ্রসাদ। তখন কালীপ্রসাদ মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছেন।

ব্যাকুলভাবে কেঁদে ফেলে ক্ষেমঙ্করী বললেন, ও অম্বিকে, এ কী কল্লি? লোকটা মরে গ্যালো নাকি? তুই পিতৃঘাতী হলি?

নেশায় চক্ষু দুটি করমচার মতন রাঙা, সমস্ত মুখ ঘর্মাক্ত অবস্থায় অম্বিকা-প্রসাদ সগর্বে বললো, মরুক। ঐ ওল্ড ফুলটা মরুক না, তাতে ক্ষতি কি? তুমি কাঁদচো কেন, মা? তোমার চিন্তা নেই। বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর, তোমার আমি আবার বে দেবো! এবার ভালো করে দেকে শুনে একটা রিফর্মড বাবা নিয়ে আসবো! সেই বাবাতে আমাতে তোমার সঙ্গে বসে হেলথ ড্রিংক কর্বো! এই বুড়োটা না মলে নতুন বাবা আসবে কী করে?

সে যাত্রায় কালীপ্রসাদ মরলেন না অবশ্য। এবং কনিষ্ঠপুত্র যে-হেতু সব সময়ই বেশী প্রশ্রয় পায়, তাই গর্ভধারিণীর অনুরোধে অম্বিকাপ্রসাদকে তিনি ক্ষমাও করে দিলেন।

চণ্ডিকাপ্রসাদের মহলে দুর্গামণি প্রায় একাই বাস করে। তার স্বামী সপ্তাহান্তে একবারও ঘরে ফেরে কিনা সন্দেহ। এখন নিজেই হুণ্ডি-কাটার অধিকারী হবার ফলে অর্থ সংগ্রহের কারণেও তার বাড়িতে আসার তেমন কোনো দায় নেই। কখনো কখনো সে বিষয়-সম্পত্তির তদারকির অছিলায় মফস্বলে যায়, তখন সঙ্গে যায় বজরাভর্তি ইয়ার-বক্সী, পেটি পেটি মদ্য ও একাধিক বারবনিতা। যে গতিতে সে চলেছে, তাতে আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে সব কিছু ফুঁকে দিতে সক্ষম হবে।

দুর্গামণি পুত্রহীনা। পঁচিশ বৎসর বয়স, যৌবনের সমস্ত সম্পদ এখন তার শরীরে। দুর্গামণির মুখশ্রীতে লাবণ্যের চেয়ে তেজের ভাবটাই বেশী। বেশ দীর্ঘ-কায়া, সবচেয়ে দর্শনীয় তার চুল। এক ঢাল কোঁকড়া, ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুল তার পিঠ ছেয়ে থাকে। দুর্গামণি কখনো চুল বাঁধে না, পায়ে আলতা পরে না, মুখে পমেটম মাখে না। কিছুরই অভাব নেই তার। অনেক দাসদাসী, তবু সে এক বন্দিনী।

দুর্গামণি কিছুটা লেখাপড়া জানে। স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। আর সেটাই তার জ্বালা। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তার সারাটা জীবন এমনভাবেই কাটবে। ফরাসডাঙ্গায় তার পিত্রালয়। বেশ বুনিয়াদী বংশের কন্যা সে, এখন সে বংশের অবস্থা পড়ন্ত। কারুকে কিছু না বলে দু-বার এ বাড়ি থেকে পালিয়ে

সে একা চলে গিয়েছিল ফরাসডাঙ্গায়। প্রথমবারের সময় তখনও এ বাড়িতে যৌথ সংসার ছিল, গৃহকর্তা হিসেবে কালীপ্রসাদ লোক পাঠিয়ে ভ্রাতৃজায়াকে আবার পিত্রালয় থেকে আনিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দুর্গামণির ভাইয়েরাই জোর করে তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায় কিছুদিন বাদে। বয়স্থা সধবা স্ত্রীলোকদের বেশী দিন বাপের বাড়ি থাকতে নেই। তাতে দুই কুলেরই অপবাদ হয়। তা হলে দুর্গামণি কোথায় যাবে?

এ বাড়িতে কুসুমকুমারীই তার একমাত্র বন্ধু। যদিও কুসুমকুমারী তার থেকে বয়েসে বেশ কিছুটা ছোট। তবু তার সঙ্গেই দুর্গামণির মনের কথা হয়। দুর্গামণির কথা শুনে সরলা কুসুমকুমারী চমকিত, শিহরিত হয়ে ওঠে।

দুর্গামণি বলে, আমার এক এক সময় কী ইচ্ছে যায় জানিস, কুসোম? ইচ্ছে যায়, বাজারে গিয়ে নাম লেকাই। নটী হই!

কুসুমকুমারীর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে যায়।

দুর্গামণি বলে, কেন এখুনো যাইনি জানিস? শুধু আমার মায়ের জন্যে। আমি পাপ-পুণ্যের পরোয়া করিনি! এই জীবনেই তো নরক যন্তোন্না পাচ্চি, এর চে আর কী বেশী শাস্তি পাবো? কিন্তু আমার মা বড় ভালো, তার মনে দুঃখু দিই কী করে বল? আমি নষ্ট হলে, আমি পাপ কল্লে আমার বাপ-মায়ের বংশে কলঙ্ক লাগবে, সেই কতা ভেবে আমি যেতে পারি না। তা হলে সারা জীবন এইভাবেই পচে মত্তে হবে? আমাদের মতন পোড়াকপালীদের আর কোন্ পথ খোলা আচে?

একটু থেমে সে আবার বলে, আর একটা পথ খোলা আচে বটে। কিন্তু আমি মত্তে চাই না রে, কুসোম। আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে!

দুর্গামণি অনেকবার কুসুমকুমারীকে প্ররোচনা দিয়েছে তার স্বামী অঘোরনাথকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে। দুর্গামণির মতে, এমন অনারোগ্য হিংস্র উন্মাদকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করে দেওয়ায় কোনো পাপ নেই। তাতে সে-ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচবে। কুসুমকুমারীও বাঁচবে।

এ সব কথা শুনে কুসুমকুমারী তার নীলবর্ণ চক্ষু দুটি পরিপূর্ণ ভাবে মেলে চুপ করে চেয়ে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না।

এক এক সময় দুর্গামণি কুসুমকুমারীর চিবুকটি নিজের করতলে ধরে বলে, তুই বড় সুন্দর রে, কুসোম। তোর মিতেনীর বর যে তোর নাম দিয়েছিল 'বনজ্যোৎস্না' বড় সাত্থক নাম। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, আমি নিশ্চয় বিয়ে কত্তুম তোকে। আর যদি তা না হতো, তা হলে জোর করে ব্যাভিচার কত্তুম তোর সঙ্গে।

সমস্ত বড় মানুষদের বাড়ির মতন, এ বাড়িতেও একগুচ্ছের আশ্রিত পরিজন থাকে। কেউ পল্লবিত শাখা প্রশাখার আত্মীয়, কেউ গ্রাম সম্পর্কের। সত্যপ্রসাদ নামে একটি যুবক এ-বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। একদিন কী কারণে অম্বিকাপ্রসাদের সঙ্গে তার মতান্তর হওয়ায় তাকে বিদায় নিতে বলা হলো। নিজের বই-পত্র ও পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে যুবকটি যখন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কেরাঞ্চি গাড়ির অপেক্ষায়, সেই সময় ছাদ থেকে দুর্গামণি দেখতে পেল তাকে। ছেলেটির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে মমতা হলো দুর্গামণির। সে একজন ভৃত্য পাঠিয়ে ডেকে আনালো ছেলেটিকে। তার মুখে সব কথা শুনে দুর্গামণি বললো, যেতে হবে না তোমায়, তুমি এ মহলার নিচের তলায় থাকো।

এ নিয়ে অন্য মহলে দুর্গামণির নামে পাঁচ কথা কানাকানি হলো ঠিকই। কিন্তু দুর্গামণি সে সব গ্রাহ্য করে না।

সত্যপ্রসাদ ছেলেটি লাজুক প্রকৃতির। শৈশবে পিতৃহীন। দুর্গামণির চেয়ে সে বৎসর চারেকের ছোট। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। দুর্গামণি তাকে ডেকে এনে তার কাছ থেকে কলেজের গল্প শোনে। এক এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যদি পর-জন্ম বলে কিছু থাকে, তবে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই। তখন তোমাদের মতন আমিও কলেজে পড়বো। যখন খুশী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, আসবো।

সত্যপ্রসাদ নানাপ্রকার বাংলা বই এনে দেয় দুর্গামণিকে। ইংরেজী বই থেকে গল্প পড়ে পড়ে শোনায়। শ্রোতা হিসেবে কুসুমকুমারীও এসে জুটে যায়। মাঝে মাঝে তারা তাস খেলে। মল্লিকবাড়ির দ্বিতীয় মহলের এক নিভৃত কক্ষে ওরা তিন সঙ্গী একত্র অনেক সময় কাটায়।

একদিন দুর্গামণি কুসুমকুমারীকে বললো, জানিস কুসোম, আমাদের সত্যর কিন্তু তোকে খুব পচন্দ! তুই অত দূরে দূরে বসিস কেন, ওর একটু কাচ ঘেঁষে বসলেও তো পারিস!

কুসুমকুমারীব মুখখানি লজ্জারুণ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সে বলে, যাও, খুড়ী, ও রকম কতা আর বলবে না। তা হলে আর তোমার কাচে আসবো না।

দুর্গামণি বলে, আহা, লজ্জায় তো মুখ একেবারে গোলাপ ফুলের বন্ন হয়ে গ্যাল। আমি সব বুজি, সত্য তোর দিকে কেমন ভারি ভারি চোক করে চায়, খেলায় তোকে ইচ্ছে করে জিতিয়ে দেয়। আমি ফরাসডাঙ্গার দত্তবাড়ির মেয়ে, আমার চোককে কে ফাঁকি দেবে?

কুসুমকুমারী শরীরে ভালো করে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি চল্লুম।

দুর্গামণি তার হাত চেপে ধরে বলে, পুরুষমানুষের গা থেকে একটা তাপ বেরোয়, কাচে গেলেই টের পাওয়া যায়। তুই টের পাস না? ঐ তাপে গা শেঁকতে বড় আরাম। পোড়ারমুখী, সারাটা জীবন এমনভাবে কাটাবি? শুদু কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকবি!

কুসুমকুমারী এবারে খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দেয়, তোমার যদি অত শক, তো তুমিই কেন বসো না ওর গা ঘেঁষে?

দুর্গামণি বলে, দূর, ও তো আমার হাঁটুর বয়িসী। আমি কি ওকে ঐ চোকে দেকতে পারি? আমি যদি তেমন মনের মানুষ পেতুম, তা হলে প্রাণ খুলে তার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা কত্তুম। আমার তো পাপ-পুণ্যির ভয় নেই। কিন্তু আমায় কেউ চায় না রে, কুসোম। আঁটকুড়ি হয়েই জীবনটা কাটাতে হবে আমায়।

একদিন সত্যপ্রসাদ আর ওরা দুজন তাস খেলছে এমন সময় নিচতলায় হল্লা শোনা গেল। এ হল্লার সঙ্গে ওরা পরিচিত। বিশেষ কোনো কারণে চণ্ডিকাপ্রসাদ বাড়ি ফিরেছে। তাকে পালকি থেকে নামানো, সিঁড়ি দিয়ে তোলা, সে এক বিরাট পর্ব, ভৃত্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। সিঁড়ির কাছে শোনা যাচ্ছে চণ্ডিকাপ্রসাদের জড়িত কণ্ঠের সেই একই গান।

এই সময় খেলা ভেস্তে যায়, কুসুমকুমারী এবং সত্যপ্রসাদ দ্রুত প্রস্থান করে। কোনো কোনো সময় দিনের বেলা হলে দুর্গামণিও চলে যায় এ মহল ছেড়ে। আজ দুর্গামণি বললো, দাঁড়া। একটুক্ষণ ভেবে আবার বললো, তুই চলে যা, কুসোম। সত্যপ্রসাদ থাক।

কুসুমকুমারী চলে যাবার পর সত্যপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালো দুর্গামণি।

সত্যপ্রসাদ কম্পিত কণ্ঠে বললো, বৌঠান্—

হাত তুলে তার কথা থামিয়ে দিল দুর্গামণি। তারপর তুমির বদলে তুই সম্বোধন করে তাকে বললো, তোর কোনো ভয় নেই। আমি আচি না! যা বলবো শুনবি।

সত্যপ্রসাদের হাত ধরে তাকে দুর্গামণি নিয়ে এলো নিজের শয়নকক্ষে। বিছানা থেকে সুজনিটা তুলে বললো, তুই এখেনে শো, আমি তোর পাশে থাকবো। খপরদার, আমাকে ছুঁবি না, চোক বন্ধ করে থাকবি। আমি না বললে চোক খুলবিনি।

সত্যপ্রসাদের পাশে শুয়ে পড়লো দুর্গামণি, বুক থেকে আঁচল খসিয়ে লাস্যময়ীর ভঙ্গি করে রইলো। তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। কক্ষের দ্বার খোলা।

একটু পরেই ভিতর মহলে ঢুকে পড়লো চণ্ডিকাপ্রসাদ। পুরুষ ভৃত্যরা আর এ পর্যন্ত আসে না। টলতে টলতে নিজের কক্ষের দিকে এগোলো, মুখে তখনও সেই গান। নিজের রক্ষিতার শয্যায় এক তবলিয়াকে দেখে যার মাথায় খুন চেপেছিল, সে নিজের পত্নীর কক্ষের দিকে একবার দৃকপাত পর্যন্ত করলো না, দুর্গামণিকে ডাকলোও না, কোনোক্রমে নিজের কক্ষের পালঙ্কে ধড়াস করে পড়লো।

একটু পরেই তার প্রবল নাসিকা গর্জন শুরু হবার পর দুর্গামণি আস্তে উঠে নিজের বেশবাস সামলে নিয়ে বললো, তুই এবার যা, সত্য!

সত্যপ্রসাদ চলে যাবার পর দুর্গামণি নিজের আঙুলের নোখগুলো যেন মার্জারীর মতন ধারালো করে তুললো, তারপর ফালা ফালা করে ছিঁড়তে লাগলো নিজের মাথা-দেওয়ার রেশমী বালিশটা।

তৃতীয় মহলে অঘোরনাথকে নিয়ে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অঘোরনাথ নিজের পত্নী কিংবা জননীকে একেবারেই চিনতে পারে না। সে একমাত্র চেনে বাড়ির এক অতি বৃদ্ধা দাসীকে। তার জন্মের সময় এই দাসীটিই ধাত্রীর কাজ করেছিল। শুধু এই ধাত্রীর হাতে ছাড়া আর কেউ খাবার দিলে সে খায় না। মোটা লোহার শিকল দিয়ে দুই হাত ও পা বেঁধে রাখা হয়েছে অঘোরনাথের, কারণ সে অতিশয় হিংস্র। উন্মাদ হবার পর থেকে তার আর কোন রোগ হয় না, এমনকি জ্বর পর্যন্ত হয় না, দিন দিন তার শরীর হয়ে উঠছে দৈত্যের মতন, শরীরের পরতে পরতে ময়লা এবং নিজের মূত্র-পুরীষের মধ্যে বসে থাকে সে। প্রাচীনা দাসীটি তাকে মায়ের অধিক সেবা করেছে এতদিন, কিন্তু মাত্র দু'দিনের জ্বরে সে চিরকালের মতন চলে গেল।

এখন অঘোরনাথের কাছে কে যাবে? কে তার মুখে আহার তুলে দেবে? কেউ সামনে ঘেঁষতে সাহস পায় না। অঘোরনাথের জননী এর আগেই পুত্রের কাছ থেকে এমন পদাঘাত পেয়েছেন যে তাঁর কোমর ভেঙে গেছে, আর তিনি সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেন না।

তিনদিন চারদিন হয়ে গেল অঘোরনাথের মুখে এক দানা অন্ন ওঠেনি। সে চক্ষু দুটি গোলাকার করে এদিক ওদিক চায়, মনে হয় সেই দাসীটিকে খুঁজছে। কয়েকজন তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করেও প্রচণ্ড হুংকার শুনে পালিয়ে এসেছে। অঘোরনাথের জননী মেঝের পাথরে কতবার মাথা ঠুকলেন, কত চিকিৎসক ডেকে আনা হলো, কিন্তু কোনো সুফলই দেখা গেল না। সকলের মনোভাব এই যে, একমাত্র কুসুমকুমারীই আন্তরিক চেষ্টা করলে ওকে খাওয়াতে পারবে। সতী সাধ্বী রমণীরা স্বামীর জন্য কত কী করে, বেহুলা তার মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর কুসুমকুমারী এটা পারবে না? দুর্গামণিই একমাত্র নিষেধ

করেছিল, তুই খপরদার যাবিনি কুসোম, লোকে যাই বলুক, ও পাগল তোকে প্রাণে মেরে দেবে।

হলোও তাই। কুসুমকুমারী ঠাকুরঘরে প্রণাম করে, গুরুজনদের পায়ের ধুলো নিয়ে পায়েসের বাটি নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে। যেন সে স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করতে যাচ্ছে। অঘোরনাথ প্রথমেই জোড়া পায়ে পদাঘাত করলো না, শিকারকে কাছে আসতে দিল। হাঁটু গেড়ে বসে কুসুমকুমারী যেই একটি হাত বাড়িয়েছে, অমনি অঘোরনাথ কামড়ে ধরলো তার কাঁধ, ঠিক যেন বাঘে ধরেছে এক হরিণীকে। দ্বারবানরা লাঠির ঘা মেরে মেরে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, দুর্গামণিও হাতে লাঠি ধরে কষিয়ে দিল কয়েক ঘা। কুসুমকুমারীকে যখন ছাড়িয়ে আনা হলো তখন তার বামদিকের কাঁধের এক খাবলা মাংস উঠে এসেছে, সে চেতনা হারিয়েছে অনেক আগেই!

পরদিনই বাগবাজারে পিত্রালয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কুসুমকুমারীকে। সেখানে থাকতে থাকতেই সে সংবাদ পেল যে একুশ দিন উপবাসের পর অঘোরনাথ প্রাণত্যাগ করেছে। সপ্তদশী কুসুমকুমারী বিধবা হওয়ায় একমাত্র অঘোরনাথের জননী ছাড়া খুশী হলো আর সকলেই। কুসুমকুমারীর শরীরে তার স্বামীর একমাত্র চিহ্ন রইলো বাম স্কন্ধের ঐ ক্ষতস্থানের দাগ।
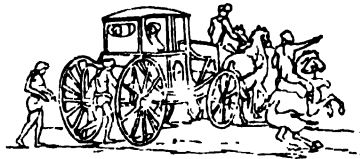
মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু এক পত্র লিখলেন তাঁর বন্ধুকেঃ মহাকবিরা যে কত অসম্ভব জায়গা থেকেই জন্মায়! স্বর্গ থেকে বেদব্যাস হঠাৎ নেমে এলে কতই না চমকিত হতেন আজ! যে-ব্যক্তির গায়ে সব সময় বীয়ারের গন্ধ, গোরু-শুয়োর-মুর্গীর মতন নিষিদ্ধ খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু যার মুখে রোচে না, যার অঙ্গে সর্বসময় সাহেবী পোশাক, যে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষাকে এতই ভালোবাসে যে নিজের দেশের ভাষা সম্পর্কে সব সময় ঘৃণায় নিন্দামন্দ করে, সেই ব্যক্তিই কিনা হঠাৎ হয়ে গেল এক প্রথম শ্রেণীর হিন্দু কবি! সে এমনই স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় বিষয় নিয়ে লিখলো, যে-সব বিষয় নিয়ে মুনি-ঋষিরা ইঙ্গুদি গাছের ছায়ায় বসে আলোচনা করতে করতে ধন্য হয়ে যান!

কী ব্যাপার, মধু, এই অধঃপতিত দেশের কবিতাকে জাতে তুলবার জন্য, তুই এমন প্রতিদানহীন কাজের ভার গ্রহণ করলি যে? ইংরাজীতে লিখলে, ইংরাজী পত্রের সম্পাদনা করলে তোর কত সুনাম হতো!...বোধ হয় উপরওয়ালার অভিপ্রায়ই অন্য রকম। যা হোক, এই যে কাজ তুই করলি, তার জন্য একটা পুরস্কার তুই পাবি অন্তত—অমরত্ব।

মধুসূদন উত্তর দিলেন, কী করে জানলে, ভায়া, যে রেভারেণ্ড ডক্টর বেদব্যাস গোমাংস খেতেন না আর ছিলিপ ছিলিপ করে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতেন না? তুই জেনে রাখ, রাজ, রাশিয়ার সমস্ত রাজকীয় ধন রত্ন তুচ্ছ করেও আমি নিজের দেশের কবিতার সংস্কারের কাজে লেগে থাকবো!

মধুসূদন এখন অহংকার এবং অত্যুৎসাহে যেন ফেটে পড়ছেন। দেশের শিক্ষিত সমাজে তাঁর নামে জয়-জয়কার। যাতে হাত দিচ্ছেন, তাতেই সোনা ফলছে।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয় কি না এই নিয়ে তর্কাতর্কির পর লিখে ফেললেন, "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য"। বিদ্বানপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহে" খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করলেন। সেই কাব্য পাঠ করে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন রসিক পণ্ডজন। বাংলা ভাষাতে এমন উচ্চাঙ্গের কাব্য সম্ভব? শব্দ সংস্থাপনের গুণে একই সঙ্গে এতে মিলে আছে গাম্ভীর্য আর মাধুর্য।

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপানি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি।

ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নতুন, অনাস্বাদিতপূর্ব। আর এ সব লিখেছে কি না হ্যাট-কোট পরা এক ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি! আদালতের দোভাষীর কণ্ঠে প্রাচীন আর্য সভ্যতার মনোরম চিত্র সংবলিত এমন মধুর সঙ্গীত!

একই সঙ্গে নাটক রচনায় হাত দিলেন মধুসূদন। অর্থের বিনিময়ে বেলগাছিয়ার রাজাদের জন্য তাঁকে "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করে দিতে হয়েছে বটে কিন্তু পদে পদে বিতৃষ্ণায় তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। এই নাকি নাটক! যেমন কাঁচা ভাব, তেমনই নীরস ভাষা। রাজারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নাটক-অভিনয়ের আয়োজন করেছেন, অনেক ভালো নাটক তাঁদের পাওয়া উচিত।

মধুসূদন নিজেই কলম ধরলেন, শুরু হলো শর্মিষ্ঠা। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বাল্যকালেই কিছু জানা ছিল, মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে প্রথম দিকে খেয়াল বশে সংস্কৃত চর্চা করতে গিয়ে আবার ঐ দুটি মহাকাব্য পড়া হয়ে যায় মধুসূদনের। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহ-কাহিনীর মধ্যে শর্মিষ্ঠাকেই বেশী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। এই রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে নিয়েই নাটক গড়ে তুলতে লাগলেন।

দু-এক পাতা লেখেন আর পড়েন মধুসূদন, সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে উচ্চ-কণ্ঠে পঙ্‌ক্তিগুলি উচ্চারণ করেন। মনের মধ্যে একটা দ্বিধা থেকে যায়। কবিতা লেখা হয় আপন খেয়ালে অথবা আবেগের বশে, কিন্তু নাটকের কিছু নিয়ম কানুন আছে। এটা ঠিক নাটক হচ্ছে তো? কারুর কাছ থেকে একটু পরামর্শ পেতে বাসনা হয়। আসলে পরামর্শ নয়, মধুসূদন চান তাৎক্ষণিক উচ্চ প্রশংসা। পাঠ করা মাত্রই কেউ ধন্য ধন্য করলে তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি হয়। কিন্তু সে রকম কেউ নেই। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে চির অনুরক্ত বন্ধু গৌরদাস বসাক এখন কলকাতায় নেই, চাকরির উপলক্ষে তাঁকে যেতে হয়েছে বালেশ্বরে।

গৌরদাসের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে নিয়মিত। এক চিঠিতে গৌরিদাস লিখলেন, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তুই নাটকটি একবার রামনারায়ণ তর্ক-রত্নকে দেখালে পারিস! নাট্যকার হিসেবে ওঁর প্রভূত খ্যাতি, নাটকের রীতিনীতি ঠিক হয়েছে কিনা, উনিই বুঝবেন!

কিছুটা দ্বিধা করে তারপর মধুসূদন রাজি হলেন। কিছুটা অন্তত যাচাই না করেই সম্পূর্ণ নাটকটি বেলগাছিয়ার রাজাদের হস্তে দিলে তারপর সবাই যদি হাসাহাসি করে? যদি বলে, এ তো নাটক নয়, এ যে গর্ভস্রাব!

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে ডেকে পাঠালেন মধুসূদন। তিনি এলেন না। গোমাংসভোজী ফিরিঙ্গির বাড়িতে পদার্পণ করেন না তিনি। তবু মধুসূদন

লোক মারফৎ "শর্মিষ্ঠা" নাটকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠিয়ে দিলেন তর্ক-রত্নের কাছে। সঙ্গে এক পত্র লিখে অনুরোধ জানালেন যে, মহাশয় যদি এই নাট্য-রচনার ব্যাকরণগত অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব। এজন্য যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদানেও সম্মত রহিলাম।

পাণ্ডুলিপি-বাহক ফিরে এসে জানালো যে, সে ভুল করে কাগজের পুলিন্দাটি পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে দিতে গেলে তিনি আঁৎকে উঠেছিলেন একেবারে। সেটি মাটিতে রাখার পর তিনি তার ওপর গঙ্গাজলের ছিটা দিয়ে শুদ্ধ করে নেন আগে। তারপর কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে দেখে দু-চার দিবস পর মন্তব্য জানাবেন বলেছেন।

এর পর বেলগাছিয়ার রাজবাড়িতে একদিন নাটুকে রামনারায়ণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মধুসূদনের। বক্ষ একটু দুর দুর করতে লাগলো তাঁর। ইনি কী বলবেন কে জানে? নাটুকে রামনারায়ণের মন্তব্যের মূল্য আছে, অন্তত রাজাদের কাছে তো আছেই।

রামনারায়ণ শ্লেষ হাস্যে বললেন, মহাশয়, গঙ্গাজল দিয়া শুদ্ধ করে লইলেই বা কী হয়, এখনো আপনার নাটকে যে ম্লেচ্ছ গন্ধ ভুর ভুর করে। ব্যাকরণাশুদ্ধির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এ রচনায় সংস্কৃত নাটকের রীতি তো কিছুই মান্য করেন নাই! নান্দী পাঠ কই, সূত্রধর কই? একেবারে বিদেশী ভাব। এ যে সাহেবের লেখা বলে প্রতীয়মান হয়! যদি বলেন, তো আগাগোড়া ঢেলে সাজায়ে দি।

মধুসূদন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মহাশয়ের অত পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই কো! পাণ্ডুলিপি ফিরত পেলে কৃতার্থ হই!

ক্রোধে মধুসূদনের শরীর জ্বলে যেতে লাগলো। টিকিধারীটা বলে কি! তাঁর নাটক ঢেলে সাজাবে? অন্যের কলম ধার করে তাঁর নাটক দাঁড়াবে! কোনো প্রয়োজন নেই। উত্থান বা পতন যাই হোক, তাঁকে নিজের রচনা নিয়েই দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী ভাব, থাকলোই বা বিদেশী ভাব, সাহিত্য কি কখনো দেশ কালের ওপর নির্ভর করে? শেক্সপীয়রের রচনা তবে আমরা উপভোগ করি কী ভাবে? মূরের কবিতায় প্রাচ্য তত্ত্ব আছে, সেজন্য কেউ কি তাঁকে নিন্দে করে? বাইরনের কবিতায় এসিয়াটিক ভাব আছে, সেজন্য কি বাইরনকে ইংরেজদের কম ভাল লাগে? কার্লাইলের গদ্যে তো জার্মান প্রভাব!

মধুসূদন ঠিক করলেন, তিনি নিজের সামর্থ্যেই রাস্কেল পণ্ডিতগুলিকে হতচকিত করে দেবেন। ওদের লেখনী পর্যন্ত স্তব্ধ করিয়ে দেবেন তিনি।

শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা সমাপ্ত হলে মধুসূদন সেটি পাঠিয়ে দিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কাছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের সঙ্গে মধুসূদনের বিসম্বাদের কথা আগেই রাজাদের কানে গেছে। তবু নাটকটির দোষগুণ বিচারের জন্য কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষত এই নাটক মঞ্চে অভিনীত হলে দোষ ত্রুটি সকলের কানে লাগবে। তাঁদের সভাপণ্ডিত দেশবরেণ্য আলঙ্কারিক তর্কবাগীশের কাছে নাটকটি পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, যে-সব স্থল আপত্তিকর কিংবা দোষজনক, সে-সব জায়গায় দাগ দিয়ে দিতে।

নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে রীতিমতন একটি সভা ডাকা হলো 'শর্মিষ্ঠা' নাটক আলোচনার জন্য। মধুসূদন এবং প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশও উপস্থিত। তর্কবাগীশের হস্তে শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি, ওষ্ঠে মৃদু মৃদু হাস্য। সে হাস্যে শ্লেষের বদলে যেন স্নেহের ভাবই বেশী। তর্কবাগীশ বয়েসে যথেষ্ট প্রাচীন, মধুসূদনের প্রায় দ্বিগুণ, জীবনে কখনো সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করেন না। ঠেঙো ধুতির ওপর গায়ে

একটি মুগার চাদর। মধুসূদন তাঁর দিকে সরাসরি চেয়ে রইলেন, আজ আর তাঁর সংশয়ের লেশমাত্র নেই।

তর্কবাগীশ বললেন, বাপুহে, তোমার এই নাটকটি অনেকে অতি উত্তম বলবে, আবার এতে দোষেরও অবধি নেই।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপত্তিকর জায়গাগুলোতে দাগ দিয়েচেন?

তর্কবাগীশ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, না, দেইনি। ভুলের সংখ্যা অসংখ্য, তাহলে পুরোটাই দাগাতে হয়, কিছুই বাকি থাকে না।

সভাপণ্ডিতের উদ্দেশে রাজা বললেন, পোন্‌মোয়াই, আপনার কতা তো ঠিক বুজতে পাচ্চিনি, কেমন যেন প্রহেলিকা মনে হচ্চে। একবার বলচেন, অনেকে অতি উত্তম বলবে, আবার বলচেন, পুরোটাই ভুলে ভরা!

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ওষ্ঠে সেই মৃদু হাস্য লেগেই আছে। তিনি বললেন, আমি যে চোখ দিয়ে দেখছি, সে রকম চোখ এ দেশে আর গোটা দু তিন লোকের আছে। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ফতে হয়ে যাবো, তখন এই সব বই-ই চলবে, বাহবা বাহবা পড়ে যাবে!

মধুসূদন উঠে দাঁড়িয়ে সগর্বে বললেন, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঠিকই বুঝেচেন, আপনাদের যুগ শেষ। আমি বাঙ্গালা কাব্য জগতে নতুন যুগ প্রবর্তন করবো। এই "শর্মিষ্ঠা" আমার দুহিতা সমা। এই নাটকটি রচনার কারণ দেকিয়ে আমি কবিতাকারে একটি প্রস্তাবনা লিকিচি। আপনাদের অনুমতি হলে সেটি এখেনে পড়ে শোনাতে পারি।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, অবশ্যই পড়ুন!

তর্কবাগীশ বললেন, হ্যাঁ বাবা, পড়ো, শুনি।

মধুসূদন একটু অস্বস্তির সঙ্গে একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তাঁর বদলে অন্য কেউ পড়ে দিলে আরও ভালো হতো। তাঁর বাংলা উচ্চারণ ভালো নয়। কণ্ঠস্বরও মচকানো। সবচেয়ে ভালো হতো, যদি অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলী এটা পড়তেন, কিন্তু কেশববাবু এ সভাস্থলে উপস্থিত নেই। সকলে উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছে বলে শেষ পর্যন্ত ভরসা করে মধুসূদন নিজেই পড়তে লাগলেন।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়!
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগো মাগো বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

মধুসূদনের পাঠ সাঙ্গ হওয়া মাত্র সভাসদরা বিলেতি কায়দায় চটাপট শব্দে করতালি ধ্বনি করে উঠলো। কেউ কেউ বললো, ব্রাভো, ব্রাভো। কেউ কেউ আহ্ আহ্ শব্দ করলো।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন মধুসূদনের কাছে। নিজ পরিবারের কোনো অনুজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, বাপু, তুমি যে-টি পাঠ করলে, সেটি সঠিক কবিতা কিনা বলতে পারি না। কয়েক স্থলে মাত্রা স্খলন হয়েছে, লঘু স্বর গুরুস্বর মানোনি, তবু এ রচনা শুনে প্রাণে বড় আরাম হলো। নাম প্রেমচাঁদ, অন্তরে আমার প্রেম রস রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যাকরণ আর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে মাথা তাতেই ঠাসা, সেগুলো ভুলতে পারি না।

তারপর মধুসূদনের মস্তকে বৃদ্ধ তাঁর কম্পিত দক্ষিণ হস্ত রেখে বললেন, আশীর্বাদ করি, তুমি সার্থক হও। বঙ্গবাসীর রুচি সংস্কার কার্যে ব্রতী থাকো!

বেলগাছিয়া মঞ্চে মহা সমারোহে অভিনীত হলো শর্মিষ্ঠা নাটক। দর্শকরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলো এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি। বাংলার লাট বাহাদুর স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং আরও অনেক হোমড়া চোমড়া রাজপুরুষ এসেছিলেন, মধুসূদন তাঁদের জন্য শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদ করে রেখেছিলেন আগেই। সাহেবরাও মুগ্ধ। অনেকেই বলতে লাগলেন, বাংলায় এটিই প্রথম সার্থক নাটক।

কাজের নেশা পেয়ে বসেছে মধুসূদনকে। "শর্মিষ্ঠা" মহড়ার সময় পাইকপাড়ার রাজারা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, হাস্যরসাত্মক নাটক আমাদের তেমন নেই, অথচ মঞ্চে হাসি তামাসাই জমে ভালো। মাইকেল, আপনি একখানা নাটক ট্রাই করুন না এবার!

একখানা নয়, ঝটাপট পর পর দুখানা প্রহসন লিখে ফেললেন মধুসূদন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। কিছুদিন আগেও পুরো একটি বাক্য বাংলায় বলতে পারতেন না যে ব্যক্তি, প্রহসনের কথ্য ভাষায় তাঁর দক্ষতা দেখে সকলে দ্বিতীয়বার স্তম্ভিত হলো। এবং এত দ্রুত নাটক রচনা করতেও আর কারুকে দেখা যায় না। এ যেন এক জাদুকর!

প্রহসন দুটির পরই মধুসূদন আবার লিখতে বসলেন পদ্মাবতী নাটক। এবার কাহিনীর সারাংশ নিলেন গ্রীক পুরাণ থেকে। তাঁর রচনায় বিদেশী প্রভাবের কথা এদেশে অনেকে কানাঘুষো করে। এবার তিনি দেখিয়ে দেবেন, সরাসরি বিদেশী কাহিনী নিয়েই স্বদেশী নাটক রচনা করা সম্ভব কিনা।

পদ্মাবতী লিখতে লিখতেই মধুসূদনের আবার মন উচাটন হলো। এ তিনি কোন্ পথে চলেছেন? নাটক মানেই তো গদ্য! বাল্যকাল থেকেই তিনি গদ্যের উৎপাত অপছন্দ করেন। কাব্যের সরোবরে অবগাহন করাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী আনন্দের। নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁকে কি শুধু গদ্য-নাটকই লিখে যেতে হবে!

পদ্মাবতী রচনা অর্ধপথে থেমে রইলো। তিনি আবার ফিরে যাবেন কবিতায়। তিনি এমন কাব্য রচনা করবেন যা বাংলায় কেউ কখনো চিন্তাও করেনি। কিন্তু কোন্ বিষয় নিয়ে লিখবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না। কয়েকদিন এই রকম অস্থিরতায় কাটলো। আর অস্থিরতার সময় তাঁর বীয়ার পানও বেড়ে যায়।

মধুসূদনের নাট্য রচনার সাফল্যে তাঁর ছাত্র বয়েসের বন্ধুরা সবাই পুলকিত। চাকুরি উপলক্ষে অনেকে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে আছে, তারা চিঠি লিখে অভিনন্দন জানায়। কলকাতায় যারা থাকে, তারা অনেকে দেখা করতে আসে। মাদ্রাজ থেকে ফেরার পর পুলিস আদালতে সামান্য চাকুরি নিয়ে মধুসূদন যখন দীন অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর কাটাচ্ছিলেন, তখন একমাত্র গৌরদাস বসাক ছাড়া বন্ধুরা কেউ আর তাঁর কুশল সংবাদ নিত না। এখন বন্ধুরা আবার ফিরে আসায় মধুসূদন অভিমান করেন না, বরং তাঁর আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি লাগে। দরাজ হস্তে আপ্যায়ন করেন তিনি, কখনো টাকা পয়সা না থাকলে বন্ধুদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাদেরই খাওয়ান।

রাজনারায়ণ আর গৌরদাস দুজনেই বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছেন। মধুর বাড়িতে প্রায় নিত্য আসেন তাঁরা। খোস গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

একদিন গৌরদাস এসে বললেন, জানিস মধু, আমাদের গঙ্গা ফিরে এয়েচে অ্যাতোদিন বাদে।

মধুসূদন জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গা? কোন্ গঙ্গা?

গৌরদাস বললেন, সেই যে রে, গঙ্গানারায়ণ, আমাদের সঙ্গে পড়তো, সিংগীদের বাড়ির ছেলে, খুব লাজুক, ইনট্রোভার্ট টাইপের—

মধুসূদনের মনে পড়লো না। অন্তত সতেরো বছর গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, মনে না পড়ারই কথা। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

গৌরদাস বললেন, সে বড় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমার সঙ্গে বেশী দেকা হতো না বটে কিন্তু রাজনারায়ণের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ ছেল গঙ্গানারায়ণের। বছর পাঁচেক আগে জমিদারি তদারক করতে গিয়ে গঙ্গানারায়ণ উধাও হয়ে যায়, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি, সবাই ধরে নিয়েচিল যে সে মরেই গ্যাচে, তার শ্রাদ্ধশান্তিও হয়ে গেসলো। সেই গঙ্গা আবার ফিরে এয়েচে! তাজ্জব ব্যাপার!

মধুসূদন বললেন, তাজ্জব না তাজ্জব! এ যে দেকচি এক নতুন নাটকের বিষয়! একদিন নিয়ে আয় তো তাকে।

গঙ্গানারায়ণ নিদারুণ আহত অবস্থায় কৃষ্ণনগর জেলে বন্দী ছিল। সংবাদ পেয়ে নবীনকুমার কয়েকজন কর্মচারী ও উকিল সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যায়। প্রচুর অর্থব্যয় ও তদারকি করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সে জামিনে মুক্ত করে। চিকিৎসায় গঙ্গানারায়ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু তার সারা শরীরে প্রহারের দাগ মিলিয়ে যায়নি। তার নামে মামলা চলছে এখনো।

কলকাতায় এসে গঙ্গানারায়ণ প্রথমেই যোগাযোগ করেছে হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে। গঙ্গানারায়ণের নাম ইতিমধ্যেই হরিশের কাছে পরিচিত। তাঁর মফস্বল সংবাদদাতাগণ গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিয়েছে। নদীয়া যশোহরের চাষীদের কাছে গঙ্গানারায়ণ একজন প্রবাদ-পুরুষ। গঙ্গানারায়ণ যে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, তা এখনো কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা, এখনো যেখানে যত বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, তার মূলে গঙ্গানারায়ণ। তার নাম করে স্থানীয় নেতারা আরও বিদ্রোহের উস্কানি দেয়।

গঙ্গানারায়ণ হরিশকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে যে এসবই গল্প কথা, কিছুই সত্যি নয়, হরিশ ততই হাসেন। তিনি বলেন, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, লোকে বিশ্বাস তো করে। সেটাই তো বড় কতা। আপনি নীলচাষীদের বুকে

ভরসা এনে দিয়েচেন।

গঙ্গানারায়ণ বলে, কিন্তু লাঠি-বন্দুক নিয়ে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর পার পাওয়া যাবে? আইনের সুযোগ নিয়ে দাবি আদায় করতে হবে চাষীদের।

হরিশ বলে, আইনের সুযোগ তো নিতেই হবে। তা ছাড়াও দু-চারটে নীলকর সাহেবকে যদি চাষীরা ঠ্যাঙাতে পারে তো ঠ্যাঙাক না! দু-দশটা নীলকুঠী জ্বলুক।

প্রতিদিন দলে দলে চাষী গ্রামাঞ্চল থেকে আসতে শুরু করেছে হরিশের বাড়িতে। তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানায়। হরিশ তাদের ধমকে বলে, ব্যাটারা কাঁদিস কেন? লড়! লড়তে পারিস না? কেঁদে কেঁদেই তো জন্ম জন্মান্তর গেল।

কৌশল হিসেবে প্রত্যেক চাষীকে দিয়ে নীলকরদের নামে মামলা ঠুকতে লাগলেন হরিশ। তিনি নিজেই দরখাস্তের মুসাবিদা করে দেন। নিজেই ওদের হয়ে দিয়ে দেন কোর্ট ফি। এমন কি চাষীদের কলকাতায় খাওয়া থাকার ব্যয়ভারও হরিশই বহন করেন।

গঙ্গানারায়ণ হরিশের এই কাজে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হলো। প্রতিদিন সকাল থেকে সে হরিশের সঙ্গে থাকে। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পর অবশ্য আর হরিশকে পাওয়া যায় না, তখন তাঁর সুরাপান ও আমোদ ফুর্তি চাই। হরিশ পরিশ্রম করেন অসুরের মতন, আবার তাঁর প্রমোদও সেই রকম।

হরিশ অবশ্য পই পই করে বলে দিয়েছেন, গঙ্গানারায়ণ যেন কোনোক্রমেই শহরে আসা চাষীদের কাছে আত্মপরিচয় না দেয়। গঙ্গানারায়ণের নামে মফস্বলে যে মীথ চলছে, তা চলুক।

একদিন গঙ্গানারায়ণকে মধুসূদনের বাড়িতে নিয়ে এলেন গৌরদাস। চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে গঙ্গানারায়ণের, এখন তার পোশাক অতি সাধারণ, একটি ধুতি ও উত্তরীয় ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করে না গঙ্গানারায়ণ, তবু তাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারলেন মধুসূদন। বাল্যবন্ধুরা কখনো কি বদলায়!

গঙ্গানারায়ণকে আলিঙ্গন করে মধুসূদন বললেন, বাই জোভ্, এ যে আমাদের সে গোবেচারা গঙ্গা, আমাদের হিন্দু কালেজের সাইলেন্ট ফিলজফার!

এতদিন পর মধুসূদনকে দেখে গঙ্গানারায়ণের চক্ষে জল এসে গেল। তার মনের অভ্যন্তরে মধুর জন্য সব সময়ই একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

মধুসূদন বললেন, গঙ্গা, আমিও অনেকটা তোরই মতন, প্রডিগ্যাল সান্ হয়ে কলকেতায় ফিরেচিলুম! তুই ছিলিস্ জমিদারের সন্তান, এখুন যে সাধু-সন্নোসীর মতন দেকাচ্চে তোকে।

কিছুক্ষণ আবেগ বিনিময়ের পর ওরা শান্ত হয়ে বসলো। সেলিব্রেট করার জন্য এক বোতল শ্যাম্পেন খুলে ফেললেন মধুসূদন। গঙ্গানারায়ণ কোনোদিনও ওসব স্পর্শ করে না। আজ রাজনারায়ণ উপস্থিত, তিনিও সুরাপান পরিত্যাগ করেছেন।

রাজনারায়ণ বললেন, তুই জানিস, মধু, গঙ্গানারায়ণ বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে দল গড়েছেল। বন্দুক নিয়ে নীলকরদের সঙ্গে লড়েচে। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার! ভাবাই যায় না, আমাদের সেই গঙ্গা, এত বড় হীরো।

গঙ্গানারায়ণ লজ্জা পেয়ে বললো, না, না, সেরকম কিছু নয়। তবে ভাই নীল-

চাষীদের দুর্দশা আমি নিজের চক্ষে দেকিচি। গ্রামে গ্রামে যে কী তাণ্ডব চলচে তা তোমরা ভাবতে পার্বে না!

মধুসূদন উৎসাহিত হয়ে বললেন, শুনি তো তোর এক্সপিরিয়েন্স, বেশ একটু গুচিয়ে বিশদ করে বল।

রাজনারায়ণ বললেন, কিছু কিছু আমাদেরও কানে আসে। হরিশ মুকুজ্যের কাগচেও পড়চি—

গঙ্গানারায়ণ বললো, হরিশ মুখুজ্যে চাষীদের জন্য মস্ত কাজ কচ্চেন। তিনি নমস্য।

মধুসূদন বললেন, শুনিচি লোকটা আমারই দরের একজন ড্রাঙ্কার্ড। তা মাতাল হলেও যে নমস্য হয়, সে কতা তোরা স্বীকার পেলি তো?

গৌরদাস বললেন, আহা, গঙ্গানারায়ণের অভিজ্ঞতাগুলোই শোনা যাক না—

কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলবার পর সেখানে উপস্থিত হলো একজন আগন্তুক। গল্পের মাঝখানে অচেনা লোক এসে পড়ায় ওরা বিরক্তই হলো একটু। মধুসূদন জিজ্ঞাসু চোখে লোকটির দিকে তাকালেন।

লোকটি বয়েসে ওদের চেয়ে ছোট, বৎসর তিরিশেকের হবে, সরকারী আমলার মতন পরিচ্ছদ। সে মধুসূদনের দিকে চেয়ে বললো, আপনিই বোধ করি মাইকেল? দেকেই চিনিচি? আপনাদের আসরে কি আমি একটু আসন গ্রহণ কত্তে পারি?

মধুসূদন বললেন, আমরা এক বিশেষ আলোচনায় এনগেজড আচি। আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা বলবেন কী?

লোকটি বললো, শুধু আপনার দর্শন লাভ। কয়েক মাস ধরেই আপনাকে দেকবার বাসনা আমার মনে বলবতী হয়েচে। অবশ্য আর একটা নিবেদনও আচে। আপনি সাম্প্রতিক বঙ্গের বিশিষ্ট কবি। নাট্যকার হিসেবেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত, "শর্মিষ্ঠা" নাটক বড়ই অপূর্ব, মনোহর! বেছে বেছে আপনার মতন এক খ্রীষ্টধর্মীয়ের লেখনীতেই স্বয়ং মা সরস্বতী ভর করেচেন, এ বড় বিস্ময়ের কথা। আপনাকে দেকে চক্ষু সার্থক কত্তে এসেচি। আপনি আমার শ্রদ্ধার অভিবাদন লউন।

প্রশংসা শুনলে একটুও অস্বস্তি বোধ করেন না মধুসূদন। এ সব কিছুই যেন তাঁর প্রাপ্য এইভাবে কথাগুলি শুনলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, মহাশয়ের কী করা হয়? মহাশয়ের নাম?

লোকটি বললো, আমি সরকারের ডাক বিভাগে কর্ম করি। অধমের নাম শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

বড় মুখ করে আত্মপরিচয় দেবার মতন কিছুই নেই দীনবন্ধুর। দরিদ্রের সন্তান, কলকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে কিংবা অভিজাত সমাজে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ পায়নি। নদীয়ার এক গ্রামের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল, তারপরই তার পিতা তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এক জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লেখার কাজে। কিশোর দীনবন্ধুর সে কাজে মন টেঁকেনি, পিতা ঠাকুরের নির্দেশ

অমান্য করে গোপনে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। এক বৃহত্তর জগৎ তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকেছিল।

কিন্তু এক সহায়-সম্বলহীন কিশোরের পক্ষে কলকাতা শহর বড় কঠোর স্থান। বাহির সিমুলিয়াতে এক পিতৃব্যের বাড়ি খুঁজে খুঁজে বার করল অনেক চেষ্টায়, সেখানে শুধু আশ্রয় মিললো, আর কিছু না। আশ্রয়ের বিনিময়ে খুড়তুতো ভাইয়েরা তার ওপর রান্নার ভার চাপিয়ে দিল। কিন্তু গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লেখার চেয়ে কলকাতার আত্মীয় বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করার মধ্যে কী আর এমন পদোন্নতি ঘটলো। সর্বক্ষণ মনখারাপ হয়ে থাকে দীনবন্ধুর। একটু সময় পেলেই কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর স্কুল-কলেজগুলির সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাদ্রী লঙ সাহেব একটি অবৈতনিক স্কুল চালান। একদিন ভরসা করে সেখানে ঢুকে পড়লো দীনবন্ধু। ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পেরে এখন দলে দলে ছেলে আসে স্কুলে পড়তে, সকলকে নেওয়া সম্ভব হয় না। লঙ সাহেব কিশোরটিকে দু চার কথায় পরীক্ষা করে বললেন, দেখো হে, তোমার কিছুদিনের জন্য সুযোগ দিব। যদি পাঠাভ্যাসে উৎকৃষ্ট মতি দেখাইতে পারো, তবেই তোমার স্থান হইবে এখানে, নচেৎ নহে।

লঙ সাহেবের কথার মান রেখেছিল সে। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি না পেলে বই-খাতা কেনার টাকাই বা আসবে কোথা থেকে। দীনবন্ধুর পিতৃ-দত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ, সবাই গন্ধা গন্ধা বলে ডাকে, মোটেই তার পছন্দ হয় না। স্কুলে পড়ার সময়ই সে নিজের নামটা বদলে নিয়েছে।

লঙ সাহেবের স্কুল ছেড়ে কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুল, তারপর হিন্দু স্কুল। লঙ সাহেব লক্ষ রেখেছিলেন এই ছেলেটির ওপর, দীনবন্ধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তিনি তাকে বইপত্র কিনে দেন। কিন্তু হিন্দু স্কুলে বেশীকাল পড়া হলো না দীনবন্ধুর, তার সহপাঠীদের তুলনায় তার বয়েস অনেক বেশী। যে-বয়েসে অন্যরা চাকুরিতে ঢুকে যায়, সেই বয়েসে সে স্কুলের ছাত্র। তাই শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই সে ডাক বিভাগের চাকুরি গ্রহণ করলো।

কিছুদিন পাটনায় পোস্ট-মাস্টারী করার পর বদলি হলো উড়িষ্যায়। সেখান থেকে আবার নদীয়ায়, বর্তমানে ঢাকায়। ইতিমধ্যে বিবাহাদি করে সে সংসারী হয়েছে।

নদীয়ায় থাকার সময় তার পরিচয় হলো এক প্রতিভাবান যুবকের সঙ্গে। যুবকটি পাশের জেলা যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। এর নাম বঙ্কিম চাটুজ্যে। ছাত্র বয়েসে দীনবন্ধু গুপ্ত কবির সংবাদ প্রভাকর কাগজে পদ্য লিখেছে মাঝে মাঝে, সে পত্রিকার পৃষ্ঠায় সে এই বঙ্কিমের পদ্যও দেখেছে। তারপর এ-ও শুনেছিল যে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর প্রথম বি এ পরীক্ষায় এই বঙ্কিমও প্রথম দুই গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজন। চাক্ষুষ হলো এই প্রথম। যুবকটি বয়েসে তার চেয়ে বেশ ছোট হলেও স্বভাবে অতি গম্ভীর, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। দীনবন্ধুই উদ্যোগী হয়ে নারকোলের খোলা ভেঙে যুবকটির অন্তরের নরম শাঁস স্পর্শ করলো। বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনের।

বিবাহের পরই বঙ্কিমের পত্নী বিয়োগ হয়েছে। সে আবার বিবাহ করতে চায়। দীনবন্ধু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নানান জায়গায় পাত্রী দেখে বেড়ায়। এবার

ঢাকা থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে, বঙ্কিমের বিবাহের সম্বন্ধ একেবারে পাকা করে যাবে। তারই মধ্যে একদিন অবসর করে সে দেখা করতে এলো বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উল্কার মতন প্রবেশকারী কবিবর মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে। দীনবন্ধু বঙ্কিমকেও সঙ্গে করে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু সে আসেনি। অপরিচিতদের সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা বলা সে তো পছন্দ করে না বটেই, তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য বিষয়েও তেমন কোনো আগ্রহ নেই বঙ্কিমের। ছাত্রাবস্থায় সে বাংলা পদ্য লিখেছে বটে কিন্তু এখন তার লেখনী দিয়ে ইংরেজী বাক্য ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

প্রাথমিক সম্ভাষণাদি এবং মধুসূদনের রচনাগুলির উচ্চ প্রশংসা করার পর দীনবন্ধু বললো, যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার সমীপে আগমনের যে অন্য আর একটি উদ্দেশ্য আছে, সেটি ব্যক্ত করি।

মধুসূদন বললেন, নিবেদন? অব কোর্স আপনি তা ব্যক্ত কর্তে পারেন, যদি ব্রিফ্‌লি হয়, আমি আমার এই বন্ধুর মুখ থেকে কিছু গল্প শুনচিলাম—

দীনবন্ধু বললো, হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলবো। দেখুন মিঃ ডাট্, আপনার কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়িচি নিশ্চয়ই, আপনার শর্মিষ্ঠা নাটকও বড় মনোরম, কিন্তু আপনার প্রহসন দুটি এক কথায় অনবদ্য। এমন জীবন্ত ডায়ালগ বাংলায় আর কেউ লেখেননি। আমার মুখস্ত আচে, শুনবেন? 'তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন! (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তার বয়ে গেল কি? ছুড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙড়! (প্রকাশ্যে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে। গদা বললো, যে আজ্ঞে! ভক্ত বললো, ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখচি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও নাকি নাই?'

মধুসূদন বললেন, ব্যাস, ব্যাস, আর শোনাবার দরকার নেই।

গৌরদাস বললেন, তাজ্জব! আপনি অ্যাক্টর নন, তবু নাটকের ভাষা এমন মুখস্ত করেচেন?

দীনবন্ধু বললো, আরো গড়গড়িয়ে বলে যেতে পারি। এটা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' থেকে শুনবেন?

মধুসূদন বললেন, দ্যাটস এনাফ্। কিন্তু আপনার নিবেদনটি কী। তা এখনো বুঝলাম না!

দীনবন্ধু বললো, এমন যাঁর ভাষা, তাঁর কাছে আমাদের অনেক কিছু চাইবার আচে। আপনি ইংরেজ মান্য লোক হলেও এমন দিশী কথা জানলেন কী করে? সেটাই অবাক লাগে।

মধুসূদন বললেন, আমি যশোরের গ্রামে বাল্যকালে কতবার গেচি। সে সব ভাষা আমার মেমোরিতে ঘুমিয়ে ছেল, আবার ফিরে এসেচে।

দীনবন্ধু বললো, সেই জন্যই বলচি, আপনি মদ্যপানের কুপ্রথা, গ্রাম্য জমিদারদের ব্যাভিচার নিয়ে স্যাটায়ার লিখে সমাজের অনেক উপকার করেচেন। এবার রায়তদের নিয়ে একটি লিখুন।

—কাদের নিয়ে?

· গ্রামের রায়তদেব নিয়ে। আমি কর্মোপলক্ষে নদীয়া-যশোরে ঘুরে দেখিচি, নীল চাষীদের ওপর কী দুঃসহ অত্যাচার হচ্চে। আপনার প্রহসন দুটি পড়বার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে, এই সব হতভাগ্য চাষীদের দুরবস্থার কথা নিয়ে আপনি যদি একটি নাটক রচনা করেন, তবে দেশের মানুষ সবাই জানবে।

—স্ট্রেঞ্জ কয়েনসিডেন্স! আমরা আমাদের এই বন্ধুটির কাচ থেকে ইন্ডিগো প্ল্যান্টারসদের কীর্তি-কাহিনীই শুনচিলুম এতক্ষণ। তার মাঝখানে আপনি এসে পড়লেন। আমাদের এই স্কুলটি-ফ্রেন্ডটি নিজে জমিন্দার, কিন্তু গ্রাম্য প্লাউমেনদের সঙ্গে মিশে রিবেলিয়ান অর্গানাইজ করেচে। গঙ্গা, তোমার বাকি কাহিনীটা বলো না।

ধুতি ও চাদর পরিহিত গঙ্গানারায়ণ এতক্ষণ নীরবে নবাগত ব্যক্তিটির কথা শুনছিল। এবার সে বললো, আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। চাষীদের অবস্থা তো মোটামুটি জেনেচো, তারপর দু-এক জায়গায় সংঘর্ষ হলো আর কি।

গৌরদাস বললো, না না, বলো, আমার শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে।

দীনবন্ধু বললো, আমি বাইরের লোক, তবু যদি আমায় আপনাদের বৈঠকে একটু স্থান দেন, তা হলে আমিও শুনতে পারি।

মধুসূদন বললেন, বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! প্লীজ!

গৌরদাস বললো, তারপর সেই তোরাপ নামে লোকটি কী করলো?

গঙ্গানারায়ণ ধীর স্বরে বললো, তোরাপ আর অন্যান্য গ্রামবাসীরা একেবারে মরীয়া হয়ে একটা কিছু করতে চায়। বিশেষত একটি দুটি নারী-হরণের পর তারা টগবগ করে ফুটচে। তখন একরাতে জঙ্গলের ডেরা ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার হাতে বন্দুক দেখে ওরা ভরোসা পেয়েচে, আমায় অবশ্য বন্দুক দাগতে হয়নি। একটা নীলকুঠি সহজেই দখল করা গেল।

রাজনারায়ণ বললেন, অমন ছাড়া ছাড়া করে বলচিস কেন, গঙ্গা, সব ব্যাপারটা ডিটেইলসে বল! তুই এমন ভাব কচ্চিস যেন একটা নীলকুঠি দখল করা চাট্টিখানি মুখের কথা? এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার—।

এরপর গঙ্গানারায়ণকে তার অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিতেই হলো।

শেষ হবার পর দীনবন্ধু বললো, আপনিই তা হলে গঙ্গানারায়ণ সিংহ? নদীয়ায় গিয়ে বহুবার আপনার নাম শুনিচি। গরিবগুর্বো লোকেরা আপনাকে দেবতার মতন মানে।

গঙ্গানারায়ণ লাজুক মুখে বললো, না, সে রকম কিছু নয়।

দীনবন্ধু বললো, আপনাকে নিয়ে অনেক গল্প-কথা আছে ওদিকে। আপনিই সেই সব গল্পের নায়ক। আপনাকে চোখে দেখাও ভাগ্যের কতা!

মধুসূদন সহাস্যে বললেন, ইট সিমস্, গঙ্গা, ইউ আর মোর ফেমাস দ্যান মি!

দীনবন্ধু মধুসূদনের দিকে ফিরে বললো, দত্তজা, আপনার ফ্রেন্ডের মুখে শুনলেন তো সব কথা? আমিও এ সব কথাই বলতে এসেছিলুম। আপনার দুর্দান্ত লেখনীতে এই সব চিত্র ফুটিয়ে তুলুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

মধুসূদন বললেন, প্রোজ! আমি আর প্রোজ লিকতে চাই না। পোয়েট্রি, শুধু পোয়েট্রিই আমার আলোবাতাস। এখন আমি একটা গ্রেট পোয়েট্রি লেখার কতা ভাবচি। হয় তো কালই শুরু করবো।

দীনবন্ধু বললো, আপনি নিশ্চয়ই পোয়েট্রি লিকবেন। কিন্তু এখন প্রয়োজন নাটকের। প্রহসন দুটি লিকে আপনি যে-রূপ কশাঘাত করেচেন, এবার নীল-চাষীদের দুঃখ নিয়ে এমন কিছু লিকুন, যা পড়ে সবাই কাঁদবে। আপনারা জানেন বোধ হয়, নীলচাষের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য সরকার থেকে এক কমিশন বসানো হয়েচে। সীটনকার সাহেব তার সভাপতি। শোনা যাচ্চে,

এই সীটনকার চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। লেফটেনান্ট গভর্নর গ্র্যান্ট সাহেব গোড়ার দিকে চাষীদের দিক একটু টেনেছিলেন বটে, কিন্তু এখন আবার বেঁকে গ্যাচেন। এই গঙ্গানারায়ণ সিংহের মতন কেউ যদি চাষীদের সাহায্য কত্তে যায়, তবে তাদের ফাটকে পোরবার জন্য ১১ আইন চালু হয়েচে। আমাদের উচিত ইন্ডিগো কমিশনারের সামনে প্রকৃত তথ্যগুলি তুলে ধরা, যদি ঐ আইন পাল্টানো যায়—

মধুসূদন বললেন, এ সব বেশ ভালো কতা। কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

—ঐ যে বললুম, আপনি নীল চাষীদের নিয়ে একটি নাটক রচনা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আপনি স্বয়ং বীণাপাণির আশীর্বাদ-পুষ্ট।

—আমার এখুন আর গদ্য রচনায় মন নেই। আমার মন শুধু কাব্যের দিকে ঝুঁকে আচে। আমি রামায়ণের মেঘনাদকে নিয়ে একটা কাব্য শুরু কচ্চি। রাম আর তার দলবল যেমন অসভ্যের মতন অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে মেরেচে, আমি আমার কাব্যে তার শোধ তুলবো।

—আপনি আর নাটক লিকবেন না!

রাজনারায়ণ বসু দীনবন্ধুকে বললেন, আপনি...আপনি তো ভারি অদ্ভুত লোক মশায়। মধু লিকবে না শুনে অমনি আপনার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল। আপনি নিজেই লিকুন না। আপনার যখন নীলচাষীদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আচে।

দীনবন্ধু বললো, হায়, আমি লিখবো! আমার কি সে ক্ষমতা আচে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা যিনি লিখেচেন তিনিই যদি না লেখেন—কয়েক লাইন পদ্য ছাড়া আমার হাত দিয়ে আজ পর্যন্ত কিচুই বেরোয় নি।

গঙ্গানারায়ণের দিকে ফিরে দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আপনি লিকতে পারেন না?

গঙ্গানারায়ণ হেসে বললো, কোনোক্রমে আমি দু-একবার বন্দুক চালিয়েচি বটে, কিন্তু লেখনী আমার হাতে একেবারেই চলে না।

মধুসূদন উঠে এসে দীনবন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, মাই ফ্রেন্ড, ইউ মোস্ট ট্রাই ইয়োর হ্যান্ড...নীলচাষীদের অবস্থা দেকে আপনার মনে হয়েচে এই বিষয় নাটক লেখার যোগ্য...এই মনে হওয়াকেই বলে ইনস্পিরেশান। বড় বড় লেখকরা এই ইনস্পিরেশান দ্বারাই চালিত হন, সুতরাং আপনি আর দ্বিধা কর্বেন না। কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ুন গে।

মধুসূদনের স্পর্শে রোমাঞ্চিত বোধ করলো দীনবন্ধু। সে আর কোনো কথা না বলে নীরব হয়ে রইলো। এবং সেদিন ঐ আসর থেকে বিদায় নেবার পর মধু-সূদনের শেষ কথাগুলিই অনবরত ঘুরতে লাগলো তার মস্তিষ্কে।

হালিশহরে বন্ধু বঙ্কিমের বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়েই দীনবন্ধু আবার চলে গেল তার কর্মস্থল ঢাকায়। সরকারি নিরস কাজকর্মের মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এক একটি কাল্পনিক চরিত্রের সংলাপ তার মাথায় আসে। কবি মধুসূদন একেই কি বলেছেন ইনস্পিরেশান? নইলে হঠাৎ এই সব কথা মাথায় আসে কেন? তা হলে তো লিখতে হয়। বেশী দেরী করে ফেললেও লাভ নেই, ইন্ডিগো

কমিশন চলাকালীন বার করতে পারলেই এর উপযোগিতা।

কর্মোপলক্ষে দীনবন্ধুকে নৌকাযোগে প্রায়ই ঢাকা থেকে নানা স্থলে যেতে হয়, দু দিন তিনদিন, কখনো এক সপ্তাহও নৌকোয় কাটাতে হয়। নিরিবিলিতে লেখার সেই প্রকৃষ্ট সময়। লিখতে লিখতে এক এক সময় গঙ্গানারায়ণ সিংহের বর্ণনার কথা মনে পড়ে। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ সিংহের নামে আদালতে মামলা ঝুলছে। তার নাম নাটকে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না বলে দীনবন্ধু এড়িয়ে যায়।

তিন সপ্তাহের মধ্যে নাটক লেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। নাম আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, নীলদর্পণ। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে দীনবন্ধু উঠে এলো নৌকোর ছাদে। যে-কোনো একটি সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করার আনন্দ তো আছেই, কিন্তু এখন বক্ষের মধ্যে ভয়ের দুম দুম শব্দও হচ্ছে। এই নাটক প্রকাশিত হলে রাজরোষে পড়ার ভয় আছে। চাকরি হারানোও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

একটু বাদেই প্রবল ঝড় উঠলো। দীনবন্ধুর নৌকো তখন মেঘনার বুকে। ভাদ্রের মেঘনা ঝড়ের সময় অতি ভয়ঙ্করী, কালো রঙের ঢেউগুলি যেন অকস্মাৎ অতি জীবন্ত হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও মাঝিরা হাল ধরে রাখতে পারলো না। তারা হায় হায় করে উঠলো। আর বুঝি নৌকো রক্ষা পায় না।

দীনবন্ধুর সারা শরীর কম্পিত হতে লাগলো। মানুষ মাত্রেরই মৃত্যুভয় থাকে, দীনবন্ধু ভাবলো, সে সামান্য মানুষ, তার জীবনের আর এমন মূল্য কী, কিন্তু নীলদর্পণের পাণ্ডুলিপিও সলিলসমাধি লাভ করবে? তবে কি জগদীশ্বরের ইচ্ছে নয় যে এই নাটক প্রকাশিত হোক? কিছুক্ষণের জন্য দীনবন্ধুর মন ভালো-মন্দ চিন্তার অতীত হয়ে গেল, ক্রুদ্ধ ঝড়ের দাপাদাপি চললো বাইরে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য নৌকো নিমজ্জিত হলো না। দীনবন্ধু নিরাপদেই এসে পৌঁছোলো ঢাকায়। নাটকটির গুণাগুণ বিচারের আর সময় নেই, অতি দ্রুত ছাপিয়ে ফেলা দরকার। ঢাকায় দীনবন্ধুর দু-একজন গুণগ্রাহী জুটেছে। তাদেরই মধ্যে রাম ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি যত্ন করে সেখানে নীলদর্পণ ছাপিয়ে দিল। নাট্যকারের কোনো নাম রইলো না। কশ্চিৎ পথিকস্য এই নামে একটি ভূমিকা জুড়ে দিল দীনবন্ধু। তারপর মুদ্রিত নাটকের কয়েক কপি নিয়ে চলে এলো কলকাতায়।

বন্ধু বঙ্কিমকে পড়াবার সুযোগ নেই। কারণ সে ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের নেগুয়ায় বদলি হয়ে গেছে। দীনবন্ধুর প্রথমেই মনে পড়লো তার কৈশোর পৃষ্ঠ-পোষক লঙ সাহেবের কথা। লঙ তাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন নানা ব্যাপারে, তাঁকে একবার পড়ানো দরকার।

পাদ্রী লঙ পেশায় সরকারী অনুবাদক। দেশীয় ভাষায় রচনার সারমর্ম তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে সরকারের গোচরে আনেন। আসলে লঙকে দিয়ে সরকার গোয়েন্দার কাজ করিয়ে নেয়। দেশী ভাষায় রাজদ্রোহমূলক কিছু লেখা হচ্ছে কিনা সেটা জানাই সরকারের উদ্দেশ্য। সরলমনা পাদ্রী লঙ অত বোঝেন না। তিনি এ দেশের ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে এ দেশের মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছেন। এ দেশের চাষীদের দুরবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদন্ত করেছেন। লঙকে নাটকটি পড়ে শোনালেন দীনবন্ধু। শুনতে শুনতে লঙ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ও কাতর হয়ে পড়লেন। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তুমি সত্য লিখেছো? গ্রাম দেশে এমন অত্যাচার হয়! এ সব তুমি নিজের চোখে দেখেছো?

দীনবন্ধু বললো, কিছু আমার নিজের চোখে দেখা। কিছু কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শোনা।

লঙ বললেন, তুমি অবিলম্বে এ বইখানি ইংরেজিতে অনুবাদিত করাও। এমন চলতি গ্রাম্যভাষা তো আমি ইংরেজি করতে পারবো না। তুমি কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে সত্বর এ-ভার দেও। সে পুস্তক ছাপাবার ব্যবস্থা আমিই করবো। তারপর সেই ইংরেজি ভাষ্য ইণ্ডিগো কমিশনে পেশ করা হবে।

নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ কে করবে? দীনবন্ধুর প্রথমেই মনে পড়লো মধুসূদন দত্তের কথা। তিনি এ নাটক লিখতে সম্মত হননি। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদও কি করে দেবেন না? ইংরেজি তিনি অতি উত্তম জানেন তো বটেই, তা ছাড়া তিনি এ রকম ভাষায় স্বয়ং নাটক লিখেছেন। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতীর ইংরেজি করেছেন। সুতরাং নাটক অনুবাদের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

দীনবন্ধু আবার গিয়ে ধরলেন মধুসূদনকে। সেদিনও সেখানে তাঁর বন্ধুরা উপস্থিত। সকলের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারলেন না। ঠিক হলো, তিনি অনুবাদ করে দেবেন বটে কিন্তু তাঁর নাম যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তাঁরও তো সরকারি আদালতে চাকুরি।

লঙ সাহেবই পরামর্শ দিয়েছিলেন দীনবন্ধুকে এই সময় কলকাতা ত্যাগ করতে। তাই দীনবন্ধু ঢাকায় ফিরে গিয়ে নিরীহভাবে চাকুরি করতে লাগলেন। ঝামাপুকুরে এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো মধুসূদনকে। তিনি বললেন, এক রাত্রেই তিনি অনুবাদ শেষ করে দেবেন। তবে তাঁর দুটি শর্ত আছে। অন্তত বারো বোতল বীয়ার চাই তাঁর। আর গঙ্গানারায়ণকে তাঁর সঙ্গে থেকে প্রতিটি লাইন পড়ে শুনিয়ে সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সংলাপে মুসলমানী ভাষা আছে। গঙ্গানারায়ণ ওদের মধ্যে ছিল। সে-ই ও সব কথার ঠিক মানে বুঝতে পারবে।

সন্ধে থেকে শুরু হলো কাজ। মধুসূদনের একহাতে বীয়ারের বোতল, অন্য হাতে লেখনী। গঙ্গানারায়ণ সংলাপগুলো পড়ে পড়ে তার সাধারণ অর্থ বুঝিয়ে দেয়। মধ্যপথেই মধুসূদন হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ঠিক আচে, ঠিক আচে, বুঝিচি, বুঝিচি। তার পর তিনি গড়গড়িয়ে লিখে যান।

অনুবাদ চলতে লাগলো দ্রুত তালে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাবার পর মধুসূদনের নেশাও প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছোয়। মাঝে মাঝে তাঁর চক্ষু ঢুলে আসে, হাত থেকে খসে পড়ে কলম। গঙ্গানারায়ণ তখন বলে, তা হলে আজ আর থাক, মধু! বাকিটা কাল হবে।

আবার কলম তুলে নিয়ে এবং গলায় একঢোঁক বীয়ার ঢেলে মধুসূদন বলেন, নো-ও-ও। আই মাস্ট ফিনিস দিস ড্যাম থিং টু নাইট। যাই বলিস, গঙ্গা, এই পোস্টমাস্টারবাবুটি কিন্তু নাটকটি লিকেচে বেড়ে। 'সমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, গোড়ার বাক্যি হয়ে গিয়েচে!' ড্যাম গুড! ভেরি রিয়েলিস্টিক। তারপর বল্, নবীনমাধব কী বললে? নবীনমাধব ক্যারেকটারটা যেন তোর আদলে গড়েচে।

গঙ্গানারায়ণ বললো, মধু, তুই আর বীয়ার পান করিস নি! যথেষ্ট তো হলো।

মধুসূদন ধমকে বললেন, সাট্-আপ, মাই ডিয়ার বয়। তোর কাজ তুই করে যা, আমার কাজ আমি করবো।

পঞ্চম অঙ্কে এসে মধুসূদন বললেন, এ কি রে বাপু, সব্বাইকে মেরে ফেলচে যে! এ যে বাবা হ্যামলেটকেও ছাড়িয়ে গেল! পোস্টমাস্টারবাবুটি প্রথম নাটক

লিকেই শেক্সপীয়ার। হা-হা-হা-হা! তারপর বল গঙ্গা, আদুরী কী বললে? ফাইন ক্যারেকটার, দিস আদুরী, আই লাইক দিস গার্লি...ওরে বাপ্‌রে, এই বিন্দুমাধব আবার খুব সংস্কৃত ঝাড়ে যে।

নাটকের শেষ বাক্যটি লেখামাত্র মধুসূদন নেশায় জ্ঞান হারিয়ে সেই টেবিলের ওপরেই শুয়ে পড়লেন।

কুসুমকুমারীর পিত্রালয়ে প্রায়ই নানা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। এ গৃহে সুখ ও সমৃদ্ধি যেন পরস্পরের হাত ধরে আছে।

কুসুমকুমারীর পিতারা পাঁচ ভাই, তাঁরা সকলেই একান্নবর্তী। তাঁদের পুত্র কন্যার সংখ্যাও বর্তমানে সব মিলিয়ে সাতাশ, কুসুমকুমারীর নিজের সহোদর সহোদরার সংখ্যাই নয়। সুতরাং এতবড় পরিবারের একেবারে এক কোণে বিধবা কুসুমকুমারীর হারিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। বিধবা বলেই কুসুমকুমারীকে ঠেলে দেওয়া হলো না ঠাকুরঘরে। তার পিতা-মাতা ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়েই যে এক উন্মাদের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁরা কুসুমকুমারীর প্রতি আদরের বন্যা বইয়ে দিলেন। তার জন্য নির্ধারিত হলো এ গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষ, দুটি দাসী নিযুক্ত করা হলো তার সেবার জন্য।

কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কিছু ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনাথকে কার্যোপলক্ষে ত্রিপুরায় যেতে হলো, তিনি কুসুমকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতী বিধবার পক্ষে দেশ ভ্রমণ প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার, কিন্তু কৃষ্ণনাথ নিছক আচারবদ্ধ মানুষ নন, তিনি তেজস্বী পুরুষ, নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, পাঁচজনের কথা অগ্রাহ্য করার সাহস রাখেন। বদ্ধ জীবন ছেড়ে কিছুদিন বাইরে ঘুরে শোকসন্তপ্তা কন্যাটির যে যথেষ্ট উপকার হবে, সে কথা ভেবেই তিনি কুসুমকুমারীকে নিয়ে গেলেন ত্রিপুরায়।

কুসুমকুমারীর অবশ্য সন্তাপ ছিল, কিন্তু শোক ছিল না। যে-স্বামীর সঙ্গে তার কোনো দিন একটিও স্বাভাবিক বাক্য বিনিময় হলো না, হৃদয় বিনিময় তো দূরের কথা, যাকে দেখে সে শুধু ভয়ই পেয়েছে, তার মৃত্যুতে আবার শোক কী? শুধু বুকের ওপর সর্বক্ষণ যেন পাষাণভার চেপে থাকে।

ত্রিপুরার পথে পাহাড় ও অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আস্তে আস্তে তার হৃদয় উন্মোচিত হয়। প্রকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হবার মতন চক্ষু তার আছে। প্রতিটি দৃশ্যই তার কাছে নতুন মনে হয়। নদীবক্ষে শত শত কাঠের গুঁড়ি ভেসে যেতে দেখলে একই সঙ্গে সে বিস্মিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাঠ চালান যায়, বাঃ ভারি বুদ্ধির ব্যাপার তো! মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে শিশুর মতন দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি নিয়ে ছুটে যাওয়া ধূসর রঙের বন-খরগোশ। কুসুমকুমারীর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে ওদের ধরতে।

যাত্রীদলটির সঙ্গে প্রহরা দিয়ে চলেছে ত্রিপুরা রাজবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক। সুতরাং বিপদের কোনো ভয় নেই। কৃষ্ণনাথ বাইরে এসে কন্যার আব্রুর ব্যাপারেও বিশেষ কড়াকড়ি করেন নি, জনপদের বাইরে দিয়ে যাবার সময় কুসুমকুমারীর পালকির দু' পাশ খোলা থাকে। কখনো ইচ্ছে হলে সে তার পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে হেঁটেও আসতে পারে।

ত্রিপুরায় ধর্মনগর নামে এক স্থানে এক রাত্রিবেলা ওদের তাঁবু পড়েছে। কাছেই একটি জলাশয়ের ওপারে খানিকটা জঙ্গল। পূর্ণিমার রাত, আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। কুসুমকুমারী সেই জলাশয়ের ধারে এসে বসেছে। এক একবার সে জল দেখছে, এক একবার দেখছে আকাশ। আজ চন্দ্রকিরণের এত জোর যে পাতলা মেঘ ভেদ করেও দেখা যায় পূর্ণ চাঁদ। মেঘগুলি শন্ শন্ করে ছুটছে, অথবা এক এক সময় কুসুমকুমারীর ভ্রম হয় মেঘগুলিই বুঝি থেমে আছে, আর চাঁদ ছুটছে অমন করে।

হঠাৎ অদূরে চক্ চক্ শব্দ হতেই কুসুমকুমারী চমকে তাকালো। তার পর সে যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সেই সরোবরে জলপান করতে এসেছে দুটি চিত্রল হরিণ। কুসুমকুমারী এর আগে কখনো জীবন্ত হরিণ দেখে নি। সমস্ত হৃদয়টাকে দু' চক্ষে এনে সে দেখতে লাগলো হরিণ দুটিকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্যই যেন সেই সময় মেঘ সরে গিয়ে বেশী করে আলো পড়লো সেখানে। হরিণ দুটি এত কাছাকাছি মানুষের উপস্থিতি টের পায় নি আগে, একটু পরে সজাগ হতেই তারা এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। তাদের সেই ছন্দময় লম্ফ এবং সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কুসুমকুমারী, তার সর্ব শরীরে রোমাঞ্চ হলো। পৃথিবীটা এত সুন্দর!

সেইখানে আচ্ছন্নের মতই বসে ছিল কুসুমকুমারী, একটু পরেই একসঙ্গে অনেক মানুষের চিৎকারে সজাগ হলো সে। রক্ষীর দল হরিণ দুটিকে দেখতে পেয়েছে, ওদের বধ করার জন্য তারা পিছু ধাওয়া করেছে। কুসুমকুমারী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। তার পিতাকে বলে সে ওদের নিবৃত্ত করবে। এমন স্নিগ্ধ, সুষমাময় রাত্রেও কি মানুষের হিংসার কথা মনে আসে! কুসুমকুমারীর মনে পড়ে গেল শকুন্তলার গল্পের কথা। এই স্থানটি যেন তপোবন, এখানে জীব হত্যা নিষেধ। তারপর তার মনে হলো, এমন জ্যোৎস্নাময় রাত্রে, সমস্ত পৃথিবীটাই তপোবন, কোথাও কারুর মনে এখন হিংসা থাকা উচিত নয়।

কুসুমকুমারী এগিয়ে যেতে লাগলো তাঁবুর দিকে। লোকগুলি হরিণ দুটিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি শুনে সে নিশ্চিন্ত হলো। আবার ফিরে এলো সেই জলাশয়ের কাছে। জলের ওপর ভাসছে চাঁদ, আকাশেও চাঁদ, এই দুই চাঁদ দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইলো সে, যেন তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে সুখানুভূতি হচ্ছে। তার সতেরো বছরের জীবনে এমন আনন্দ সে যেন আর কখনো পায় নি।

তবু, চতুর্দিকে এত সুন্দরের মধ্যে বসে থেকেও কুসুমকুমারীর এক সময় মনে হলো, চিত্রল হরিণ দুটি কেন সে দেখলো? শকুন্তলার গল্পটা না মনে পড়লেই ভালো হতো এ সময়। সে কিছুতেই দমন করতে পারলো না একটা দীর্ঘশ্বাস। শকুন্তলা তার মতন বিধবা ছিল না!

ত্রিপুরা থেকে প্রায় তিন মাস পরে কুসুমকুমারী আবার ফিরে এলো কলকাতায়। তখন তাদের বাড়ির ছেলেরা মিলে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে মেতে

উঠেছে।

এই পরিবারের পুরুষরা কেউ প্রকাশ্যে মদ-মেয়েমানুষের চর্চা করে না। গোপনে কার কোন্ দিকে যাতায়াত আছে, তা কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ও সবের কোনো স্থান নেই। কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ অবশ্য প্রকৃতই সচ্চরিত্র পুরুষ, তাঁর ঝোঁক আছে ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি। এ গৃহের বালকদের স্কুল-কলেজে পড়া বাধ্যতামূলক। যুবকরা পায়রা ও ঘুড়ি ওড়ানোর মতন নির্দোষ আনন্দে মত্ত থাকে। দোল-দুর্গোৎসবে যাত্রা ও পালাগান হয়। এবার তারা নিজেরাই নাটক করবে। নির্দেশক, অভিনেতা, গায়ক-বাদক প্রায় সকলেই এ বাড়ির ছেলে। বাড়ির মেয়েদের অংশ গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে নাটমহলে মহড়ার সময় মেয়েদের উপস্থিত থাকায় কোনো দোষ নেই। নাটকের নাম বিক্রমোর্বশী। জোড়া-সাঁকোর সিংহবাড়িতে নবীনকুমার সিংহের এই নাটকের অভিনয় দেখে বাগবাজারের ছেলেরা মুগ্ধ হয়েছিল, তাই তারা সেই নাটকই মঞ্চস্থ করতে চেয়েছে। কুসুম-কুমারী আগাগোড়া বসে বসে মহড়া দেখে, এক একবার সে তার মেজদা, ছোড়দা, ফুলদাদের কিছু কিছু নির্দেশও দেয়।

একদিন দুর্গামণি একটি পত্র পাঠালো তাকে।

"আমার পরম স্নেহের ধন কুসুম সোনা, আজ ছয় মাস হইল তোরে দর্শন করি নাই। দিবারাত্র বার ২ মনে পড়ে তব ফুল্ল কুসুমিত মুখখানি। ঐ নীল নয়নমণি দুইটি কী কহিব সর্বদা আমার সংগে ২ ফেরে। তুই এই পাপের গৃহে আর কোনোদিন পদস্পর্শ করিবি না জানি, কেনই বা করিবি, তোর উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। আমি হতভাগিনী আর কোথায় যাইব এই পাপ পুরীতেই পচিয়া মরা বৈ আর কোনো গতি নাই। শ্রীমান সত্যপ্রসাদ মধ্যে ২ তোমার কথা বলে। বেচারি বড় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, উহার বোধহয় এস্থান হইতে বাস উঠিল। উহার মাতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন সে পাশ না দিয়া বিবাহ করিতে চাহে না। আর খেলা জমে না।

ওরে কুসোম, তুই বড় বাঁচা বাঁচিয়া গিয়াছিস। রাক্ষস পাগোল স্বামীর সহিত সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরার চাহিতে স্বাধীন বৈধব্য শতগুণে ভালো। স্বাধীন বৈধব্য এমন কথা সত্যপ্রসাদ একবার তোর সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমার বড় মনে ধরিয়াছে। আহা আমি যদি এমত স্বাধীন বৈধব্য পাইতাম! তুই বিধবা থাকিবি কেন আমার মতন তোর বয়স তো তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকে নাই— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবলাদিগের সুরাহা করিয়াছেন। তোর কাঁচা বয়স, তোর পুনরায় বিবাহ হইবে, হইবেই হইবে, এমন যার রূপ সেই যে বৃন্দাবন গোস্বামী ঠাকুর একবার গান শুনাইয়াছিলেন 'ঢল ঢল কাঁচা অংগের লাবণি' তুই যেন সেই। বলিব কি কুসোম, আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তবে বলপূর্বক তোরে হরণ করিয়া লইয়া যাইতাম কোনো দূর দেশে। আমার এই জীবনটা বৃথাই গেল, তুমি ভাগ্যবতী হও, কোনো রূপবান গুণবান পুরুষ তোমারে গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। সত্যপ্রসাদ এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আকুতি করিতেছে তাহাকে দেখাইব না সুতরাং আর লিখিব না। আর অধিক কী। ইতি অং তোমার খুড়ী ঠাকুরানী দুর্গামণি।"

পত্রখানি অন্তত দশবার পাঠ করলো কুসুমকুমারী। পড়তে পড়তে সে হাসলো, কাঁদলো, তার পর সেখানি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে সে উড়িয়ে দিল বাতাসে। এই পত্র অন্য কেউ দেখে ফেললে কতখানি লজ্জার ব্যাপার হবে! দুর্গামণির মুখের কোনো

বাঁধন নেই। আবার বিবাহ? ছিঃ!

কুসুমকুমারী অবশ্য জানে না যে তার পুনর্বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃপেন্দ্রনাথের দুটি শিশু-পুত্রের গৃহশিক্ষক যদুপতি গাঙ্গুলী, তার সঙ্গে নৃপেন্দ্রনাথের মাঝে মধ্যে দেশ ও সমাজ বিষয়ে আলোচনা হয়। যদুপতি গাঙ্গুলী বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য এবং বিদ্যাসাগরের চ্যালা। নৃপেন্দ্রনাথ ঐ যদুপতির প্ররোচনায় কয়েকটি দুঃস্থ বিধবার বিবাহের সময় কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কুসুমকুমারী এ বাড়িতে বিধবা হয়ে ফিরে আসার কিছুদিন পর যদুপতি একদিন নৃপেন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি বিধবা বিবাহের সমর্থক, আপনি আপনার এই ভগিনীর আবার বিবাহ দিন না কেন! প্রস্তাব শুনে নৃপেন্দ্রনাথ আমতা আমতা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ সায় দিতেও পারেন না আবার গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাচীনপন্থী সাজতেও চান না। তিনি বললেন, আমার অমত না থাকলেও আমার বাবা এ পরিবারের কর্তা, তাঁর সম্মতি বিনা তো কিছু হতে পারে না। যদুপতি তখন বললেন, আপনার বাবার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করুন তবে। শুনেছি আপনার বাবা রামতনু লাহিড়ী মশায়ের একজন সুহৃদ। আপনি জানেন নিশ্চয় যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিধবা বিবাহ কার্যে মহোৎসাহী?

আচ্ছা দেখি, বলে নৃপেন্দ্রনাথ তখনকার মতন এড়িয়ে যান। রাশভারী কৃষ্ণ-নাথের কাছে এরকম কথা বলতে নৃপেন্দ্রনাথের সাহস হয় না। কৃষ্ণনাথ যদি রাজি হন তো তখুনি এমন সুপরামর্শের জন্য পাত্রকে স্নেহ-সম্ভাষণ করবেন, আর যদি রাজি না হন তো অমনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা!

নাছোড়বান্দা যদুপতি কিছুদিন অন্তর অন্তরই বিষয়টা মনে করিয়ে দেয় নৃপেন্দ্রনাথকে। নৃপেন্দ্রনাথ এখন গৃহশিক্ষকটিকে দূর থেকে দেখলেই সোজা একেবারে শয়ন ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাকেন। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই ভাইকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন নৃপেন্দ্রনাথ। সেই ভাই দুটির কোনো আপত্তি নেই কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহে, কিন্তু তারাও কেউ কৃষ্ণনাথের কাছে গিয়ে এই প্রসঙ্গ তোলার সাহস পায় না।

এক ভাই একটি কার্যকর বুদ্ধি দিল। কৃষ্ণনাথের মনোভাব যাচাই করার সাহস যখন তাদের নেই, তখন অন্য একটা পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গিয়ে যদি অনুরোধ করা যায়, তিনি কৃষ্ণনাথকে কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহের কথা বলুন। কৃষ্ণনাথ রাজি না হলেও রামতনু লাহিড়ীর মতন মান্য বন্ধুর ওপর তো রাগ করতে পারবেন না! সেই অনুযায়ী রামতনু লাহিড়ীর খোঁজ নেওয়া হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় লাহিড়ী মহাশয় এখন কৃষ্ণনগরে। তাঁর কল-কাতায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

কুসুমকুমারীর ফুলদাদা হেমেন্দ্রনাথ সাজছে উর্বশী। সে বেচারির দু পা হাঁটলেই শাড়ি খুলে যায়। তা দেখে নাটমণ্ডের সিঁড়িতে বসা বাড়ির মেয়েরা একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ হেমেন্দ্র রাগ করে বলে, দিদিরা থাকলে আমি পার্ট বলবো না! মহড়ার সময় ওদের থাকা চলবে না!

তখন মেয়েরা কল্‌কল্ করে ওঠে। কুসুমকুমারীর সেজদিদি বলেন, ওরে হেমু, আসল থ্যাটারের দিনে অ্যাক্টো করার সময় তোর যদি শাড়ি খুলে যায়, তখন ভালো হবে?

কুসুমকুমারী বলে, অ সেজদি, হেমু বলেচে, উর্বশী মালকোঁচা মেরে শাড়ি

পরবে!

এক হাতে তলোয়ার ধরা পুরুষরা পর্যন্ত হেসে ওঠে!

নাট্য নির্দেশক পিসতুতো দাদা নগেন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, অ্যাই, কী হচ্চে! এটা ছ্যাবলামোর জায়গা? ইন্দু, শশী, কুসী, ক্ষেমী তোরা এবার ভাগ্ এখেন থেকে!

সেজদিদি ইন্দুমতি বলেন, তোরা থ্যাটারের সময় লোক হাসালে আমাদের বাড়ির নাম খারাপ হবে না? মেয়েদের পাট আমরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোরা শিখে নে।

যাও, যাও, তোমাদের আর ধিঙ্গিপনা কর্তে হবে না! এখুনি ইদিকে বড়োদাদা এসে পড়লে দেকাবে মজা!

—ওমা, ওমা, নন্তু ওর শাড়িতে বেল্ট বেঁধেচে দ্যাক! অ নন্তু, সখীরা বেল্ট বেঁধে এস্টেজে নামবে নাকি রে? হি-হি-হি!

মেয়েদের রঙ্গরস অবশ্য অকস্মাৎ থেমে গেল। এই সময় সেখানে এসে পড়লো স্বয়ং নাট্যকার নবীনকুমার সিংহ। ঠিক পাশের গৃহেই তার শ্বশুরালয়। এ বাড়ির যুবকরা তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল একবার এসে মহড়া দেখে যেতে এবং কিছু পরামর্শ দিতে।

সরোজিনীদের সঙ্গে এ বাড়ির কিছুটা আত্মীয়তা আছে, সেই হিসেবে নবীনকুমার এ বাড়ির কুটুম্বের মতন। তাকে দেখে মহিলারা ঘোমটা দিয়ে মুখ ফেরালো, কেউ কেউ আড়ালে সরে গেল, কয়েকজন একই জায়গায় বসে রইলো, তাদের সঙ্গে নবীনকুমারের রসিকতার সম্পর্ক।

কোঁচানো ধুতি ও নীল মখমলের বেনিয়ান পরা নবীকুমার চত্বরের মাঝখানে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালো, তার হাতে একটি রূপো বাঁধানো ছড়ি। তার চেয়েও বেশী বয়েসী যুবকদের উদ্দেশ করে ভারিক্কী গলায় সে বললো, তা কেমন হচ্চে টচ্চে শুনি! সুরেন্দ্রবাবু বুঝি পুরুরবা সেজেছেন?

কুসুমকুমারী সিঁড়ির আসন ছেড়ে উঠে অবনতমুখে চলে গেল অন্দর মহলে। যাবার সময় নবীনকুমারের সামনে দিয়ে আসতে হলো তাকে। সে মুখ তুললো না একবারও। এই নবীনকুমারের ব্যাধির সময় সে একবার দেখতে গিয়েছিল, তখন নবীনকুমার একটিও কথা বলেনি তার সঙ্গে। সে কথা তার মনে আছে। নবীনকুমার এবারেও অবশ্য থান কাপড় পরা এই তরুণীটির দিকে চেয়েও দেখলো না।

পরদিন সরোজিনী এলো এ বাড়িতে। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে একেবারে শেষ কালে সে এলো কুসুমকুমারীর কাছে। সরোজিনী এর আগেও কুসুমকুমারীর সঙ্গে দেখা করে গেছে কয়েকবার। যখনই সে পিত্রালয়ে আসে, এ বাড়িতেও একবার ঘুরে যায়। আজ এসে সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত জড়িয়ে ধরে বললো, অ কুসুমদিদি, তুমি একবার আমাদের বাড়িতে চলো! এখুনি চলো।

কুসুমকুমারী বললো, কেন রে, তোদের বাড়িতে যাবো কেন?

সরোজিনী তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে বললো, চলো না! একবারটি চলো! আমার আজ্ঞপুত্র তোমার সঙ্গে কতা কইতে চেয়েচেন!

—কী বললি! কী পুত্র!

—আজ্ঞপুত্র! আমি সব সময় অন্যদের কাচে আমার বর, আমার বর বলি তো, তাই উনি বলেচেন, বর বর বলো কেন? বর তো শুধু বিয়ের দিন হয়। তোমাকে কি এখন আমি আমার কনে, আমার কনে বলবো? তুমি আমায় আজ্ঞপুত্র বলবে।

কুসুমকুমারী হেসে বললো, ও, আর্যপুত্র! বরের বদলে আর্যপুত্র! এ যে কেমন যাত্রা যাত্রা শোনায়!

—কী করি বলো দিদি! ওনার যে খেয়াল! কত রকম খেয়াল যে ওঁর হয়!

—তা তোর বরের সঙ্গে আমি কী কতা কইবো!

—একবার চলোই না! তুমি যে বেধবা হয়েচো, সে কতা তো উনি জানতেনই না, আমি কাল রাতের বেলায় বল্লুম! তা শুনে উনি বললেন, আহা, কোন্ মেয়েটি গো? সেই যার সঙ্গে আমাদের পুতুলের বে হয়েছেল? তাকে একবার ডাকো না?

—সরো, তুই যেমন পাগল, তোর বরও তেমনি পাগল! সেই পুতুল খেলা, সে সব কবেকার কতা! বিধবা মেয়েকে কি পরের বাড়ি যেতে আচে!

—আমরা তোমার পর? আমাদের বাড়ি তোমার হলো গে পরের বাড়ি?

সরোজিনীর স্বাভাবটি এখনো ছেলেমানুষীতে ভরা। কুসুমকুমারীর চেয়ে সে বয়েসেও কিছুটা ছোট। একটু অমনোমত কথা শুনলেই সে অভিমানে ওষ্ঠ ফোলায়। তা সরোজিনীর অভিমানের কারণ আছে। দুই পরিবারের প্রাসাদ একেবারেই সংলগ্ন বলা যায়, এ ছাদে ও ছাদে কথা হয়, অন্দর মহলের পিছন দিকে দুই বাড়িরই বাগান এবং ঝিল। এ বাড়ি ও বাড়ির মেয়েরা সব সময়ই যাতায়াত করে।

তবু কুসুমকুমারীর যেতে লজ্জা করে। সরোজিনীও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত কুসুমকুমারী গেল তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে। তার মা পুণ্যপ্রভা বললেন, ওমা, তুই বোসেদের বাড়ি যাবি, তাতে আবার কতা কী! তিনি সরোজিনীর চিবুক ছুঁয়ে অনেক আদর করলেন।

নবীনকুমার পালঙ্কে শুয়ে একখানি বই পড়ছিল, সরোজিনী ঘরে ঢুকে বললো, এই যে, কাকে এনিচি দেকুন!

নবীনকুমার দেখলো, একগলা ঘোমটা টানা এক থান পরা মূর্তি ঈষৎ পাশ ফিরে দাঁড়ানো। মুখখানা দেখবার কোনো উপায় নেই।

নবীনকুমার বললো, এই যে মিতেনী, আমায় চিনতে পারো?

কুসুমকুমারী কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, সরোজ, তোমার মিতেনী কি অমন উল্টো দিকে ফিরে থাকবে?

সরোজিনী বললো, আপনি ভুলে গ্যাচেন, ও আমার মিতেনী কেন হবে। কুসোমদিদি তো ছেল আমার দিদির মিতেনী!

নবীনকুমার বললো, তা না হয় হলো। উনি কি আমার সঙ্গে কতা বলবেন না?

সরোজিনী বললো, ও কুসোমদিদি, তুমি অ্যাত লজ্জা পাচ্চো কেন গো? তুমি তো আগে আমার বরের...অ্যাই! থুড়ি...আমার আজ্জপুত্রের সঙ্গে কতা কইতে।

কুসুমকুমারী ফিসফিস করে কী যেন বললো তাকে।

সরোজিনী বললো, তুমি ওরকম করো না তো! বিধবা হলে বুঝি কতা কইতেও নেই। শান্তি মাসী কি চন্দনগরের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কতা বলেন না?

নবীনকুমার হাত জোড় করে ছদ্মকৌতুকে বললো, হে দেবী, একবার আমায় দর্শন দান করে ধন্য করুন। আপনি কি জানেন না, বিধবা কুন্তী তাঁর দেবর বিদুরের সঙ্গে কতা কইতেন।

সরোজিনী জোর করে সরিয়ে দিল কুসুমকুমারীর মুখের ঘোমটা। তবু সে এদিকে তাকাবে না। আবাব মুখখানা জোর করে স্বামীর দিকে ফিরিয়ে দিল

সরোজিনী। কুসুমকুমারীর চক্ষু দুটি বোজা। তার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হচ্ছে লজ্জায়।

কুসুমকুমারীকে দেখে চমকে উঠলো নবীনকুমার। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা পার হয়ে এসেছে বলে এই মেয়েটির মুখখানি সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়লো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললো, তুমি...তুমি সেই বনজ্যোৎস্না!

এবার নীল রঙের চক্ষু দুটি মেলে কুসুমকুমারী তাকালো নবীনকুমারের দিকে।

বিম্ববতী বাণপ্রস্থ গ্রহণের পর বিধুশেখর আর একদিনও সিংহবাড়িতে যাননি। আর কোনো আগ্রহ নেই তাঁর। শুধু দূর থেকে তিনি নজরে রাখবেন, নবীনকুমার বিষয়সম্পত্তি সব একেবারে উৎসন্নে না দেয়। অবশ্য হিসাবপত্রের শুষ্ক ব্যাপার নিয়েও তাঁর আজকাল আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না, তবু এতদিনের অভ্যাস। দিনের মধ্যে একবার না একবার কাগজ-কলম নিয়ে বসবেনই। তাঁর নিজস্ব ঐশ্বর্যও কম জমেনি। এরও ঠিক মতন বিধিব্যবস্থা করে যেতে হবে। কোন্ দিন তিনি চোখ বুজবেন, তার ঠিক নেই। ভরসা তো একমাত্র নাবালক নাতি, আর নবীনকুমার—তার ওপর কি ভরসা করা যায়?

এরই মধ্যে বিধুশেখরের কানে এসে পেঁাছোলো গঙ্গানারায়ণের আগমন বার্তা। তিনি খুব একটা বিস্মিত হলেন না। গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কখনোই খুব একটা ধ্রুব নিশ্চিত হননি। পুরুষমানুষ এত সহজে মরে না। বিশেষত যার মৃত্যু হলে অপর কারুর খুশী হবার কারণ আছে। যম যেন ইচ্ছে করে তাদেরই স্পর্শ করতে ভুলে যায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল গঙ্গানারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তাতেই তিনি ভেবেছিলেন, যাক, আপদ গেছে!

দিবাকর যখন এসে প্রথম জানালো যে গঙ্গানারায়ণ ফিরে এসেছে, বিধুশেখর তৎক্ষণাৎ চক্ষু বুজে মনে মনে বললেন, নিয়তির যেমন বিধান, সেই মতনই ঘটুক, আমার আর কোনো দায় নেই। গঙ্গানারায়ণেব সহিত কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা ছোট্‌কুই বুঝবে, আমি আর মাথা গলাতে যাবো না।

কিন্তু তিনি অন্তরে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। তাঁর অশক্ত, পঙ্গু শরীরটা যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো, যেন তিনি এখনো তাঁর ছাড়িটা দিয়ে গঙ্গানারায়ণকে সাপ-পেটা করতে পারেন! গঙ্গানারায়ণের প্রতি এমনই এক বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ জমে আছে তাঁর মনে, যা তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। গঙ্গানারায়ণ যে কিছুদিন বারানসীতেও ঘোরাঘুরি করেছে সে সংবাদ লোক-পরম্পরায় তিনি অবগত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর ক্রোধে আরও ইন্ধন পড়েছিল। এই মতিচ্ছন্ন যুবকটি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বিন্দুবাসিনীকে নষ্ট করেছে। বিন্দুকে চিরকালের মতন দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। বিন্দুকে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁর মন যে কতখানি পুড়েছে, সে কথা তো কেউ জানে না।

চাপা শ্লেষের সঙ্গে তিনি দিবাকরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুঁ, ফিরে এসেচে! ভালো কতা! আসল লোক কি না দেকে নিইচিস তো? নাকি আবার জাল প্রতাপ-

চাঁদের মামলা হবে? নিজের ভাগের সম্পত্তি দাবি করেচে নিশ্চয়?

দিবাকর আমতা আমতা করে উত্তর দেয়, আজ্ঞে, দেকে তো মনে হয় আমাদের সেই বাবু-ই বটে। তবে কি না হলফ্ করে কে বলতে পারে? সম্পত্তির কতা তো কিচু বলেননিকো এখনো, অনেকটা সন্ন্যেসীদের মতন ভাব।

বিধুশেখর বললেন, হুঁ!

একটু থেমে বিধুশেখরকে খুশী করবার জন্য দিবাকর বললো, ভেক্ ধরেচেন কি না তা আর আমাদের মতন ছার লোকে কী বলবে! আজকাল কে আসল, কে নকল বোজা শক্ত। আপনি তো সবই জানেন।

বিধুশেখর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

দিবাকর জিজ্ঞেস করলো, একবার ছোট্‌কুবাবুকে দেকা কত্তে বলবো আপনার সঙ্গে?

এবার বিধুশেখর উদাসীনভাবে বললেন, না, থাক। যদি তার ইচ্ছে হয় আসবে, ডাকবার দরকার নেইকো। আমি আর এ-সবের মধ্যে থাকতে চাই না।

ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন বিধুশেখর। গঙ্গানারায়ণ ফিরে এলেও যাতে সে-কোনো সুবিধে করতে না পারে, সে ব্যবস্থা তিনি আগেই করে রেখেছেন। গঙ্গানারায়ণ মৃত বলে রটিত হবার পর তার ভাগের সম্পত্তি নবীনকুমারের নামেই বর্তে ছিল। ইদানীং মহাভারত অনুবাদের হুজুগে নবীনকুমার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। সে জন্য কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়েছিল। বিধুশেখর কৌশলে নবীনকুমারকে দিয়ে গঙ্গানারায়ণের জায়গা-জমিই সব বেচে দিয়েছে। এখন কার্যত গঙ্গানারাযণ কপর্দকশূন্য, এবার সে বুঝুক! কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে সে হাত-তোলা হয়ে থাকতে পারবে? যে পুরুষমানুষের হাতে পয়সা থাকে না, বাড়ির কুকুর-বিড়ালটা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে না। আবার না নিরুদ্দেশে চলে যেতে হয় গঙ্গানারায়ণকে। আর যদি ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধে, তখন বাধ্য হয়েই হস্তক্ষেপ করতে হবে বিধুশেখরকে।

মুখে যা-ই বলুন, বিধুশেখর মনে মনে প্রত্যাশা করেছিলেন যে ছোট্‌কু ঠিকই আসবে তাঁর কাছে। বিষয়-বুদ্ধি ছোট্‌কুর খুবই কম। গঙ্গানারায়ণের ফিরে আসা জনিত সংকটে পরামর্শ নেবার জন্য বিধুশেখরের কাছে আসতেই হবে ছোট্‌কুকে। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, ছোট্‌কু আর আসে না। বিধুশেখর জানেনই না যে ছোটকু আর এবাড়িতে কোনোদিনই আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

ছোট্‌কু এলো না, তার বদলে গঙ্গানারায়ণ নিজেই এলো একদিন।

ছোটভাই নবীনকুমার নিজের উদ্যোগে জেলখানা থেকে জামিনে খালাস করে এনেছে গঙ্গানারায়ণকে। কলকাতায় এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, যে গৃহে সে আবাল্য প্রতিপালিত হয়েছে, সে গৃহে তার আর কোনো চিহ্নই নেই। বিম্ববতী নেই শুনে গঙ্গানারায়ণের অন্তর হাহাকার করে উঠেছিল, সে চেয়েছিল, সেই দণ্ডেই হরিদ্বারের দিকে রওনা হবে, জননীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। নবীনকুমার অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছে। কারণ গঙ্গানারায়ণ এখনো আসামী, তার নামে মামলা ঝুলছে, তার যত্রতত্র গমনের স্বাধীনতা নেই।

গঙ্গানারায়ণের নিজস্ব কক্ষটিও এখন অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কারুকে দোষও দেওয়া যায় না। কেই-বা ভেবেছিল গঙ্গানারায়ণ ফিরে আসবে? তার পত্নী

লীলাবতি বাপের বাড়ি থেকে আর কখনো এ-বাড়িতে আসেনি। সেই নিরপরাধ বালিকাটি কত কষ্টই না পেয়েছে। বিনা দোষে সে পতি-সহবাসে বঞ্চিতা হয়ে বিধবা সেজে রইলো। শেষ পর্যন্তও সুখের মুখ দেখতে পেল না সে। মাত্র আট মাস আগে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে সে এই ভবধাম পরিত্যাগ করেছে। কানা-ঘুষো শোনা যায় যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি লীলাবতীর, কিছু একটা অসমীচীন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ফলে আত্মঘাতিনী হয় সে। তার মৃত্যুর ঠিক দুই দিন পরেই তার পিত্রালয়ে তার এক পিসতুতো দাদা গলায় ফাঁস লাগিয়ে অপঘাতে মরে বলেই এমন গুজবের জন্ম হয়। সে যাই হোক, লীলাবতী মুছে গেছে এ পৃথিবী থেকে।

পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শান্তভাবে গ্রহণ করে গঙ্গানারায়ণ। লীলাবতীর প্রতি সে সীমাহীন অবিচার করেছে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য যেন সে নিজে দায়ী নয়, দায়ী তাদের দুজনের নিয়তি। লীলাবতী বেঁচে থাকলেও গঙ্গানারায়ণ কি তাকে এখন আবার গ্রহণ করতে পারতো?

নবীনকুমার এখন মহাভারত অনুবাদ-কার্যে খুবই ব্যস্ত বলে গঙ্গানারায়ণের ফিরে আসা নিয়ে খুব বেশী হই হই করলো না। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের দেখলেই মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। গঙ্গানারায়ণকে দেখা মাত্র নবীনকুমার অনুভব করেছিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটির প্রতি তার অন্তরের টান আছে। এর সঙ্গে তার শৈশব স্মৃতিগুলি মধুর। দু-তিনদিন অনবরত গল্প শোনার পর নবীনকুমার বলেছিল, দাদামণি, তুমি এসে পড়ে আমায় বড় বাঁচা বাঁচিয়েচো! জমিদারি দেকাশুনোর ভার এবার থেকে তুমি আবার নেবে, ওসব আমার পোষায় না। বাপ্‌রে!

গঙ্গানারায়ণ হেসে উত্তর দিয়েছিল, আমিও আর ওসব পার্বো না রে, ছোট্‌কু! এতকাল পথে পথে ঘুরে ঘুরে আমি জমিদারি চালচলন সব ভুলে গেচি। আমায় আর কেউ মানবে না।

নবীনকুমার বলেছিল, ওসব কতা আর শুনচিনি! তুমি গায়ে ফু দিয়ে থাকবে ভেবোচো! তোমার কাঁধে সব জোয়াল চাপিয়ে আমি এবারে নিশ্চিন্দি। দুদিন থাকো না তারপর নিজেই দেকবে, আমার এখন কত কাজ! বিদ্যেসাগর মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করিচি, মহাভারত অনুবাদের কাজ আমার সম্পন্ন কত্তেই হবে!

বিধুশেখর এ বাড়িতে আসে না দেখে খট্‌কা লেগেছে গঙ্গানারায়ণের। এ বিষয়ে ছোট্‌কুকে কিছু প্রশ্ন করলে সে এড়িয়ে যায়। বিধুশেখরের প্রসঙ্গই যেন তার কাছে অস্বস্তিকর। তবু গঙ্গানারায়ণের মনে হলো, সৌজন্য এবং ঔচিত্যবোধে তারই একবার যাওয়া দরকার বিধুশেখরের কাছে।

আগে ছিল ইঁটের দেওয়াল। এখন লোহার রেইলিং দিয়ে ঘেরা হয়েছে সামনের বাগানটি। যে পামগাছগুলিকে গঙ্গানারায়ণ ছোট দেখেছিল, এখন সেগুলি পূর্ণ বয়স্ক। তাদের পত্ররাজিতে বাতাসের হিল্লোলে এ গৃহটিকে দূর থেকে আরও সুশ্রী দেখায়। গেটের এক পাশে দ্বারবানদের বসার জন্য একটা গুমটি ঘর, এটাও ছিল না আগে। দ্বারবান গঙ্গানারায়ণকে চেনে না, অবশ্য তাকে বাধাও দিল না। ভেতরে এসে গঙ্গানারায়ণ দেখলো, দক্ষিণ দিকের উদ্যানে একটি বালক আঁকশি দিয়ে একটা পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ার চেষ্টা করছে। ঐ বালকটিকে চেনে না গঙ্গানারায়ণ। সুহাসিনীর পুত্রকে সে চিনবেই বা কী করে! গঙ্গানারায়ণ নিজেও বাল্যকালে ঐ গাছে চড়ে অনেক পেয়ারা পেড়েছে। ঐ গাছের পেয়ারা

পাকলে ভেতরটা লাল টুকটুকে হয়।

গঙ্গানারায়ণের বক্ষ কম্পিত হলো না। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসও বেরুলো না। গঙ্গানারায়ণ নিজেই যেন একটু অবাক হলো। মানুষ অনেক সময় নিজের থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে যাচাই করে। অপর কোনো দর্শকের মতন লক্ষ্য করে নিজের গতিবিধি। গঙ্গানারায়ণ ধরেই নিয়েছিল, এ গৃহে পা দেওয়া মাত্রই বিন্দুবাসিনীর স্মৃতিতে মন উচাটন হবে তার। সে দুর্বল হয়ে পড়বে। কই, সে রকম কিছুই হলো না তো, বিন্দুবাসিনীর স্মৃতি যেন এরই মধ্যে তার হৃদয়ে হালকা ফিকে হয়ে এসেছে। যে-সব দিনগুলি যন্ত্রণার, কাতরতার, আশাভঙ্গের, তা মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, শুধু সুখকর দিনগুলিই এখন ধরে রাখতে চায় স্মৃতি। সময় এমনই ধন্বন্তরী!

সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গানারায়ণ উঠে এলো বৈঠকখানায়। সে কক্ষ শূন্য। পাশে আর একটি বৈঠকখানা আছে, সেখানে বিধুশেখর শুধু তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতেন। সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। সারা বাড়িতেই কেমন যেন খাঁ খাঁ ভাব। এক সময় প্রতিদিন সকালে এখানে প্রচুর লোকসমাগম হতো। বেশ কয়েক বৎসর হলো, বিধুশেখর ওকালতি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন।

একজন নতুন ভৃত্য গঙ্গানারায়ণের দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে। একবার সে কিছু জিজ্ঞেসও করলো, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল ভেতরের দালানের দিকে। সেখানে বসে থাকা এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললো, কেমন আচো, নরহরি?

এই নরহরি এ-বাড়িতে কাজ করছে বহুকাল ধরে। তার বয়েসের যেন গাছ-পাথর নেই। গঙ্গানারায়ণ এর কোলে-পিঠে চড়েছে শৈশবে। গঙ্গানারায়ণকে নরহরি ভারি ভালোবাসতো। স্নেহ জিনিসটা যত পুরোনো হয়, ততই পাক ধরে। অতকাল পরে ছানি পড়া চোখে নরহরি গঙ্গানারায়ণকে দেখামাত্র চিনতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সে একেবারে হেসে কেঁদে অস্থির। একবার সে গঙ্গানারায়ণের গায়ে হাত বুলোয়, আবার সে গঙ্গানারায়ণের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাকুলভাবে বলতে থাকে, কোতায় গিসলে, দাদু আমার? কেঁদিচি তোমার জন্যে, ও-বাড়ির মা-ঠাকরুণকে গিয়ে জিগিয়িচি...।

অন্যান্য দাস-দাসীরাও ভিড় করে দেখতে এলো গঙ্গানারায়ণকে। অন্দর মহলের কেউ এখনো খবর পায়নি, বিধুশেখরও নিচে নামেনি আজ। আগে বিধুশেখরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করা উচিত, কিন্তু এ-বাড়িতে লোকমুখে সংবাদ পাঠিয়ে তারপর দেখা করার মতন সম্পর্ক নয় গঙ্গানারায়ণের। সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সে আগেই জেনেছে যে এ-বাড়ির জ্যাঠাইমা মারা গেছেন, তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে এখানে।

একজন দাসী গঙ্গানারায়ণের আগে আগে ওপরে উঠে এসেছিল, সে তড়িঘড়ি ডেকে আনলো সুহাসিনীকে। ধীর পায়ে হেঁটে সুহাসিনী এসে তার কাছে দাঁড়ালো। গঙ্গানারায়ণ চিনতে পারলো না তাকে। মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে সুহাসিনী বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি ফিরোচো, শুনিচি......এতদিন পরে এলে?

—কে?

—চিনতে পাল্লে না? সুহাসিনীকে মনে নেই তোমার?

গঙ্গানারায়ণ প্রায় স্তম্ভিত। এই সুহাসিনী? কত ছোট দেখেচে ওকে, গঙ্গা-নারায়ণের বিবাহের পরে পরেই বিবাহ হয়েছিল ওর। সে আজ বিধবা, শরীর

অত্যন্ত শীর্ণ। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। মনে হয় কত না যেন বয়েস! অথচ সে তো বিন্দুবাসিনীর চেয়েও ছোট। বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে চেহারারও কোনো মিল নেই সুহাসিনীর। গঙ্গানারায়ণের চকিতে মনে পড়লো কাশীতে গঙ্গার ওপরে রামনগরে পাল্কীর মধ্যে বিন্দুবাসিনীকে দেখার কথা। ঠিক যেন রাজ-রাজেন্দ্রাণীর মতন রূপ। না, ঠিক হলো না। কোনো রাজেন্দ্রাণীর পাথরে গড়া মূর্তি।

—তুই? সেই সুসি?

—আমি কিন্তু তোমায় দেকা মাত্তর চিনিচি! তুমি সেই একই রকম রয়োচো!

—তাই? সবাই যে বলে আমি অনেক বদলে গেচি? খুব একটা উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই সুহাসিনীর ব্যবহারে। এককালে কী ছটফটেই না ছিল এই মেয়ে! গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুহাসিনীর দুই চক্ষু দিয়ে নেমে এলো অশ্রুবিন্দু।

—ও কি, সুসি, তুই কাঁদচিস কেন?

—এতকাল পরে তোমায় দেকেও কাঁদবো না, আমি কি এমনই পাষাণ। গঙ্গা-দাদা, পৃথিবীটা কেমন হয়ে গেল বলো তো?

—লক্ষ্মী দিদি আমার, কাঁদে না। চোখ মুছে ফ্যাল! আয়, তোকে অনেক মজার মজার গল্প শোনাবো—

—চলো, ঘরে গিয়ে বসবে চলো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কতা আছে। ছোটকু তো মস্ত লোক হয়েচে, এ বাড়িতে আসেই না! দিদি গঙ্গাচ্চান কত্তে গ্যাচে, এক্ষুণি এসে পড়বে!

—আগে জ্যাঠাবাবুকে প্রণাম করে আসি।

—বাবা বোধহয় ঘুমুচ্চেন।

—এখন, এই সকাল দশটার সময় ঘুমুচ্চেন?

—বাবা তো এদানিং সব সময়ই প্রায় ঘুমোন। দাঁড়াও, দেখি জেগেচেন কি না।

বিধুশেখরের ঘরের পাশ দিয়েই ছাদে ওঠার সিঁড়ি। গঙ্গানারায়ণ একবার সেদিকে তাকালো। ছাদে শুধু ঠাকুর ঘর।

বিধুশেখরের ঘরের দরজা খোলা। পালঙ্কের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, চক্ষু মুদিত, হাত দুটি বক্ষের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা। সুহাসিনী বাবা বলে ডাকতেও বিধুশেখর সাড়া দিলেন না।

একটু আগে সুহাসিনীর সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের কথোপকথন কিছু কিছু কানে গেছে তাঁর, তিনি গঙ্গানারায়ণের উপস্থিতি টের পেয়েছেন। তবু তিনি সময় নিচ্ছেন ওর মুখোমুখি হবার জন্য।

সুহাসিনী বললো, গঙ্গাদাদা, তুমি শিয়রের কাচে গিয়ে দাঁড়াও, ডাকো, তা'লেই জেগে উঠবেন'খন।

গঙ্গানারায়ণ বললেন, এখন থাক বরং, পরে আসবো।

—না, তুমি ডাকো না, সারাদিনই তো অমনি! শিয়রের কাছে নয়, বিধুশেখরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো গঙ্গানারায়ণ। মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, জ্যাঠাবাবু, জ্যাঠাবাবু।

ধীরে চক্ষু মেলে বিধুশেখর বললেন, কে?

—জ্যাঠাবাবু, আমি গঙ্গা।

বিধুশেখর এক চক্ষু দিয়ে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। যেন তিনি ঠিক ঠাহর

করতে পারছেন না।

শায়িত ব্যক্তির পদধূলি গ্রহণ করতে নেই তাই গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের পা স্পর্শ করলো না, বিনীত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—হাতখানা একটু ধর্ তো, সুসি।

সুহাসিনী এসে সাহায্য করতে বিধুশেখর উঠে বসলেন আস্তে আস্তে। নষ্ট চক্ষুটির ঠুলিটা কপালের ওপর তোলা ছিল, সেটাকে ফিরিয়ে আনলেন যথাস্থানে। পালঙ্কের বাইরে পা ঝোলাতে হবে, অসাড় বাঁ পা-টি নিয়ে এলেন অতি কষ্টে। তারপর বললেন, গঙ্গা? তুমি সত্যিই ফিরোচো তাহলে।

গঙ্গানারায়ণ এবার বিধুশেখরের পদধূলি গ্রহণ করলো। অভ্যেসবশে বিধুশেখর একটি হাত তুললেন তার মাথার কাছে, মুখে কিছু বললেন না।

—আপনার শরীর গতিক ভালো আচে তো, জ্যাঠাবাবু?

—হ্যাঁ, বেশ ভালোই আচি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। সুসি, কারুকে বল্ মিষ্টি এনে দিতে। তোরঙ্গ খুলে একটা রুপোর রেকাবি বার করে দিগে যা। হ্যাঁ, তারপর বলো, গঙ্গা, এতদিন তুমি গেস্‌লে কোতায়?

বসলো না গঙ্গানারায়ণ, দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, বোধকরি আমার মস্তিষ্কে কিচু গোলমাল হয়েছেল, তাই বিনা কারণে দেশে দেশে ঘুরিচি।

—হুঁ। ইব্রাহিমপুর থেকে উধাও হয়েছেলে, আবার সেখানেই ফিরে এয়োচো, এমন শুনতে পাই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার পত্নী ইতিমধ্যে গত হয়েচেন শুনিচি, তুমি কি অন্যত্র বিবাহ করোচো?

—আজ্ঞে না।

—তোমাদের জননী তো হঠাৎ হরিদ্বারে চলে গ্যালেন। আর ফিরবেন না বলেচেন। দ্যাকো দিকি কাণ্ড। ও বাড়ি একেবারে ফাঁকা। তুমি এখুন কলকেতাতেই থাকবে?

—আজ্ঞে, সে রকম কিচুই ভাবিনি। ছোট্‌কু আমায় জেলখানা থেকে এনেচে, এখনো মোকদ্দমা ঝুলচে—

—দেশের রাজার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করে কেউ জেতে? যতসব আজগুবি কাণ্ড। দু'পাঁচ বচর যদি জেল খাটতে হয়, সে তোমায় রাজ-সরকার আগেও খাটাতো, পরেও খাটাবে, মধ্যেখান থেকে টাকাকাড়ির ছেরাদ্দ হবে।

—ছোট্‌কু এসব ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেনি? আমি তো অত শত জানি না, কেষ্টনগরে সে দু'জন উকিল নিয়ে পৌঁচোলো, তারাই সব ব্যবস্থা কর্লে।

—ছোট্‌কুর মাতাটা বিগড়েচে ছোটবেলা থেকেই। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার বোধ করে না সে। টাকাকড়ি একেবারে নয় ছয় কচ্চে। শোনো, আমি বলি কি, তুমি এখেনে থাকচো যখন...দিবাকরটা বুড়ো হয়েচে, ওর দ্বারা আর কাজ কম্মো হয় না, চুরি করেও তো ফাঁক কল্লে, তুমি ওর কাজটা নাও, হিসেব পত্তর-গুলো যদি ঠিকঠাক রাকা যায়, তুমি লেকাপড়া শিকোচো—

কাটা কাটা শুষ্ক ধরনের কথা। শেষের বাক্যটিতে বিধুশেখর পরিষ্কার ইঙ্গিত করলেন যে, গঙ্গানারায়ণকে ও বাড়িতে দিবাকরের মতন কর্মচারী হয়ে থাকতে হবে। গঙ্গানারায়ণের মামলার জন্য অর্থ ব্যয় হবে, সেটাও বিধুশেখরের একেবারেই মনঃ-

পুত নয়। এতকাল বাদে দেখা হবার পর এই আপ্যায়ন!

গঙ্গানারায়ণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো বিধুশেখরের দিকে। অপমান বোধ অল্প অল্প জ্বালা ধরাতে শুরু করেছে তার শরীরে। এই মানুষটির সঙ্গে সে একবার সম্মুখ যুদ্ধে নামবে বলে মনস্থ করেছিল। এতকাল পরেও যে বিধুশেখর ঠিক সেই আগেকার মতনই ব্যবহার করবেন, সে ভাবতে পারেনি। আবার শুরু হবে দ্বৈরথ?

কিন্তু বিধুশেখরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বক্ষে ক্রোধের বদলে জেগে উঠলো অনুকম্পা। লড়াই হবে কি, বিধুশেখর তো আগে থেকেই হেরে বসে আছেন। এই সেই বিধুশেখর, সেই কঠোর তেজী, আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ? একচক্ষু নেই, বাঁ হাতটা অক্ষমভাবে ঝুলে আছে, বাঁ পায়ে জোর নেই, সারা শরীরটাই যেন মর্চে ধরা, এ তো এক ভগ্নস্তূপ! আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বলেই প্রাণপণে প্রতাপ দেখাবার চেষ্টা। কী করুণ, কী হাস্যকর। এঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেই বা ইনি কী করবেন? কিন্তু গঙ্গানারায়ণের দয়া হলো, জীবিত অবস্থায় বিধু-শেখরের ঐ প্রতাপটুকুও কেড়ে নেওয়া সঙ্গত হবে না।

সে হাঁটু গেড়ে বসে বিধুশেখরের পা জড়িয়ে ধরে বললো, জ্যাঠাবাবু, আমি আপনার কাচে অনেক অন্যায় করিচি, আপনার মনে দুঃখ দিয়িচি, জানি, আমার ওপর এখনো আপনার রাগ আচে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, যা হবার তা তো হয়েই গ্যাচে, আপনি আমার গুরুজন, আপনি ক্ষমা না কর্লে...এবার থেকে আপনার সব কতা শুনে চলবো—

বেদব্যাসের উপমা ধার করে বলা যায়, একটু ক্ষণের জন্য বিধুশেখরের হৃদয় গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নের দীঘির মতন হয়ে উঠলো। উপরিভাগের জল খুব উষ্ণ, আবার তলদেশের জল তেমনই ঠান্ডা। হৃদয়ের সেই তলদেশের অংশে তিনি চাইলেন ছেলেটিকে ক্ষমা করতে, ক্ষমার মতন একটা শান্ত স্নিগ্ধ ব্যাপার উপভোগ করার বাসনা হলো তাঁর। জীবন সায়াহ্নে এসে তো সকলকেই ক্ষমা করে যেতে হয়। কিন্তু এ মনোভাব একটুক্ষণের জন্য মাত্র। গঙ্গানারায়ণকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না তিনি। এ তাঁর জীবনের রাহু, এ কেন ফিরে এসেছে? এই যে ক্ষমা চাইছে, এটাও ওর প্রতারণা?

গঙ্গানারায়ণ তখনও বিধুশেখরের পা ধরে আছে, কিন্তু একটা আশ্বাস বা স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতে পারলেন না বিধুশেখর। আশীর্বাদের জন্য তাঁর হাত উঠলো না। তিনি শুধু বললেন, যাক, যাক, হয়েচে, হয়েচে, এবার ওঠো।

—তোমার কুসুমদিদির আমি আবার বিয়ে দোবো!

শুনে আঁতকে উঠলো সরোজিনী। তার পতি দেবতাটি যে একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের তা সে অনেক দিন আগেই জেনে গেছে। নিত্য নতুন বাতিক তার মস্তকে ভর করে। কিন্তু এ আবার কী উদ্ভট কথা!

দুই চক্ষু প্রায় কপালে তুলে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে

দেবেন? আপনি খোয়াব দেকচেন বুজি? ওর বে হয়ে গ্যাচে সেই কবে, তারপর বেধবা হলো, আপনি দেকলেন না সিদিনকে, মাতায় সিঁদুর নেই, হাতে নোয়া নেই, কপাল পুড়িয়ে বাপের বাড়ি এয়েচে—

—বিধবা বলেই তো ওর বিয়ে দোবো আবার!

—বিধবার বে, সে তো ছোট-লোক, অজাত-কুজাতের মধ্যে হয়! চার ঘরের কায়েত বাড়ির মেয়ে সম্পর্কে ও কি অলুক্ষুণে কতা! আপনার কি পরকালেরও ভয় নেই?

—ঠিক এই কতাটাই বিদ্যেসাগর মশাই বলচিলেন! আমরা এ শহরে যে কটা বনেদী ঘর রয়িচি, আমরা মুখে মুখে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের বিধবা-বিবাহ কর্মে সায় দিয়িচি, কেউ কেউ অর্থ সাহায্যও করিচি, কিন্তু নিজেদের বাড়িতে কেউ বিধবা-বিয়ে চালু করিনি! উনি যেদিনকে কতাটা বললেন, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। উনি তো হক্ কতাই বললেন। আমাদিগের যত প্রগতি সব শুধু জিবের ডগায়, কাজে নয়! কিন্তু কী করবো বলো, আমার বাড়িতে তো বিধবা কেউ নেই যে তার বিয়ে দোবো! তুমি যদি বিধবা হতে, কত ঘটাপেটা করে তোমার বিয়ে দিতুম আবার!

সরোজিনী স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমার মাতার দিব্যি, আপনি এসব কতা বলবেন না, এই দেকুন, আমার বুকের মধ্যে কেমুন তোপ দাগার মতন গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হচ্চে?

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তুমি বিধবা হলে আমি মরে যেতুম, এই তো! তা এতবড় একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমি মত্তেও রাজি আচি। দেশের কাজে মরণেও সুখ!

এর পর সরোজিনী, ওগো আমার কী হবে গো, বলে ডুকরে উঠলো। নবীন-কুমার তার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, অবোধ বালিকা আর কাকে বলে! আরে আমি কি সত্যিই মত্তে যাচ্চি নাকি? এ হলো গে কতার কতা! সেই জন্যই তো বলচি তোমার কুসুমদিদির বিয়ে দোবো! সরোজ, শুধু অন্ধকারেই রয়ে গ্যালে, এত বই কাগচ-পত্তর এনে দি, কিচুই পড়ো না! পড়লে জানতে আজকাল ভদ্রঘরেও বিধবার বিয়ে হয়! চার ঘরের কায়েত কী বলচো, শ্রোত্রিয় কুলিন ব্রাহ্মণরাও বিধবা মেয়ে বিয়ে কচ্চেন! তোমার কুসুমদিদি পাত্রী হিসেবে খুবই ভালো!

অশ্রু মার্জনা করে সরোজিনী বললো, আপনি কুসোমদিদির বে দেবেন, এ কেমনতরো কতা? কুসোমদিদি কি আপনার বাড়ির মেয়ে? তার বাপ-দাদারা রয়েচেন না, ওঁয়ারা এই কতা শুনলে লাঠি নিয়ে আপনাকে তাড়া করবে।

—কেন? ওঁরা কি নির্বোধ? বাড়িতে এমন খাসা একটি বিধবা পাত্রী থাকতেও ওঁরা বিদ্যেসাগর মশাইকে খুশী কত্তে চাইবেন না?

—বিদ্যেসাগর না কে খুশী হবে বলে ওঁয়ারা এমন পাপ কাজ কত্তে যাবেন? ঝাঁটা মারি এমন খুশী হওয়ার মুকে!

—এই হলো মেয়েমানুষের বুদ্ধি! নিজের ভালো নিজেরা বোঝে না! তোমার কুসুমদিদি সারাজীবন বিধবা হয়ে কষ্ট পাবে, তাতে তুমি খুশী?

—বিধবা হয়েচে,...যার যেমুন ভাগ্য, ভাগ্যে থাকলে হবে না?

—আমি ভাগ্য পাল্টে দেবো! কালই কতা বলবো কুসুমের বাবার সঙ্গে। ওর বিয়েতে আমি দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা কত্তেও রাজি আচি!

পর দিনই কথা বলা হলো না অবশ্য, কিন্তু বিষয়টা নবীনকুমারের মনে রয়ে

গেল। সে এখন বিষম ব্যস্ত। মহাভারত অনুবাদের কাজ নিপুণভাবে চলছে প্রায় অষ্টপ্রহর ধরে। এতদিন কেউ সঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি যে নবীনকুমারের মতন এক বিংশতিবর্ষীয় অস্থির স্বভাবের যুবক সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের মতন বিশাল কাজ হাতে নিয়ে সত্যিই তাতে মন দিয়ে লেগে থাকবে। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাসের উপায় নেই। কাজ অগ্রসর হচ্ছে অতি দ্রুত বেগে, ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে মুদ্রিত হয়েও বেরিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বও যন্ত্রস্থ!

অনুবাদের প্রথম পর্ব পাঠ করেও সকলে বিস্মিত। আট দশ জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতদের দিয়ে নবীনকুমার অনুবাদের কাজ করাচ্ছে, এ খবর সকলেই জানে, কিন্তু এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সুললিত, সরস বাংলা লেখা তো কোনো পণ্ডিতের কর্ম নয়! এতে বিশেষ একজন কারুর হাত আছে এবং সেই একজন নবীনকুমার স্বয়ং! সে-ই রচনার ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা করে।

নিজের বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে শুধু এ কাজের জন্যই নবীনকুমার বরাহনগরে একটি প্রশস্ত উদ্যান বাটী ক্রয় করেছে, এবং তার নাম দিয়েছে 'সারস্বতাশ্রম'। পণ্ডিতরা সবাই সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন। আর একটি বাড়ি কিনে সেখানে স্থাপিত হয়েছে মুদ্রাযন্ত্র। প্রতিদিন জোড়াসাঁকো থেকে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে নবীনকুমার যায় বরাহনগরে। পথে বাগবাজারে তার শ্বশুরালয় পড়ে। এক একদিন বরাহনগরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ চললে সেদিনটা আর নবীনকুমার নিজের বাড়িতে ফেরে না, শ্বশুর বাড়িতেই রাত্রি যাপন করে। সরোজিনী সেখানেই আছে।

কাজের নেশায় যেন পেয়ে বসেছে নবীনকুমারকে। এতবড় একটা কাজ তো রয়েছেই, তার ওপরেও সে নিয়েছে "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ"-এর মতন উচ্চমানের পত্রিকার সম্পাদনা ভার। রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদত্যাগ করায় বঙ্গভাষানুবাদক সমিতির এই পত্রিকাটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তখন নবীনকুমার নিজের স্কন্ধে এই দায়িত্ব নেয়। মান্যবর এবং পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিবর্তে কুড়ি বৎসর বয়েসের এক যুবক "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ"-এর মতন পত্রিকার সম্পাদক! অবশ্য অনুবাদক এবং লেখক হিসেবে নবীনকুমার তার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

তবু এতেও ক্ষান্ত নয় সে। প্রতিদিন সংস্কৃত-অনুবাদ ও গুরু গম্ভীর শব্দাবলী শুনতে শুনতে এক এক সময় তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তার চরিত্রে একটা লঘু আমোদ-প্রিয় দিক আছে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ সে উচ্চাঙ্গের চিন্তাভাবনা চালিয়ে যেতে পারে না। মাঝে মাঝে তার চিত্ত বিনোদন দরকার। মুলুক চাঁদের আখড়ায় সে আর যায় না। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গেও দেখা হয় না, বন্ধু-বান্ধব সংস্পর্শে কালযাপন করার মতনও তার অবসর নেই। সেই জন্যেই সে বরাহনগরে মহাভারত চর্চার মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠে চলে যায়, সেখানে নিজস্ব একটি কক্ষ আছে, তাতে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। সেই কক্ষের একটি দেয়াল জুড়ে রয়েছে একটি বেলজিয়ান আয়না। নবীনকুমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। লাফায়, ডিগবাজি খায়। এই তার বিনোদন! একা একা সেই কক্ষের মধ্যে সে কখনো শ্রীকৃষ্ণ সাজে, কখনো শ্রী রাধিকা, কখনো সে ভীম, আবার সে নিজেই বক রাক্ষস। আয়নার সামনে যাকে দেখা যায়, তাকে সে জিহ্বা প্রদর্শন করে, নানা রকম ভেংচি কাটে! একটু পরে সে যখন আবার বেশ-বাস ঠিকঠাক করে কাঁধে চাদরটি দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে গম্ভীর ভাবে, তখন তাকে দেখে কে বুঝবে যে এই মানুষটিই একটু আগে কতরকম ছেলেমি করছিল!

সংস্কৃত ঘেঁষা, সন্ধি সমাস সমন্বিত গুরুগম্ভীর বাক্যগুলি মাথা থেকে তাড়াবার জন্য সে আরও একটা উপায় অবলম্বন করেছে। নিজের গোপন কক্ষটিতে সে একটি ছোট খাতায় যা খুশী লিখে যায়। কিছুদিন আগেই চড়ক গেছে, সেই উৎসবে কলকাতা শহর কেমন মেতে উঠেছিল তার একটা বিবরণ লেখে সে, কিন্তু লেখবার সময় সতর্ক থাকে, পারতপক্ষে সে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবে না!

আপন খেয়ালে এই ভাবে সে লিখে যায়, "এদিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সুতো গলায দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের মহত্ত্বর স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশ লাঠি হাতে করে প্রত্যেকে মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠোনে ঢাকের সঙ্গতে নেচে ব্যাড়াচ্চে! চাষীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা...ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্তে রপ্তে ব্যাড়াচ্চে..."

ঠিক যেমন তার মুখের ভাষা সেই রকম লেখা। একই সঙ্গে মহাভারতের বিশুদ্ধ ভাষা এবং এই রকম পথ চলতি গদ্য লিখে চলেছে একই লোক। এই নতুন ধরনের লেখা লিখতে লিখতে বেশ মজা পেয়ে গেল নবীনকুমার। চড়ক পার্বণের পর লিখলো বারোইয়ারি পুজো বিষয়ে। ক্রমে ছোট খাতাটি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় নবীনকুমারের মনে হলো, এই লেখাগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করলে কেমন হয়? তারই নিজস্ব ছাপাখানা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাম কী থাকবে। তার নিজের নাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে যে পরিচিত, তার কলম দিয়ে এই লেখা বেরিয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে? এ লেখা পড়লে যদি সবাই ছি ছি করে? না, নাম দেওয়া চলতেই পারে না। মুলুকচাঁদের নামটা দিয়ে দিলে হয় না? মুলুকচাঁদ কাকপক্ষীর মতন ঘুরে ঘুরে শহর কলকাতার সব সংবাদ সংগ্রহ করে। কাকপক্ষী না প্যাঁচা? হুতোম প্যাঁচার নকশা নাম দিলে কেমন হয়?

মাঝে মাঝেই মনে পড়ে কুসুমকুমারীর কথা। ঐ নীল নয়না বালিকাটির গাঢ় চোখের দৃষ্টি যেন নবীনকুমারের মনে গেঁথে গেছে। ওর কথা মনে এলেই নবীনকুমার মাথা ঝাঁকায়, যেন সে-ই কুসুমকুমারীর অভিভাবক, কুসুমকুমারীর জীবনের সুব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব তারই। একটা কিছু করতেই হবে খুব শীঘ্র, কুসুমকুমারীর পিতার সঙ্গে কথা বলা হয়েই উঠছে না। তিনি কলকাতায় নেই।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গেল নবীনকুমার। হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল দুর্ভিক্ষ চলছে, শত সহস্র মানুষ অনাহারের সম্মুখীন, তা নিয়ে কিছু আলোড়ন হচ্ছে সংবাদপত্রগুলিতে। সেই উপলক্ষে দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজ ভবনে একটি সভা ডেকেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা নেই নবীনকুমারের, কিন্তু ইদানীং সে প্রায়ই ওঁদের সভায় যায়। দেবেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনতে তার ভালো লাগে, এমন সুমিষ্ট বাংলা সে অন্য কারুর মুখে শোনেনি। সভার বেদীস্থলে বসে দেবেন্দ্রবাবু এ দেশের সুদূরতম প্রান্তের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনা করলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। দেবেন্দ্রবাবু নিজে ঐ সব দেশ ঘুরে এসেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। পাহাড়ী জাতির লোকেরা বড় সরল হয়, দেবেন্দ্রবাবুর ভাষায় তাদের দুর্দৈবের চিত্র যেন চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেবেন্দ্রবাবু যে-ই বললেন, যে দেশবাসীর বিপদে আমরা যদি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করি তবে কি আমাদের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না, অমনি নবীনকুমার আর থাকতে পারলো না, উঠে এগিয়ে গেল দেবেন্দ্রবাবুর দিকে। তার গায়ে

যে একটি শাল রয়েছে, যার মূল্য অন্তত দুই সহস্র মুদ্রা, সেটি খুলে দেবেন্দ্রবাবুর পদপ্রান্তে রেখে সে বিনীতভাবে বললো, এই আমার সামান্য দান। পরে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করবো!

তখনই সভাস্থলের অন্য সকলেই নিজেদের অঙ্গুরীয়, সোনার বোতাম ও গার্ড চেইন সম্বলিত ঘড়ি খুলে দিতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ও নবীনকুমারের মনে পড়ে গেল কুসুমকুমারীর কথা। কোথাও কোনো মানুষের দুঃখের কথা শুনলেই তার কুসুমকুমারীর কথা মনে আসে। না, ঐ অপাপবিদ্ধা বালিকাটিকে কিছুতেই সারাজীবন কষ্ট পেতে দেওয়া হবে না। শীঘ্রই কুসুমকুমারীর জন্য একটি পাত্র জোগাড় করতে হবে। নবীনকুমার তার পরিচিত অকৃতদার কিংবা মৃতদার ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। যেন কুসুমকুমারীর পিতার অভিমত গ্রহণ করা এমন কিছু জরুরী নয়, একজন উপযুক্ত বিধবা-বিবাহেচ্ছু পাত্রের সন্ধান করাই এখন প্রধান কর্তব্য।

দেবেন্দ্রবাবুর পাশে তাঁর দুই পুত্র বসে আছে, একজনের নাম দ্বিজেন্দ্র। অন্য জন জ্যোতিরিন্দ্র। দেবেন্দ্রবাবুর সন্তান-ভাগ্য খুব ভালো, এর মধ্যেই তাঁর ত্রয়োদশটি পুত্র-কন্যা জন্মেছে। জ্যোতিরিন্দ্র বেশ ছোট, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বোধ হয় নবীনকুমারের সমবয়েসী হবে। নবীনকুমার একবার ভাবলো, দেবেন্দ্রবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলে হয় না যে তাঁর এক পুত্র ঐ কুসুমকুমারীকে বিবাহ করুক। দেবেন্দ্র-বাবু নব্য পন্থী, উদার মনস্ক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয়ই এতে আপত্তি জানাতে পারবেন না। অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী কুসুমকুমারী ঠাকুর বাড়ির বধূ হবার অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু একটু পরেই তার খেয়াল হলো, এ রকম প্রস্তাব করা যায় না। দেবেন্দ্র-বাবুরা ব্রাহ্মণ, কুসুমকুমারীরা কায়স্থ। পিরিলির বামুনই হোক আর যে-রকম ব্রাহ্মণই হোক, এঁরা এখনো বিবাহ-ব্যাপারে জাতি-ভেদ ঘোচাতে পারেননি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য নবীনকুমার অন্য এক ব্যাপারে মেতে উঠলো, আর মনে রইলো না কুসুমকুমারীর কথা।

এক প্রাতঃকালে বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে নবীনকুমারকে ধরলো গঙ্গা-নারায়ণ। সে বললো, ছোট্‌কু, ক'দিন থেকেই তোকে খুঁজচি, তোর আর দেখাই পাই না। মহাভারতের অনুবাদটি বড় সরেশ করিচিস রে! আমায় আরও খানকতক বই দিবি?

নবীনকুমার বললো, তোমার যত খুশী বই নাও না, দাদামণি! দুলালকে বলো, আনিয়ে দেবে। আমি তো মহাভারত বেচবো না, তিন হাজার কপি ছাপিয়েচি, সব বিলিয়ে দেবো, যে যা চাইবে, মহাভারত নিয়ে আমি ব্যবসা কত্তে নামিনি!

—এটা বড় মহৎ কাজ করলি রে ছোট্‌কু! আমার বন্ধুদের দেকালুম, তারা তো থ! এমন বিশুদ্ধ বাংলা এমন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, যেন মনে হয় নতুন রচনা।

—দাদামণি, তুমি তো হরিশ মুকুজ্যের ওখেনে গতায়াত করো, ওঁকে বই দিও এক কপি।

—তুই আমায় যে বইখানা দিইচিলি সেটা আমার এক বন্ধু জোর করে নিয়ে নিলে! কিচুতেই ছাড়লে না। তার বদলে সে তার লেখা নতুন একটা বই তোকে পড়তে দিয়েচে, তুই পড়ে দেকবি?

—কে তোমার বন্ধু?

—মধু, আমার সহপাঠী ছেল, এখন তো বেশ ক'খানা বই লিখেচে, বেশ নামও হয়েচে, তুই নাম শুনিসনি? মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বইখানি নিয়ে জুড়ি গাড়িতে উঠে পড়লো। এখান থেকে বরাহনগর যেতে অনেক সময় লাগে, তার মধ্যে বইখানি পড়ে ফেলবে। মধুসূদন দত্তর নাম সে শুনেছে বটে, পাইকপাড়ার রাজাদের বাঁধা নাট্যকার! নবীনকুমার নিজে বাড়ির মণ্ডে থিয়েটারের প্রচলনের পর অনেকেই তার অনুকরণ করছে! পাইকপাড়ার রাজারা বহু অর্থব্যয়ের আড়ম্বর করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক ধনী তার চেয়ে একটু বেশী কোনো ধনীকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না। সেই অনুযায়ী পাইকপাড়ার রাজাদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা বিরাগ ভাব আছে। স্বভাবতই তাদের বাঁধা নাট্যকার সম্পর্কেও সে প্রসন্ন নয়।

বইখানি অবশ্য নাটক নয়, কাব্য। 'মেঘনাদ বধ'। শুধু নামটি দেখেই নবীনকুমারের মনে একটা চিন্তা তরঙ্গ খেলে গেল। মহাভারত নয়, রামায়ণের কাহিনী। রামায়ণেরও কোনো বিশুদ্ধ গদ্যে বঙ্গানুবাদ নেই। মহাভারত শেষ করেই রামায়ণ অনুবাদে হাত দিতে হবে তো!

তারপর প্রথম পাতা উল্টে সে পড়তে শুরু করলো। 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি/বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে/অকালে : কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী...।' নবীনকুমারের ভুরু উত্তোলিত হলো। এইভাবে আরম্ভ, এরকম মাঝখান থেকে! শুরু থেকেই এক বীর চূড়ামণির পতন? এ যে নাটকের মতন। এরকম কাব্য নবীনকুমার কখনো পড়েনি।

অন্যদিন হুতোমের নকশা লেখার মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য সে পথের দু পাশ দেখতে দেখতে যায়। আজ আর অন্য কোনো দিকে তার আর খেয়ালই রইলো না। এ কী অবিশ্বাস্য রকমের কবিতা? কবিতা সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে এমনিতেই একটা বিস্ময়ের ভাব আছে। সে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু কবিতা তার হাতে ঠিক আসে না। গদ্য রচনা বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে, কিন্তু কবিতা জিনিসটা কেমন যেন হয়েও হয়ে ওঠে না। এ রকম কবিতা নবীনকুমার কখনো পড়েনি। এমন ঝঙ্কারময় শব্দ, এমন উন্নতভাব, লাইনের শেষে মিল নেই অথচ প্রতিটি লাইনই দৃঢ় সংবদ্ধ।

...শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী
পিকরব-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!

দুলাল চন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকে জুড়ি গাড়ির পিছনে। চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে দৌড়ে দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী বলচেন, ছোটবাবু?

নবীনকুমার কখন আপনমনে উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুরু করেছে। এমন কবিতা মনে মনে পড়া যায় না। হাতের ইশারায় দুলালকে যা, যা, বলে সে পাঠে নিমগ্ন হয়ে রইলো। খানিক পরে আবার সে মুখ বাড়িয়ে কোচোয়ানের উদ্দেশে বললো, এই ঘোরা, ঘোরা, শিগগির গাড়ি ঘুরিয়ে নে! দুলাল আবার নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে, ছোটবাবু?

নবীনকুমার এমন ঘোরের মধ্যে আছে যেন দুলালকে চিনতেই পারলো না প্রথমে। তীব্র দৃষ্টি মেলে বললো, কে? কে বিরক্ত করে এখন?

পরক্ষণেই আবার সে বললো, ও, দুলাল, আমি আজ কাজে যাবো না, আজ্ঞে বাড়ি ফিরবো, গাড়ি ঘোরাতে বল, তুই দৌড়ে বরানগরে চলে যা—পণ্ডিত মশাইদের খপর দিগে যা—।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবীনকুমার মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করলো। এমন নেশা সে অনেকদিন পায়নি। তারপর চারদিন ধরে নবীনকুমারের মুখে শুধু ঐ কাব্যের কথা। যাকে পায় তাকে ডেকে ডেকে শোনায়। এই ফিরিঙ্গি কবি সম্পর্কেও তার মনে দারুণ কৌতূহল জেগেছে। ছোটভাই-এর এতখানি উৎসাহের আতিশয্য দেখে গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই মধুর সঙ্গে পরিচয় কত্তে চাস? ডেকে আনবো'খন একদিন তাকে আমাদের বাড়িতে!

কিন্তু মধুসূদনকে এত সাধারণভাবে ডাকা হলো না এ-বাড়িতে। এর মধ্যে একদিন বিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের বিদায় অভ্যর্থনা হয়ে গেল। আগেকার হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি এ রিচার্ডসন বৃদ্ধ হয়েছেন, চিরকালের মতন তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ইংলণ্ডে। মধুসূদন, গৌর, গঙ্গানারায়ণ, ভূদেব প্রমুখ ছিল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র, তারা ওঁকে টাউন হলে সম্বর্ধনা জানালো এবং তারাই চাঁদা করে রিচার্ডসনের ফেরার জাহাজ ভাড়া তুলে দিল। সেই সভাতে উপস্থিত রইলো নবীনকুমার। সভা শেষে বাইরে বেরিয়ে এসেই সে বললো, আমরা প্রধান প্রধান সাহেবদের বিদায়ের প্রাক্কালে রিসেপশান দি, আমরা অদ্যাবধি আমাদের দেশীয় কোনো ব্যক্তিকে তা দিয়িচি?

যদুপতি গাঙ্গুলি বললো, এটা তুমি ঠিকই বলেচো, নবীন! আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় মানুষদের পেচোনেও আমরা ঘোঁট পাকাই, গুণের সমাদর করি না। নইলে বলো, বিদ্যাসাগর মশাইকে পাবলিক রিসেপশান দেওয়া উচিত ছিল না কি? তুমি একটা ব্যবস্থা করো না।

নবীনকুমার একটুক্ষণ ভেবে বললো, উনি কি এ সব তোয়াক্কা করেন? কে বলতে যাবে ওঁকে। যদি উনি ধমকে ওঠেন? আমি বলি কী, যে নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েচে আমাদের সাহিত্যাকাশে, তাঁকেই প্রথমে সম্বর্ধনা জানানো যাক। আগেকার দিনে রাজা-বাদশারা কবিদের শিরোপা দিতেন। এখন রাজা থাকেন বিভূঁয়ে। আমাদেরই সে দায়িত্ব লওয়া কর্তব্য।

নবীনকুমার পায়ের তলায় জল গড়াতে দেয় না। পরের সপ্তাহেই ব্যবস্থা হলো সম্বর্ধনার। এই সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সিংহবাড়ির বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে। কার্ড ছাপিয়ে বিতরণ করা হলো শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। ব্যাপারটি সত্যিই অভিনব, কলকাতা শহরের পত্তনের পর এ পর্যন্ত কোনো কবিকে এমনভাবে প্রকাশ্য অভিনন্দন জানানো হয়নি। শুধু মানপত্র নয়, কবিকে একটি উপহারও দেওয়া হবে। উপহারের দ্রব্যটি নবীনকুমারই ঠিক করলো। সুরা-প্রেমিক কবিকে দেওয়া হবে একটি রৌপ্যনির্মিত পানপাত্র।

গঙ্গানারায়ণ গিয়ে সম্মতি নিয়ে এসেছিল মধুসূদনের। নির্দিষ্ট দিনে মধু-সূদন সেজেগুজে তৈরি, সঙ্গে যাবে গৌরদাস এবং একজন মাইনেকরা পণ্ডিত। গৌরদাসের অনুরোধেও মধুসূদন দেশীয় পোশাক পরিধান করতে রাজি হলেন না। কিন্তু যাবার আগে মনের জোর আনার জন্য মধুসূদন ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলে যেই গলায় ঢালতে যাবেন, তখন গৌরদাস চেপে ধরলেন তার হাত। অনুনয় করে বললেন, প্লীজ মধু, অন্তত আজ থাক। ওখেনে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবেন, তোর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাইবেন—

বোতলটি নামিয়ে রেখে মধুসূদন বললেন, থাক, আজ আর নিজের পয়সায় কেন খাই! ওরা নিশ্চয়ই সার্ব করবে? বড় মানুষের বাড়ির ব্যাপার, আশা করি ওরা বেস্ট কোয়ালিটিই দেবে!

গৌরদাস বললেন, মনে হয় না। যতদূর জানি, ও-বাড়িতে ড্রিঙ্কস-এর চল নেই।

—কী বললি? সভা খুলেচে, ইংলিশ কায়দায় রিসেপশান দিচ্চে, আর ওয়াইন সার্ব করবে না? বিদ্যোৎসাহিনী সভা তো শুনিচি আসলে মদোৎসাহিনী সভা!

—তুই ভুল শুনিচিস মধু!

—তবে আর যাই কেন? হোয়াই বদার! মিচিমিচি গণ্ডাখানেক লোকের বক-বকানি শুনতে যাই কেন?

—তুই কী বলচিস, এত বড় সম্মান! চল, প্লীজ, ব্যাপারটা সেরে এসে বাড়ি ফিরে তুই যত খুশী ডিংক করিস।

ঘোড়ারগাড়ি মাঝরাস্তা পর্যন্ত আসার পর আবার ছটফটিয়ে উঠলেন মধুসূদন! গৌরকে তিরস্কার করে বললেন, তুই কী কল্লি বল তো? আমার গলা শুক্যে আসচে। ওরা কি ডায়াস তৈরি করে তার ওপর আমায় বসাবে? ওরে বাপ রে বাপ!

গৌরদাস বললেন, বেশীক্ষণ লাগবে না। তোর লেকচারটা শেষ হলেই তুই বাড়ি চলে আসবি।

—হোয়াট? লেকচার? কে দেবে লেকচার? তোর মাতা খারাপ?

—বাঃ, ওদের সম্বর্ধনার উত্তরে তোকে দু-চার কতা বলতে হবে না? সেটাই তো ভদ্রতা!

—তোরা আমায় মেরে ফেলতে চাস? আমি দোবো বেঙ্গলিতে লেকচার? শুনেই আমার সারা গা কাঁপচে। ওরে বাপ রে বাপ, আমি যাবো না, আমি পালাবো—

পণ্ডিতটি হো হো করে হেসে উঠলেন। মধুসূদন চক্ষু গরম করে তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি হাসচো কেন, পণ্ডিত! ভাবচো, আমি প্রহসন কচ্চি? আমি বেঙ্গলিতে লেকচার দোবো? নেভার।

পণ্ডিতটি বললেন, বলেন কি মশাই, হাসবো না? বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি যিনি, তিনি বাংলা বক্তৃতা করতে ভয়ে কাঁপছেন, এতে হাসি পাবে না?

এবার গৌরদাসও হেসে উঠলেন সশব্দে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কিন্তু মধুসূদনের সব কিছুই বেশ পছন্দ হতে লাগলো। বিদ্যোৎসাহী সভার সভ্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা খুবই আন্তরিক। বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী ঔৎসুক্যের সঙ্গে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে নবীনকুমার পাঠ করলেন মানপত্র। সেই আবেগের স্পর্শ লাগলো মধুসূদনের কণ্ঠে, উত্তর দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বেশ গড়গড় করেই বাংলা বলতে লাগলেন তিনি। অবশ্য একটুখানি বলার পরই তাঁর হাঁটুদ্বয় কম্পিত হতে লাগলো। হঠাৎ একটুখানি থেমে তিনি বললেন, আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন...কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম...। তারপরই বসে পড়লেন। তাতেই বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালিধ্বনি হলো। এরপর অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পাঠ করলেন মেঘনাদ-বধের নির্বাচিত অংশ। মধুসূদন বেশ নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগলেন। তাঁর আর বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা গেল না।

ফেরার পথে ঘোড়ারগাড়িতেও গৌরদাসের সঙ্গে মধুসূদন আলোচনা করতে লাগলেন সভাটির সার্থকতা সম্পর্কে। নবীনকুমারকে বেশ পছন্দ হয়েছে মধু-সূদনের। ঐ অল্পবয়সী ছোকরাটি এ শহরের সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরই আনতে পেরেছে এই সভায়, এটা কম কথা নয়। গৌরদাস বললেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে

একমাত্র হরিশ মুখুজ্যেকেই দেকলুম না। তিনি বোধ হয় অন্য কর্মে ব্যস্ত—।

মধুসূদন ললাট কুঞ্চিত করে বললেন, আর একজনকে দেকিনি। অথচ দেকবো বলে একস্‌পেকট করিচিলুম। তোমাদের ঐ বিদ্যাসাগর। তিনি এলেন না কেন? তাঁর বুঝি খুব অহংকার! ইফ ইউ মিট হিম, ওঁকে বলে দিও, ঐ সব অহংকারী পণ্ডিতদের মাইকেল এম এস ডাট্ গ্রাহ্য করে না।

নীলদর্পণ বইখানি নিয়ে ইংরেজ সরকার এক মজার মুশ্‌কিলে পড়ে গেল। নেটিভদের ভাষায়, নেটিভদের বই-পত্র-পত্রিকায় তাদের মনোভাব কেমন প্রতিফলিত হচ্ছে তা সরকারের গোচরে আনা পাদ্রী লঙের কর্তব্য। লঙ সাহেব সেই অনুযায়ী নীলদর্পণের সারমর্ম জানালেন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নরের সেক্রেটারি সীটন-কার সাহেবকে। এবং লঙ্ যেহেতু দেশীয় লোকদের অবস্থা উন্নয়নে আগ্রহী, সেই কারণে তাঁর কণ্ঠস্বরে খানিকটা আবেগও ফুটেছিল।

সীট্‌ন-কার-এর বয়েস কম, একটু আদর্শবাদী ধরনের, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সজাগ। তা ছাড়া, বড়লাট লর্ড ক্যানিং এবং ছোটলাট জন পিটার গ্রাণ্ট দু'জনেই যদিও কলকাতায় অধিষ্ঠিত, তবু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসনের সব ঝক্কিঝামেলা সেক্রেটারি সীট্‌ন-কারকেই পোহাতে হয়। সিপাহী যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এখনো সকলের মনে জাগরূক। নিরীহ প্রজাদের ওপর বেশী অত্যাচার চালালে আবার না একটা অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়। সুতরাং সীটন-কার এই বিষয়টি তাঁর ওপরওয়ালা জন পিটার গ্রাণ্টকে অবহিত করালেন অবিলম্বে।

গ্রাণ্ট এদেশে চাকরি করছেন অনেকদিন। পদোন্নতি হতে হতে বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর হয়েছেন। এ দেশের গ্রাম গঞ্জের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ পাবার পর তিনি প্রথম কিছুদিন পূর্ণ-উদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন, ইদানীং সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বয়েসও হয়েছে যথেষ্ট, তিনি জানেন, আর তাঁর পদোন্নতির আশা নেই, ছোট লাট থেকে বড় লাট হওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না, তার আগেই অবসর নিতে হবে। এই অবস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা খানিকটা আলস্যে গা ভাসিয়ে দেয়।

প্রবল গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। গ্রাণ্ট তাঁর চৌরঙ্গি সম্মুখবর্তী আলয়ের দ্বিতলের বারান্দায় হালকা কুর্তা গায়ে বসেছিলেন। বিকেলের শেষাশেষি বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে কিছুক্ষণ প্রবল বাতাস ছুটে আসে কলকাতার দিকে, সেইটুকুই যা আরামের। বাঁ হাতে ছোটা পেগ, ডান হাতে আলবোলার নল, দেশীয় প্রথায় ধূমপানের অভ্যেস হয়েছে তাঁর কিছুদিন। এই সময় জরুরি কাজে সীটন-কার দেখা করতে এলেন।

নীলদর্পণ বইটির বিষয়বস্তু শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন গ্রাণ্ট। অলস হলেও তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। নাটকটিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গ্রামের চাষী একযোগে প্রতিরোধ করতে নেমেছে, এ ঘটনা যদি সত্যি হয়, তা হলে সত্যিই আশঙ্কার কথা। গ্রামের নিরীহ গরিব চাষী আবহমানকাল ধরেই নিপীড়িত হয়ে আসছে।

কিন্তু ধনবান বা শিক্ষিত শ্রেণী কখনো চাষীদের পাশে দাঁড়ায় না, তারা চেষ্টা করে সরকারের পক্ষে থাকতে। নবীনমাধব এবং তোরাপের স্বার্থ আলাদা, নবীন-মাধবদের পরিবার তো ইচ্ছে করলেই কিছু অর্থ ব্যয় করে সব মিটমাট করে নিতে পারতো, তবু তারা কেন তোরাপ ক্ষেত্রমণিদের হয়ে লড়াই করতে গেল? এর মধ্যে বিপদের বীজ আছে। এইভাবেই বিদ্রোহ শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে গ্রান্ট কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন সীটন-কার-এর সঙ্গে। সীটন-কারেরও বক্তব্য এই যে শুধু গ্রামের মধ্যবিত্ত নয়, এমনকি শহরের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, যাদের সঙ্গে জমি জমার কোনো সম্পর্কও নেই, তারাও চাষীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। ইন্ডিগো কমিশানে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আগুন ছোটাচ্ছে হরিশ মুখুজ্যে। এই হরিশ মুখুজ্যের কী সম্পর্ক গ্রামের চাষীদের সঙ্গে? যার নিজের কোনো জমি-জমা নেই। এটা একটা নতুন ঝোঁক।

গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, এই নাটকের একটি ইংরাজী অনুবাদ করানো সম্ভব কী? তাহা হইলে রাজকর্মচারীরা ইহা পাঠ করিয়া বর্তমান অবস্থার চিত্রটি সম্যক অনুধাবন করিতে পারিত!

সীটন-কার বললেন, ইহার অনুবাদ করা শক্ত কিছু নহে। লঙের সহিত বহু শিক্ষিত নেটিভের যোগাযোগ রহিয়াছে, সে অনায়াসেই সত্বর অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে পারে।

গ্রান্ট বললেন, তাহা হইলে অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের ব্যয়ে তাহা মুদ্রণের ব্যবস্থা করুন। যাহাদের যাহাদের আপনি উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহাদের নামে এক কপি বই প্রেরণ করুন। আমাদিগের সকলের ইহা জানা দরকার।

এই নির্দেশ দিয়ে গ্রান্ট কয়েকদিন পরেই চলে গেলেন মফঃস্বল পরিদর্শনে।

অনুবাদ তো লঙের কাছে প্রস্তুত। কালক্ষেপ না করে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। সরকারি খরচে সীটন-কার পাঁচশো কপি ইংরেজি নীলদর্পণ ছাপিয়ে তার এক এক কপি সরকারি লেফাফায় ভরে শুধু এদেশের নয়, ইংলন্ডেরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করতে লাগলেন। এর পর বারুদে অগ্নি সংযোগ হলো।

ইংরেজি কেতাবখানির সন্ধান পেয়ে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়তে লাগলো নীলকর সাহেবরা। 'ইংলিশম্যান' নামে সংবাদপত্র হৈ হৈ রৈ রৈ তুললো। ইংরেজ ব্যবসায়ী-দের শক্তিশালী সংস্থা ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন কড়া ভাষায় বাংলা সরকারের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চাইলো, সরকারি উদ্যোগেই এ গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছে কি না। যে গ্রন্থে ইংরেজ জাতিকে এত হেয় করে দেখানো হয়েছে, ইংরেজ সরকারই সে রচনার পৃষ্ঠপোষক? সমস্ত নীলকর-দের চিত্রিত করা হয়েছে অমানুষ হিসেবে, খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে ইংরেজের নামে, নীলকর পত্নীর সঙ্গে জেলা ম্যাজিসট্রেটের প্রণয়ের ইঙ্গিত করে ইংরেজ ললনাদের সতীত্বে কুৎসা আরোপিত হয়েছে, এমনই একটি কদর্য, বিদ্বেষ-মূলক অপকৃষ্ট পুস্তকের জন্য ব্যয়িত হয়েছে সরকারি অর্থ?

চিঠি পেয়ে সরকার একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ। ব্যাপারটা তো এদিক থেকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। সরকারি স্বীকৃতি মানেই গ্রন্থটির সব অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া। ব্যবসায়ীদের চটিয়ে কখনো সরকার চালানো যায়? নীলকরদের খানিকটা সংযত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বটে সরকার, তা বলে তাদের একেবারে বিরুদ্ধবাদী করে তোলা যায় কি? নেটিভদের এতখানি প্রশ্রয়ই বা দেওয়া চলে কী করে? স্বয়ং বড় লাট লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত এই গ্রন্থ প্রকাশের

ব্যাপারে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হলেন।

বেগতিক দেখে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন গ্রান্ট। তিনি জানালেন যে সে সময় তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন, সব ব্যাপারটা তিনি জানেন না। সরকারি খরচে মুদ্রণের নির্দেশও কি তিনি দেননি? গ্রান্ট জানালেন যে তিনি বলেছিলেন বটে যে আমাদের খরচে, স্পষ্টাক্ষরে সরকারি ব্যয়ের কথা তো বলেন নি?

তাহলে সব দায়িত্ব সীটন কার-কেই নিতে হয়। কিন্তু বাংলা সরকারের সেক্রেটারি প্রকৃতপক্ষে সরকারের মুখপাত্র, তাঁর অবমাননায় সরকারেরই অবমাননা। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে ঐ চিঠির উত্তরে জানানো হলো যে, নীলদর্পণ প্রকাশের ব্যাপারটা সরকারের পক্ষে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেছে, সেজন্য সরকার অনুতপ্ত।

কিন্তু ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা ওতে শান্ত হলো না, তারা হাইকোর্টে ঐ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক এবং অনুবাদকের নামে মামলা দায়ের করলো।

বাংলা বইটিতে যেমন, তেমন ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটিতেও লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকের কোনো নাম নেই। দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তের নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে শুধু মুদ্রাকর হিসেবে ছাপাখানার মালিক ম্যানুয়েল নামে এক সাহেবের নাম রয়েছে। সে বেচারিকেই শমন পাঠালো আদালত। যেহেতু ইংরেজি গ্রন্থ নিয়েই মামলা, তাই প্রকাশক হিসেবে বাংলা সরকারের দুই প্রতিনিধি গ্রান্ট এবং সীটন-কারেরই এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু তাঁরা ঢোঁক গিলে বসে রইলেন এবং খুঁজতে লাগলেন একজন বলির পাঁঠা।

খোঁজার প্রয়োজন অবশ্য অবিলম্বেই ফুরিয়ে গেল, নির্দোষ ম্যানুয়েল সাহেবের সাজা হবে ভেবে এগিয়ে এলেন পাদ্রী লঙ, তিনি জানালেন, এই গ্রন্থের সব কিছুর জন্য তিনি একা দায়ী। আদালতের সামনে তিনি ধীর শান্ত গলায় বললেন, যতদিন আমি জীবিত আছি, যতদিন আমার মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তি থাকিবে ততদিন আমি দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া যাইব। আমি খৃষ্টান এবং ইহাই খৃষ্টানের প্রকৃত ধর্ম!

শুরু হয়ে গেল নীলদর্পণের মামলা।

নবীনকুমার তখন একদিকে মহাভারত অন্যদিকে হুতোমের নকশা রচনায় ব্যাপৃত। এই সময় হরিশ মুখুজ্যে তাকে একটি চিঠি পাঠালেন। কিছুটা শ্লেষ ও পরিহাসের সঙ্গে হরিশ লিখেছেন,

বেরাদর, বেশ কিছুকাল তোমার দর্শন পাই না, তবে তোমার অগ্রজ মারফৎ তোমার সুকীর্তির কিছু সংবাদ পাই। আমোদ প্রমোদ সব বাদ দিয়া একেবারে কর্মবীর হইয়া উঠিলে। সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিতেছ। অহো কী মহীয়সী কীর্তি! ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তোমায় ধন্য ধন্য করিবে, অবশ্য যদি ভবিষ্যতে এ দেশের মানুষ টিঁকিয়া থাকে! শত সহস্র মানুষ অনাহারের সম্মুখীন, নীলকরের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বলিতেছে, দেশ ছারখার হইয়া গেল, এই সময় মহাভারতের মতন পুণ্য গ্রন্থ রচনাই যোগ্য কাজ বটে।

আরও শুনিয়াছি, তুমি কবিবর মাইকেল দত্ত এস্কোয়ারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলে। তিনি প্রকান্ড কবি, আমি যদিও এক অক্ষরও পাঠ করি নাই, তবু লোক মারফৎ শুনিলাম দত্ত কবি মেঘনাদ বধ

কাব্য রচনার নামে রামায়ণকেই বধ করিয়া ছাড়িয়াছেন! তাঁহাকে মানপত্র দেওয়ায় নববাবু সমাজের যোগ্য কাজই হইয়াছে বলিতে হইবে। বুলবুলির লড়াই ও বাঈ নৃত্য দর্শন ছাড়িয়া এক্ষণে কাব্যকলা লইয়া মত্ত হইবারই উপযুক্ত সময় বটে। তোমাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম তুমি কিঞ্চিৎ বেতর পথে চলিবে, পিতৃসঞ্চিত অর্থ সমুচিত কার্যে ব্যয় করিবে।

এক্ষণে তোমার পুস্তক প্রীতি, নীলদর্পণ নামে একটি কেতাব বাহির হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাখো কি? গ্রন্থকার কে তাহা জানি বটে, কিন্তু নাম বলিব না। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের বড়ই সত্য, বড়ই মর্মন্তুদ চিত্র অংকিত তিনি করিয়াছেন। সে গ্রন্থ প্রচারেরও বুঝি উপায় রহিল না, বাঘা বাঘা সাহেবরা তাহাকে মামলায় ফাঁসাইয়াছে, পাদ্রী লঙ সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যুর মতন একাকী আর কতদিন লড়িবে!

আমারও বোধ করি নিষ্কৃতি নাই। আমি ইন্ডিগো কমিশানে সাক্ষ্য দিয়া সকল প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতেছি বলিয়া কুপিত ইংরাজগণ আমারও নামে মোকদ্দমা আনিয়া আমাকে সর্বস্বান্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তবে আমার জন্য চিন্তা করিয়ো না, আমার শরীরে অসুরের শক্তি, ইংরেজ বেটাদের অপেক্ষা আমার মেধাও বেশী। আমি আরও কিছু না হউক পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিব এবং ও বেটাদের সহিত লাঠালাঠি করিয়া যাইব। তুমি শরীফ মেজাজে রহিয়ো, এই মনস্কামনা জানাই।

পত্রটি পেয়ে রীতিমতন ক্ষুব্ধ হলো নবীনকুমার। সে চাটুকারদের পছন্দ করে না বলেই এক সময় হরিশ মুখুজ্যের সাগরেদী করতে গিয়েছিল। কিন্তু হরিশ এবার তাকে অন্যায্য কটাক্ষ করেছে। তৎক্ষণাৎ সে কাগজ কলম নিয়ে উত্তর রচনা করতে বসলো।

বন্ধু,

ক্ষুধার্ত মানুষের কাচে সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেইকো, তা বলে সব সুন্দর জিনিস মুচে ফেলতে হবে? যে লোক না খেয়ে রয়েচে, বসরাই গোলাপের কোনো কদর নেই তার কাচে, কারণ গোলাপ-টগর-চাঁপা এগুলো তার খাদ্য নয়, খেলে পেটও ভরে না। সেইজন্য তুমি পৃথিবী থেকে সব ফুলগাচ উপড়ে ফেলতে চাও? আম দেশে রায়তরা কষ্ট পাচ্চে, তাদের কষ্ট দূর কত্তে তো হবে বটেই, যেমন তুমি চেষ্টা কচ্চো, তা বলে লোকে মহাভারত পড়বে না? কবিরা মাতৃভাষার সাধনা কর্বে না? কতায় বলে, 'অক্ষরে পন্ডিত তুষ্ট, ফুলে তুষ্ট ভোমরা,/ক্ষুধা ভোজনে তুষ্ট, কিলে তুষ্ট বর্বরা—'। যার যা কাজ তার তা সাজে, নইলে সব যজ্ঞিই নষ্ট। চাষীদের দুর্দশা ঘুচোবার জন্য শুধু সেদিকেই সবাই মন দেবে, আর ইদিকে নব্য শিক্ষিত ছোঁড়াগুলো বাংলা ভাষার অনাদর করে শুদু ইংরিজি ফড়ফড়াবে, কিংবা দলে দলে কেরেস্তান হয়ে যাবে, এটাই বা কেমন কতা! মধুসূদন দত্ত সাহেবমনা ও ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি যে বাংলার জন্য লেখনী ধারণ কচ্চেন এবং এমন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য উপহার দিয়েচেন সেজন্য আমরা ধন্য ও কৃতজ্ঞ। তাঁর গুণের সমাদর না কল্লে আমাদের এই কুঁদুলে বাঙালী জাতির উপযুক্ত কাজই হয় বটে! নীলদর্পণ আমি পড়িচি, লেকাটি তেমন সরেশ নয়, একটাও সাহেব মল্লে না, আর দিশি ক্যারেকটারগুলো পটাপট মরে গ্যালো, এ কেমন! অবশ্য সোসিয়াল রিফর্মে-শানের জন্য এই প্রকার নাটকের মূল্য খুবই আচে। তোমার শরীরে এখুনো অসুরের মতন শক্তি জেনে বড় প্রীত হলেম। এত বল কোতায় পাও! এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে মাদৃশ সামান্য ব্যক্তিকে স্মরণে রেকেচো তাতে যার-পর-নাই সুখী

হয়েচি।......

এই পত্র লেখা সত্ত্বেও অবশ্য নবীনকুমার নীলদর্পণ মামলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে এর আগেই সে নীলদর্পণ গ্রন্থ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনেছে। মধুসূদনের জন্য তাঁর বন্ধুরা চিন্তিত, কোনোক্রমে অনুবাদক হিসেবে তাঁর নাম ফাঁস হয়ে গেলে তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। চাকুরিও হারাতে হতে পারে। সেইজন্য সব প্রমাণপত্র বিলোপ করা হয়ে গেছে। পাদ্রী লঙ অবশ্য আদালতে অবিচল, তিনি আর কারুকে জড়াতে চান না।

বিচারের সময় প্রতিদিন আদালত লোকে লোকারণ্য। ব্যবসায়ী ইংরেজরা তো আসছেই, তাছাড়া দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেককে দেখা যায়। এমন বিচার-প্রহসন বহুদিন দেখা যায়নি। সাহেবের আদালতে সাহেবের বিচার, যদিও উপলক্ষ সাধারণ নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ। সকলেই জানে যে পাদ্রী লঙ এ নাটক রচনাও করেননি, প্রচারের দায়িত্বও তাঁর নয়। তবু সেই লঙকেই শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি যে হবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিচার চলছে মর্ডাণ্ট ওয়েলসের এজলাশে, এই মর্ডাণ্ট ওয়েলসই কিছুদিন আগে এক বিচারের সময় মন্তব্য করে-ছিলেন যে ভারতীয়রা সকলেই জুয়াচোর এবং বদমাশ।

বরানগরে মহাভারত অনুবাদ কার্যালয়ে না গিয়ে নবীনকুমার এখন হাইকোর্টে চলে আসে প্রত্যহ। যদুপতি গাঙ্গুলীকেও এখানে সে দেখতে পায়। আদালতে দর্শকদের গ্যালারিতে স্থান সঙ্কুলান হয় না, যদুপতি আগে ভাগে এসে দু জনের জন্য আসন সংরক্ষণ করে রাখে। সওয়াল জবাব শুনতে শুনতে নবীনকুমারের গ্লানি বোধ হয়। সে যদুপতিকে ফিসফাস করে বলে, আমাদের প্রজাদের নিয়ে মামলা, অথচ আমাদের দেশী লোক একজনও কাঠগড়ায় দাঁড়ালো না? এ বড় লজ্জার কতা নয়?

যদুপতি বলে, ভাই, তবু এ একরকম ভালো! দিশী লোক কখুনো সাহেবদের সাথে মামলায় জিততে পারে? তার ওপর এ হলো গে মানহানির মামলা। এ মামলায় হারলে প্ল্যাণ্টার সাহেবগুলোর মুখে একেবারে চুনকালি পড়ে যাবে!

—এ মামলায় জয় হবে, তুমি আশা করো?

—দ্যাকোই না কী হয়! হাজার হোক লঙ একজন পাদ্রী এবং ভালোমানুষ বলে সব্বাই জানে। এমন মানুষকে সাজা দিলে অনেক ইংরেজও ক্ষেপে যাবে। বিলেতেও এর প্রতিক্রিয়া হবে!

—নীলকরদের সঙ্গে ইংরেজি কাগচওয়ালারাও যোগ দিয়েচে, ওদের কামড় একেবারে কচ্ছপের কামড়।

—কাগচওয়ালাদের ক্ষেপবার তো কারণ রয়েচেই! 'হরকরা' আর 'ইংলিশম্যান' তো ক্ষেপে একেবারে লাল! নীলদর্পণ-এর ভূমিকায় কী লেকা আচে দ্যাকোনি? রসিক নাট্যকার লিকেচেন যে চাঁদির কত গুণ! জুডাস যেমন মাত্র তিরিশটি টাকার বিনিময়ে প্রভু যীশুকে পণ্টিয়াস পাইলেটের হাতে ধরিয়ে দিইচিলেন, সেই রকমই এই দুই কাগচওয়ালা নীলকরদের কাচ ঠেঙে মাত্র হাজার টাকা ঘুষ খেয়েই গরীব চাষীদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করে অত্যাচারী ব্যবসায়ীদের গুণ গাইচে। বেড়ে লিকেচেন, যাই বলো!

এক এক সময় আসামী পক্ষের উকিলদের সওয়াল শুনে নবীনকুমার বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যায়। তার শরীর নিশপিশ করে। এই বুঝি উকিল? নীলকরদের দ্বারা নিয়োজিত দুঁদে উকিলদের বিরুদ্ধে লঙের পক্ষের একজন উকিল মিনমিন

রে কতা বলে, কী যে বলে তা ভালো করে শোনাই যায় না! আর একজন উকিল কালের দিকটায় জিভ ছুঁচোলো করে কিছু চোখা চোখা বাক্য বলে বটে, কিন্তু বলা বারোটা বাজতে বাজতেই তার জিভ এলিয়ে যায়, পা টলতে থাকে, কথার কানো সংগতি থাকে না। বিচারকও তেমনি চতুর, নিউমার্চ নামে এই মদ্যপ উকিলটি সওয়াল করতে এলেই কোনো ছুতোনাতায় অ্যাডজোর্ন করে দেয়। অপরাহ্ণে আবার আদালত বসলে নিউমার্চ তখন শুধু হাসির খোরাক জোগায়।

নবীনকুমারের মনে হয়, এখানে এসে শুধু সময়ের অপব্যয় হচ্ছে। মহাভারতের কাজ দেখাশুনো স্থগিত রয়েচে, তাছাড়া কুসুমকুমারীর বিবাহের চিন্তাও স পরিত্যাগ করেনি, প্রায়ই মনে পড়ে, কিন্তু সে ব্যাপারে সে সময় দিতে পারছে না। মধ্যপথে সে চলে যাচ্ছে দেখে যদুপতি গাঙ্গুলী তাকে বাধা দেয়। তার মতে এর চেয়ে বড় ঘটনা এখন আর দেশে কিছু ঘটছে না।

সে বলে, বুঝতে পারচো না, ভাই—

নবীনকুমার তাকে বাধা দিয়ে বলে, অত ভাই ভাই করো না তো! আমি কি ব্রহ্ম হয়িছি? ও তোমার ব্রেম্ম সতীর্থদের যত খুশী ভাই ভাই করো গে।

ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে যদুপতি বলে, ব্রাহ্মদের প্রতি তোমার এমন বিতৃষ্ণা আচে জানতুম না তো! তুমি তো দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নিয়মিত যাও দেকিচি!

নবীনকুমার বললো, সে আলাদা কতা। ব্রাহ্ম তো হইনি, কোনোদিন হবোও না। দেবেন্দ্রবাবুকে শ্রদ্ধা করি বটে, কিন্তু ধম্মো নিয়ে মাতামাতিতে আমার মন নেই।

যদুপতি বললো, সে যাই হোক! শোনো একটা কতা বলি, এই নীলদর্পণের মামলায় জয় হলেও আমাদের জিৎ, হারলেও আমাদের জিৎ!

—কী রকম?

—জয় হলে তো কতাই নেই। আর হার হলে, নিরপরাধ পাদ্রী লঙ সাজা পেলে দেকো সারা দেশে কত শোরগোল পড়ে যাবে। বিলাতেও এ নিয়ে আন্দালন হবে। কোনো পাদ্রীকে জেলে ভরার কতা আগে কখনো শুনোচো?

—কিন্তু পাদ্রী লঙ আইরীশ, সে কতা ভুলে যেও না! আইরীশদের সম্পর্কে ইংরেজদের খানিকটা বিরাগ ভাব আচে না?

—তা হোক, তবু বিলাতে আইরীশদেরও মুরুব্বি রয়েচে অনেক।

যথাসময়ে জুরিদের পরামর্শ নিয়ে বিচারক মর্ডাণ্ট ওয়েলস রায় দিলেন। জুরিমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে অপূর্বভাবে, বারোজন ইংরেজ, একজন পর্তুগীজ, একজন আর্মেনিয়ান আর একজন পার্শী। বাংলার চাষীদের ব্যাপার, বাঙালী মুখপাত্র একজনও নেই। জুরিরা একবাক্যে লঙকে দোষী সাব্যস্ত করলো। শেষ মুহূর্তেও লঙকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষের উকিলরা পুনর্বিচার দাবি তুললো জোরালো ভাবে। তখন চীফ জাসটিস বার্নস পীকক বিচারের ভার নিলেন। তাতে হেরফের কিছু হলো না। এমনকি একটু সৌজন্যও তিনি দেখালেন না। লঙের বক্তব্যের মাঝপথে অকস্মাৎ বাধা দিয়ে তিনি রায় দিলেন, লঙের এক মাস কারাদণ্ড এবং এক সহস্র মুদ্রা জরিমানা!

দণ্ড শুনে সাহেবরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। দেশীয় ব্যক্তিরা স্তম্ভিত। তারপর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতেই নবীনকুমার হাত তুলে নিরস্ত করলেন সকলকে। অন্যে কেউ পা বাড়াবার আগেই নবীনকুমার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ধর্মাধিকরণের দিকে। হাকিমের পার্শ্বে বসা পেশকারের সামনে একটি টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে সে বিনীত ভাবে বললো, লঙ মহোদয়ের জরি-

মানার অর্থ আমার তরফ হইতে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়!

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নবীনকুমার আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। দ্বারের কাছাকাছি এসেই সে দৌড় দিল, পাছে কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে আসে! বাইরে বেরিয়েই সে শুনতে গেল আদালত কক্ষের মধ্যে তার উদ্দেশে করতালি ধ্বনি, সে দুই হাতে চাপা দিল কান। যদুপতি গাঙ্গুলী তাকে এসে ধরবার আগেই সে হাঁকিয়ে দিয়েছে জুড়িগাড়ি।

পরদিন দল বেঁধে অনেকেই এলো তার গৃহে। যদুপতির উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। তারা নবীনকুমারকে সম্বর্ধনা জানাতে চায়। নবীনকুমার লজ্জায় আরক্ত হয়ে বার বার থামিয়ে দিতে গেল তাদের। সামান্য এক সহস্র মুদ্রা সে দিয়েচে, এ নিয়ে বেশী কথা বলার কী আছে! সে তো লঙের হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে পারেনি!

সকলে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চায়, কিন্তু নবীনকুমার উঠে পড়লো। বিশেষ কারণে তাকে এখন বার হতে হবে। উত্তম সাজসজ্জা করতে গেল নবীনকুমার। আজ দেবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কয়েকমাস আগে দেবেন্দ্রবাবুর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আজ তার নামকরণ উপলক্ষে উৎসব।

নাম অবশ্য আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিক আগের পুত্রটির নাম সোম, সেইজন্য এই নবজাতকের নাম রাখা হবে রবি।

যদুপতি গাঙ্গুলী ব্রাহ্মদের এক প্রার্থনা সভায় হঠাৎ ঘোষণা করলো, আগামী বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে সে তার উপবীত বিসর্জন দেবে। সে তারিখটি বেশী দূর নয় আর মাত্র এগারো দিন বাকি।

বাতাসে আগুনের ফুলকির মতন খবর রটে যায় সর্বত্র। সারা শহরে শোরগোল পড়ে গেল একেবারে। এ যে ঘোর কলি! কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান পৈতা ত্যাগ করবে, তা হলে আর সর্বনাশের পাঁচ পোয়া পূর্ণ হতে বাকি থাকে কী? এই সব পাপ তো শুধু একজনের ওপর অর্সায় না, গোটা সমাজের প্রতিই অভিশাপ নেমে আসে। দলে দলে লোক যদুপতি গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে এসে তর্জন গর্জন করতে লাগলো। একদল লোক রাধাকান্ত দেবের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লো। এর একটা বিহিত করতেই হবে।

পৈতা পরিত্যাগের চেষ্টা এর আগেও কয়েকজন নবীন ব্রাহ্ম করেছে কিন্তু সার্থক হতে পারেনি। হয় সেই সব নবীন ব্রাহ্মদের মাতা আত্মঘাতিনী হবার ভয় দেখিয়েছেন অথবা পিতা পানাহার বন্ধ করে ছেলেকে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছেন। মানুষ জন্মায় শুধু একবার, শুধু বাহ্মণেরই এক জীবনের মধ্যে দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাই তিনি দ্বিজ, আর সেই দ্বিজত্বের চিহ্ন ঐ যজ্ঞসূত্র। ব্রাহ্মণের কাজ ধর্মরক্ষা করা, আর সেই ব্রাহ্মণই যদি অধর্মাচারী হয়, তা হলে হিন্দুসমাজের সর্বনাশ রোধ করবে কে?

যদুপতির আত্মীয় পরিজন কেউ কলকাতায় নেই, সে একা বাসা ভাড়া করে

থাকে। সে বিপত্নীক এবং গোঁয়ার প্রকৃতির। একবার জেদ ধরলে সে কিছুতেই ছাড়বে না। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তার মধ্যে এই বিবেক দংশন চলছিল। ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদী নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসক, তবু তাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকে কী প্রকারে? এখনো ব্রাহ্মদের পুত্র-কন্যাদের বিবাহের সময় অনু-লোম-প্রতিলোমের কথা চিন্তা করা হয়। এ তো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া। যদুপতি সেই জন্যই একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।

যদুপতির কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু তাকে পরামর্শ দিল এ ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হতে। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এখনই এ রকম হঠকারিতার প্রয়োজন নেই, তা হলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আরও মারমুখী হয়ে উঠবে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু যদুপতি অনমনীয়। তার ধারণা আপোসের মনোভাব নিয়ে কোনো বড় কাজ করা যায় না। ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা সারা দেশের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করা উচিত। সনাতন হিন্দুধর্মের মতন এতে যে জাতিভেদের স্থান নেই তার প্রমাণ রাখার প্রয়োজন আছে। এতে যদি সংঘর্ষ বাধে তো বাধুক। কেশবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন তরুণ ব্রাহ্মের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উৎসাহ পেল যদুপতি।

নির্দিষ্ট দিনে যদুপতির সমর্থকরা সমবেত হয়েছে তার গৃহের অভ্যন্তরে। আর বাইরে একদল লোক টিটকারি ও কুৎসিত মন্তব্য করছে। যদুপতির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, একবার সে অলিন্দে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে বাইরের লোকগুলি উচ্চগ্রামে গালিগালাজ শুরু করে দেওয়ায় যদুপতি পাশ ফিরে তার এক বন্ধুকে বললো, যারা এমন কুরুচিপূর্ণ কুবাক্য বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে, তারাই ধর্মের রক্ষক। হায় হিন্দুধর্ম, এই তোমার দশা!

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে সে গলা থেকে উপবীতখানি খুলে হাত জোড় করে তার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে বললো, পিতঃ, আমাকে মার্জনা করুন! আমি সজ্ঞানে যাহা সৎকর্ম বলিয়া বিবেচনা করি তাহাই পালন করি। আপনি শৈশবে আমাকে এমনই শিখাইয়াছিলেন।

তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তার বাঁকুড়া নিবাসিনী মাতার উদ্দেশে বললো, মা, তুমি জানো, আমি কখনই ভালো বই মন্দ কাজ করবো না। পরের কথায় তুমি কান দিও না, আমার ওপর বিশ্বাস রেখো, তুমি জেনো যে তোমার যদু কোনোদিন কোনো অনেষ্য কাজ করবে না।

তারপর সেই ন'গাছি সুতো মালার মতন হাতে দুলিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে সে বললো, বিদায়! আজ থেকে আমার কণ্ঠ বন্ধনহীন হলো।

এই সময় একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হলো। এক যষ্টিধারী হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মধ্যবয়েসী ব্যক্তি ভিড় ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললো, একি সব্বনেশে কতা। মাতায় বাজ ভেঙে পড়বে, ভূমিকম্প হবে, তিরিশ সালের মত আবার বন্যা হবে। ওরে বাপ রে বাপ, ওরে বাপ রে বাপ!

লোকটি দ্বিতলে যদুপতির কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললো, আমার ওপর এ অত্যাচার কেন, আমি পুত্র কলত্র নিয়ে ঘর করি, ও মোয়াই, আমার এ সব্বোনাশ কচ্ছেন কেন? আপনাকে ভালো মানুষের ছেলে জেনেই তো বাড়িভাড়া দিইচিলুম। ও মোয়াই, এ কী কল্লেন?

আদর্শ ব্রাহ্মের মতন বিনীত, সুভদ্র কণ্ঠে যদুপতি বললো, কী হয়েচে, নয়নচাঁদবাবু? আপনি এত বিচলিত কেন?

গৃহস্বামী নয়নচাঁদ হঠাৎ যেন থমকে গেলেন। তারপর ঘরের চারদিক তাকিয়ে আবার যদুপতির মুখে দৃষ্টি স্থাপন করে মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ও বাবা, এ যে সুস্থ মানুষের মতন কতা বলে! তবে যে সবাই বলে, দাঁত কিড়মিড় করে বক রাক্ষসের মতন চক্ষু ঘুরোচ্চে! বামুন পৈতে ত্যাগ কল্লে ব্রহ্মদৈত্যি হয়ে যায়।

যদুপতি সমেত সেখানকার সকলেই উচ্চহাস্য করে উঠলো। কৃষ্ণদাস পাল বললো, এ পারফেক্ট স্পেশিমেন অব ইমবেসিলিটি।

যদুপতি বললো, ভয় পাবেন না নয়নচাঁদবাবু, আমি ব্রহ্মদৈত্য হইনি এখোনো। বসুন। আমি শুধু গলা থেকে এই সুতোগাছি খুলে ফেলিচি।

নয়নচাঁদ প্রায় ছটফটিয়ে লাফাবার ভঙ্গি করে বললো, বসবো, এখেনে বসবো, বলেন কী? নেহাৎ প্রাণের দায়ে এয়িচি, আমার গিন্নী বল্লেন, যাও, এখুনি যাও, সারা বাড়ি গঙ্গাজল দিয়ে ধুইয়ে এসো গে তারপর পুরুত ডেকে...মোয়াই, এই হাতজোড় কচ্চি, আমার ঘাট হয়েচে, কোন পাপে আপনাকে বাড়িভাড়া দিইচিলুম জানি না, এবার এখেন থেকে পাট তুলুন। আজ্ঞে, বলেন তো আমি গাড়ি ডেকে দি—।

তারপর সেখানে এক মহা কোলাহল শুরু হলো। নয়নচাঁদ সেই দণ্ডেই যদুপতিকে বাড়িছাড়া করতে চায়। যদুপতির বন্ধুরা তা কিছুতেই মেনে নেবে না। কৃষ্ণদাস পাল চোখা চোখা বাক্য বলতে খুব ওস্তাদ, সে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে যুক্তিজালে নয়নচাঁদকে একেবারে ফাঁদে পড়া পশুর মতন বেঁধে ফেললো। উপায়ান্তর না দেখে তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো নয়নচাঁদ। শান্তিপ্রিয় যদুপতিই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল গৃহত্যাগ করতে। তার এক বন্ধু অবনীভূষণ তাকে আশ্রয় দিতে রাজি। তখনই একটা কেরাঞ্চিগাড়ি ডেকে তোলা হলো মালপত্র। বাইরের বিরুদ্ধবাদী জনতা মনে করলো, এতে যদুপতির যথেষ্ট হেনেস্থা হয়েছে। তারা দুয়ো দিয়ে উঠলো।

মালপত্র নিয়ে চলে গেল অবনীভূষণ। যদুপতি তার অন্য বন্ধুদের নিয়ে সারবন্ধভাবে চললো গঙ্গার ঘাটের দিকে। হাজার হাজার লোক অনুসরণ করতে লাগলো তাদের। গঙ্গার ঘাট একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। সকলের সব মন্তব্য উপেক্ষা করে যদুপতি তার পৈতেগাছা ছুঁড়ে ফেলে দিল জলস্রোতে। তারপর সে মুখ ফেরালো যুদ্ধজয়ী বীরের মতন।

পরদিনই যদুপতি গেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সংবাদ জানাতে। যদুপতি যেমন দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসভায় যায়, তেমনই আবার সে বিদ্যাসাগরের চ্যালা। বিদ্যাসাগর খুশী বা অখুশী—কোনো রকমই ভাব প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন কে কেমনভাবে ধর্মাচরণ করবে, সে তার নিজস্ব ব্যাপার। তবে, বাপু, হুজুগে পড়ে করোনি তো? সমাজকে ধাক্কা দিলে সমাজ যে প্রতিশোধ নেয় তার ধাক্কা সামলাতে পারবে তো? তখন যেন পেছুপা হয়ো না!

যদুপতি বললো, আজ্ঞে না। আমি সব জেনেশুনেই একাজ করিচি।

বিদ্যাসাগর বললেন, এখন দিন-কাল অনেক পাল্টেছে, তেমন দুর্বিষহ অবস্থা নাও হতে পারে। তুমি খুব একটা নতুন কিছু করো নি। রামতনু লাহিড়ী মশায়ের নাম শুনেছো?

—আজ্ঞে সেই শিক্ষাব্রতী মহাত্মার নাম কে না শুনেচে!

—আজ থেকে বোধ করি বছর দশেক আগে ঐ রামতনু লাহিড়ীও উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তখন তোমরা নিতান্ত বালক, তাই সে ঘটনা তোমরা জানো না

কী কোন্দলই না শুরু হয়েছিল সেই উপলক্ষে। রামতনুর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে তো ধোপা-নাপিত বন্ধ হলোই, তিনি উত্তরপাড়ায় চলে এলেন শিক্ষকতা নিয়ে। সেখানেও অত্যাচারের শেষ নেই। কোনো লোক তাঁর বাড়িতে কাজ করে না। দোকানদার তাঁর কাছে চাল-ডাল পর্যন্ত বেচে না। মহা-দুর্দৈব। রামতনু পৈতে ত্যাগ করে মহৎ কাজ করেছিলেন কিনা সে প্রশ্নে আমি যাই না। কিন্তু বন্ধু মানুষ বিপদে পড়েছেন। তাই আমি কলকাতা থেকে নৌকায় তার জন্য চাল-ডাল পাঠিয়ে দিতুম। রাঁধুনী বামুনও পাঠিয়েছি। সে বেটা দুদিন কাজ করার পরই স্থানীয় লোকের তাড়নায় ভেগে যায়। আমি আবার পাঠাই। এইভাবে মোট পাঁচটি রাঁধুনী বামুন পাঠিয়েছিলুম। তবে নাপিত পাঠাতে পারিনি। সেই কারণে কিছু-দিন লাহিড়ী মশায় লম্বা দাড়ি রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর সেই দৃশ্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন। একটু থেমে আবার বললেন, ইদানীং আর তেমন উৎপাত নাই। তোমার বিশেষ বিপদের কারণ দেখি না। লোকে অবশ্য পশ্চাতে গালি দেবে ঠিকই, গালি না দিলে যে এদেশের লোকের পেটের ভাত হজম হয় না।

নবীনকুমারের সঙ্গেও দেখা হলো যদুপতির। নবীনকুমার সব শুনে বললো, তা করোচো বেশ করোচো! আমার ওপর টেক্কা দিলে হে! আমার তো পৈতে নেই যে তোমার মতন সেটি ত্যাগ করে দশজনের বাহবা নেবো! তা একটা কথা জিগ্যেস কচ্চি, পৈতে খুলে ফেল্লে বেশ কতা, কিন্তু সিটিকে আবার ঘটা করে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে গেলে কেন? তার মানে গঙ্গাজল যে পবিত্র তা মানো! আর একথাও মানো যে পৈতে জিনিসটা খুলে ফেল্লেও যেখেনে সেখেনে সেই জিনিসটে ফেলা যায় না, গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হয়।

একটু অপ্রস্তুত হলো যদুপতি। তারপর আমতা আমতা করে বললো, তা নয়, তা নয়। আমি পৈতে পায়খানার মধ্যেও ফেলে দিতে পাত্তুম। কিন্তু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, সব্বাই দেখলে, এই প্রচারই তো দরকার। যত প্রচার হবে, ততই লোকে সাহস করে এগিয়ে আসবে।

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বললো, তা যা বলোচো। এ রকম একটা দুঃসাহসিক কাজ কি ঘরের মধ্যে চুপেচাপে সারা উচিত? দশজনের বাহবা না পেলে মন ভরবে কেন!

শুধু বাহবা পাওয়া নয়। যদুপতির উপবীত ত্যাগের মূলে যে একটি অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সে কথা নবীনকুমার টের পেল কয়েকদিন পরে।

রাত্রে শয়নকক্ষের দরজা এঁটে দিয়েই সরোজিনী দৌড়ে তার স্বামীর পালঙ্কের কাছে এসে এক দারুণ সংবাদ জানাবার ভঙ্গিতে বললো, আপনি ঠিকই বলিচিলেন, আপনার কতাই মিলে গেল।

নিদ্রার আগে কিছুক্ষণ সেজবাতির আলোকে পুস্তক পাঠ নবীনকুমারের অভ্যাস। তবে বড্ড পোকার উৎপাত হয়। আর মশার ঝাঁক তো আছেই। একে গ্রীষ্মকাল, তায় কদিন ধরে নিদারুণ গুমোট চলছে। দুজন পাঙ্খা-বরদার পালা করে সারা রাত্রি জেগে বাইরে বসে এ-ঘরের পাখার দড়ি টানে। তাতেও মশা যায় না। ইদানীং সাহেবদের বাড়ির অনুকরণে নবীনকুমার তার শয়নকক্ষের জানলা-গুলিতে মশারির মতন সূক্ষ্ম তারের জাল লাগিয়েছে। তবু যে কোথা থেকে ঢুকে পড়ে মশা, তার ঠিক নেই।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে? কোন কতা মিললো আমার?

সরোজিনীর ওষ্ঠাধর পানের রসে লাল। রাতের জন্য অতি সূক্ষ্ম নীলরঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে। পালঙ্কের ওপর উঠে বসে সে তার মাথার চুল খুলতে খুলতে বললো, ঐ যে আপনি বলিচিলেন না কুসোমদিদির আবার বে'র কতা? ছি, ছি, কী ঘেন্না, এ পরপুরুষের সঙ্গে ঐ বেধবা মেয়েমানুষ আবার শোবে!

নবীনকুমার তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, তোমায় কে বল্লে এ কতা?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ গো ,আমি তো আজই শুনিচি, আপনি বিশ্বেস কচ্চেন না? আমার মা তো শুনেই কাঁদতে বসলেন! মা বললেন, ওরে বাবা, কী হবে। আমাদের পাশের বাড়িতে এত অনাচার...হতভাগিনী কুসোমের পরকাল বলে কিচু রইলো না।

নবীনকুমার এক ধমক দিয়ে বললো, তোমার মা কী বল্লেন, তা আমি শুনতে চাই না। ও-বাড়িতে তুমি কী শুনেচো তা বলো।

কথাটা আসলে সত্যি। কুসুমকুমারীর দাদাদের উদ্যোগ সার্থক হয়েচে। রামতনু লাহিড়ী কালীঘাটের নিকটবর্তী রসাপাগলা গ্রামে শিক্ষকতা করতে এসেছেন সম্প্রতি। কুসুমকুমারীর দাদারা গিয়ে ধরে তাঁকে। তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন কৃষ্ণনাথ রায়ের কাছে। কুসুমকুমারীর পিতা কৃষ্ণনাথ রামতনুবাবুকে খুবই মান্য করেন। সুতরাং তিনি এককথায় উড়িয়ে দিলেন না, বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন কিছুক্ষণ। কৃষ্ণনাথ বৈষয়িক ও ঐতিহ্যবিশ্বাসী পুরুষ। কিন্তু গোঁড়া নন, যুক্তিবাদী। সব কথা শুনে তিনি বললেন, আপনার কতা আমি অস্বীকার কত্তে পারি না। কুসুম আমার প্রাণাধিক, সে জীবনে সুখী হয় আমি সর্বান্তঃকরণে চাই। ভুল করে তার বিবাহ দিয়েচিলুম এক পাগলের সঙ্গে—এখন এই প্রকার বিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে তাই হোক। আপনি সুপাত্র দেকুন। আর হ্যাঁ, আর একটা কতা আচে, তার জননীর মত করাতে হবে, তিনি বেঁকে বসলে সেখেনে আমি জোর খাটাতে পারবো না।

কুসুমকুমারীর জননী পুণ্যপ্রভার ওপর জোর খাটাতে হলো না। নৃপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভাইরা জননীকে ঘিরে বসে বললো, মা, তোমার মত কত্তেই হবে, বাবা মশায় যখন হ্যাঁ বলেচেন—। পুণ্যপ্রভা অশ্রু বিসর্জন করে বললেন, ওরে, অবলা বেধবা নারীদের যখন বিদ্যেসাগর বে দিয়েচেন তখন আমি মনে মনে দু হাত তুলে বিদ্যেসাগরকে আশীর্বাদ করিচি। এখন নিজের মেয়ের বেলায় কি আমি অমত কত্তে পারি। সে পাগোলের কতা ভেবে বাছা যে এখনো শিউড়ে শিউড়ে ওটে।

এখন চতুর্দিকে কুসুমকুমারীর জন্য পাত্রের অনুসন্ধান চলেছে।

কয়েকদিন মহাভারত অনুবাদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নবীনকুমার এ সব কিছুই জানতো না। সে সরোজিনীর চিবুক ছুঁয়ে আদর করে আনন্দের সঙ্গে বললো, সরোজ, তুমি আজ একটা বড্ড ভালো খপর শোনালে। তোমার কুসোমদিদির একটা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা কত্তে হবে।

সরোজিনী বললো, ওমা, কুসোমদিদির বিয়ের ব্যবস্থা আপনি করবেন কেন, সে তো অন্য বাড়ির মেয়ে! আমার মা বলেচেন, ও বিয়ে যদি হয়ও আমরা কেউ নেমন্তন্ন খেতে যাবো না। আপনার পায়ে ধচ্ছি, আপনিও যাবেন না! ঐ পাপের সঙ্গে আপনি নাম জড়াবেন না।

—সরোজ, এ রকম কতা আর দ্বিতীয়বার বলো না আমার সামনে! তোমায় কতবার বুঝিয়িচি যে বিধবার বিয়ে পাপ নয়? বিধবার যদি আরেকজনের সঙ্গে

বয়ে হয়, তবে সে আর পরপুরুষ থাকে না। সেও ঐ বিধবার ধর্মপতি! তোমার কুসুমদিদি সারাজীবন এ দুঃখ পাক, তুমি তাই চাও!

নবীনকুমারের কণ্ঠস্বরে উষ্মার পরিচয় পেয়ে সরোজিনী তাড়াতাড়ি বললো, না, না, তা আমি চাই না। আপনি যখুন বলচেন, তখন পাপ নয়!

—অনেক পণ্ডিতলোক বিধবা বিবাহ করেচেন, তারা স্বামী-স্ত্রীতে সুখে আচেন!

—কুসোমদিদির সঙ্গে বুঝি কোনো পণ্ডিতের বে হবে? তাই হেমু বলছেল।

—পণ্ডিত মানে কি তুমি টুলো পণ্ডিত ভেবেচো? তা কেন? তোমার কুসুমদিদির জন্য আমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান পাত্র জোগাড় করবো। বুঝলে না, বাগবাজারের রায় বাড়ির মেয়ে, অত বড় বংশের কোনো বিধবা মেয়ের এ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। সেইজন্যই তো আমার এত উৎসাহ। এতদিনে বিদ্যেসাগর মশায়ের প্রতিকারের জয় হবে। দাঁড়াও, কাল থেকেই আমি পাত্রের সন্ধানে লেগে পড়ছি!

—শুনুন, হেমু বললো, আপনার এক বন্ধু, ঐ যে যদুপতি গাঙ্গুলী না কি, যে নাকি পৈতে পুড়িয়ে চাঁড়াল হয়েচে, সে কুসোমদিদিকে বে কত্তে চায়!

—অ্যাঁ?

—ঐ যদুপতি না ফদুপতি লোকটা তো নেপেনদাদার ছেলেদের পড়ায়। ও বাড়িতে যায়। কী জানি কখুনো কুসোমদিদিকে দেখে ফেলেচে কি না!

নবীনকুমার আপন মনে হেসে উঠলো।

সরোজিনী উৎকণ্ঠিতভাবে বললো, আপনি হাসচেন? মা বলছেল, কুসোমদিদির এমন ধিঙ্গিপনা করা বড়ই দোষের কতা! থ্যাটারের মহড়ার সময় বসে থাকে—

—আবার ঐ রকম কতা?

—মা বলছেল যে!

—তোমার মাকে বলবে, ঐ রকম কতা শুনলে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়! বুঝলে? ফের যদি তুমি তোতাপাখির মতন তোমার মায়ের কতা আমায় শোনাও, তোমায় খাঁচায় আটকে রাখবো!

—আর বলবেন না, আপনি রাগ কর্বেন না!

—যদুপতির মনে তা হলে এই ছেল! হা-হা-হা-হা—

পরদিন যদুপতি নিজেই এসে উপস্থিত। মুখখানি ম্লান, বিষণ্ণ। তাকে দেখেই সরোজিনীর কথার সত্যতা বুঝতে পারলো নবীনকুমার।

যদুপতি অন্য লোক মারফত কুসুমকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃপেন্দ্রনাথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। নৃপেন্দ্রনাথ রাজি হন নি, ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থ বিধবার বিবাহ, এতখানি বৈপ্লবিক কাজ করতে তাঁর পিতাও সম্মত হবেন না! মাঝখান থেকে যদুপতির লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে রায়বাড়িতে তার ছেলে-পড়াবার চাকুরিটিও গেছে। বিবাহের উমেদারকে আর গৃহশিক্ষক হিসেবে রাখা যায় না।

নবীনকুমারের কাছে খোলাখুলি সব কথা স্বীকার করে যদুপতি বললো, ভাই, এ যে মহাজ্বালা। উপবীত ত্যাগ করলুম, তাও আমায় বলে ব্রাহ্মণ! আর কিসে ব্রাহ্মণত্ব ঘোচাতে পারি বলো তো!

নবীনকুমার বললো, তা হলে এই জন্যেই ঢাক ঢোল পিটিয়ে পৈতে ফেলে দিয়েছিলে?

যদুপতি নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে বললো, বিশ্বাস করো, আমার কোনো অশুচি মতলোব নেই। কন্যাটিকে আমি একবারও চক্ষে দেখিনি। আমি যে বালক দুটিকে পড়াতুম তারাই অনেক গল্প করেচে ঐ মেয়েটির গুণপনার। তাই শুনে আমি মুগ্ধ হয়িচি!

নবীনকুমার বললো, তাকে চক্ষে দেখলে তুমি বুঝি তা হলে মুচ্ছো যেতে! সে মেয়েটি সাক্ষাৎ সরস্বতী ঠাকরুণটি যেন।

যদুপতি বললো, আমি মরে গেলেও কোনো বামুনের মেয়েকে বিবাহ করবো না! আমি যে প্রকৃতই জাত মানি না, তার প্রমাণ দিতে চাই। সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ এই কন্যাটি সম্পর্কে! ভাই, তুমি একটু চেষ্টা করে দেকবে। তোমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওঁদের কুটুম্বিতে আচে—

নবীনকুমার বললো, আচ্ছা দেকি!

নবীনকুমার অবশ্য আগেই জানে যে ওখানে যদুপতির কোনো আশা নেই। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের তফাত তো কৃষ্ণনাথ রায়ের বাড়িতে একটা বড় ব্যাপার বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার আছে, সেটা যদুপতি বুঝবে না। যদুপতির কোনো বংশ মর্যাদা নেই। সে সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বনেদী রায় পরিবারের সঙ্গে এমন পাত্রের বিবাহ সম্পর্ক হয় না। ওঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন নিজেদের সমান সমান কোনো বাড়ির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে।

যদুপতি তো খারিজ হয়ে গেলই, কুসুমকুমারীর জন্য আর যে চার পাঁচজন পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তাদের কারুকেই মনঃপূত হলো না নৃপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অন্যান্য ভাইদের। একবার ভুল বিবাহ হয়েছিল, দ্বিতীয়বার তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে সম্বন্ধ পাকা করতে চান। রূপে ও স্বভাবে অনিন্দিতা কুসুমকুমারীকে তো আর যার তার হাতে দেওয়া যায় না। তার চেয়ে কুসুমকুমারীর বৈধব্য দশাও ভালো। বাপের বাড়িতে তার যত্নের কোনো অভাব নেই।

নবীনকুমারও অনেক চেষ্টা করে কুসুমকুমারীর যোগ্য পাত্র সংগ্রহ করতে পারলো না। পরিচিতদের মধ্যে সে রকম কেউ নেই। কোথাও কোনো বিবাহ-যোগ্য উপযুক্ত যুবকের সন্ধান পেলে সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। যেন সে নিজেই কন্যাকর্তা। এদিকে ক্রমশ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর যদি কুসুমকুমারীর বিয়ের কথাটা চাপা পড়েই যায়! বয়েসেরও তো একটা ব্যাপার আছে। বেশি দিন ধৈর্য ধরে থাকা নবীনকুমারের ধাতে নেই, কুসুমকুমারীর বিবাহ সম্ঘটিত না হওয়া পর্যন্ত নবীনকুমারের শান্তি নেই।

তারপর একদিন যেন তার দিব্য দর্শন হলো। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে শয্যার ওপর উঠে বসে সে ভাবলো, আশ্চর্য, এমন সহজ কথাটাই তার মনে পড়ে নি! কুসুমকুমারীর জন্য সুযোগ্যতম পাত্র আর কে হতে পারে? দু-একদিনের মধ্যেই এবার ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে, এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

সকালের দিকে বিদ্যাসাগরের বাড়ির লাইব্রেরি কক্ষে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়। অনেকেই আসে কিছু সাহায্যের আশায়। ইতিমধ্যেই চারিদিকে রটে গেছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিপদের কথা জানিয়ে কেঁদে পড়তে পারলেই তিনি কিছু না কিছু সাহায্য করবেনই। এমনকি তিনি অনেকের জন্য সারা জীবন মাসিক সাহায্য বরাদ্দ করে দেন। এ ব্যাপারে তাঁর শত্রু-মিত্র ভেদ নেই। কলকাতায় মস্ত মস্ত ধনী আছে অনেক, কিন্তু তাদের কারুর কাছেই গিয়ে এরকম নিঃসঙ্কোচে হাত পাতা যায় না।

এক সময় নবীনকুমার সিংহ এসে সেই ভিড়ের মধ্যে এক পাশে আসন গ্রহণ করলো। বিদ্যাসাগর একটু বিস্মিত হয়ে তাকালেন তার দিকে। তিনি প্রায়ই বরাহনগরে নবীনকুমারের সারস্বতাশ্রমে যান মহাভারত অনুবাদের কাজ পরিদর্শনের জন্য, কখনো কোনো বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে নবীনকুমার তাঁর কাছে লোক পাঠায়। অর্থাৎ নবীনকুমারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আজ এত সকালে নবীনকুমার যখন বিনা এত্তেলায় হাজির হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছে।

তিনি ভুরু উত্তোলন করে প্রশ্ন করলেন, কী খবর হে, নবীন?

নবীনকুমার বললো, আপনি আগে অন্যদের সঙ্গে কতা শেষ করুন, আমি অপেক্ষা করছি।

লাইব্রেরি কক্ষটিতে কাঠের তাকে তাকে মূল্যবান গ্রন্থরাজি সুন্দরভাবে সাজানো। বইয়ের প্রতি যেমন যত্ন, তেমনই বই সংগ্রহের জন্য অর্থব্যয়েও কোনো কার্পণ্য নেই বিদ্যাসাগরের। অধিকাংশ বই ই মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো। একবার কে-যেন বলেছিল, আপনি বই-বাঁধাই-এর জন্য এত খরচ করেন কেন, এটা কি অপব্যয় নয়? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, তুমি বাপু পাঁচশো টাকা দামের শাল গায়ে দাও কেন? আমার তো পাঁচ সিকে দামের চাদরেই কাজ চলে যায়।

কক্ষের উত্তর দিকের দেওয়ালে এক রমণীর তৈলচিত্র টাঙ্গানো আছে। ছবিটি বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর। ছবিটি নবীনকুমার আগেও কয়েকবার দেখেছে, আজ তার মনোযোগ যেন সেদিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। কী নিরাভরণ সরল মূর্তি। ভগবতী দেবী গৌরবর্ণা, পরনে শুধু একটি অতি শস্তা কস্তা ডুবে শাড়ি, আর অলঙ্কারের মধ্যে হাতে শুধু শাঁখা। ঈষৎ লজ্জামিশ্রিত মুখখানি দেখলেই বোঝা যায়, এই রমণী কত মমতাময়ী। মাতৃমূর্তি দেখলেই নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। নবীনকুমারেরও মনে পড়লো গত দু' মাসের মধ্যে বিম্ববতীর কাছ থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। যদিও বিম্ববতী আর কোনোদিন ফিরবেন না বলে গেছেন, তবু এবার একবার তাঁকে হরিদ্বার থেকে আনাবার চেষ্টা করতেই হবে। নবীনকুমারের জননীর এমন কোনো ছবি নেই।

অন্য লোকজনদের বিদায় দিয়ে বিদ্যাসাগর নবীনকুমারের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নবীনকুমার বললো, আপনার মায়ের এই চিত্রটি আগেও দেকেচি তবে আজ

যেন বেশী করে চোখ টানলো। ইটি কার তৈরি? কোনো সাহেব ছাড়া তো এমন মনোহর চিত্র আঁকতে পারে না!

বিদ্যাসাগর বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছো। হডসন সাহেবের নাম শুনেছো? তিনিই এই ছবি বানিয়েছেন।

নবীনকুমার বললো, ঠিক বুজলুম না। না দেকে কি এমন পোট্রেইট আঁকা যায়? একজন সাহেব আপনার মায়ের ছবি আঁকলেন কী ভাবে?

—না দেখে আর আঁকবে কেমন করে? সাহেব দেখেই এঁকেছেন।

—সাহেব আপনাদের গ্রামের বাড়িতে গেসলেন?

—না, আমার মা তখন এখানে। পাইকপাড়ার রাজারা হডসন সাহেবকে আনিয়েছিলেন। আমি সেখানে যাতায়াত করি, তা একদিন সাহেব ধরে বসলে আমার একটা চিত্র-মূর্তি গড়াবে। আমি না না করি, তো সে সাহেব কিছুতেই সে কথা কানে তোলে না। নাছোড়বান্দা হয়ে শেষ পর্যন্ত আমায় রাজী করিয়ে ছাড়লে। তারপর ভালো করে গিল্টি ফ্রেমে বাঁধিয়ে সেখানা আমায় উপঢৌকন দিলে, কিছুতেই দাম লবে না। বলে কি-না বিধবা বিবাহের পক্ষে আমি যা লিখেছি তার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে সাহেব খুব খুশী হয়েছে। ঐ চিত্র তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। তখন আমি মনে করলুম, তবে আমার জননীরও একটা চিত্র গড়িয়ে নিই না কেন?

—আপনার মা রাজী হলেন?

—আমার মায়ের সব কিছুই আমার উপর বরাৎ! তিনি বললেন, নিন্দা হলে লোকে তো আমার নিন্দা করবে না, তোরই নিন্দা করবে। আমি বললুম, বেশ তাই। আমার কপালে তো নিন্দা কম জোটে নি. অধিকন্তু আর কী হবে! মাকে নিয়ে গেলেম সাহেবের বাড়ি!

—আপনি...হিন্দু ঘরের সধবাকে...সাহেবের বাড়ি নিয়ে গেলেন?

—সাহেবের বাড়িতে সব জিনিসের জোগাড় আছে, সে আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি ভালো হয় না। আমি সাহেবসুবোদের বাড়ি যেতে পারি, আমার জননী গেলেই বা দোষ কী?

—দোষের কতা নয়, আমি ভাবচি সাহসের কতা।

—এবার বলো, তোমার কি সংবাদ!

—অ্যাঁ...ইয়ে—আজ্ঞে, আমাদের গৃহে একদিন কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলুম, আপনি এলেন নাকো সেদিন। লোকমুখে শুনতে পেলুম, আপনি মেঘনাদবধ কাব্যখানা তেমন পছন্দ করেননি।

—তোমরা পছন্দ করেছো তো তাতেই যথেষ্ট। কাব্যরুচি যার যা নিজস্ব। আমার ভালো লাগে ভারতচন্দ্র, ঐ রকম দিশী মতের বাংলাভাষা পড়ে আমি আনন্দ পাই। তোমরা যদি কাব্যে বিলিতি বাংলা চালাতে চাও তো চলুক!

—মাইকেলের কাব্যে আপনি বিলিতি বাংলা কী দেকলেন? সবই তো সংস্কৃত ভাঙা শব্দ।

—তুমি কি এই সাত সকালে আমার সঙ্গে কাব্য-আলোচনা করতে এসেছো? আমার তো হাতে এখন সময় নেই, বাপু। একবার প্রেসে যেতে হবে। আমি কালি-দাসের কুমারসম্ভব সম্পাদনা করে ছাপাচ্ছি, সেই কাজ আছে।

—আমি আপনাকে একটা সুখবর দিতে এয়েচি।

—বটে? শুনি, শুনি, আজকাল সুখবরের বড় আকাল পড়েছে।

—আপনি বাগবাজারের কৃষ্ণনাথ রায়ের নাম শুনেচেন নিশ্চয়ই।

—তিনি একজন বুনিয়াদী ধনী। এইটুকু মাত্র জানি।

—ধনী তো বটেই। ত্রিপুরার রাজ-সরকারের দেওয়ান। হিন্দুসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর এক কন্যা সদ্য বিধবা হয়েচে। তিনি সেই কন্যাটির আবার বিবাহ দেওয়ায় রাজি হয়েচেন। বিধবা বিবাহ এদানি খুব কমে গেচে বলে আপনি মনঃকষ্ট পাচ্চিলেন। এই বিবাহটি হলে আবার খুব জোর একটা সাড়া পড়ে যাবে। এ রকম বড় বংশে বিধবা বিবাহ একটিও হয়নি। দেশের লোক আবার ভরোসা পাবে।

—যদি হয় তবে তো সুখবর ঠিকই।

—নিশ্চয় হবে! কন্যাটি যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তার যোগ্য পাত্র পাওয়া যাচ্চে না বলে বিয়েটা আটকে রয়েচে। যদুপতি গাঙ্গুলী পৈতে ত্যাগ করেচে আপনি জানেন বোধ করি, সে ঐ কন্যাটিকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু কন্যাপক্ষ তাতে রাজি নয়। পৈতে না থাকলেও যদুপতি বামুনের ছেলে। তায় আবার ব্রাহ্ম। ওঁরা অতটা বাড়াবাড়ি করতে চান না।

—যদুপতির অমন প্রস্তাব দেওয়া উচিত হয় নি। বিধবা বিবাহের নামেই এত বাধা। তার ওপর যদি বর্ণাশ্রম ভাঙতে যাওয়া হয়, তা হলে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে যাবে।

—শেষ পর্যন্ত কন্যাটির জন্য আমি একটি পাত্র ঠিক করিচি, তাই আপনার অনুমতি নিতে এলুম।

—পাত্রটি কে?

—আজ্ঞে, আমি!

—তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কন্যাটি আমার স্বর্গতা পত্নীর সখী ছিল। বাল্যকাল থেকেই ওকে আমি দেকিচি। ওদের সঙ্গে আমাদের পাল্‌টি ঘর। সব দিক থেকেই এ বিবাহ মানানসই হবে।

বিদ্যাসাগর যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী নবীনকুমার সিংহ করবে বিধবা বিবাহ? রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এটা মেনে নেবে? বিধবা বিবাহের পক্ষে এত বড় জয় যে কল্পনাই করা যায় না। এ রকম একটি বিবাহ সত্যিই সংঘটিত হলে তার প্রচার হবে সমস্ত ভারতবর্ষে।

তিনি বললেন, তুমি...তুমি পারবে? তোমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন...রাধাকান্ত দেবের সঙ্গেও তোমাদের কী রকম আত্মীয়তা আছে শুনেছি...।

নবীনকুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললো, আপনি যদি আশীর্বাদ করেন, আমি কোনো বাধাই গ্রাহ্য করি না। আমি মনে মনে বহুকাল যাবৎ আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আচি, আমি সর্বদা আপনার প্রদর্শিত পথে চলতে চাই!

এরপর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। এই চঞ্চল যুবকটি বারবার তাঁকে বিস্মিত করছে। এত ধনী পরিবারের এই বয়েসের সন্তানরা তো আর কেউ এ রকম নয়। এর চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সবই যেন দেশের মঙ্গলের জন্য! প্রেসের কাজ ভুলে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বললেন নবীনকুমারের সঙ্গে।

দারুণ উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরে এলো নবীনকুমার। বিদ্যাসাগরকে খুশী করতে পেরেছে। এতেই তার বেশী আনন্দ। ভাগ্যিস ঠিক সময় কথাটা মনে পড়েছিল। কুসুমকুমারীর জন্য অন্য পাত্র খোঁজার কোনো মানে হয়? কুসুমকুমারীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি এবং নীলবর্ণ চক্ষু দুটি বারবার তার মনে আসে। সেই কুসুমকুমারীকে সে নিজেই পরের ঘরণী করতে পাঠাচ্ছিল? এমন আহাম্মুকি কেউ করে? কুসুমকুমারী শুধু তার হবে, সে আর কারুর হতে পারে না।

নবীনকুমার অবশ্য এখনো এ প্রস্তাব আর কারুকে জানায়নি। সে যেন ধরেই নিয়েছে এ বিষয়ে কারুর কোনো আপত্তির প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন কি কুসুমকুমারীর পিতার বা অন্যান্যদের মতামত নেবার যে প্রয়োজন আছে, তাও সে ভাবলো না। সে, নবীনকুমার সিংহ, ধনে-মানে-গুণে এই সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত। তার যোগ্যতা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করবে? সে প্রস্তাবটি জানানো মাত্র সকলেই নির্বাক হয়ে যাবে! এই বিবাহে এমন জাঁকজমক করবে নবীনকুমার, যে রকমটি কলকাতার মানুষ বহুদিন দেখেনি।

স্নান-আহারাদি সেরে সে বরাহনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। আজ রাতটি সে শ্বশুরালয়ে কাটাবে। রাত্রেই সরোজিনীকে সুসংবাদটি দিয়ে আগামীকাল সকালে কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করবে। অথবা, সে কি নিজেই যাবে না কোনো লোক মারফৎ আগে খবরটি জানাবে? প্রথমে দূত পাঠানোই বুঝি শ্রেয়।

শয়নকক্ষের বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার নিজেকে দেখতে পেল না। দেখলো কুসুমকুমারীকে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে বললো, বন-জ্যোৎস্না, তুমি আমার হবে! আমি সহকার তরু, তুমি মাধবীলতা। আমি সরোবর, তুমি আমার বক্ষে পঙ্কজিনী হয়ে ফুটে থাকবে।

সেদিন অপরাহ্ণেই যদুপতি গাঙ্গুলী চলে এলো বরাহনগরে। খুব ব্যস্তসমস্ত-ভঙ্গিতে বললো, ভাই, তোমাকে বিদ্যাসাগর মশাই আজই একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। যথাসম্ভব শীঘ্র গেলে ভালো হয়।

নবীনকুমার বললো, কী ব্যাপার?

যদুপতি বললো, তা তো জানি না। তবে উনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েচেন মনে হলো। তুমি বিদ্যাসাগর মশাইকে আমার নামে কী বলেচো? হঠাৎ আমাকে একচোট বকাঝকা কল্লেন।

শ্বশুরবাড়ি আর যাওয়া হলো না। নবীনকুমার তখনই চলে এলো বাদুড়বাগানে। সদ্য সন্ধ্যা হয়েচে। বিদ্যাসাগর নিজের কক্ষে একলা রয়েছেন, মুখখানি থমথমে। যদুপতিকে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, যেদো, তুই বাইরে যা, নবীনের সঙ্গে আমার সবিশেষ কথা আছে। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিবি।

দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। নবীনকুমারের দিকে অগ্নিবর্ষী নেত্রে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, তোমার মনে এই ছিল? তুমি আমার সঙ্গেও তঞ্চকতা করতে চাও! তোমাদের বড়মানুষদের রক্তে রয়েছে লাম্পট্য আর ভণ্ডামি! সে তোমরা কখনো ছাড়তে পারবে না জানি, তবু এর সঙ্গে আমার নাম না জড়ালে বুঝি তোমাদেব সুখ হয় না? আমি তো তোমায় সাধ করে কখোনো ডাকি নি, তুমি কেন আস আমার কাছে?

সারা জীবনেই নবীনকুমারের কখনো ধমক খাবার অভ্যেস নেই। অভিমানে তার ওষ্ঠ কম্পিত হতে লাগলো। অতি কষ্টে সে বললো, আমি...আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না... আপনি আমায় কেন এ সব কতা বলচেন...?

—তুমি কিছুই বুঝতে পারো না? তুমি সেয়ানা দুষ্ট। তুমি অম্লানবদনে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে যেতে পারো, আর আমার কথা বুঝতে পারো না। তোমাদের অর্থ আছে, লাম্পট্য করতে চাইলে তোমাদের কে বাধা দেবে। যদি বিবেক না বাধা দেয়! তোমার বিবেক বলে যদি কিছু থাকতো, তবে তুমি আমায় এমন মিথ্যা বুঝ দিয়ে যেতে না! লাম্পট্য করতে চাও, করো, কিন্তু তার মধ্যে একজন বিধবা কন্যাকে জড়াতেই হবে!

—লাম্পট্য? মিথ্যে কতা! বিধবা বিবাহ কত্তে চেয়ে আমি অন্যায় করিচি? আপনাকে কী মিথ্যে কতা বলিচি?

—তুমি বলেছো, এই বিধবা কন্যাটি তোমার স্বর্গতা পত্নীর সখী? কেন এই তঞ্চকতা? তোমার পত্নী জলজ্যান্ত বর্তমান নেই? আমারও জানা ছিল সে কথা, কিন্তু তোমার কথার ফেরে পড়ে ভুলে গিয়েছিলুম।

—যে বিধবা কন্যাটির কথা আপনাকে বলিচি, সে সত্যিই আমার স্বর্গতা পত্নীর সখী ছেল। এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। তবে আমি আর একটি বিবাহ করিচি বটে, সে কতার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিনি, কারণ তা সবাই জানে, ভেবিচিলুম, আপনিও জানেন।

—এক পত্নী বর্তমান থাকতেও তুমি একটি বিধবাকে বিবাহ করতে চাও?

—একাধিক পত্নী রাখা কি শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ না দেশাচার বিরুদ্ধ?

—বিধবাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে উপপত্নী রাখার বদলে লোকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য একটি করে বিধবাকে বিয়ে করবে, আমি কি এই উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছি? কচি বয়েসের বিধবা মেয়ে-গুলি যাতে সম্মানের সঙ্গে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যোগ্য সহধর্মিণীর পদ পায়, সেই ছিল আমার আশা। তোমার যা খুশী করো গে যাও, আমি তোমার আর মুখ দর্শন করতে চাই না।

—আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ কচ্চেন। আমি আপনার সঙ্গে কোনো তঞ্চকতা কত্তে চাইনি। একাধিক বিবাহ যে অন্যায়, সে কতা আমার মনে আসেনি!

—ছি, ছি, ছি, কোনোক্রমে এই বিবাহের সঙ্গে আমার নাম জড়ালে সকলে মনে করতো, আমি বড়মানুষদের লোভ চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছি। তোমার একটি পত্নী রয়েছে, তাকে তুমি বঞ্চনা করবে কোন্ অধিকারে? এক বিধবার মুক্তির জন্য এক সধবার সর্বনাশের কোন্ যুক্তি?

—আমি জানি, আমার পত্নী এ বিবাহে আপত্তি কত্তেন না। তিনি এই বিধবা কন্যাটিকে খুব ভালোবাসেন, দুজনে মিলেমিশে থাকতেন!

—তোমাদের মতন বংশের বধূদের আবার আপত্তি সম্মতি কী? তাদের মতা-মতের কোনো মূল্য আছে? তোমরা যা করবে, তাই তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হবেন! তোমরা যখন উপপত্নী রাখো, বারবনিতা-গমন করো, তখন বাড়ির বউদের আপত্তির কোনো তোয়াক্কা করো? নাকি সব বউরাই সাগ্রহে সম্মতি দেন? তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না! তোমার ঐ মহাভারত অনুবাদও একটা ভড়ং মাত্র! নাম কেনার হুজুগ! আমি সোমপ্রকাশে ছাপিয়ে দেবো যে তোমার কোনো কীর্তির সঙ্গে আমার কোনো সংযোগ রইলো না। তোমার এই বিবাহেও আমি

প্রকাশ্যে বিরোধিতা করবো। এখন থেকে আমি বহু বিবাহ নিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে লাগবো!

নবীনকুমার নতমস্তকে নীরব হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বিদ্যাসাগর সবেগে পায়-চারি করছেন ঘরের মধ্যে। এক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন নবীনকুমারের দিকে।

নবীনকুমার আস্তে আস্তে বললো, আমার স্ত্রীর কোনো সন্তান হয়নি এ পর্যন্ত। যদি সে আমাদের বংশে কোনো উত্তরাধিকারী দিতে না পারে—

বিদ্যাসাগর দু হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, উঃ, এসব কথা শুনলেও গাত্রদাহ হয়। তোমার কত বয়েস, যে এর মধ্যেই নিজেকে অপুত্রক ভাবছো? তোমার পিতার কত বয়েসের সন্তান তুমি? তুমি আমায় আর উত্তেজিত করো না। তুমি নিজের পথ দেখো।

নবীনকুমার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার বুকটা বিষম দমে গেছে। আজ সকালেই সে আনন্দ সাগরে ভাসছিল, এখন এ কী হলো? দেশের এতগুলি মানুষের মধ্যে সে একমাত্র বিদ্যাসাগর মশাইকেই আঁকড়ে ধরেছিল, তিনিও তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিলেন।

যদুপতি উন্মুখভাবে অপেক্ষা করছিল, সে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার তীক্ষ্ণভাবে তাকালো যদুপতির দিকে। যদুপতির ঠোঁটে যেন বিদ্রূপের হাস্য লেগে আছে! সে নিশ্চয়ই সব জানে। সে কুসুমকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে চায় নবীনকুমারও যেন তাকে না পায়। সেই তা হলে বিদ্যাসাগরের কানে এই সব কথা তুলেছে।

নবীনকুমার আবার ফিরে এলো কক্ষের মধ্যে। বিদ্যাসাগর পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, সে তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে আর একবার সুযোগ দিন।

বিদ্যাসাগর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আবার—?

—একজন সামান্য নারীর জন্য আমি আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে পারি না কিছুতেই। আমার এই অভিপ্রায়ের কথা আমি আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানাইনি, আর কেউ জানবেও না।

—তুমি এই বিবাহ করবে না?

—আমি আপনার কাচে শপথ করে বলতে পারি। এর আগে শপথ করে গেচি, মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে, জীবন থাকতে সে কাজ আমি সম্পূর্ণ করবোই, আজ ফের শপথ করে যাচ্ছি, ইহজীবনে আর দার পরিগ্রহের চিন্তা স্বপ্নেও স্থান দেবো না। আপনি একবার আপনার পদস্পর্শ করার অনুমতি দিন!

বিদ্যাসাগরের সারা শরীরে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো, মুখখানা কুঁকড়ে গেল। তিনি বললেন, আঃ, কেন যে তোমরা আমাকে দিয়ে এত কঠিন কথা বলাও ...আগে থেকেই যদি...লোকে কুকথার জন্য মুখিয়ে আছে, একটা ছিদ্র পেলেই... তুমি মনে নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছো...আহা থাক, থাক—

বিদ্যাসাগরের চক্ষু দিয়ে জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগলো!

এবারেও বেরিয়ে এসে নবীনকুমার যদুপতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে সোজা উঠে গেল জুড়ি গাড়িতে। দুলালকে নির্দেশ দিল, বাড়ির দিকে চ!

কিছুদূর যাবার পরই সে আবার দুলালকে ডেকে বললো, থাক, গাড়ি ফেরাতে বল, আমি বাগবাজারে যাবো।

সেখানেও গেল না নবীনকুমার, খানিকটা যাবার পরই সে আবার মত বদলালো। সে যাবে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে। বেশ রাত হয়েছে, এ সময় গঙ্গার ধার নিরাপদ

স্থান নয়। তবু সে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে এলো। সর্বক্ষণের সঙ্গী দুলালচন্দ্রকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে সে হাঁটতে লাগলো একা। তার মাথার মধ্যে ঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস সব যেন একসঙ্গে চলছে। মাঝে মাঝে ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ে ধরছে সে। তার নিশ্বাস ছুটন্ত অশ্বের মতন উষ্ণ।

গঙ্গার ধারে ধারে জাহাজ থেমে আছে অনেক। আজকাল অধিকাংশই কলের জাহাজ আসে, সেগুলির চোঙা দিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। বেশ কয়েকটি জাহাজে জ্বলছে সার সার রঙীন লণ্ঠন, সেখান থেকে ভেসে আসছে নেশাগ্রস্ত নাবিকদের হল্লা। তীরেও চলছে নাবিকদের আনাগোনা, কেউ কেউ এক একটি বারবনিতার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হিড়হিড় করে। এ সময় কোনো ভদ্র নাগরিক এ তল্লাটে আসে না।

নবীনকুমারের সেসব দিকে কোনো খেয়ালই নেই। সে ভাবছে, একটা জাহাজ ক্রয় করে নিরুদ্দেশে ভেসে পড়লে কেমন হয়? এখুনি, এই মুহূর্তে! সেই জাহাজে আর কেউ থাকবে না, একজন নাবিকও না, শুধু সে একা। পৃথিবীর অজানা প্রান্তে যেসব দ্বীপে এখনও মানুষের পদস্পর্শ ঘটেনি, সেখানে সে একটি কুটির বানাবে।

একটু পরে নবীনকুমার জাহাজঘাট ছেড়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে এসে কেল্লার প্রান্তবর্তী গড়খাইয়ের পাশে একটি গাছের নিচে দাঁড়ালো। তারপর সম্পূর্ণ অকারণে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো সেই গাছের একটি ডাল। সে ডালটি তার নাগাল পাবার কথা নয়, তবু সে চেষ্টা করে যেতে লাগলো, এক আধবার নয়, অন্তত পঞ্চাশবার।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে সে দুলালকে বললো, ভবানীপুর!

দুলাল সভয়ে বললো, ছোটবাবু, অনেক রাত হলো, বাড়ি যাবেন না?

নবীনকুমার দুলালের দিকে এমন ভাবে চাইলো যেন তাকে ভস্ম করে ফেলবে।

হিন্দু পেট্রিয়ট অফিসে হরিশ মুখুজ্যের খোঁজ করে পাওয়া গেল না। কার্যালয় তখন বন্ধ হয়ে গেছে। নবীনকুমার তখন চলে এলো জানবাজারে মুলুক-চাঁদের আখড়ায়। সেখানে হরিশ রয়েছেন। বিরাট আসর বসেছে, এক দঙ্গল অচেনা লোকের সঙ্গে হরিশ প্রায় নেশায় উন্মত্ত। নবীনকুমারকে দেখে সকলে রই রই করে উঠলো, টলতে টলতে উঠে এসে হরিশ আলিঙ্গন করলেন তাকে। হাতের ব্র্যাণ্ডির বোতলটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী. চলবে?

নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে বোতলটি গ্রহণ করে ওষ্ঠে ছোঁয়ালো।

হরিশ বললেন, কী বেরাদর, ফিরে এলে যে? বিদ্যেসাগরের চ্যালা হয়ে তো ভিজে বেড়ালটি সেজেচিলে? আর্ট-কালচার দিয়ে দেশোদ্ধার কর্বে! এসব গর্হিত নেশা তো তোমাদের করার কতা নয়?

ব্র্যাণ্ডির বোতলে একটা বেশ বড় চুমুক দিয়ে এবং অনেকদিন অনভ্যাসের ফলে দু-একবার বিষম খেয়ে সামলে নিয়ে নবীনকুমার বললো, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাচে দুটি ব্যাপারে শপথ করিচি, আমার প্রাণ দিয়েও তা আমি রক্ষা কর্বো। আর সব ব্যাপারে আমি মুক্ত।

নিয়তি ঠাকুরাণী বড়ই কৌতুকপরায়ণা। প্রকৃতির রাজ্যে যে-সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, মাঝে মধ্যে তার কিছু কিছু ভণ্ডুল করে দিতেই তাঁর বেশী আমোদ। প্রকৃতির পাখিরা মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে যায়, আবার নিয়তির পাকচক্রে তাদের মধ্যেই দু' দশটি পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। নিয়তির কৌতুকে আজ যে রাজা কাল সে ফকির, আবার ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রও অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা পায়। পথের ঝাঁকা-মুটে কঠোর পরিশ্রম করেও পরিবারের জন্য দু বেলার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারে না, অথচ ধনীর দুলাল, যে সারাদিন নিজের হাতে কুটোটিও নাড়ে না, সে নানাবিধ অত্যুত্তম খাদ্য সামগ্রীর সামনে বসে নাক ছাঁটা দিয়ে বলে, এটা খাবো না, ওটা খাবো না! নিয়তি অতি নিষ্ঠুর, এতই নিষ্ঠুর যে মানুষ কোনোদিন তার মূর্তি পর্যন্ত কল্পনা করেনি:

সিংহ পরিবারের প্রতি নিয়তির নেকনজর যেন একটু বেশী। এ বাড়ির গঙ্গানারায়ণকে নিয়ে তিনি কম খেলা খেলেন নি, আবার আর একবার খেললেন।

নীলকর সাহেবরা গঙ্গানারায়ণের নামে যে বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছিল, আদালতের বিচারে গঙ্গানারায়ণ তার সব কটিতেই বে-কসুর খালাস পেয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যেও তো দু-একজনের সত্যি সত্যিই আইনের প্রতি আনুগত্য থাকে। এমনকি শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও তেমন ব্যতিক্রম আছে। জাস্টিস পীকফোর্ড গঙ্গানারায়ণকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মন্তব্য করলেন যে নিঃস্বার্থভাবে এই ব্যক্তি নীলচাষের ব্যাপারে কয়েকটি অযৌক্তিক ব্যবস্থার প্রতিকার বাসনায় সাধারণ নিরীহ চাষীদের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে ইনি নিজেই অত্যাচারিত হয়েছেন। এই প্রকার ব্যক্তিদের শাস্তি দিলে দেশের আইনশৃঙ্খলার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

এদিকে ইণ্ডিগো কমিশন চলছে। গঙ্গানারায়ণের মামলায় এরকম রায়ে অনেক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে এই বৃত্তান্ত ছাপা হলো। অতি ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া গঙ্গানারায়ণকে বিশেষ কেউ চিনতো না, সে বিখ্যাত হয়ে পড়লো রাতারাতি। তার কীর্তিকাহিনী নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে এবার ছড়িয়ে পড়লো শহরের লোকের মুখে মুখে। অনেকে গঙ্গানারায়ণকে একবাব চাক্ষুষ দেখার জন্যও সিংহসদনের দ্বারের সামনে এসে ভিড় করে।

গঙ্গানারায়ণ অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো খুবই। সে লোকের সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, নিজের কক্ষে লুকিয়ে থাকে। এমনকি সে চিন্তা করতে লাগলো যে কলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসবে কি না। ঠিক এই সময় নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে গঙ্গানারায়ণের দিকে চেয়ে হাসলেন।

আধুনিক কালের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি শিরোমণি, সেই এজু-রাজ রামগোপাল ঘোষ স্বয়ং একদিন গঙ্গানারায়ণেব সঙ্গে দেখা করে একটি প্রস্তাব

দিলেন। না ভেবেচিন্তে হুট করে কোনো কথা বলেন না বলেই রামগোপাল ঘোষের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। হরিশ মুখুজ্যে রামগোপাল ঘোষের বিশেষ অনুগত, এক সময় হরিশ রামগোপালের গৃহের সান্ধ্য আড্ডায় নিয়মিত যেতেন। কিন্তু সেখানে পরিমিত মদ্যপান হয় বলে ইদানীং হরিশ আর বড় একটা যান না, কিন্তু রামগোপালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে।

রামগোপাল বললেন, হরিশের কাচ থেকে আপনার বৃত্তান্ত সব শুনিচি। ইউ আর এ মারভেল! অথচ আপনি এত মডেস্ট, এত সফ্‌ট স্পোকেন, এই আপনিই বন্দুক ধরেচেন কতকগুলিন ব্লাড হাউন্ড ঐ প্ল্যানটারগুলিনের বিরুদ্ধে...এ যে বিশ্বাসই করা যায় না।

গঙ্গানারায়ণ মস্তক অবনত করে বললো, হরিশ সব কিছুই বাড়িয়ে বলেন, বন্দুক ধরিচি বটে কিন্তু ফায়ার করিচি মাত্র একবার।

রামগোপাল অল্পকালের মধ্যেই সরাসরি চলে এলেন মূল প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আরও অনেকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি একটি নিবেদন আচে। আপনি বাগবাজারের কৃষ্ণনাথ রায়ের বিধবা কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করার কথা বিবেচনা করে দেখুন।

গঙ্গানারায়ণের মাথায় যেন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো!

গঙ্গানারায়ণের মতন, কুসুমকুমারীর নামটিও এখন একেবারে অপরিচিত নয়! কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি যে তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চেয়েছেন এবং সেজন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি চলছে, এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। এখন ঐ বিবাহের ব্যাপারটি আর শুধু বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারেই আবদ্ধ নেই। বিধবা বিবাহের সমর্থকরা এই উপলক্ষে আবার কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগলেন, যেমন করেই হোক, এই কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। অন্যদিকে গোঁড়ার দলও নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই, তারা ভেবেছিল, এর মধ্যেই বিধবা বিবাহের ঝোঁক স্তিমিত হয়ে গেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই লোকে এই অনাচার সম্পূর্ণ বর্জন করবে। তার মধ্যে আবার এ কি হাঙ্গামা! কৃষ্ণনাথ রায়ের মতন ধীর, স্থির ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কি হঠাৎ বুদ্ধিনাশ হলো! গোঁড়ার দল রাজা রাধাকান্ত দেবকে গিয়ে ধরলো, আপনি যেমন করেই হোক এই বিয়ে আটকান!

কৃষ্ণনাথ রায়ের সঙ্গে শহরের অন্য অনেক ধনী ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে সম্পর্ক আছে। তারাও এই বিবাহ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো নানা-প্রকারে। কৃষ্ণনাথ নিজ সিদ্ধান্তে অবশ্য এখনো অনড় আছেন, তবে তাঁর একটাই শর্ত। কুসুমকুমারীর প্রথম বিবাহের সময় তিনি ভুল করেছিলেন, এবার ভালো করে দেখে শুনে পছন্দ মতন পাত্র না পেলে যার তার হাতে তিনি তাঁর এই আদরিণী কন্যাকে তুলে দেবেন না।

পাছে বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা কোনো ষড়যন্ত্র করে কিংবা অকস্মাৎ আবার কৃষ্ণনাথ রায়ের মত পরিবর্তিত হয়, তাই বিধবা-বিবাহ-সমর্থকরা যত শীঘ্র সম্ভব এই বিবাহ সঙ্ঘটিত করতে চায়। এ সব ব্যাপারে কালহরণ মানেই অশুভ। এ পর্যন্ত কোনো পাত্রকেই কৃষ্ণনাথ রায় মনোনীত করেন নি। কুসুমকুমারীকে যারা চক্ষেও দেখেনি, কৃষ্ণনাথ রায়ের পরিবারের সঙ্গে যাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই এমন শত শত ব্যক্তি কুসুমকুমারীর জন্য পাত্র অন্বেষণে তৎপর। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতন ব্যক্তিও আছেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো নিজস্ব উদ্যোগ নেননি, তবে কুসুমকুমারীর বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য হলে তিনি স্বয়ং

যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকবেন সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বলা যায় সত্যিই প্রায় শতাধিক ব্যক্তির মুখপাত্র হয়েই এসেছেন রামগোপাল বিভিন্ন সম্মিলনীতে আলোচনায় এই জনমতই গড়ে উঠেছে যে গঙ্গানারায়ণ সিংহ কুসুমকুমারীর যোগ্যতম পাত্র। এমন উদার ও মহৎ মানুষ এখন সারা দেশেই দুর্লভ তদুপরি সে ধনী ও অভিজাত বংশের সন্তান, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শরীরে অধিকারী এবং বিপত্নীক। কৃষ্ণনাথ রায় কোনো কারণেই গঙ্গানারায়ণকে অপছন্দ করতে পারবেন না।

গঙ্গানারায়ণকে সম্পূর্ণ নীরব দেখে রামগোপাল ঘোষ আবার বললেন, আমি কন্যাপক্ষের লোক নই, সুতরাং আমার কাচ থেকে এ প্রস্তাব শুনে ইউ মে বি জাস্টিফায়েবলী সারপ্রাইজড...কিন্তু আসলে আমরা পাত্রপক্ষেরই, আপনার কা থেকে সম্মতি পেলে মেয়ে পক্ষের কাচে গিয়ে কতা পাড়বো!

গঙ্গানারায়ণ এবার ধীর কণ্ঠে বললেন. আপনি কষ্ট করে আমাদের বাড়ি এয়েচেন, আমরা কৃতার্থ হয়িচি, আমার ছোট ভাই এখন গৃহে নেই, সে আপনাকে দেখলে খুবই আহ্লাদিত হতো, তবে...দুঃখের বিষয় এইটুকুই যে, আপনাদে নির্বাচন ভুল হয়েচে, আমার আর বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। আমি আর সংসারী হতে চাই না।

রামগোপাল হেসে বললেন, আপনি বন-জঙ্গল ছেড়ে সংসারে ফিরে এশেচেন সংসারে থাকলে তো সকলকেই সংসারী হতে হয়।

—অনেক সংসারেই আবার দু-একজন আলগোচ ধরনের মানুষ থাকে, যার সাতে-পাঁচে যেতে চায় না। মিঃ ঘোষ, আমি বাকি জীবনটা খোলামেলা থাকতে চাই!

—আপনি চাইলেই বা আমরা দোবো কেন? দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে আমরা চাই আপনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

—দেশের জন্য আপনি আর যা হোক কর্তে বলুন, কিন্তু বিবাহ কতে বলবেন না।

—দেশের জন্য মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দেয়, আর আপনি বিবাহের মতন একটা সামান্য কাজ কত্তে পারবেন না? এই দেকুন না, সিপয় মিউটিনির সময় দিল্লি বারুদখানা দখল রাখবার জন্য কজন ইংরেজ কেমন স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলে—।

—মিঃ ঘোষ, আমার গায়ে গেরুয়া হাওয়া লেগে গ্যাচে, আমার আর দারা পুত্র-পরিবারে মন বসবে না।

—হাওয়া পালটাতে আর কতক্ষণ! দেকুন না, দেশের হাওয়াই এখন উল্টো দিকে বইচে।

আরও কিছুক্ষণ এরকম কথার পিঠে কথা চলল, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ বিবাহে সম্মতি দিল না। শেষ পর্যন্ত তাকে আরও একটু বিবেচনা করতে বলে রাম গোপাল ঘোষ বিদায় নিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই ক্ষান্ত হলো না। এরপর গঙ্গানারায়ণের ওপর আক্রমণ আসতে লাগলো নানা দিক দিয়ে। হরিশ মুখুজ্যে কাছেও এ সংবাদ পৌঁছেচে, তিনিও এতে খুব উৎসাহী। গঙ্গানারায়ণের বন্ধুর গৌরদাস, রাজনারায়ণ, ভূদেব এমনকি মধুসূদন পর্যন্ত দেখা হলেই তাকে এ কথা বলেন। সকলেই একমত যে একটা বড় কাজ-এর জন্য গঙ্গানারায়ণের এই বিবাহ করা উচিত।

রাজনারায়ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, ওরে গঙ্গ

সেকেলে স্বয়ম্বর সভার কতা শুনিচিস তো, তোর হলো গে একেলে স্বয়ম্বর সভা। আমরা সবাই মিলে ভোটে তোকে বর নির্বাচন করিচি, এখন তো তোর পেচপাও হলে চলবে না!

গঙ্গানারায়ণ বললো, আমি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করিচিলুম যে তোরা আমায় ইলেক্ট কল্লি—

রাজনারায়ণ বললেন, ক্রমওয়েলকে যখন রাজা করা হলো, তখন তিনি কি নমিনেশান পেপার সাবমিট করেচিলেন? সবার ক্ষেত্রে লাগে না!

—অর্থাৎ আমার দশাও ক্রমওয়েলের মতই হবে।

—তা ভাই বিয়ে করা মানেই তো একরূপ ফাঁসী কাঠে চড়া নয়? তুই একবার বিয়ে করেই এত ভয় পেয়ে গেলি? এই দ্যাক না, গৌর, মধু, আমি আমরা সবাই তো দুবার করে মাথা মুড়িয়িচি, আর দেরি করিস নি, তুই এবার দুর্গা বলে ঝুলে পড়!

—আমাকে এমন অনুরোধ করে আর বিব্রত করিস নি তোরা!

—তুই কি বিধবা বিবাহ কত্তে ভয় পাচ্ছিস? দ্যাক্ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের অনেক আগেই আমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেচে, নইলে আমি নিশ্চয়ই কোনো বিধবার পাণিগ্রহণ করে অন্তত একজন দুঃখিনী বালিকার দুঃখ দূর কত্তুম। কিন্তু আমি নিজে উদ্‌যুগী হয়ে আমার দুই ভায়ের বিয়ে দিইচি দুই বিধবার সঙ্গে। তখন লোকে ভয দেখিয়েছেল আমায়। আমি মেদিনীপুরে বাংলা বাড়িতে থাকি, বলে কিনা রাতের বেলা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে! আমি বলেচিলুম, দিক দেখি একবার। বোড়ালের লোকেরা বললো, আমি গ্রামে গেলে আমায় ইঁট মারবে। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে গ্রামে যেতুম। তোর যদি কোনো বিপদ হয়। আমরা সকলে মিলে তোর পাশে থাকবো!

গঙ্গানারায়ণ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, না, আমি সে কতা বলচি না, সে কতা বলচি না—!

গঙ্গানারায়ণ তর্কবাকীশ নয়। সকলের কাছেই সে যুক্তিতে হেরে যায়, কিন্তু তার মন মানে না। অবস্থা এমন হয়েছে যে তার এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই, সব জায়গাতেই ঐ এক কথা। এরা সকলে মিলে গঙ্গানারায়ণের মনের কষ্ট অনেক বর্ধিত করে দিল।

এতদিন পর আবার বারবার মনে পড়তে লাগলো বিন্দুবাসিনীর কথা। কুসুম-কুমারীকে চক্ষে দেখেনি গঙ্গানারায়ণ, কিন্তু তার যে বয়সের কথা সে শুনেছে, সেই বয়সেই বিন্দুবাসিনীকে গোপনে চিরতরে প্রেরণ করা হয় কাশীতে। কৈশোরের ক্রীড়াসঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীর মুখ, ঠিক যেন গর্জন তেল মাখা প্রতিমার মুখের মতন, আর সেই সময়কার সুমধুর দিনগুলি গঙ্গানারায়ণের স্মৃতিপটে কতকগুলি স্থির চিত্রের মতন দোলে। তারপর বারানসীর বিন্দুবাসিনীকে মনে পড়া মাত্র তার বুকের মধ্যে যাতনা শুরু হয়। যেন সবকটি তন্ত্রী থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হচ্ছে। শেষের সেই অমোঘ কালরাত্রিতে বজরা থেকে নেমে নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বিন্দু আঃ আঃ শব্দ করেছিল, সে রকম বুক ফাটা আর্তনাদ মানুষের কণ্ঠ থেকেও বেরোয়! তার আগে বিন্দুবাসিনী নেশাচ্ছন্ন গলায় অন্তত দুবার বলেছিল, আমার কিচুই পাওয়া হলো না রে, গঙ্গা! এমন বঞ্চিত কাতরোক্তি কি গঙ্গানারায়ণ কোনোদিন ভুলতে পারবে? সে প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছিল। কেন সকলে মিলে তার সেই দুঃসহ স্মৃতিকে আবার উস্কে দিতে চায়!

বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা গঙ্গানারায়ণ কারুকে বলেনি, এই গোপনীয়তার বিপুল ভার সে সারা জীবন একলা বহন করবে। কোথায় গেল বিন্দুবাসিনী? সে নিশ্চয় সাঁতার জানতো না। নগর কলকাতার বনেদী পরিবারের পুরাঙ্গনা, তাও বালবিধবা, তার সন্তরণ শিক্ষার সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া বাঁচতে সে চায়নি, ইচ্ছে করে লাফ দিয়েছিল নৌকো থেকে, জলের গভীরে তলিয়ে গেছে, হাঙরে-কুমীরে ঠুকরে খেয়েছে তার দেহ!

একরাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখলো গঙ্গানারায়ণ। বারানসীর বিন্দু-বাসিনী নয়, সেই প্রাণোচ্ছলা কিশোরী যার সঙ্গে একসাথে গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিত-মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিত। স্বপ্নের বিন্দুবাসিনী অভিমানে ভুরু বাঁকিয়ে বললো, তুই না বলিচিলি আমায় মেঘদূত কাব্যখানা পড়াবি? মিথ্যুক! তোর কোনো কতার ঠিক নেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে গঙ্গানারায়ণ অনেকদিন পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। অন্ধকার কক্ষ, রাত্রি নিশুতি, তার এই কান্নার কথা আর কেউ জানবে না।

মুলুকচাঁদের আখড়ায় হরিশ মুখুজ্যে একদিন নবীনকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাদা এ বিয়ের ব্যাপারে কিছু ঠিক কল্লেন? আমার কাচেও কদিন যাবৎ আসচেন না!

নবীনকুমার মুলুকচাঁদের আখড়ায় আবার নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু করেছে। প্রতিদিনই অত্যধিক সুরা পান করে শেষে একসময় চেতনা হারায়। এখন সে ঠিক যেন হরিশ মুখুজ্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, সারাদিন মহাভারত অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে প্রভূত পরিশ্রম করে, তারপর সন্ধ্যা থেকেই এখানে এসে শুরু করে মদ্যপান। তবে আগের তুলনায় সে অনেক গম্ভীর, অন্য সকলকে চুপ করিয়ে রেখে নিজে একা কথা বলার অভ্যাস একেবারেই পরিত্যাগ করেছে, মাতলামির হুল্লোড়েও সে যোগ দেয় না এবং বারনারীদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। নর্তকীরা এলে সে পাশের কক্ষে শুতে চলে যায়।

মুলুকচাঁদের ব্যবসার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে ইতিমধ্যে। রাজস্থান থেকে সে তার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের এনে নানান ব্যবসায়ে জুড়ে দিয়েছে, বড়বাজার অঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ির মালিক সে নিজে। জানবাজারের এই আখড়ায় সে আর প্রতি সন্ধেবেলা আসতে পারে না, তবে ব্যবস্থাদি সবই ঠিক থাকে। মনে হয় এই আখড়াটি সে টিকিয়ে রেখেছে শুধু হরিশ মুখুজ্যের জন্যেই। রাইমোহন এখানে আর আসে না, এটা নবীনকুমারের পক্ষে একটা স্বস্তির বিষয়।

হরিশের প্রশ্নের উত্তরে নবীনকুমার সংক্ষেপে বললো, কী জানি!

হরিশ সচকিত হয়ে বললেন, অ্যাজ এ মেটার অফ ফ্যাকট্ আই ওয়াজ গোয়িং টু আস্ক ইউ। তোমার এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই কেন বলো তো, বেরাদর? কদিন ধরেই লক্ষ করচি, তুমি এ সম্পর্কে একটাও কতা কও না! সবাই যখন এত মাতামাতি কচ্চে!

নবীনকুমার বললো, আমি আর কি বলবো?

—তুমি তোমার দাদাটিকে বোঝাওনি? গঙ্গানারায়ণ আমাদের গর্ব! উই হ্যাভ্ মেনি প্ল্যানস টুগেদার। গঙ্গাতে আমাতে দেকো না সামনের বছর থেকে একটার পর একটা মুভমেন্ট লনচ কর্বো—আগামী দশ বছরের মধ্যে আমি এই ইংরেজ ব্যাটাদের টিট্ করে ছাড়বো।

—এইসব মুভমেন্ট কত্তে গেলে কি নতুন বিয়েতে জড়িয়ে পড়লে চলে? তাতে

বাধার সৃষ্টিই তো হবার কতা!

—না, না, এই বিয়েটা করা বিশেষ দরকার। এই উদাসীন জাতিকে বারবার ঘা মারতে হবে! এক একটা মহৎ একজামপল সেট কত্তে হবে। গঙ্গানারায়ণ সিংহের মতন মানুষ যদি বিধবা বিবাহ করেন তা হলে আরও কত লোক এ রকম কাজ কত্তে ভরসা পাবে।

—আমার মনে হয়, এ বিয়ে হবে না।

—কেন?

—আমার মা বেঁচে রয়েচেন, তিনি হরিদ্বারে থাকুন আর যেখানেই থাকুন। এ খবর ঠিকই তাঁর কানে পেঁৗচবে, তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদবেন। দাদা নিশ্চয়ই মায়ের মনে এরকম দুঃখ দিতে চান না।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে হরিশ মুখুজ্যে মহা উত্তেজিতভাবে বললেন, তুমি...তুমি এই কতা বললে, নবীন? তুমি প্রতিটি বিধবা-বিবাহের জন্য এক হাজার টাকা দান ঘোষণা করেচিলে, সেই তোমার মুখে এমন কতা! তুমি না বিদ্যাসাগরের চ্যালা! এখন নিজের পরিবারে এই বিয়ে ঢুকচে বলেই অন্য সুর গাইচো! জানি, জানি, তোমরা সব একটু এদিক ওদিক হলেই বাপ-মায়ের সুপুত্তুর হয়ে যাও! মুখেন মারিতং জগত, তারপর দায় পড়লেই ভালো মানুষের মতন মুখটি করে বলবে, কী কর্বো ভাই, মা অনেক করে বল্লেন, তাই এই বিয়েটা করে ফেল্লুম! হেঃ! আমি যে কাগজ চালাবার জন্য সর্বস্বান্ত হচ্চি, সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়চি, সে কি আমার মায়ের মত নিয়ে? তোমার দাদা যদি এ বিয়ে করতে ভয় পান, তা হলে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্কই রইবে না! আমি একাই আমার ক্রুসেড চালিয়ে যাবো!

এমন ভর্ৎসনার উত্তরে নবীনকুমার একটাও কথা বললো না। সে গালিচার ওপর বসে ছিল, হাতের গেলাসটি শেষ করে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো।

হরিশ বললেন, তোমাদের জননী হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েচেন, তবু তোমরা মায়ের দোহাই পেড়ে সটকাচ্চো!

নবীনকুমার নীরবে দুটি হাতের পাঞ্জা স্থাপন করলো দুই চক্ষুর ওপর।

—কী, কোনো উত্তর দিচ্চো না যে?

—আমাকে এখন বিরক্ত করো না!

—জানি, যখন তোমরা কোনো যুক্তি দেকাতে পারো না। তখন ঘুমিয়ে পড়ো। খাঁটি ভারতীয় একেই বলে, হেঃ!

নবীনকুমার এবার উপুড় হয়ে গেল। হরিশ মুখুজ্যের অনেক প্ররোচনাতেও সে আর একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না।

এর দশ দিনের মধ্যেই বিবাহের দিন ও লগ্ন ঠিক হয়ে গেল। গঙ্গানারায়ণ হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যে লোকের অনুরোধের উত্তরে বারবার না বলার চেয়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কোনো ক্রমে মেনে নিয়ে স্বস্তি বোধ করে। সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে এবং বন্ধুদের উপরোধে সে বোধ হয় বিষও খেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুসুমকুমারীর সঙ্গে বিয়ের উপমা দেওয়া কোনো ক্রমেই ঠিক হলো না। সেই এক রাত্রে বিন্দুবাসিনীকে স্বপ্নে দেখার পর থেকেই গঙ্গানারায়ণের মন একটু একটু পরিবর্তিত হচ্ছিল। তার মনে হলো, বিন্দুবাসিনীর বয়সী এক বিধবাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে সে ঐ মেয়েটিকে বিন্দুবাসিনীর মতনই দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই মেয়েটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিতা করলে

বিন্দুবাসিনীর আত্মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। সেই ইঙ্গিত দেবার জন্যই স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়েছিল বিন্দুবাসিনী। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ বিবাহে এই ভেবেই সম্মতি দিল যে, সে যেন অন্য মূর্তিতে বিন্দুবাসিনীকেই গ্রহণ করছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিবাহ উপলক্ষে বিধুশেখর কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টাই করলেন না। সিংহ পরিবারে এত বড় একটা কাণ্ড হতে চলেছে, অথচ তাতে বিধুশেখরের যেন পক্ষে বিপক্ষে কোনো উদ্দীপনাই নেই। যথা সময়ে গঙ্গানারায়ণ বিধুশেখরের অনুমতি নিতে গিয়েছিল, তিনি শুকনো গলায় বলেছিলেন, তুমি বিবাহ কত্তে চাইচো...এতে আর আমার বলবার কী আচে! যা ভালো বুঝবে, কর্বে। এটুকু বলেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি। গঙ্গানারায়ণ তখন সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুসি, সব তো শুনিচিস, আমি যদি এই বে করি, তোরা খুশী হবি? উদ্গত অশ্রু কোনো ক্রমে রোধ করে সুহাসিনী উত্তর দিয়েছিল, গঙ্গাদাদা, দেশসুদ্ধু সব দুঃখিনী মেয়েরা তোমায় দু হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বেন।

বাগবাজারে কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রাসাদে এই বিবাহের দিন সমারোহ হলো বিস্তর। আসরে উপস্থিত রইলেন গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি। নবীনকুমারের অবশ্য যাওয়া হলো না।

বর-বেশী গঙ্গানারায়ণকে কুসুমসজ্জিত জুড়ি গাড়িতে চাপিয়ে এবং অন্যান্য গাড়ি ও পাল্কীতে বরযাত্রীদের চাপিয়েই নবীনকুমার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিকেলেই এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এসেছে, অতিকষ্টে সে সংবাদ গোপন করে রাখা হয়েছে গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে। গত রাত্রি থেকে হরিশ মুখুজ্যে অনবরত রক্ত-বমি করছেন। তাঁর মাথার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

দু জন সাহেব চিকিৎসক এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নবীনকুমার খানিক পরেই উপস্থিত হলো হরিশের বাড়িতে। সেখানেও একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। গঙ্গানারায়ণের বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন ছুটে এসেছেন এত দূরে হরিশকে দেখবার জন্য। তাঁরা বললেন, নবীনকুমারকে এখন একবার বাগবাজারে যেতে, সকলেই তাকে খোঁজা-খুঁজি করছে। গঙ্গানারায়ণকে হরিশ ও নবীনকুমারের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে নানা রূপ ভুজুং-ভাজুং দেওয়া হয়েছে, এখন নবীনকুমারের একবার যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে নবীনকুমার কিছুতেই উঠে যেতে রাজি নয়।

রাত্রি ভোর হবার পর বহু কার্য অসমাপ্ত রেখে, বহু মানুষকে কাঁদিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন হরিশ। আগের দিন থেকেই তাঁর বাকরোধ হয়েছিল, মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠজনদের একটি কথাও বলে যেতে পারলেন না।

হরিশের গৃহের সামনে যে ছোটখাটো একটা জটলা জমেছিল, সেখানে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল রাইমোহন। ভেতরে যায়নি। যাবার মতন অবস্থাও নয়। তার পোশাক শতচ্ছিন্ন, বার্ধক্যে শরীর নুব্জ হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি স্তিমিত, ঠিক পথের পাগলের মতন চেহারা, চেনাই যায় না আগেকার মানুষটিকে। শেষ সংবাদ শোনার পর সে বেসুরো জড়িত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ রচিত একটা গান শুরু করে দিলঃ

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে রে ভাই ছারখার
অসময়ে হরিশ মোলো
লঙের হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার...

একটু আগে জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। চিৎপুরের রাস্তা একেবারে কাদায় মাখামাখি। পথের দু'পাশের পগারের থকথকে কাদায় নতুন জল মিশেছে বলে সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে। ভন্ ভন্ করছে নীল ডুমো মাছি। এরই মধ্যে বাজার করতে বেরিয়েছেন বাবুরা, গোড়ালি উঁচু করে বকের মতন পা ফেলে ফেলে চলছেন, তাঁদের পিছু পিছু ধামা মাথায় করে সঙ্গে চলেছে বাড়ির ভৃত্য বা দাসী। হৌসের বাবুরা আপিসের দেরি হয়ে গেল বলে ছুটছে পড়ি মরি করে, তাদের অনেকেরই জুতো জোড়া বগলদাবা এবং ধুতি তুলে ধরেছে উরু পর্যন্ত। ছ্যাকরাগাড়িগুলোর আষ্টেপৃষ্ঠে ভিড়, কেউ কেউ মাথাতেও চেপে বসেছে।

এই সকালবেলাতেও দু' চারটি মাতাল ও গাঁজাখোর ঢলাঢলি করছে পথের এখানে ওখানে। পাহারাওয়ালা মাঝে মাঝেই গাড়ি-ঘোড়া সামলানোর কর্ম ছেড়ে বলে, 'বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে, বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।' কিন্তু একথাও পুরোনো হয়ে গেছে, এখন সবরকম নেশাই ছড়িয়ে পড়েছে শহরের সর্বত্র। ন'টার তোপ্ পড়তেই এক মাতালবাবু এমন ভাবে আঁতকে উঠলেন যে এক লাফ দিতেই কাদার ওপর ডিগবাজি দিলেন দু'বার। তারপর আর তাঁর পদদ্বয়ের ওপর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। এই অবস্থায় কোনো পালকী বা কেরাঞ্চী গাড়ি তাঁকে নেবে না, কারণ এখন তেজীর সময়, খদ্দেরের অভাব নেই। মাতালবাবু এক নগদা ঝাঁকামুটেকে ধরলেন তাঁকে মাথায় করে নিয়ে যাবার জন্য। তা সে ঝাঁকামুটেও গলা ঝামড়ে বলে কি না, পুঙিগর বাই, আমারে মুদ্দোফরাস পাইচেন?

এ সময় খরিদ্দার সমাগমের সম্ভাবনা কম বলে বারাঙ্গনারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের রঙ্গ দেখে। মাঝে মধ্যে তারা ওপর থেকে নানারকম মন্তব্যও ছুঁড়ে দেয়। এক কেরাঞ্চী গাড়িতে উঠে বসেছেন দুই বাবাজী, একজনের উদরটি জয়ঢাকের মতন, আর মুখখানি তেলো হাঁড়ি। কামানো মস্তকে চৈতন ফক্কা। অন্য বাবাজীর চেহারাটি ফড়িং-এর মতন পল্কা। হাতে একটি শামুকের ডিবে যেন জন্ম ইস্তক সাঁটা, তিনি এতই নস্যি নেন যে তাঁর লালাও খয়েরি রঙের। এই দুই বিসদৃশ চেহারার গোঁসাই গাড়িতে চাপার ফলে সে গাড়ি আর নড়তে চায় না, গাড়োয়ান জিবে টক্ টক্ শব্দ করে চাবুক মাথার ওপর ঘোরালেও ঘোড়া নড়ে না এক পা। সেই দৃশ্যে পথের লোক বেশ কৌতুক পেয়ে গেল। নিকটবর্তী বারান্দা থেকে এক বারাঙ্গনা বললো, ওরে, ঐ এক গোঁসাই-ই তো এক গাড়ি! মিনসে যেন কুম্ভকর্ণ! আরেকটা তো ওঁয়ার দাঁত খোঁটার খড়কে কাটি! এক চীনেবাদামওয়ালা

বললো, ওরে গাড়োয়ান, একদিকে এক ধূম্রলোচন, আর একদিকে এক চিমসে সওয়ারি! আগে পাষাণ ভেঙে নে, তবে তো গাড়ি চলবে! অমনি ওপর থেকে সেই বারাঙ্গনাটি বললো, ওরে ঐ রোগা মিনসেটার গলায় গোটা কতক পাতর বেঁদে দে, তবে তো পাষাণ ভাঙা! আমোদখোর জনতা হে-হে-হে করে হেসে উঠলো। গাড়ির মধ্যে তটস্থ বিপুলকায় বাবাজী বললেন, ভায়া, শহরের স্ত্রীলোকগুলি কি ব্যাপিকা দেখচো! প্রভো, তোমার ইচ্ছা! অন্য বাবাজী বললেন, জন্ম ইস্তক ওঁয়ারা কোনো উঁপদেশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁয়াদের রাঁমা রঞ্জিকা পাঁঠ দেঁওঞা উঁচিত! এক মাতাল তার মধ্যে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বল্লে? কী বল্লে? আবার বলো।

বিশিষ্ট মার্জিত শিক্ষিত সুসভ্য দুই বাবু পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে যেতে এই দৃশ্য দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন এবং একজন অপরজনকে বললেন, হোয়াট ডিগ্রেডেশান! এই কাণ্ট্রি দিন দিন গোয়িং টু হেল!

একটু দূরে এক কালীমন্দিরের সামনে পাঁঠার মাংস বিক্রয় হচ্ছে। ভাগা ভাগা করে সাজানো, এগুলি প্রসাদী মাংস তাই খদ্দেরের টান বেশী। দামও একটু বেশী। যারা কিনতে পারে না তারা বলে, এখন শহরের দেবতারা পর্যন্ত রোজগেরে! মাংসের ব্যবসা কচ্চে। ইদানীং মাংস খাওয়ার একটা জোর হুজুগ উঠেছে, ওতে নাকি সাহেবদের মতন স্বাস্থ্য হয়, চামড়ায় জেল্লা লাগে। সেইজন্য পাঁঠার মাংস বেশ দুষ্প্রাপ্য। মাতাল, বেনে ও বেশ্যারাই আগেভাগে বেশী দামে মাংস কিনে নিয়ে যায়। তাই পাঁঠার মাংসেও ভেজাল চলছে কখনো কখনো শোনা যায়। কুকুর-বিড়ালও বাদ যায় না। ভাবগতিক এখন এমন হয়েছে যে জলচরের মধ্যে শুধু নৌকো, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি আর চতুষ্পদের মধ্যে শুধু খাট এখন খাওয়া নাই!

পথের মোড়ে মোড়ে বড় বড় লাল-কালো অক্ষরে ছাপা ইস্তাহার লটকানো। হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে খুলচে, দেশ ভ্রমণের অপূর্ব সুযোগ! অপূর্ব সুযোগ! অল্প খরচে এবং দিন সংক্ষেপে বারাণসীধাম এবং ত্রিবেণীতীর্থে স্নানের জন্য অনেকেই এখন ব্যস্ত। আরমানি ঘাট সর্বদা লোকে লোকারণ্য।

হঠাৎ একটা হই হই রই রই শোরগোল শোনা গেল। পথের সব লোক ঊর্ধ্ব-মুখী হয়ে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে। গৃহস্থবাড়ির বুড়ো-বুড়ী ছেলে-মেয়ে সবাই দুপদাপ করে উঠে গেল ছাদে। আকাশে আশ্চর্য দৃশ্য, শূন্যে ভাসছে মানুষ। সাহেব জাতি যে কত খেলাই জানে, আকাশেও মানুষ ওড়ে! প্রায় ফি বছরই ফরাসীদেশের এক সাহেব এসে এই মানুষ ওড়ার কেরামতি দেখায়। কেল্লার মাঠে হাজার হাজার মানুষ চাঁদা দিয়ে সেই মানুষ ওড়া দেখতে যায়। তলায় যন্ত্র বসানো এক পেল্লায় কাপড়ের গোল্লা, সাহেবরা তাকে বলে বেলুন, আর দেশী লোকেরা বলে ফানুস। সেই ফানুসে এক সাহেব উঠে বসার পর দড়ি কেটে দেওয়া হয়, অমনি ফানুস দুলতে দুলতে ওপরে ওঠে। উঠতে থাকে তো উঠতেই থাকে, গগনবিহারী সাহেব শূন্য থেকে হাত নাড়ে। আবার ইচ্ছে মতন নেমেও আসতে পারে সেই ফানুস।

একদল লোক আঙুল তুলে বলতে লাগলো, ওই, ওই ওই! যারা দেখতে পায়নি তারা বলতে লাগলো, কই, কই, কই? কেউ বললো, দ্যাক, দ্যাক একটা শকুন ঐ ফানুসটার কাচে যাচ্ছে, এবার ঠুসো মারবে।

পথের গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ, সকলেই দেখতে লাগলো সেই ফানুসের লীলা। অত উঁচুতে সাহেবটিকে মনে হচ্ছে যেন রথের মেলার পুতুল। ফানুসটি দুলতে

দুলতে এক একবার একদিকে সরে যায়, অমনি সবাই হে-হে করে ওঠে। একটু পরেই বৃষ্টি নামতেই সকলে দুদ্দাড় করে ছুটলো। ফানুসটি আর দেখা গেল না। কেউ বললো, সাহেব ছাতা নিয়েচেন তো? কেউ বললো, সাহেব এখন চাঁদের ওপর বসে একটু বিশ্রাম কচ্চেন।

আরমানি ঘাটে রেলের টার্মিনাস। টিকিটের কাউণ্টারগুলির সামনে মানুষের ভিড়ের অন্ত নেই, মনে হয় যেন একদল লোক বাড়ি থেকে এখানে এসেছে শুধু নিজেদের মধ্যে ঠ্যালাঠেলি করবার জন্যে। রেলের চাপরাসীরা বেত হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে সপাসপ পেটাচ্ছে তাদের। ভাগ্যবান যারা কোনোক্রমে টিকিট কাটতে পারে তারাও টাকা দিয়ে খুচরো ফেরত পায় না। অবেদন নিবেদনও নিষ্ফল। বুকিং ক্লার্ক মহাশয় তখন আপন মনে গুনগুনিয়ে গান করেন, "মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কী গুণ ঐ বিদেশী!" খুচরো ফিরতের দাবিতে কেউ যদি তর্জন গর্জন করে তখন রেল-পুলিস ও জমাদাররা তাদের কণ্ঠে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে। দেশী লোকদের ফার্স্ট ক্লাস ভ্রমণের অধিকার নেই বলে ফার্স্ট ক্লাস কাউণ্টার জনবিরল ও নিঃশব্দ। দু-চারটি সাহেব মেম সেখান থেকে সকৌতুকে থার্ড ক্লাসের এই ভূতের নৃত্য দেখেন।

ঘাটে স্টিম ফেরি দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে, লোকের ভিড়ে কুমড়ো-গাদাগাদি হলে সেগুলি টুনুনাণ্টাং টুনুনাণ্টাং ঘণ্টা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়। গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। কেউ কেউ বলে সাহেবরা ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই রেল লাইন খুলেছে। কাঁকড়ার গর্তে যেমনভাবে ডিম থাকে সেইভাবে মানুষ পোরা হয় থার্ড ক্লাসে, তারপরও স্টেশন মাস্টার ও গার্ড এসে উঁকি দিয়ে দেখে যান এখনো নিশ্বাস ফেলার জায়গা আছে কি না, তা হলে আরও কিছু যাত্রী ঠুসে দেওয়া হবে।

আরমানি ঘাটের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সুঠাম সবল চেহারার যুবাপুরুষ, পরনে নীল রঙের কোট প্যাণ্টলুন, মাথায় একটা শোলার হ্যাট, মুখের রেখা সুগম্ভীর। আর একজন ধুতি-বেনিয়ান পরা অভিজাত চেহারার ব্যক্তি সেকেণ্ড ক্লাস কাউণ্টার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এসে বললো, তুমি...আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মশায়ের নামটা জানতে পারি?

হ্যাটকোটধারী যুবকটি ভাবলেশহীন মুখে বললো, আই ডোনট থিংক আই মেট ইউ বিফোর!

ধুতি-ভদ্রলোকটি বললো, তা হলে কি আমার ভুল হলো! তবে আপনাকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো কেন?

হ্যাট কোট আর কোনো উত্তর দিল না।

—মশায়ের নামটি যদি জানতে পারি।

—তার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

ধুতি-বেনিয়ান যেন দারুণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ নাম মনে পড়ছে না। হ্যাট কোটের ব্যবহার বেশ রূঢ়, কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। বিড় বিড় করে ধুতি-বেনিয়ান স্টিম-ফেরীর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, ও মনে পড়েচে, মনে পড়েচে! তুমি তো চন্দ্রনাথ!

হ্যাটকোট ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। ধুতি-বেনিয়ান দৌড়ে এসে তাকে

ধরে বললো, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রনাথ! আমি এবার ঠিক ধরিচি।

হ্যাটকোট ফিরে দাঁড়িয়ে আরও কর্কশভাবে বললো, সো হোয়াট?

অপর ব্যক্তিটি তার হাত চেপে ধরে বললো, ভাই চন্দ্রনাথ, আমায় চিনতে পাচ্চো না? আমি তো তোমাকেই খুঁজেছিলুম। আমার নাম রতনমণি, বাগবাজারের রতনমণি রায়। আমি জানি, তুমি আমায় দেকে রাগ করবে, কিন্তু তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মাথা থেকে টুপিটি খুলে চন্দ্রনাথ বললো, আমি মনে করি না, আমার সঙ্গে কাহারো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে!

—চন্দ্রনাথ, আমরা হিন্দু কালেজে এক কেলাসে পড়তুম।

—না।

—জানি, তুমি কি বলতে চাও। তুমি ভর্তি হবার পর আমরা সবাই কেলাস ছেড়ে দিইচিলুম, তবু দু-চারদিন এক সঙ্গে বসিচি। তোমাকে আমার মনে আচে, আমাকে তোমার মনে নেই?

সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত এই চন্দ্রনাথ আমাদের পূর্ব পরিচিত। সে হীরা-বুলবুলের পুত্র। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে রতনমণির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলো। সে কিছুই বিস্মৃত হয় না, তার স্মৃতিশক্তি আয়নার মধ্যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠের মতন, রতনমণিকে সে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। কিন্তু সে কারুকেই চিনতে চায় না।

—তুমি কোতায় যাচ্ছো, চন্দ্রনাথ? টিকিট কেটেচো? চলো, আমরা এক সঙ্গেই যাই। আমি তোমার সঙ্গে থার্ডকেলাসেই যাবো না হয়।

—আমি কোথাও যাচ্চি না। আমি কলকাতায় ফিরচি।

—অ্যাঁ, তুমি যাচ্চো না? তোমাকে এখেনে দেকে ভাবলুম...তুমি কলকেতা থেকে কোথাও যাচ্চো?

—না!

—তোমার এমন ধড়াচুড়ো, প্রথমে ভাবলুম বুঝি সাহেব—তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

—এ কথাটা দু'তিনবার শুনলুম। কিন্তু কী দরকার তা এখনো বুজলুম না।

—তোমার কাচে আমি ক্ষমা চাইবো।

—আপনার ফেরী ছেড়ে যাচ্চে।

—যাক গে, চুলোয় যাক ফেরী। না হয় আজ যাবোই না, শ্রীরামপুরে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি, ভাগনেটার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, সেইজন্যই একবার... তা না হয় কাল যাবো। তোমাকে দেকে আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেবে গেল। এতদিন এমন একটা বুকচাপা কষ্ট ছেল...

—আপনি কী বলচেন, কিচুই বুজতে পাচ্চি না।

—ভাই, অল্প বয়েসে কী নির্বোধ ছিলুম, জ্ঞান বুদ্ধি কিচুই ছেল না, তোমার ওপর অবিচার করিচি। পরে যখুন উপলব্ধি হয়েচে, তখন থেকে আমার বুকের মধ্যে অনুতাপানল ধিকিধিকি জ্বলচে।

—আমার এখনো বিশ্বাস, আপনি ভুল কচ্চেন, আপনি আমাকে অন্য মানুষ ভেবেচেন।

—আপনি? তুমি...তুই বলে ডাকো আমায়। আমরা সহপাঠী...হায় কী মূর্খ, কী মূর্খ আমরা, তোমার জন্মবৃত্তান্তের সাত কাহন তুলে আমরা তোমার সঙ্গে

পড়তে চাইনি...তুমি জীবনে উন্নতি করেচো দেকে বড় খুশী হলুম।

—এবার যাই।

—কোতায় যাবে তুমি। একবার পেয়িচি, তোমায় আর ছাড়চিনি। তোমায় তো আসল কতাটাই বলা হয়নি।

—আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।

—এখেনে? এই পাঁচপেঁচি ভিড়ের মধ্যে? চলো, আমরা কোনোখানে গিয়ে বসি। অনেকক্ষণ ধরে মনের কতা কই।

—আপনার সঙ্গে মনের কথা কইবার মতন সখ্য আমার ছিল বলে তো মনে পড়ে না।

—সেই কতাই তো বলচি। তেমন সখ্য হলো না সেটা তো আমারই দুর্ভাগ্য। কিংবা দুর্ভাগ্যই বা বলচি কেন, আমারই সম্পূর্ণ নিজস্ব দোষ। যে পাপ আমি করিচি...

—আমাকে সত্যিই এবারে যেতে হবে।

—যাবে মানে? তুমি আমায় ক্ষমা করোচো কিনা না জেনেই আমি তোমায় ছাড়বো ভেবোচো? কক্ষনো না।

—ক্ষমা?

—চন্দ্রনাথ, আমিই সেই মহাপাতক। তোমার মনে আচে কি না জানি না, আমিই মনে করিয়ে দিচ্চি...সেই যে একদিন সন্ধেবেলা বাগবাজারে আমাদের বাড়িতে...কিসের যেন নেমন্তন্ন ছেল...হ্যাঁ, মনে পড়েচে, আমার ছোট বোনের বিয়ে...বাইরে কাঙালী ভোজন হচ্চিল...আহা-হা ভাবলেও এখন বুক ফেটে যায়... তুমি আমার সতীর্থ হয়ে কিনা কাঙালীদের মধ্যে বসেচিলে...আমার কি উচিত ছেল না তোমার হাত ধরে তোমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে পঙ্‌ক্তিভোজে বসানো... তা না করে আমি কী করিচি! আমার ছোটকাকাকে ডেকে বলিচি, ছোটকাকা, এই সেই বেশ্যার ছেলেটা আমাদের কলেজের নাম ডোবাচ্চে...তোমাকে মারতে মারতে হটিয়ে দেওয়া হলো...তোমার মনে আচে?

চন্দ্রনাথ চুপ করে রইলো। জীবনের এইসব ঘটনা কেউ কি কখনো ভুলতে পারে?

রতনমণি বললো, তখন ভেবেচিলুম, কতই যেন বাহাদুরীর কাজ করলুম... তারপর তিন চার বচর পরে একদিন...তখন আমি আরও অনেক পড়াশুনো করিচি, অনেক শাস্ত্র পাঠ করিচি, দর্শন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিচি...হঠাৎই একদিন মনে হলো, আমি কতখানি অমানুষের মতন ব্যবহার করিচি তোমার সঙ্গে। তোমাকে কতখানি দাগা দিইচি!

রতনমণির চক্ষু দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। চন্দ্রনাথ তা সত্ত্বেও কোনো প্রতি-উত্তর দিল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইলো রতনমণির দিকে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চক্ষু মুছে রতনমণি অবার বললো, আজ আমার প্রায়শ্চিত্ত হলো। চলো, তুমি কোতায় যাবে, তোমার সব কতা শুনবো।

চন্দ্রনাথ কোথায় যাবে তা সে নিজেই জানে না। চার বৎসর পর সে ফিরলো কলকাতায়। শ্মশানে মাতৃমুখ দেখে সেই যে ছুট দিয়েছিল, তারপর তার জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এ শহরে আর কোনদিন সে আসবে না ভেবেছিল। হঠাৎ এক সময়ে এক সাহেবের নেকনজরে পড়ে যায়। তার ইংরিজিজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে সাহেবটি তাকে বর্ধমান রেল স্টেশনে একটা চাকরি দিয়েছে। নিতান্ত

উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার এবার কলকাতায় হঠাৎ আসা।

রতনমণি চন্দ্রনাথের কোনো আপত্তিই শুনলো না। প্রায় জোর করেই তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো রাস্তায়, তারপর একটা পাল্‌কি ডেকে তাকে নিয়ে চললো নিজের বাড়িতে।

চন্দ্রনাথ কলকাতা শহরে ফিরে এসেছে নতুন মানুষ হয়ে। এখন সে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত, তার শারীরিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থবল। রেলওয়েতে কয়েক বৎসর চাকুরি করে সে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চিত করতে পেরেছে। সে মিতব্যয়ী, মিতাহারী এবং কোনোরকম নেশা ভাং করার অভ্যেস তার নেই, তা ছাড়া এই চাকুরিতে উপরি রোজগার হয় অনেকটা বিনা আয়াসেই। আকৃতিতেও সে প্রকৃত রূপবান, তার দিকে যে-কেউ একবার দৃষ্টিপাত করলেই দ্বিতীয়বার তাকাবে। এমন দীর্ঘকায় পুরুষ বঙ্গবাসীদের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়, গাত্রবর্ণ গৌর, শুধু তার ওষ্ঠের রেখায় যেন ঈষৎ বাঁকা ভাব পরিস্ফুট।

রতনমণি জোর করে চন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এলো স্বগৃহে এবং এমন আদর-যত্ন করতে লাগলো, যেন কোনো গুরুঠাকুর এসেছেন। বাগবাজারে তাদের প্রকাণ্ড তিনমহলা বাড়ি, বাইরের দিকের এক অংশে আছে সুসজ্জিত অতিথিশালা, সেখানে স্থান দেওয়া হলো চন্দ্রনাথকে। কিন্তু এত খাতিরের আদিখ্যেতায় দু'দিনেই অস্থির হয়ে উঠলো চন্দ্রনাথ, তা ছাড়া রতনমণি যতই ভাবোচ্ছ্বাস দেখাক কিছুতেই তাতে চন্দ্রনাথের হৃদয়ে সাড়া জাগে না।

কিছুদিন আগে এ বাড়িতে রতনমণির বিধবা ভগিনী কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে উৎসবের রেশ এখনো যায় নি, দূর দূর থেকে আগত আত্মীয়স্বজনে ভবন পরিপূর্ণ। বাড়িতে এত ভিড় বলেই রতনমণি চন্দ্রনাথের কাছে এসে নিভৃতি খোঁজে। তার গল্পের আর শেষ নেই।

তাদের বাড়িতে এই বিধবা বিবাহ যে কতখানি গর্বের ব্যাপার সে কথা বারবার সবিস্তারে শোনায় রতনমণি। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিল প্রথমে। কিন্তু রতনমণির পিতা কৃষ্ণনাথ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই বিবাহে যারা যারা আসবে না তাদের সঙ্গে ইহজীবনে তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। তখন প্রায় সকলেই আমতা আমতা করে মত পরিবর্তন করেছে। যে বনস্পতির ছায়ায় তাদের আশ্রয়, সেই বনস্পতির গাত্রে কুঠারাঘাত করতে তাদের সাহসে কুলোয় নি। বিবাহের দিন গোলমালের আশঙ্কায় প্রায় একশত পুলিস নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রহরায়, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি অবশ্য। আর কত গণ্যমান্য মানুষ এসেছিলেন, তাঁদের নাম বলে শেষ করা যায় না।

এই বিবাহের ফলে রতনমণির বুকে অনেকখানি ভরসা জেগেছে। কিছুদিন ধরেই সে একটি বাসনা পরিপোষণ করছিল, সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে চায়। এ বাড়িতে এ পর্যন্ত কেউ ব্রাহ্ম হয়নি। তবে রতনমণির পিতা যখন কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার মতন উদার হয়েছেন, তখন এক পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণেও হয়তো আপত্তি

করবেন না।

রতনমণি বললো, চন্দ্রনাথ, তুমি ব্রাহ্ম হবে? চলো, তোমাতে আমাতে একদিন দেবেন্দ্রবাবুর কাছে যাই।

চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে লোহার শিক বসানো গবাক্ষের ধারে। এখান থেকে এ বাড়ির সদর দেউড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। ঐ দেউড়ির বাইরে সে একদিন কাঙালী পংক্তির মধ্যে খাওয়ার আশায় বসেছিল, তাকে মারতে মারতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনও প্রত্যেকদিনই ওখানে কাঙালীরা এসে আশায় আশায় বসে থাকে, সেদিকে তাকালেই চন্দ্রনাথের মনে হয়, সেও যেন কৈশোরের শরীর নিয়ে ওদের মধ্যে রয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে বললো, ব্রাহ্ম? কেন?

রতনমণি বললো, তুমি ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে কিছু জানো না? বেশ তো আমি তোমায় খানকতক বই পড়তে দোবো। ভাই, আমি এই নবধর্মের মধ্যে সংস্কারমুক্ত পবিত্রতার সন্ধান পেয়েচি। একেশ্বরবাদী হওয়া ছাড়া এই অনড় স্থবির হিন্দু-ধর্মের কোনো মুক্তি নেইকো। এত জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি। এত অবিচার...

চন্দ্রনাথ বললো, বর্ধমানে আমি এতদিন একা একা থেকেচি, সেই সময় পড়েচি অনেক বই, ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে আমার কিছু জানতে বাকি নেই। শুধু একটা বিষয় জানতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরমশায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ঘোচাতে চাইচেন বেশ কতা, কিন্তু তিনি কি তাঁর পাল্কী বেহারা কিংবা বাড়ির চাকর-বাকরদের ঐ ধর্মে দীক্ষা দিয়েচেন?

রতনমণি খাঁটি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, চাকরদের দীক্ষা দেবেন? কেন?

—কেন, চাকররা বুঝি হিন্দু নয়? তাদের মুক্তির দরকার নেই?

—তুমি কী বলচো, মাথামুণ্ডু ছাই বুজতেই পাচ্চি নি! চাকররা দীক্ষা নেবে? তারপর পাঁচজন ভদ্দরলোকের সঙ্গে এক সাথে প্রার্থনায় বসবে? হে-হে-হে! কেউ দীক্ষা দিতে চাইলেই বা সে ব্যাটাদের সাহস হবে কেন? তারা রাজিই হবে না!

-আফ্রিকা থেকে যে-সব নিগ্রোদের আমেরিকায় ক্রীতদাস হিসেবে নেওয়া হয়েচে, তারাও কিন্তু খৃষ্টধর্মে দীক্ষা পেয়েচে। সেখেনে প্রভু-ভৃত্য সব এক ধর্মের। তোমাদের বুঝি আলাদা।

—তুমি যা বলচো, এবার বুজিচি, হ্যাঁ, একদিন সারা দেশের সকলেই ব্রাহ্ম হবে, কিন্তু তার আগে, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগে দলে আনা হোক, আগে ভালো করে দানা বাঁধুক!

—আমি দীক্ষা নিতে চাইলে আমায় দেওয়া হবে?

—কেন হবে না? তোমার মতন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষকে আমাদের মধ্যে পেলে...

—সেখেনে আমায় নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিতে হবে? আমি বলবো, আমার জননী ছিলেন বেশ্যা, আমার পিতা কে তা আমি জানি না।

—এ হে হে, ওসব থাক্। তুমি ওসব আগবাড়িয়ে বলতে যাবে কেন?

—অর্থাৎ আমাকে মিথ্যে পরিচয় দিতে বলচো! অথচ বইপত্তর পড়ে দেকিচি, ব্রাহ্মদের জীবনে মিথ্যার কোনো স্থান নেই, তাঁরা সত্যের উপাসক। আমি জানি, তোমাদের এই সব সংস্কার আন্দোলন শুধু সমাজের উচ্চবর্ণ বামুন কায়েতদের জন্য। আর আছে বণিকশ্রেণী। একালে জমিদারদের চেয়ে বণিকরাই বেশী শক্তি-

মান। তারা অভিজাত সাজবার জন্য পুরোনো জমিদারি কিনে নিচ্চে আর সমাজের চূড়ায় ওঠবার জন্য দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে দয়ালু পরোপকারী আর সমাজ সংস্কারক সাজচে!

—তুমি এত রেগে যাচ্চো কেন?

—তোমাদের বিদ্যেসাগর মশাইয়ের কাছেও গিয়ে আমি একটা কথা জেনে আসবো। বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমি অন্য অনেকের চেয়েই খাটো নই। কিন্তু আমি যদি বিধবা বিবাহ কত্তে চাই, তিনি আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন? তিনি নিজে উপস্থিত থেকে আমার বিয়ে দেবেন? মন্ত্রপাঠের সময় যখন আমার পূর্বপুরুষদের নাম জিজ্ঞেস করা হবে, আমি পরিষ্কার বলবো, আমি জারজ, আমার কোনো পিতৃ-পরিচয় নেই।

—চন্দ্রনাথ, ঐ জ্বালা তুমি আর বুকে পুষে রেক না। ওসব পুরোনো কতা ভুলে যাও!

—আমি কিচুই ভুলবো না! আর জীবনে কখনো মিথ্যে কতা বলবো না বলে শপথ নিয়েচি!

—কিন্তু সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে এরকম রাগ বইলে তুমি তো জীবনে কিচুই কত্তে পারবে না। জীবনে ভালো ভালো দিকগুলোন উপভোগ কত্তে গেলে মনটাকে নির্মল রাখতে হয়।

—যে মানুষ অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে চায়, তার ক্রোধী ও জেদী থাকাই উচিত। দেকো, তোমাদের এই সমাজটার একদিন আমি ঘাড় মটকাবো!

—হা-হা-হা-হা-হা।

—হাসচো, হাসো। শোনো, তোমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম কিংবা বিধবা বিবাহটিবাহ এসবই অতি ছেঁদো ব্যাপার। মুষ্টিমেয় লোকের হুজুক। মানুষের মধ্যে কোনো উচ্চ নীচ শ্রেণী থাকবে না, সব মানুষ সমান হবে, সমান অধিকারের সুযোগ পাবে, এই কতাটা প্রচার করাই এখন প্রকৃত ধর্ম।

—সব মানুষ সমান হবে? এইসব আজগুবী কতা তোমার মাতায় ঢুকলো কী করে? হাতের পাঁচটা আঙুল কখনো সমান হয়? হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হলে সে হাতে যেমন কোনো কাজ চলে না, তেমনি সব মানুষ সমান হলে তখুন আর সমাজও চলবে না! তা হলে কেউ আর প্রজা থাকবে না, সবাই রাজা হতে চাইবে!

—কেউ রাজাও হবে না, কেউ প্রজাও থাকবে না। গুণ অনুসারে যে-যার নিজের কাজ করবে। আসল কতা হলো, সকলে সমান অধিকার পাবে। চণ্ডীদাস নামে এক কবির নাম শুনেচো? তিনি গেয়েচিলেন, শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

—ও, তিনি তো বোষ্টম ছেলেন না? তা তুমি বোষ্টমদের দলে ভিড়তে পারো অবশ্য। ওরা শুনিচি জন্ম পরিচয়ের ধার ধারে না। যার তার সঙ্গে কণ্ঠী বদল কল্লেই ওদের বে হয়ে যায়। ওদের খুব মজা।

—অর্থাৎ তুমি ওদের বিদ্রূপ কচ্চো। ওরা জাতের বিচার মানে না, বংশ পরিচয় তোয়াক্কা করে না বলেই তোমাদের চক্ষে ওরা বিদ্রূপের পাত্র। তুমি আমাকে এ বাড়িতে ডেকে এনেচো শুধু তোমার আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি লাগাতে, আমাকে সম্মান করতে নয়! সে আমি প্রথমেই বুঝেচি। আই নো ইয়োর টাইপ। আই হ্যাভ সীন এনাফ অফ দিস কাইন্ড অফ হিপোক্রিসি।

এর অল্প পরেই চন্দ্রনাথ নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রতনমণির গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। তারপর একটি কেরাঞ্চি গাড়িতে অনেকক্ষণ ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা বাসা ভাড়া পেল বৈঠকখানা অঞ্চলে। বর্ধমান ছেড়ে কলকাতায় আসবার সময় তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা ছিল না, ভেবেছিল দু-চারদিন ঘুরে চলে যাবে। এখন সে ঠিক করলো, এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে। রেলের চাকুরিতে ইতিমধ্যেই সে মনে মনে ইস্তফা দিয়ে ফেলেচে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে। গাড়ি ধরলো না, পদব্রজেই ঘুরতে লাগলো উদ্দেশ্যহীনভাবে।

কলুটোলার কাছে অনেক দোকনপাট এই সময়েও খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের বাইরে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। খরিদ্দারদের ভিড়ে স্থানটি রম্ রম্ করে। এক দোকান থেকে চন্দ্রনাথ একটি মজবুত ছড়ি কিনলো, তার ইংরেজি-আনা পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে। তার গাত্রবর্ণ ও পোশাকের সামঞ্জস্যের জন্য অনেকে তাকে সাহেব মনে করে। দেশীয় লোকরাই এমন ভুল করবে, সাহেবরা নয়। অবশ্য ট্যাঁস ফিরিঙ্গি হিসেবে সে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারে স্বচ্ছন্দেই। ছড়িতে ভর দিয়ে সে অলস পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলো।

মনের গতি অনেক সময় মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না। চরণের গতির সঙ্গে মনের গতি মিলে যায়, তবু মানুষ অবাক হয়। এক সময় চন্দ্রনাথ সত্যিই বিস্মিত হলো দেখে যে কখন অজান্তে সে শ্মশানের ধারে পৌঁছে গেছে। এইখান থেকেই একদিন এক দৌড়ে সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল ; সেইজন্যই এই একই স্থানে তাকে কে যেন টেনে এনেছে।

শ্মশানের পরগাছাদের নিয়ে চন্দ্রনাথ এখানে যে একটি দল গড়েছিল, সেরকম যে দুজন চণ্ডালকে চন্দ্রনাথ এখানে দেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন এখনো আছে, অন্যজনের বদলি নতুন লোক এসেছে। পুরোনো চণ্ডালটি কি চিনতে পারবে যে এই নীল রঙের কোট প্যান্টালুন ও মাথায় হ্যাট পরা মানুষটিই এককালের সেই চাঁদু, যে এখানে নেংটি পরে ডাণ্ডা হাতে নিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে বেড়াতো? চন্দ্রনাথ অবশ্য চণ্ডালটিকে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। সে কিছুই ভোলে না, জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাই তার মনে আছে।

সব মিলিয়ে শ্মশানের দৃশ্য ঠিক একইরকম রয়েছে মনে হয়। পর পর তিনটি চিতা জ্বলছে, একদিকে জমিয়ে তাড়ি ও গাঁজা খাচ্ছে শ্মশান-বন্ধুরা, আর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে শোকে মুহ্যমান আত্মীয়স্বজন। মাংসপোড়ার গন্ধ চন্দ্রনাথের খুব পরিচিত লাগে। কতদিন সে এখানে চিতার পোড়া কাঠ দিয়ে দাঁত মেজেছে।

চন্দ্রনাথ এসে গঙ্গার ঘাটের কাছে দাঁড়ালো। নদীটি যেন তাকে চিনতে পেরেছে, নদী মুখ ফুটে কোনো সম্ভাষণ জানায় না, তবু বোঝা যায়। অন্ধকারের মধ্যে চন্দ্রনাথ নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে শেষ ধাপে খালি গা, ধুতি মাল-কোচা মেরে পরা একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

চন্দ্রনাথ আমূল চমকে উঠলো। এ যেন তারই প্রতিরূপ। গৃহত্যাগ করে একদিন ঠিক এই বয়সে, এই রকম অবস্থাতেই সে শ্মশানের প্রান্তে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল না? চন্দ্রনাথের বিভ্রম হলো, যেন মনে হলো সত্যিই সে নিজেই এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আবার দ্বিতীয়বার তার জীবন শুরু হচ্ছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি কে?

ছেলেটি মুখ ফেরালো। তার দু' চোখে শুকনো জলের রেখা। বোধ হয় সে তার পিতা বা মাতাকে দাহ করতে এসেছে। চন্দ্রনাথের বুকটা মুচড়ে উঠলো। সে প্রায় তার হাত রাখতে গেল ছেলেটির কাঁধে। যদিও পুরোনো অভিজ্ঞতায় চন্দ্রনাথ জানে, শ্মশানে কারুকে সান্ত্বনা জানাতে নেই। এখানে কান্নাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তা ছাড়া কী সান্ত্বনাই বা সে দেবে!

কাছাকাছি একজন অচেনা মানুষকে দেখে ছেলেটি নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। চন্দ্রনাথ নিচু হয়ে গংগা থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে মাথা থেকে টুপী খুলে সেখানে সেই জল ছোঁয়ালো। চন্দ্রনাথের এ পৃথিবীতে প্রিয় বস্তু কিছুই নেই, তবু একথা ঠিক, একদিন সে এই নদীকে ভালোবেসেছিল।

অন্ধকারে প্রবহমানা নদীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রনাথ। এক সময় তাকে ঘিরে ধরলো শ্মশানের নন্দী ভৃংগীরা। চন্দ্রনাথ সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। তারপরই সজোরে হেসে উঠলো হা-হা-হা করে। সত্যিই তো কিছু বদলায় না। এক সময় এরকম অন্ধকারে কোনো শাঁসালো-মালদার চেহারার লোককে একা দেখলে সেও তার দলবল নিয়ে তাকে ঘিরে ধরতো না? লোকটার সব কিছু কেড়েকুড়ে সর্বস্বান্ত করে ছাড়তো। এখন এই ছেলের দলও তাকে সেইরকম কোনো লোক ভেবেছে। হাতের ছড়িটা তুলে সে অনেকটা সস্নেহেই বললো, যাঃ! যাঃ! অন্য জায়গায় যা।

চন্দ্রনাথ এর পর চলে এলো বউবাজারে। এ পথেও রাত্রি যত বেশী হয়, তত লোকজন জাগে। ফেরিওয়ালারা ঘন ঘন বেলফুল হেঁকে যায়, সেই সংগে তপ্‌সে মাছ, গুলাবি রেউড়ি আর ধুপধুনো। দু'দিক থেকে আসা দুই ল্যাণ্ডো বা ফিটন গাড়ির ঘোড়া পাশাপাশি গ্রীবা বাঁকিয়ে ফ-র-র শব্দে কিছু বাক্য বিনিময় করে। এই সব কিছু ছাপিয়ে যায় মাতালের হল্লা।

যে বাড়িতে হীরা বুলবুল থাকতো যেখানে চন্দ্রনাথ জন্মেছে, সেই বাড়িটির রঙ পালটানো হয়েছে, আগে ছিল ফিকে নীল, এখন হলুদ। মেরামতির কাজও কিছু হয়েছে মনে হয়। সব ঘরে আলো, সব ঘরে ঘুঙুর-তবলার শব্দ এবং কলকণ্ঠ। হীরা বুলবুলের সব চিহ্ন হারিয়ে গেছে এখান থেকে, তবু জীবন তার নিজের নিয়মে চলেছে।

ছড়িতে ভর দিয়ে সেই বাড়ির অদূরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রনাথ। তার বক্ষে কোনো স্মৃতির উদ্বেলতা নেই, বরং ক্রমশ পুঞ্জীভূত হচ্ছে ক্রোধ। এই গৃহটিকে সে যেন সহ্য করতে পারছে না কিছুতেই। এটাকে যেন সে এখুনি ভেঙে ফেলতে চায়, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এই পাপ-পুরী।

কয়েকটি দালালশ্রেণীর লোক ঘোরাঘুরি করছে বাইরে। চন্দ্রনাথকে বাড়িটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে তারা তাকে কোনো লোভী ইদ্রুস্‌ পিদ্রুস জাতীয় ফিরিঙ্গি মনে করলো। একজন কাছে এসে বললো, কম্‌ কম সার, প্রেটি গার্ল, হিন্দু গার্ল, মুসলমান গার্ল, চীপ্‌ রেট সার—।

চন্দ্রনাথ কিছু বলবার আগেই হুড়মুড়িয়ে একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি এসে পড়লো প্রায় তার গায়ের ওপর, ঘোড়াটি শূন্যে সামনে দু' পা উচ্চে তুলে চি হিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠলো। ল্যাণ্ডো থেকে নামলো স্থূলকায় এক বাবু। বাঁ হাতের কব্জিতে গোড়ের মালা জড়ানো, চক্ষু দুটি জবাফুলের মতন লাল। গাড়ি থেকে নেমেই বাবুটি বেসামাল অবস্থায় ঘুরে গেলেন এক পাক, তাঁর ধুতিটি দুলতে লাগলো

ঘাগরার মতন। তিনি জড়িত কণ্ঠে বললেন, ওরে কে আচিস, ধন্‌না আমায়।

সামনে চন্দ্রনাথকে দেখে তিনি তার কাঁধটাই খামচে ধরলেন এক হাতে। চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তার মধ্যেই এক দালাল এসে তাঁকে ধরে ফেলেছে।

বাবুটি বক্রচোখে চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হুম্‌দো মন্দোটা ক্যা র‍্যা? রাস্তার মদ্যিখানে ধম্মের ষাঁড়ের মতন খাড়িয়ে আচে কেন?

দালাল বলল, চলুন, চলুন, আমি ধচ্চি!

বাবুটি বললেন, চ, আমায় নিয়ে চ, আজ বিম্‌লি খালি আচে তো? যিদিনকেই আসি সিদিনেই শালী ঐ যেদো মল্লিকের সঙ্গে...ঐ তো ওর ঘরে লীল লণ্ঠন জ্বলচে।

এই বাবুটিকে চন্দ্রনাথ কোনোদিন আগে দেখেনি, এর প্রতি তার বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই, তবু যেন দপ্‌ করে তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। লোকটি যে ঘরটির দিকে আঙুল তুলে দেখালো, ঐটাই ছিল তার জননী হীরা বুলবুলের শয়নকক্ষ।

হাতের ছড়িটা তুলে চন্দ্রনাথ বাবুটিকে সপাং সপাং করে প্রাণপণে পিটিয়ে যেতে লাগলো পাগলের মত।
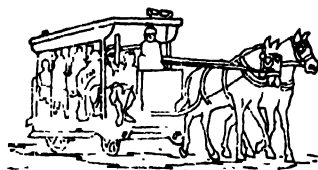
হরিশের মৃত্যু নবীনকুমারের বক্ষে একেবারে তীব্র শেলসম বাজলো। কয়েক দিন প্রায় হতচেতনের মতন পড়ে রইলো সে। অমন স্বাস্থ্যবান, অমন তেজস্বী, সব সময় উৎসাহে ভরপুর মানুষটি চলে গেল অকস্মাৎ! আর যে সময় হরিশকে দেশবাসীর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, সেই সময়টা সে অপসৃত হলো! বিশ্বনিয়ন্তার একি অবিচার! আর কী-ই বা বয়েস হয়েছিল হরিশের, মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর!

এক সময় শোক সামলে উঠতেই হলো নবীনকুমারকে। হরিশ বহু কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন, এখনই সেগুলি জোড়া লাগাবার চেষ্টা না করলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত হিন্দু পেট্রিয়টের মতন পত্রিকা বন্ধ হতে দেওয়া চলে না কিছুতেই।

হরিশ অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর, আবার তাঁর খরচের হাতও ছিল অতি দরাজ, নীল চাষীদের জন্য তিনি অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল হরিশ ভবানীপুরে একটি ছোট বসত বাড়ি আর হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁর বিধবা পত্নী ও মাতার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী করে তারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

হরিশের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর নবীনকুমার একদিন ধীর পদে হিন্দু পেট্রিয়ট দফতরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। এখানে হরিশ নেই, তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর, দরাজ হাস্য আর শোনা যাবে না, এ যেন কল্পনাই করা যায় না। নবীনকুমারের শরীর অবশ হয়ে আসে। তার মনে হয়, পৃথিবীতে তার আর একজনও বন্ধু নেই।

পত্রিকা দফতরে একটি যুবক একলা চুপ করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। এই যুবকটির নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই যুবকটি কিছুদিন হরিশের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনায় সহকারিত্ব করেছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই অনেক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শম্ভুচন্দ্র, এক সময় সে নিজেও স্বতন্ত্রভাবে একটি কাগজ বার করতে চেয়েছিল, কিন্তু অর্থের সঙ্গতি নেই। যুবকটি ইংরেজী লেখে চমৎকার, যুক্তিজ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ এবং হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি আছে। এই দফতরেই শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে নবীনকুমারের ভালো লেগে যায়, এক কথায় নবীনকুমার তার পরিকল্পিত পত্রিকার জন্য কিনে দেয় একটি মুদ্রণ যন্ত্র। শম্ভুচন্দ্র তখন 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিন' নামে পত্রিকা বার করলো, কিন্তু চললো না বেশীদিন।

শম্ভুচন্দ্র নবীনকুমারের চেয়ে সামান্য বয়েসে বড় হলেও নবীনকুমারকে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, একটিও কথা বললো না। পুরুষ মানুষ অন্য পুরুষ মানুষের সামনে আর কী ভাষায় শোক প্রকাশ করবে! নীরবতাই এখানে বাঙ্ময়।

হরিশ নেই বলেই ঘরখানি যেন নিদারুণ শূন্য মনে হচ্ছে। নবীনকুমার চতুর্দিকে চক্ষু বোলাতে লাগলো। সর্বত্রই হরিশের চিহ্ন। দেওয়ালের একটি হুকে ঝুলছে এক গাদা পৈতে। ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ মুখুজ্যে ব্রাহ্ম হবার পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে, লোকজন ডেকে উপবীত পরিত্যাগ করেননি বটে, তবে ঐ সুতোগাছিগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মানবোধও ছিল না। প্রায়ই গা থেকে পৈতে খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন দেয়ালে, কখনো কখনো গ্যালি প্রুফের আপতন বোঝার জন্য ঐ পৈতে দিয়েই মেপে নিতেন, আবার বাড়ি ফেরার সময় পরে নিতেন গলায়। শেষদিন আর পরা হয়নি।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে?

শম্ভুচন্দ বললো, আর তো উপায়ান্তর দেখি না! এ ছাপাখানাও রক্ষা করা যাবে না বুঝি। নীলকর সাহেবরা ওঁর নামে মানহানির মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে, ওঁর মৃত্যু হলেও প্রতিশোধ নেবার জন্য সাহেবরা এই ছাপাখানা ক্রোক করে নিতে পারে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তা পারে?

শম্ভুচন্দ্র বললো, সাহেবদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এই ছাপাখানাটিও গেলে হরিশের পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হবে!

নবীনকুমার কয়েক মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করলো। তারপর প্রশ্ন করলো, আর কেউ যদি তার আগেই এই ছাপাখানা এবং পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেয়!

—তা হলে বাঁচানো যেতে পারে অবশ্য!

—এই ছাপাখানার মোট দাম কত হবে বলে আপনার মনে হয়?

—যন্ত্রটি পুরোনো হয়ে গ্যাচে, টাইপগুলিও বহু ব্যবহৃত, তা তবুও হাজার বারোশো টাকা দাম উঠবে নিশ্চয়!

—আপনি হরিশের মা ও স্ত্রীকে গিয়ে বলুন, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এই সমুদয় কিনে নিতে চাই।

—কত টাকা বললেন?

—পাঁচ হাজার টাকা। আশা করি সেই টাকার সুদে দুই বিধবার সারা জীবনের খরচ চলে যাবে।

শম্ভুচন্দ্র খানিকক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর অস্ফুট স্বরে

বললো, আপনি হাজার টাকার জিনিস পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন? এমন অদ্ভুত দরাদরির কতা কখনো শুনিনি। কলকাতা শহরে বড় মানুষ অনেকেই আচে, কিন্তু আপনার মতন সৎ কাজে ব্যয় করতে জানে ক'জন? আপনি...

নবীনকুমার হাত তুলে এই সব অবান্তর কথা বন্ধ করিয়ে দিয়ে বললো, আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি কালকের মধ্যেই টাকা দিয়ে সইপত্তর করে সব পাকা করে নিতে চাই। আমি নামে মালিক হলেও এ পত্রিকা চালাতে হবে আপনাকেই।

—আমি চালাবো?

—হ্যাঁ। আপনি একা না পারেন, গিরিশ ঘোষকে ডেকে নিন্, কাগজের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আচে—আপনারা সম্পাদনার ভার নেবেন, খরচপত্তরের দায়িত্ব সব আমার। এ পত্রিকা কিছুতেই বন্ধ হতে দেওয়া হবে না!

যে কথা সেই কাজ। নবীনকুমারের অধ্যবসায়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা আবার চালু হয়ে গেল। সেখানেই নিবৃত্ত হলো না নবীনকুমার। হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য সে উঠে-পড়ে লাগলো। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হরিশকে যদি দেশবাসী ভুলে যায় তবে তার চেয়ে কৃতঘ্নতা আর কিছুই নেই।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নবীনকুমার গঠন করলো হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে যার যথাসাধ্য দান করার জন্য আবেদন জানিয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে বিতরণ করলো সে। এই স্মৃতিভাণ্ডারে প্রথমে সে নিজেই দিল পাঁচ শত টাকা। কিন্তু দেখা গেল দরিদ্র সাধারণ মানুষ অনেকেই এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা পাঠালেও বিশিষ্ট ধনী যাঁরা পাঁচ শত, হাজার টাকা দানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউ আসলে কিছুই দিলেন না। নবীনকুমার তখন মেমোরিয়াল কমিটির কাছে এক প্রস্তাব দিল, হরিশের নামে এক স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা হোক, যেখানে থাকবে একটি গ্রন্থাগার, উৎসাহী ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ এবং একটি পাবলিক হল, যেখানে দেশীয় লোকেরা সভাসমিতি করতে পারবে। এ শহরে স্থানীয় লোকদের ব্যবহার উপযোগী একটিও হল নেই। এবং এই স্মৃতি মন্দিরের জন্য নবীনকুমার এখুনি বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দান করতে প্রস্তুত আছে।

তবু কমিটির সভ্যদের বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সকলেই যে-যার স্বার্থ সামলাতে ব্যস্ত। চাঁদা যা উঠেছে তা অন্য কাজে লাগাবার জন্য এক একজন এক একরকম পরামর্শ দেয়। কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের খুব আগ্রহ ও লোভ হরিশের পত্রিকাটি হস্তগত করার।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবীনকুমার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে-গেল এই সব ব্যাপার থেকে। হরিশের মতন স্বার্থত্যাগী মানুষকেও যদি মৃত্যুর পরেই লোকে এমন অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে এ দেশে আর সত্যিকারের আদর্শবান পুরুষ জন্মাবে কী করে? জীবিতাবস্থায় হরিশকে নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে, যারা তার স্তুতি গেয়েছে, এখন তারাই বক্রভাবে বলে, হ্যাঁ, হরিশ অনেক বড় বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নিজেই অমিতাচার করে অকালে প্রাণটা খোয়ালেন।

মেমোরিয়াল কমিটির সভা থেকে একদিন রাগতভাবে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে নবীনকুমার মনে মনে বলতে লাগলো, বন্ধু, পরকাল বলে কিচু আচে কিনা আমি জানি না, তুমি কোনো জায়গা থেকে আমার কতা শুনতে পাবে কি না তাও জানি না, তবু আমি বলচি, আর যে-ই তোমায় ভুলে যাক, আমি যতকাল বেঁচে

থাকবো, আমি তোমায় কখনো একদিনের জন্যও বিস্মৃত হবো না! বন্ধু, এমনভাবে আমায় একা ফেলে চলে গ্যালে!

নিজ গৃহে সারা দিনের মধ্যে বোধ হয় একদণ্ডও কাটায় না নবীনকুমার। শোক ভুলবার জন্য সে নিজেকে যেন শত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। শুধু কাজ আর কাজ! সান্ধ্য বিনোদনের জন্যও সে যায় না কোথাও। হরিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুলুকচাঁদের আখড়া বন্ধ হয়ে গেছে, নবীনকুমারও আর মদ্য পান করে না। সর্বক্ষণ সে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।

একেবারে মুখের ভাষায় সে যে ছোট ছোট নকশাগুলি লিখছিল, সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে সে বই আকারে ছাপিয়ে বার করে দিল নিজের নাম গোপন করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজ একেবারে তাজ্জব। এ কার রচনা? এমন নির্মম সত্য, রঙ্গব্যঙ্গময় সমাজচিত্র কার হাত দিয়ে বেরুলো? টেকচাঁদ ঠাকুরের চেয়েও এ লেখার ভাষায় জোর অনেক বেশী। মহাভারত অনুবাদের সুগম্ভীর ভাষা যার হাত দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে যে এমন তীক্ষ্ম, তীব্র, চটুল চলতি বাংলা লেখা সম্ভব, তা কারুর সুদূরতম কল্পনাতেও এলো না। একই সঙ্গে নবীনকুমার হাত দিল আবার নতুন নাটক রচনায়, আর মহাভারতের কাজ তো চলছেই। 'নীলদর্পণ' নাটকখানি প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর আর কেউ ভয়ে প্রকাশের ভার নিতে চাইছে না, নবীনকুমার নিজ ব্যয়ে নিজের মুদ্রণশালা থেকে সেই বই ছাপিয়ে বার করে দিল।

সরোজিনী প্রতি রাত্রে সাজগোজ করে স্বামীর ঘরে আসে, তার স্বামী তার দিকে মনোযোগ দেবারও সময় পায় না। রুপোর জাল দিয়ে ঘেরা একটি বিদেশী লণ্ঠন কিনেছে নবীনকুমার, যা বাতাসের ঝাপটায় নিবে যায় না। সেই লণ্ঠন জেবলে সে অধিক রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করে যায়।

সরোজিনী কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে কুণ্ঠিতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক সময় স্বামীর কাছে এসে আড়ষ্টভাবে বলে, অনেক রাত হলো যে, আপনি এবার শুতে আসবেন না?

নবীনকুমার মুখ না ফিরিয়েই বলে, আমার দেরি হবে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো গে!

সরোজিনী তবু জিজ্ঞেস করে, আপনার কত দেরি হবে?

নবীনকুমার পাঠে নিমগ্ন থেকে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার ঠিক নেই।

এক প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করলে নবীনকুমার হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় বলে সরোজিনী আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। তার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরা, বাহুতে ফুলের সাজ আর সারা শরীরে চন্দন সৌরভ ব্যর্থ হয়। নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুদিন হলো তার পতি দেবতাটির কেন এমন পরিবর্তন হলো, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আগেও তো উনি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাত্রে শয়ন কক্ষে সরোজিনীকে কাছে ডেকে নরম সোহাগ বাক্য বলতেন প্রতিদিন। নিত্য নতুন কত না কৌতুক উদ্ভাবন করতেন উনি। কত না খুনসুটি। সেই মানুষটি এই ক' মাসে এমন বদলে গেলেন!

সরোজিনী এই নিয়ে তার মা ও দিদিদের কাছে কান্নাকাটি করেছে। সকলেই শুনে বিস্মিত হয়। বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না, বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পোষে নি, নিজ গৃহে থেকেও পত্নীর দিকে নজর দেয় না ; এ আবার কেমন ধারা কাণ্ড! এমন তো হয় না। হরিশ মুখুজ্যে ওর বন্ধু ছিল, তাঁর মৃত্যুতে নবীনকুমার মনে

আঘাত পেয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সেও তো হয়ে গেল কয়েক মাস। ব্যাটাছেলে বন্ধু মারা গেলে কোনো পুরুষমানুষ এমন মনমরা হয়ে থাকে? তা ছাড়া, এরকম সময়ে তো সবাই ঘরের মানুষকেই বেশী করে আঁকড়ে ধরে।

সবাই সরোজিনীকে দোষ দেয়। সে-ই নিশ্চয়ই তার স্বামীকে বশ করতে পারছে না। যে সধবা মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর সঙ্গে এক শয়নকক্ষে থেকেও স্বামীকে কাছে পায় না, সে মেয়েমানুষের মরণও ভালো। দিদিরা পরামর্শ দেয়, ওরে সরো, একদম হাত-আলগা দিস্‌নি, সাপ্‌টে ধর, দরকার হয় পায়ে পড়বি, একবার মন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেঁদেও কূল পাবি না!

সরোজিনী সত্যিই এক মধ্য রাত্রে দৌড়ে এসে নবীনকুমারের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নবীনকুমার চমকে উঠে বলে, এ কি, এ কি!

সরোজিনী সর্বাঙ্গে বহু অলংকার পরে, ঝলমলে বেনারসী শাড়িতে নববধূর সাজে সেজেছে। কিন্তু তার চোখে জল। নবীনকুমারের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে সে বললো, আজ আপনাকে বলতেই হবে, আমি কী দোষ করিচি! কেন আমায় দেকলেই আপনি হাত নেড়ে বলেন, চলে যাও, চলে যাও! আমি কি বিষ পিম্‌ড়ে, আমায় আপনার সহ্য হয় না? বলুন তবে, আমি আগুনে ঝাঁপ খেয়ে মর্বো!

নবীনকুমার টেবিলের ওপর মস্ত বড় একটা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে কী সব হিসেব করছিল। হাতের পেন্সিলটি সরিয়ে রেখে সে সরোজিনীর মুখখানি ধরে ওপরে তুললো। তারপর বিরক্তিচাপা ঈষৎ অস্থির কণ্ঠে বললো, আঃ, সরোজ, কেন ছেলেমানুষী করো। দেকচো না আমি ব্যস্ত রইচি। কাজের সময় এ রকম বিরক্ত করো না।

সরোজিনী চোখের জল মুছে ফেলে হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক, কাজের সময় বিরক্ত করতে নেই। আর আপনাকে বিরক্ত কর্বো না। তবে আমার মা জিজ্ঞেস করতে বলেচেন, রাত জেগে আপনি কী এত কাজ করেন, তা দিনের বেলা সারা যায় না? এ রকম রাত জাগলে যে আপনার শরীর নষ্ট হবে। যারা পেটের ভাত জোটাবার জন্য কাজ করে তারাও তো এমন দিন-রাত্তির খাটে না। ভগমানের কৃপায় আমাদের অভাব নেই—

নবীনকুমার শুকনো হেসে বললো, পেটের ভাত জোটাবার জন্য বেশী খাটতে হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভাত জোটাতে গেলে সময়ের হিসেব কল্লে চলে না। আমি এখন যে কাজে হাত দিইচি, সেটা তোমায় বোঝালেও বুঝবে না।

সরোজিনী বললো, তবু বলুন একটু, মা জানতে চেয়েচেন।

—আমি বাংলা দৈনিক কাগচ বার কচ্চি।

—কী?

—ঐ যে বললুম, তুমি বুঝবে না। সাহেবরা ইংরেজীতে ডেলি ন্যুজ পেপার বার করে, কখনো দেকোচো? লোকে সকালে জলখাবার খেতে বসার আগেই ফেরি-ওয়ালারা বাড়ি বাড়ি সেই কাগজ দিয়ে যায়। আমি এবার সেই রকম বার কচ্চি, বাংলা ডেলি ন্যুজ পেপার। তার নাম 'পরিদর্শক'।

এবারেও কিছু হৃদয়ঙ্গম হলো কিনা বোঝা গেল না, সরোজিনী তার স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

বস্তুত নবীনকুমারের এই নতুনতম উদ্যমটি দেখে তার পরিচিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে নবীনকুমারের আগ্রহ সেই কৈশোর

থেকেই। কোনো পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যাক, সে সহ্য করতে পারে না। আর্থিক অনটনে কোনো পত্রিকা উঠে যাবার উপক্রম হলেই, নবীনকুমার সেটি কিনে নিয়ে আবার চালু করে দেয়। এমনকি একবার 'দূরবীন' নামে একটি উর্দু পত্রিকার সঙ্কটদশার কথা শুনে নবীনকুমার তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকাটি ক্রয় করে তার এক মুসলমান বন্ধুকে সেটি আবার দিয়ে দেয় চালাবার জন্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও সে একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনে উপহার দিয়েছে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। দুই ব্রাহ্মণ মিলে পরিদর্শক নামে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কয়েক মাস পরেই তাদের সামর্থ্যে ও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। নবীনকুমার অমনি সেই পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়েছে, এবং এটা সে নিজেই চালাতে চায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে। বাংলায় আবার দৈনিক পত্রিকা, তাও একুশ বৎসর বয়েসের যুবক তার সম্পাদক! এ যে ঈশ্বর গুপ্ত মশাইকেও টেক্কা দেবার চেষ্টা!

পত্রিকাটির প্রকাশ কবে থেকে শুরু হবে তার ঠিক নেই এখনো, তবে কয়েকদিন ধরেই প্রবলভাবে সেই পত্রিকা সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ চলছে। সকলেরই ধারণা, নবীনকুমারের যখন একবার ঝোঁক চেপেছে, তখন ও পত্রিকা সে বার না করে ছাড়বে না। একদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন বিশাল কাজ, অন্যদিকে দৈনিক পত্রের প্রকাশ!

নবীনকুমার সরোজিনীকে দৈনিক পত্রের ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছিল, মধ্য পথে হঠাৎ সরোজিনী বললো, আমি একটা কতা জিগ্যেস করবো?

—বলো!

—আপনি কুসোমদিদির বে'র জন্য কত কথা বলেচিলেন, কত আপনার উৎসাহ, সেই কুসোমদিদি আমাদের এ বাড়িতে বউঠান হয়ে এলো, আর আপনি তার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না কেন?

প্রসঙ্গটির আকস্মিকতায় নবীনকুমার থমকে গেল। চক্ষু তারকা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। নিশ্বাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর সে বললো, তোমার কুসুমদিদির বিয়ে হবার দরকার ছেল, বিয়ে হয়েচে...ভালো হয়েচে...আমরা সবাই খুশী হয়িচি...

—আপনি কুসোমদিদি-বউঠানের সঙ্গে একদিনও কতা বললেন না...এ বাড়িতে এলো...

—আমি কাজে ব্যস্ত, আমার কারুর সঙ্গেই কতা বলার সময় নেই। তোমার সঙ্গেও তো কতা কইতে পারি না।

—কুসোমদিদি-বউঠান সুধোচ্ছিলেন, উনি আপনাকে কী বলে ডাকবেন, ঠাকুরপো না আগের মতন মিতেনীর বর?

—ওনার যা খুশী তাই ডাকবেন...আমি কী জানি!

—আপনি তা'লে আজও এখন শুতে যাবেন না? আমি যাই?

—যাও!

সরোজিনী চলে যাবার পর নবীনকুমার খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগলো তার শরীর, ঠিক অত্যধিক জ্বরতপ্ত রোগীর মতন। চেয়ার থেকে নেমে সে ভূঁয়ের ওপর শুয়ে পড়লো টানটান হয়ে। তার শরীরের একেবারে অতল থেকে কাতর শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আঃ! আঃ!

বিম্ববতীর কক্ষ এবং সেদিকের মহলটি এখন নিয়েছে গঙ্গানারায়ণ। টানা অলিন্দে এখনো সার সার টাঙানো রয়েছে পাখির খাঁচাগুলি, অযত্নে অবহেলায় বেশ কিছু পাখি ইতিমধ্যেই মরেছে, জীবিত আছে আঠারো-কুড়িটি। এতদিন পর কুসুমকুমারী আবার সেই পাখিগুলির ভার নিল। সে তাদের খাদ্য ও জল দেয়, প্রত্যেকটি পাখির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সুমিষ্ট স্বরে কথা বলে তাদের সঙ্গে।

প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না। বিম্ববতী চলে যাবার পর কুসুমকুমারী এসে যেন তা আবার ভরে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম কুসুমকুমারী লজ্জায় ঘরের বার হতেই চাইতো না। সরোজিনী ছাড়া আর কোনো নারী কথা বলতেও আসেনি তার সঙ্গে। সে ভেবেছিল, এ বাড়ির অন্যান্য মহিলারা এ বিবাহ সুচক্ষে দেখেন নি। কুসুমকুমারী বুদ্ধিমতী, সে জানতো এমনটি হবেই। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে পাত্র পক্ষের বাড়িতেই প্রতিরোধ বেশী হয়।

কুসুমকুমারী অবশ্য একথা জনতো না যে জোড়াসাঁকোর সিংহদের মতন এত খ্যাতিমান ও ধনী পরিবারে জনসংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। নিকট আত্মীয়ও প্রায় কেউ নেই-ই বললে চলে। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু হয়েছে, বিম্ববতী তীর্থবাসিনী হয়েছেন, সুতরাং এঁদের অবলম্বন করে যেসব দুঃস্থা দূর সম্পর্কিত আত্মীয়ারা থাকতেন, তাঁরাও ঝরে গেছেন এক এক করে। তিন তলায় হেমাঙ্গিনীর মহলে চার-পাঁচ জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এখনো রয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা সচরাচর নিচে নামেন না। বিধবা বিবাহকে তাঁরা ব্যভিচারের নামান্তর বলেই মনে করেন, সুতরাং নববধূকে তাঁরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি।

এ সংসারের হাল ধরবার কেউ নেই। সরোজিনী নিতান্তই বালিকা, এবং তার বয়সী অন্যান্য বধূদের তুলনায় তার সাংসারিক বোধ আরও কম। তা ছাড়া সে প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকে। বিম্ববতী নেই বলেই তার যাতায়াত আরও অবাধ হয়েছে। তা ছাড়া পিত্রালয়ে থাকাই তার পক্ষে এখন সুবিধাজনক, বরাহনগর থেকে মহাভারত অনুবাদের কাজ সেরে নবীনকুমার অধিক রাত্রে প্রায়ই জোড়াসাঁকো ফিরতে পারে না, সে বাগবাজারেই থেকে যায়।

এ সংসারে কোনো গৃহিণী নেই বলেই ভৃত্যতন্ত্রই সব কিছু চালায়। পুরোনো আমলের গোমস্তা দিবাকর এখনো রয়ে গেছে, দৈনিক বাজার হাট থেকে শুরু করে, গৃহ মেরামত এমনকি দোল-দুর্গোৎসবের ব্যবস্থাও তার হাতে। বিধুশেখরের তীক্ষ্ন নজর এবং খবরদারিও নেই, সেই জন্য দিবাকরের এখন রীতিমতন পোয়া বারো।

সরোজিনী থাকলে তার সঙ্গে গল্প করে কুসুমকুমারীর সময় কাটে। তা ছাড়া তরু আর নীরু নাম্নী দুটি দাসীকে সে নিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। কুসুমকুমারীর ভাই ও দাদারাও প্রায়ই তার খবর নিতে আসে। এই বিবাহে কুসুম-

কুমারীর পিত্রালয়ের সকলেই খুব সন্তুষ্ট। গঙ্গানারায়ণের মতন পাত্র পাওয়া তো অতি ভাগ্যের কথা বটেই, তা ছাড়াও সিংহ পরিবারে কুসুমকুমারীর প্রতি অনাদর বা অযত্ন হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, আজ হোক, কাল হোক, সেই তো এই সংসারের কর্ত্রী হবে।

দুর্গামণির কথা প্রায়ই মনে পড়ে কুসুমকুমারীর। এই বিবাহের কথা দুর্গামণির কানে গেছে নিশ্চয়ই। এ সংবাদ শুনে বোধহয় তার মতন আর কেউ খুশী হয়নি। কুসুমকুমারী আশা করেছিল, দুর্গামণির কাছ থেকে একটি পত্র পাবে। না পেয়ে তার একটু উদ্বেগ হয়, দুর্গামণির কোনো বিপদ ঘটেনি তো? কুসুমকুমারী নিজেই একটা পত্র লেখার কথা ভাবে, লিখতে গিয়েও নিরস্ত হয়, ঐ বাড়ির সঙ্গে কোনো রূপ যোগাযোগ রাখা সমীচীন কিনা সে বুঝতে পারে না। বস্তুত, কুসুমকুমারী তার পূর্ব স্বামীর পরিবারের সকলের কথাই মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চায়, একমাত্র দুর্গামণিকে ছাড়া। ওখানকার দুঃসহ দিনগুলিতে দুর্গামণিই ছিল তার একমাত্র ভরসা।

দুর্গামণিকে পত্র লেখা উচিত কিনা এ-সম্পর্কে সে গঙ্গানারায়ণকে জিজ্ঞাসা করার কথা ভেবেছে। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে নি। কুসুমকুমারীর পূর্ব-জীবনের কথা একবারও উত্থাপন করে নি গঙ্গানারায়ণ। তা হলে কি সে প্রসঙ্গ কুসুমকুমারীর নিজে থেকে তোলা উচিত? কুসুমকুমারী কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারে না। এ-ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। অথচ দুর্গামণির জন্য তার মন কেমন করে। সে দুর্গামণির কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছে না বলে নিজেকে তার অকৃতজ্ঞ মনে হয়।

গঙ্গানারায়ণ সারাদিন ব্যস্ত থাকে। কলকাতার তাদের বিভিন্ন হৌসের পরিচালকগণ ও খাতকেরা আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে নবীনকুমারের দেখা না পেয়ে তার কাছেই আসে। বিধুশেখরও যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছেন। বাধ্য হয়েই গঙ্গানারায়ণকে দায়িত্ব নিতে হয়। ছোটকুর সঙ্গে দু-চার কথা বলতে গিয়েও সুবিধে হয়নি। নবীনকুমার সব দায় তার জ্যেষ্ঠের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চায়। তহবিল থেকে সে তার প্রয়োজনীয় অর্থ পেলেই হলো, কী ভাবে অর্থাগম হবে, সে সম্পর্কে তার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। ক্রমশ বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে গঙ্গানারায়ণ জড়িয়ে পড়ছে, যদিও তার মন এর মধ্যে নেই, ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি সে কোনোরূপ মোহ বোধ করে না।

মামলায় জয় হবার পর গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল সে আবার ইব্রাহিমপুরে ফিরে যাবে, সেখানকার চাষীদের সাহায্য করবে। সে খবর পেয়েছে যে সেখানে এক সদাশয় ন্যায়নিষ্ঠ নতুন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ায় সেখানকার নীলকর সাহেবরা ইদানীং একটু ঠাণ্ডা হয়ে আছে। চাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এইটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু গঙ্গানারায়ণের যাওয়া হলো না, তার বিবাহ এবং হরিশ মুখুজ্যের মৃত্যুর মতন দুটি ঘটনায় সব বদল হয়ে গেল। হরিশের মৃত্যুতে গঙ্গানারায়ণও খুব ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তা সে সামলে উঠতে পারলো শুধু কুসুমকুমারীর জন্য। এতখানি জীবনে এই প্রথম গঙ্গানারায়ণ একজনকে পেয়েছে, যার কাছে মন উজাড় করে দেওয়া যায়। যার সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেওয়া যায়। সারাদিন গঙ্গানারায়ণ উৎসুক হয়ে থাকে, কখন রাত্রিকালে কুসুমকুমারীর সঙ্গে তার দেখা হবে।

এখন গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। যদিও তার বিবাহের পর তিনমাস কেটে গেছে, তবু এখনো গঙ্গানারায়ণের আদ্যরস হয়নি।

উকিল, মোক্তার ও খাজাঞ্চীদের সঙ্গে কথা সারতে সারতে এক একদিন অনেক রাত হয়ে যায়। ওপরে উঠে এসে শয়নকক্ষের দ্বার ঠেলে গঙ্গানারায়ণ দেখতে পায়, মেঝের ওপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে কুসুমকুমারী সেঝবাতির আলোয় কোনো বই পড়ছে। বইখানির আকার দেখেই সে বুঝেছে, সেটি কোন্ বই। গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। এই তন্ময় পাঠিকাকে সে বিঘ্নিত করতে চায় না। তবু নারীগণের সহজাত প্রবৃত্তিতেই কুসুমকুমারী অল্প সময়ের মধ্যেই অপরের উপস্থিতি টের পায়, সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

গঙ্গানারায়ণ নিয়ম করেছে যে রাত্রির আহার সে নিজের শয়নকক্ষেই সেরে নেবে। রাত্রে সে ভাত বা আমিষ কিছুই খায় না. চিড়ে-মুড়ি-ফল-দুধ দিয়ে হালকা ভোজন সেরে নেয়। হিমালয়ের ক্রোড়ে কিছুদিন অবস্থান করার পর থেকেই আমিষ আহারে তার রুচি চলে গেছে। নেহাত কেউ পেড়াপেড়ি করলেই সে দু এক টুকরো মাছ বা মাংস মুখে তোলে। যেমন কুর্তা পাতলুন সে পরতেই চায় না।

গঙ্গানারায়ণকে দেখে কুসুমকুমারী বই মুড়ে রেখে উঠে আসে। দাসীদের ডাকে না, সে নিজেই গঙ্গানারায়ণের খাবার পরিবেশন করে। মেঝেতে গালিচার আসন পেতে সামনে একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে সেখানে রুপোর থালাটি রাখে। জল ভরে আনে রুপোর গেলাসে। থালায় সাজানো বিশেষ কোনো প্রকার সন্দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, এগুলো মা নিজে তৈরি করে পাটিয়েচেন। আপনাকে আর দুটো দিই?

গঙ্গানারায়ণ হাসে। কুসুমকুমারীর মা প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু খাদ্য-ব্যঞ্জন নিজের হাতে তৈরি করে এখানে পাঠান। গঙ্গানারায়ণ ভাবে, দেখা যাক, এরকম কদিন চলে।

গঙ্গানারায়ণের আহার শেষ হলে তারপর কুসুমকুমারী খেতে যাবে। প্রথম প্রথম গঙ্গানারায়ণ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, তার ফিরতে দেরি হলে আগে খেয়ে নিতে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কোনো এয়োস্ত্রীকেই নাকি স্বামীর আগে অন্নগ্রহণ করতে নেই। গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, হালফিল তো অনেক নিয়ম পালটাচ্ছে, এটা পালটাতে পারে না? কুসুমকুমারী তার উত্তর দিয়েছিল, যে-সব নিয়ম ভালো, সেগুলো তো পালটাবার দরকার নেই!

কুসুমকুমারীর এই ধরনের কথা শুনেই গঙ্গানারায়ণ বেশী মুগ্ধ হয়। যে-কোনো বিষয়েই কুসুমকুমারীর পরিষ্কার স্পষ্ট মতামত আছে। সে মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে জানে। গঙ্গানারায়ণের মনে পড়ে লীলাবতীর কথা। শুধু লীলাবতী কেন, অধিকাংশ রমণীই তো নিছক ঘরোয়া কথা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কিছু বলতেই জানে না। প্রথা-বিরুদ্ধ কোনো প্রসঙ্গ ওঠালেই. ওমা, সে কি! দিয়ে কাজ সারে।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ প্রক্ষালন করে এসে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীর বইটি খুলে বসলো। কুসুমকুমারী আহার সেরে ফিরে এলে সে বললো, তুমি তো অনেকখানি পড়ে ফেলেচো! কেমন লাগচে?

কুসুমকুমারী উৎফুল্ল মুখে বললো. ভারি ভালো, একবার ধল্লে আর ছাড়তে

ইচ্ছে করে না!

—তুমি সব বুঝতে পারো? তোমার কোনোখানে খটোমটো লাগে না?

—একটুও না! মাঝে মধ্যে একটা দুটো কতার মানে জানি না বটে তবু সব বুঝতে পারি। আমি আগে কাশীদাসী পাড়িচিলুম, কিন্তু তার সঙ্গে কত তফাৎ!

—সত্যি, আমাদের ছোট্‌কু এই একটা মস্ত বড় কাজ কচ্চে! কতই বা বয়েস ওর। আমার চেয়ে অন্তত তের-চোদ্দ বছরের ছোট, এই বয়েসেই গোটা মহাভারত অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া...কেমন সুন্দর ভাষা...আমাদের এই বংশে ছোট্‌কু একটা প্রতিভা। ওর সঙ্গে তোমার ভালো করে আলাপ-পরিচয় হয়েছে?

নীল চক্ষু দুটি স্থিরভাবে মেলে, ওষ্ঠাধরে সামান্য হাসি মেখে, আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে কুসুমকুমারী বলে, না। তবে আগে দেকিচি, আমার মিতেনীর বর হিসেবে—

গঙ্গানারায়ণ বললো, ও খুব ব্যস্ত, তবে আলাপ-পরিচয় তো হবেই, তখন দেকো, ও কেমন পাগল! সব সময় বড় কোনো কাজের চিন্তা মাতার মধ্যে টগ্‌বগ করে ফোটে!

মহাভারতের মোট তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত। তা কয়েকদিনের মধ্যেই কুসুমকুমারীর পড়া হয়ে যায়। আরও পড়বার জন্য সে ছটফট করে। এ বাড়িতে এসে অফুরন্ত অবসরের মধ্যে তার বই পড়ার নেশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অত বাংলা বই সে পাবেই বা কোথায়!

এক রাতে গঙ্গানারায়ণ ফিরলে কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করে, আপনাকে একটা কতা বলবো? আপনি রাগ করবেন না?

গঙ্গানারায়ণ অবাক হয়ে বলে, কী কতা? তোমার ওপর রাগ করবো কেন, কুসুম? তোমার ওপর রাগ কত্তে পারে এমন পাষণ্ড কেউ আচে?

আপনি সারাদিন খেটেখুটে আসেন, তাই বলতে সাহস পাই না। এক একদিন একটু তাড়াতাড়ি এসে আমায় একটু পড়াবেন? আমি তো সংস্কৃত পড়তে পারি না, যদি আমায় পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেন।

গঙ্গানারায়ণের শরীরে অকস্মাৎ রোমাঞ্চ হয়। স্বপ্নে দেখা বিন্দুবাসিনীর কথা মনে পড়ে। বিন্দুবাসিনী অভিমান করে বলেছিল, তুই আমায় মেঘদূত পড়াবি বলিচিলি, পড়ালি না তো, গঙ্গা! এ যেন অবিকল সেই কণ্ঠস্বর!

গঙ্গানারায়ণ একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর আপন মনে বলতে শুরু করে: কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা/স্বাধিকারপ্রমত্তঃ/শাপেনস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ ...তারপর ষষ্ঠ শ্লোকের শেষে যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা... এই পর্যন্ত বলে সে থামে। শ্লোক বলতে বলতে গঙ্গানারায়ণ যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে আবার ফিরে আসে। তারপর বললো, আমার অনেক কাল থেকেই ইচ্ছে, কারুকে মেঘদূত পড়ে শোনাই...তুমি আজ বললে, এসো, কুসুম, আমার পাশে এসে বসো, তোমায় আমি মেঘদূত পড়াবো।

কুসুমকুমারী বললো, মেঘদূত কী? এ বইয়ের নাম তো শুনিনি কখনো। আমার খুব ইচ্ছে করে শকুন্তলা বইটা পড়বার—।

গঙ্গানারায়ণ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, শকুন্তলা? হঠাৎ শকুন্তলা পড়বার জন্য ইচ্ছে হলো কেন? মেঘদূত পছন্দ নয়?

কুসুমকুমারী হেসে বললো, আমি কি ছাই কোনোটাই জানি! ছেলেবেলায় আমার দাদাদের পোন মশাইয়ের মুকে শকুন্তলার গপ্পোটা শুনিচিলুম, তাও

পুরোটা নয়...সেই গপ্পোটা জানতে ইচ্ছে করে। মেঘদূতের তো আমি নামই জানি না!

একটু থেমে থেকে গঙ্গানারায়ণ বললো, তবু প্রথমে মেঘদূতটাই শোনো। শকুন্তলার কতা পরে একদিন বলা যাবে।

মেঘদূত গঙ্গানারায়ণের আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। তার বই লাগে না। ফুঁ দিয়ে সে সেজবাতিটা নিবিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। কুসুমকুমারীর হাত ধরে সে নিয়ে আসে গবাক্ষের ধারে। শরৎকাল, এ সময় আকাশে কাশফুল বর্ণের লঘু মেঘ ভেসে বেড়ায়। সেই রকম একখণ্ড মেঘ দেখিয়ে গঙ্গানারায়ণ বললো, ঐ দ্যাকো মেঘদূত যাচ্ছে...তুমি মহাভারতে নল দময়ন্তীর গল্প পড়েছো? একটি হংস হয়েছিল ওদের দূত...তেমনি রামগিরি পাহাড়ে এক নির্বাসিত যক্ষ সুদূর অলকায় তার প্রিয়াকে একটি বার্তা পাঠাবার জন্য একখণ্ড মেঘকে দূত হিসেবে নিয়োগ করেছিল।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞেস করলো, রামগিরি কোথায়?

গঙ্গানারায়ণ বললো, তোমার মতন সকলেরই এ প্রশ্ন মনে আসবে বলে কবি কালিদাস প্রথম শ্লোকেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন...জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু। স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং ...জনকতনয়া মানে সীতা। বনবাসের সময় রাম আর সীতা এই রামগিরিতে ছিলেন কিছুদিন, এখানকার জলে সীতা স্নান করেছিলেন বলে তাঁর অঙ্গস্পর্শে জল পবিত্র ...এইখানেই সেই যক্ষ...

—ঐ যক্ষের নাম কী?

—এটাই আর একটা মজা। কালিদাস তাঁর এই কাব্যের নায়কের কোনো নাম দেননি। অর্থাৎ এ যেন জগতের সমস্ত বিরহী মানুষেরই মনের কথা। ধরো, আমি যদি কোনোদিন খুব দূরে চলে যাই, আমায় যদি কেউ নির্বাসন দেয়, তখন আমিও তোমার কতা ভেবে এমনভাবেই বিলাপ কর্বো।

—তারপর বলুন।

—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং...সেই অভিশপ্ত যক্ষ আট মাস নির্বাসনে কাটিয়েচে, দুঃখে-বিরহে রোগা হয়ে গ্যাচে সে, হাত থেকে বলয় খসে পড়ে যায়...এরই মধ্যে এলো আষাঢ় মাসের প্রথম দিন. যক্ষ দেখলে পর্বতের সানুদেশ আলিঙ্গন করে আচে একখণ্ড মেঘ, তার যেন মনে হলো এক পরিণত গজ বপ্রক্রীড়া কচ্চে, অর্থাৎ এক খ্যাপা হাতি মেতে উঠেচে ভূমিখননের খেলায়... কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! তখন সে মেঘকে ডেকে বললো...

—মেঘ কি মানুষের কতা শুনতে পায়?

—ঠিক মতো আকূতি দিয়ে ডাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে, যেমন এই যক্ষের ডাক শুনেছেল...তা ছাড়া কবিও বলে দিয়েচেন, যারা কামার্ত, চেতন-অচেতনের প্রভেদ বোঝা তাদের কাচে আশা করা যায় না...

বেশ কয়েকটি শ্লোক শোনবার পর কুসুমকুমারী বললো, ছাতে যাবেন?

গঙ্গানারায়ণ আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছাতে? কেন! তোমার ভালো লাগচে না?

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের বাহুতে গণ্ড ছুঁইয়ে বললো, ভীষণ ভালো লাগচে, এমন আমি কখনো শুনিনি, আপনি যদি এখন থেমে যান আমি মরে যাবো...চলুন ছাতে যাই, সেখেনে খোলা আকাশ, মাতার ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাবে, সেখেনে বসে শুনতে আরও বেশী ভালো লাগবে।

রাত্রি নিশুতি, সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, সকলেই ঘুমন্ত। খুব সন্তর্পণে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো কুসুমকুমারী আর গঙ্গানারায়ণ। পা টিপে টিপে উঠে এলো ওপরের সিঁড়ি দিয়ে। যাতে কোনো শব্দ না হয় এমন সাবধানে খুললো দরজা। শরৎকালীন আকাশ থেকে অল্প অল্প শিশিরপাত হচ্ছে, ছাদ ঈষৎ ভিজে ভিজে, কিন্তু তা ওরা গ্রাহ্য করলো না। ছাদে কতকগুলি বৃহৎ মাটির জালায় জল ভরা থাকে, সেরকম একটা জালায় পিঠের ভর দিয়ে পাশাপাশি বসলো ওরা দু'জনে। আজকের রাত্রিটিও বড় উপযুক্ত, কোমল, মিহিন সু-পবন বইছে।

চোখ আকাশের দিকে তুলে তন্গতভাবে গঙ্গানাবায়ণ বললো, কোথাও নদীর তীরে তীরে চাঁপা ফুল ফুটে উঠচে...কোথাও দাবাগ্নিতে বন পুড়ে গিয়েচিল, হে মেঘ, তোমার বর্ষণে সেখানকার মাটি থেকে মধুর গন্ধ উঠচে। আর সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ছুটে যাবে চিত্রল হরিণ...।

সম্পূর্ণ পূর্বমেঘ সমাপ্ত করে গঙ্গানারায়ণ চুপ করলো।

কুসুমকুমারী বললো, থামলেন কেন?

গঙ্গানারায়ণ বললো, আজ এই পর্যন্ত থাক। উত্তরমেঘ তোমায় কাল শোনাবো। খুব ভালো জিনিস একদিনে বেশী গ্রহণ কত্তে নেই...যেমন ধরো মধু, এক সংগে যদি বেশী পান করো, কষ্ট হবে।

—আমার কিন্তু এখন ছাত থেকে যেতে ইচ্ছে কচ্চে না।

—এসো, এখানেই বসে থাকি।

—যদি সারা রাত থাকতে চাই, থাকবেন?

—পাগল মেয়ে, তুমি যদি থাকতে পারো, আমি পারবো না?

—আমার ভীষণ ভালো লাগচে, এত ভালো, যেন কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এমন সুন্দর দিন আমার জীবনে কখনো আসেনি। দেকুন আকাশের দিকে, মনে হচ্চে না চাঁদ যেন ঠিক আমাদের দু'জনকেই দেকচে?

—আমাদের দু'জনকে নয়, শুধু তোমাকে। চাঁদ তোমায় হিংসে কচ্চে!

—তা তো হিংসে হতেই পারে। চাঁদ বড় একা।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইলো এরপর। জাগ্রত মানুষের মন কখনো থেমে থাকে না, ওদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো দু'দিকে।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কুসুম, তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো? এই যে মানুষের জীবন, এর উদ্দেশ্য কী?

কুসুমকুমারী বললো, জানি না তো, কখনো ভাবিও নি।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এই কতাটা আমার এখন প্রায়ই মনে হয়। এই জগৎ সংসারের একজন পরম পিতা আচেন, একদিন তাঁর পায়ের কাচে যখন যাবো, তিনি শুধোবেন, মানুষের জীবন পেয়েছিলে, সে জীবন চরিতার্থ করে এসোচো তো? তখন কি উত্তর দোবো?

—আমি সামান্য মেয়ে, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস কচ্চেন?

—তুমি সামান্য হবে কেন, কুসুম! তোমারও মন আচে—।

—জীবনের উদ্দেশ্য কী তা আমি জানি না। আসুন আজ থেকে আমরা দু'জনে মিলে খুঁজি...এর উত্তর খোঁজবার জন্য আপনি একলা একলা আমায় ছেড়ে কোতাও চলে যাবেন না কতা দিন! প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় কেমন যেন ভয় করে উঠলো, কিন্তু আর ভয় পাবো না, আমিও খুঁজবো, আমায় সাহায্য কর্বেন, বলুন?

—কতা দিলুম, কুসুম।

কুসুমকুমারী গঙ্গানারায়ণের পায়ে হাত রাখলো। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গানারায়ণ দেখলো এই নীলনয়না, স্নিগ্ধ, কোমল, কুমুদিনীর মতন মুখের মেয়েটি বিন্দুবাসিনী নয়, এ অন্য নারী, এর নিজস্ব চরিত্রপ্রভায় আর অন্য কারুর কথা মনে পড়ায় না।

গঙ্গানারায়ণ উঠে দাঁড়াতেই কুসুমকুমারী বললো, আপনি চলে যাচ্চেন? এই যে বললেন—

গঙ্গানারায়ণ দু' হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—।

কুসুমকুমারীও উঠে দাঁড়ালো এবং গঙ্গানারায়ণের আহ্বানে বক্ষলগ্না হলো। গঙ্গানারায়ণ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললো, জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, মানুষের একাকিত্ব বড় সাংঘাতিক। আমি অনেকদিন বড় একা ছিলুম গো, কুসুম, এখন থেকে তুমি আমার সেই শূন্যতা সম্পূর্ণ ভরিয়ে দাও।

ঠিক সোহাগবালার মতন থাকোমণির শরীরেও মেদ জমতে শুরু করেছে। এটা বুঝি এই ছোট জলচৌকিখানিরই গুণ। নিচের তলার এই দরদালানের জলচৌকিতে যে বসবে ভৃত্য মহলের কর্তৃত্ব যেমন তার হাতে আসবে তেমনি তার চেহারাতেও পুষ্টি লাগবে। কয়েক বছর আগেও থাকোমণির দেহ ছিল যেন পাথরে কোঁদা, সাধারণ রমণীদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা বলে তার মেদবিহীন শরীরটি ছিল রীতিমতন আকর্ষণীয়। এখন তার চিবুকে দুটি ভাঁজ পড়েছে, হাত-পা গোল গোল হয়ে এসেছে এবং আঙুলের ডগাগুলো যেন সব সময় টসটস্ করে।

মাঝখানে দু মাস থাকোমণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই জলচৌকিটি প্রায় বেদখল হবার উপক্রম হয়েছিল। মানদা দাসী এখানে বসেছিল জাঁকিয়ে। মানদা এবং অন্যান্যদের ধারণা হয়েছিল যে থাকোমণি আর বাঁচবে না। প্রায় সেই রকমই দশা হয়েছিল তার, হাত-পা নাড়ার ক্ষমতাও চলে গিয়েছিল, একলা ঘরে পড়ে থেকে চিঁ চিঁ করতো, তবু ভাগ্যক্রমে সে আবার সেরে উঠলো।

তারপর এই জলচৌকি থেকে মানদা দাসীকে সরানোর জন্য প্রায় ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল থাকোমণিকে।

সেই অসুখের পর থেকেই থাকোমণি এ রকম স্ফীত হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সোহাগবালার মতনই পরিণতি তার হবে কি না এই কথা ভেবে প্রায়ই থাকোমণির বক্ষ কাঁপে। তা ছাড়া, এই জলচৌকিটা সে এখনো আঁকড়ে ধরে আছে বটে, কিন্তু সে টের পেয়ে গেছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি ধসে যাবে। মানদা দাসী এবং অন্যান্য কয়েকজন সব সময় তার দিকে শকুন-চক্ষে তাকায়। থাকোমণির আর ভালো লাগে না, কিচ্ছু ভালো লাগে না।

নকুড় আর দুর্যোধন মাছ কুটছে চাতালে বসে। থাকোমণি অলসভাবে চেয়ে

আছে সেদিকে। বড়বাবুর কুটুমবাড়ির কয়েকজন আজ নেমন্তন্ন খাবেন এ-বাড়িতে, তাই আজ বেশী মাছ এসেছে। কুটতে কুটতে দু-একটা টুকরো বাঁ দিকে ছুঁড়ে ফেললে দুর্যোধন, আর নকুড় তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐভাবে প্রায় সেরখানেক মাছ সরিয়ে ফেলে ওরা বাইরে বিক্রি করে আসবে। থাকোমণি ইচ্ছে করে দেখছে না। ওরা কি ভাবছে, ওরা থাকোমণির চোখে ধুলো দিতে পারবে? থাকোমণি সবই জানে। তবু নিত্যি তিরিশ দিন আর ওদের সংগে খ্যাট খ্যাট করতে থাকোমণির ইচ্ছে করে না। মাছের দরের যা হিসেব দিলে নকুড়, তা শুনেও তাজ্জব হবার কথা। বলে কি না রুইমাছের মন বারো টাকা, এ কী মগের মুলুক পেয়েছে? ন টাকা সাড়ে ন টাকা মন দরে পাকা রুই বাড়িতে এসে বয়ে দিয়ে যায়! থাকোমণি তবু ওদের কাছ থেকে চুরির টাকার বখরা চায়নি।

টাকাপয়সার প্রতিও লোভ কমে গেছে থাকোমণির। কী হবে টাকা দিয়ে? এক সময় ভাবতো বটে, 'বন্ধু নাহি কড়ি বই' কিন্তু বয়েস অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ায় সে উপলব্ধি করেছে যে কড়ি থাকলেও মেয়েমানুষের জীবনে নিরাপত্তা নেই। বলতে গেলে থাকোমণি তো টাকার ওপরেই শুয়ে আছে। তার শয্যার নিচে তোড়ায় বাঁধা বাঁধা টাকা আর খুচরো পয়সা। বিশ বৎসর ধরে সে যা উপার্জন করেছে, তার থেকে পাই-পয়সাও খরচ হয়নি, সবই জমা আছে, তবু থাকোমণির অন্তরে অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে কেন?

এই যে ইদানীং সে নকুড় বা দুর্যোধনের কাছ থেকে চুরির বখ্‌রা নেয় না সেইজন্যই বরং সে কিছু খাতির পায়। থাকোমণির এবংবিধ পরিবর্তনে নকুড় আর দুর্যোধন খুব আতান্তরে পড়ে গেছে, ব্যাপারটির আগা-পাশ-তলা কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। সেই সোহাগবালার আমল থেকেই এই দরদালানের জল-চৌকির অধিকারিণী প্রত্যেকটি চুরির আধ্‌লারও ভাগ না নিয়ে ছাড়েনি। থাকো-মণি যে এখন আর ভাগ চায় না, তার মানে কি তার গভীর কোনো মতলব আছে? দিবাকরকে বলে থাকোমণি যে-কোনো দাসী বা ভৃত্যের চাকরি যখন খুশী খেয়ে দিতে পারে। থাকোমণির ক্ষমতা সোহাগবালার চেয়েও বেশী, কারণ সে দুলালের মা।

রাত্তিরবেলা সব কাজ মিটে গেলে নকুড় থাকোমণির ঘরের দোরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, ও থাকোদিদি, ঘুমুলে নাকি, আসবো? পিছনের গোল-পাতার ঘর অনেক দিন হলো ছেড়ে এসেছে থাকোমণি। দিবাকরের অনুগ্রহে সে নিচের মহলেই একটা পাকা ঘর পেয়েছে। ঘর থেকে যখনই বেরোয়, তখনই থাকো-মণি সে ঘরের দরজায় তালা লাগায়। হুটহাট করে এ-ঘরে কারুর প্রবেশ করার হুকুম নেই। নকুড় বয়েসে থাকোমণির চেয়ে যথেষ্ট বড় তো বটেই, এক সময় সে ছিল থাকোমণির উপপতি, তবু এখন সে থাকোমণিকে দিদি বলে সম্বোধন করে। প্রথম দিন যে আচমকা থাকোমণির ঘরে ঢুকে তার ওপর বলাৎকার করতে এসেছিল, সেই নকুড় এখন থাকোমণির ঘরে ঢোকার আগে বিনীত কণ্ঠে অনুমতি নেয়।

থাকোমণি বলে, না। ঘুমুইনি, আয়, ভিতরে আয়।

এই ভৃত্য মহলে নকুড়ের মতন শয়তান আর দুটি নেই। চুরির নেশায় সে এমনই পাগল যে পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বার করতেও সে ছাড়ে না। কয়েক

বছর অন্তর অন্তর নকুড়ের বউ মরে। আবার সে গাঁয়ে গিয়ে একটি করে বিয়ে করে আসে। এবং অন্যান্য ভৃত্যদের মতনই, দেশের বাড়িতে একটি বউ থাকলেও এখানেও সে একজন সঙ্গিনী রাখে। গ্রামের বাড়িতে যাবার জন্য তো বছরে ছুটি মেলে একবার, তাও বেশী দিন থাকা চলে না, পয়সার টানে নিজেরাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। নকুড় আবার ঘন ঘন সঙ্গিনী বদলায়। যথেষ্ট বয়েস হলেও তার শরীরটি এখনো অসুরের মতন এবং সারা দিন ধরে সে এত রকম কাজ করতে পারে যে তার স্বভাবের যতই দোষ থাকুক, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো কাজে নকুড়কে প্রয়োজন হয়।

নকুড়ের সঙ্গে থাকোমণির শারীরিক সম্পর্ক নেই অনেকদিনই। নকুড় এখন মঙ্গলা নাম্নী এক দাসীকে নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। তা থাক, সেজন্য থাকোমণির কোনো খেদ নেই। নকুড় এখন তার সেবা-দাস।

ঘরে ঢুকে নকুড় দেয়ালের এক কুলুঙ্গি থেকে একটা বটুয়া বার করে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। থাকোমণি বসে থাকে তক্তাপোশের ওপরে। বটুয়াটা খুলে কল্কে বার করে গাঁজা সাজতে শুরু করে নুকুড়। সারা দিনের পর এই সময়টার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে থাকোমণি। এই নকুড়ই তাকে এক সময় গাঁজার নেশা ধরিয়েছে! এখন কয়েক ছিলিম গাঁজা না টানলে থাকোমণির ঘুমই আসে না রাত্রে। থাকোমণি নিজে যে গাঁজা সাজতে জানে না তা নয়, তবু অন্য কেউ সেজে দিলে ভালো লাগে। কিছুদিন হলো নকুড় আবার নিজেই গায়ে পড়ে এসে এই ভার নিয়েছে।

নকুড় ছিলিম সেজে ফুঁ দিতে দিতে ডান হাতের কনুই বাঁ হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেটি এগিয়ে দেয় থাকোমণির দিকে। তার একদা-শিষ্যা থাকোমণিকেই সে প্রথম টানটি লাগাবার সম্মান দেয়। থাকোমণি দু হাতে কল্কেটি ধরে প্রথমে কপালে ঠেকায়, তারপর শিবনেত্র হয়ে টানতে শুরু করে। পট পট করে বীজ ফাটার শব্দ হয়, অনেকখানি ধোঁয়া বুকে টেনে দম বন্ধ করে থেকে কল্কেটা সে ফিরিয়ে দেয় নকুড়কে। তারপর এইভাবে কল্কেটি হাতবদলাবদলি হতে থাকে। ছিলিম শেষ হলে নকুড় আবার সাজতে বসে।

নকুড়ের চেয়ে থাকোমণিই আগে বুঁদ হয়। চোখ বুজে থেকে সে একটু একটু মাথা দোলাতে থাকে। নকুড়ের এর পরও অন্যত্র বহু কাজ আছে। সে একটু পরেই উঠে যাবে, তার আগে থাকোমণিকে খুশী করবার জন্য বললো, থাকোদিদি, তোমার হাঁটুতে আজ বেদনা আচে? তারপরই সে হাত বাড়িয়ে থাকোমণির পদসেবা শুরু করে। থাকোমণি চোখ মেলে ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে নকুড়ের দিকে চেয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

ঠিক সেই সময়টিতে কোনো রাজ-রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে থাকোমণির কিছু তফাত থাকে না। বস্তুত উপরতলা ও নিচতলায় অনেক কিছুই একই ভাবে চলে। অনেক কাহিনী-কিস্যায় পড়া যায় যে কোনো স্বেচ্ছাচারিণী রানী প্রতি রাতে এক একজন প্রেমিক পুরুষকে অন্দরমহলে নিয়ে আসতেন। এই ভৃত্যতন্ত্রে থাকোমণি এখনো সম্রাজ্ঞী, সেও কি তা পারে না? এই তো নকুড়ের মতন একজন সা-জোয়ান তার পা টিপছে! এই নকুড় এক সময় তাকে অসহায় অবলা পেয়ে মাটির পুতুলের মতন ভাঙচুর কর'ত চেয়েছিল।

একটু পরেই এক পা তুলে নকুড়ের বুকে একটা ঠোক্কর মেরে থাকোমণি বলে, যাঃ, এবার তুই যাঃ।

নিতান্ত বাধ্যের মতন নকুড় উঠে পড়ে এবং যাবার সময় দরজাটি টেনে দিয়ে যায়। দিনের পর দিন থাকোমণি চুরির পয়সার বখরা চায় না, তার বদলে একটা করে পায়ের ঠোক্কর তো সে দিতেই পারে।

নকুড় চলে গেলে থাকোমণি ক্রন্দন শুরু করে, ক্রমশ তার কান্না বাড়তে থাকে গাঁজার ধোঁয়ার মতন এই কান্নাও তার ঘুমের ঔষধ, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে থাকোমণি ঘুমিয়ে থাকে।

দিবাকর এখনো সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি থাকোমণিকে। শরীরে আর জোর নেই দিবাকরের, তবু এখনো সে নিচের মহলের প্রভু। বাড়ির কর্তাদের কোনো নজর নেই বলে দিবাকরের ক্ষমতা এখন অনেক বেশী। একা আর বেশীদিন সামাল দিতে পারবে না বলে সে গ্রাম থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়েছে। ছেলেটির নাম পঞ্চানন, অপুত্রক দিবাকরের এই পঞ্চাননই উত্তরাধিকারী। ছেলেটি মাথায় টেরি কাটে, সন্ধে হলেই উড়নি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে দিবাকরের যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি, সেইজন্য ছেলেটির স্বভাব হয়েছে বাবু ধরনের। একদিন নবীনকুমার বাড়ি থেকে নির্গত হচ্ছে, সেই সময় পঞ্চানন তার সামনে পড়ে গিয়েও কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে হাত জোড় করে থাকেনি। ছোটবাবু অবশ্য লক্ষ্যই করেনি কিন্তু দূর থেকে দিবাকর দেখতে পেয়ে পঞ্চাননকে কান ধরে হিড় হিড় করে ভেতরে টেনে এনে খড়ম পেটা করে কপাল ফাটিয়ে দিল। যে-কোনো উপায়েই হোক দিবাকর তার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে মানুষ করবেই!

দিবাকর থাকোমণিকে হাতে রাখতে চায় বিশেষ উদ্দেশ্যে। এক একদিন সন্ধ্যে বেলা দিবাকর ডেকে পাঠায় থাকোমণিকে। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়। তবু যেন ওদের অনেককালের দাম্পত্য সম্পর্ক, এমনভাবে কথা হয় সুখ দুঃখের। বাইরের জগতের একটু আধটু সংবাদ দিবাকরের কাছ থেকেই শুনতে পায় থাকোমণি। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিন চারবার মাত্র থাকোমণি এ বাড়ির বাইরে গেছে।

দিবাকরের কাছ থেকেই থাকোমণি এই অত্যাশ্চর্য খবরটি শুনেছে যে বড়বাবুর নতুন বউমণি গান গায়।

শুনে থাকোমণি চক্ষু কপালে তুলেছিল। বলে কি, একে বিধবা, তার ওপর গান করে নতুন বউ! এ কেমন বংশের মেয়ে?

থাকোমণির অবিশ্বাস দেখে দিবাকর বলেছিল, হ্যাঁ রে, থাকো, আমি নিজের কানে শুনিচি। আদালতের বেলিফ্ এশ্চিলো, আমি সে কাগচ নিয়ে ওপরে গিচি বড়বাবুকে সই করাতে, হঠাৎ শুনি কত্তামার ঘরে কে গুনগুনোচ্চে! কী অনাছিষ্টি ভেবে দ্যাক, কত্তামা আমাদের সতী সাবিত্তির, তেনার ঘরে ঐ অজাত-কুজাতের মেয়েকে ঢোকালেন বড়বাবু!

গঙ্গানারায়ণ বিধবা বিবাহ করায় এ বাড়ির দুজন রসুই ঠাকুর চাকরি ছেড়ে চলে গেছে পাপের ভয়ে।

বধূবরণের সময় কুসুমকুমারীকে দেখেছে থাকোমণি। নতুন বধূর রূপ দেখবে কী, বিধবার কপালে সিঁদুর, এটা ভেবে সেদিকে তাকাতেই ভয় করছিল তার। সবাই যখন উলুধ্বনি দিচ্ছিল, থাকোমণির জিহ্বা নড়েনি।

—এবার কোনদিন দেখবি হিজড়ে মাগীদের মতন বাবুদের বউ ধেই ধেই করে নেত্য কচ্চে।

—অমন কতা বলোনি গো, অমন কতা বলোনি! বাবুদের অমঙ্গল হলে যে আমাদেরও অমঙ্গল!

—তোকে আমি বলে রাকচি, থাকো, মিলিয়ে নিস, এ বাড়ি থেকে মা লক্ষ্মী বিদেয় নিয়েচেন! এত বড় বংশ এবার ছাগলে মুড়োবে। ছোটবাবু যেমন দুহাতে ট্যাকা খর্চা কচ্চেন তাতে কোন্‌দিন না দেউলে হতে হয়। আমার চে তো কেউ বেশী জানে না! মাতার ওপর তো দ্যাকার কেউ নেই—

—ও বাড়ির বড়বাবু আর আসেন না।

—তেনার ভীমরতি হয়েচে, তিনি আর কী কর্বেন!

কথায় কথায় দিবাকর আসল কথাটা পাড়ে। পঞ্চাননকে থাকোমণি নিজের ছেলের মতন দেখে, তাকে শিখিয়ে পড়ে মানুষ করে নেয়। দিবাকর চোখ বুজলে তো পঞ্চাননকেই গোমস্তাগিরি করতে হবে। সুতরাং থাকোমণির সঙ্গে পঞ্চাননের মিল না হলে নিচের মহলের রাজ্যপাট ঠিকঠাক চলবে না!

থাকোমণি পোড় খেয়ে অনেক কিছু শিখেছে, সে দিবাকরের আসল মতলবটি ঠিকই বোঝে। দিবাকর চিরকালই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে, শয্যা-সঙ্গিনীদেরও সে একটিও নরম কথা বলে না। অথচ ইদানীং থাকোমণির সঙ্গে তার ব্যবহার একেবারে মধুমাখা। এমনকি নিজের পানের ডিবে থাকোমণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, নে থাকো, একখিলি পান খা!

দিবাকর থাকোমণিকে তার ছেলের বিপক্ষে দাঁড় করাতে চায়। দিবাকর জেনে গেছে যে দুলাল তার মাকে একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। ছোটবাবুর পেয়ারের লোক দুলাল এখন সময় সময় দিবাকরের ওপরেও চোখ রাঙায়। সেই জন্যই দুলালের বিরুদ্ধে একটা জোট বাঁধা দরকার, তাতে থাকোমণিকেও দলে টানতে হবে। থাকো-মণির যে এতবড় অসুখ গেল, দুলাল একদিনের জন্যও তার মায়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং অমন ছেলেকে আর থাকোমণির দরকার কী?

থাকোমণির সত্যিকারের দুঃখের জায়গায় ঘা দেয় দিবাকর। সে ভেতরে ভেতরে পুড়তে থেকেও বলে, হ্যাঁ, পাঁচু তো আমার ছেলেরই মতন। একটু ভব্যিসব্যির জ্ঞান কম, তা বয়েসকালে শুধ্‌রে যাবে। আমি বলি কি, পাঁচুর বে দাও, তার বউ এসে এখেনে থাকুক।

একটা নয়, ইতিমধ্যে দু-দুবার বিবাহ হয়ে গেছে পঞ্চাননের। কোনো স্ত্রী-ই বাঁচেনি। আবার বিয়ে তো দিতে হবেই দেখে শুনে, তার আগে ছেলেটা খুঁটে খেতে শিখুক।

—পাঁচুর বউ এলে তখন তাকে আমি জলচৌকি ছেড়ে দোবো। ঐ মানদা হারামজাদীকে কোনোদিন দোবো না!

দিবাকর এমন মুখ করে থাকে যেন মানদাকে সে চেনেই না। অথচ থাকোমণির অসুখের সময় মানদা যে জলচৌকিতে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল, সে কি দিবাকরের অনুমতি ছাড়াই? দিবাকরের শয্যায় হয়তো এখনো মানদার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। থাকোমণি সব জানে। দিবাকর যতই চতুর হোক, সে এটুকু বোঝে না যে, মা কখনো তার সন্তানের বিরুদ্ধে যায় না।

থাকোমণির খুব বাসনা ছিল যে দুলালের পত্নী সুবালাকে ক্রমে ক্রমে সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একদিন তাকেই নিজের জায়গায় বসাবে। কিন্তু তা হলো না। সুবালা নিজে যেমন দেমাকী, দুলালও হয়েছে সেরকম। দুলাল তার মাকে ধমকে বলেছিল, তার বউ ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে, সে কখনো দাসী-

বাঁদীগিরি করতে যাবে না। ছুতোর মিস্তিরির মেয়ে হলো ভদ্দরলোক আর দুলালের নিজের মা দাসী!

দুলাল এখন প্রাণপণে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করছে। বাগানের মধ্যে একখানি একটেরে ঘরে সে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। সে বা সুবালা ভুলেও কখনো দাস-দাসী মহলে পা দেয় না। তাদের জন্য খাবার পাঠাতে হয়। দুলাল ঘরের মধ্যেও জামা পরে থাকে, জুতো পায় দেয় এবং হুঁকোয় তামাক খায়। নিজে সে বই পড়ে এবং বউ ও ছেলেকে পড়তে শেখায়। এমনকি দুলাল নিজের জন্য একটি চাকর পর্যন্ত রেখেছে!

থাকোমণি দেখা করতে গেলে দুলাল বা সুবালা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে, একবারও ভেতরে গিয়ে বসতে বলে না। নাতিকে নিয়ে সোহাগ করা আর থাকো-মণির এ জন্মে হলো না। নাতি তাকে চিনলোই না ভালো করে। কেন যে মায়ের ওপর দুলালের এ রাগ তা থাকোমণি বুঝেও বুঝতে চায় না। সেটাও বুঝলে তার জীবনের আর বাকি রইলো কী!

একদিন দুলাল তা অতি নির্দয়ভাবে বুঝিয়ে দিল।

থাকোমণির একটাই শুধু স্বপ্ন আছে। কোনো জমি কিনে ঘর তুলবে, পুকুর কাটাবে, ধান চাষ করবে। দাসীবৃত্তি ছেড়ে সে আবার চাষীর বাড়ির গৃহিণী হবে। সেরকম পয়সা তো তার রয়েছেই, কিন্তু একা তো যাওয়া যায় না, ছেলে-বউকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে পারলে সুখ কোথায়? কিন্তু দুলাল এ প্রস্তাব কিছুতেই কানে তোলে না। তবু সে যতই বকুনি-ঝকুনি দিক থাকোমণি প্রায়ই এই কথাটা বলে।

একরাত্রে থাকোমণির মাথায় এই স্বপ্নটা আবার বেশী চাগিয়ে উঠলো। গাঁজায় একটু দম দিলেই তার না-কেনা জমি, না-কাটা পুকুর, না-তৈরী বাড়ির চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে মানস নেত্রে। সেই জন্যই সে কাঁদে। সে রাত্রে থাকোমণি আর থাকতে পারলো না একলা ঘরে। নকুড় ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, দিবাকরের ঘরের দ্বার বন্ধ, শুনশান করছে নিচের মহল। একা একা গাঁজা টেনে থাকোমণির বেশী ঘোর লেগে গেল, সে বাইরে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগলো দুলালদের দরজায়। ঘুম ভেঙে উঠে দুলাল দরজা খুলতেই থাকোমণি তার হাত ধরে নেশাজড়িত কণ্ঠে আন্তরিকতম কাকুতি করে বললো, অ দুলে, চ না, আমরা গাঁয়ে যাই, সেখেনে মায়ে পুতে সুখে থাকবো, তোর বউকে আমি মাতায় করে রাখবো, অ দুলে, চ না যাই! এক্ষুনি চলে যাই—।

দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র কণ্ঠে দুলাল বললো, বেবুশ্যে মাগী, এত রাত্রে এয়েচিস ঢলানী কত্তে, এতটুকু হায়া নেই কো, তোর মুখ দেখলে পাপ হয়! ফের যদি কোনদিন—

বলতে বলতেই মাতৃবক্ষে সজোরে পদাঘাত করলো দুলালচন্দ্র। বিস্ফারিত নেত্রে থাকোমণি ধরাশায়ী হতেই সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল তার পুত্র।

পরদিন ভোর থেকে থাকোমণিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তাড়া খাওয়া বন্য পশুর মতন ছুটতে ছুটতে থাকোমণি একসময় গঙ্গা পেয়ে গেল। তার ছেলে

বলেছে তার মুখ দেখতে চায় না, তবে এ মুখ আর সে কাকে দেখাবে? ভোরের প্রথম খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারের মানুষদের জনে জনে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ওগো, ভিনকুড়ি গাঁ কোতায় বলতে পারো? আমি সেখেনে যাবো, ওগো, তোমরা আমায় পথ বলে দাও—। দু চারজন তাকে সাহায্য করার চেষ্টায় জানতে চায়, কোন জেলা, কোন পরগনা কোন মৌজা? কিন্তু থাকোমণি সে সব কিছুই জানে না। ধানকুড়ি আর ভিনকুড়ি পাশাপাশি এই দুটি গ্রামের নাম ছাড়া তার আর কিছুই মনে নেই। কিন্তু শুধু গ্রামের নাম শুনে পথ বা দিকের সন্ধান দিতে পারে না কেউই। তবু থাকোমণি অন্ধের মতন ছুটতে থাকে। সে তার স্বামী শ্বশুরের ভিটেয় ফিরে যেতে চায়। সেখানে পৌঁছোতে পারুক বা না পারুক, সে আর পিছন পানে চাইবে না।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রর একদা সহপাঠী কেশব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই ব্রাহ্মদের মধ্যে যেন আবার নতুন রক্ত সঞ্চারিত হলো।

কিছুদিন ধরে ব্রাহ্মদের মধ্যে নির্জীব ভাব এসে গিয়েছিল, ভিতরে ভিতরে নানা রকম মনোমালিন্য ও মতভেদ। কেউ কেউ বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চায় যতটা আগ্রহী ততটা ঈশ্বর বা ধর্মচর্চায় নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিন্তু তাঁর মুখে ঈশ্বরের কথা কখনো শোনা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্তও যেন দিন দিন সংশয়বাদী হয়ে পড়ছেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে এঁদের প্রতি বিরক্ত। রাগ করে তিনি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেও ব্রাহ্মদলের ঠিক মতন হাল ধরতে পারছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ এখন প্রৌঢ়। এক কালের তরুণ বিপ্লবী এখন রক্ষণশীল। কিছু ব্রাহ্ম সভ্যদের চাপে পড়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে বেদ কোনো অভ্রান্ত, পবিত্র গ্রন্থ নয়। কিন্তু ব্রহ্মসভার বেদীতে কোনো ব্রাহ্মণের বদলে অব্রাহ্মণ বসে শাস্ত্র পাঠ করে শোনাবে, এতটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পৈতা-বিসর্জন, জাতি-ভেদ প্রথার অবসান কিংবা বিধবা বিবাহ—এর কোনোটারই ঠিক বিরোধী না হলেও দ্রুত কোনো পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি ব্রাহ্ম হলেও তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়, তিনি বাধা দেন না, আবার পুজোর সময় নিজে উপস্থিতও থাকেন না।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি দেখলেন নব যৌবনের এক মূর্ত প্রতীককে। এ ছেলেটি যেমন তেজস্বী তেমনই এর মধ্যে ধর্মের প্রতি উন্মাদনা রয়েছে। প্রবল পাপ বোধ আছে বলে সে পুণ্যের অভিলাষী। বেহালা বাজানোয় বেশী আসক্তি হয়ে যাচ্ছিল বলে নিজের হাতেই সেই বেহালা ভেঙে ফেলেছে কেশব।

বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র কেশবকে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই দেখছেন। প্রায়ই সে এ বাড়িতে তাঁর ছেলেদের কাছে আসে। বৈষ্ণব বংশের সন্তানকে এক সময় কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়, কিন্তু কেশব সেই দীক্ষা নেয়নি, পরিবারের সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়েই সে ব্রাহ্ম হয়েছে। এতেই বোঝা যায় তার

সাহস।

কৈশোর ছাড়বার পর থেকেই কেশব আদর্শ ও নীতিচর্চা নিয়ে মেতে আছে। তার একটা বড় গুণ, সে কোনো কাজই একা করে না, অনেককে একসঙ্গে নেয়। নেতৃত্বের সহজাত গুণ আছে তার মধ্যে, যুবকের দল বিনা দ্বিধায় তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়। 'ইয়ং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর ইউ!' নামে সে একটা ইংরেজি পুস্তিকা লিখেছে, তাতে যেন আগুন ঝরছে একেবারে।

ছেলেদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার বোটে করে বেড়াতে গেলেন রাজমহলে। সঙ্গে আছেন রাজনারায়ণ বসু, আর এসেছে পুত্রবন্ধু কেশব। বোটের এক কোণে বসে উপনিষদ পড়েন দেবেন্দ্রনাথ, অন্য কোণে বসে কেশব পড়ে বাইবেল। আবার হঠাৎ হঠাৎ কেশব আর সত্যেন্দ্র এক সঙ্গে গান করে। বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে কেশব, বাল্যকাল থেকেই গানের চর্চা আছে তার। কেশবের অনুপ্রেরণায় সত্যেন্দ্রও গান লিখতে ও গাইতে শুরু করেছে। দু জনের গান শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায় দেবেন্দ্রনাথের। শুধু শুষ্ক তত্ত্ব নয়, ভক্তিরসের সঞ্চার করে এই দুই যুবক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কেশবের খুব উৎসাহ। প্রায়ই সে বলে, মাত্র এক হাজার দু হাজার লোক ব্রাহ্ম হলে কী হবে? এই নব ধর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে, এমন কি সারা পৃথিবীতে! যেমন তেমন করে হোক আমরা সকলকে এই ধর্মে দীক্ষা দেবো! আমাদের ধর্মেতে পাগল হতে হবে। উন্মত্ত না হলে কোনো কাজ হবে না।

ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাটাও বড় সরল করে বলে কেশব। সে বলে, আমাদের এই ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বর্ণিত ঈশ্বর নন। এই ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির, প্রকৃতি এর পুরোহিত। সকল অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে পূজা করবার অধিকারী।

তরুণ কেশবের মুখে এসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান দেবেন্দ্রনাথ। যত শোনেন আরও শুনতে ইচ্ছে হয়। বিষয়-সম্পত্তি কিংবা পারিবারিক সুখ সম্ভোগের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এর, কেশব চায় তার সর্ব সময় ব্রাহ্মধর্মের জন্য দেবে, সে সারা দেশে প্রচারে বেরিয়ে পড়বে।

যেন এই রকম একজনের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। শুধু একটা বিষয়ে তাঁর খট্‌কা লাগে। কেশব যেমন তেমন বলে কেন? সে যেমন তেমন ভাবে সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিতে চায়, তা হলে কি সে কোনো কৌশল বা চাতুর্যের আশ্রয় নেবে? কেশব জাতিতে বৈদ্য, লোকে বলে বৈদ্যরা ফিচেল হয়। কিন্তু পবিত্র ধর্মের প্রচারের মধ্যে তো ফিচলেমি থাকলে চলে না। রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তুমি কি জানো, বৈদ্যজাতি ফিচেল বলে অপবাদ আছে কিনা?

রাজনারায়ণ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, হ্যাঁ, তা আছে!

দেবেন্দ্রনাথের এ সংশয়ও এক সময় কেটে যায়। তাঁর মনে হয় কেশব ছেলেটি একেবারে খাঁটি সোনা। সে ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পৃথিবীর সকল জাতি সমস্বরে এই গান করুক, ঈশ্বর আমাদের পিতা, সকল মানুষ ভাই-ভাই! তা শুনে দেবেন্দ্রনাথের মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এই তো আদর্শ বাণী।

পরের বছর দেবেন্দ্রনাথ সদলবলে গেলেন সিংহলে। জাহাজে চড়ে কালাপানি পার। এবারও সঙ্গী হলেন কেশব এবং কালীকমল গাঙ্গুলী নামে দুই যুবক। বাড়ির লোকের ঘোর অমতে কেশব চুপি চুপি জাহাজে উঠে এক কুঠুরির মধ্যে

ূকিয়ে রইলো। জানলা দিয়ে বাইরে কোনো বাঙ্গালীকে দেখা মাত্র চমকে চমকে
ঠে, এই বুঝি তার কোনো আত্মীয় তাকে ধরে নিতে এসেছে। সিংহল যাতায়াতের
ীর্ঘ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাকে আরও ভালো করে চিনলেন।

কেশব যে কতখানি উৎসাহী প্রচারক তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিংহল থেকে
ফরার পরের বৎসর। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেশব বায়ু পরিবর্তনের জন্য
কছু দিনের জন্য গেল কৃষ্ণনগর। কলকাতার চেয়েও কৃষ্ণনগর প্রাচীন এবং বহু
াক্ষিত লোকের বাস সেখানে। পাদ্রীরা সেখানে খৃীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য
ড় ঘাঁটি বানিয়েছে। কেশব সেখানে সভা ডেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে
াগড়া লাগিয়ে দিল পাদ্রীদের সঙ্গে। পাদ্রী ডাইসন কেশবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান
রলে কেশব সিংহগর্জনে মুখের মতন জবাব দিলো তাঁর। বহু লোক ভিড় করে
ালো কেশবকে দেখতে ও তার মুখের কথা শুনতে। একটার পর একটা সভা.
থানীয় ছাত্র, শিক্ষকের দল, এমন কি রক্ষণশীল হিন্দুরাও এলো কেশবকে সমর্থন
ানাতে। এতদিন পর একজন এসে পাদ্রীদের রোধ করবার জন্য নিখুঁত যুক্তিজাল
দয়ে পাদ্রীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। কেশব খৃীষ্টধর্মের নিন্দা করে না, সে বাইবেল
থকেই অজস্র উক্তির উদ্ধৃতি দেয়, দেশের অবস্থা এবং সমাজের অবস্থাও আলো-
না করে সে বুঝিয়ে দেয় যে ধর্ম সমাজ-ছাড়া নয়, আবার সমাজও ধর্ম-ছাড়া নয়।

কেশবের এই বিজয়-অভিযানের বিবরণ শুনে চমৎকৃত হন দেবেন্দ্রনাথ।

ক্রমে অবস্থা এমন হলো যে কেশবকে না দেখে তিনি থাকতেই পারেন না।
ুত্রসম এই যুবকটি হয়ে উঠলো তাঁর পুত্রদের চেয়েও প্রিয়তর। কেশব বাড়িতে
ালে তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কেশব অন্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে বসতে
গলে তিনি তাকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দেন নিজের কৌচের এক পাশে।
াঁর জন্য মিছরি বা অন্যান্য কোনো খাদ্য এলে তিনি এক চামচ কেশবের মুখে
ুলে দিয়ে তারপর নিজে এক চামচ খেয়ে বলেন, একবার তুমি খাও, একবার আমি
াই! ...তোমাকে দেখলেই আমার আত্মার আরাম হয়, তুমি যে ব্রহ্মানন্দ!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেশবের সঙ্গে আলাপচারি করে কাটান দেবেন্দ্রনাথ। কেশব
বঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করে, আপিস ছুটি হলেই সে চলে আসে। সঙ্গে আসে
ার বন্ধু ও সমর্থকরা। হল ঘরে লম্বা মাদুর পেতে তার ওপরে বসে সকলে।
ছেঁড়া ও ময়লা পোশাক পরা যুবক কেরানির দল ধর্ম আলোচনায় গলা ফাটায়,
খনো গেয়ে ওঠে গান। ঘন ঘন চা আসে। অধিক রাত্রি হয়ে গেলে কেউ কেউ
ঠবার জন্য ঘড়ি দেখলে দেবেন্দ্রনাথ তার হাত চেপে ধরে বলেন, রাখো তোমার
াড়ি, ঘড়ি কি ঠিক সময় রাখে?

কেশবের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন হলো। কেশব
ার যুবক বন্ধুদের সঙ্গে এই সংকল্প নিয়েছে যে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা
ার কেউ উপবীত ধারণ করবে না। এই কথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পৈতের
দকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে আর এটা রাখা কেন? এতদিন পর তিনিও পৈতে
্যাগ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, পিরালী সংসর্গ থাকায় তাঁদের কেউ খাঁটি ব্রাহ্মণ মনে
রে না। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় উপাচার্য হিসেবে খাঁটি ব্রাহ্মণরাই বেদীতে
সে শাস্ত্র পাঠ করে। দেবেন্দ্রনাথ উপদেশ দেবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, সেই

বেদীতে কখনো বসেননি। কেশব একদিন তাঁকে বললো, আপনি আমাদের চক্ষে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি মহর্ষি, আপনি কেন বেদীতে বসবেন না? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এই ধর্মের সার কি বোঝে? এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না দেবেন্দ্রনাথ, দু একদিন দ্বিধা করার পর বেদীতে বসলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এতদিন-কার এক প্রথার পরিবর্তন হলো।

এর পর একটু বেশী সাহসের কাজ করে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ।

কেশব নারীদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তার বন্ধু সত্যেন্দ্র অল্প বয়েসেই স্ত্রী স্বাধীনতা নামে একটি বই লিখেছে। দুই বন্ধু স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দান এবং বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দান বিষয়ে আলোচনা করে। এসব দেবেন্দ্রনাথের কানে আসে, তিনি আপত্তি করেন না। তিনি বুঝতে পারেন, যুগের পরিবর্তন হচ্ছে।

কেশব কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার দু মাস পরে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ। কেশব এবং অন্যান্য যুবকরা খুব একটা উচ্চ কণ্ঠে দাবি না তুললেও গুনগুনিয়ে বলাবলি করতে লাগলো, ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান পুরুষ দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে কেন হিন্দু মতে হবে। সেই নারায়ণ শিলা আর অগ্নি-সাক্ষী? ব্রাহ্মরা এই সব পৌত্তলিকতা মানে না, অথচ সামাজিক অনুষ্ঠানে এগুলো মেনে চলতে হবে?

দেবেন্দ্রনাথ রাজি হয়ে গেলেন যুবকদের কথায়। তিনি ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মমতেই কন্যার বিবাহ দেবেন। একেবারে সব কিছু অস্বীকার না করে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা নিলেন তিনি। হিন্দু রীতি প্রায় সব কিছুই রইলো, শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি হলো, বিয়ের আসরে সাজানো রইলো দান সজ্জা। অর্ঘ্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক ও বস্ত্রাদি নিয়ে বরকে বরণ করলেন দেবেন্দ্রনাথ, স্ত্রী-আচারও হলো, শুভদৃষ্টি, মালা বদল, গ্রন্থি বন্ধন এসব কিছুই বাদ গেল না। শুধু রইলো না কোনো পুরোহিত আর নারায়ণ শিলা, আগুনের সামনে যজ্ঞও হলো না। তার বদলে বর ও বধূকে নিয়ে হলো ব্রহ্ম-উপাসনা আর পুরোহিতের বদলে প্রবীণ ব্রাহ্মরা দিলেন উপদেশ।

উগ্র ব্রাহ্মরা এতখানি হিন্দুয়ানী মেনে চলায় পুরোপুরি খুশী না হলেও এটাই হলো প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটি। এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত বিলাতি সংবাদপত্র 'অল দা ইয়ার রাউন্ড'-এ এই বিবাহের বর্ণনা ছাপা হলো ফলাও ভাবে।

আর এরই ফলে বিরাট কোলাহল পড়ে গেল হিন্দু সমাজে। নতুন ভাবে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচলনের পর প্রথমে প্রবল আলোড়ন হলেও আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দেশের মানুষ ধরে নিয়েছিল যে এটা কিছু আলাভোলা বড় মানুষ আর কিছু কলেজীয় ছোকরাদের ব্যাপার। হিন্দু ধর্মের অসংখ্য শাখা আছে, ব্রাহ্মরাও না হয় আর একটা শাখা হয়ে ঝুলে থাকবে।

কিন্তু ব্রাহ্মরা বেদকে অস্বীকার করায় হিন্দুরা আবার নড়ে চড়ে ওঠে। খৃষ্টান-দের আছে বাইবেল, মুসলমানদের কোরাণ, আর হিন্দুদের বেদ থাকবে না? এই সব দৈব গ্রন্থের কেউ ভুল ধরতে পারে? আর ব্রাহ্মরা বলে কিনা বেদ অভ্রান্ত

নয়। এমন কি কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, বেদ একখানি কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এমন কথা যারা বলে, তারা হিন্দু ধর্মের শত্রু।

এর পর ঠাকুরবাড়িতে শালগ্রাম শিলা বাদ দিয়ে বিবাহের কথা প্রচারিত হওয়ায় ক্রোধের ফুলকি ছড়াতে লাগলো। ঈশ্বর ও অগ্নিসাক্ষী না রেখে বিবাহ হয়? সে তো ব্যভিচার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো সারা দেশের ঘৃণা। শুধু উপহাস ও বিদ্রূপ নয়। ব্রাহ্মদের ওপর যখন তখন আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ব্রাহ্মরাও যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধলে নবোদ্যমে।

এই সময় ব্রাহ্মদের একজন সেনাপতি দরকার। আর কে হবে সেই সেনাপতি, কেশব ছাড়া?

শহরে দেবেন্দ্রনাথের মন টেঁকে না। সুকুমারীর বিবাহের সময় আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকেও অনেক লাঞ্ছনা ও কটূক্তি সইতে হয়েছে তাঁকে। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা শহর থেকে বেশ দূরে কোনো নিরালা জায়গায় একটা আশ্রম তৈরি করবেন। সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, স্থান নির্বাচনের জন্য ঘুরতে ঘুরতে বর্ধমানের গুসকরায় এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন তিনি, হঠাৎ যেন এক রাত্রে প্রত্যাদেশ পেলেন। যেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে ডেকে বলছেন, কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য করো, তাতেই সমাজের কল্যাণ হবে।

কলকাতায় ফিরে গিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে কেশবচন্দ্রকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্যের পদে বরণ করবেন। তাঁর বয়েস হয়েছে। সব কাজের ভার তিনি একার হাতে আর রাখতে পারেন না, তা ছাড়া এখন তিনি বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে বাইরে থাকবেন। তিনি নামে মাত্র প্রধান আচার্য থাকলেও সব কাজের দায়িত্ব এখন থেকে নেবে কেশবচন্দ্রই।

কেশবচন্দ্রের বয়েস সবে মাত্র তেইশ বৎসর পার হয়েছে, তাকে বসিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত প্রবীণ ব্রাহ্মদের মাথার ওপরে! এবং অব্রাহ্মণ হয়েও সে আচার্য হবে! এ কি সকলে মেনে নিতে পারে? কয়েকজন বয়স্ক শুভানুধ্যায়ী দেবেন্দ্রনাথকে আড়ালে বললেন, এখনই এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হচ্চে আপনার? আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না? ঐ মাথা-গরম ছোকরাকে আপনি এতখানি সম্মান ও দায়িত্ব দিয়ে একেবারে সমাজের আচার্য করে দিচ্ছেন? ঐ 'বোধ হয়' আর 'চেষ্টা করিব'-কে দিয়ে কতটা কাজ হবে।

'বোধহয়' আর 'চেষ্টা করিব' নিয়ে কেশবচন্দ্রের আড়ালে অনেকেই কৌতুক করে। কেশবচন্দ্রের সত্যানুরাগ এখন এমনই স্তরে গেছে যে যাতে ভুল করেও একটা মিথ্যে বলে ফেলতে না হয়, সেই জন্য কেশবচন্দ্র সব কথার মধ্যে বোধ হয় বা চেষ্টা করিব জুড়ে দেয়। ব্যাঙ্কে অঙ্কের হিসাব মেলাবার পর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিসেব মিলেছে? কেশবচন্দ্র উত্তর দিয়েছিল, বোধহয় মিলেছে! সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, হিসেব মিলেছে কিংবা মেলেনি, এর মধ্যে আবার বোধহয় কী? কেউ কেউ রসিকতা বানিয়েছে যে, কেশবচন্দ্র ভাত খেতে বসে বলে, এবার আমি ভাত খাইবার চেষ্টা করিব। খাওয়ার পর হাত ধুয়ে এসে বলে, এবার বোধহয় আমি আঁচাইয়াছি!

প্রবীণদের আপত্তিতে কান দিলেন না দেবেন্দ্রনাথ। কেশবের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ আর কে আছে? সবচেয়ে বড় কথা, তার অন্তরে জ্বলছে আগুন। আগামী ১লা বৈশাখে মহা ধুমধামের সঙ্গে তাকে বরণ করা হবে আচার্য পদে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে কেশব। প্রায় সর্বক্ষণই সে ঠাকুরবাড়িতে থাকে। উৎসবের দু দিন আগে সত্যেন্দ্র তার বন্ধুকে বললেন, ভাই, এত বড় একটা ব্যাপার হবে সেদিন। তোমার স্ত্রীকে আনবে না? তিনি দেখবেন না?

কেশব বললো, এ তো অতি উত্তম কথা। অবশ্যই বোধহয় তাঁকে আনা উচিত।

এবারে কিন্তু কেশবের পরিবারের সকলে একেবারে বেঁকে বসলেন। বাড়ির বউ যাবে ঐ ঠাকুরদের মতন ম্লেচ্ছ ও পতিতদের বাড়িতে? তা একেবারেই অসম্ভব। কেশব যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে যায় তা হলে একেবারেই চলে যেতে হবে, এ বাড়িতে আর তার ফিরে আসা চলবে না। এমন কি সম্পত্তির অংশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে।

কেশবচন্দ্র তাতেও নিরস্ত হলো না। সম্পত্তির চিন্তা না হয় পরে করা যাবে, এখন যেমন ভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কেশব তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না। এর মধ্যেই তাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

সেই রাত্রেই একটা শিবিকা সঙ্গে নিয়ে কেশব চলে এলো বালীতে। এখানে তার শ্বশুরালয়। ভৃত্যদের কাছে প্রথমে সন্ধান নিল তার পত্নী জগন্মোহিনী সেখানে আছেন কি না। আছেন জেনেও কেশবচন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো না, এক ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ পাঠালো যে সে বাইরে অপেক্ষা করছে, জগন্মোহিনী ইচ্ছে হলে এসে সাক্ষাৎ করতে পারে।

জগন্মোহিনী তৎক্ষণাৎ নেমে আসতেই কেশবচন্দ্র তাকে সমস্ত ঘটনাটি প্রথমে বোঝালো। তারপর বললো, শোনো, তুমি খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে তোমাকে জাত, ধর্ম, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনা সব ত্যাগ করতে হবে। তোমার পিতা-মাতা ও অন্যান্যরা যাঁদের সঙ্গে তুমি স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে বন্ধ, তাঁদের সঙ্গে নষ্ট হবে তোমার সম্পর্ক। ক্ষুধার অন্ন কখন কী জুটবে ঠিক নেই। আমাকে ছাড়া আর সব কিছুই হারাবে তুমি। এতখানি ত্যাগের বিনিময়ে শুধু আমি কি তোমার যোগ্য?

কোনো উত্তর না দিয়ে কেশবের দিকে এগিয়ে এলো জগন্মোহিনী।

ভোরবেলা সস্ত্রীক কেশব এসে পৌঁছোলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দেউড়ির সামনে। দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। কেশবকে আলিঙ্গন করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, এসো ব্রহ্মানন্দ, আমার এ গৃহ, তোমার গৃহ। তুমি সুখে এখানে বাস করো।
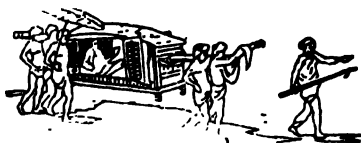
পরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য চিৎপুরে একটি বাড়ি ক্রয় করেছে নবীনকুমার। নতুনভাবে সব কিছু সজ্জিত করা হচ্ছে। সম্পাদকের কক্ষটি দ্বিতলে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক দ্বিপ্রহরে নবীনকুমারের জুড়ি গাড়ি সেই গৃহের সামনে থামলো। আজ থেকে সে এই দৈনিক পত্রিকাটির পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবে। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী নামে দুই ব্রাহ্মণ

নবীনকুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সসম্ভ্রমে নিয়ে এলো দ্বিতলে। এই দুই ব্রাহ্মণই পত্রিকাটি শুরু করেছিল, ক্ষুদ্র আকারের এক পাতার কাগজ, তাও চালাতে পারেনি, নবীনকুমার ওদের কাছ থেকে পরিদর্শকের সর্বস্বত্ব গ্রহণ করেছে। হরিশের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়টের সে-ই মালিক। দুরবীন নামে একটি উর্দু পত্রিকাও চলে তার অর্থানুকূল্যে। এবার সে অধিগ্রহণ করলো এই দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র।

সম্পাদকের কেদারায় আসীন হয়ে নবীনকুমার অন্যদের বললো, অনুগ্রহ করে আপনারাও বসুন। প্রথমেই আমি প্রয়োজনীয় ক'টা কতা বলে নিতে চাই।

প্রাক্তন দুই সম্পাদক ছাড়াও আর আটজন মুদ্রাকর এই কাগজের কর্মী। এ ছাড়াও নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সাত-আট জন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। কয়েক জন আসন গ্রহণ করলো, কয়েক জন রইলো দণ্ডায়মান।

বাইশ বৎসর বয়স্ক সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললো, প্রথমেই জানাই, তর্কালংকার মশাই ও গোস্বামী মশাই সমেত এই পত্রিকার যাঁরা যাঁরা কর্মী ছিলেন, সকলেই ভবিষ্যতে এ কাগজে বহাল থাকবেন।

সকলে একসঙ্গে সাধু! সাধু! বলে উঠলো। ছলছল করে উঠলো তর্কালংকার ও গোস্বামীর চক্ষু। তারা এতটা আশাই করেনি।

নবীনকুমার বললো, আপনারা আরও যোগ্য লোক খুঁজুন, আমার আরও কর্মী লাগবে। একপাতা নয়, এই পত্রিকা হবে চার পৃষ্ঠা।

এবার সকলে আরও বিস্মিত। চার পৃষ্ঠার বাংলা কাগজ? প্রতিদিন? এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে!

অন্যদের মুখে বিস্ময়-লেখা পাঠ করেই নবীনকুমার আবার বললো, হ্যাঁ, প্রতিদিন চার পৃষ্ঠা। এ কাগচ হবে ইংরেজি পত্রিকাগুলির সমতুল্য। আপনারা সকলেই জানেন, এতকাল যে সব বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েচে, তা ইংরেজি কাগচগুলির উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজি কাগচের বস্তাপচা পুরোনো খবর বাংলা কাগচে বেরোয়। আমি নাম কত্তে চাই না, এমন বাংলা কাগচ আচে যার সংবাদ অংশ ইংরেজি কাগচের চোথো অনুবাদ, কী তাই না?

অন্যরা আর কী বলবে! এ তো জানা কথাই। বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ কোথায়?

আমরা পরিদর্শকের জন্য নিজস্ব রিপোর্টার নিয়োগ কর্বো। তারা হাইকোর্টে যাবে। মফস্বলে যাবে, হাটে-বাজারে ঘুরবে, গবরমেণ্টের হাই হাই ব্যক্তিদের সঙ্গে কতা বলবে, তারপর নিরপেক্ষ সংবাদ দেবে। দেখুন, অনেক সংবাদ আচে, যা সাহেবদের কাজে লাগে কিন্তু আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তবু বাংলা কাগচে ইংরেজির অনুকরণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক জাহাজ অমুক স্থল থেকে এসেচে। অমুক জাহাজ অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলণ্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কী উপকার? আমাদের আচার-ব্যবহার সমুদয়ই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙলা কাগচ বাঙ্গালার নিজস্ব খবর, যাতে দেশের কল্যাণ হয়, মানুষের চেতনা জাগ্রত হয়, এমন বিষয় পরিবেশণ কত্তে হবে। তা ছাড়া আপনাদের সকলকে এক শপথ নিতে হবে, আপনারা রাজি?

সকলের মুখপাত্র হয়ে মদনমোহন গোস্বামী বললেন, সিংহমশাই, আপনার বাক্যগুলি শুনে আমাদের মনে এক নতুন ভাবের উদ্রেক হতেছে। এ সব যে বড়ই সত্য কথা। তত্রাচ তাহা আমরা এতদিন উপলব্ধি করি নাই।

নবীনকুমার বললো, মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্ররা পাশ করে যখন ডাক্তার হয়, তখন মানবসেবার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়। সংবাদপত্রেও মানুষের মনের চিকিৎসা হওয়া কর্তব্য। সে কারণে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, জ্ঞানপূর্বক সত্য পথ থেকে বিচলিত হবো না। যাতে কোনো বিষয়ের অতি বর্ণন না হয় সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হবো...আর...পৃথিবীর কোনো মানুষই পক্ষপাতের হাত এড়াতে পারেন না যদিও, তবু আমরা অঙ্গীকার কচ্চি যে, জ্ঞানত কোনো পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হবো না। কেমন, এ শপথ ঠিক?

—অবশ্যই, অবশ্যই!

—আপনারা জানেন, আমি মহাভারত অনুবাদ-কার্যে ব্যস্ত আছি। অর্ধেকের বেশী হয়ে গ্যাচে, এ সময় সে কাজে ঢিল দেওয়া চলে না। সেজন্য এখানে আমি খুব বেশী সময় দিতে পারবো না। দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরই। আমি সকাল আট ঘটিকা থেকে দুপুর দুই ঘটিকা পর্যন্ত মহাভারত কার্যালয়ে থাকব। সেখান থেকে আসতে আমার এক ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ তিন ঘটিকা থেকে রাত্র আট-নয় ঘটিকা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে কাজ কর্বো!

—সে কি মহাশয়! আপনি আহার-বিশ্রামেরও সময় রাখবেন না?

—আমার এ শরীরের পক্ষে খুব বেশী আহার্যের প্রয়োজন হয় না, আর বিশ্রামের জন্যও আমার শয্যার প্রয়োজন হয় না। সেজন্য আপনাদের চিন্তা করবার দরকার নেই। বাংলার ঘরে ঘরে এই কাগচ পেঁৗচে দেওয়া চাই। যাতে লোকে ইংরেজি দৈনিক ফেলে সাগ্রহে এই কাগচ পড়ে। আর একটা কতা! গোস্বামী মশাই, এ কাগচে লেকবার সময় আপনাদের ভট্টাচার্যি-বাংলা ছাড়তে হবে। সংস্কৃত আর নস্যির গন্ধওলা বাংলা আমার চাই না। সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। তাতে ব্যাকরণ একটু ক্ষুণ্ণ হলে কিংবা ব্যোপদেব রাগ কল্লেন কিনা তা নিয়ে মাতা ঘামালে চলে না!

শুরু হয়ে গেল দৈনিক পরিদর্শক। চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম চার পয়সা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংবাদ পরিবেশন, ঝকঝকে ছাপা, সবই অভিনব। লোকে প্রাত-রাশ গ্রহণ করবার আগেই যাতে এই কাগজ পেয়ে যায়, তেমন ব্যবস্থা করা হলো। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করলেন, বাংলায় এমনটি আর কেউ দেখেনি।

বিদ্যাসাগর প্রথম দিন পরিদর্শক পেয়ে বিস্মিত হলেন। নবীনকুমার কী কাণ্ড শুরু করেছে! দৈনিক সংবাদপত্র বার করা কি সোজা কথা! ওদিকে মহাভারত অনুবাদের মতন অত বড় কাজ হাতে রয়েছে......হুজুগে যুবক, তবে কি মহা-ভারতের কাজ মুলতুবি রেখে এবার এটাতে মেতেছে?

একদিন তিনি চলে এলেন বরাহনগরে। সারস্বত-আশ্রমে মহাভারত অনুবাদের কাজ কিন্তু একটুও থেমে নেই। নবীনকুমার পণ্ডিতদের একদণ্ডও নিবৃত্তি দেয় না। পণ্ডিতরা মহাভারতের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে মিলিয়ে একটি একটি মূল নির্বাচন করে তার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করে রেখে দেয়। নবীনকুমার প্রত্যেক-দিনের প্রথমার্ধ এখানে কাটিয়ে ভাষার পরিমার্জনা করে। তারপর সে চলে যায় পরিদর্শক কার্যালয়ে।

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তা হলে এই বাংলা সংবাদপত্র বেশীদিন বেরুবে না। অথচ দিনের পর দিন ঠিক সময়ে পরিদর্শক প্রকাশিত হতে লাগলো।

এক সন্ধ্যাকালে পরিদর্শকের সম্পাদকের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো সম্পা-দকেরই সমবয়সী এক যুবক। নবীনকুমার সম্পাদকীয় লিখছিল অভিনিবিষ্টভাবে,

যুবকটি গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, কী হে, নবীনবাবু, একটু বসতে পারি?

নবীনকুমার মুখ তুলে, ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বললো, এ কি কৃষ্ণকমল নয়? আরে, আরে, বসো বসো! অ্যাদ্দিন বাদে হটাৎ কী মনে করে?

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নবীনকুমারের সহপাঠী ছিল হিন্দু কলেজে, কিছুদিন সে বিদ্যোৎসাহিনী সভাতেও যোগ দিয়েছিল উৎসাহের সঙ্গে। তারপর বেশ কিছুদিন তার দেখা নেই। কৃষ্ণকমল যেমন মেধাবী, তেমনই খেয়ালী।

কৃষ্ণকমল বললো, কেমন দেশোদ্ধার কত্তে মেতেচো, তাই দেখতে এলুম।

নবীনকুমার বললো, একটু বসো, কৃষ্ণকমল। আমি হাতের এই কাজটা সেরে নি আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কতা কইবো।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে, কপি বয়কে ডেকে তার হাত দিয়ে সেটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নবীনকুমার বললো, কৃষ্ণকমল, তুমি এসেচো বড় ভালো হয়েচে, তোমার মতন একজনকেই খুঁজচিলুম!

—ঘরে হুঁকো-গড়গড়া কিছুই রাখোনি?

—আমি তো ধূমপান করি না।

—তুমি না হয় নাই কল্লে, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের জন্য তো অন্তত রাকবে, সম্পাদকের ঘরে কত রকম মনুষ্য আসবে।

—এখুনি আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা কচ্চি!

– থাক, থাক, আপাতত নস্যিতেই কাজ চালাই। ভট্টাচার্যি বংশের ছেলে, সঙ্গে সব সময় নস্যির ডিবেটা রাকি।

—তা ভট্টাচার্যির বংশের সন্তান হয়েও তুমি তো পুরোপুরি নাস্তিক শুনিচি! আরও কী কী যেন কচ্চো, যা ঠিক ভট্টাচার্য-সুলভ নয়?

—আরে, নাস্তিক হয় বামুনরাই। চাঁড়াল কখোনো নাস্তিক হয় না। বামুন ব্যাটারা তো জানে যে অন্য জাতের লোকদের ভগবানের নাম করে খুব ভয় দেকাচ্ছি বটে, আসলে ভগবান-টগবান কিচু নেই। মন্দিরের পুজোরিরা দেকবে টপ করে ঠকুরের প্রসাদ এঁটো করে খেয়ে নেয়।

—হা-হা-হা-হা।

—তোমরা কায়েতরা আর বেনেরা ধূমধাম করে মা-বাপের ছেরাদ্দ যজ্ঞ করো, ব্রাহ্মণকে গোরু-বাছুর দান করো। কত না যেন পবিত্র পুণ্যের কাজ! আর সে বামুন বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কশাইয়ের কাচে বিক্কিরি করে দেয়।

—হ্যাঁ। ছেলেবেলায় এ রকম দেকিচিলুম বটে, তখন রাগ করে সেই বামুনের টিকি কেটে নিইচিলুম। যাক সে কতা। তুমি এসে পড়েচো, তোমাকে আমার দরকার।

কৃষ্ণকমল দীর্ঘাঙ্গ, কৃশকায়, গাত্রবর্ণ মাজা মাজা, এই বয়েসেই একটু একটু টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু গুম্ফটি বেশ পুরুষ্টু। পরনে ধুতি, বেনিয়ান ও চায়না কোট, পায়ে তালতলার চটি। ওষ্ঠে একটু যেন বিদ্রূপ হাস্য সব সময় লুকিয়ে থাকে।

এক টিপ নস্য নাকে ঠুসে দিয়ে সে বললো, আমার মতন লোককে তোমার কী দরকার পড়লো বলো তো?

—তুমি 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামে একখানা বেশ সরেশ গ্রন্থ রচেচিলে, পড়ে বড় মজা পেয়েচিলুম। আর তো বাংলায় তেমন লিকলে না! তোমার মতন

বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী লোককে আমাদের চাই। তোমরা কলম ধরলে দেশের অনেক উপকার হবে। তুমি আমাদের কাগচের জন্য লেগে পড়ো না!

—হুঁ, তোমার কাগচ দেশসেবার বিষয়ে অনেক বড় বড় কতা থাকে তো দেকিচি। তা এ জন্য তোমার কত খর্চা হচ্ছে?

—খর্চার কতা ভাবলে কি কোনো ভালো কাজ হয়?

—সাহেব ব্যবসায়ীরা তোমার কাগচে বিজ্ঞাপন দেয় না। অর্থাৎ রেভিনিউ নেই। সবটাই তোমার পার্স থেকে যাচ্চে তাই না?

—কাগচ ঠিক মতন চললে ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন ঠিকই দেবে।

—বাংলা কাগচে? হেঃ!

—কৃষ্ণকমল, তুমি বিশ্বাস করো না বাঙালী ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে? ইংরেজিতে ভালো ন্যুজ পেপার হয় আর বাংলায় আমরা তেমন পারি না?

—ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা গুড়গুড়ে ভট্চার্যের মতন খিস্তি-খেউড় ছাড়ো, কাগচ চলবে। তোমার এই বড় বড় আইডিয়ালিজ্ম-এর কথা ক'জন বুঝবে? দেশাত্মবোধ, হুঁঃ, ক'জন লোক জানে দেশ কাকে বলে?

—কৃষ্ণকমল, তুমি কি আমায় নিরাশ করে দেবার জন্যই আজ এখেনে এসোচো! তোমার এ সব বিনি পয়সার উপদেশ আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার কাগচে লিকবে কি না?

—পয়সা পেলে লিকতে পারি বটে।

—পয়সা পাবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা করচো শুনিচি, তোমার কি এমনই পয়সার অভাব যে লেকার আগেই পয়সার কথা মনে এলো?

—পয়সার চিন্তা কার নেই! স্বয়ং লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত বলেন যে সরকারি ফাণ্ডে টাকার অভাব। তোমাদের মতন দেশের উপকার করবার জন্য আমি মাতা ফাটাফাটি করতে রাজি নই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য যাঁরা উজিয়ে বেড়াচ্চেন বেড়ান, আমি প্রফেশনাল মানুষ।

—বেশ ভালো কতা। প্রফেশনাল লেখক হিসেবেই তুমি আমাদের নতুন কী দিতে পারো? সাহেব-সুবোর গল্প কিংবা বিলেতি চালের বাংলা আমার চলবে না।

—তুমি দেশীয় বিষয় চাও। এ দেশের কোতায় কী কাণ্ড ঘটেচে তুমি কতটুকু জানো? তুমি এমন কোনো স্থানের কতা জানো, যেখেনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া করে, নাচে গায়?

—হাজার হাজার নারী-পুরুষ?

—তার বেশী ছাড়া কম নয়। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশী, এক পুরুষের পাশে তিন-চারজন যুবতী—

—এ সব কী গাঁজাখুরি চালাচ্চো, কৃষ্ণকমল? নারী-পুরুষ প্রকাশ্য স্থানে বসে আহারাদি করবে? এ কি তোমার সাধের ইংলণ্ড না সুদূর আমেরিকা? হিন্দুস্তানে এমন সম্ভব নয়।

—হিন্দুস্তান বাদ দেও, কলকেতা থেকে মাত্র ষোল ক্রোশ উত্তরেই এমন হয়, আমি নিজের চক্ষে দেকে এসিচি। রেলযোগে কাঁচড়াপাড়া চলে যাও, তার কাচেই ঘোষপাড়া গ্রাম। সেখানে প্রতি দোল-পূর্ণিমায় আউলে সম্প্রদায়ের মেলা বসে। আউলে সম্প্রদায়ের নাম শুনেচো? শোনোনি? অথচ দেশের অবস্থা বদলাতে চাও? সেইজন্যই বলচিলুম, ক'জন জানে দেশ মানে কী?

—বাংলায় হিন্দুদের কত সম্প্রদায় আচে। তার মধ্যে সব কটি সম্প্রদায়ের

পরিচয় না জানলেই দেশকে জানা হলো না?

—নবীন, তোমায় একটু ক্ষেপাচ্ছিলুম। আমি নিজেই কি ছাই জানতুম? নেহাত গতবারে গিয়ে পড়িচিলুম। সে দেকি যে ষাট সত্তর হাজার মানুষের মেলা। তার মধ্যে চোদ্দ আনাই স্ত্রীলোক। কুলকামিনীরা আর অমন ধেই ধেই করে মেলায় যাবে এমন বিশ্বাস হয় না, মনে হলো বেশ্যার সংখ্যাই বেশী। কেউ হত্যে দিয়ে আচে, কেউ পুজো দিচ্চে, কেউ বা নাচা-গানা করে চলেছে, আবার কেউ বা নিজের লোককে বোবা সাজিয়ে 'বোবার কথা হোক' বলে রোগ আরামের ভেল্কি দেকাচ্চে!

—এত লোক এক সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আউলে সম্প্রদায়ের কর্তা এখন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। তার সঙ্গে দেকা করতে গিয়ে দেকলুম, কর্তাবাবু একটা শয্যায় শয়ন করে আচেন আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে বসে কেউ পদসেবা কচ্চে, কেউ গা টিপে দিচ্চে, কেউ মুখে সন্দেশ তুলে দিচ্চে, কেউ অঙ্গে চন্দন লেপচে আর কেউ গলায় মালা পরাচ্চে। বেড়ে ব্যাপার। কর্তাবাবু আমার সঙ্গে কতা বলার সময়ই পেলেন না। শুনলুম নাকি বৃন্দাবনের কেষ্টলীলার মতন এখানেও স্ত্রীলোকদের বস্ত্রহরণ হয়!

—কৃষ্ণকমল, তোমার ঝোঁকটা কোন দিকে বলো তো? তুমি যেন আদি রসের ব্যাপারে বেশী মজা পেয়েচো? আমার কাগচে ওসব আমি প্রচার কত্তে চাই না।

—ওঃ হো, তোমার বুঝি আদি রসের দিকে ঝোঁক নেই। ঐ যে হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাজারে ছেড়োচো, তাতে তো আদিরসের টিপ্পনী কম নেই!

—ওটা, ওটা—

—বুঝিচি, ওটাও সমাজসংস্কার! শোনো, আমি এই মেলার কতা সবিস্তারে বললুম কেন জানো? ঐ মেলাটা দেকে আমি মুগ্ধ হয়িচি। শুধু আদিরসের জন্য নয়, এই প্রথম আমি একটা মেলা দেকলুম, যেখানে কোনো জাতিভেদ নেই। এখানে হিঁদু-মোছলমান সব সমান। মোছলমান এখানে সানন্দে বামুনের মুখে অন্ন দেয়, বামুন আহ্লাদ করে খায়। সদগোপ, কলু, মুচি, বৈষ্ণব সব ওখেনে এক। এমনকি নারী-পুরুষেরও প্রভেদ নেই। অবস্থাবৈগুণ্যে যে-সব অবলা নারী বেশ্যা হয়েচে, তাদেরও কেউ ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাকে না! এ যেন এক মহামিলন মেলা। এ কতা সারা দেশকে জানাবার দরকার নেই?

- বেশ তো তুমি লিকে দাও!

কৃষ্ণকমল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে আসতে লাগলো পরিদর্শকের সম্পাদকীয় দফতরে। কিন্তু গাল-গল্পই করে, লেখার ব্যাপারে অলস। ঈষৎ ঝাঁঝালো বিদ্রূপ মিশ্রিত গল্প বলায় তার জুড়ি নেই, কাজ বন্ধ করে নবীনকুমারকে শুনতে হয়।

নবীনকুমার তাকে লেখার জন্য তাড়া দিলেই সে বলে, আরে দাঁড়াও, তোমার কাগচ ভালো করে চলুক। আগে দেকি, তোমার এলেম কতদূর! এর মধ্যে কত টাকা গলে গ্যাচে, ঠিক করে বলো তো ভাই?

নবীনকুমার এই শেষের কথাটিতে অপ্রসন্ন হয়। সে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, ও প্রসঙ্গ তুলো না। আমি টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে চাই না!

হরিশের মতন কৃষ্ণকমলও বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করলো নবীনকুমারের মানস-জগতে, যদিও হরিশের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের অনেক প্রভেদ। হরিশ যথেষ্ট কৃতবিদ্য হয়েও তার মধ্যে সব সময় জ্বলন্ত ছিল দুর্বার দেশপ্রেম এবং তীব্র প্রাণশক্তি। হরিশের কর্মচাঞ্চল্য অন্যদেরও জাগিয়ে দিত। সেই তুলনায় কৃষ্ণকমল শুধুই বুদ্ধিজীবী, তার মধ্যে কর্মের উদ্যম নেই, বরং অন্য সকলের সশ্লেষ সমালোচনা করতে সে খুব পারদর্শী।

কিছুদিন আগে কৃষ্ণকমলের দাদা রামকমল আত্মহত্যা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র এবং রূপবান, গুণবান রামকমল স্বহস্তে নিজের জীবনের অবসান ঘটানোয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্মিত হয়েছিলেন। ইদানীং-কালের মধ্যে এরকম ঘটনা আর শোনা যায়নি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এই মানব-জীবন, তা কেউ নিজের হাতে নষ্ট করে? দাদার মৃত্যুর পর থেকে কৃষ্ণকমল যেন আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে, সব কিছুর প্রতিই তার বিদ্রূপ হাস্য। একমাত্র রমণীদের প্রসঙ্গ উঠলেই সে সরস হয়ে ওঠে।

'পরিদর্শক' কার্যালয়ে সে নিয়মিত আসতে লাগলো কিন্তু তার লেখার নামটি নেই। একদিন সে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি যুবককে সঙ্গে করে এনে নবীনকুমারকে বললো, এ বেশ কবিতা-টবিতা লিখচে, দ্যাখো না, একে কোনো কাজে লাগাতে পারো কি না! আর একদিন সে বললো, দেবেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রকে কিছু লিখতে বল না! দ্বিজেন্দ্র তোমার-আমার সমবয়েসী হবেন বোধ করি, মগজে বিদ্যা-বুদ্ধি কিঞ্চিৎ আছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বিদ্যাসাগর 'পরিদর্শক' কার্যালয় দেখতে আসবেন শুনে কৃষ্ণকমল তড়িঘড়ি পায়ে চটি গলিয়ে বললো, তা হলে আমি উঠি।

নবীনকুমার অবাক হলো। সে জানতো, কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয় পাত্র, শিশু কৃষ্ণকমলকে বিদ্যাসাগর নিজে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কেন, বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেকা করে যাবে না?

কৃষ্ণকমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না হে, উনি আমায় দেখলে ব্যাজার হবেন। কেন আর মিছামিছি ওঁর বকুনি শুনি!

—কেন, উনি তোমায় বকবেন কেন?

—কারণ আচে। তুমি জানো না, উনি চেয়েছিলেন আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হই? তাতে আমার রুচি হয়নি। ওঁর আদেশ আমি মানি নি!

—সে তো অনেকদিন আগের কথা। উনি তো পুরোনো রাগ পুষে রাখেন না!

—ইদানীং অন্য একটি কারণেও উনি খুব কুপিত হয়ে আচেন আমার ওপরে। বীরসিংহার ঐ ব্রাহ্মণটির একটা দোষ কি জানো, যার সঙ্গে নিজের মত না মিলবে, তাকেই আর উনি সহ্য করতে পারেন না।

—কিন্তু উনি তো অন্যায্য বিষয়ে রাগ করেন না। তোমার ওপর কোন্ কারণে

রাগ করেছেন?

—সেটি এখন বলা হচ্ছে না! আমি যাই!

বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়েই চলে গেল কৃষ্ণকমল।

একটু পরেই এলেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সংবাদ-পত্র-পরিচালনার কাজকর্ম। তারপর বললেন, সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তোমার এই উদ্যমের খুবই প্রশংসা করেছেন। এখন দেখছি, তিনি অতিরঞ্জন করেন নি মোটেই। তবে এটিকে টিকিয়ে রাখাই দরকার।

নবীনকুমারের মাথায় কৃষ্ণকমলের কথাটাই ঘুরছিল। সে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কৃষ্ণকমলকে পচন্দ করেন না?

বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। উদাসীনভাবে বললেন, লোকে ভাবে আমি যা বলবো কৃষ্ণকমল বুঝি তা সবই শুনবে। আসলে সে আমাকে মোটেই মানে না।

পরদিন কৃষ্ণকমল আবার আসতেই নবীনকুমার তাকে চেপে ধরলো। সে বললো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে তোমার কী নিয়ে মনোমালিন্য হয়েচে, তা বলতেই হবে। ঐ চিন্তাটা কিচুতেই মাতা থেকে তাড়াতে পারচি না।

কৃষ্ণকমল হেসে বললো, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন, নবীন?

নবীনকুমার বললো, আমার কৌতূহল তোমার ব্যাপারে নয়, আমার গুরু কোন্ কারণে তোমার মতন প্রিয়জনের ওপরেও রাগ করেন সেইটি শুধু আমি জানতে চাই।

কৃষ্ণকমল বললো, সেটি জানতে হলে তোমাকে এক স্থানে যেতে হবে আমার সঙ্গে। তুমি যেতে পারবে?

নবীনকুমার বললো, কোথায়?

কৃষ্ণকমল বললো, সে যে-স্থানেই হোক না কেন, তুমি যেতে পারবে কি না বলো?

নবীনকুমার বললো, কেন পারবো না? আমি পুরুষমানুষ হয়ে এমন কোন্ স্থান আচে, যেখেনে যেতে পারি না?

—তা হলে আগে কাজ সেরে নাও!

রাত্রি ন'টায় পরিদর্শক কার্যালয় থেকে বেরুলো দু'জনে। জুড়ি গাড়িতে উঠেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করে দিল কৃষ্ণকমল। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ-এর সে খুব ভক্ত, প্রায়ই সে কোঁৎ-প্রচারিত পজিটিভিজম তত্ত্ব বোঝাতে চায় নবীন-কুমারকে। নবীনকুমারের অবশ্য দর্শনের জটিল ব্যাপার নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করার তেমন আগ্রহ নেই।

কৃষ্ণকমল বললো, দ্যাখো, ইংরেজি মাসের নামগুলি যে ঠাকুর দেবতাদের নামে, এটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে কোঁৎ একটা চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বৎসর ভাগ করেছেন তের মাসে, প্রত্যেক মাসের নাম হবে মোজেস, হোমর, আরিস্টট্ল, আর্কিমিডিস, শেক্সপীয়র, এ'দের নামে।

নবীনকুমার বললো, তা বেশ তো। কিন্তু আমাদের বেদব্যাস, বাল্মীকি এ'রা কি দোষ কল্লেন? ব্যাস-বাল্মীকি কি হোমর-শেক্সপীয়রের চেয়ে কিছু খাটো?

—কোঁৎ সারা মাসটা ভাগ করেছেন আঠাশ দিনে। প্রত্যেক দিনের নামও হবে এক একজন মহাপুরুষের নামে। মনু, মুহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন, কলম্বাস এ'রা।

—তা আগে থেকে এই সব মহাপুরুষদের নামে মাস আর দিনের নাম ঠিক করে ফেললে. ভবিষ্যতেও যে এ'দের চেয়ে আরও বড় মহাপুরুষ জন্মাবেন না, তার কোনো ঠিক আছে? তখন আবার নাম বদলাবে? তা ছাড়া এই নাম নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের লোক একমত হবে কেন?

—আমি কোঁৎ-এর মতটিই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

—আমি কিন্তু ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চেয়ে সম্রাট অশোককে বড় বলবো। আমরা এখন কোতায় যাচ্চি বলো তো?

—আমি কোচোয়ানকে বলে দিয়েছি। শোনো, জন স্টুয়ার্ট মিল এই পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো? এতে পরস্পর-বিরোধী. বিভিন্ন মতা-বলম্বী এমন সব ব্যক্তিদের নাম পাশাপাশি রাখা হয়েছে যারা জীবিত অবস্থায় দেখা হলে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করতেন নিশ্চয়ই। কোঁৎ-এর এই যে বিশ্ব মানবিক উদার মনোভাব. এটি পৃথিবীর আর কোন দার্শনিকের মধ্যে দেখেছো? ডিস্টিংক-শান অফ ফাংশান, অর্থাৎ কর্মে অধিকার ভেদ কোঁৎ-এর একটা প্রধান কথা।

গাড়ি এসে থামলো এক জায়গায়। পিছন থেকে দুলাল এসে জিজ্ঞেস করলো, এবার কোন্ দিকে যাবো?

কৃষ্ণকমল বললো. সামনের গলিতে লাল বাড়িটির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে নবীনকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্দিহান হলো। এ যে রামবাগানের কু-পল্লী। কোঁৎ-শিষ্যের এখানে কী জন্য আগমন? বিশ্বের সমস্ত সতী রমণীদের সম্মানার্থে কোঁৎ চার বৎসর অন্তর বিশেষ একটি দিনে সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে একটি উৎসবের প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই কোঁৎ-এর শিষ্য হয়ে কৃষ্ণকমল অসতী নারীদের কাছে এলো কেন এত রাত্রে?

লাল রঙের বাড়িটির দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল বললো. এসো, তিন-তলায় যেতে হবে।

কোনো আপত্তি না জানিয়ে নবীনকুমার তাকে অনুগমন করলো।

আলো ঝলমল কক্ষ এবং রমণীকণ্ঠের নির্লজ্জ হাস্যধ্বনি শুনে বাড়িটির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

ওপরে উঠে এসে একটি বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকমল ডাকলো. প্রমদা, প্রমদা।

চওড়া লালপেড়ে ধনেখালির শাড়ি পরা এক যুবতী দ্বার খুলে ওদের দেখে একটু সরে দাঁড়ালো।

ঘরের মধ্যে একটি মোটা জাজিম পাতা. আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দেওয়া কয়েকটি চেয়ার। জুতো না খুলে ধুতির কোঁচাটি বাঁ হাতে ধরে নবীনকুমার গিয়ে বসলো একটি চেয়ারে। এখনো যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। পূজারী ব্রাহ্মণের সন্তান. পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিভোর কৃষ্ণকমল এরকম বাড়িতে যাতায়াত করে। অথচ নানা প্রসঙ্গে সে কৃষ্ণকমলের মুখে শুনেছে যে সে মদ্যপানের ঘোর বিরোধী।

যুবতীটির মুখ মাত্র এক ঝলক দেখেছে নবীনকুমার। এখন সে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরের এক কোণে।

কৃষ্ণকমল বললো, একটু চা পান করবে নাকি, নবীন?

নবীনকুমার সবেগে দু'দিকে মাথা আন্দোলিত করলো। বাড়ির বাইরে কোথাও সে পারতপক্ষে কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি একটু চা পান করবো। প্রমদা, একটু চায়ের জোগাড়ে লেগে পড়ো তো!

যুবতীটি একটি দরজার পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের কক্ষে।

কৃষ্ণকমল বললো, আমি ওকে চা প্রস্তুত করা শিকিয়েচি। এ বাড়ির অন্য কোনো স্ত্রীলোক চা কী দ্রব্য তাই আগে জানতো না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে সংশোধনের ভঙ্গিতে আবার বললো, অবশ্য প্রমদাকে তুমি এ বাড়ির অন্য স্ত্রীলোকদের মতন মনে করো না। সে কোনো এক মর্যাদা-সম্পন্ন ভদ্রবাড়ির মেয়ে। বালবিধবা। পরিবারের কয়েকটি অমানুষের অত্যাচারে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমার এক পরিচিত লোকের সাহায্যে এখানে এসে উঠেছে। প্রমদা বিশেষ গুণবতী। আমি তাকে বিবাহ করবো ঠিক করেছি।

—বিবাহ করবে?

—কেন, তোমারও আপত্তি আছে নাকি?

—তোমার তো একটি পত্নী বর্তমান!

—তা থাক না। আমার একটি পত্নী আছেন বটে কিন্তু তিনি আমার সহধর্মিণী নন। তাই আমি প্রমদাকে সহধর্মিণী করতে চাই। তাতেই তোমার গুরুর ঘোর আপত্তি! এইবার বুঝলে তো!

নবীনকুমার হাসলো।

কৃষ্ণকমল আবার বললো, তিনি বিধবা বিবাহের প্রতিষ্ঠাতা অথচ এই বিধবা রমণীটিকে আমি গ্রহণ করতে চাই শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

নবীনকুমার বললো, আমার গুরু যে আপত্তি কর্বেন তা জানি। তিনি বিধবা বিবাহের নামে পুরুষের একাধিক বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তোমার মতন ঘোর নাস্তিক এবং পজিটিভিস্ট যে হঠাৎ বামুন পন্ডিতদের ধারা অনুসরণ করে একাধিক বিয়ে করতে চাইবে, তাতে আশ্চর্য হচ্চি। তোমার গুরু ফরাসী কোঁৎ সাহেব বেঁচে থাকলে কী বলতেন? তিনি একাধিক বিবাহ সমর্থন কত্তেন?

—কোঁৎ-এর জীবনেও একজন ক্লোটিল্ড নাম্নী রমণী ছিলেন, তা জানো না বুঝি?

—মাদাম ক্লোটিল্ড-কে দার্শনিক কোঁৎ কোনোদিন সামাজিকভাবে বিবাহ করেচিলেন, এমনও তো শুনিনি!

—শোনো, তাঁর মতে বিবাহ তিন প্রকার। প্রথম তো হলো সিভিল ম্যারেজ, যাতে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, দম্পতির মনের অমিল হলে সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় হলো তোমার রিলিজিয়াস ম্যারেজ, ধর্মের নামে বিবাহ, যা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন। এই বিবাহের পর শুধু বিধবা নয় বিপত্নীক পুরুষও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না। আর এক রকম বিবাহকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন চেইস্ট ম্যারেজ। এ বিবাহে স্ত্রী পুরুষের মানসিক মিল হলে তবেই তারা একত্র বাস করবে কিন্তু সহবাস করবে না। আমি প্রমদাসুন্দরীকে এই চেইস্ট বিবাহ করতে চাই। পারস্পরিক সাহচর্যই বড় কথা।

—তাতে বাধা কোতায়?

—মুশকিল কি জানো, এ দেশের লোককে তো চেনো তুমি, তারা এর মর্ম বুঝবে না। মনে করবে, আমি বুঝি অন্য ভড়ং করে একটি উপপত্নী রেখেছি।

তাই একে একটা সামাজিক বিবাহের আবরণ দিতে চাই।

নবীনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার চেইসট বিবাহ মাথায় থাক, আমিও ওতে বিশ্বাস করি না। আমিও বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে একমত। কৃষ্ণকমল, আমি আর তোমার সংসর্গে থাকতে চাই না। চল্লুম্!

—আরে, আরে, দাঁড়াও, অত চটলে কেন?

কিন্তু নবীনকুমার আর অপেক্ষা করলো না। সিঁড়ি দিয়ে জুতো মশমশিয়ে, কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে নেমে এলো নিচে। তার শরীর কিস্‌কিস করছে বিরক্তিতে! চেইস্‌ট ম্যারেজ না ঘোড়ার ডিম!

পরিদর্শক নিয়ে কয়েক মাস উঠে পড়ে লেগে থাকলেও নবীনকুমার কাগজটিকে ঠিক দাঁড় করাতে পারলো না। কেচ্ছা-খেউড় পড়ায় যারা অভ্যস্ত তারা পরিচ্ছন্ন সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী নয়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজ কিছুতেই বাংলা কাগজ পড়তে চায় না। ইংরেজি সংবাদপত্র বাড়িতে না রাখলে তাদের মান যায়। যাদের একাধিক পত্রিকা রাখার সামর্থ্য আছে তারাও মনে করে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করলে অন্য লোকেরা বুঝি তাদের কম শিক্ষিত মনে করবে।

কিন্তু নবীনকুমারের জেদ, পরিদর্শক সে চালাবেই। কাগজের চাহিদা যত কমতে লাগলো ততই সে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দিতে লাগলো। কমতে কমতে দাম হলো এক পয়সা। এর পর বোধহয় সে বিনা পয়সায় বিলি করবে। অর্থ ব্যয় হতে লাগলো জলের মতন।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ পর্যন্ত সচকিত হলো। বেঙ্গল ক্লাব নামে সাহেবদের বিখ্যাত একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাববাড়িটি এবং জমির মালিক নবীনকুমাররা। খুব মূল্যবান সম্পত্তি। নবীনকুমার সেই বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ি-জমি বিক্রয় করে দিতে চায়।

গঙ্গানারায়ণ একদিন নবীনকুমারকে ডেকে বললো, তুই এ কি ঠিক করিচিস, ছোট্‌কু? ওদিকে জমির দাম যে হু-হু করে বাড়চে। এসপ্লানেড ছাড়িয়ে সাহেবরা পার্ক স্ট্রিটের দিকে বিস্তর বসতি কচ্চে, ওদিকে যে দু' চারদিন বাদে জমি হবে সোনা!

নবীনকুমার বললো, উপায় কী, দাদামণি! তোমার তবিল যে শূন্য দেকচি! আমার এখন অনেক টাকার দরকার।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই যে-ভাবে টাকা ব্যয় কচ্চিস, তত টাকা আসবে কোতা থেকে! গত পাঁচ মাসে তুই এক লক্ষ টাকার ওপরে নিয়িচিস!

—আমার আরও টাকা লাগবে। তুমি দেকলে তো দাদামণি, হরিশ যেই মলো, অমনি বেমালুম সব্বাই তাকে ভুলে গেল। তার কাজ তো কারুকে না কারুকে চালিয়ে যেতে হবে? এখন টাকার জন্য চিন্তা কল্লে চলে? তুমি বরং একবার জমিদারি দেকতে বেরোও, দ্যাকো যদি আদায় পত্তর কিছু যদি বাড়ানো যায়। দাদামণি, তুমি কি আমায় হার মানতে বলো?

অনেকদিন পরে গঙ্গানারায়ণ গেল বিধুশেখরের সঙ্গে দেখা করতে। বিধুশেখর ইদানীং প্রায়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী থাকেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছু বলেন না। কয়েকদিন হলো তাঁর পীড়া খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুহাসিনী সেই সংবাদ দিয়ে সকালবেলা লোক পাঠিয়েছিল।

কবিরাজ ছাড়া অন্য কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করান না বিধুশেখর। গঙ্গানারায়ণ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে বহুমূত্র রোগের খুব ভালো চিকিৎসা আছে অ্যালোপ্যাথিতে, সেই একজন চিকিৎসক ডাকলে বিধুশেখরের যন্ত্রণার উপশম হবে।

বিধুশেখর উদাসীনভাবে বললেন, আর কী হবে, আমি তো এখন দিন গুণচি, আর এই শেষ সময় শ্লেচ্ছ ওষুধ গলায় দিয়ে কী হবে!

আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর গঙ্গানারায়ণ খানিকটা ইতস্তত করে বললো, জ্যাঠাবাবু, আপনাকে আর একটা কতাও জানানো দরকার বোধহয়। আমাদের ছোট্কু এক সঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ হাতে নিয়ে নিয়েচে, এমন দু' হাতে টাকা খরচ কচ্চে যে আর বুঝি সম্পত্তি রাখা দায়। আমি তো কোনো দিকে তাল সামলাতে পাচ্চি না।

জীর্ণ শরীরখানা একটু কাত করে বিধুশেখর মুখ উঁচু করলেন। তাঁর বিবর্ণ ওষ্ঠে একটু যেন হাস্যের ছায়া দেখা গেল। চোখে জ্বলে উঠলো আগ্রহ। এতদিন পরে সিংহ বাড়ির এই উদ্ধত যুবক তাঁর কাছে এসেছে বিষয়-সম্পত্তির জন্য পরামর্শ নিতে! তিনি জানতেন, আসতেই হবে একদিন না একদিন।

সমস্ত বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর মন্তব্য করলেন, ওর ঐ দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেবার জন্য কৌশল করো। আর, নবীনকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারো আমার কাচে? তাকে অনেকদিন দেখিনি, একবার দেকতে সাধ হয়।

কিন্তু নবীনকুমার বিধুশেখরের কাছে যাওয়ার সময় পেল না এবং সত্বর বেঙ্গল ক্লাবের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিল।

গঙ্গানারায়ণকে কোনো কৌশল করতে হলো না অবশ্য, তার আগেই শেষ দশা ঘনিয়ে এলো পরিদর্শক সংবাদপত্রের। শুধু অর্থব্যয় করেই তো পাঠকদের মন বদল করা যায় না। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা দাঁড়ালো যে ঐ পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয় দেড়শত ব্যক্তিকে আর নগদ মূল্যের ক্রেতা মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। বাণ্ডিল বাণ্ডিল অবিক্রিত কাগজ স্তূপাকার হয়ে থাকে। এমনকি কর্মচারীরাও আড়ালে হাসাহাসি করে মালিককে নিয়ে। যে কাগজ পাঠকরা কিনে পড়ে না, সে কাগজের জন্য মন দিয়ে লিখতেই বা ইচ্ছে করে কার? পত্রিকার মানও কমতে লাগলো দ্রুত।

কৃষ্ণকমলের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, তবু আর একদিন নিজে থেকেই এসে বিদ্রূপ করে গেল সে। পঁয়তাল্লিশ জন, অ্যাঁ? এদের নিয়ে তুমি দেশোদ্ধার করবে আর সমাজ বদলাবে! তোমাদের এই এক মুঠো সমাজ নিয়েই যত নাচানাচি। আসল দেশটাকে তোমরা কেউ এখনো চিনলে না!

নবীনকুমার ক্ষুব্ধ ভাবে বললো, বাঙালীরা বাংলা কাগজ পড়বে না, শুধু ইংরেজি কাগজ পড়বে? এটা কী রকম কথা?

কৃষ্ণকমল হাসতে লাগলো।

পরিদর্শক যে-দিন বন্ধ হয়ে গেল সেদিন নবীনকুমার বাড়ি ফিরলো মধ্যরাত্রে। নিজের পায়ে ভর দিয়েও ফিরতে পারলো না সে। দুলাল এবং আরও দু', একজন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো অন্দর মহলে। নেশার ঘোরে সে সংজ্ঞাহীন।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন দু' হাত উজাড় করে উপহার দিতে শুরু করেছেন মধুসূদনকে। এক সঙ্গে এতদিকের সার্থকতা খুব কম মানুষের জীবনেই আসে।

মাত্র তিন বছর সাহিত্য রচনা করেই এত সুনাম, এত যশ কে কবে পেয়েছে? পুলিস-আদালতের এই দোভাষীটির নাম এখন সকলের মুখে মুখে। সকলেরই কৌতূহল, কে এই মাইকেল মধুসূদন। এই ম্লেচ্ছের রচিত কবিতা পাঠ করে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণীদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। তাঁর জনপ্রিয়তা যে কতদূর পৌঁছেচে তা একদিন নিজের চোখেই দেখলেন মধুসূদন। চীনেবাজার দিয়ে তিনি এক সকালে পদব্রজে আসছিলেন, দেখতে পেলেন এক মুদিখানার মালিক নিবিষ্টভাবে একটি বই পড়ছে। লেখক মাত্রই নিজের বইয়ের দিকে একপলক নজর দিলেই চিনতে পারে। মধুসূদন বুঝতে পারলেন, সেই বইটি মেঘনাদবধ কাব্য। লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মধুসূদন জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়, কী বই পাঠ কচ্চেন, জানতে পারি কি? মুদিটি চোখ তুলে হ্যাট-কোটধারী কালোকোলো ফিরিঙ্গিপারা লোকটিকে দেখে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, মশায়, এই বইয়ের ভাষা আপনি বুঝবেন না। এ এক অপূর্ব কাব্য! আহা কী লিকেচেন! 'বাঁচালে দাসীরে আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন!'

এমনকি বই লিখে বেশ দু পয়সা আয় হচ্ছে মধুসূদনের। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে তাঁর সব রচনা, এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মেঘনাদের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাতে দীর্ঘ, জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে উদীয়মান এক কবি। এই যুবক কবিটি যথেষ্ট পণ্ডিত। বি এ পাস।

পিতৃ সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা চলার পর এই সময় জয়ী হলেন মধুসূদন। খিদিরপুরের বাড়ি. সুন্দরবনের জমিদারি সমেত.অনেক কিছুই তাঁর হস্তগত হলো। অর্থ-কষ্ট কাটলো এতদিন পর। রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র বহুকাল পর আবার যথেচ্ছ টাকা ওড়াবার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন। লোয়ার চিৎপুরের বাড়ি ছেড়ে মধুসূদন চলে এলেন খিদিরপুরে, পৈতৃক বাড়িটির ভগ্নদশা বলে. কাছেই ভাড়া নিলেন বৃহৎ একটি উদ্যানবাটি। এর মধ্যে তাঁর দুটি সন্তান জন্মেছে। একজনের নাম রাখা হয়েছে শর্মিষ্ঠা, অন্যজনের নাম মিল্টন। সংসারে এখন সুখের অবধি নেই। কর্মের প্রবল উৎসাহে এখন তাঁর সুরাপানও পরিমিত।

এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও আর্থিক সচ্ছলতার সময়ে পুলিস আদালতের সামান্য চাকুরিটি চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো মানে হয় না। মধুসূদন কিছু দিন যাবৎ মনে মনে অন্য একটি চিন্তা নিয়ে খেলা করছেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর স্কন্ধে অন্য একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। হরিশের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট আর কিছুতেই ঠিক মতন চলছে না। নবীনকুমার তাই তার গুরু বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিল, আপনি এটার যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করুন। বিদ্যাসাগর মাইকেলকেই যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে তাঁকে ডেকে এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়ে গেছেন মধুসূদন, ধুতি

চাদর পরা এই খর্বকায় ব্রাহ্মণকে তাঁর মনে হয়েছে বঙ্গকুলচূড়ামণি। বিদ্যাসাগরকেই তাঁর সদ্য রচিত কাব্য 'বীরাঙ্গনা' উৎসর্গ করলেন সশ্রদ্ধ চিত্তে।

খিদিরপুরের বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্নে বসে লেখাপড়ার কাজ করছেন মধুসূদন। এমন সময় শুনতে পেলেন বাইরে পথে তুমুল বাদ্যধ্বনি ও লোকজনের কোলাহল। কৌতূহলী হয়ে তিনি এলেন জানালার ধারে। সহধর্মিণী হেনরিয়েটা এতদিনে সুন্দর বাংলা শিখে নিয়েছেন। স্বামীর কবিতা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই তিনি পাঠ করতে পারেন। একটি বই থেকে মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও কিসের শব্দ, ডিয়ার?

মধুসূদন পত্নীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, ডারলিং, এদিকে এসো, দেকবে এসো!

পথ দিয়ে চলেছে মহরমের সাড়ম্বর বর্ণাঢ্য মিছিল। মস্ত বড় রঙীন তাজিয়া, দুলদুল অশ্ব, অল্পবয়স্ক ছেলেরা কোমরে ছোট ছোট ঘণ্টা-সমন্বিত দড়ি বেঁধে, হাতে তলোয়ার বা লাঠি নিয়ে নকল যুদ্ধের অভিনয় করতে করতে চলেছে। আর বয়স্করা বুক চাপড়ে চাপড়ে বিলাপ করছে হায় হাসান, হায় হোসেন।

তিন বছরের শিশু শর্মিষ্ঠা এসে দাঁড়িয়েছে বাবা-মায়ের পাশে। বাইরে অত কোলাহল শুনে শর্মিষ্ঠা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সে তার রিনিঝিনি কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কাঁদচে কেন?

মধুসূদন কন্যাকে বক্ষে তুলে নিয়ে মহরম উৎসবের পশ্চাৎ-কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

হেনরিয়েটারও খুব আগ্রহ, তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা সেটা নিয়ে। মধুসূদন বললেন, অহো, কি মহান বিষাদ কাহিনী। জানো আরিয়েৎ, মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে কাব্য রচনা করে, তা হলে সে মহাকবির স্বীকৃতি পাবে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে সে সমগ্র মুসলমান জাতির মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে পারবে। আমাদের ধর্মে এমন তীব্র শোকের বিষয়বস্তু নেই।

হেনরিয়েটা হঠাৎ মুচকি হাসলেন।

মধুসূদন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, তুমি হাসলে যে!

হেনরিয়েটা বললেন, ইউ সেইড, 'আমাদের ধর্মে'!

এবার অট্টহাসি করে উঠলেন মধুসূদন। হাসতে হাসতে বললেন, মুখের কতায় ওরকম এসে যায়! হোয়াট আই মেণ্ট, হিন্দুদের ধর্মে! ব্রজাঙ্গনা লেকবার পর অনেকে আমাকে বোষ্টম বলতে শুরু করেচে! কিন্তু আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান।

একটু পরে মধুসূদন আবার বললেন, আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামে এরকম মহরমের উৎসব দেকিচি। সে স্মৃতি আমার মনে দেগে আচে। হাসান-হোসেনের দুঃখে আমিও কাঁদতুম। আহা, আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ আমার জন্ম-স্থান দেকলে না কখনো।

হেনরিয়েটা বললেন, তোমার জন্মস্থান দেকতে আমারও সাধ হয়। আই লাভ দিজ কিউট লিটল বেঙ্গালি ভিলেজেস।

—যাবে? তা হলে চলো!

—আমরা ক্রিশ্চিয়ান। গ্রামের লোকেরা আমাদের টলারেট কর্বে কি?

—আমার জন্মস্থানে যাবো, কে বাধা দেবে! ড্যাঙ্গডোঙ্গিয়ে চলে যাবো! আমি এখন সে গ্রামের জমিদার।

যে-কথা, সেই কাজ। সপরিবারে যশোরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন মধুসূদন। সংগে আরও অনেক লোক লস্কর। অর্থের কোনো অভাব নেই। যশোরে পেঁৗছে মধুসূদন ভাড়া করলেন একটি বৃহৎ বজরা। তারপর সেই বজরায় চেপে কপোতাক্ষ নদীবক্ষে চললেন সাগরদাঁড়ি গ্রামের দিকে।

সেই শৈশবের আকাশ। নদীর দু ধারে সেই চিরতরুণ তরুশ্রেণী, মধুসূদনের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগলো। হেনরিয়েটা একবার নিজের কামরা থেকে বাইরে এসে দেখলেন বজরার ছাদের ওপর মধুসূদন প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। জন্মভূমির সন্নিকটে এসে মধুসূদনের মনে পড়ে গেছে নিজের জননীর কথা। কত কষ্ট পেয়েই না তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন।

হেনরিয়েটা আর ডাকলেন না স্বামীকে।

একটু পরে শিশুপুত্র মিল্টনের জন্য দুধের প্রয়োজন হওয়ায় বজরা ভেড়ানো হলো এক স্থলে। দু জন পরিচালক গেল কাছাকাছি গ্রামে দুধের সন্ধানে। তাদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে বলে অতিব্যস্ত মধুসূদন নিজেই নেমে পড়লেন পাড়ে। অদূরে কয়েকটি ঘরবাড়ি দেখে সেদিকে এগিয়েছেন, অমনি তাঁকে দেখে গ্রামের লোকেরা ছুটে পালাতে লাগলো। কয়েকটি শিশু কেঁদে উঠলো তারস্বরে। এ রকম হ্যাট-কোট পরা কোনো ট্যাঁস ফিরিঙ্গি সেই গন্ডগ্রামে এ পর্যন্ত পদার্পণ করেনি। গ্রামের লোক ভেবেছে এ কোন্ গ্রহান্তরের প্রাণী।

মধুসূদনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি পাল্লা দিয়ে ছুটলেন ওদের সংগে। শেষ পর্যন্ত একটি লোককে ধরে ফেলে বললেন, ওরে, আমায় দেকে ভয় পাচ্চিস? আমি যে তোদেরই এখেনকার মধু। ছোটবেলায় আমিও যে তোদেরই মতন এখেনে খালি গায়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো মেখে খেলা করিচি। আমি এখুনো তোদের ভাষায় কতা কইতে পারি, দেকবি! খ্যাতি নাতি বেলা গেল, শুতি পাল্লাম না।

এক এক করে লোকেরা ফিরে এলো তাঁর কাছে। মধুসূদন এক একজনের গলা জড়িয়ে ধরে কুশল সংবাদ নিতে লাগলেন, পকেট থেকে মুঠো মুঠো টাকা বার করে বিলিয়ে দিতে লাগলেন শিশুদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা এত দুধ এনে উপহার দিল হেনরিয়েটাকে যা দিয়ে তিনি সপরিবারে সচ্ছন্দে স্নান সেরে নিতে পারেন।

গ্রামের স্বগৃহে মধুসূদনের ফেরা যেন মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাবর্তন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে এক সময় মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ রটে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যুর সংগে সংগে তাঁর বংশনাশ হয়ে গেল ধরে নিয়ে আত্মীয় পরিজনরা দখল করে নিয়ে নিল ঘরবাড়ি। সেই সব আত্মীয়স্বজন অবশ্য এখন বেশ সাদরেই বরণ করলো মধুসূদনকে। মধুসূদন দেখলেন, যে চন্ডীমন্ডপে বসে তিনি প্রথম বাংলা অ-আ-ক-খ শিখতে শুরু করেছিলেন, সে চন্ডীমন্ডপের এখন ভগ্নদশা। সেই বিশাল বাদামগাছটা অবশ্য এখনো টিঁকে রয়েছে। যার নিচে বসে তিনি প্রপিতা-মহের কাছ থেকে রামায়ণের কাহিনী শুনেছিলেন। সেই সব মনে পড়ে আর বারবার চক্ষে অশ্রু আসে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ ভিড় করে এলো মধুসূদনকে দেখবার জন্য। হেনরিয়েটা সম্পর্কে কৌতূহল আরও বেশী। ঐ স্বর্ণকেশিনী স্ত্রীলোকটি নদীর জলে পা ধুয়ে যখন ওপারে উঠে আসে, তখন সকলেরই সে দৃশ্যটি যেন অলৌকিক বোধ হয়। অমন গাত্রবর্ণ মানুষের হয়? আর ঐ শিশু দুটি? ঠিক

যেন দেব-শিশু!

বহুদিন পরে গ্রামে ফিরে মধুসূদন খুব আমোদে মেতে উঠলেন। খুড়ীমা জেঠীমা সম্প্রদায়ের যাঁরা এক সময় তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করতেন, তাঁরা এখন দ্বিধায় সঙ্কোচে দূরে সরে থাকলেও মধুসূদন নিজে গিয়ে হাজির হন তাঁদের ঘরে। কারুকে ডেকে বলেন, আমায় ভয় পাচ্ছো, খুড়ীমা? ছুঁয়ে দেবো কিন্তু। তা হলেই তোমার জাত যাবে। কী সুন্দর খিচুড়ি রাঁধতে তুমি খুড়ীমা, এখন একদিন রেঁধে খাওয়াবে না? কারুর কাছে গিয়ে বলেন, ও জ্যাঠাইমা, এতদিন পর তোমার হাতের পায়েস খাবো বলে এলুম, আর তুমি মুখ লুকিয়ে রইলে? কখনো বা হেনরিয়েটাকে সঙ্গে করে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে ঢুকে বলেন, কই গো, গাঁয়ে এলুম, তোমরা বউ বরণ কল্লে না? শাঁক বাজাও, বউয়ের সিথেয় সিঁদুর পরাও।

ছোট ছোট বালকদের ধরে ধরে কোলে পিঠে নিয়ে মধুসূদন বলেন, আয় বেটা, আমার মুখের এঁটো খাইয়ে তোর জাত মেরে দিই!

তিনি নিজেও যেন পুনরায় শিশু হয়ে গেলেন আটত্রিশ বছর বয়েসে।

কিছুদিন নিজের গ্রামে বাস করে মধুসূদন বেড়াতে গেলেন কাটিগ্রামে মামার বাড়িতে। জাহ্নবী দেবীর ভ্রাতা বংশীধর ঘোষ এখনো জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর সংসারের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। এতকাল পরে ভাগিনেয়কে দেখে তিনি একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মধুসূদনের প্রভূত খ্যাতির কথা পৌঁছেছে তাঁর কানে। তিনি জাতপাত তেমন মানেন না। মধুসূদনের হাত ধরে একেবারে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে একটি পালঙ্ক দেখিয়ে বললেন, ছোট্টবেলায় এই খাটে তোর মা আর আমি দুই ভাই-বোনে শুতাম, তুই এইখানে বোস, মধু!

মামা-ভাগ্নেতে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হলো।

বংশীধর ঘোষ তাঁর বাড়ির লোকেদের হুকুম দিয়ে দিলেন, তাঁর এই বিখ্যাত ভাগিনেয়কে সমস্ত আহার্য দ্রব্য পরিবেশন করা হবে স্বর্ণপাত্রে। সেই জন্য সিন্দুক খুলে সোনার থালা, ঘটি-বাটি-গেলাস বার করা হলো। কিন্তু অন্তঃপুরের মহিলারা অতখানি উদার হতে পারেন না, তাঁদের ধারণা, খৃষ্টান মধুসূদন ছুঁয়ে দিলে সেই সব স্বর্ণপাত্র আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাই গৃহকর্তার অগোচরে অন্য ব্যবস্থা হলো। বংশীধর হঠাৎ এক সময় দেখে ফেললেন, এক ভৃত্য স্বর্ণ-গাড়ুর বদলে মাটির কলসী থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে মধুসূদনের হস্ত প্রক্ষালনের জন্য। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ছুটে এসে তিনি এত জোরে এক লাথি মারলেন যে মূর্ছিত হয়ে গেল ভৃত্যটি। মহিলাদের উদ্দেশ করে তিনি বলতে লাগলেন, ছিঃ, এত নীচু মন তোমাদের? না হয় একসেট সোনার বাসনই নষ্ট হতো! আমার ভাগ্নের জন্য আমি এটুকু পারি না?

মধুসূদন মামার হাত ধরে তাঁকে থামিয়ে বললেন, মামা, করেন কী! করেন কী! মাটিতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে কলাপাতায় চাট্টি গরম ভাত খেতেই যে আমার সব চেয়ে বেশী আনন্দ হয়! সেই আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করেন কেন?

মূর্ছিত ভৃত্যটিকে নিজে সেবা করলেন মধুসূদন, তারপর তাকে দশটি টাকা দিলেন।

মামাবাড়ি থেকে আবার সাগরদাঁড়িতে ফেরা হলো। মধুসূদনের বেশী সময় কাটে নদীতীরে। নদীর ঘাটলায় বসে তিনি কপোতাক্ষীর দিকে চেয়ে বসে থাকেন,

দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। নৌকোয় করে যারা যায়, তাদের সঙ্গে তিনি ডেকে ডেকে কথা বলেন। তারা কেউ তাঁকে কবি হিসেবে চেনে না। কিন্তু কোনো জমিদারকে এমন সহজ আন্তরিকভাবে কথা বলতে তারা কখনো শোনে নি।

হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না বলে এবার এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। শেষবারের মতন বাল্যসঙ্গী নদীটিকে সম্বোধন করে বললেন, কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীর বেঁধে বাস করতে পায়, সেও পরম সুখী। একদিন আমি আবার ফিরে আসবো। তোমার কাছেই থাকবো। আমায় ভুলে যেও না।

কলকাতায় ফিরেই মধুসূদন একদিন বন্ধুদের ডেকে বললেন, তিনি বিলাতে যাবেন। কৈশোরের সেই স্বপ্ন! অ্যালবিয়ানস ডিসট্যান্ট শোর কতবার তাঁকে ডেকেছে, এই তো সময় সেই সাধ চরিতার্থ করার।

রাজনারায়ণ বললেন, সে কি, মধু! গ্রন্থকার হিসেবে তোর কত খ্যাতি হয়েছে, লোকেরা একবাক্যে তোকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলে মেনে নিয়েছে। কেউ বলে তুই বঙ্গের মিলটন। কেউ বা বলে তুই ভারতের নব কালিদাস। এখন পাঠকরা তোর কাচ থেকে আরও কত প্রত্যাশা করে। এই সময় তুই দেশ ছেড়ে চলে যাবি?

মধুসূদন বললেন, সার্থকতা পেয়েছি বলেই তো এখন ছেড়ে যেতে পারি! এসিচি, লিখিচি, জয় করিচি! বঙ্গ সরস্বতীকে দিয়িচি অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তিনি গলায় মালা করে পরেছেন। যদি ব্যর্থ হতুম, তা হলে মোটেই পালাতুম না। আরও আরও চেষ্টা করে দেশের জন্য কিছু না কিছু দিয়ে যেতুম। এখন আমি যেতে পারি বিজয়ী বীরের মতন।

কোনো বন্ধুর পরামর্শই গ্রহণ করলেন না মধুসূদন। তিনি যাবেনই। তাঁর প্রধান যুক্তি, এ রকম বসে বসে খেলে বিপুল পিতৃ-সম্পত্তিও তিনি দু দিনে উড়িয়ে দেবেন। এ দেশে কাব্য লিখে তো আর সংসার চলে না! সুতরাং রোজগারের জন্যই তিনি লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসবেন।

বিষয়সম্পত্তি সব গচ্ছিত করা হলো মহাদেব সরকার নামে এক ব্যক্তির কাছে। সে মধুসূদনের বিলাতে পড়ার খরচ পাঠাবে এবং মাসে মাসে কলকাতায় হেনরি-য়েটাকে দেবে দেড় শো টাকা। মধুসূদনের সব কিছুই তড়িঘড়ি, অর্থের ব্যবস্থা হওয়া মাত্র তিনি টিকিট কিনে ফেললেন জাহাজের।

বন্ধুদের মনের মধ্যে একটা ভয় সব সময় উঁকি মারে। কিন্তু কুসংস্কার মনে হবে, এই জন্য কেউ কারুকে মুখ ফুটে বলেন না। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর কেউই বিলেতে গিয়ে আর ফিরতে পারেননি। তারপর অবশ্য অনেকে গিয়েছে এবং ফিরেও এসেছে, তবু, ঐ দুটি মানুষের কথাই বেশী করে মনে পড়ে। ওঁদের দু জনের পর বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে মধুসূদনই তৃতীয়।

মধুসূদন নিজেও এই কথাটা বোঝেন এবং সেই জন্যই তাঁর বন্ধুদের বলেন, তোরা কিছু চিন্তা করিস না। আমি ঠিক ফিরে আসবো। কিন্তু তোরা আমায় মনে রাকবি তো? চক্ষের আড়াল হলেই কি এ দেশের মানুষ আমায় ভুলে যাবে?

আগামী কাল ক্যাণ্ডিয়া জাহাজ ছাড়বে। সন্ধ্যার সময় মধুসূদন নিজ বাস-ভবনে বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পান-ভোজনের জন্য ডেকেছেন। নানা রকম হাস্য পরিহাস হচ্ছে, এর মধ্যে এক সময় গঙ্গানারায়ণ মধুসূদনকে ডেকে বললেন, মধু, তুই যে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, তোর মন কেমন

কচ্ছে না? তুই এত হাসতে পাচ্চিস কী করে?

মধুসূদন বললেন, একটা নতুন কবিতা লিকিচি, তুই শুনবি, গংগা?

গংগানারায়ণ বললো, শুধু আমায় কেন, সকলকেই পড়ে শোনা না? তোর নতুন কবিতা!

সকলে নিঃশব্দে একাগ্র হলে মধুসূদন কুর্তার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বললেন, বায়রণের সেই লাইন মনে আচে? মাই নেটিব ল্যান্ড গুড নাইট! সেই মর্মে আমি এটা লিকিচি, আপনারা শুনুন।

রেখো মা দাসের মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে...

আবার বল্গাহীন অসংযমের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে নবীনকুমার।

কোনো কাজে ব্যর্থতা সে মেনে নিতে পারে না, প্রচণ্ড উদ্যম সত্ত্বেও ব্যর্থ হলে বিমর্ষতার বদলে তার মনে জেগে ওঠে ক্রোধ, আর সেই ক্রোধে সে নিজেকেই আঘাত করতে চায় সবচেয়ে বেশী! বঙ্গবাসীদের জন্য সে একটি পরিচ্ছন্ন সুরুচি-সম্মত দৈনিক পত্রিকা চালাতে চেয়েছিল, সেজন্য একটুও ব্যয়কুণ্ঠ হয়নি, তবু তার দেশবাসী গ্রহণ করলো না সে পত্রিকা! 'রসরাজ'-এর মতন আদি রসাত্মক খেউড়ে ভরা পত্রিকা চলে আর 'পরিদর্শক' চললো না!

ক্ষুব্ধ নবীনকুমার মনে মনে শপথ করলো, সে আর দেশের মানুষের উপকার করবার জন্য মস্তক ঘর্মাক্ত করবে না!

দু'জন পণ্ডিতের মৃত্যু হওয়ায় কিছুদিন মহাভারত অনুবাদের কাজ বন্ধ আছে, অন্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। সুতরাং এখন নবীনকুমারকে বরাহ-নগরে যেতে হয় না, সারাদিন সে বিছানায় শুয়ে বই পড়ে কিংবা কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করে, সন্ধ্যাকালে সে সেজেগুজে বাড়ির বার হয়। সঙ্গে কোনো ইয়ারবক্সি কিংবা মোসাহেবও থাকে না, এখন কোনো পরিচিতের সঙ্গও পছন্দ হয় না নবীন-কুমারের। জুড়ি গাড়ির মধ্যে সে একা একা সারা শহর টহল দিয়ে বেড়ায়, কখনো কিছুক্ষণের জন্য থামে বাগবাজারের ঘাটে, ব্র্যাণ্ডির বোতল ওষ্ঠে ঠেকিয়ে গলায় ঢেলে দেয় সেই তরল গরল। অনির্দিষ্ট দুঃখ তাকে উতলা করে তোলে। নেশা যত বাড়তে থাকে দুঃখ ততই বাড়ে, একলা গাড়ির মধ্যে বসে সে কাঁদে। এক সময় জড়িত পদে গাড়ি থেকে নেমে নদীর ওপরের প্রশস্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এরকম একা-ভ্রমণ বেশী দিন চলে না। একদিন কৃষ্ণকমলের সন্ধানে রাম-বাগানে চলে এলো সে। কৃষ্ণকমল কথায় কথায় তাকে বিদ্রূপ শেলে বিদ্ধ করে, তবু ঐ লোকটি তাকে টানে। রামবাগানে সেই গৃহটির ত্রিতলে এসে পূর্ব পরি-চিত কক্ষটির দ্বারে করাঘাত করে সে একটু অপ্রস্তুত হলো। প্রমদাসুন্দরী নামে সেই রমণীটির বদলে দ্বার খুলেছে অন্য এক রমণী। প্রমদাসুন্দরীর বসন ছিল

সাদামাটা, এ স্ত্রীলোকটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরে আছে, তাতে চুমকি বসানো, দু' চোখে সুর্মা টানা।

মাপ করবেন, বলে নবীনকুমার পিছন ফিরতেই স্ত্রীলোকটি বললো, একটু দাঁড়ান।

নবীনকুমার আবার ঘুরে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি মুগ্ধভাবে নবীনকুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, আহা, কী রূপ! এ যেন গিরিগোবর্ধনধারী গোপাল! এ যেন যমুনা পুলিনে বংশীধারী! আহা, কী টানা টানা চোখ, এমন কন্দর্পকান্তি আপনি কে গা?

নবীনকুমার বললো, আমার ভুল হয়ে গ্যাচে, আমি অন্য একজনকে খুঁজতে এয়েচিলুম।

স্ত্রীলোকটি রহস্যময় হাস্য দিয়ে বললো, আপনি যাকে খুঁজচেন, তাকে কোনোদিনই পাবেন নাকো!

—আমি খুঁজচিলুম আমার এক বন্ধুকে। তিনি এখেনে অন্য একজনার কাচে আসতেন।

—এ দুনিয়ায় কেবা বন্ধু, কেবা শত্তুর! তবু এ অধীনার কাচে এক দণ্ড দাঁড়ান, একটু প্রাণ ভরে দেকি আপনাকে। আহা কী রূপ, মানুষের এমন রূপ হয়! এমন প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল দৃষ্টি, তীক্ষ্ম নাসিকা, নব-দুর্বাদল-শ্যাম, তুমি যে হৃদয়-রঞ্জন মানভঞ্জন!

নবীনকুমারের মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করলো। এমনিতেই রমণীদের সামনে সে স্বাভাবিক হতে পারে না। সে যুগপৎ লজ্জিত ও বিস্মিত হলো। কাব্য-সাহিত্যে সে পাঠ করেছে যে পুরুষরাই নারীদের সামনে এমন রূপের স্তুতি করে। আর এখানে এই রমণীই করছে তার রূপ নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রশংসা! তার বিস্মিত হবার কারণ এই যে, এই স্ত্রীলোকটি কথা বলছে প্রায় শুদ্ধ ভাষায়, এমন ভাষা তো কোনো বারবনিতার মুখে শোনা যায় না!

সে মুখ তুলে তাকাতেই রমণীটি যেন তার মনের কথাই পাঠ করে বললো, কী ভাবচো, আমি বাজারে-খানকি নই! ওগো, আমার ঘরে একবার পায়ের ধুলো দেবে?

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

স্ত্রীলোকটি উৎফুল্ল জ্যোৎস্নার মতন হাসি ছড়ালো সারা মুখে। তারপর বললো, আমায় চিনতে পাচ্ছো না, আমি যে তোমার রাইসোহাগিনী গো!

নবীনকুমার এবার ফিরে যাওয়া মনস্থ করলো। এ স্ত্রীলোকটি বেশ্যা ছাড়া কিছুই নয়, নানারকম নকশা জানে। সম্ভবত কোনো যাত্রা-পালা শুনে শুনে এই কথাগুলি মুখস্থ করেছে, এসবই ওর খদ্দের ধরার ছল।

নবীনকুমার আবার ফিরতেই হাস্যমুখী তরুণীটির মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে আঁধার বর্ণ হয়ে গেল, সে ছলো ছলো কণ্ঠে বললো, হ্যাঁগো, আমি কি নরকের কীট যে আমার দিকে অমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালে? ঠিক আচে, আমি আজ রাত্তিরে মরে যাবো।

এবার নবীনকুমার স্ত্রীলোকটির কক্ষের চৌকাঠের এদিকে পা দিল। এর বিষয়ে কৌতূহল দমন না করে ফিরে যাওয়া যায় না।

পূর্বেকার আসবাবপত্র সব বদলে গেছে। ঘরের মধ্যে কৌচ নেই, তার বদলে পুরু জাজিম পাতা, তার ওপরে মখমলের আস্তরণ। দুটি সুদৃশ্য তাকিয়াও রয়েছে সেখানে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো একটি নতুন কাচের আলমারি, তার মধ্যে সাজানো সারি সারি কাচের গ্লাস।

জাজিমের ওপরেই বসতে হলো নবীনকুমারকে। তার একটু ভয় ভয় করছে। এভাবে কোনো বারবনিতার ঘরে একলা সে আগে আসেনি। স্ত্রীলোকটির হাব-ভাবও যেন অদ্ভুত। পাগল নয় তো?

স্ত্রীলোকটি নবীনকুমারের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললো, আমার নাম সুবালা। তোমার নাম বলবার দরকার নেইকো, তুমি আমার কেষ্টঠাকুর। তুমি কী ড্রিঙ্ক কর্বে বলো তো? তুমি রম্ খাও? এ অভাগিনীর কাচে রম্ ছাড়া তো আর কিচু নেই!

এতক্ষণে নবীনকুমার বুঝতে পারলো, সুবালা নামের স্ত্রীলোকটি বেশ খানিকটা নেশা করে আছে। সেই জন্যই ওর ধরন-ধারণ খানিকটা পাগলিনী, খানিকটা রহস্য-ময়ীর মতন।

আদর-কাড়া গলায় সুবালা বললো, বুঝিচি, আমায় তোমার একটুও মনে ধরেনি, আমি কালো কুচ্ছিত শ্মশানকালী, তুমি ত্রিভঙ্গমুরারি, আমি অষ্টাবক্র...

অর্থাৎ সুবালাও নবীনকুমারের মুখ থেকে রূপস্তুতি শুনতে চায়। কারণ সে কালোও নয়, কুৎসিতও নয়, বেশ রূপসীই সে, মুখখানা ভালো কুমোরের গড়া প্রতিমার মতন, শুধু তার কপালের ঠিক মাঝখান দিয়ে তিলকের মতন একটা কাটা দাগ।

নবীনকুমার বললো, আপনার...তোমার কথা শুনলে মনে হয়, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে। এখেনে কী করে এসোচো?

খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি। হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ে কপাল ঠেকে যায় মাটিতে। সেইরকম হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ একটি রামের বোতল এবং দুটি কাচের গেলাস নিয়ে ফিরে এসে আবার নবীনকুমারের সামনে বসে পড়ে বললো, তোমরা পুরুষমানুষরা সবাই আমাদের কাচে এসে আমাদের হিস্টোরি-জিয়োগেরাফি জিজ্ঞেস করো কেন গো? তাতে বুঝি তোমাদের বেশী মজা লাগে? ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে মজালে বেশী আমোদ হয়?

নবীনকুমার বললো, হিস্টি? জিয়োগ্রাফি? এসব তুমি জানলে কী করে? তুমি লেকাপড়া শিকোচো?

—বাঃ, শিকিচি না? বেথুনের ইস্কুলে তিন কেলাস পড়িচি! সেই দোষেই তো আমার কপাল পুড়লো।

নবীনকুমার স্তম্ভিত হয়ে গেল। বেথুন স্কুলে পড়া মেয়েদেরও পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়? ফিমেল-উদ্ধারের জন্য নব্য শিক্ষিতদের যে এত উদ্দীপনা, তার পরিণাম এই? সে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলো না।

সুবালা বললো, শোনো তবে আমার গপ্পো!

দুটি গ্লাসে সে রাম ঢাললো। এই সব গৃহের কোনো পাত্রে পানাহার করতে নবীনকুমারের রুচি হয় না। কৃষ্ণকমল একদিন বিদ্রূপ করে বলেছিল, তুমি বড়-মানুষের ছেলে, তুমি জুড়ি-গাড়ি না হাঁকিয়ে কোনো দিন কোথাও যাও নি, তুমি আর এ দেশকে কী চিনবে? আমার মতন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারো তো

বুঝি! তখন কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বেশ কয়েকপদ পদব্রজেই কলকাতার অলি-গলি ঘুরেছিল নবীনকুমার। সেই পর্যন্ত সে পারে। কিন্তু বারোয়ারি থালা-গেলাসে মুখ দিতে গেলেই তার বংশ-মর্যাদা ভেতর থেকে ঠেলে ওঠে!

নিচে গাড়িতে তার ব্র্যান্ডির বোতল আছে। সেই জন্য নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, তোমার কোনো নোকর নেই?

সুবালা বললো, আচে একজনা, সে এখন নেই, কেন।

তা হলে আর কী হবে? নবীনকুমারের পক্ষে নিচে নেমে গিয়ে নিজে হাতে করে ব্রান্ডির বোতল নিয়ে আসা শোভা পায় না। এই স্ত্রীলোকটিকেও বলতে পারে না সে কথা। অগত্যা সে সুবালার দেওয়া গেলাসটি সরিয়ে রেখে সরাসরি রামের বোতল থেকেই এক চুমুক দিল। এই রকম নির্জলা মদ্যপানে সে বেশ অভ্যস্ত, এটা শিখেছে হরিশের কাছ থেকে।

সুবালা মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে উরুর ওপর দুটি হাত রেখে বললো, বেথুনে তিন কেলাস পড়ার পরই আমার বিয়ে হলো। ভালো ঘর, অনেকটা তোমার মতন সোন্দর বর। আমাদের বংশও খারাপ নয়কো, আমার বাবা সদর দেওয়ানির উকিল ছেলেন। আমার স্বোয়ামী প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্তর। কপালে সইলো না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি স্বগ্যে গেলেন! আমার শাশুড়ী আমায় বললেন, লক্ষ্মীছাড়া, নেকাপড়া শিকে কপালে বৈধব্য নিয়ে এয়েছিল, আমার ছেলেটাকে খেলো! বাবা নেই, ছোটবেলা থেকেই নেই, আমরা মামার বাড়িতে মানুষ। শাশুড়ী দিলেন গলাধাক্কা, চলে এলুম মামার বাড়িতে ফের!

—ছেলে প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়ে, তবু সেই ছেলের মা বললে তুমি লেখা-পড়া শিকোচো বলেই বিধবা হলে?

—তাই তো বললে! আমি কি ছাই গপ্পো বানাতে পারি?

—তখন তোমার বয়েস কত?

—এগারো!

—তোমার মামারা তোমার আবার বিয়ে দিতে পারলেন না?

—শোনোই না! মামাদের পয়সার জোর নেই, তেনারা চিটি লিকলেন বিদ্যে-সাগরকে।

—তিনি কিচু ব্যবস্থা করেন নি?

—কর্বেন না কেন? নইলে কি আর এমনি এমনি দয়ারসাগর বিদ্যেসাগর নাম! চটি ফটফটিয়ে একদিন সটাং চলে এলেন আমাদের বাড়িতে। ওমা, কত নাম শুনিচিলুম বিদ্যেসাগরের, চেহারাখানা দেকে একেবারে ভির্মি খাবার জোগাড়। মাতা কামানো সে এক পাল্কী বেহারার হদ্দ। তবে গলার আওয়াজটি শুনলে বোজা যায় যে হ্যাঁ, বীরসিংহের ব্যাটা বটে! তিনি এক মাসের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন আমার বিধবা বিয়ে। এবারে বিয়ে হলো আরও বিরাট বংশে, সব্বাই এক ডাকে সে বাড়ির কত্তার নাম জানে। সে বাড়িতে আমি মাইকেল মধুসূদনকে দেকিচি।

—অ্যাঁ! সত্যি?

—হ্যাঁ গো, বলচি যে আমি মিছেকতা বানাতে জানি না। তা মাইকেল মধু-সূদন তখনও পদ্য লেকেন নি। ও বাড়ির কত্তার কাচে আসতেন বীয়র খাবার জন্য। কী বীয়র খেতে পারেন গো তিনি, ছ' বোতল সাত বোতল, যত খান ততই মুখ দিয়ে গলগলিয়ে কতা বেরোয়...।

—সেখেনে বিয়ে হবার পর আবার কী বিভ্রাট হলো?

—যা হবার তাই হলো! ঐ যে কতায় বলে না, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। আমার শ্বশুরের কত নাম ডাক, কত দ্যান ধ্যান, গরিব দুঃখীর জন্য মন কাঁদে, কিন্তু এ হতভাগিনীর দুঃখটাই শুধু তিনি বুঝলেন না।

—কী নাম তোমার শ্বশুরের?

—ছিঃ, তা কখনো বলতে আচে? আমি কপাল খুইয়িচি বলে কি ঐ সব মানী লোকের নামে দুর্নাম ছড়াতে পারি? শোনো না, তারপর কী হলো! আমার দ্বিতীয় বিয়ে হলো একজন পোকায় খাওয়া মানুষের সঙ্গে! বিদ্যেসাগর মশাই তো বিয়ে দিয়েই খালাস, তিনি তো পরে আর দেকতে যান না সেই সব বিয়ে হওয়া বিধবার কী দশা হয়!

—এ কী তাঁর পক্ষে সম্ভব?

—না, না, তাঁর নামে দোষ দিচ্চি না। তিনি মহাপুরুষ! সব দোষ আমার নিয়তির। আমার শ্বশুরের ঐ এক ছেলে, তাঁর ছেল ক্ষয়কাশ রোগ। সবাই জানতো বেশীদিন বাঁচবে না। শ্বশুরমশাই সে খপর চেপেচুপে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাই জন্যই তো বিধবার জন্য অত দরদ। আমি মামার বাড়িতে ভাত-ঠ্যালা হয়ে আচি, মামারা কি আর অত খোঁজ খপর নেয়, না বিদ্যেসাগর মশাইয়ের সময় আচে? আমার শ্বশুর ভেবেচিলেন যদি ছেলে মরার আগে কোনোক্রমে একটি বংশ-ধর জন্মায়...। আচ্ছা কেষ্টঠাকুর, সত্যি করে বলো তো, ভগবান বলে কেউ কি সত্যিই আচে?

—ভগবান বলে কেউ থাকলেও তিনি যে তোমার প্রতি দয়া করেননি, বোঝাই যাচ্চে!

—কেন কল্লেন না? আমি কী দোষ করিচি? এই মা কালীর দিব্যি তোমায় বলচি, ক্ষয়কাশ থাক আর যাই থাক, আমার সেই স্বোয়ামীকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করিচি, রক্ত বমি কত্তেন তিনি, আমি নিজের হাতে...মানুষটি খারাপ ছিলেন না, যখন বুকে খুব কষ্ট হতো, আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলতেন, আহা সুবালা, আমার তো বাঁচার খুব ইচ্ছে...

ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো সুবালার দুই চক্ষু দিয়ে। নবীনকুমার রামের বোতলে আর একটি চুমুক দিয়ে বললো, থাক, আর বলতে হবে না।

সুবালা মেয়েটি সত্যিই বড় বিচিত্র। এই সে কাঁদছিল, আবার তক্ষুনি ফিক করে হাসলো। চক্ষে জল শুকোয়নি অথচ হাস্য মুখে সে বললো, জানো, যেই সে মলো অমনি সবাই আমায় আবার বললো, রাক্কুসী! এই দ্যাকো, আমি রাক্কুসী! হ্যাঁ, আমি তোমায় খেয়ে ফেলতে পারি।

—তুমি মদ খাওয়া কোতায় শিকলে? এখেনে তোমায় কে নিয়ে এলো।

—অতবড় মানী শ্বশুর আমার, তিনি পর্যন্ত বললেন, তাঁর বাড়িতে আমার আর ঠাঁই নেই। যে-মেয়ে দু দুবার স্বামীকে খায় সে রাক্কুসী ছাড়া আর কী? সে অপয়া, তার মুখ দর্শনেও পাপ, তাই না গো?

—তোমার তো কোনো দোষ ছিল না! ক্ষয়কাশ হলে কেউ বাঁচে? ক্ষয়কাশের রুগীর সঙ্গে জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছেল...বিদ্যেসাগর মশাই নিশ্চয়ই জানতেন না সে কতা!

—বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি জানলেই বা কী কত্তেন?

—জানলে তিনি তোমার শ্বশুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না কোনো দিন। সে ব্রাহ্মণের জেদ আমি জানি!

—তাতেই বা কী আমার স্বগ্গ লাভ হতো? তিনি আমার শ্বশুরের ওপর রাগ করে আমার সে বিয়ে পরে ভেঙে দিতে পাত্তেন না! দ্বিতীয়বার বিধবা হবার পর তিনি আবার আমার বিয়ে দিতেন?

—তখন তোমার কত বয়েস?

—তের। পুরুষমানুষ কী বস্তু তখনো জানিনি।

—তোমার শ্বশুর তোমায় রাস্তায় বের করে দিলেন?

—অতবড় মানী লোক, একেবারে কী আর রাস্তায় ফেলবেন? তা হলে লোকে যে তাঁকেই দুষবে। পাইক দিয়ে আমায় মামাদের বাড়িতে ফেরত পাটিয়ে দিলেন। সেখেনেও একই অবস্থা। মামারা চোক মোটা মোটা করে তাকায়। ভদ্রঘরের মেয়েমানুষ দু' বার বিধবা, এমন কতা কেউ সাত জন্মে শুনেচে। আমি যেন এক সৃষ্টি-ছাড়া। আমি নিজেই ভাবতুম, আমার ওপরে শনির দৃষ্টি আচে, আমার জীবনে সুখ মানে মরীচিকা। ছিলুম মামাদের বাড়িতে দাসী বাঁদী হয়ে, মামীরা শত বকুনি দিলেও রা কাড়িনি কোনো দিন, সেজোমামীর এক ভাই কত লোভ দেকিয়েচে, ইতি উতি হাত টেনে ধরেচে, কোনোদিন তার সঙ্গে নষ্ট হইনি, এই মা মনসার দিব্যি তোমায় বলচি। একদিন রাগ করে মেরিচিলুম তাকে এক থাবড়া! সেই যে বলে না, পায়ের যুগ্যি মানুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কতা কয়!

—শেষ পর্যন্ত সেই মামীর ভাই-ই তোমায় এ পথে এনেচে?

—মোটেই না। সতেরো বচ্ছর বয়েস পর্যন্ত কোনোদিন কারুকে ঘেঁষতে দিইনি, তখুনো পর্যন্ত ভগবানে বিশ্বাস ছেল...এখন আমার বয়েস উনিশ, কত্ত বড় হয়ে গ্যাচি, না? সত্যি গো এখন উনিশ, আমি মিছে কতা বলি না!

—তোমাকে কে বাড়ির বার কল্লো?

—তোমার এত কৌতূহল কেন গো, কেষ্টঠাকুর? হঠাৎ আজ কোতা থেকে তুমি উদয় হলে, তোমায় দেকে একেবারে চমক খেয়ে গেলুম! ঠিক যেন মন্দিরে বসানো মূর্তিটি!

—তোমাকে মদ খাওয়া কে শেখালো তা বললে না?

—কেউ শেখায়নি তো, আমি নিজে শিখিচি। এ পথে এলে সবাই শিখে যায়। তুমি জিগ্যেস কচ্চো তো কী করে এ পথে এলুম? তোমরাই এনোচো!

—তার মানে? তুমি মামার বাড়িতে থাকতে পারতে না?

—পাত্তুম! লাথি ঝাঁটা খেয়েও সেখেনে পড়ে থাকতুম। কিন্তু কপাল যাবে কোথায়? একদিন আমার মামার বাড়িতে পাল্কী নিয়ে উপস্থিত হলো অনাদিচরণ। সে আমার দ্বিতীয় পক্ষের খুড়তুতো দেওর। হি-হি-হি-হি! পুরুষমানুষেরই শুধু আগে দ্বিতীয় পক্ষ হতো, এখন মেয়েমানুষেরও দ্বিতীয় পক্ষ হয়। সেই অনাদিচরণ এসে আমার শ্বশুর মশায়ের নাম করে বল্লে, তিনি আমায় ডেকে পাটিয়েচেন! বাড়িতে কোনো শুভ কাজ আচে, বাড়ির বৌ সেখেনে উপস্থিত না থাকলে কেমন কেমন দেকায়। মামারা তো এক কতায় রাজি। মনে মনে বললে বোধহয়, আপদ গেল! আর যেন ফিরে না আসে! থান কাপড়ে ঘোমটা টেনে আমি তো উঠে বসলুম পাল্কিতে। সে পাল্কি যখন থামলো, আমি দেকি, ওমা, এতো হালসীবাগান নয়, এ যে অন্য জায়গা, কী রকম বিচ্ছিরি মতন বাড়ি...এই যাঃ! বলে ফেললুম যে—

নবীনকুমারও চমকে উঠলো। হালসীবাগানে বিধবাবিবাহ? সে তো নীলাম্বর মিত্রের বাড়িতে। কলকাতার পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ বিধবাবিবাহ। নবীনকুমার স্বয়ং উপস্থিত ছিল সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হিসেবে। পাত্রকে তার মনে আছে, শিবপ্রসাদ মিত্র, হ্যাঁ, একটু শীর্ণ, দুর্বল চেহারা ছিল বটে। ঘোমটায় ঢাকা নববধূর মুখ সে ভালো করে দেখতেই পায় নি। এই সেই রমণী? নীলাম্বর মিত্র, যিনি প্রতিটি সামাজিক সংস্কারে এগিয়ে আসেন, সব ব্যাপারে মুক্তহস্তে চাঁদা দেন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের মস্ত বড় সমর্থক, সেই ব্যক্তিই নিজের পুত্রবধূকে এইভাবে ঠেলে দিয়েছেন? শুধু একটি বংশধর পাবার লোভে নিজের রুগ্ন সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে এরকম একটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সর্বনাশ করলেন? এইসব লোকই দেশের মাথা, এরাই ইংরেজি শিক্ষিত, এরাই রিফর্মার!

নবীনকুমার আর শুনছে না। তবু বলেই চলেছে সুবালা।

—তারপর কী হলো জানো, সে মুখপোড়া আমায় নিয়ে তুললো হাড়কাটার একটা বাড়িতে। হাড়কাটা কোতায় জানো তো, যেখেনে হাড়ের বোতাম বানায়, সেই পাড়ায়...সে বাড়িটা বেবুশ্যেদের, আমার মুখ চেপে ধরে একটা ঘরে বন্ধ করে রাকলো...তারপর...সেই অনাদি...রাত্তিরবেলা...আমি একা মেয়ে মানুষ কী করে নিজেকে বাঁচাবো...তবু সে কতা কেউ ভেবে দেকলে না, আমায় সবাই এই নরকে ফেলে দিলে...আমার মামারা কিংবা শ্বশুর ঠাকুর একবার খোঁজ নিলে না পর্যন্ত আমার, আমি যে একটা মানুষ, বাঁচলুম না মলুম কেউ তা জানতে চাইলে না গো...

আবার কাঁদতে কাঁদতে সুবালা নবীনকুমারের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সরে গেল। তারপর বললো, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না তুমি!

নবীনকুমারের মতন বড় মানুষের সন্তান, বিশেষত সম্পত্তির অধিকারী স্বাবলম্বী যুবকের পক্ষে বেশীদিন একা থাকা সম্ভব নয়। সান্ধ্য অভিযানে সে আর কতদিন একা একা ঘুরবে! তা ছাড়া অনেকে তাকে দেখেই চিনতে পারে। বাইশ বৎসর বয়েসেই সে এই নগরীর প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, অনেক সভা সমিতিতে তাকে দেওয়া হয় সম্মানিত আসন।

তার খ্যাতির কারণ দু'রকম। সুধীজন ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাকে চিনেছে ধনীদের মধ্যে একজন ব্যতিক্রম হিসেবে। অতুল সম্পদের অধিকারী হয়েও সে বিলাসিতায়, অমিতাচারে গা ভাসায় নি, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর করুণা পাবার জন্যও তেমন লালায়িত হতে দেখা যায়নি, আবার ধর্ম সংস্কারের নামেও উন্মত্ত হয়নি। প্রায় কৈশোর বয়সে বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে সে নিজগৃহে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছিল, স্বয়ং নায়ক সেজে সুনামও পেয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু থিয়েটারকেই জীবনের পরাকাষ্ঠা মনে না করে সেই মোহ সে বর্জন করেছে অচিরেই। ক্রমশই বৃহত্তর কাজের প্রতি তার আগ্রহ। সমাজ হিতকারী যে-কোনো অনুষ্ঠানে

সে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সদ্য গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাকে চিনেছে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনাকারী হিসেবে। মহাভারত অনুবাদের মতন বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা এই যুবকটির প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও কৌতূহল। খণ্ড খণ্ড বাংলা মহাভারত সে বিনামূল্যে বিতরণ করছে তো বটেই, তা ছাড়া সম্প্রতি সে সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছে যে, ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে-কেউ এই গ্রন্থ চাইলেই পাবে, এবং সেজন্য কারুকে ডাকমাশুলও প্রেরণ করতে হবে না, সে ব্যয়ও সে নিজেই বহন করবে। যত দূরে ডাক যায়, ততই মাশুল বাড়ে, তা হোক, কন্যাকুমারী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে সে মহাভারত পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।

অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাকে চিনেছে দাতা হিসেবে। শুধু যে নীল দর্পণের মামলায় জরিমানার এক সহস্র মুদ্রা সে তৎক্ষণাৎ ঝনাৎ করে ফেলে দিয়েছিল তাই নয়, ওরকম সহস্র মুদ্রা সে যখন তখন দান করে। প্রকৃত-অভাবী, সৎ-দরিদ্র এবং জুয়াচোরদের মধ্যেও রটিত হয়ে গেছে যে জোঁড়াসাঁকোর সিংহীবাড়ির ছোটবাবুর কাছে যে-কোনো ছুতোনাতায় কিছু চাইলেই রিক্ত হাতে ফিরতে হয় না। কত বিচিত্র কারণ দেখিয়ে যে লোকে তার কাছে দান চাইতে আসে তার আর ইয়ত্তা নেই। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থেকে শুরু করে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণরা তো তার কাছ থেকে সত্য মিথ্যা কারণ দেখিয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে যায় বটেই, এছাড়া পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, বিধবাবিবাহের উমেদার ও ইস্কুল খোলার উৎসাহী ব্যক্তিরাও তার কাছে নিয়মিত আসে। নবীনকুমারের আত্মগরিমা প্রবল হলেও নিছক দানের অহংকারেই দান করে না সে। সে অর্থ জিনিসটাকে যেন খোলামকুচির মতন জ্ঞান করে। তার এত অর্থ আছে, অথচ অন্য অনেকের নেই, এই চিন্তা তাকে স্বস্তি দেয় না।

এক প্রাতঃকালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছ থেকে এক দূত এলো তার কাছে। কী বৃত্তান্ত? দূতটি জানালো যে ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে সম্প্রতি দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সেখানকার অনাহার প্রপীড়িত ব্রিটিশ প্রজাদের সাহায্যকল্পে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ একটি ফাণ্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁরা বাবু নবীনকুমার সিংহের কাছ থেকে সাহায্য চান।

প্রস্তাবটি শুনে হা-হা করে অট্টহাস করে উঠলো নবীনকুমার। নব-দূর্বাদলের মতন তার কচি গুম্ফে হাত বুলিয়ে সে বললো, বটে, বটে! এদেশের মানুষের সব দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে গ্যাচে, এখন আমাদের সাহায্য কত্তে হবে ইংলণ্ডের সাহেব দুঃখীদের জন্য, অ্যাঁ? তাই না?

দূতটি ঠিক বুঝতে পারলো না নবীনকুমারের বিদ্রূপ। সে বললো, আজ্ঞে, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রানী স্বর্ণময়ী, বাবু হরলাল শীল, আমাদের কর্তাবাবু, এঁরারা সক্কলে এর মধ্যেই এক হাজার টাকা করে দিয়েচেন।

ওষ্ঠের কোণে হাস্যটি মজুত রেখে নবীনকুমার বললো, তা হলে তো আমাকেও হাজার টাকা দিতে হয়, কী বলো? নইলে মান থাকবে না! তা আমাদের পয়সায় ল্যাঙ্কাশায়ারের সাহেবরা তা হলে কিচুদিন থাক গরু-শোর! আমরা দান কচ্ছি শুনে তারা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ কর্বে তো? নাকি ড্যাম্-সোয়াইন-নিগার বলে গালাগালি কর্বে? এশো যখন, নিয়ে যাও টাকা। ওরে দুলাল—

এই নবীনকুমারের দানের ধরন!

অর্থীদের মধ্যে অনেকে নবীনকুমারের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। বারবার নানান্ কারণ দেখিয়ে অর্থ আদায় করতে চক্ষুলজ্জায় আটকায়, তার চেয়ে বাবুর সঙ্গে নিত্যপ্রহর থাকতে পারলেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বড় মানুষের হাত ঝাড়লেই দু' পাঁচ শো! তা ছাড়া, নবীনকুমারের মোসাহেবের পদ খালি আছে দেখে সেই পদ দখল করার জন্য অনেকের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এতবড় একজন ধনীর সন্তানের মোসাহেব থাকবে না, এ কী হয়!

নবীনকুমার পোকা-মাকড়ের মতন এদের ঝেড়ে ফেলতে চায়, তবু ছিনে জোঁকের মতন দু' একজন রয়ে যায়। সকালবেলা বৈঠকখানায় অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে এরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

এক সন্ধ্যায় রামবাগানের সেই গৃহটিতে সুবালার ঘরে যাবে বলে নবীনকুমার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, এমন সময় ওপর থেকে নামতে নামতে এক ব্যক্তি তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর জিভ কেটে বললো, আরেঃ! ছোটবাবু যে? আপনি এখেনে? এখেনকার যে-মাগীকে আপনার পছন্দ, আমাদের হুকুম কর্বেন, আমরা তাকে আপনার বাগান বাড়িতে পোঁচে দোবো! এরকম পল্লীতে আপনার মতন মানুষের একলা একলা আনাগোনা কি উচিত হয়?

নবীনকুমার এই লোকটিকে কোনদিন দেখেনি। তবু ঐ লোকটি তাকে চিনেছে দেখে সে বিস্মিত হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

লোকটি বিনয়ে সারা শরীর কুঁকড়ে বললো, আজ্ঞে আমি আপনার দাসানুদাস।

নবীনকুমার ভাবলো, সারা শহরে তার এত দাসানুদাস ছড়িয়ে আছে, অথচ সে নিজেই তাদের চেনে না, এ তো বড় আশ্চর্য! এই লোকটি ধুতি ও বেনিয়ান পরা, নাকের নিচে পুরুষ্টু গুম্ফ, মাথায় তেল চকচকে চুল দুদিকে পাট করা, ভদ্রমানুষের মতন চেহারা, এ কেন তার দাসানুদাস হতে যাবে? দীর্ঘকায় এই লোকটির সঙ্গে অনেকটা যেন রাইমোহন ঘোষালের চেহারার মিল আছে। কিন্তু রাইমোহনের চেয়ে এর বয়েস অনেক কম। রাইমোহন তো বৃদ্ধ হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে।

লোকটি হাত জোড় করে বললো, আপনি কষ্ট করে আসবেন কেন? কোনটিকে চাই একবার বলুন, এখুনি আপনার গাড়িতে তুলে দিচ্চি, আপনাদের সেবা করাই তো আমাদের কাজ!

লোকটিকে অগ্রাহ্য করে ওপরে উঠে এলো নবীনকুমার। তখুনি মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করলো, এভাবে সুবালার কাছে আর আসা হবে না।

সুবালার ঘরে উপস্থিত হয়ে সিঁড়িতে-দেখা লোকটির বর্ণনা দিয়ে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটি কে বলতে পারো?

সুবালা বললো, ও তো এখেনকার দালাল গো। ঐ মিনসেই তো আমায় এখেনে এনে তুলেচে!

নবীনকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে প্রশ্ন করলো, ও তোমায় এখেনে এনেচে? কী করে?

সুবালা হাসতে হাসতে বললো, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, তুমি কিছুই জানো না। আমি হাড়কাটার গলিতে ছিলুম, কিন্তু আমি কি সেখেনে থাকার যুগ্যি? নিজের মুকে বলতে নেই, তবু আমায় দেকতে পটের বিবিটির মতন নয় কো? হি-হি-হি-হি।

আজও সুবালা নেশা করেছে এরই মধ্যে। সম্ভবত সে সারাদিন ধরেই একটু

একটু নেশার দ্রব্য পান করে। সুস্থ, স্বচ্ছ চোখে সে বোধহয় এই পৃথিবীকে আর দেখতে চায় না।

সে বললো, হাড়কাটার গলিতে তো থাকে শস্তার মেয়েমানুষরা। আমার দেওর নাগরটি যখন আমায় ফেলে পিঠটান দিলে, তখন আমিও এপথে নামলুম, ঐ শস্তার কারবার, দু' টাকা এক টাকার খদ্দের সব! এই সব দালালরা আড়কাঠি লাগায়, নিজেরাও পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, সুন্দরপানা, ভালো গা-গতরের মেয়েমানুষ দেকলে ভালো পাড়ায় নিয়ে আসে। ঐ রামখেলাওনই তো আমায় এখেনে এনে, এইসব আসবাবপত্তর নিজের গাঁটের টাকা দিয়ে কিনে আমায় এ ঘরে বসিয়েচে। আমার রোজগারের আদ্দেক ও পায়!

নবীনকুমার অস্ফুটভাবে বললো, ওর নাম রামখিলাওন?

—সব্বাই তো তাই বলে। ওর কতা শুনে বোজবার উপায়টি নেই যে ও হিন্দুস্থানী! ভারি শেয়ানা লোকটা!

—ঐ রকম লোক আমায় চিনলো কী করে?

—তোমার এমন কেষ্টঠাকুরের মতন রূপ, যে একবার দেকবে, সে-ই মনে রাকবে!

—তোমার আর এখানে থাকা হবে না!

কয়েকদিনের মধ্যেই মৌলা-আলীতে একটি বাসা ভাড়া করে সেখানে সে নিয়ে গেল সুবালাকে। এজন্য রামখেলাওন দালালকে খেসারৎ দিতে হলো সাত শো টাকা। সুবালার জন্য নবীনকুমার পৃথক বাসা ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাতাসে আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়লো সে সংবাদ। অনেকেই নিশ্চিন্ত হলো এ খবর শুনে। যাক্, ছোকরা তবে এতদিন পর বাজারের মেয়েমানুষকে রক্ষিতা করেছে! এতদিন নবীনকুমারকে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারছিল না। ছোকরা শুধু দান-ধ্যান বদান্যতা করবে, মহৎ ব্যাপার নিয়ে মগ্ন থাকবে আর মদ-মেয়েমানুষ করবে না, এ কি হয়?

নবীনকুমার অবশ্য সুবালার অঙ্গ স্পর্শ করেনি একদিনও। দৈবাৎ সুবালার সঙ্গে দেখা হবার পর, সুবালার পূর্ব পরিচয় জেনে তার কাছে সে নিয়মিত আসা শুরু করেছিল একটা বিস্ময় বোধ নিয়ে। বয়সের তুলনায় নবীনকুমার যতই ভারিক্কী ভাব দেখাক, তার ভিতরের শিশুটি যাবে কোথায়? সে প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেনি যে হালসীবাগানের বিখ্যাত মিত্র পরিবারের এক বধূ এরকম বাজারে বারবনিতা হয়েছে। হালসীবাগানের নীলাম্বর মিত্রের বংশ তো অনেকটা নবীনকুমারদের বংশের মতনই মর্যাদাসম্পন্ন। তা হলে কি তাদের পরিবারের কোনো রমণীও কি কার্যকারণের যোগাযোগে এরকম বার-নারী হয়ে যেতে পারতো?

নবীনকুমারের ধারণা ছিল, কলকাতার পণ্যা স্ত্রীলোকরা প্রায় সকলেই পশ্চিম দেশীয়। শুধু তার একার নয়, এরকম ধারণা অনেকেরই। নিজের সমাজের রমণীরাও যে জীবিকার জন্য এই আদিম পেশা গ্রহণ করে, তা পুরুষরা স্বীকার করতে চায় না। সেই জন্য অন্য সমাজের ওপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে এবং ভোগেও কোনো গ্লানি থাকে না। এইসব স্ত্রীলোকরাও নিজেদের কদর বাড়াবার জন্য পশ্চিমা বলে পরিচয় দেয় নিজেদের। হয়তো মুর্শিদাবাদ থেকে আগতা কোনো সাধারণ পাঁচপেঁচি ঘরের বউ, সে-ও তালতলায় ঘর ভাড়া নেবার পর বাবুদের বলে, মুই লকনৌ থেকে এয়েচি গো, খোদ লকনৌ থেকে। লাচ জানি। দেকবে?

সুবালাকে বারবার জেরা করে নবীনকুমার নিশ্চিন্ত হয়েছে যে এই রমণীটি

সত্যিই বিখ্যাত নীলাম্বর মিত্রের এককালের পুত্রবধূ। এর বিবাহে নবীনকুমার নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছিল। সেই কারণেই সুবালার শরীর ভোগ করার প্রবৃত্তি হয়নি কোনোদিন তার। সেই বিবাহ সভার সন্ধ্যাটির কথা স্মরণ করলেই তার শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। কত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেদিন, বিধবা-বিবাহের মতন একটি মহৎ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা নিশ্চয়ই শ্লাঘা বোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কারুরই কোনো দায়িত্ব নেই। আর নীলাম্বর মিত্তির নিজে? ক্ষয় রোগী পুত্রের সঙ্গে এক বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়ে সমাজের কাছ থেকে বাহবা নিলেন, আর পুত্রের মৃত্যুর পরই নির্লজ্জ-ভাবে বিদায় করে দিলেন সেই পুত্রবধূকে? নীলাম্বর না বাগাড়ম্বর?

নবীনকুমারের ইচ্ছে হয় নীলাম্বর মিত্তিরকে একদিন ঘাড় ধরে টেনে আনে সুবালার কাছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, নীলাম্বর মিত্তিরের প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট। প্রতিশোধ নেবার জন্য হাত নিশপিশ করে নবীনকুমারের। তারপর তার মনে পড়ে, প্রতিশোধ নেবার একটি মোক্ষম অস্ত্র তো তার হাতেই আছে। আবার সে লিখতে শুরু করে হুতোম প্যাঁচার নক্সা। এই সব বাগাড়ম্বর মিত্তিরদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেবে সে. দেশবাসী এদের চিনুক।

নবীনকুমার না চাইলেও সুবালা প্রায়ই নানারকম ছলা কলা দেখিয়ে নবীন-কুমারকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। নেশাটি বেশ জমে ওঠার পর তার শরীর কোন পুরুষের শরীর চায়। নবীনকুমার চেষ্টা করেও সুবালার নেশার অভ্যেস ছাড়াতে পারে নি। মর্মান্তিক সত্যটি হচ্ছে এই যে ভদ্র পরিবারের কন্যা, উচ্চ পরিবারের বধূ সুবালা, কিছু লেখাপড়াও শিখেছে, বইপত্র পাঠ করেছে যথেষ্ট, তবু মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যেই সে একেবারে ঝানু বেশ্যা হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই হোক, অন্য যে-কোনো কারণেই হোক একবার এই পেশা গ্রহণ করবার পর সবাই অন্যান্যদের চেয়ে যোগ্যতর পেশাধারিনী হতে চায়। এটাই নিয়ম। সুবালা জানে তার আর ফেরার পথ নেই, পতিতা রমণী হয়েই যদি থাকতে হয় সারা জীবন, তা হলে সে অযোগ্য পতিতা হবে কেন?

নেশা তুঙ্গে উঠলে সে নবীনকুমারকে নিজের বক্ষে আহ্বান করে প্রতিদিন। প্রত্যাখ্যাতা হবার পর সে রাগে জ্বলে ওঠে, নবীনকুমারকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুক করে. তার পুরুষত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জানায়। এমনকি নবীনকুমারের গায়ে জিনিস-পত্র ছুঁড়ে মারে। স্ফুরিতাধরা হয়ে সে বলে. তুমি আমায় দয়া দেকাচ্চো? কে চায় তোমার দয়া? ভারী এলেন আমার দয়াল ঠাকুর রে! আমার রূপ-যৌবন আচে, আমি কারোকে পরোয়া করি না! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কী? তোমার মতন অনেক বড় মানুষের ছেলে এখনো আমার পা চাটতে আসবে!

নবীনকুমার চায় সুবালাকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও যে একজন পতিতা রমণীকে সমাজে ফিরিয়ে আনা যায় না. এ সত্য তাকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে হলো। যদিও এ সত্যটিকে সে মানতে চায় না!. তবে কি কৃষ্ণকমলই ঠিক বলেছিল?

সবচেয়ে সহজ ছিল সুবালাকে কোনো তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া। হিন্দু-দের সব তীর্থস্থানগুলিই ঘিরে আছে বড় বড় পতিতাপল্লী। সুবালা যদি সে-রকম কোনো তীর্থে গিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ধর্মকর্ম নিয়ে জীবন কাটায়, তা হলে তার পূর্ব-জীবন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। কিন্তু সুবালার একেবারেই ঈশ্বরের ওপর ভক্তি নেই, তীর্থস্থানের নাম শুনলেই

যেন তপ্ত কটাহে বেগুনভাজার মতন চিড়বিড় করে! ঝাঁঝালো গলায় বলে, কেন আমি পালাবো? কেন? সবাই আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মতন। কিন্তু কলকেতা শহরটা কি কারুর কেনা? আমি আমার মাংস বেচে টাকা কর্বো, এখেনেই পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবো।

এই সুবালা নবীনকুমারের জীবনের একটা পর্ব। অন্য কেউ সাধারণত এই-রকম সমস্যায় স্বেচ্ছায় এতখানি জড়িয়ে পড়ে না। অন্য কোনো ভদ্র সজ্জন সুবালার মতন কোনো রমণীর সন্ধান পেলে দুঃখিত হতেন ঠিকই, কিন্তু মেয়েটি যখন বেশ্যা হয়েই গেছে তখন আর কী করা যাবে, এই ভেবে এড়িয়ে যেতেন নিশ্চিত। বড়জোর, 'অহো আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গে কত দুষ্ট ক্ষত।' এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

কিন্তু নবীনকুমার সে ধাতুর নয়। যে উদ্যম নিয়ে সে পরিদর্শক পত্রিকা চালাতে চেয়েছিল, প্রায় সেই উদ্যম নিয়েই সে সুবালাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চায়। মৌলা-আলীর ভাড়াবাড়িটির সদরে সে দু'জন চৌবে দ্বারবান বসিয়েছে, সুবালার জন্য নিযুক্ত করেছে দু'টি বয়স্কা দাসী। তার আহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ত্রুটি রাখে নি। এর ফলে নবীনকুমারের খ্যাতির সৌরভ আরও ছড়িয়ে পড়ছে অবশ্য। লোকে বলাবলি করছে, মহাভারতের নাম করে অত টাকা খর্চা কচ্চেন উনি, আর মেয়েমানুষের জন্য দু'দশ টাকা ওড়াবেন না, এ কী হয়! হাত খুলুক, হাত খুলুক, তাতে আরও দু' দশটা মাতালের প্রতিপালন হবে!

নবীনকুমারের গৃহেও এই ব্যাপার জানাজানি হয়েছে। সরোজিনী নিভৃতে কাঁদে। গঙ্গানারায়ণ আভাসে-ইঙ্গিতে দু' একবার তার কনিষ্ঠকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নবীনকুমার কান দেয় নি।

মহাভারতের কাজে তিন চার দিন ব্যস্ত থাকে, তারপর এক একদিন সে যায় সুবালার কাছে। গাড়ি থেকে নেমেই সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, দ্বিতলের কোনো গবাক্ষের গরাদ ধরে সুবালা উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। এ যেন বিলাতি কাহিনীর কোনো নায়িকা তার প্রেমিকের প্রত্যাশায় উৎসুক চক্ষে প্রতীক্ষমানা। কিন্তু এ দেশ বিলাত নয়, এ দেশে কোনো ভদ্র পরিবারের কন্যা অমন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পথচারীদের শরীর দেখায় না। বারবনিতাদেরই এমন করা সাজে।

নবীনকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও সে সুবালার এই অভ্যেসটি ছাড়াতে পারছে না। পরক্ষণেই মনে পড়ে, এ তো সুবালাকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা, এমন ভাবেই বা কতদিন চলবে? এরই মধ্যে এক মধ্যরাত্রে কয়েক-জন মাতাল হল্লা করে এ বাড়ির মধ্যে জোর করে ঢুকতে চেয়েছিল, দ্বারবানদের সঙ্গে তাদের লাঠালাঠি হয়েছে।

নবীনকুমারকে দেখতে পেয়েই দ্বিতল থেকে লজ্জাহীনার মতন সুবালা তাকে ডেকে ওঠে। এও ঠিক খাঁচার পাখির ডাকের মতন।

একজন কারুর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু সে-রকম কে আছে? হরিশ চলে গিয়ে নবীনকুমার একেবারে বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে। অনেক ভেবে সে আবার কৃষ্ণকমলকেই খুঁজে বার করলো।

সব শুনে কৃষ্ণকমল কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললো, মেয়েটি দেখতে কেমন? রূপসীই বললে তো? তা বেশ্যা যখন হয়েই গিয়েছে, তখন আর তাকে টানাটানি করে কী লাভ? রসিক পঞ্চজন এরকম একটি রূপসী বেশ্যা থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

কৃষ্ণকমলের মুখে এরকম সাধারণ ব্যক্তিদের মতন উত্তর শুনে নবীনকুমার ভুরু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলো।

কৃষ্ণকমল আবার বললো, এ সমাজে বেশ্যারও প্রয়োজন রয়েছে। তুমি যদি ভোগ করতে না চাও, আটকে রাখবে কেন, রসিকদের জন্য ছেড়ে দাও! মাঝে মাঝে ভদ্রঘর থেকে সাপ্লাই না এলে সুন্দরী রূপসী বারবনিতার ডিমান্ড মেটানো যাবে কী করে? চেষ্টা করেও ওকে তুমি বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না।

নবীনকুমার এবার বাঁকা সুরে বললো, তোমার প্রয়োজন আচে নাকি? তুমি তা হলে ওকে একবার দেকে আসতে পারো—

কৃষ্ণকমল বললো, না, ভাই, আমার প্রয়োজন আমি অন্যভাবে মিটিয়ে নিয়েছি। শোনো, নবীন, এ সমাজে যুবতী নারীর পতি বিনে গতি নেই। বিধবা হলে এ বাড়ি ও বাড়ির লাথি-ঝ্যাঁটা খাবে, নয়তো বাজারে গিয়ে নাম লেখাবে। এই তো নিয়তি। তোমার গুরু বিদ্যাসাগর যতই চেষ্টা করুন কিছুতেই কিছু হবে না। দু' দশটা বিধবার বিবাহ দিলেই কি তিনি মানুষের মন পাল্টাতে পারবেন? যে জাতি যত বেশীদিন পরাধীন, সে জাতি নৈতিক ভাবে তত বেশী রুগ্ন।

নবীনকুমার বললো, তা হলে তুমি বলচো, বিবাহ দেওয়া ছাড়া এ মেয়েটির আর কোনো উপায় নেই।

কৃষ্ণকমল বললো, বেশ্যার বিবাহ দেবে, তুমি তো কম নও হে! এ মেয়েটির বিবাহ হবে তার মানে তৃতীয়বার, এমন কথা তো তোমার গুরুও স্বপ্নে স্থান দেননি! শোনো, তুমি টাকার জোর খাটিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে জোর করে ওর বিবাহ দিয়ে দিতে পারো, কিন্তু তা কতক্ষণ টিঁকবে? তুমি নিজে বিবাহ করবে না নিশ্চিত, কারণ তুমি ডবল্ বিবাহের ঘোর বিরোধী!

নবীনকুমার নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়াতেই কৃষ্ণকমল মুচকি হেসে বললো, একটা কথার উত্তর দাও তো? ভদ্রঘরের একজন বধূ ভাগ্য বিড়ম্বনায় বেশ্যা হয়েচে, সেইজন্যই তুমি এত উতলা হয়েচো, তাই না? আর ছোটলোকের ঘরের কত মা-বউ যে পেটের দায়ে ঘরের বার হয়ে এসে বেশ্যাবৃত্তি করে, তাদের জন্য নিশ্চয়ই তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। পথে ঘাটে যারা হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখোনি কখনো? এই তো তোমাদের দেশোদ্ধার!

কৃষ্ণকমলের কথাই ঠিক হলো। কিছুদিনের মধ্যেই এক সন্ধ্যায় নবীনকুমার মৌলা-আলীতে গিয়ে শুনলো যে পাখি উড়ে গেছে। সুবালা নিজেই পলায়ন করেছে, না অপর কোনো পুরুষ তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, তা অবশ্য বোঝা গেল না। দ্বারবানদ্বয়কে তর্জন গর্জন করায় তারা স্বীকার করলে বটে যে কয়েক-দিন ধরে এক সুদর্শন বাবু এ বাড়ির সামনে দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করেছে।

নবীনকুমার বিশেষ আশ্চর্য হলো না। গত এক মাস ধরে সুবালা তার জীবন বিষময় করে তুলেছিল, দেখা হলেই তাকে নপুংসক বলে গালিগালাজ করতো। পুরুষের সাহচর্যহীন তথাকথিত সুস্থজীবনে সুবালা ফিরে যেতে চায় না। সুবালার অনুসন্ধান করে আর কোনো লাভ নেই বলে নবীনকুমার মৌলা-আলীর বাড়িটির পাট তুলে দিল শীঘ্রই।

সুবালা-পর্বটি নবীনকুমারের জীবনে সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ একটি বড় দাগ রেখে গেল।

সারাদিন পরিশ্রম, তার উপরে রাত্রি জাগরণ ও মাত্রাহীন সুরাপানের ফলে এক সময় নবীনকুমার গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হলো। সপ্তাহকালের মধ্যেই জীবন-সংকট দেখা দিল তার, বড় বড় চিকিৎসকরা হতাশ হলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু, প্রখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবীনকুমারকে দেখতে এসে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তিনি হরিশ মুখুজ্যের চিকিৎসা করেছিলেন, নবীনকুমারের রোগে যেন হরিশেরই লক্ষণ দেখতে পেলেন। কিন্তু হরিশের তবু সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছিল, নবীনকুমারের যে সবে মাত্র তেইশ!

সাহেব ডাক্তাররা এসে নিয়মমাফিক ঔষধ দিয়ে গেছেন, দুজন কবিরাজকে এনেও দেখানো হয়েছে। ছোট ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য গঙ্গানারায়ণ পরামর্শ নিয়েছে শহরের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের কাছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের খরচে যে-দুজন বঙ্গসন্তান প্রথম বিলাতে ডাক্তারি পড়তে যায়, তাদের মধ্যে একজন সূর্যকুমার চক্রবর্তী। খ্রিস্টিয়ান হয়ে ফিরে এসে সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী নাম নিয়েছেন। বর্তমানে দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশী নাম ডাক। এই সূর্য-কুমারের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল, সুতরাং সূর্যকুমারের মতামতের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে লাগলো সে।

সূর্যকুমার একদিন গঙ্গানারায়ণকে নিভৃতে বললেন, মিঃ সিংহ, আমি আপনাকে একটি প্লেইন ট্রুথ বলতে চাই। যে-কোনো রোগেই, যত ভালো মেডিসিনই থাক, সর্বোত্তম ঔষধ হলো উইল টু লিভ, উইল টু সারভাইভ...এই উইল পাওয়ারের মতন ঔষধ আর নেই। আপনার কনিষ্ঠের মধ্যে সেইটিই আমি ল্যাকিং দেকচি। হোয়াই...দিস ইয়াং ম্যান ইজ সো মোরোজ! একটি কথা পর্যন্ত বলে না...

গঙ্গানারায়ণ বললো, শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েচে।

সূর্যকুমার বললেন, এমন উইক নয় যে বাক্‌শক্তি নেই, এমন ফীবল নয় যে কতা শুনতে পাবে না! অথচ সে আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না, আমাদের কতা শুনতে পাচ্ছে কি না, তাও বোঝা যায় না...

—ডক্তর চক্রবর্তী এর প্রতিকার তো আপনাকেই কত্তে হবে।

—দিস ইয়ং ফেলো ইজ অ্যানাদার ভিকটিম অব ইনটেমপারেন্স, তা তো বোঝাই যাচ্চে! সাচ ইজ দি স্যাড স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স ইন আওয়ার কাণ্ট্রি যে ভালো ভালো ইয়ংম্যানেরা বিলাতি প্রথার মোহে...সে যাক, কিন্তু বয়েস বেশী হয়নি, লীবারটি এমন কিছু ড্যামেজড হয়নি যে সারিয়ে তোলা যাবে না! কিন্তু এই নৈরাশ্য কেন? অর্থ-সম্পদ, সুখ-ভোগ কোনো কিছুরই অভাব নেই কো।

—কিন্তু ও তো এমন কিছু বেশী ড্রিঙ্ক করে না। কত হুমদো হুমদো মাতাল দিবারাত্র বোতল সেবা করে, তারপরও তারা অনেক বয়স পর্যন্ত দিব্য চলে ফিরে বেড়ায় আর ছোটকু তো মাত্র কয়েক মাস...

—সেই কতাই তো বলচি! এক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হচ্চে উইল পাওয়ার... একটি রোগ আচে, তার নাম মেলানকোলিয়া, প্রাচীন গ্রীস দেশের উচ্চবংশীয়

ব্যক্তিদের এই রোগ হতো, অতিরিক্ত সুখভোগ ও স্বেচ্ছাচার থেকে এই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা রোগ জন্মায়—

—ডক্তর চক্রবর্তী, আমার ভাইটি যে নিছক ভোগী ও স্বেচ্ছাচারী নয়, তা নিশ্চয় আপনি জানেন? কত বড় মহৎ অন্তঃকরণ তার, দেশের লোক তার নামে ধন্য ধন্য করে, সে প্রতিভাবান।

—তবু এ রোগের লক্ষণ দেখে মেলানকোলিয়াই বোধ হয় আমার। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ব্যাধির কোনো দাওয়াই নেই। এ বিষয়ে আপনি আমাদের রেসপেকটেড সীনিয়র কলিগ দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে কনসালট করতে পারেন।

—তিনিও তো দেকচেন।

—তিনি আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, তিনি যদি পারেন আপনার ভাইকে কতা বলাতে, তবেই উন্নতি সম্ভব। আমার কোনো প্রশ্নের তো সে জবাবই দেয় না!

একথা ঠিকই, অসুস্থ হবার পর থেকে নবীনকুমার কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা কয় না। সরোজিনী বা গঙ্গানারায়ণের শত প্রশ্নের সে শুধু হুঁ-হাঁ উত্তর দেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে নবীনকুমার কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে শ্রবণ ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। এবার তার তেমন কিছু হয়নি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ সজাগই আছে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সে তার জিহ্বার ব্যবহার করতে নারাজ। এবারে তার রোগের প্রধান উপসর্গ বমি। কিছু তার পেটে সহ্য হয় না, যে-কোনো খাদ্য, এমনকি ঔষধ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করলেই সে উগরে দেয়। কোনো চিকিৎসকই এই বমি বন্ধ করতে পারছেন না। শরীর একেবারে কঙ্কালসার হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে, শুধু তার চক্ষুদুটি অত্যুজ্জ্বল। মুখখানিতে বিমর্ষতার কালিমা লিপ্ত। যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাকে, সে শুধু ঘরের কড়িকাঠ দেখে।

কোনো প্রবল দুঃখ বা অভিমানে যে নবীনকুমার জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প নিয়েছে, তাও নয়। কোনো অভিযোগ নেই তার, কোনো দাবি নেই। এমনিই তার আর কিছু ভালো লাগে না। তার মতন চঞ্চল ও জেদী স্বভাবের যুবকের এই আকস্মিক পরিবর্তনই সকলের কাছে অস্বাভাবিক লাগে। কথা বলে না কেন সে?

সরোজিনী মনের দিক থেকে আজও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। যে-কোনো বিপদেই সে শুধু পাশবন্ধ পক্ষিণীর মতন ছটফট করতে জানে। তার এমন রূপবান, গুণবান স্বামী, অথচ গত দু-এক বৎসর ধরেই সে সরোজিনীর প্রতি কেমন যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে। কী করে স্বামীকে ফেরাতে হয়, সে বুদ্ধি তার নেই। নবীনকুমারের নিদারুণ অসুখের সংবাদ শুনে তার পিত্রালয়ের লোকেরা ছুটে এসেছে। কিন্তু তারা আসায় হই চই হাঙ্গামাই বেড়েছে এ বাড়িতে, গঙ্গানারায়ণ চিকিৎসার ব্যাপারে তো কোনো কিছু বাদ রাখেনি!

গঙ্গানারায়ণ বারবার কাতরভাবে জিজ্ঞেস করে, তোর কী হয়েচে, ছোটকু, আমায় খুলে বল। ডাক্তাররা তো বলেচেন, তুই সেরে উঠবি! বমি বন্ধ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবু তুই এত মন-মরা হয়ে থাকিস কেন? কী হয়েচে তোর মনে?

নবীনকুমার সংক্ষিপ্তভাবে বলে, কিচু না!

—তোর কিচু খেতে ইচ্ছে করে? কারুকে দেকতে ইচ্ছে করে? ওস্তাদ ডাকবো, তুই গান শুনবি?

—নাঃ!

—হাওয়া ফেরাবার জন্য তুই কোতাও যেতে চাস?

—নাঃ!

—সব না না করিস কেন? তুই কী চাস বল! লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোর মনের মধ্যে কী আচে আমায় বল!

—কিচ্ছু না!

এইভাবে কী করে আর কথা চালানো যায়। তবু গঙ্গানারায়ণ হার মানে না। নিজের স্ত্রী কুসুমকুমারীকেও সে বলেছে নবীনকুমারের সেবা করতে। সরোজিনীর সঙ্গে কুসুমকুমারী এই কক্ষে প্রায়ই এসে বসে থাকে। তার সঙ্গেও কথা বলে না নবীনকুমার। এর আগে কুসুমকুমারীর বিবাহের পর এ বাড়িতে যে-কয়েকবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, নবীনকুমার তাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে বৌঠান ও আপনি বলে সম্বোধন করেছে। কুসুমকুমারী যে এক সময় তার প্রথমা পত্নীর মিতেনী ছিল, সে সম্পর্ক সে অস্বীকার করেছে।

কুসুমকুমারী কৌতুক করতে চেয়েছে তার সঙ্গে, দেবরের সঙ্গে সে তো কৌতুক করতেই পারে কিন্তু নবীনকুমার আমল দেয়নি। হরিশের মৃত্যুর পর থেকেই সে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকদিনই একবার করে আসেন। অন্যান্য রোগী দেখার পাট চুকিয়ে এখানে আসতে তাঁর একটু রাত হয়। নবীনকুমারের শয্যার শিয়রের পাশে তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ মুখে বসে থাকেন। এমন রোগ তাঁর আগে চোখে পড়েনি। সামান্য বমি থামানো যাচ্ছে না। এ ভেদ বমিও নয়, তাহলে তিন-দিনের বেশী কাটতো না। কোনো আহার্যই পেটে না গেলে এ রোগী বাঁচবে কী করে?

দুর্গাচরণের মনে পড়ে, এই নবীনকুমারেরই হাতে-খড়ির সময় তিনি আচার্য হয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। তখন এ পঞ্চমবর্ষীয় বালক। সেই বয়সেই কী চমকপ্রদ ছিল এর ব্যবহার, একদিনেই ইংরেজী-বাংলা বর্ণমালার একটি করে অক্ষর লিখে দেখিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি এই বালকটির উত্থান লক্ষ করছেন। এর সব কিছুই এর বয়েসের তুলনায় অতি অগ্রসর। ত্রয়োদশ বৎসরে এ স্থাপন করেছে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, চতুর্দশ বৎসরে স্বগৃহে মঞ্চ বেঁধে এমন নাটকের অভিনয় করলো, যাতে সাহেবরা পর্যন্ত তাজ্জব। সে নিজেই ছিল পরিচালক ও নায়ক। পঞ্চদশ বৎসরে সে তারও ওপরে হলো স্বয়ং নাট্যকার। অষ্টাদশ বৎসরে সে হাত দিল মহাভারত অনুবাদের মতন সুবিশাল কাজে। সেই যুবকের এই পরিণতি! তেইশ বৎসর বয়সে সে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যকৃৎ আহত করে শয্যাশায়ী। চক্ষু দুটি ব্যতীত সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ মুখ, যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি! অতিরিক্ত প্রতিভাবানদের কি এমনই হয়? তাদের মেধা ধারণ করার মতন ক্ষমতা শরীরের থাকে না!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নবীনকুমারের এই রূপান্তরের কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছেন। দুর্গাচরণের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত সংবাদ নেন নবীনকুমারের। তিনি দুর্গাচরণকে সখেদে বলেছেন, বুনিয়াদি বংশগুলির মধ্যেই বুঝি এই অভি-শাপ আছে, বাপ-পিতামহর ধারা ছাড়তে পারে না কিছুতেই। তবে যাই বলো, ঐ ছেলেটির ওপর আমি ঠিক রাগ করতে পারি না।

দুর্গাচরণ মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা নবীন, শুনলুম তো আজ সারাদিনে তুমি এককণা খাদ্যও গ্রহণ করো নি। এখন একটু ঘোলের সরবত খাবে?

নবীনকুমার বললো, না।

দুর্গাচরণ বললেন, একেবারে কিছু না খেলে কী করে চলে? বমির ভয় পাচ্ছো তো? এক বাটি ঘোল খেয়েই দ্যাখো না।

—নাঃ!

—একেবারেই ইচ্ছে নেই!

—নাঃ!

দুর্গাচরণ চমকে উঠলেন। নবীনকুমারের মুখে কিসের গন্ধ? এ তো ব্র্যান্ডি ছাড়া কিছু নয়!

—নবীন, তুমি আবার মদ্যপান শুরু করেছো?

নবীনকুমার চুপ!

দুর্গাচরণ নিচু হয়ে দেখলেন, পালঙ্কের তলায় ফরাসী কনিয়াকের একটি বোতল রক্ষিত আছে। কী সর্বনাশের কথা! যে রোগীর উদরে একদানা অন্ন নেই, সে করছে মদ্যপান! এ যে বিষ! ঘরে কোনো গেলাস বা জলের পাত্রও নেই, অর্থাৎ কোনো সময়ে নিরালা পেয়ে নবীনকুমার ঐ বোতল থেকে নির্জলা চুমুক দিয়েছে।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গানারায়ণ, তার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এ সব কী? এ যে ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেলার পাকা ব্যবস্থা! কে ওকে ঐ ব্র্যান্ডির বোতল এনে দিয়েছে?

গঙ্গানারায়ণ তখনই লোকজন ডাকাডাকি ও হইচই শুরু করে দিল। এবং আসামী খুঁজে পেতে মোটেই বিলম্ব হলো না। কে আর নবীনকুমারকে ব্র্যান্ডি এনে দেবে, অতি প্রভুভক্ত দুলালচন্দ্র ছাড়া? দুলালচন্দ্র তো এ কক্ষের দ্বারের পাশে প্রায় সর্বক্ষণই দণ্ডায়মান থাকে।

একটু জেরা করতেই দুলালচন্দ্র স্বীকার করে ফেললো, সে কী করবে, সে তো জীবনে কখনো নবীনকুমারের কোনো হুকুম অমান্য করে নি! প্রভু চাইলেও সে দেবে না, তার ঘাড়ে ক'টা মাথা!

অত্যন্ত উত্যক্তের মতন হয়ে দুর্গাচরণ বললেন, আর আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। মানুষটাকে যদি বাঁচাতে চাও তো জোর করে কিছু খাওয়াতে হবে। নিয়ে এসো এক বাটি ঘোল।

নবীনকুমারের সামনে এসে তিনি চিকিৎসক নয়, পারিবারিক অভিভাবকের মতন কঠোর স্বরে বললেন, ওসব মতলোব তোমার খাটবে না আর! এবার জোর করে...ঐ গঙ্গা একদিক ধরবে, আমি একদিক ধরে জোরের সঙ্গে ঠোঁট ফাঁক করে গেলাবো! এত সহজে তুমি আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে চাও?

নবীনকুমার কোনো প্রতিবাদ করলো না, একটি কথাও বললো না, মুখ হ্যাঁ করলো। সরোজিনী ঝিনুকে করে ঘোলের সরবত ঢেলে দিতে লাগলো তার মুখে। পুরো এক পাথরের বাটি ভর্তি ঘোলই পেটে গেল নবীনকুমারের। এবং শেষ হওয়া মাত্র সে উঠে বসে ওয়াক তুললো। সবটাই বেরিয়ে গেল আবার।

সকলে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। স্বেচ্ছায় মানুষ এভাবে বমি করতে পারে না। সত্যিই কোনো খাদ্য-পানীয় নবীনকুমারের পেটে সইছে না।

দুর্গাচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আগে থেকেই খালি পেটে ব্র্যান্ডি গিলেছে, এর পর আর ঘোল সইবে কেন? তবু হাল ছাড়া চলবে না। কাল সক্কাল থেকে এরকমভাবে আবার খাওয়াবে। না খেতে চায় জোর করবে!

এর পর সরোজিনী এবং গঙ্গানারায়ণ যুগপৎ অনেকক্ষণ ধরে হা-হুতাশ ও কাকুতি-মিনতি করলো নবীনকুমারের সামনে। নবীনকুমার নীরব, নিঃস্পন্দ হয়ে

রইলো।

গঙ্গানারায়ণ দুলালচন্দ্রকে শাসিয়ে দিল, ফের যদি সে নবীনকুমারের কাছে মদের বোতল নিয়ে যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ তার চাকরি তো খতম হবেই, তাকে মারতে মারতে দেশ-ছাড়া করে দেওয়া হবে।

পরের দিনটিও কাটলো প্রায় একইভাবে। সারা দিনে তিন চার বার খাদ্য খওয়ানো হলো নবীনকুমারকে। প্রত্যেকবারই সে বমি করলো। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী একটি রবারের নল দিয়ে তার পেটের একেবারে মধ্যে তরল খাদ্য পেৌঁছে দেবার চেষ্টা করলেন, তাতেও বিশেষ সুফল হলো না।

সূর্যকুমার জিজ্ঞেস করলো, নবীনবাবু, শুধু একটি কতার উত্তর দিন আমাকে। যাস্ট ওয়ান আন্সার। আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তান্বিত হলো নবীনকুমার। তারপর ম্লান খসখসে গলায় বললো, হ্যাঁ, করে!

সেদিন রাত্রি দশটার পর কিছুক্ষণের জন্য নবীনকুমারের কক্ষ ফাঁকা। এক সময় পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো দুলালচন্দ্র। চোরের মতন এদিক ওদিক চেয়ে ঝট্ করে চাদরের আড়াল থেকে বার করলো একটি ব্র্যাণ্ডির বোতল। ফিসফিসিয়ে বললো, ছোটবাবু এনিচি!

সঙ্গে সঙ্গে একটি নাটকীয় কাণ্ড হলো। সেই কক্ষটি যেন একটি মঞ্চ। দু'দিকের দুই দ্বার যেন উইংস। সেই দুই দ্বার দিয়ে ঝটিতি এসে ঢুকলো দুই নারী, সরোজিনী ও কুসুমকুমারী। তারা এসে দাঁড়ালো দুলালের দু'পাশে।

কুসুমকুমারী বললো, ওটা দে আমাকে।

দুলাল প্রভুর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে কুসুমকুমারী দাপটের সঙ্গে এক ধমক দিয়ে বললো, দে বলচি! তোর এত সাহস! আজ তোর এ বাড়ি থেকে পাট উঠলো, যা বিদেয় হয়ে যা!

সরোজিনী বললো, আপদ, তুই এক্ষুনি দূর হ!

দুলালচন্দ্র বোতলটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে দৌড়ে প্রস্থান করলো।

কুসুমকুমরী বললো, আমরা দুই বোনে এখেনে উপোসী হয়ে বসচি। সারা রাত থাকবো, আপনি না খেলে আমরাও খাবো না। আয় সরোজ—

সত্যিই এই বাড়ির দুই বধূ পালঙ্কের কাছে মেঝেতে বসলো পাশাপাশি। এই নাট্যে অবশ্য নবীনকুমার এখনো একটিও সংলাপ উচ্চারণ করলো না।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটি এখনো মেঝের ওপর দাঁড় করানো। কুসুমকুমারী সেদিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। তার চক্ষে জল এসে যাচ্ছে। তার পিত্রালয়ে এ দ্রব্যটির কোনো প্রভাব সে দেখেনি। কিন্তু অনেকদিন আগে, যেন তার পূর্বজন্মে, অর্থাৎ তার প্রথম বিবাহের সময় সে দেখেছে ঐ বোতলের জন্য দুর্গামণির জীবনটা কেমন নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক দিন পর দুর্গামণির কথা মনে পড়ে মুচড়ে উঠছে তার বক্ষ। সরোজিনীর জীবনও সে কিছুতেই বিনষ্ট করতে দেবে না।

একটু পরে সে বললো, কোনো দাসীকে ডাক্, ওটা নিয়ে গিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসুক!

এবার নবীনকুমার বললো, ওটা আমায় দাও, সরোজ!

সরোজিনী সভয়ে তাকালো কুসুমকুমারীর দিকে।

নবীনকুমার পাশ ফিরে তার দৃষ্টির চুম্বকে সরোজিনীকে আকৃষ্ট করতে চেয়ে এবং একটি হাত বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বললো, দাও!

সরোজিনী বললো, ও দিদি...।

কুসুমকুমারী উঠে দাঁড়ালো। পালঙ্কের কাছে এসে তার নীল চক্ষুমণি দুটি স্থিরভাবে নবীনকুমারের দিকে রেখে কোমল অনুনয়ের স্বরে বললো, ছিঃ, অমন করে না! কেন এই সর্বনাশ কচ্চেন আপনি—

নবীনকুমার খুব থেমে থেমে বললো, অনেক রাত হয়েচে, নিজের ঘরে যান, বৌঠান—।

—না, আমি যাবো না। আমি সরোর সঙ্গে এখেনে থাকবো। সরো ছেলেমানুষ, আপনাকে ভয় পায়, আমি তো পাই না...আপনি কিচু না খেলে আমরাও না খেয়ে থাকবো, দেকি আপনি কতদিন পারেন!

গা থেকে চাদরটি সরিয়ে নবীনকুমার আস্তে আস্তে উঠে বসলো। দেখলে ভয় হয়, যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল। তার গায়ের নিমাটি ঢলঢল করছে। গলার ওপর মাথাটা যেন শরীরের তুলনায় অনেক বড়।

নবীনকুমারকে পালঙ্কের বাইরে একটা পা বাড়াতে দেখে কুসুমকুমারী বললো, ও কি, ও কি কচ্চেন?

উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ না করে অমানুষিক চেষ্টায় নবীনকুমার নামতে চেষ্টা করলো পালঙ্ক থেকে। ইদানীং অন্তত দুজন ধরাধরি না করলে সে মাটিতে দাঁড়াতেই পারে না, এখন সে একা যাবার চেষ্টা করছে।

সরোজিনী চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো, ও মা গো, কী হবে, কী সর্বনাশ, ওগো কে কোতায় আচো—

দাসী-বাঁদী, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছুটে এলো গঙ্গানারায়ণ। নবীনকুমার তখন মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েছে। সরোজিনী আর কুসুমকুমারী তাকে দু'দিক থেকে ধরতে যেতেই সে রুক্ষস্বরে বললো, ছেড়ে দাও!

গঙ্গানারায়ণ ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী হয়েচে, ছোট্‌কু? তুই কী চাস্‌!

নবীনকুমার বললো, সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলো। নইলে আমি এখেনে থাকবো না।

—বলচি, বলচি, সবাই চলে যাবে, তুই আগে শো—।

নবীনকুমারকে প্রায় জোর করেই ধরে এনে গঙ্গানারায়ণ শুইয়ে দিল পালঙ্কে। অন্যান্য কৌতূহলীদের চলে যাবার হুকুম দিয়ে গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারীকে বললো, দোরটা বন্ধ করে দাও!

নবীনকুমার বললো, ঐ ব্র্যান্ডির বোতলটা দাও আমাকে!

—তুই, তুই...এই অবস্থায়...ডাক্তাররা বলেচেন—

—দাও!

—না, কিছুতেই না! তুই এমন ছেলেমানুষী করিস নি, ছোট্‌কু!

—তোমরা আমায় মেরে ফেলতে চাও? এ কতা বোঝো না যে শুধু ঐ ব্র্যান্ডি খেলেই আমার বমি হয় না!

—কিন্তু খালি পেটে ওটা খেলে—

—দাও!

—ছোট্‌কু, তুই শুয়ে পড়। যদি খেতেই হয় আমি তোর গলায় দু চার ফোঁটা ঢেলে দিচ্চি, আর জেদ করিস নি, ছোট্‌কু—

অতি শীর্ণকায় এবং মৃতপ্রায় নবীনকুমার যে এখনো এই সিংহ পরিবারের প্রধান পুরুষ, তা তার ব্যবহারে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। গঙ্গানারায়ণের কথা গ্রাহ্য

না করে শয্যার ওপর উপবিষ্ট অবস্থায় সে হাত বাড়িয়ে বসে রইলো।

গঙ্গানারায়ণ মেঝে থেকে তুলে নিল বোতলটি। কুসুমকুমারী আর্তস্বরে বললো, আপনি দিচ্ছেন?

গঙ্গানারায়ণ তবু নিরুপায়ভাবেই বোতলটি এগিয়ে দিল কনিষ্ঠের হাতে।

কম্পিত হাতে ছিপিটি খুলে বোতলের মুখটি ওষ্ঠে ছোঁয়ালো নবীনকুমার। কিন্তু দু'চার ফোঁটার বেশী তার মুখে গেল কিনা সন্দেহ! বোতলটি সে ধরে রাখতে পারলো না। তার হাত থেকে খসে পড়ে সেটি ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। সমস্ত কক্ষ পূর্ণ হয়ে গেল তীব্র সুরার গন্ধে।

রেলওয়ের চাকরিতে আর ফিরে গেল না চন্দ্রনাথ। বৈঠকখানার বাসাবাড়ি ছেড়ে সে চিৎপুরে ফৌজদারি বালাখানার পাশে একটি মাঝারি ধরনের গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসলো! হাতে কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, কিন্তু তা দিয়ে সারা জীবন চলবে না, সুতরাং সে গ্রহণ করলে নতুন পেশা।

সে নিজেই একটি পদবী জুড়ে দিয়েছে তার নামের সঙ্গে, বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা সাইন বোর্ড। তাতে ইংরেজি ও বাংলায় এই মর্মে লেখা আছেঃ অপূর্ব সুযোগ! অপূর্ব সুযোগ! হিমালয়ের সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দৈব ঔষধ! ভূত-প্রেত-পেত্নী, ধনুষ্টংকার, স্বপ্ন দোষ, চোয়াল-আটক, সাহেব-ভয়, পত্নী-প্রহার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রত্যক্ষ চিকিৎসা করিয়া থাকি। ফিস মাত্র দুই টাকা। এক পক্ষকালের মধ্যে হাতে হাতে ফল না পাইলে মূল্য ফেরত। সাক্ষাৎকারের সময় সকাল নয়টা হইতে এক ঘটিকা। প্রোঃ চন্দ্রনাথ ওঝা।

প্রথম প্রথম খদ্দের তেমন আসে না, লোকে সাইন বোর্ডটি পড়ে, মুচকি হাসে, কেউ কেউ বলে, ওঝাও ইংরিজি শিকেচে, এঃ? কালে কালে কতই দেকবো!

দু' একজন ওঝার চেম্বারে উঁকিঝুঁকি মেরেও বিশেষ রকম কৌতুক ও বিস্ময় বোধ করে। ভূত কিংবা সাপের বিষ-ঝাড়ানো ওঝা কে না দেখেছে, তাদের চেহারা হয় কাপালিকদের মতন, রক্তাম্বর ভূষিত, মাথার চুলে জট। কিন্তু এ যে একেবারে সাহেব-ওঝা! হাট-কোট-প্যান্ট পরা, সামনের টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসে ফুক ফুক করে সিগারেট টানে। পায়ে আবার ইংলিশ জুতো!

মেডিক্যাল কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং পরে এম ডি পাশ করা ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার সম্প্রতি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষে প্রচার শুরু করায় শহরে নতুন হুজুগ উঠেছে! হেকিমী-কবিরাজি-টোট্‌কা চিকিৎসা ছাড়িয়ে এতদিনে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অনেকে। এ আবার কী নতুন জিনিস এলো! শুধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারই নয়, প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের নাতি রাজা দত্ত-ও এই হোমিওপ্যাথি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, এবং সঙ্গে আছেন কয়েকজন সাহেব! চিনির দানার মতন ছোট ছোট কয়েকটা সাদা রঙের

বড়ি আর জলের মতন স্বচ্ছ, দেখলে মনে হয় জলই, তার কয়েকটা ফোঁটা খেলেই সেরে যাবে বড় বড় রোগ? এও আর এক রকমের ভেল্কি নয়?

চন্দ্রনাথের সাইন বোর্ড দেখে অনেকে ভাবলো, কোনো ট্যাঁস ফিরিঙ্গি বোধহয় আর এক রকম ভেল্কি দেখাতে এসেছে।

কাল্লু শেখ নামে একটি মুসলমান কিশোরকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে চন্দ্রনাথ। ছেলেটি তার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল একদিন। ছেলেটিকে এক নজর দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল চন্দ্রনাথ। ছেলেটির মাথায় চুল নেই, এমনকি ভুরুও নেই। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে তার সম্পূর্ণ শরীর কেশহীন, নির্লোম। বাপ-মা হারা ঐ কাল্লুর স্থান ছিল শহরের আস্তাকুঁড়ে, পোকামাকড়ের মতন আবর্জনা খুঁড়ে খেত, তার ঐ বিচিত্র চেহারার জন্য তাকে দেখলেই ঢিল মারতো পল্লীর বালকেরা।

চন্দ্রনাথ তাকে স্বগৃহে স্থান দিয়ে উত্তম খাদ্য খাইয়ে কয়েক দিনেই চাঙ্গা করে তুললো। জীবনে কারুর কাছ থেকে একটিও স্নেহ-বাক্য না শুনলেও ছেলেটি বেশ হাসি খুশী। চন্দ্রনাথের বেশ ভালো সময় কাটে তার সঙ্গে। কাল্লু শেখের নাম বদলে দিয়ে সে বলেছে, শোন্, এখন থেকে তোর নাম হলো সুলতান, তুই মনে করবি এই কলকাতা শহরটার তুই-ই মালিক, কারুকে ভয় পাবি না, বুঝলি। এবার বল্, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

ছেলেটি বললো, মাই নেম ইজ কাল্লু শেখ!

—অ্যাই ও! বললুম না, তোর নাম আজ থেকে সুলতান?

—জী সরকার, সুলতান!

—ফের জী সরকার বলছিস? বলবি, ইয়েস স্যার!

—ইয়াস ষাঁড়!

—ওতেই হবে। এবার বল্, শশার ইংরিজি কী?

—কুকামবার।

—লাউ কুমড়ো?

—পমকিন!

—চাষা?

—প্লৌমান!

—বাঃ! বাঃ!

মাত্র ছ' মাসে এতখানি ইংরেজি শিখে নিয়েছে সে। তাছাড়া সে চন্দ্রনাথের সঙ্গে কুস্তি করে, গঙ্গায় গিয়ে সাঁতার কাটে, অনেক উঁচু উঁচু স্থান থেকে লম্ফ দেয়। চন্দ্রনাথ তাকে এ সব শিক্ষা দেয় বিশেষ উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রনাথের প্রথম খরিদ্দার এলো এক আর্মেনিয়ান জুতোর ব্যবসায়ী। কলকাতা শহরে ভূত-প্রেতের উপদ্রব নিত্য লেগে আছে। এই আর্মেনিয়ান সাহেবটি কাশীপুর অঞ্চলে শখ করে একটি বাগান বাড়ি কিনেছিল। গত এক মাস ধরে সে বাড়িতে ভূত লেগেছে। শুধু শোনা কথা নয়, আর্মেনিয়ান সাহেবটি নিজে সেখানে গিয়ে থেকে দেখেছে। যখন তখন ভূতে ঢ্যালা ছোঁড়ে, মাথায় হিসি করে দেয়, দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও কালো বেড়াল হয়ে ঘরে ঢোকে—ইত্যাদি। গ্রাম্য ওঝা নিয়োগ করে কোনো কাজ হয়নি, তাই সে এসেছে এই ট্যাঁস ফিরিঙ্গির কাছে।

পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে চন্দ্রনাথ কাজটি হাতে নিল এবং সাত দিনের মধ্যে সেই কাশীপুরের বাগানবাড়ি ভূত-মুক্ত করে ফেললো। তাতে তার নাম হলো

একটু, ক্রমে একটি দুটি করে খরিদ্দার বাড়তে লাগলো।

লোকজন এলে চন্দ্রনাথ নানা রকম রঙ্গ কৌতুক করে। রাজস্থানের এক ব্যবসায়ী এসেছে তার ভাগ্নেকে নিয়ে, ভাগ্নেটির চোয়াল-আটক হয়েছে। মুখ-খানি হাঁ করা। বন্ধ করতে পারছে না কিছুতেই. চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, তিনদিন ধরে এই অবস্থা। রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে মাঠে গিয়ে প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করার সময় কিছু দেখতে পেয়ে ভয়ে নাকি এ রকম হয়েছে।

সব বিবরণ শুনে চন্দ্রনাথ হাঁক দেয়, সুলতান!

তখনই ঘরের মধ্যে থপ্ থপ্ করে কী যেন ঢোকে। দেখেই আঁতকে ওঠে ব্যবসায়ী এবং তার ভাগ্নেটি। সারা অঙ্গে আঁট মখমলের পোশাক পরা সুলতান হেঁটে আসে দু' পায়ে নয়, দু হাতে, পা দুটি ওপরে।

ব্যবসায়ীটি চেঁচিয়ে ওঠে, সীয়া রাম, সীয়া রাম! এ কৌন্...?

চন্দ্রনাথ খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলে. ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। ও আমার অ্যাসি-স্ট্যান্ট!

ভাগ্নেটির অবশ্য এতেও চোয়াল বন্ধ হয়নি।

সুলতানের মুখে কামড়ানো একটা কলম। চন্দ্রনাথ সেটি নিয়ে সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন লেখে, তারপর সুলতানের পায়ের আঙুলের ফাঁকে সেটি গুঁজে দিয়ে বলে, চট্পট ওষুধ নিয়ে এসো!

সুলতান নাকি সুরে বলে, ইঁয়াস ষাঁড়! তারপর একই রকমভাবে থপথপিয়ে চলে যায়।

চন্দ্রনাথ তখন সিগারেট ধরিয়ে বলে, ওকে এনেছি ছিল্‌কি গড়ের একটা হানা বাড়ি থেকে। সব রকম কাজ জানে!

একটু পরেই ঘরের ছাদ থেকে কী যেন একটা মিশমিশে কালো রঙের প্রাণী লাফিয়ে পড়ে একেবারে ভাগ্নেটির ঘাড়ের ওপরে। ব্যবসায়ী এবং তার ভাগ্নে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে. আই বাপ. আই বাপ. মর গ্যয়া. মর গ্যয়া।

হাসতে হাসতে দুদিকে অনবরত মাথা দোলাতে থাকে চন্দ্রনাথ। সুলতানই কালো চাদর জড়িয়ে লাফিয়ে পড়েছে কড়িকাঠ থেকে। কোন্ কৌশলে সে ওখানে আসে. তা বাইরের কারুর জানবার উপায় নেই।

হাসি থামিয়ে চন্দ্রনাথ বলে. দিন. আমার ফিস্ দু' টাকা।

চন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী আমোদ পায় সাহেবভীতি রোগের চিকিৎসা করে। বর্ধমানে চাকরি করার সময় সে দেখেছে যে গ্রাম দেশে এই রোগ খুব প্রবল। কোনো ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে দৈবাৎ কোনো সাহেব উপস্থিত হলে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পলায়ন করে তো বটেই, কখনো কখনো দু' একজনের ঐ রোগ ধরে যায়। দূর থেকে কোনো সাহেব দেখলেই কিংবা সাহেব শব্দটি উচ্চারিত হলেই তারা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এমনকি কোনো দয়ালু. হৃদয়বান সাহেবও তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলেরই এই রোগ হতে পারে।

হয়তো কোনো বর্ধিষ্ণু চাষীর সন্তানের সারা গায়ে খুজ্‌লি কিংবা দাঁতের রোগ হয়েছে. শহরে এনে চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি আছে সেই চাষীর। কিন্তু সেই চাষীর ছেলের যদি সেইসঙ্গে সাহেব-ভীতি রোগও থাকে. তা হলেই মুশ-কিল। শহরে এলে একটি দুটি সাহেব চোখে পড়বেই, আর তখনই তার হাত পা

ঠকঠকিয়ে কেঁপে মৃগী রোগীর মতন ফেনা বেরুবে মুখ দিয়ে। এমনকি চীনেম্যান দেখলেও ওরা সাহেব ভেবে ভয় পায়। অথচ খুজলি কিংবা দাঁতের রোগ, দুটোরই চিকিৎসা চীনেম্যানরাই খুব ভালো জানে।

চাষীর সঙ্গে এসেছে তার পুত্র, হ্যাট-কোটধারী চন্দ্রনাথকে দেখেই বাবারে, সাহেবরে! বলে সে দাঁতে দাঁতে বাদ্য শুরু করে দেয়।

চন্দ্রনাথ তখন তাকে আরও ভয় দেখিয়ে বলে, হাঁ, হামি সাহেব আছি। টুম্ ডাকু। হামি টুমাকে মারিব!

চাষীর দিকে তাকিয়ে বলে, ভয় নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনার এই ছেলে সিধে হয়ে যাবে।

ছেলেটির কণ্ঠ পাকড়ে জোর করে ঠেলতে ঠেলতে চন্দ্রনাথ নিয়ে যায় ভিতরে। অন্য একটি ঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়, যাতে কোনো আওয়াজ বাইরে না যায়। একটি কাঠের টুলের ওপর জ্বলছে টেমী, তার পাশেই রাখা রয়েছে একটি হাতখানেক লম্বা কাঠের মুগুর।

চাষী ছেলেটির বয়েস ষোলো-সতেরো, বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, সারা গায়ে খুজলি। ছেলেটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে চন্দ্রনাথ আচমকা টেনে এক বিরাশি সিক্কা থাপ্পড় কষায়। ছেলেটি ছিটকে দেয়ালে পড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে।

তখন চন্দ্রনাথ হাঁক দেয়, সুলতান!

সেই ঘরেরই একটা কালো পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে সুলতান। বিচিত্র তার সাজ পোশাক! এক একটি রোগের জন্য তার পৃথক পৃথক সাজ আছে। আজ সে পাক্কা সাহেব। বুট জুতো, প্যাণ্ট-কোট-টুপী। মুখে একটি জ্বলন্ত চুরুট। ছোট্টখাট্টো চেহারার সুলতানকে দেখায় পুতুলের মতন।

সে এসেই নাক-মুখ ফুলিয়ে ভয়ানক রাগের ভঙ্গি করে বলে, ড্যাম কুকাম্বার! ড্যাম পামকিন! ড্যাম! ড্যাম!

তারপরই সে চাষীর ছেলেটির কাছে এসে কাটে এক রাম চিমটি। ছেলেটি বাবারে, মারে, গেলুম রে, ওগো ছোট পিসী তুমি কোহানে গ্যালে গো, বলে ডাক ছেড়ে কাঁদে আর সুলতানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘর জুড়ে দৌড়োয়। সুলতান অনবরত ড্যাম, ড্যাম বলতে বলতে তাকে তাড়া করে আর চিমটি কেটে যায়। মাঝে মাঝে সুড়সুড়িও দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি নাজেহাল হতে হতে মরীয়া হয়ে সুলতানকে উল্টে আঘাত করে একটা। সুলতান এর পরে একটা ছোট ছুরি হাতে নিয়ে ছেলেটিকে মারতে উদ্যত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে দাঁত কিড়মিড় করে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় ছেলেটি তখন হাতে তুলে নেয় সেই কাঠের মুগুরটি।

চন্দ্রনাথ গার্ড চেইন দেওয়া ঘড়ি বার করে কোটের পকেট থেকে। সে হিসেব করে দেখেছে, প্রায় সবার ক্ষেত্রেই পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লাগে। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এসে সে বলে, ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে।

সুলতানও তখন ছুরি সমেত হাতটি নামিয়ে হি হি করে হেসে বলে, তোমার নাম কী গো? অ ছেলে? আমার নাম সুলতান ছায়েব।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করে, আর কোনো দিন সাহেব দেখলে ভয় পাবে? কতায় আচে না, যেমন কুকুর তেমন মুগুর! তুমি শোনোনি!

চন্দ্রনাথের এই চিকিৎসায় সত্যিই কাজ হয়। কচিৎ কদাচিৎ দু একটি রোগী ফিরে আসে পুনরায় চিকিৎসার জন্য।

রাত্রে সুলতান আর চন্দ্রনাথ একত্রে খানাপিনা করে। নানারকম গল্প হয়। তারপর সুলতান ঘুমিয়ে পড়লে চন্দ্রনাথ একবার রোঁদে বেরোয়। শহরের পথে পথে একা একা টহল দেওয়া তার এক নেশা। তার আর একটি শখ মাতাল ধরে পেটানো। কু-পল্লীতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে সে, নিশাচর প্রমোদসন্ধানীদের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে বিবাদ বাধায়, তারপর তাদের বেদম প্রহার করে। চন্দ্রনাথের যা শারীরিক শক্তি, তাতে তিন চারজন ব্যক্তিকে সে কাবু করে দিতে পারে খালি হাতেই।

কখনো কখনো চন্দ্রনাথের ডাক না পড়লেও সে নিজেই কোনো ভূতের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। পাথুরেঘাটায় এক স্যাকরার একমাত্র পুত্রের দম-ফটকা রোগ হয়েছে। যখন তখন সে গেল গেল গেল রব তুলে চোখ উল্টে দড়াম করে পড়ে যায়। তারপরই সে ওরে বিষ্টু, ওরে বঙ্কা, ওরে জয়হরি প্রভৃতি অচেনা লোকের নাম ধরে ডাকে। স্যাকরাটির যা পয়সা তাতে সে এ শহরের অনেক হঠাৎ নবাবকে আহিরীটোলায় কিনে শালকের বাঁধাঘাটে বিক্রি করে দিতে পারে। ইনি সেই গুপী স্যাকরা, এখন গোপীমোহন স্বর্ণকার হয়েছেন। এক পাথুরেঘাটাতেই তাঁর তিনখানা বৃহৎ অট্টালিকা।

পুত্রের চিকিৎসার জন্য গোপীমোহন ইংরেজি ডাক্তার, বদ্যি হাকিম সবই ডেকেছেন। বাড়ির মেয়েরা কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন, কালভৈরবের স্তব পাঠ ও নানা স্থানের চরণামৃত ও মাদুলীর ব্যবস্থাও চালিয়ে গেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এ খুব জবরদস্ত প্রেতাত্মার ব্যাপার। গোপীমোহনের পুত্র লক্ষ্মীমোহনের পীড়া দিন দিনই দুরূহ রূপ নিচ্ছে, এখন তার দম ফেলতে খুবই কষ্ট হয়, কুকুরের মতন জিভ বার করে হাঁপায় এবং অন্য লোকের কণ্ঠে কথা বলে।

এবার আনানো হয়েছে মস্ত বড় এক গুণিনকে। পারিবারিক গুরুঠাকুরের মতন এই গুণিনের সঙ্গে সব সময় অনেক চ্যালা চামুণ্ডা ঘোরে। গোপীমোহন স্যাকরার বসত বাড়িতে একতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে ছ-সাত জন চ্যালা সমেত উঠেছেন সেই গুণিন। খুব ধুমধাম করে যাগযজ্ঞ চলছে কয়েকদিন ধরে, তারপর লোকের মুখে মুখে রটিত হয়ে গেল যে সামনের অমাবস্যার রাতে সেই গুণিন ভূত নামাবেন।

সন্ধে থেকেই সেদিন গোপীমোহনের বাড়ির সামনে প্রবল ভিড়। দ্বারবান দিয়েও তাদের গতি রোধ করা যাচ্ছে না। চল্লিশ পঞ্চাশজন ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়েছে একেবারে ভিতর মহলে। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রনাথ এবং সুলতান। আজ দুজনেরই পরনে ধুতি-কামিজ, সুলতানের মস্তকে আবার পাগড়ি।

বড় একটি হলঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার করে বসে আছেন গুণিন, সঙ্গে তাঁর নাকরেদরা। লক্ষ্মীমোহনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে এক পাশে কম্বল শয্যায়। ঘরের এক কোণে একটি আসন পাতা এবং তার সামনে অনেকগুলি বাসনে লুচি-মণ্ডা সমেত বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন। সে সমস্ত খাবার দশটা মানুষে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা রাখা হয়েছে ভূতের সেবার জন্য।

গ্রাম্য ওঝারা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রচুর গালমন্দ করে ভূতকে বার করে আনে। এই গুণিন অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিলেন দর্শকদের উদ্দেশে। কেরে-

ন্তানি ও ব্রাহ্ম-হুজুকের ওপরেই গুণিনের বেশী রাগ, দু পাত ইংরেজি পড়ে যেসব ছোকরারা দেশে অবিশ্বাসের ঝড় বইয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যই আজকাল এইসব রোগ সারে না! এর ফলে কিছু গোলযোগ দেখা দিল, দর্শকরা এতখানি কড়া গালিগালাজ হজম করতে রাজি নয়!

উত্তেজনা যখন চরমে ওঠার মতন অবস্থা, তখন গুণিন হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি ভূত নামাবেন না, আর একদণ্ডও এ বাড়িতে থাকবেন না। গোপীমোহন অসহায় ভাবে সকলের কাছে হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতি করছে, মশায়রা শান্ত হোন, শান্ত হোন!

শেষ পর্যন্ত রফা হলো, যারা অবিশ্বাসী তাদের চলে যেতে হবে, আর যারা বিশ্বাস করে তারা থাকতে পারে। অবিশ্বাসীদের দূষিত বাতাসে কোনো শুভ কাজ হয় না। একদল লোক তর্জন গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল, রয়ে গেল বেশীর ভাগই।

চন্দ্রনাথ এর মধ্যে একবারও টুঁ শব্দ করেনি। সুলতানকে নিয়ে শান্তভাবে বসে আছে এক পাশে।

এরপর গুণিন যথারীতি চিৎকার করে দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়তে লাগলো, এবং চ্যালারা ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় কাঁদিয়ে অস্থির করলো সকলকে। এক সময় হঠাৎ সব শব্দ থেমে যেতেই কিছুক্ষণের জন্য নেমে এলো অদ্ভুত নীরবতা। তারপর প্রথাসিদ্ধ ভূতের মতন নাকি সুরে কে যেন বললে, দূঁর হঁয়ে যাঁও, সঁবাই ঘঁর থেঁকে দূঁর হঁয়ে যাঁও!

গুণিন এবং তাঁর চ্যালারা সমেত সমস্ত দর্শককেই বেরিয়ে যেতে হলো ঘর থেকে, কিন্তু সামনের দরজা ও জানলা দুটি রইলো খোলা। দূর থেকেই যেন দেখা গেল ধোঁয়ায় ভর্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন ঘুরছে একাধিক ছায়ামূর্তি। এবং চক চকাস, কড়র মড়র শব্দ হতে বোঝা গেল প্রেতাত্মা খাবার খেতে বসেছে। দর্শকদের সকলেরই সর্বাঙ্গে শিহরণ হলো, দু' চারজন ভয়ে আর্ত শব্দ করে উঠলো, এক রমণী মূর্ছা গেল।

ভূত শুধু খাদ্যই গ্রহণ করছে না, মটর মট্ শব্দে তামাকও টানছে। সত্যিই অলৌকিক, রোমাঞ্চকর কাণ্ড!

কয়েক মুহূর্ত পরেই অবশ্য অন্য রকম কাণ্ড শুরু হলো। হঠাৎ ওয়াক ওয়াক শব্দ শুরু হলো। ভূতে বমি করছে। সে কি সাংঘাতিক বমি, যেন ভেদ বমির বাবা, ভোজন-বিলাসী প্রেতের যেন একেবারে শেষ দশা!

হতভম্ব দর্শকদের মধ্য থেকে হো-হো করে হেসে উঠলো চন্দ্রনাথ। অন্যদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বাতি জ্বালিয়ে ভৃত্যরা ছুটে এলে দেখা গেল, সেই গুণিন এবং তার দু-তিনজন চ্যালাই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বমি করছে। অতি করুণ দৃশ্য।

ব্যাপার আর কিছুই না, অন্ধকার ও ধোঁয়ার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রনাথ সুলতানকে পাঠিয়ে অনেকখানি টারমেরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছে ঐ খাদ্যদ্রব্যে। ঐ অ্যাসিড পেটে গেলে পাঁচ মিনিটের বেশী উদরে কিছু রাখা সম্ভব নয়।

হাসতে হাসতেই সুলতানের কাঁধে হাত দিয়ে চন্দ্রনাথ বললো, এবার চল।

ছাদের ছোট ঘরটিতে বসে নিবিষ্ট মনে পড়াশুনো করছে কুসুমকুমারী।

সারা দিনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই কুসুমকুমারী এইখানে কাটায়। স্থানটি বড় নির্জন, বড় মনোরম। গৃহের অন্যান্য বাসিন্দাদের সংগে কোনো সম্পর্ক থাকে না। দ্বিপ্রহরে চতুর্দিক একেবারে শুনশান, মধ্যে মধ্যে শুধু শোনা যায় পথের ফেরিওয়ালাদের হাঁক, শিল কোটাও! কুয়োর বালতি তোলাবে গো! দাঁতের পোকা ভালো করবে গো! বাসন চাই, বাসন! মীর্জাপুরী কাঁসার বাসন! হিং চাই, হিং! প্রত্যেকের একটি নিজস্ব সুর আছে। কাকের ডাক, শালিকের ডাকের সংগে ফেরিওয়ালাদের এই হাঁক যেন ঠিকঠাক মিলে যায়, সবই মনে হয় প্রকৃতির অংগ।

ছাদের আলসেতে বসেছে এক জোড়া চিল, মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় কুসুমকুমারীর দিকে। চিল দেখলে বড় ভয় হয় তার। কী তীক্ষ্ম ঠোঁট, আর সব সময় রাগী রাগী চোখ। খুব ছেলেবেলায় কুসুমকুমারীদের বাপের বাড়িতে হিমু নামে একটি বালক ভৃত্য ছিল, একদিন তার কী অবস্থা! বাগবাজারের ভুবন ময়রার দোকান থেকে রসগোল্লা আর রাধাবল্লভী আনতে পাঠানো হয়েছিল তাকে, দু হাতে দুটো চাঙগাড়ি নিয়ে আসছিল হিমু, এমন সময় আট দশটা চিল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে। ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আছড়ে পড়েছিল হিমু, তার গালে চিলের নোখের আঁচড়ের ফালা ফালা দাগ। সেই থেকে চিল দেখলেই কুসুমকুমারীর বুক কাঁপে। সে যে উঠে গিয়ে চিল দুটোকে তাড়িয়ে দেবে, সে সাহসও নেই।

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার পাঠে মনোনিবেশ করে কুসুমকুমারী। গঙ্গানারায়ণ বড় কড়া শিক্ষক, রোজ তাকে পড়া দিয়ে যায়, রাত্রে এসে ধরে। বৎসর খানেকের মধ্যেই গঙ্গানারায়ণ তাকে অনেকখানি ইংরেজিও শিখিয়েছে। ব্যাকরণের ওপর বেশী জোর দেয়নি গঙ্গানারায়ণ, প্রথমে সে কুসুমকুমারীকে কিছু ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে, অর্থ না বুঝে শুধু তোতা পাখির মতন কণ্ঠস্থ করা, তারপর এক এক করে প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝিয়েছে। এরপর এক একটি পুরো কবিতার অর্থ কুসুমকুমারীকে বাংলায় লিখতে হবে। এই রকম এখন কিছুদিন চলছে তার হোম টাস্ক। কোনো ইংরেজী শব্দের অর্থ ভুলে গেলে অভিধান দেখে নিতেও শিখেছে কুসুমকুমারী।

আজকের পাঠ্য শেলীর একটি কবিতা। লাইনস টু অ্যান ইণ্ডিয়ান এয়ার।

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, দ্যাকো, আমাদের কবি কালিদাস যেমন মেঘকে উদ্দেশ করে লিকেচিলেন মেঘদূত কাব্য, সেই রকম একজন ইংরেজ কবি লিকেচেন হাওয়াকে উদ্দেশ করে। ইনি মস্ত বড় কবি, জানো তো পি বি শেলী, মারা গ্যাচেন অল্প বয়েসে, কিন্তু সৃষ্টি করে গ্যাচেন অমর কাব্য। আরও মজার কতা শোনো, ইনি কখনো আসেননিকো আমাদের দেশে, অথচ এই ভারতের সুস্নিগ্ধ বাতাসকে এত ভালোবেসেচেন যে তার ওপরেই লিকে ফেলেচেন একখানা এমন মধুর কবিতা!

দি ওয়াণ্ডারিং এয়ারস দে ফেইণ্ট
অন দা ডার্ক দা সাইলেণ্ট স্ট্রিম—
দি চম্পক ওডারস ফেইল
লাইক সুইট থট্স ইন আ ড্রিম ;
দি নাইটিঙ্গেল কমপ্লেইন
ইট ডাইজ আপ অন হার হার্ট
অ্যাজ আই মাস্ট ডাই অন দাইন
ও বিলাভেড্ অ্যাজ দাও আর্ট!

ভাবাবেগে উদাত্ত কণ্ঠে পড়তে পড়তে গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, মাঝখানে ঐ যে একটা শব্দ শুনলে, দি চম্পক, ওটা কিন্তু আমাদের চাঁপা ফুল। হিন্দু কলেজে আমাদের রিচার্ডসন সাহেব পড়াতে পড়াতে ওটা উচ্চারণ করতেন, দি ছাম্পাক্! আমি বলেছিলুম, স্যার আমাদের চম্পককে কেন ছাম্পাক বলবো! শুনে রিচার্ডসন সাহেব হেসেছিলেন। আমার বন্ধু মধু, ঐ যে সেদিন বিলেত গ্যালো, ঐ মধু ছিল ছেলেবয়েসে বড্ড ইংরেজ গোঁড়া। সে বলেছিল, না, ইংরেজি বলার সময় কোনো দেশী শব্দ এসে গেল তো তাও উচ্চারণ করতে হবে ইংরেজদের মতনই। মধু গৌরকে ডাকতো গাউর, আমায় ডাকতো দি গ্যানজেস।

একা নিরালায় ইংরেজী কাব্য পাঠ করতে করতে অকস্মাৎ এক সময় লজ্জায় কুসুমকুমারীর গণ্ডদেশ ও কর্ণমূল আরক্ত হয়ে যায়। যেন কোনো অপার্থিব সুখের আলো এসে পড়ে মুখে।

...লেট দাই লাভ ইন কিসেস রেইন
অন মাই লিপ্স অ্যাণ্ড আইলিডস পেইল...

এই লাইন দুটির অর্থ বোঝাবার সময় কী কাণ্ডই না করেছিল গঙ্গানারায়ণ! মাঝে মাঝে কুসুমকুমারীর স্বামীটি যেন একেবারে শিশুর মতন হয়ে যায়!

গঙ্গানারায়ণ বলেছিল, কিসেস রেইন মানে কী বুঝলে তো? বৃষ্টির মতন চুম্বন ঝরে পড়া, কেমন ভাবে ঝরে পড়ে দেখবে? বলতে বলতেই লম্ফ দিয়ে উঠে এসে কুসুমকুমারীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আবার বলেছিল, এই এমনি ভাবে...ঠোঁটের ওপরে...চোখের পাতার ওপরে...। ইস, তখনও বেশী রাত নয়, ঘরের বাইরে একজন দাসী বসেছিল, সে যদি কিছু দেখে থাকে!

সুন্দর একটি বাঁধানো খাতায় কুসুমকুমারী সেই ইংরেজী কবিতার বাংলা অর্থ লেখে। এক সময় হঠাৎ ঘোর গর্জন শুনে সে আমূল চমকিত হয়ে যায়। বই খাতা রেখে সে চলে আসে দ্বারের সামনে। আকাশে যে কখন এত মেঘ ঘনিয়েছে, সে টেরই পায়নি। দক্ষিণের আকাশ ভল্লুকবর্ণ মেঘে একেবারে সমাকীর্ণ। দৈত্য-সম্রাটের হুংকার কণ্ঠস্বরে বাজ হেঁকে উঠছে. আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চিরে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। এমন জোর একটা ঝড়ের ঝাপটা এলো যে কুসুমকুমারীর প্রথমে মনে হলো সে অন্ধ হয়ে গেছে। আঁচল চাপা দিল চক্ষে। জানলা দরজাগুলি এই সুযোগে জীবন্ত হয়ে উঠে ছটফট করতে লাগলো।

এই সময় ছাদে একা থাকতে কুসুমকুমারীর গা ছমছম করে। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হবার কোনো লক্ষণ নেই। ছোট ঘরটি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে পোঁছোবার আগেই কুসুমকুমারী ধরা পড়ে গেল ঝড়ের হাতে। সে তার শাড়ি সামলাবার জন্য শক্ত করে চেপে ধরে রইলো নিজেকে. এদিকে তার মাথার সব চুল যেন ঝড়ের সঙ্গী হতে চায়। এক পা হাঁটতে গেলেই ঘুরে পড়ে যাবার মতন

অবস্থা। তারপর হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি আসতেই সব প্রতিরোধ তুলে নিয়ে আত্ম-সমর্পণ করলো কুসুমকুমারী।

কাছাকাছি আর কোনো উচ্চ প্রাসাদ নেই, এই অট্টালিকার ছাদেও উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, সুতরাং এখানে বৃষ্টি-স্নান করতে কোনো বাধা নেই তার। আঃ কী সুখ, কী সুখ! জীবন এত সুন্দর! স্বর্গলোক থেকে নেমে আসা কোনো অপ্সরার মতন কুসুমকুমারী দু হাত ছড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলো বৃষ্টির মধ্যে। কাব্যের বর্ণনার চেয়েও সত্যিকারের প্রকৃতির রূপ দুই চক্ষু মেলে দেখা আরও কত বেশী উপভোগ্য। আকাশজোড়া এই যে বিদ্যুৎ-চমক, এই যে প্রবল বজ্র-নির্ঘোষ, এর বর্ণনা করতে পারে মানুষের কোনো ভাষা? এই যে এত বড় একটা আকাশ, তাও কি কোনো দিন কোনো কাব্যে ধরা পড়েছে? বাগানের গাছ-গুলি বৃষ্টির অভ্যর্থনায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে।

এক সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কুসুমকুমারী ডাকলো, সরোজ, সরোজ! শিগগির শুনে যা!

দু' তিনবার ডাকার পর সরোজিনী শুনতে পেয়ে সিঁড়ির কাছে এসে বললো, কী গো, ডাকচো কেন?

—শিগগির ওপরে উঠে আয়!

—ওমা, দিদি, তুমি একেবারে ভিজে গ্যাচো যে!

—উঠে আয় না মুখপুড়ী! দেরি কচ্চিস কেন?

সরোজিনী ওপরে উঠে আসতেই কুসুমকুমারী বললো, আয় বৃষ্টিতে স্নান করি। আমি তো কতক্ষণ ভিজচি, হঠাৎ মনে হলো, আহা আমি একলা একলা এত আনন্দ কচ্চি, সরোজকেও ডাকি!

সরোজিনী ভয় পেয়ে যায়। একটু সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, এই বৃষ্টিতে ভিজবো? তুমি কি পাগল না কি দিদি, এ রকম ভিজলে যে সান্নিপাতিক হবে।

—আঃ, এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না! সব তাতেই তোর ভয়, সান্নিপাতিক হবে তো হবে! নে, আয়!

—ছাতে...ভিজে কাপড়ে...কেউ যদি আমাদের দেকে ফ্যালে?

—এখেনে কে দেকবে! আচ্ছা নে, সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি—

সরোজিনীকে জোর করেই টেনে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে এলো কুসুমকুমারী। উদ্ভাসিত মুখে জিজ্ঞেস করলো, কী, ভালো লাগচে না?

সরোজিনী তেমন উৎসাহিত হতে পারে না, একটু আড়ষ্ট হয়েই থাকে কুসুমকুমারী তাকে আবার বললো, ইস, একটু আগে যদি আসতি, ঝড়ের সময় যদি দেকতি আকাশটা। ঠিক যেন পাগলা হাতির মতন শুঁড় তুলে ছুটে আসছিল মেঘগুলো। একেই বলে মেঘের বপ্রক্রীড়া।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে স্নান করবার পর দুই তরুণী নেমে যায় নিচে। তারপর ওদের বেশ শীত করতে থাকে। কুসুমকুমারী রান্নাঘরে তার দাসীকে পাঠিয়ে দেয় বিশেষ নির্দেশ দিয়ে। দারুচিনি, এলাচ আর আদা ফোটানো এক প্রকার তরল তপ্ত পানীয় সে একটু পরে এনে দিলে কুসুমকুমারী বলে, নে, গরম গরম খেয়ে নে সরোজ, দেকবি আর কিচ্ছু হবে নাকো!

কুসুমকুমারী এর পর গুন গুন করে একটা গান ধরে। জীবন তাকে চতুর্দিক থেকে ভরিয়ে দিয়েছে, সুখ যেন আর ধরে না তার শরীরে। হাটখোলার দত্ত বাড়িতে সে যখন বালিকা বয়েসে বধূ হয়ে গিয়েছিল, তখন উন্মাদ স্বামীকে দেখে সে

ভেবেছিল, তার ভবিষ্যৎ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে, কিন্তু আবার তার জীবনে যে এমন পরিপূর্ণতা আসবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার স্বামী গঙ্গানারায়ণ একেবারে দেবতার মত মানুষ, জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করেও কটা মেয়ে এমন স্বামী পায়!

শুধু একটি ব্যাপারে কুসুমকুমারীর মনে একটু অস্বস্তি রয়েছে। তার দেবর নবীনকুমার তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এই মানুষটিকে সে কত কম বয়েস থেকে চেনে, তার মিতেনীর স্বামী ছিল, এখন একমাত্র দেবর, তার সঙ্গে সে কত গল্প করবে ভেবেছিল। বিষয় সম্পত্তির দেখাশুনো সব গঙ্গানারায়ণকেই করতে হয় বলে সে সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু নবীনকুমারের বাড়ি থেকে বহির্গত হবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। পরিদর্শক যে-কয়েক মাস চলেছিল তখন নবীনকুমার নিশ্বাস ফেলারও সময় পেত না। তারপর থেকে তার আর কোনো কাজে উৎসাহ নেই। মহাভারত অনুবাদের কাজটি এখনো সে চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কখনো কখনো তিন চার দিন সে নিজ কক্ষ থেকে বাইরেই আসে না। তিন চার মাস সে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিল, এখন সেরে উঠেও সে অনেকটা নিরুদ্যম হয়ে আছে।

নবীনকুমার কুসুমকুমারীকে দেখলেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। দু' একটি শুষ্ক ভদ্রতার বাক্য বলে সে স্থান থেকে চলে যায়। কেন যে তার ব্যবহার এরকম আড়ষ্ট, সে কথা বুঝতেই পারে না কুসুমকুমারী। সে বিধবা হবার পর নবীনকুমারই যে তার দ্বিতীয় বিবাহের সবিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল, তাও তো সে জানে। অথচ এখন তার প্রতি এত অনীহা! কুসুমকুমারী আশা করেছিল এ বাড়ি কত জমজমাট হবে, কত সমারোহ। তার বিবাহের আগেই সে এ বাড়িতে এসে দেখে গেছে দুটি নাটকের অভিনয়, সে কি অপূর্ব সুন্দর ব্যাপার! বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশনে এখানে কত সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমাবেশের কথা সে শুনেছে। এ সব কিছুতেই কুসুমকুমারীর খুব আগ্রহ। অথচ সে এ বাড়ির বধূ হয়ে আসবার পর সেই সবকিছুই যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

নবীনকুমারের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি থাকলে সে অভিযোগ জানাতে পারতো গঙ্গানারায়ণের কাছে বা স্বয়ং নবীনকুমারের কাছেই। কিন্তু তা তো নয়। নবীনকুমারের ব্যবহারে বিনয় বা সম্ভ্রমের কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু এত বিনয় বা সম্ভ্রমই বা কেন? নবীনকুমারের চেয়ে সে বয়েসে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট, তবু নবীনকুমার তার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলে। অথচ এই মানুষই এক সময় তার নাম দিয়েছিল বনজ্যোৎস্না। এই পরিবারে কি এমন নিয়ম যে, বয়সের তফাত যাই থাক সম্পর্কে গুরুজন হলেই আর কারুর সঙ্গে হাসি-তামাশা করা নিষিদ্ধ? কুসুমকুমারীর বাপের বাড়িতে তো এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তার সেজদাদার স্ত্রী আর তার ন'দাদা প্রায় সমান বয়েসী, তারা তো সব সময় খুনসুটি করে। সেজদাদার স্ত্রী সকলের সঙ্গেই খেলার সময় খেলুড়ি হতো।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি কিছু ধরে গিয়ে আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেই রইলো এবং ওপরের দিকে তাকালেই মনে হয় আকাশ অনেক নিচে নেমে এসেছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক অবস্থা, খুব ঘন ঘন চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, কিন্তু বজ্রপাতের কোনো শব্দ নেই। এই সব ঘনঘোর দিনগুলিতে

একা থাকতে বড় মন উতলা লাগে কুসুমকুমারীর। এত কাল সে বৃহৎ পরিবারে কাটিয়ে এসেছে, তার পিত্রালয়ে আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশী নারী পুরুষ থাকে। সেই তুলনায় যেন খাঁ খাঁ করে জোড়াসাঁকোর সিংহদের এত বড় প্রাসাদ।

কার সঙ্গেই বা গল্প করে সময় কাটাবে কুসুমকুমারী। এক তো ঐ সরোজিনী, কিন্তু সে যেন কিছুদিন ধরে কেমন মন-মরা হয়ে গেছে। কুসুমকুমারী অনেক চেষ্টা করেও ওকে প্রফুল্ল করতে পারেনি। তা ছাড়া সরোজিনীর বুদ্ধি যে তেমন প্রখর নয়, তা বুঝতে পারা গেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধের পর খুব মিহিন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার বইতে লাগলো জোর বাতাস। ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো বাতাসের বেগ, সমুদ্র-গর্জনের মতন অবিরাম শব্দ বাইরে, দরজা-জানলা সব বন্ধ করা হলেও মনে হতে লাগলো সারা বাড়িটা যেন কাঁপছে। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ রাখা একটুও পছন্দ নয় কুসুমকুমারীর, কিন্তু এখন আর খোলার উপায় নেই, চতুর্দিকে দুমদাম শব্দ হচ্ছে, কী সব যেন ভাঙছে।

প্রকৃতি আজ ক্রুদ্ধ খেলায় মেতেছে, কিন্তু তা দেখতে পাচ্ছে না বলেই কুসুমকুমারীর আরও বেশী ছটফটানি। বন্ধ ঘরে সে একা বসে থাকেই বা কী করে? বই পড়ায় আর মন বসে না। গঙ্গানারায়ণ কখন ফিরবে কে জানে।

একজন দাসী এসে খবর দিল, তাদের বাড়ির পিছনের বাগানে কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়েছে, কারা নাকি বলছে গঙ্গার বান ওপরে উঠে এসে ভাসিয়ে দিয়েছে কেল্লার মাঠ। আর একটু পরে খবর পাওয়া গেল দাস-দাসীদের গোলপাতার ঘরের ছাউনিগুলো আকাশে উড়ে যে কোথায় চলে গেল, আর দেখাই গেল না। আরও একটু রাতে খবর এলো, পাথুরিয়ার ঠাকুরদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এবং ঝড়ের তাণ্ডব বৃদ্ধিই পাচ্ছে ক্রমশ।

বাপের বাড়ি থেকে আনা দুই দাসীর সঙ্গে তাস নিয়ে বিন্তি খেলে সময় কাটাচ্ছিল কুসুমকুমারী, রাত্রি দশটা বেজে গেলে তার বক্ষের ভিতরকার ঝড়ের আন্দোলন বাইরের ঝড়কেও ছাড়িয়ে গেল। গঙ্গানারায়ণ ফিরলো না এখনো! এমন দুর্যোগের রাতে পথে বোধ হয় আর একটিও মানুষ নেই, গঙ্গানারায়ণ, তবে কোথায় গেল!

কুসুমকুমারী অসহায় বোধ করে। কাকে গিয়ে বলবে, কে ব্যবস্থা নেবে? কর্মচারীদের খবর পাঠাতে পারে, কিন্তু কর্মচারীরা কতটা কী করতে পারে? এরই মধ্যে একটি বন্ধ জানলা খুলে গেল ঝড়ের ধাক্কায়, ঝনঝন ঝনডন শব্দে ভেঙে পড়লো কাচ, প্রবল বাতাসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব কিছু। অতি কষ্টে সেই জানলা আবার বন্ধ করা হলো, তারই মধ্যে বাইরের ঝড়ের দিকে তাকিয়ে ছমছম করে উঠলো সকলের শরীর। আস্তো আস্তো গাছ উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে!

কুসুমকুমারী আর পারলো না, বারান্দার অন্য প্রান্তে ছুটে গিয়ে সরোজিনীর ঘরে ধাক্কা দিয়ে বললো, ও সরোজ, খোল, খোল!

সরোজিনী দরজা খুলে উদভ্রান্ত কুসুমকুমারীকে দেখে বললো, ও দিদি, আমারও বড্ড ভয় কচ্চে! আজ বুঝি পৃথিবী রসাতলে যাবে!

—ছোটবাবু কোতায়? বাড়িতে আচেন?

—হ্যাঁ আচেন। সারাদিনই তো শুয়ে রয়েচেন!

—একবার ডাক তাকে। আমার বুঝি সর্বনাশ হয়ে গ্যালো!

ভীতি-বিহ্বল মুখে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সরোজিনী। নবীনকুমার সম্প্রতি স্বগৃহে বসেই একাকী মদ্যপান করতে শুরু করেছে। সে সময় নিজের ঘরেই সে আবদ্ধ থাকে, কারও সঙ্গে দেখা করে না। সুরোজিনী কথা বলতে গেলে ধমক খায়। রাত্রির এই সময়ে সে আর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকে না।

—দাঁড়িয়ে রইলি কেন, সরোজ? উনি যে এখনো ফেরেননি!

—ও মা, সে কি সর্বনাশের কতা!

—আমি আর কাকে বলবো, কোতায় যাবো? ছোটবাবুকে একবার ডাক।

এই সময় ডাকলে উনি যে বড্ড রাগ করেন, কুসুমকুমারী আর এক মুহূর্ত সময়ক্ষেপ করতে চায় না। সরোজিনীর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই বুঝে সে নিজেই দৌড়ে গিয়ে নবীনকুমারের ঘরের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে আঘাত করতে লাগলো।

ভেতর থেকে নবীনকুমার ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, কে? দূরে হয়ে যা!

—ছোটবাবু...একবার খুলুন...মহা বিপদ...

দরজা খুলে নবীনকুমার আরও জোর ধমক দিতে যাচ্ছিল, কুসুমকুমারীকে দেখে দৃষ্টির উষ্মা মুছে ফেললো। তারপর সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলো, এ কি, বউঠান, আপনি...এত রাতে?

—আমার...আপনার দাদা .এখনো ফেরেননি...বাইরে এই কাণ্ড চলচে...

—কী হয়েচে বাইরে?

—আপনি টের পাননি কী সাংঘাতিক ঝড়...আজই বুঝি প্রলয়...

—আপনি শান্ত হোন, বউঠান। এত ভয়ের কী আচে! দাদা কোতায় গ্যাচেন!

—জানি না।

নবীনকুমার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো, যেন সে বুঝতে চায় গঙ্গানারায়ণ কোথায় যেতে পারে। তারপর ডান পাশে সরে গিয়ে একটা জানলা খুলতেই ঝড়ের আচমকা ধাক্কা লাগলো তার গায়ে। তবু সে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বেশ শান্ত ভাবে বললো, হ্যাঁ, বেশ জোরেই ঝড় হচ্চে বটে!

তারপর সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, দুলাল? দিবাকর! ওরে কে কোতায় আচিস! সহিস-কোচোয়ানদের বল গাড়ি যুততে, আমি বেরুবো।

কুসুমকুমারীর সারা শরীর কম্পিত হচ্ছে, অতি কষ্টে সে রোধ করে আছে উদ্গত অশ্রু। সরোজিনীর মুখখানি সম্পূর্ণ বিবর্ণ।

নারী দুজনের উপস্থিতি গণ্য না করে নবীনকুমার ফিরে গিয়ে তার পালঙ্কের পাশের টেবিলের ওপর থেকে ব্র্যান্ডির বোতল তুলে নিয়ে গলায় ঢাললো খানিকটা। বাঁ হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে ওষ্ঠ মুছে সে খুঁজতে লাগলো তার ছড়িটা। সেটা পেয়ে এবং হাতে নিয়ে সে দ্বারের কাছে এসে বললো, আপনার ভয় নেই, বউঠান, আমি যাচ্চি, দাদামণিকে ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবো!

সরোজিনী এবার প্রায় কঁকিয়ে বলে উঠলো, আপনি...এখুন বাইরে যাবেন? বাড়ি ভেঙে পড়চে, গাচ উল্টে যাচ্চে...।

সে কথার উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলো না নবীনকুমার। ততক্ষণে দুলাল এসে বারান্দায় সিঁড়ির কোণায় দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে বললো, গাড়ি বার হয়েচে?

—ছোটবাবু, বাইরে যে মহাকাণ্ড! এক পা হাঁটা যায় না!

—হুঁ! চল, দেরি করিস না!

সরোজিনী কুসুমকুমারীর হাত চেপে ধরে বললো ও দিদি!

ততক্ষণে কুসুমকুমারীও বুঝতে পেরেছে।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তার দেবরকে পাঠাচ্ছে বিপদের মধ্যে! তার নিজের যদি সর্বনাশ হয়ে গিয়েও থাকে, তার ওপর সে আবার সরোজিনীরও সর্বনাশ করতে চলেছে! এমন কি দুলাল পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে বাইরে যেতে।

সে বলে উঠলো, না, না, আপনি যাবেন না...যাবেন না...লোকজনরা যদি পারে একটু এগিয়ে দেখুক।

নবীনকুমার কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সরোজিনী আর কুসুমকুমারী এক সঙ্গে ছুটে গেল তাকে আটকাতে।

—যাবেন না আমার মাথার দিব্যি...আপনার পায়ে পড়ি...

দেখা গেল নারীদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই নবীনকুমারের বরং সে দুলালের মাথা লক্ষ্য করে মারবার জন্য ছড়িটা তুলে বললো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? চল!

শত কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল নবীনকুমার। দিবাকর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলো কোথাও, দুলাল এবং আরও দুজন ভৃত্য গেল তার সঙ্গে। জুড়ি গাড়ি নেবার কোনো উপায় নেই সত্যিই। পথকে আর পথ বলে চেনাই যায় না। একে তো ঘুরঘুটি অন্ধকার, শব্দহীন বিদ্যুৎ ঝলকে ক্ষণিকের জন্য দেখা যায় সারা পথে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছের ডালপালা। খড়, খাপড়া, বাঁশ, ইঁট-কাঠ। তার মধ্য দিয়েই নবীনকুমার এগোতে লাগলো, দুলাল ঠিক তার সামনে।

অবশ্য বেশী ঝুঁকি নিতে হলো না ওদের। অতি কষ্টে খানিক পথ এগোবার পর ওরা শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠ। গঙ্গানারায়ণই ফিরচে কয়েক জনের সঙ্গে। একটা কাজে গঙ্গানারায়ণ গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, দুর্যোগে আটকা পড়ে যায়। তবু দুঃসাহস নিয়ে সে ফিরতে শুরু করেছিল, এক স্থলে তার জুড়ি গাড়ি উল্টে যায়। ঘোড়া দুটিই মারা গেছে, কোচোয়ান গুরুতর আহত, সৌভাগ্যবশত গঙ্গা-নারায়ণের কোনো আঘাত লাগেনি।

বাড়ি ফিরে এসে প্রায় সমস্ত রাতই জেগে থাকতে হলো সকলকে। এই প্রাসাদের একটি অংশও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে এক সময়। বাইরে গেলে নিস্তার নেই, ঘরের মধ্যে বসে থাকতেও প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। সত্যিই বুঝি প্রলয় শুরু হয়েছে, এই রাতটিই বুঝি পৃথিবীর শেষ রাত্রি।
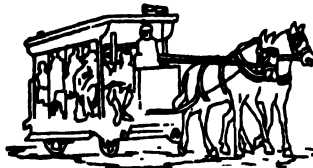
পরদিন সকালেও তেমন কিছু বোঝা যায় নি, দ্বিপ্রহরের পর রোমহর্ষক সব সংবাদ আসতে লাগলো। ঝড় প্রশমিত হলেও বৃষ্টির বিরাম নেই, তারই মধ্যে লোকজন এসে পৌঁছতে লাগলো এ গৃহে। এক একজনের মুখে এক এক রকম চমকপ্রদ বিবরণ।

সত্যই বুঝি এক প্রলয়ের মহড়া হয়ে গেছে গত রাত্রে এই শহরের বুকে। যে-ই আসে, সে-ই বলে, কী কাণ্ড গো বাবু, একটাও বুঝি বাড়ি আস্ত নেইকো! রাস্তাঘাট কিছুই চেনা যায় না, শতেক বছরের পুরোনো গাচও উপড়ে পড়েচে। অতবড় বাড়ি মিত্তিরদের, যেন দৈত্যে তুলে নিয়ে গ্যাচে, সেখেনে এখন ফাঁকা মাঠ! একজন বললো, আমি কাল রেতের বেলা আকাশ দিয়ে একটা নৌকো উড়ে যেতে দেকিচি. হ্যাঁ গো, ঝুটো কতা নয়, সত্যি বলছি...।

স্মরণকালের মধ্যে এরকম ঝড় এ দেশে আঘাত হানে নি। গুজব ও ঘটনা, সত্যামিথ্যে রটনার মধ্য থেকে প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। কলকাতা শহরের শত শত গৃহ ভূপাতিত, মৃতের সংখ্যা সঠিক কত কেউ জানে না এখনো, গোলপাতা, খড় ও টিনের চালের ঘরগুলির অধিকাংশেরই চাল উড়ে গেছে, পান্তির মাঠে মরে পড়ে আছে বহু গরু-মহিষ, আর্মেনি ঘাটের জাহাজবন্দরে এমনই ধ্বংস কাণ্ড হয়েছে যে, একটি জাহাজও অক্ষত নেই। আকাশে নৌকো উড়ে যাবার কাহিনীও অলীক নয়, বাগবাজারের ঘাট থেকে একটি ডিঙ্গি নৌকো উড়তে উড়তে গিয়ে উল্টোডিঙ্গিতে পড়ে সে স্থানটির নাম সার্থক হয়েছে। আকাশ পথে ডালপালা শিকড়সুদ্ধ উড়ন্ত বৃক্ষেরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছে।

ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিরা কাল সন্ধ্যার পর থেকে আর কেউ পথে বার হয়নি, কিন্তু দাস-দাসী, ফিরিওয়ালা এবং নিত্য রোজগেরেদের তো উপায় নেই, তারা আজও বৃষ্টি মাথায় করে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকার সংবাদ।

এক আনাজওয়ালী স্ত্রীলোক এসে হাউ হাউ করে কেঁদে পড়লো। তার চার বছরের খোকাটিকে পাওয়া যাচ্ছে না, সর্বনেশে ঝড় খোকাটিকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ঝটিকার বেগ কত প্রবল হলে মানুষ পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে, তা চিন্তা করে সকলে তাজ্জব। এমন আর কখনো শোনা যায়নি। তার কান্না কেউ থামাতে পারে না। এছাড়া দুধওয়ালা, ছোলাওয়ালা, তেলের কলু, বাজারের মেছুনি ইত্যাদি সকলেরই বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন, সকলেই দুঃখের কথা বলতে চায়, কিন্তু কে কার কথা শুনবে!

নবীনকুমারদের প্রাসাদটি তিন পুরুষের, বেশ মজবুতভাবে গড়া। তাই বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। একটি মহলের দেয়াল ভেঙে পড়েছে, পিছন-বাড়ির ভৃত্যদের গোলপাতার ঘরগুলি নিশ্চিহ্ন। গঙ্গানারায়ণ বড় বাঁচা বেঁচে গেছে গত রাত্রে, ঐ দুর্যোগের মধ্যে অতখানি পথ এসে সে খুবই ঝুঁকি নিয়েছিল। অবশ্য ঝড় সবচেয়ে বেশী রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল মধ্যরাত্রির পর।

নবীনকুমারের দান-খ্যাতি অনেকদূর পৌঁছেছে বলে বহু বিপন্ন মানুষ এসেছে সিংহ-ভবনে সাহায্য প্রার্থনা করতে। এক সঙ্গে অনেকের আর্ত-আকুল প্রার্থনায় কারুর কথাই ঠিক মতন বুঝতে পারা যায় না। বার-মহলের দ্বিতলের একটি কক্ষের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নবীনকুমার চেয়ে আছে সেই জনতার দিকে। সদরের ঠিক বিপরীত দিকে ছিল পুরোনো আমলের আস্তাবলখানা, নবীনকুমার চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে কিনা সন্দেহ, তার দৃষ্টি উদাসীন। একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক ঘণ্টা কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই। তাদের বাড়ির সদরের ঠিক বিপরীত দিকে ছিল পুরোনো আমলের আস্তাবলখানা, নবীনকুমারের পিতামহ কিছুদিন কোম্পানির ফৌজে ঘোড়ার জোগানদারের কাজ করেছিলেন। তারপর সেখানে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর নির্মিত হয়ে রাজমিস্তিরিদের একটি

আস্তানা গড়ে উঠেছিল। সেই সব ক'টি ঘরের ওপর পড়ে আছে বিশাল একটি আম গাছ। ঐ আম গাছটিকে নবীনকুমার তার জন্ম থেকে দেখছে। তার পিতামহের আমলের গাছ, আর ওকে দেখা যাবে না।

এক সময় গঙ্গানারায়ণ এসে বললো, ছোট্‌কু তুই এখেনে? আর আমি তোকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্চি।

নবীনকুমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এদের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে তো আর কান পাতা যায় না! কী করা যায় বল্‌ তো?

নবীনকুমার গঙ্গানারায়ণের চোখে চোখ রেখে এখনো নিঃশব্দ রইলো।

—তুই কী বলিস? এদের কিছু দেওয়া হবে?

এবার নবীনকুমার বললো, সে তুমি যা ভালো বুঝবে!

—তবু তোর একটা মত না নিয়ে তো কিছু কত্তে পারি না!

—আমার আর মত কি?

—এরা এসে কেঁদে পড়েচে, কিছু না দিয়ে চক্ষু বুজে রইলে এ বাড়ির সুনাম হানি হয়। জনা তিরিশ-চল্লিশেক এসেচে, আমি বলি কী, ওদের দশটা করে টাকা অন্তত দিয়ে দেওয়া হোক।

—বেশ তো।

—তুই মত দিচ্চিস তো? তা হলে এখুনি দেওয়া শুরু করি?

নবীনকুমার ঘাড় হেলন করলো।

গঙ্গানারায়ণ যেতে গিয়েও ফিরে এসে বললো, ও, আর একটা কতা! কোচোয়ান কলিমুদ্দিন সাঙ্ঘাতিক খবর এনেচে! ও বাড়িতে নাকি ভীষণ অবস্থা, ছাত ভেঙে পড়েচে এক দিকে...

—ও বাড়ি?

—বিন্দুদের বাড়ি...মানে, জ্যাঠাবাবুদের বাড়ি! একবার তো সেখেনে যেতে হয়?

—তুমি যাবে? যাও!

—তুই যাবি না?

—নাঃ!

—সেটা কি ভালো দেকায়? জ্যাঠাবাবু ভাববেন, এই বিপদের সময় আমরা কেউ গেলুম না।

—লোকজন পাঠিয়ে দাও, সত্যিকারের কতটা বিপদ হয়েচে, জানো আগে!

—ঠিক বলিচিস। তাই করা যাক্‌ বরং!

গঙ্গানারায়ণ এবার ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই নবীনকুমার বললো, দাদা, শোনো, তুমি যখন এই লোকগুলোকে কিছু সাহায্য কত্তেই চাইচো, তখন দশ টাকা দিও না!

—দশ টাকা দোবো না? তবে কত দোবো, পাঁচ?

—অন্তত এক শো টাকা করে দাও!

—এ—ক—শো? তুই বলিস কি? আরও কতজন আসবে তার ঠিক আচে? পাঁচ টাকায় ঘরের ছাউনি হয়ে যায় আর পাঁচ টাকায় মাসখানেকের খোরাকি—

—তুমি আমাদের বাড়ির সুনামের কতা বলছিলে, একশো টাকা না দিলে কি সে সুনাম থাকে?

—খবর পেয়ে যদি আরও দলে দলে লোক ছুটে আসে?

—সবাইকেই দিও। কেউ যেন ফিরে না যায়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রস্তাবে গঙ্গানারায়ণ একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ ছেলেটা বলে কী! এ রকম দানছত্র খোলা কি সম্ভব? একশো টাকা হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে শুনলে শহরসুদ্ধ লোক ধেয়ে আসবে না?

—তুই কি ঠিক মতন ভেবে বলচিস, ছোটকু।

—দাদা, তুমি আমার মত জিজ্ঞেস করলে কেন? তুমি তো নিজের ইচ্ছে মতন যা খুশী করতে পারতেই!

—তবিলে যদি অত টাকা না থাকে তখন?

—যতক্ষণ কুলোয়, ততক্ষণ দিও!

এর ওপর আর কথা হয় না। গঙ্গানারায়ণ আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

এ যেন টাকা পয়সা হরির লুঠ দেবার মতন। অকারণে অপব্যয়। যে লোক-গুলি সাহায্য চাইতে এসেছে, তারাও এতটা আশা করে না। এদের মধ্যে অনেকেই এক সঙ্গে একশো টাকা চক্ষেই দেখেনি কখনো। যারা মাস মাইনের কাজ করে, তাদের বেতন বড় জোর পাঁচ দশ টাকা, আনাজপাতির ব্যবসা করেও কেউ মাসে পনেরো বিশ টাকার বেশী মুনাফা করতে পারে না।

একটু বাদে গঙ্গানারায়ণ আবার ফিরে এসে বললো, টাকা পয়সা বিলির কাজটা তুই নিবি, ছোটকু?

নবীনকুমারের সে ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। সে সরাসরি বলে দিল, গঙ্গা-নারায়ণের সময়াভাব হলে কর্মচারীদের দিয়ে ও কাজ চালানো হোক।

এত টাকার ব্যাপার, কোনো কর্মচারীকে বিশ্বাস করা যায়? গঙ্গানারায়ণ প্রথমেই প্রার্থীদের সকলকে দেউড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে লৌহ দ্বার বন্ধ করে দিল। তারপর স্বহস্তে সে একটি খেরো খাতায় লিখে নিল সকলের নাম ঠিকানা। সেই নামের পাশে বসিয়ে নিল প্রত্যেক্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ ছাপ। এবার সে দিবাকরকে বসিয়ে দিল বিলি-বন্দোবস্তের ভার দিয়ে। টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে গঙ্গানারায়ণ নিজেও পছন্দ করে না। সে জানে, দিবাকর এই লোকগুলির কাছ থেকে দস্তুরি আদায় করবে, সেই জন্য দুলালকে দাঁড় করিয়ে দিল পাশে। এবং তার কাছে নির্দেশ দেওয়া রইলো, আর কোনো লোককে যেন দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়।

তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যেই সে চলে গেল বিধুশেখরের বাড়ি।

সেখানে ক্ষতি হয়েছে খুবই, কিন্তু বাড়ির কেউ আহত বা নিহত হয়নি। গোয়াল ঘরের ওপর গাছ পড়ে দুটি দুধেলা গাভী মারা গেছে। বিধুশেখর যে কক্ষে শয়ন করেছিলেন, ছাদ ভেঙে পড়েছে তারই পাশের ঘরে। গঙ্গানারায়ণ দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল যে অশক্ত শরীর নিয়ে বিধুশেখর আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং স্বয়ং তদারক করছেন সব কিছু। বিশেষ বিচলিতও মনে হলো না তাঁকে। গঙ্গানারায়ণের দিকে একচক্ষু দিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ির খবর কী? আমি নিজেই যাচ্ছিলুম একটু পরে—।

পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে প্রকাশিত হলো এই দুর্যোগের বিবরণ। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে শুধু

সাহেব পাড়ার ধ্বংসচিত্রই ছাপা হয়েছে, কোথায় কোন সাহেবের বাড়ির বাগান নষ্ট হয়েছে, কতগুলি জাহাজ ডুবি হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে কত, সেইসব কথাই সাত কাহন। যেন এ দেশটি সাহেবদেরই। নেটিভদের বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেল কিংবা কয়েক শো মানুষের অপঘাত মৃত্যু হলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

বাংলা মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিও অতি দ্রুত বিশেষ সংস্করণ বার করলে, কিন্তু শুধু হা-হুতাশে ভরা। ইংরেজদের মতন রিপোর্টিং-এর ধারায় তারা রপ্ত নয়, পরিসংখ্যান কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেওয়ার বদলে তারা শুধু উচ্ছ্বাস প্রকাশেই বেশী পারঙ্গম। দু-একটি পত্রিকা আবার মুদ্রিত করেছে জ্যোতিষীদের ভাষণ : আমরা পূর্বেই তো কহিয়াছিলাম যে ইং ৬৪ সনে এক প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝাবাত আসিবে তাহাতে মানুষ-গবাদি পশু যে কত প্রাণ হারাইবে তাহার সীমা পরিসীমা নাই...এ বৎসরে দুঃসময়ের করাল ছায়া ঘনাইয়াছে এই জাতির ভাগ্যাকাশে...শনি বক্রী হইয়াছেন, অশ্লেষা ও মঘার যোগাযোগে...আমরা পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে এইসব কলির পাঁচ পোয়া পূর্ণ হইবার লক্ষণ...

অসীম বিরক্তিতে সব পত্রিকাগুলি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল নবীনকুমার।

সে পরিদর্শক নামে ভূতপূর্ব দৈনিক সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক। জেগে উঠেছে তার ভিতরের সাংবাদিক চরিত্রটি। এখন পরিদর্শক পত্রিকা চালু থাকলে সে দেখিয়ে দিত রিপোর্টিং কাকে বলে। কিন্তু এই পোড়া দেশ তার পত্রিকা পছন্দ করলো না, কেউ গ্রহণ করলো না। ঐ পত্রিকার জন্য সে কত অর্থ ব্যয় করেছে বলে সকলে তাকে মনে করে নির্বোধ। চলে কিনা এই সব পত্রিকা! এরা সকলেই হয় সাহেবদের পা-চাটা অথবা নিয়তিবাদী!

তার মনে পড়লো হরিশের কথা। শহরবাসীর এই দুঃসময়ে হরিশের লেখনীর কত প্রয়োজন ছিল। কেউ হরিশের শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এলো না। হিন্দু পেট্রিয়ট এখনো চলছে, নবীনকুমারই তার স্বত্বাধিকারী, কিন্তু সে নিজে কিছু আর দেখে না। মধুসূদন ইওরোপে চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণদাস পালই ঐ পত্রিকার পুরো দায়িত্ব নিয়েছে।

কয়েক মাস নবীনকুমারের মনে যে ক্লৈব্য জন্মেছিল এই ঝড়ে যেন তা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দিনের পর দিন সে নিজের পালঙ্কে শুধু শুয়ে থেকেছে, কারুর সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে চায়নি। বসত বাটিতেই মদ্য পান চালু করে দিয়েছিল পুরোপুরি, যেন জীবন সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ নেই।

আবার সে জেগে উঠলো। বেলা দশটায় সে হাঁক দিয়ে বলল, দুলাল! গাড়ি জুততে বল!

দুলাল জানালো যে, এখনো পথঘাটে গাড়ি চালাবার কোনো উপায় নেই। বৃষ্টি প্রশমিত হয়েছে বটে, কিন্তু সব পথই ভাঙা বাড়ি আর উৎপাটিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সে নিজে অনেকখানি ঘুরে দেখে এসেছে।

নবীনকুমার বললো, বেশ, আমি তবে পায়ে হেঁটেই বেরুবো। তুই তৈরি হয়ে নে!

দুলাল সভয়ে জিজ্ঞেস করলো, এমন দিনে কোতায় যাবেন, ছোটবাবু?

নবীনকুমার বললো, যাবো বরানগরে। কাজ কম্মো কত্তে হবে না? সব কিছু দিনের পর দিন ফেলে রাখলে চলবে?

—বরানগর? পায়ে হেঁটে?

—কেন? যাওয়া যাবে না? কেউ যাচ্ছে না? সবাই কি ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে

বসে আছে?

যাওয়া যাবে না কেন, অনেকেই যায়। কিন্তু এ বাড়ির কোনো মানুষ কোনোদিন দিবাকালে পায়ে হেঁটে বেরিয়েচে নাকি? জোড়াসাঁকো থেকে বরানগর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবেন ত পথের লোকজন চক্ষু কপালে তুলে বলবে না, ঐ যাচ্চেন রামকমল সিংগীর ছেলে নবীনকুমার সিংগী! এই জলকাদা আর আদাড় পগারের মধ্য দিয়ে উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্চেন কি গো, বৈরিগী হয়েচেন নাকি?

কারুর নিষেধই গ্রাহ্য করলো না নবীনকুমার। তার চোখ-মুখের চেহারাই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সে আবার আগেকার মতন জেদী ও চঞ্চল যুবা। ধুতিতে মালকোঁচা মেরে নিল, তার ওপর সাধারণ একটি কুর্তা, হাতে ছড়ি, পায়ে কালো বার্নিস করা পাম্প শু। নিচে নেমে এসে সে দুলালকে বললো, চ!

লোকের মুখে শোনা কিংবা সংবাদপত্রের বিবরণ পাঠের সঙ্গেও চাক্ষুষ দেখার অনেক তফাত! যতটা সে কল্পনা করেছিল, ধ্বংসের রূপটি তার চেয়েও ভয়াবহ। একটি গৃহও বুঝি অক্ষত নেই। একটি বৃক্ষও হয়তো পুরোপুরি অটুট নয়। পথ চলা সত্যিই দুষ্কর। অতি প্রয়োজনে কোনো কোনো ভদ্র গৃহস্থ পাল্কী নিয়ে বার হয়েছিল, এরকম পথ দিয়ে চলা পাল্কী বেহারাদেরও অসাধ্য, মাঝপথে তারা সওয়ারি নামিয়ে দিয়েছে।

পথ পরিষ্কার করা কিংবা আর্ত বিপন্নদের সাহায্য করার কোনো উদ্যোগই নেই সরকারের। কিংবা কে জানে, যাবতীয় উদ্ধারকার্য বুঝি চলছে সাহেব-পল্লীগুলিতে, নেটিভ টাউন বিষয়ে চিন্তা করার এখনো সময় আসেনি।

নবীনকুমারের মনে হলো সমস্ত নগরীটিই একটি ধ্বংসস্তূপ। তার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো অন্য একটি চিত্র। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু ঠুনকো সব খসে গেছে। আবার গড়ে উঠেছে এক নতুন দেশ, সুন্দর উজ্জ্বল। মানুষের মনে নতুন আশা। সব কিছুর সঙ্গে মানানসই করে নিতে হলে জীবনটাকেও তো নতুন করে নিতে হবে!

প্রলয়ংকর ঝড়ে কলকাতা নগরীর অন্যান্য বহু অট্টালিকার মতন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা ভবনটিরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই ভবনটির একাংশ কাত হয়ে পড়েছে। ছাদ ভেঙে কড়ি-বরগা এমন ঝুলে ঝুলছে যে উত্তমরূপে মেরামত করার আগে ওখানে প্রবেশ করাই বিপজ্জনক।

ঝড়ে শুধু উপাসনা ভবনটিই ভাঙেনি, সেই ধাক্কায় ব্রাহ্ম সমাজও ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল।

প্রবীণ দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে জ্বলন্ত তেজী যুবা কেশবের মিলনে ব্রাহ্ম সমাজ নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। গুসকরা গ্রামের এক আম্রকুঞ্জে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস কালে দেবেন্দ্রবাবুর মনে যে বিদ্যুৎ চমক হয়েছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেশব এই ধর্ম আন্দোলনটিকে স্থানীয় গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে সর্ব

ভারতে ছড়িয়ে দেবার উদ্যম নিয়েছেন। সুদূর বোম্বাই শহরে গিয়ে পর্যন্ত তিনি প্রচার করে এসেছেন এই নতুন ধর্ম মত। এখন সারা ভারতে ব্রাহ্ম সমাজের শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা দু হাজারের কিছু বেশী। যারা দীক্ষা নেয়নি এমনও অনেকে এই মুক্ত-চিন্তা ও কালোপযোগী ধর্ম-সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট।

পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে মাঘ উৎসবে যোগ দিয়েছেন কেশব, এই উপলক্ষে চিরকালের মতন গৃহত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তখন দেবেন্দ্রবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে সস্ত্রীক তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সকলের এমন আন্তরিক, আপন-করা ব্যবহার যে এ যে পরের বাড়িতে বাস, তা একদিনের তরেও বোঝা যায় নি। কেশবের স্ত্রী জগন্মোহিনীর কী-ই বা বয়েস। এর আগে কখনো সে থাকে নি কোনো অনাত্মীয়ের গৃহে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর কন্যা ও পুত্রবধূরা তাকে একেবারে নিজেদের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। সকলে মিলে অন্দরমহলে কত আনন্দ-ফূর্তি। জগন্মোহিনীর তবু মন কেমন করে তার একেবারে ছোট ভাইটির জন্য। সে দুঃখও তিনি ভুলে যান দেবেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রবিকে দেখে। রবির মুখে সদ্য আধো আধো বোল ফুটেছে, জগন্মোহিনী প্রায়ই তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রবির বড় ভাই সোম আর দেবেন্দ্রবাবুর এক নাতি সত্যও তার পায়ে পায়ে ঘোরে, এই শিশুরা তাঁকে "মাচি" বলে ডাকে।

কিছুদিন ঠাকুরবাড়িতে থাকার পর কেশবের শরীরে একটি বিষম ফোঁড়া হলো। কার্বঙ্কল জাতীয়। দেবেন্দ্রবাবু খ্যাতনামা চিকিৎসকদের ডাকিয়ে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। তবু বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন কেশব। তখন কেশবের আত্মীয়-স্বজন অনুতপ্ত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে আবার কেশব ও জগন্মোহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কলুটোলার বাড়িতে।

সেরে ওঠবার পর কেশব আবার বিপুল বিক্রমে লাগলেন ব্রাহ্ম সমাজের কাজে।

প্রথম যৌবনে বিষয়-কার্যের প্রতি দেবেন্দ্রবাবুর মনে একটা খুব বিরাগের ভাব ছিল। তাঁর মনে হতো, নিত্য তিরিশ দিন অর্থ সম্পদের চিন্তা মানুষের নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম সাধনার অন্তরায়। বিশেষত তাঁর পিতা অত্যন্ত বৈষয়িক, বিলাস-আড়ম্বরপ্রিয় এবং ভোগী দ্বারকানাথকে দেখেই দেবেন্দ্রবাবু আর বিপরীতমুখী হয়েছিলেন। প্রায়ই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুদূর, নির্জন শৈল-শিখরে সুমহান প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি বেশী সান্ত্বনা পেতেন।

কিন্তু এখন তিনি মধ্যবয়স্ক এবং একটি সুবৃহৎ পরিবারের অধিপতি। সাংসারিক ব্যয় বিপুল তো বটেই তা ছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিচালনার জন্যও তাঁকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ইণ্ডিয়ান মিরার নামে ইংরেজি পাক্ষিকও চলে তাঁর অর্থানুকূল্যে। সুতরাং দেবেন্দ্রবাবু এই সময়ে মন দিয়েছেন জমিদারি দেখাশুনোর কাজে। পিতার ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গেছে, জমিদারির আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এক সময় যিনি প্রায় দেউলিয়া হতে বসে-ছিলেন, সেই দেবেন্দ্রবাবু এখন আবার দেশের ধনী সমাজের শিরোমণি। এখন তিনি মনে করেন, পুরোপুরি সংসার ধর্ম পালন করেও ধর্মানুশীল এবং আত্ম-শুদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখা যায়। তাঁর পরিমণ্ডলের সকল মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার সহৃদয় ও উদার। মুক্তহস্তে তিনি দানশীল। কিন্তু তিনি গোষ্ঠীপতি। সকলকে মেনে চলতে হবে তাঁর বিধান, তাঁর মুখের কথাই আদেশ। যেকোনো বিষয়ে

তাঁর মতই চরম, মত পার্থক্যের কোনো স্থান নেই। আসলে তো তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে পৈতৃক রক্ত!

কেশবকে খুবই পছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁর খটকা লাগে। কেশব এত বাইবেল আর যীশুখৃীষ্টের জয়গান করে কেন? এর মধ্যে যেন খৃীষ্টানী গন্ধ আছে। সাহেব জাতি এবং খৃীষ্টানী ভাবকে ঘোর অপছন্দ করেন দেবেন্দ্রনাথ। ইংরেজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শেও তিনি পারতপক্ষেও যেতে চান না। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ নেই। তিনি ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছেন, সুফী তত্ত্বের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে। তবে তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মেরই পরিশীলিত অংগ মনে করেন, পৌত্তলিকতা যেমন হিন্দু সমাজ ছেয়ে ফেলেছে, সেই রকম একেশ্বরবাদও তো হিন্দু দর্শনের প্রধান কথা, সুতরাং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারক। সেই জন্যই পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হিন্দু সমাজের পারিবারিক আচার-ব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বিপ্লব পছন্দ করেন না। তিনি ধীরে ধীরে সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

কিন্তু তরুণ কেশবের হৃদয় আরও অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মধর্ম শুধু বাঙালী উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ধর্ম, কিন্তু কেশব মনে করছেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ, এমন কি সারা পৃথিবীর জন্য এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক। শুধু বাইবেল নয়, কোরান আবেস্তাও তিনি পাঠ করেন নিয়মিত। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিতে যে সব পৃথক বিধান আছে, তা আংশিক সত্য, কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। অতএব এই সব ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মেলাতে পারলেই হবে পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা গ্রহণ করবে সেই দায়িত্ব।

কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আর কেশবের মধ্যে বিভেদটা শুধু তাত্ত্বিক নয়, ভেতরে ভেতরে বিচ্ছেদ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে কিছুদিন ধরেই। তরুণ বয়সী ব্রাহ্মরা সকলেই কেশবের চ্যালা, তারা নিত্য নতুন এক একটা ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে। কেশব যেন ম্যাসিডোনিয়ার সেই তরুণ রাজকুমার, মুষ্টিমেয় একটি দল নিয়ে যে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু যে-হেতু বহু শতাব্দী যাবত পরাধীন, যুদ্ধবিমুখ, হিন্দুর সন্তান এই কেশব, তাই তলোয়ার নয় জিহ্বাই তাঁর অস্ত্র।

পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে একেবারে বিদায় করে দেবার জন্য কেশবরা তৎপর। ব্রাহ্মধর্মে জাতিভেদ নেই, শুধু দ্বিজের ঐ চিহ্ন থাকবে কেন? কেশবদের দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রবাবু নিজে উপবীত ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু যে-সব ব্রাহ্মণ আচার্যরা ব্রাহ্ম সমাজের একেবারে পত্তনের সময় থেকে আছেন, তাঁদের তিনি সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে চান না। লোকাচারের জন্য কিংবা পারিবারিক গণ্ডগোল এড়াবার জন্য যদি তাঁরা পৈতেটা রাখতে চান তো রাখুন না! কেশবরা উদ্যোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে বিবাহ ঘটাচ্ছেন, এটাই দেবেন্দ্রবাবুর মোটেই পছন্দ নয়। এমন কি বিধবা বিবাহ ব্যাপারটাকেও তিনি মনের খুব গভীরে সায় দিতে পারেন না।

কেশবের উৎসাহদাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামে আর এক তরুণ। মেডিক্যাল

কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্রটি বাঘ-আঁচড়া নামে এক গ্রামে গিয়ে দারুণ বিক্রমের সঙ্গে প্রচারের কাজ করছেন! বিজয়কৃষ্ণের মতামত যেন কেশবের চেয়ে উগ্র! পৈতেধারী আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার বেদী থেকে না সরালে যেন তাঁর কিছুতেই স্বস্তি নেই। শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রবাবু রাজি হলেন ওঁদের কথায়।

তারপর এলো সেই ঝড়।

ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের ভগ্নদশা, কিন্তু সেজন্য তো প্রতি বুধবারের উপাসনা বন্ধ রাখা যায় না! তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো যে যতদিন না সে গৃহের সংস্কার হয়, ততদিন সমাজের উপাসনা হবে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্র-নাথের বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে কেশবের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, উপাসনা এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে, আর আচার্যের বেদীতে বসে আছেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। আর যায় কোথায়! এই পাকড়াশী মশাই শুধু যে পৈতেধারী তাই-ই নয়, একবার রটেছিল যে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছেন, পরে আবার তিনি জানালেন যে না তিনি পৈতে ছাড়তে রাজি নন। সেই লোক আচার্য? অথচ কথা ছিল আজ বিজয়কৃষ্ণ এবং কমলাকান্ত আচার্য হবেন।

উপাসনার মাঝখানেই ছোকরারা উত্তেজিতভাবে গোলযোগ শুরু করে দিল। দেবেন্দ্রবাবু এভাবে কথার খেলাপ করলেন কেন।

দেবেন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা তো ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান নয়, এটা তাঁর নিজের বাড়ি। এখানে তাঁর ইচ্ছে মতন অনুষ্ঠান পরিচালনার অধিকার তাঁর আছে।

নবীনরা বললো, মোটেই না! সকলের সম্মতি নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার স্থান বদল হয়েছে। সে স্থানটি যার বাড়িতেই হোক, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের বিধি মতই সব কিছু চলতে হবে।

দেবেন্দ্রবাবু তখনও দু'দলের মধ্যে আপোস করবার জন্য বললেন যে, তা হলে এক কাজ করা যাক না। পাকড়াশী মশাই বসেছেন বসুন, তাঁর পাশে আর একজন পৈতে ত্যাগী আচার্য আসন নিন। তা হলে আর কারুর কিছু বলার থাকে না। বিজয়কৃষ্ণই হতে পারেন দ্বিতীয় আচার্য।

কিন্তু তরুণদল তা মানতে মোটেও রাজি নয়। আপোস কিসের? প্রাণটা তো আদর্শের। একই সঙ্গে পৈতে পরে ব্রাহ্মণ সেজে থাকা, আবার জাতিভেদহীন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী, এ আবার কী রকম কথা।

বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, দেবেন্দ্র-বাবু কি পোপ নাকি যে তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে?

এবার কঠোর হলেন দেবেন্দ্রবাবু। হ্যাঁ, তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত। পাকড়াশী মশাইকে তিনি আচার্যের বেদী থেকে নেমে আসতে বলতে পারবেন না। যার ইচ্ছে হয় এই উপাসনায় যোগ দিক, যার ইচ্ছে হয় চলে যাক।

সদলবলে কেশব-বিজয়কৃষ্ণরা চলে গেলেন সেই উপাসনা সভা ছেড়ে। অন্য এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ির ছাদে গিয়ে বসলেন তাঁরা।

যেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তরুণ কেশবকে আর সব প্রবীণ ব্রাহ্মদের ডিঙিয়ে সমাজের আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বস্তুত কেশবের হাতেই

তুলে দিয়েছিলেন সমাজের ভার, আজ দেখা গেল সেই স্বপ্ন ভ্রান্ত। ব্রাহ্মসমাজের ভবন এবং যাবতীয় সম্পত্তির যে ট্রাস্টি বোর্ড ছিল তা থেকে কেশব এবং অন্যদের তিনি সরিয়ে দিলেন কলমের এক খোঁচায়। ওঁদের কারুকে তাঁর দরকার নেই। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রকে করলেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সেই অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং নিজের হাতে রাখলেন সর্বময় কর্তৃত্ব।

দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যবহারে তরুণরা প্রথমে একেবারে হতবাক। ব্রাহ্মসমাজের সব সম্পত্তি কি দেবেন্দ্রবাবুর নিজের নাকি? তিনিই বেশী টাকা-পয়সা দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখন তো তা একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং ব্রাহ্মসমাজের কনস্টিটিউশনও আছে। সে সব অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রবাবু নিজস্ব হুকুম জারি করলেন। এ যে স্বৈরাচার! রামমোহন রায়ের এই মত ছিল না যে ব্রাহ্মসমাজ ভবনে সব ধর্মের লোকেরই উপাসনার অধিকার থাকবে?

ব্রাহ্মসমাজ ভঙ্গ হয়ে যদি দুটি টুকরোই হয়, তা হলে ট্রাস্টের বিষয়ও ভাগ হওয়া উচিত। এমন মনে করলেন কেশব এবং তাঁর সমর্থকরা। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কেশব, সে পত্রিকায়ও রাতারাতি অন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হলো। এতটা কেশব কিছুতেই মানতে রাজি নন। যিনি আর্থিক সাহায্য করেন, পত্রিকার ওপরে কি শুধু তাঁরই অধিকার? আর যে সম্পাদক পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি বার করছেন, তিনি কেউ না? কেশবের লেখনী গুণেই মিরর-এর খ্যাতি।

কেশব ঠিক করলেন, যদি মিরর নামে দুটি পত্রিকা বেরোয়, তাতেও ক্ষতি নেই, তবু তিনি মিররের সম্পাদকত্ব ছাড়বেন না। পক্ষকালের মধ্যে তিনি স্বাধীন-ভাবে প্রকাশ করলেন মিরর-এর নতুন সংখ্যা।

নিজের নীতিতে অবিচল থাকলেও কেশবের সঙ্গে বিচ্ছেদে মনে বড় আঘাত পেলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারুণ্যের শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করে তাঁর অতি প্রিয় ব্রাহ্ম আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তরুণরা যখন তখন আঘাত দেয়। আর তারুণ্যের ধর্মই এই। প্রবীণদের চিন্তাধারা থেকে অন্তত কয়েক পা এগিয়ে থাকা। দল কার্যত দু' ভাগ হবার পর উত্তেজিত যুবকেরা তাঁর নামে নানারকম অভিযোগ, এমন কি কটু-কাটব্য করতেও ছাড়লো না। অভি-জাত দেবেন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদও না করে নিঃশব্দ রইলেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন তিনি। যদিও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মের সংখ্যাও কম নয়, বিদ্রোহী তরুণদের চেয়ে অনেক বেশীই হবে বোধ হয়, তবু দেবেন্দ্রনাথ আর আগেকার সেই উদ্দীপনা বোধ করেন না। এমন কি, তিনি যেন অনুভব করছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে, শ্রবণ ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে, শরীরে আর সেই জোর নেই। সাতচল্লিশ বৎসর বয়েস, এর মধ্যেই যেন তাঁর জীবনসায়াহ্ন এসে গেল।

দ্বিতলের অলিন্দে আরাম-কেদারায় তিনি চুপ করে বসে থাকেন। মনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেন না। বারবার মনে পড়ে কেশবের প্রজ্বলন্ত মুখখানি। নিজের সন্তানদের চেয়েও ওকে তিনি বেশী প্রীতি করেছিলেন। এখন কেশব দূরে গেছে, তবু তিনি কেশবের ওপর রাগ করতে পারেন না। আপন মনে বলেন, কেশব বিজয়ী হোক, ওর আত্মার প্রভায় আর সকলে আলোকিত হোক, সারা বিশ্ব কেশবকে চিনুক, জানুক।

ব্রাহ্মদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য শহরের অপর দলের বড় মানুষরা নানা রকম উপায় অবলম্বন করছেন, তার মধ্যে মোক্ষমটি হলো পশ্চিম থেকে সন্ন্যাসী আমদানী। নির্জন পর্বত-অরণ্যানী থেকে ধ্যান ভঙ্গ করে ঋষি-যোগীরা দলে দলে আসছেন কলকাতায়। এখানে ভক্তের অভাব নেই। আর চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়র অতি উত্তম ব্যবস্থা।

দু চার গণ্ডা মোসাহেব আর দু-চারটে রক্ষিতা রাখলেই ঠিক বড় মানুষীর জাঁক হয় না, ও তো রামা ধোপা কিংবা পুঁটে তেলীরাও আজকাল রাখে। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জমিদাররা এসে এমন ঢলাঢলি করে যে ও জিনিসের আর ইজ্জৎ রইলো না। তার চেয়ে বড় কোনো সন্ন্যাসী এনে জাঁক-জমক করলে বেশ নতুন রকমের হেঁকড় দেখানো যায়। ধর্ম রক্ষাও হলো আর পয়সার গরম দেখানোও হলো। সন্ন্যাসীকে দিয়ে পুজো-আর্চা, যাগ-যজ্ঞ, কাঙালীভোজন-সংকীর্তন ইত্যাদি ব্রাহ্মদের অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী বর্ণাঢ্য। ব্রাহ্মদের তো শুধু উপাসনা, পুরুষে-পুরুষে ভাই ভাই বলে জড়াজড়ি আর প্রেমাশ্রু বর্ষণ।

বঙ্কুবিহারীবাবুর ইদানীং বেশ কাঁচা পয়সা হয়েছে। ইনি আগে ছিলেন এক অ্যাটর্নির বাড়ির হেড কেরানী। যে-হেতু উকিল-মোক্তার-অ্যাটর্নীর বাড়ির ভুষো-কালি রঙের বেড়ালটা কিংবা দাড়িওয়ালা রামছাগলটা পর্যন্ত আইনের প্যাঁচ-ঘোঁচ শিখে যায় সেই সুবাদে বঙ্কুবিহারীবাবুও ক্রমে মস্ত আইনবিদ হলেন এবং পাড়াগেঁয়ে বড়লোকদের উচিত মতন শলা-পরামর্শ দিয়ে নিজে ফুলে-ফেঁপে তারকেশ্বরের কুমড়োপানা রূপ ধারণ করলেন। মধ্য বয়েসে এসে তাঁর হঠাৎ উপলব্ধি হলো পয়সা তো যথেষ্ট রোজগার কল্লুম, এবার একটু নাম কেনা যাক। ধরা-বাঁধা পথে কিছুদিন রাঁড়-ভাঁড়-মদে প্রচুর পয়সা উড়িয়েও এক সময় তাঁর একঘেয়ে লাগলো। সে রকম যেন ঠিক নাম হয় না। বস্তুত ছেলেবেলা থেকেই তাঁর একটি আড়ালের নাম আছে। তিনি সেটা জানেনও, কিন্তু সেটা ঘোচাতে পারছেন না কিছুতেই। বাল্যকালে তিনি দৈবাৎ একবার পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতে তাঁর নাকের একটি দিক থেঁৎলে যায়। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় নাককাটা বঙ্কু। তারপর বড় হয়ে তিনি যে এত কীর্তি করলেন, তবু লোকে তাঁকে আড়ালে আবডালে ঐ নাককাটা বঙ্কু বলেই ডাকে।

কিছুদিনের জন্য সিমলেয় বেড়াতে গিয়ে বঙ্কুবিহারীবাবু এক সন্ন্যাসী ধরে আনলেন। সে এক জবরদস্ত সন্ন্যাসী বটে, দেখলে মনে হয় বয়েসের গাছ-পাথর নেই। চলমান পাহাড়ের মতন দেহ, আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত এত চুল যে কোনো মানুষের থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইনি কথা বলেন না। খোরাকী অবশ্য একটি প্রমাণ আকারের হস্তীর সমতুল্য। দশ জন চ্যালা সমেত সেই সন্ন্যাসী কাঁসাড়ীপাড়ায় বঙ্কুবিহারীবাবুর বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন।

দিনে দিনে সেই সন্ন্যাসীর সুনাম এমনই ছড়িয়ে পড়লো যে কাঁসারীপাড়ায়

সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভিড়ে ভিড়াক্কার। এ অঞ্চলের বিখ্যাত সঙ্‌যাত্রার সময়ও বুঝি এত মানুষের জমায়েত হয় না। সন্ন্যাসী এক একদিন এক এক রকম কীর্তি দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। ক্রমে এমন কথাও রটে গেল যে এই সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা বানাতে পারেন এবং উপযুক্ত তিথির জন্য অপেক্ষা করছেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদের এই দাবি এক কথায় নস্যাৎ করা যায় না। কারণ মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করেছেন তিনি সর্ব সমক্ষেই। এক কোপে বলি দেওয়া হলো একটি পাঁঠাকে, তারপর সন্ন্যাসী তার শরীরে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিতেই সেই পাঁঠা অমনি জীবন্ত হয়ে লাফাতে লাফাতে ব্যা ব্যা করতে লাগলো।

সন্ন্যাসীর খ্যাতি মানে তো বঙ্কুবিহারীবাবুরও সুনাম। তিনি ভাড়াটে লোক দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সন্ন্যাসীর কৃতিত্বের কথা প্রচার করতে লাগলেন সারা শহরময়। ব্রাহ্মদের ওপর বঙ্কুবিহারীবাবুর বড় রাগ, কেন রাগ তা তিনি নিজেই সঠিক জানেন না, তবু রাগ এবং সেই জন্য খ্যাতনামা ব্রাহ্মদের বাড়ির সামনেও তিনি ঢাক-ঢোলওয়ালাদের পাঠালেন বেশী করে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি চিঠি দিয়ে আহ্বান করলেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যাবার জন্য যে এখনো সনাতন বৈদিক ধর্মের কত মহিমা! মন্ত্রশক্তির কত জোর! অবিশ্বাসীরা হেঁট মুন্ডে ফিরে যাক।

সত্যিই যেন সন্ন্যাসীর চমকপ্রদ অলৌকিক শক্তি দেখে অনেকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

কৌতূহলী নবীনকুমার একদিন এলো কাঁসারীপাড়ায়। প্রথমে সে ভেবেছিল বুঝি ভিড় ঠেলে ঢুকতেই পারবে না। দুলাল একটু ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছিল বটে, কিন্তু সামনে যেন পরপর অনেকগুলি স্তরের মনুষ্য-প্রাচীর। কিন্তু একটু পরেই অন্যরূপ ব্যাপার হলো। কিছু লোক তাকে চিনতে পেরে বলে উঠলো, ওরে, নবীনকুমার সিংহ এয়েচেন, পথ ছেড়ে দে! পথ ছেড়ে দে! আবার অন্য কয়েকজন লোক বললো, কই, নবীন সিংগী কই, দেকি দেকি!

ভিড় দু ফাঁক হয়ে গিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সন্ন্যাসীর তুলনায় নবীনকুমারও কম দর্শনীয় নয়।

নবীনকুমার যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তা সব সময় তার নিজের মনে থাকে না। তার মনের মধ্যে একটি বিস্ময় ও রগড়-সন্ধানী বালক আছে, যে মন নিয়ে সে হুতোমপ্যাঁচার নক্সা লেখে, সেই মন নিয়েই সে এখানে এসেছে। কিন্তু লোকচক্ষে সে প্রখ্যাত দাতা, মহাভারতের অনুবাদক, হিন্দু পেট্রিয়টের মালিক ইত্যাদি, এবং বিপুল ধনী তো বটেই! এ ব্যাপারে সজাগ হতেই সে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে ধীর পদক্ষেপে ভিতরে চলে এলো।

নাককাটা বঙ্কু ওরফে বঙ্কুবিহারীর সাজসজ্জা দেখবার মতন! পরনে "বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে" পাড়ের শান্তিপুরী ধুতি, লাল গজের পিরাণ, তার ওপরে ডুরে উড়নি, মস্তকে জড়িয়ে কাবলি তাজ এবং হাতে একটি লাল রঙের রুমাল। যাতে রিং সমেত গুটি কতক চাবি বাঁধা। তিনি খুব খাতির করে প্রথম দফায় নবীনকুমারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন কয়েক বার। তারপর একখিলি পান দিয়ে নিয়ে এলেন ঠাকুর-দালানে। একদিকে চ্যালা পরিবৃত হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী। মাঝখানে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাবার জন্য কিছুটা স্থান বাদ রেখে তারপর পাতা হয়েছে বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য গালিচা। সেখানে এক পাশে বসলো নবীন-কুমার। আশেপাশে অনেক চেনা মুখ।

এই সব সম্ভ্রান্ত দর্শকরা প্রত্যেকে ইচ্ছে করলে দুটি প্রশ্ন করতে পারবেন সন্ন্যাসীকে। সরাসরি কথা বলবার অবশ্য উপায় নেই। বঙ্কুবিহারীবাবুর বিশেষ সুহৃদ চূড়ামণি রায় উত্তম হিন্দী জানেন বলে দাবি করেন, প্রশ্নটি শুনে তিনি সেটি হিন্দী অনুবাদ করে বলবেন সন্ন্যাসীর এক চ্যালাকে, চ্যালা আবার সেটি দুর্বোধ্যতর হিন্দী করে শোনাবেন গুরুকে। মৌনী সন্ন্যাসী দু-চারবার মাথা নাড়বেন শুধু। সেই মস্তক সঞ্চালনের ভাষা আবার হিন্দীতে অনূদিত হয়ে প্রশ্নকারীর কাছে উত্তর হয়ে ফিরে আসবে।

বঙ্কুবিহারী নবীনকুমারকে বললেন, সিংহমোয়াই, আপনি ভাবুন তা হলে, দু-খানা কোয়েশ্চেন ভাবুন!

নবীনকুমারের পাশেই বসে আছেন সিমলের জগমোহন সরকার। দাঁত সব পড়ে গেছে। ফোকলা মুখ, মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত, গোঁফজোড়া পাকা, সেই আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। ইদানীং তিনি খুব বৈষ্ণব হয়েছেন, যে-কোনো নারীকেই মা বলে সম্বোধন করেন। এমন কি কখনো কখনো নিজের পত্নীকেও মা বলে ফেলেন।

সেই জগমোহন সরকার হেঁকে বললেন, আহা, যোগিবর যেন সাক্ষাৎ বেদব্যাস। বাবা আমার মনের দুটি সংশয় দূর করুন। কোন্ সাধনায় জীবাত্মা মিশে যায় পরমাত্মার সহিত? যাতে আর পরজন্ম থাকে না! আর, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়েই কি পরমেশ্বর এই জগতে লীলা করেন?

চূড়ামণির মারফত ঘুরে সেই প্রশ্ন গিয়ে পৌঁছোলো সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী আঙুল তুলে বাতাসের গায়ে কী সব অদৃশ্য লিপি লিখতে লাগলেন। একজন শিষ্য সেদিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর সে উত্তরটি জানালো। এমনই দুর্বোধ্য ও জটিল উত্তর যে অনেকেরই তা বোধগম্য হলো না। না বুঝলেই আরও ভক্তি বাড়ে। সাধারণ মানুষ তো নন যে সাধারণ ভাষায় কথা বলবেন।

এই রকম চলতে লাগলো আরও প্রশ্নোত্তর। এর মধ্যে দু-একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে হাস্যরোলও ওঠে। যেমন সীতাপতি রায় জিজ্ঞেস করলো, প্রভু, আপনি বলে দিন, আমার আয়ু আর কতদিন? এর উত্তরে সন্ন্যাসী জানালেন, তুমি তো ইতিমধ্যেই মরে গেছো! জানো না, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন?

ভিড়ের মধ্যে একটি থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রনাথ তার সাগরেদকে নিয়ে। কদিন ধরেই নিয়মিত আসছে সে। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে সন্ন্যাসীর ক্রিয়াকলাপ দেখে এ পর্যন্ত সে একটিও কথা বলেনি। সাগরেদটি ছটফট করলেও সে তার কাঁধ জোর করে ধরে রাখে।

নবীনকুমার কোনো প্রশ্ন করলো না। তবে দেখে শুনে তার তাক লেগে যাচ্ছে ঠিকই। তার মনে পড়লো, কৈশোর বয়সে, কলেজ-জীবনে সে ভূকৈলাশের রাজবাড়িতে এক মহাপুরুষ দর্শন করতে গিয়েছিল, যিনি সত্যযুগের মানুষ গায়ে উইয়ের ঢিপি। কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গিয়েছিল তার বুজরুকি। কিন্তু এ সন্ন্যাসীকে তো সেরূপ মনে হয় না। এমন ক্ষমতা তিনি প্রদর্শন করছেন য ব্যাখ্যার অতীত। একজন কেউ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেই তিনি শুধু খালি হাতটি তুললেন তার দিকে। অমনি সেই লোকটির গায়ের ওপর একটি গাঁদা ফুল এসে পড়লো। একটি বিড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল এর মধ্যে। তার পর এত লোক দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক ছুটতে গিয়ে সোজা গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়লো সন্ন্যাসীর কোলে। সকলে হা হা করে উঠলো কিন্তু সন্ন্যাসী সকলকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বিড়ালটির গায়ে কয়েকবার হাতের স্পর্শ দিতেই সেটি একটি পারাবত হয়ে উড়ে গেল ডানা ঝটপটিয়ে। সকলে একেবারে তাজ্জব। এ জিনিস কেউ কখনো দেখেনি।

জগমোহন সরকার নবীনকুমারের গায়ে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, ভায়া, আমার তো কোটা ফুইরে গ্যাচে, তবু আরও কিছু জিজ্ঞেস কত্তে সাধ হচ্ছে। আপনি দুটো কোয়েশ্চেন আস্ক করুন না!

কিন্তু কী প্রশ্ন করবে, তা নবীনকুমারের মনে আসছে না। তার কোনো ধর্ম সংশয় নেই, জীবাত্মা-পরমাত্মার মতন ব্যাপারগুলি সম্পর্কেও সে কোনো মাথাব্যথা বোধ করে না। সে শুধু দেখতে এসেছে।

জগমোহন সরকার বললেন, আপনি শুধোন যে, ঈশ্বর যে সর্বত্র উপস্থিত, তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব?

নবীনকুমার লজ্জা পাচ্ছে দেখে তিনি নিজেই হেঁকে বললেন, নবীন সিংহী মশাই জানতে চাইচেন...।

চূড়ামণি ও শিষ্য মারফত এই প্রশ্ন সন্ন্যাসীর কাছে পেঁছোবার পর তিনি মস্তক আন্দোলন করলেন না কিংবা বাতাসে অদৃশ্য লিপিও লিখলেন না। সামনের একটি ঘটের দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন।

দু-তিনজন শিষ্য তখন এক যোগে জানালো যে সকলকে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে ঐ ঘটের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। কেউ যেন কোনো শব্দ না করে।

ঘটটি সন্ন্যাসীর থেকে দু-তিন হাত দূরে। তার ওপরে অনেকগুলি জবা ফুল। পাশে একটি পেতলের পরাতের ওপর শালগ্রাম শিলা। সন্ন্যাসী নিথর হয়ে চেয়ে আছেন ঘটটির দিকে।

হঠাৎ সেই ঘটের চূড়া থেকে একটি জবা ফুল লাফিয়ে উঠে এসে পড়লো শালগ্রাম শিলার মাথায়।

একসঙ্গে সকলের কণ্ঠ থেকে দারুণ বিস্ময়ের গুঞ্জন বেরিয়ে এলো। নবীনকুমার যেন নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই যেন একটি কড়কটো ব্যাঙের মতন ফুলটি জীবন্ত হয়ে লম্ফ দিয়ে উঠলো। এও কি সম্ভব?

তারপরের কান্ডটি আরও যেন অলৌকিক। বঙ্কুবিহারীবাবু এই সময় একটি মদের বোতল এনে উপস্থিত করলেন। যারা আগে দু-একদিন এসেছে, তারা জানে এবার মদ্যকে দুগ্ধে পরিণত করবেন সন্ন্যাসী। জিনিসটা যে সত্যিই মদ, তার মধ্যে কোনো কারচুপি নেই, সেটা প্রমাণ করবার জন্য একটি নতুন মাটির সরায় বোতলের সবটুকু মদ ঢেলে দেওয়া হলো, ঘর আমোদিত হয়ে গেল পরিচিত সুরার গন্ধে। কিছু কিছু দর্শকের মন আনচান করে উঠলো।

তারপর একজন শিষ্য জিজ্ঞেস করলো, গুরুজী, এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?

গুরুজী কিছু না বলে এক কুশি জল ঢেলে দিলেন সেই সরায়, অমনি সেই তরল পদার্থ দুগ্ধধবল হয়ে গেল।

আবার সকলের সেই বিস্ময়ধ্বনি। নবীনকুমার ভাবলো, এই ভেল্কির সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণের কী সম্পর্ক আছে তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু মদ্য যে দুগ্ধে পরিণত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই ক্রিয়াকান্ডটির ঠিক আগে চন্দ্রনাথ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেও কয়েকদিন ধরে এসে এই ব্যাপারটি দেখেছে। সকলে দুধ দুধ বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সে এবার

তার সাগরেদকে ঠেলে দিয়ে বললো, যাঃ!

বাঁটকুল সাগরেদটি ছুটে গেল দুধের সরাটির দিকে। দুজন শিষ্য হা হা করে উঠে তাকে ধরে ফেলতেই সে নাকি নাকি আদুরে গলায় বললো, আমি দুধ খাঁবো, আঁমি ঐ দুঁধ খাঁবো!

বঙ্কুবিহারী বললেন, আরে মোলো, এ ছোঁড়া আবার এলো কোথ্ থেকে! যা, যা, দূর হ আপদ!

সুলতান আবার আবদার ধরলো ঐ দুধ খাবার জন্য।

তখন জনতার মধ্য থেকে দু-একজন বললো, মোশাই, মদ যখন দুধ হয়েই গ্যাচে, তখন ও ছোঁড়াকে একটু চেখে দেকতে দিন না!

শিষ্যরা প্রবলভাবে আপত্তি জানাতে লাগলো তাতে।

চন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, না মশাইরা, ঐ বাচ্চা ছেলেকে ও জিনিস পান করানো ঠিক হবে না। রং বদলালেও ওটা মদই রয়েছে, যে-কেউ জিব ছুঁইয়ে দেকতে পারেন।

পেছন থেকে একজন গর্জে উঠলো, ঠিক বলেচেন মশাই! মদ কখনো দুধ হয় না। আমরা খবর নিয়ে জেনেচি, আমেরিকান রাম, মার্কিন আনীশ নামের মদে জল দেবা মাত্তর দুধের মতন সাদা হয়ে যায়। ওতে বাহাদুরি কিছু নেই।

এই বক্তা একজন মেডিক্যাল কলেজের তরুণ ছাত্র। ভিড় ঠেলে সেও এগিয়ে এলো সামনে।

চন্দ্রনাথ মদের সরাটি তুলে ধরে বললো, যে-কেউ খেয়ে দেকুন, এটা ঐ আমেরিকান মদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি আর একটা কতা বলচি। ঐ সন্নেসীর আলখাল্লার ভেতর থেকে আমি যদি একটা মরা বেড়াল বার করতে না পারি তাহলে আপনারা আমাকে পঞ্চাশ ঘা জুতো মারবেন!

গুপী স্যাকরার বাড়িতে জ্যান্ত ভূতদের যা অবস্থা হয়েছিল, এবার সন্ন্যাসী আর তার চ্যালাদেরও সেরকম হল, বহুলোক ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে তছনছ করে দিল তাদের। সত্যিই সন্ন্যাসীর কম্বলের তলা থেকে বেরুলো মড়া বেড়ালটি। কী অসীম শক্তি ঐ লোকটির, বেড়ালটিকে অতি দ্রুত এমনভাবে গলা মুচড়ে মেরেছে যে সে টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। দুর্গন্ধযুক্ত একটি কাটা ছাগলও পাওয়া গেল। আর চন্দ্রনাথের বাঁটকুল সাগরেদটি শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে নিয়ে এলো সেই লম্ফমান জবাফুলটি। সেটার বোঁটায় একটি ঘোড়ার লেজের বালামচি বাঁধা। ঐ বালামচির অন্যদিক যুক্ত ছিল সন্ন্যাসীর পায়ের অঙ্গুলিতে।

জনতার হুড়োহুড়ি এড়িয়ে নবীনকুমার দাঁড়িয়ে ছিল দ্বারের এক পাশে। সাগরেদ সমেত চন্দ্রনাথকে বেরুতে দেখে সে বললো, মশায়, একটু দাঁড়াবেন কি? মশায়ের নাম জানতে পারি?

বক্র চোখে নবীনকুমারের দিকে চেয়ে চন্দ্রনাথ বললো, আমার নাম সম্পর্কে আপনার কৌতূহলের কারণ জানতে পারি কি আগে?

নবীনকুমার সহাস্যে বললো. আপনাকে আমার বেশ পচন্দ হয়েচে। আমি এই ধাতের মানুষ ভালোবাসি। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

নবীনকুমার তার প্রীতিপূর্ণ দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে দিল চন্দ্রনাথের দিকে।

শীতের প্রারম্ভে বৃক্ষ থেকে খসে পড়া পাতার মতন অনবরত চিঠি আসছে মধুসূদনের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরকেই এখন একমাত্র অবলম্বন করেছেন মধুসূদন, প্রবাসে গ্রহ-বৈগুণ্যে বিষম দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি বুঝেছেন, ঐ জেদী ব্রাহ্মণটি শুধু বিদ্যার সাগর নন, করুণাসাগরও বটে। আর যাঁদের তিনি বন্ধু বলে মনে করেছিলেন, তাঁরা সবাই বিমুখ করেছেন, একমাত্র বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই সাহায্য এসেছে বিনা শর্তে। রাজা দিগম্বর মিত্র মধুসূদনের বাল্য সুহৃদ, দেশের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে মধুসূদন তাঁর ওপরেই নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশী, সেই দিগম্বর মিত্রই তাঁর সর্বনাশের পথ সুগম করেছেন। অর্থ প্রেরণ করা তো দূরের কথা, একটা চিঠিরও উত্তর দেন না। অথচ এই রাজা দিগম্বর মিত্রকেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য উৎসর্গ করেছেন!

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেশে রেখে একাই লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছিলেন মধুসূদন। হেনরিয়েটার সংসারের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করে দিয়ে গিয়েছিলেন সম্পত্তির পত্তনীদারদের কাছে, তারা সে অর্থ নিয়মিত দেয় না। তাই নিরুপায় হয়ে হেনরিয়েটা পুত্র-কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন লণ্ডনে। বিপদ তাতে বৃদ্ধি পেল শতগুণ। মধুসূদনের ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যয় ছাড়াও এত বড় একটি সংসার চালানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লো। নিতান্ত খাদ্যচিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তার অবকাশ রইলো না। ইংলণ্ডের তুলনায় ফরাসী দেশে জীবনধারণ-ব্যয় কিঞ্চিৎ কম বলে মধুসূদন সদলবলে চলে এলেন প্যারিসে। কিন্তু যখন হাতে একটি মুদ্রাও থাকে না, তখন কোন্ দ্রব্যের মূল্য কত সে বিচারে লাভ কী? অবস্থা পৌঁছলো একেবারে চরমে। শিশু পুত্র কন্যা অনাহারের কষ্টে রোদন করে, পিতা হয়ে মধুসূদনকে তা দর্শন করতে হয়। রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র, মুখে সোনার চামচ নিয়ে যাঁর জন্ম, যিনি যৌবনে-কৈশোরে খোলামকুচির মতন দু হাতে মুদ্রা ছড়িয়েছেন, আজ তাঁর নিজ সন্তান-সন্ততির এই দশা! যদিও দেশে তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সুন্দরবনের এক আবাদ থেকেই বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রা, শুধু স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিদেশে তিনি মরণাপন্ন। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়' এই দম্ভোক্তি যাঁর মুখে সর্বদা শোনা যেত, আজ সেই তাঁকেই সামান্য ভিখারীর মতন চ্যারিটেবল সোসাইটিতে গিয়ে হাত পাততে হয়।

নিজস্ব জিনিসপত্র বিক্রয় ও বন্ধকী দিতে দিতে আর কিছুই বাকি নেই। নবীনকুমার সিংহ প্রদত্ত রৌপ্য পাত্রটি মধুসূদনের অতি প্রিয়, সেটি শেষ পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলেন। স্বদেশে তাঁর কাব্য রচনার স্বীকৃতিতে একমাত্র সংবর্ধনা সভায় তিনি এটা পেয়েছিলেন। তবু একদিন সেটিকেও নিয়ে যেতে হলো বন্ধকী দোকানে। এর বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া গেল, তাতে পুত্র-কন্যাদের কয়েকদিনের দুধের খরচ সংকুলান হবে।

অন্য সকলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে তারপরই মধুসূদন সাহায্যের আবেদন করেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। এমন যে অপ্রত্যাশিত ফল হবে, তিনি স্বপ্নেও

আশা করেন নি। কোনো রকম জামিন ছাড়াই টাকা পাঠালেন বিদ্যাসাগর! কলকাতায় এত সব মহা মহা ধনী ব্যক্তি, তাঁদের তুলনায় বিদ্যাসাগর কী আর! অতি লোভনীয় সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন বিদ্যাসাগর, এখন তাঁর যাবতীয় আয় শুধু গ্রন্থ বিক্রয় থেকে। জমিদার বা ধনীরা কেউ নয়, গদ্য গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরই শুধু সাহায্য করলেন কবি মধুসূদনকে।

কিন্তু তাতেও যে চলে না। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে দুই তিন সহস্র টাকা আসে, আর দু এক মাসের মধ্যেই তা উড়ে যায়। তখন আবার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ পত্র। এখন মধুসূদনের সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছে করুণা-নিষ্কাষণী পত্র রচনায়। বিদ্যাসাগরকে খুশী করবার জন্য তিনি ইংরেজি চিঠির মধ্যে মধ্যে কয়েক ছত্র লেখেন বাংলা অক্ষরে, বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের কাব্য পছন্দ করেন বলে প্রায়ই ভারতচন্দ্রের রচনার উদ্ধৃতি দেন, ফ্রান্সের শীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলেন, "বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।" বিলাতি পত্র-পত্রিকায় কখন কোথায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে খবরও জানান সাগ্রহে। একদিন প্যারিসের এক দোকানে দেখলেন বিদ্যাসাগরের লেখা কয়েকটি বই। দারুণ গর্ব হলো মধুসূদনের। দোকানদারকে বলেই ফেললেন, এই লেখক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাই শুনে দোকানদার বললেন, নাকি, আমাদের ধারণা, এই লেখক এখন জীবিত নেই। মধুসূদন বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কথা! না, না, তাঁর দেশ এবং তাঁর সুহৃদরা তাঁর বিয়োগ সহ্য করতে পারবেন না।

সনির্বন্ধ পত্র প্রেরণ করলে বিদ্যাসাগর ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাবেনই, এরকম একটা কুসংস্কারের মতন বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেল মধুসূদনের। কিছুদিনের জন্য তিনি সপরিবারে এসে রয়েছেন ভার্সাই নগরীতে, বিদ্যাসাগর প্রেরিত অর্থ দ্রুত নিঃশেষিত হতে চলেছে, আবার সাহায্যের আবেদন করে পাঠানো হয়েছে পত্র। এক সকালে মধুসূদন কিছু পড়াশুনোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় হেনরিয়েটা অশ্রুপূরিত নয়নে এসে বললেন, আর যে পারি না! এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকতে হবে!

নতুন কী আবার হলো? ব্যাপার অতি সামান্য, কিন্তু বড়ই মর্মভেদী। তাঁদের বাসগৃহের সন্নিকটেই ধুমধাম করে একটি বেশ বড় মেলা বসেছে। পল্লীর সব শিশুরা ছুটে চলেছে সেদিকে। তাই দেখে হেনরিয়েটার পুত্র-কন্যাও সেই মেলায় যাবার জন্য বায়না ধরেছে। অবোধ শিশু, ওদের কীভাবে নিরস্ত করা যাবে? কিছু না ভেবেই মধুসূদন বললো, যাবে না কেন, যাক না। মেলা দেখে আসুক। হেনরিয়েটার বিলাপ উচ্চতর হলো। তাঁর হাতে রয়েছে মাত্র তিন ফ্রাঁ, তা দিয়ে কিছু কেনাকাটা তো দূরের কথা, মেলার প্রবেশ মূল্যই যে ওর চেয়ে বেশী।

একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন মধুসূদন। তিনি অক্ষম পিতা, আজ প্রাতে নিজের সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাবার মতন সাধ্য তাঁর নেই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বলে উঠলেন এক সময়, একটু অপেক্ষা করো, দেখো, আজই নিশ্চিত বিদ্যাসাগরের নিকট থেকে অর্থ এসে পঁহুছোবে! তিনি কি যে সে মানুষ! তাঁর প্রতিভা ও প্রজ্ঞা প্রাচীন ঋষিদের মতন, তাঁর কর্মোদ্যম ইংরেজদের মতন আর তাঁর হৃদয়খানি বাঙালী মায়ের মতন! তিনি ঠিকই বুঝবেন!

এমনই কাকতালীয় যোগাযোগ, এক ঘণ্টার মধ্যেই ডাকে এলো বিদ্যাসাগরের এনভেলাপ, তার মধ্যে দেড় হাজার টাকা!

নিয়মিত বিদ্যাসাগর প্রেরিত অর্থে মধুসূদন সাংসারিক অনটন কিছুটা সামলে উঠে আবার পড়াশুনোর কথা ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেছেন শখ চরিতার্থ করবার জন্য, কিন্তু তাতে তো উদরান্নের সংস্থান হবে না! অনিশ্চিতকাল ধরে প্রবাসে থাকাও সম্ভব নয়, আর দেশে ফেরার আগে ব্যারিস্টারি পাশ না করলে ফিরে গিয়েও তো সেই একই অবস্থায় পড়তে হবে। দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র সত্যেন্দ্র সসম্মানে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করে সকলকে চমকিত করে দিয়েছে। সাহেবদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে সে প্রথম ভারতীয় আই সি এস। সত্যেন্দ্র যথেষ্ট মেধাবী বটে, তা ছাড়া ধনীর সন্তান, তাকে পড়াশুনোর সময় অর্থচিন্তা করতে হয় নি। শোনা যাচ্ছে যে, সত্যেন্দ্র আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে ঐ পরীক্ষার মান আরও কঠিন করার কথা চিন্তা করছেন। ভারতীয়রা করবে ইংরেজদের সঙ্গে সমান পদে চাকুরি! মধুসূদন ভয় পেলেন, তা হলে কি ব্যারিস্টারি পরীক্ষাও আরও কঠিন হয়ে যাবে? ভারতের বিভিন্ন নগরে, বিশেষত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের উপার্জন যথেষ্ট, সেখানে কি তারা সহজে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতায় নামতে দেবে? সুতরাং, দ্রুত ব্যারিস্টারি পাশ করতে গেলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আরও অর্থ চাই। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দেবার অধিকার দিয়ে বিদ্যাসাগরের নামে পাঠিয়ে দিলেন এক ওকালতনামা।

মধুসূদনের চিঠিপত্র এবং সংবাদাদি পাঠ করে শুধু করুণ রস নয়, মাঝে মাঝে কৌতুকও পান বিদ্যাসাগর। একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুকে বললেন, ওহে, তোমাদের অমিত্রাক্ষরের কবির আর একটি নতুন খবর শুনেছো? ফরাসী দেশের পুলিস নাকি তাঁকে পলাতক ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব বলে সন্দেহ করেছে!

সকলে বিস্মিত।

কাহিনীটি একেবারে অলীক নয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নানা সাহেবকে এখনো বন্দী করতে পারে নি ব্রিটিশ ফৌজ। প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার গুজব রটে। বিদ্রোহ প্রশমনের পর সাত-আট বৎসর পার হয়ে গেলেও ইংরেজ সরকার এখনও তাঁর অনুসন্ধানে তল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। পাওনাদার-বৃন্দের ভয়ে মধুসূদন প্রায় সময়ই গৃহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন, বাইরে নির্গত হন কদাচিৎ। সেইজন্য ফরাসী পুলিসের মনে সন্দেহের উদয় হলো। এই কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায়, মুখ গুম্ফ-দাড়িতে ভরা ব্যক্তিটিই ছদ্মবেশী নানাসাহেব নন তো!

মধুসূদনের আর এক পত্রে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন যে, প্রখ্যাত পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার সাহেব মধুসূদনকে অনুরোধ করেছেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করবার জন্য। পদটি অতি সম্মানের হলেও অবৈতনিক। ব্যারিস্টারি পাঠ শেষ করার জন্য মধুসূদন প্যারিস থেকে চলে এসেছেন লণ্ডনে। কিন্তু গোল্ডস্টুকার মহোদয়ের অনুরোধ মান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু সম্মান নিয়ে তিনি ধুয়ে খাবেন! এক প্রকার বিষাক্ত কীটের আক্রমণে ব্রিটেনে গবাদি পশুর মড়ক শুরু হয়েছে বলে বর্তমানে সকল প্রকার মাংসই অগ্নিমূল্য, অন্তত মাসিক সাড়ে তিন শো টাকার কমে সংসার চালানো দুঃসাধ্য। এই টাকা তাঁকে কে দেবে?

চিঠিখানি পড়ে বিদ্যাসাগর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলা অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করবেন একজন বিশিষ্ট বাঙালী কবি, এটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু ইংরেজ সরকার সে জন্য কোনো পারিশ্রমিক দিতে পরাঙ্মুখ! আর এ দেশ থেকেই বা কে সাহায্য করবেন। তিনি কতকাল একার চেষ্টায় চালিয়ে যেতে পারবেন? সে চেষ্টাও অবাস্তব।

ভিতরে ভিতরে বিদ্যাসাগর যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা অনেকে বোঝে না। দাতা হিসেবে একবার নাম রটে গেলে তার বিড়ম্বনাও কম নয়। এখন আর কারুকে বিমুখ করার উপায় নেই। দশজনকে দান করার পর একজনকে ফিরিয়ে দিলে সেটাই লোকে বড় করে দেখবে। তিনি বুঝতে পারেন, অনেকে তাঁর সঙ্গে তঞ্চকতা বা বঞ্চনা করে টাকা নিয়ে যায়। পিতৃদায়ের অজুহাতে যে ব্যক্তি অর্থ সাহায্য নিয়ে যায়, সে-ই পরে ইয়ার বক্সীদের নিয়ে মদ্যপান করে। সে সব অনাথিনী যুবতীদের জন্য তাঁর মাসিক সাহায্য বরাদ্দ আছে, অকস্মাৎ তিনি এক সময় জানতে পারেন, তাদের কেউ কেউ বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত।

এর চেয়েও সাংঘাতিক কথা, সত্যিকারের কোনো কোনো অভাবী ব্যক্তি বিদ্যা-সাগরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে সংকটমুক্ত হবার পর তারাই বিদ্যাসাগরকে আড়ালে নিন্দা-মন্দ করে। কৃতজ্ঞতা একটা বিষম বোঝা। অনেকেই সারা জীবন এ বোঝা বহনে অক্ষম। তাই এই বোঝা ঝেড়ে ফেলে উপকারী ব্যক্তির শত্রুতা করে তারা স্বস্তি বোধ করে। বিদ্যাসাগর এটা বুঝতে পারেন, তবু প্রত্যেকবার মনে নতুন করে আঘাত লাগে।

দান কখনো নিঃস্বার্থ হয় না। তার বিনিময়ে আত্মশ্লাঘার সুখ অনুভব করা যায়। বিশেষত দরিদ্র অবস্থা থেকে যিনি প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর দানের মধ্যে কিছু অহমিকা থেকেই যায়। বিদ্যাসাগর ধর্মভীরু বা পুণ্য-লোভী নন, সুতরাং তিনিও দান করেন আত্মসুখের জন্যই। যদিও অপরের দুঃখের কথা শুনে তাঁর চক্ষে জল আসে, কিন্তু এমন অশ্রুপাতও সুখের।

তবু, এরও একটা সীমা আছে। দান যখন নিত্য-নৈমিত্তিক বাঁধা-ধরা ব্যাপার হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে থাকে শুধু ক্লান্তি। নিজেকে মনে হয় অর্থ মোক্ষণের একটি যন্ত্র। কারুর মুখে দু-একটি প্রশংসা বা স্তুতিবাক্য শুনলেই ভয় হয়। এই রে, এবার বুঝি অর্থ চাইবে! মানুষের আন্তরিকতা সম্পর্কেই একটা সন্দেহের ভাব আসে। এভাবে যতই দিন কাটে, ততই নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হয়।

বিদ্যাসাগর বেশী দিন নিস্তেজ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। কর্মচাঞ্চল্য তাঁর রক্তের অন্তর্গত। দেশবাসীর প্রতি ক্ষোভ করে তিনি কিছুদিন নিজেকে গুটিয়ে রাখেন নিরালায়, আবার তাঁকে বেরিয়ে আসতেই হয়। বিধবা আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ ব্যাপক হলো না দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিলেন, কার্যকালে তাঁরা অনেকেই পিছিয়ে গেছেন। এবার তিনি আবার উদ্যমী হলেন বহু বিবাহ নিরোধ করবার জন্য। এই বহু বিবাহ নামক সামাজিক ব্যবস্থাই তো বিধবা উৎপাদনের কারখানা। সুতরাং, এটা বন্ধ করতে পারলেই মূল সমস্যায় আঘাত করা যাবে। আর একটি উপায় অবলা নারীগণকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। গ্রামাঞ্চলে স্কুল খোলার ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়, সেই উপলক্ষে তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করেন। এবার আবার তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় এক সচ্চরিত্রা বিবি এলেন কলকাতায়। এঁর নাম মেরি কার্পেন্টার। এই প্রৌঢ়া নারী ইংলন্ডে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বহুদিন যাবৎ অনলসভাবে ব্যাপৃতা। ভারত সাম্রাজ্যেও তিনি রমণীকুলের মধ্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা পৌঁছে দিতে চান। ইনি পূর্বেই বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম ও কর্মোদ্যমের কথা জানেন। সুতরাং, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী।

দেবেন্দ্রবাবু সাহেব-মেমের সংসর্গ এড়িয়ে থাকতে চান, প্রায় বলতে গেলে মেরি কার্পেন্টারের ভয়েই তিনি পলায়ন করলেন মফস্বলে। এক রাজপুরুষ একদিন মেরি কার্পেন্টারকে নিয়ে এলেন বেথুন স্কুলে, সেখানে প্রাথমিক পরিচয় হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। তরুণ ব্রাহ্মরা মহোৎসাহে সভাসমিতি করতে লাগলো মেরি কার্পেন্টারকে নিয়ে। কেশব সেনের উদ্যোগে এক সভায় উপস্থিত হতে হলো বিদ্যাসাগরকে, সেখানে মেরি কার্পেন্টার প্রস্তাব দিলেন এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশীয় শিক্ষিকা, শুধু মেম-শিক্ষিকা দিয়ে এ কাজ হবে না. সুতরাং শিক্ষিকা তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ঝটাপট তৈরি হয়ে গেল একটি কমিটি, তাতে বিদ্যাসাগরের নামও স্বভাবতই অন্তর্ভুক্ত হলো।

কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর ভাবলেন, তার এ সবের মধ্যে না থাকাই ভালো। ইংরেজদের উদোগে এ দেশে শিক্ষা বিস্তার হবে, এটা তাঁর আর মানতে ইচ্ছে করে না। এ দেশীয়দের যে কোনো উদ্যম কোনো না কোনো ইংরেজ নারী-পুরুষকে কেন্দ্র করেই হতে হবে কেন? শুধু নিজেদের চেষ্টায় কিছু করা যায় না? অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মদের উপরেও তিনি আর আস্থা রাখতে পারেন না। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পদত্যাগপত্র ঐ কমিটি থেকে।

কিন্তু মেরি কার্পেন্টার তাঁকে ছাড়তে চান না। ঘন ঘন দূত পাঠাতে লাগলেন তাঁর কাছে। বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নানা স্থানের চালু বালিকা বিদ্যালয়গুলির অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চান। অগত্যা বিদ্যাসাগরকে রাজি হতে হলো।

উত্তরপাড়ার হিতকারী সভার অধীনে কিছুদিন যাবৎ একটি বালিকা বিদ্যালয় চলছে, একদিন যাওয়া হলো সেখানে। ছোট লাট স্বয়ং অনুরোধ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। সঙ্গে রয়েছেন স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার উড্রো সাহেব এবং ডিরেকটর অ্যাটকিনসন সাহেব। ফেরার পথে বগী গাড়িতে হলো নিদারুণ এক দুর্ঘটনা।

এক স্থানে বগী গাড়িটি সবেগে মোড় ঘুরবার সময় উল্টে গেল, বিদ্যাসাগর ছিটকে গিয়ে পড়লেন পথের ওপর, তাঁর মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ এই দুর্দৈবে ঘোড়াটি দিশাহারা হয়ে লাফালাফি করছে, যে-কোনো সময় অচৈতন্য বিদ্যাসাগরের মুখে বা বক্ষে তার পদাঘাত লাগতে পারে। অপরাহ্ণ কাল, পথ জনবিরল নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেছে, এবং এ দেশীয় ব্যক্তিদের স্বভাব অনুযায়ী সকলেই হায় হায় করছে, কেউই বিদ্যাসাগরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না। এই সময় পিছনের বগীটি এসে থামতেই উড্রো ও অ্যাটকিনসন সাহেব লম্ফ দিয়ে নেমে এসে অসীম সাহসে সেই উন্মত্ত অশ্বের বল্গা চেপে ধরে বিদ্যাসাগরের প্রাণ রক্ষা করলেন। মেরি কার্পেন্টার পথের ধূলায় বসে পড়ে অচৈতন্য বিদ্যাসাগরের মস্তক তুলে নিলেন নিজের ক্রোড়ে, তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

উষাকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে নিমতলার ঘাটে গঙ্গায় তিনবার ডুব দিল নবীনকুমার। হেমন্ত ঋতুর আকাশ পরিচ্ছন্ন, বাতাস উষ্ণ-মধুর, নদীর জল অনাবিল। নবীনকুমার সন্তরণপটু নয় বলে বুকজলের বেশী দূরে যায় না, কাছেই দুলালচন্দ্র প্রহরায় দণ্ডায়মান। তিনবার ডুব দেবার পর নবীনকুমার পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলো, আঃ! তারপর সে চক্ষু মুদে, দুই কর যুক্ত করে সূর্যস্তব পাঠ করতে লাগলো, ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্...।

আজ নবীনকুমারের মস্তক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল, এখন থেকে সে প্রতিশ্রুতিমুক্ত। আজ দ্বিপ্রহরে বাংলা মহাভারতের ১৭শ' বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে'

মাত্র আট বৎসরের মধ্যে এই বিপুল মহৎ কর্মটি সে শেষ করেছে। এর খরচ সংকুলানের জন্য কলকাতার কিছু সম্পত্তি ও জমিদারির কিয়দংশ বিক্রয় করে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষোভ নেই, সে অবিশ্বাসীদের দেখিয়ে দিয়েছে যে সে পারে। বর্ধমানের মহারাজা তার সঙ্গে টেক্কা দিতে চেয়েছিলেন ; তাঁর ধনবল, লোকবল অনেক বেশী, তিনিও পণ্ডিতমণ্ডলী নিযুক্ত করে শুরু করে দিয়েছিলেন মহাভারত অনুবাদের কাজ, কিন্তু তিনি পারলেন আগে শেষ করতে?

তীরে উঠে এসে সিক্ত বস্ত্রেই দাঁড়িয়ে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, দুলাল, তুই আমার কাচে কী চাস, বল?

দুলাল ঠিক বুঝতে না পেরে বললো, আজ্ঞে?

নবীনকুমার আবার বললো, আজ আমি কল্পতরু হবো। তোর মন যা চায়, তুই নিঃসঙ্কোচে আমায় বল, তোকে আমি তা-ই দেবো।

দুলাল হাত কচলে বললো, আজ্ঞে, আপনার কাচে আমি আর কী চাইবো, ছোটবাবু, আপনি তো আমার কোনো অভাব রাকেন নি কো!

—তবু তুই কিচু চা আমার কাচে।

—আপনার স্নেহ-ভালোবাসা যা পেইচি তার অধিক আর কী চাইবো, ছোটবাবু।

—দূর বেল্লিক কোথাকার! তোর কোনো সাধ আহ্লাদ নেই? তোর বউ-ছেলের জন্যও যদি কিচু চাস।

—সবই তো আমাদের দিয়েচেন, ছোটবাবু!

—বরানগরের বাড়িটা তোর ছেলেকে দিলুম।

—আজ্ঞে, না, না, না, বড়বাবু শুনলে...

—চোপ্! আমার কতার ওপর কতা। ও বাড়ি আজ থেকে তোর ছেলের। বাড়ি ফিরেই লেখাপড়া করে দোবো। কী খুশী তো?

—আপনি ভিজে কাপড় ছেড়ে নিন।

—বললি না, খুশী কি না? বেওকুফ হাস একবার। তোর দন্তপাটি দেখি। বাঃ, এইতো।

পোশাক পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত না হয়ে নবীনকুমার সেইভাবেই একটুক্ষণ চেয়ে রইলো নদীর দিকে। এদিকটায় কলের জাহাজ আসে না। এত ভোরেও খেয়া নৌকোয় যাত্রী পারাপার চলছে, জেলে ডিঙ্গি থেকে কেউ একজন গাইছে : বাইতে বাইতে জেবন গেল তবু জেবনের মুখ দ্যাখলাম না...।

অস্ফুট স্বরে নবীনকুমার বললো, এ পৃথিবীটা বড় সুন্দর, তাই না রে দুলাল?

—আজ্ঞে।

—এই নদীর মতন কালস্রোত বয়ে চলেছে, তার মধ্যে আমরা সবাই এক একজন যাত্রী।

—আজ্ঞে।

—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো, কেউ জানে না, তবু যতটুকু দেখে যাওয়া যায়...বড় মধুর বড় আশ্চর্য, না রে?

—আজ্ঞে।

—শুধু সঙের মতন ঘাড় নেড়ে নেড়ে আজ্ঞে আজ্ঞে করে যাচ্চিস কেন? তোর কিচু নিজের কতা নেই? এ জীবনটা তোর ভালো লাগে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালো লাগে।

—মাছ ভাজা ভালো লাগে?

—আজ্ঞে।

—আর ঘোড়ার ডিম? তাও ভালো লাগে না? অপদার্থ কোথাকার! সবই এক রকম ভালো লাগে...কোনো বোধই নেই।

—একটা কতা বলবো ছোটবাবু?

—এতক্ষণ কী শুনতে চাইচি, অ্যাঁ?

—অনেকদিন পর যে আজ আপনি খুব হাসি-খুশী হয়েচেন, এইটে আমার সব চাইতে ভালো লাগচে।

—বটে! শ্মশানের ধার থেকে তুই ঐ কাঙালীগুলোনকে ডাক, ওদের সবাইকে দশটা করে টাকা দোবো।

দুলালচন্দ্র হাঁক দিতেই গণ্ডায় গণ্ডায় কাঙালী ছুটে এসে চিলুবিলু করতে লাগলো। জুড়ি গাড়ি থেকে টাকার থলি এনে নবীনকুমার দুলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, দে, ওদের টাকা দিয়ে দে, একজনও যেন না ফেরে!

দুলাল বললো, আপনি নিজের হাতে দিন, ছোটবাবু। নিজের হাতে না দিলে দানের পুণ্যি হয় না।

নবীনকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, দূর গরু কোতাকার। আমি কি পুণ্যের জন্য দান কচ্চি? পরকালের জন্য পুণ্য জমাবার কোনো দরকার নেইকো আমার। আমি ওদের দিতে চাই, দিতে আমার ভালো লাগে বলে।

দুলাল যতক্ষণ টাকা বিলি করতে ব্যস্ত রইলো, ততক্ষণ নবীনকুমার মুগ্ধ-ভাবে চেয়ে থাকলো গঙ্গার দিকে। হঠাৎ একসময় তার মনে পড়লো নিজের জননীর কথা। এই গঙ্গা নদীই তো আসছে হিমালয় থেকে। হরিদ্বার ক্ষেত্রে এই নদী সমতলে নেমেছে, সেই হরিদ্বারে এই নদীর তীরেই রয়েছেন তাঁর মা বিম্ববতী। কতদিন সে মাকে দেখেনি!

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বস্ত্র পরিবর্তন এবং জলপান সেরে নেবার পরই নবীন-

কুমার আবার বেরিয়ে পড়ল। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে শেষ খণ্ডের এক কপি সে নিজে পৌঁছে দেবে। আজ অপরাহ্ণে মহাভারত সমাপ্তি উপলক্ষে এক বিশেষ সভা হবে, কিন্তু বিদ্যাসাগর সেখানে আসতে পারবেন না। বগি-গাড়ি ওল্টাবার সেই দুর্ঘটনায় তিনি বিশেষভাবে আহত, তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত লেগেছে।

বাদুড়বাগানে উপস্থিত হয়ে নবীনকুমার শুনলো বিদ্যাসাগর প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলা এখন চিকিৎসকদের নিষেধ। তবু নবীনকুমার চাইলো একবার শুধু দর্শন করতে। বিদ্যাসাগরের সুহৃদ রাজকৃষ্ণবাবু এবং ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র অন্যসব দর্শনার্থীদের নিরস্ত করেছেন, কিন্তু নবীনকুমার সিংহকে তাঁরা না বলতে পারলেন না।

সাদা চাদর পাতা সাধারণ একটি খাটে বিদ্যাসাগর নিদ্রিত রয়েছেন, ললাটে চিন্তার রেখা, ওষ্ঠদ্বয় সামান্য কুঞ্চিত। আসবাবহীন কক্ষটিতে শুধু শোনা যাচ্ছে একটি দেওয়াল ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ। নবীনকুমার তার হাতের গ্রন্থটি রাখলো বিদ্যাসাগরের শয্যার এক পাশে, তারপর একটুক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে বলতে লাগলো, আপনার কাছে আমি শপথ করেছিলুম, তা আমি রক্ষা করিচি, আজ থেকে আমি মুক্ত।

তারপর সে এক অভিমানের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললো, আপনি আমার ওপর সুবিচার করেননি। আপনি আমার কার্যকলাপ দেকেচেন। কিন্তু আমার হৃদয় পরীক্ষা করেননি। বিদায়, গুরুদেব।

নবীনকুমারের সারাদিন কেটে গেল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে। আকাশে উড্ডীয়মান লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মতন নিজেকে হালকা বোধ হচ্ছে। এতবড় একটা কাজ যে সে সত্যিই শেষ করতে পেরেছে এজন্য ঠিক গর্ব নয়, বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ যেন ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। অপরাহ্ণের সভায় অনেক মাননীয় বক্তা তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং অনুরোধ জানালেন, এরপর পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের গদ্যানুবাদে হাত দেবার জন্য। নবীনকুমার জানালো যে শুধু রামায়ণ নয়, হরিবংশ মদ্ভাগবৎ গীতা এবং অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশের বাসনা তার আছে। অনুবাদক পণ্ডিতদের শাল-দোশালা, পিত্তলের কলসী এবং স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দেওয়া হলো। সভা শেষ হলো সাতটার তোপধ্বনি শুনতে পাওয়ার পর।

অতিথিরা সকলে চলে যেতেই নবীনকুমার অকস্মাৎ খুব নিঃসঙ্গ বোধ করলো, এরপর সে কী করবে? শুধু মহৎ আদর্শ আর সাধুবাদ শুনলেই তার মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। তার আরও কিছু প্রয়োজন। বাড়িতে তার মন টেঁকে না। তার স্ত্রী সরোজিনী কার্যত বোবা। অনেক চেষ্টা করে দেখেছে নবীনকুমার, শুধু ঘর-সংসার আর পিত্রালয়ের গল্প ছাড়া অন্য কিছুই সরোজিনীকে আকৃষ্ট করে না। ইদানীং তার পুজো-আচ্চার বাতিক চরমে উঠেছে, নবীনকুমার একেবারে পছন্দ না করলেও এ গৃহে সাধু-সন্ন্যাসী ও গণৎকারদের আনাগোনা চলছে কিছুদিন ধরে। তারা সরোজিনীর কাছে আসে। এতদিনেও সন্তান হয়নি বলে সরোজিনীর আশঙ্কা হয়েছে যে সে বুঝি বাঁজা। সে কারণেই তার স্বামী তাকে পছন্দ করে না।

সন্তান অবশ্য কুসুমকুমারীরও হয়নি এখনো, কিন্তু সে এসব দিকে ঝোঁকেনি। গঙ্গানারায়ণ কুসুমকুমারী যে মহলে থাকে, সেখানে প্রায়ই সন্ধ্যার পর গান বাজনার

আসর বসে। কুসুমকুমারীর সঙ্গীত অনুরক্তি প্রবল। নবীনকুমারেরও বিশেষ সংগীতপ্রীতি আছে, কিন্তু সে ঐ মহলে কদাচ যায় না। গঙ্গানারায়ণ এবং কুসুমকুমারী এসে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছে, প্রতিবারই নবীনকুমার কোনো না কোনো ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। এখনো সে কুসুমকুমারীর সঙ্গে পারতপক্ষে বাক্যালাপ করে না, নেহাৎ কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলেও তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নবীনকুমারের যে কেন এত বিরাগ কুসুমকুমারীর প্রতি, তা কুসুমকুমারী এ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হয়নি।

খানিকবাদে নবীনকুমার আবার বেরিয়ে পড়লো জুড়িগাড়ি নিয়ে। কোথায় যাবে সে বিষয়ে আগে থেকে মনস্থির করেনি, তাই কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে উপস্থিত হলো ফৌজদারি বালাখানার সন্নিকটে চন্দ্রনাথ ওঝার বাড়িতে।

দ্বার খুলে দিল চন্দ্রনাথের সহকারী কাল্লু শেখ ওরফে সুলতান। এবং জানালো যে চন্দ্রনাথ গৃহে নেই।

তবু অফিস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নবীনকুমার বললো, কোতায় গেচেন তোর বাবু?

সুলতান বললো, বাবু রোদে গিয়েসেন।

বুঝতে না পেরে নবীনকুমার বললো, রোদে মানে?

সুলতান বললো, আজ্ঞে হাঁ, ইয়াস ষাঁড়, বাবু রোদে গিয়েসেন। রেতের বেলা রোদ্দুর না থাকলেও আমার বাবু একবার করে রোদে যান।

নবীনকুমার বললো, ও, রোঁদে গ্যাচেন। তোর বাবু রোজ রাতে রোঁদে যান কেন, তিনি কি সেপাই নাকি?

—আমার বাবু সেপাই দ্যাখলে ভয় পান না। সাহিব-পুলুশ দ্যাখলেও ভয় পান না।

—ঠিক আচে, তোর বাবু ফিরবেন তো? আমি একটু বসচি।

—বসেন, বসেন যাঁড়, বসেন। সিক্রেট খাবেন? আমার বাবু সিক্রেট খান।

—না, আমি সিগারেট-পান-তামাক কিচুই চাই না। এই কদিন আগে দেকলুম তোর মাতায় চুল নেই, ভুরু নেই, আজ সব হঠাৎ গজিয়ে গেল কী করে?

—এটা পরচুল। বাবু পরায়ে দিয়েসেন। আর কালি দিয়ে ভুরু আঁকে দিয়েসেন। বাবু আমারে বলেন, ন্যারামুণ্ডি থাকলে ছুলতান হওয়া যায় না।

মৃদু মৃদু হাস্যে নবীনকুমার সুলতানের কথাবার্তা উপভোগ করতে লাগলো।

কয়েকমাস ধরে চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার এক অদ্ভুত-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই ষণ্ডমার্ক জেদী স্বভাবের লোকটির প্রতি নবীনকুমার বেশ আকর্ষণ বোধ করে, এই ওঝা কোনো সাধারণ চিকিৎসক নয়, এ আক্রমণ করতে চায় সামাজিক ব্যাধিগুলিকে। এইসব বিষয়ে নবীনকুমারও খুব কৌতুক পায়, তাই সে চায় চন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই নবীনকুমারের সংশ্রবে থাকতে চায় না, নবীনকুমার নিমন্ত্রণ জানালে সে যায় না, নবীনকুমার সাক্ষাৎ করতে এলেও সে বিরক্ত হয়। ধনিক শ্রেণীর প্রতিই যেন তার এক তীব্র ঘৃণাবোধ আছে।

তবু নবীনকুমার আসে। বিপরীত ধরনের মানুষের প্রতিই যেন তার কৌতূহল বেশী। মোসাহেব, খোসামুদে বা আজ্ঞে-হুজুরের দলকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে

না। চন্দ্রনাথ তার মুখের ওপর ভর্ৎসনা করে, তাতেই সে বেশী মজা পায়।

একমাত্র চন্দ্রনাথই নবীনকুমারের মহাভারত অনুবাদের গৌরব নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। সে একদিন বলেছিল, ভারি একটা কাজ! আপনার জমিদারির গরিব প্রজাদের টাকায় আপনি মচ্ছব কর্চেন। কিচু হাফ এজুকেটেড লোকের মধ্যে ঐ বই বিলি কর্চেন বিনি পয়সায়। যারা গায়ের রক্ত জল করে জমিতে ধান ফলায় তাদের কী উপকারটা হচ্চে এতে?

নবীনকুমার একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয় না। হাসতে হাসতে বলে, আমি ধনী বংশে জন্মেচি, সেটা আমার অপরাধ? কর্ণের মতন আমিও বলতে পারি, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম...।

—তবে ধনীর দুলালের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করুন। আমার কাচে আসেন কেন? একদিকে মদ-মেয়েমানুষে টাকা ওড়ান আবার একটা মন্দির বানিয়ে দিয়ে সুনাম কিনুন। এদানি আবার মন্দির বানাবার বদলে ইস্কুল খোলার ফেসিয়ান হয়েচে।

—আমি মন্দিরও বানাইনি, ইস্কুলও খুলিনি, বড় ভুল হয়ে গ্যাচে তো। তা ভাই তোমার ভূত-তাড়ানোর কারবারটি আমার বড় পচন্দ।

—ভূত আপনার মাথার মধ্যেও রয়েচে।

—বটে, বটে? সেটা কেমন ধারা ভূত তুমি বলে দিতে পারবে? যত টাকা খর্চা লাগে আমি দোবো।

—মিঃ সিংহা, যারা কতায় কতায় টাকার গরম দেকায়, আই হেইট দেম।

—কিন্তু এটাই তো তোমার পেশা, তাই না? আমার কেইসটা তুমি টেকআপ করো। তুমি যখন বললেই যে আমার মাতার মধ্যে ভূত আচে..

—আমি দুঃখিত, মাই হ্যান্ড ইজ ফুল। এখন আমি আর কোনো কেইস নিতে পারবো না।

শহরে ভূত-প্রেত আর বুজরুগ যোগী-সন্ন্যাসীর ধুম ধাড়াক্কা লেগেই আছে, খবর পেলেই নবীনকুমার সেখানে যায়। সে জানে, চন্দ্রনাথ তার সাগরেদকে নিয়ে সেখানে আসবেই। প্রতিবারই বিভিন্ন প্রকার কৌশলে চন্দ্রনাথ জুয়াচুরি ফাঁস করে দেয়। এজন্য কয়েকবার তাকে রীতিমতন বিপদেও পড়তে হয়েছে, বিরুদ্ধপক্ষীয়রা আক্রমণ করতে ধেয়ে এসেছে চন্দ্রনাথকে। মুসলমানপাড়ায় এক বাড়িতে এরকম হাঙ্গামার সময় এক সাধুর ক্ষিপ্ত চ্যালারা চন্দ্রনাথকে মারার জন্য ধেয়ে আসে, তখন নবীনকুমারই দুলালের সাহায্যে ওকে রক্ষা করে নিজের জুড়ি গাড়িতে তুলে নেয়। সেজন্য অবশ্য কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই চন্দ্রনাথের, কোনোরকম সৌজন্য বা ধন্যবাদ বাক্য না বলে সে একটু পরেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল।

চিৎপুরের রাস্তায় চন্দ্রনাথের বাড়ির প্রায় বিপরীত দিকেই আর একটি গৃহের সামনে প্রতিদিন বহু মানুষ সমাগম হয়। একদিন কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়েছিল নবীনকুমার। সে গৃহের একখানি কামরা ভাড়া নিয়ে বাস করেন একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, তিনি সাধারণ গরিব-গুর্বো লোকদের চিকিৎসা করেন এবং ওষুধ দেন। সবই বিনা মূল্যে। ভদ্রলোকের নাম প্রাণগোপাল বিষয়ী, কিন্তু তাঁর মনে বিন্দুমাত্র বিষয়বুদ্ধি নেই। নবীনকুমার ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানলো যে প্রাণগোপালবাবু রীতিমতন মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার, লক্ষ্ণৌতে

সরকারি হাসপাতালে কর্ম করতেন, কিছুকাল আগে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তিনি এক প্রকার গৃহী-সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় তিনি ব্যয় করছেন দরিদ্র মানুষদের সেবায়।

মাত্র একঘণ্টা আলাপ করবার পরই নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনার এই বাড়িটির মালিক কে? তিনি কোথায় থাকেন? আমি এই বাড়িটি কিনতে চাই। এই বাড়িতে আপনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলুন। আমি প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা দেবো।

নবীনকুমারের যে কথা সেই কাজ এবং সবই অতি দ্রুত। কয়েকদিনের মধ্যে সেই গৃহ ক্রয় করে সেখানে স্থাপিত হলো দাতব্য চিকিৎসালয় এবং প্রাথমিক যন্ত্রপাতির জন্য নবীনকুমার আরও অতিরিক্ত দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করলো।

তারপর একদিন সে চন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেছিল, ওহে ব্রাদার মন্দির স্থাপন করিনি, ইস্কুলও খুলিনি। দাতব্য চিকিৎসালয় বসিয়েচি, এটা তোমার পচন্দ। এবার তুমি খুশী?

চন্দ্রনাথের মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। সে গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিল, এও আপনার বড়-মানুষের দেমাকী। আমার বাড়ির উল্টোদিকেই কি এটা করতে হবে? আপনি নিজের নাম জাহির করবেন, তা দুবেলা দেকতে হবে আমায়!

নবীনকুমার হাসতে হাসতে বলেছিল, সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দ্যাকো, লেকা আচে, সাধারণ দাতব্য চিকিৎসালয়। আমার নাম কোতাও নেই। তোমায় দেকচি খুশী করা বড় শক্ত। আমোদের জন্য টাকা ওড়ালে তোমার আপত্তি, আর গরিবের জন্য ব্যয় কল্লেও তোমার আপত্তি?

আজ সুলতানের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করবার পরও চন্দ্রনাথ ফিরলো না দেখে নবীনকুমার ভাবলো, আর অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই।

সে উঠে দাঁড়াতেই বাইরের দ্বারের সামনে একটি কেরাঞ্চি গাড়ি এসে থামলো, তার থেকে অবতরণ করলো চন্দ্রনাথ। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই সে একবার টলে পড়ে যেতে যেতে দেওয়াল ধরে সামলে নিল নিজেকে। নবীনকুমার রীতিমতন বিস্মিত। সে আগে কখনো চন্দ্রনাথকে সুরাপান করে মাতাল হতে দেখেনি। শুধু তাই নয়, কেরাঞ্চি গাড়ি থেকে চন্দ্রনাথের পশ্চাতে নেমেছে এক অবগুণ্ঠিতা যুবতী।

সুলতান লণ্ঠন নিয়ে তার প্রভুর দিকে ছুটে যেতেই সেই আলোকে নবীন-কুমার দেখলো চন্দ্রনাথের সমস্ত পোশাক রক্তাক্ত। তার একটি চক্ষুসমেত কপাল জুড়ে গভীর ক্ষত।

চন্দ্রনাথ যে বেশ বড় রকম একটা মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তার মতন তেজস্বী ও বলশালী মানুষটিও কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। একটি চেয়ারে বসে পড়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বললো, সুলতান, একটু গরম জল করে নিয়ে আয় জল্দি।

চন্দ্রনাথের কোট ছিন্নভিন্ন, কোনো ধারালো অস্ত্রের একাধিক ঘা খেয়েছে সে, তার শরীর থেকে ফোঁটাফোঁটা রক্ত পড়ছে মাটিতে।

নবীনকুমার রক্তাক্ত দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। সে এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারলো না। গুরুতর আহত চন্দ্রনাথের এখনি চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝে সে বললো, ডাক্তার, একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

আমাদের হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবুকে বরং ডেকে আনুক সুলতান।

অবনত মস্তক দুহাতে চেপে ধরে চন্দ্রনাথ বললো, না, তার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা কত্তে পার্বো।

নবীনকুমার বললো, তোমার এমন অবস্থা হলো কী করে?

চন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিল না।

নবীনকুমার বললো, কাচেই যখন ডাক্তার রয়েছেন,—আচ্ছা আমি নিজেই ডেকে আনচি।

চন্দ্রনাথ ধমকের সুরে বললো, বলচি যে আমার দরকার নেই!

অবগুণ্ঠিতা রমণীটি দ্বারের বাইরে এক পাশ বেঁকে আড়ষ্টভাবে দণ্ডায়মান। তরুণীটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী, পরনে একটি নীল রঙের সিল্কের বসন। শরীরে যৌবন একেবারে পরিপূর্ণ। তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলো নবীনকুমার। নিশ্চিত আর একটি কুলটা নারী। শহর কলকাতা এমন গৃহত্যাগিনী স্ত্রীলোকে ভরে গেছে। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বা সামাজিক তাড়নাতেই হোক, এই সব রমণীরা একবার পথে নামবার পর ক্রমশ তারা সেই পথকেই পিচ্ছিল করে। সুবালা-পর্বের পর এই সমস্ত রমণীদের সম্পর্কে নবীনকুমারের মনে একটা দারুণ বিরাগ জন্মে গেছে।

গোঁয়ার চন্দ্রনাথ যদি চিকিৎসক না ডাকতে চায়, তা হলে এ স্থানে এখন আর নবীনকুমারের করণীয় কিছু নেই। তবু প্রস্থানের জন্য উদ্যত হয়েও নবীনকুমার চলে যেতে পারছে না। চন্দ্রনাথের অভিযান-কাহিনীটি শোনার জন্য তার দারুণ কৌতূহল।

চন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে রমণীটিকে উদ্দেশ করে বললো, আপনি ভেতরে এসে বসুন। সুলতান, বাইরের দোর বন্ধ করে দে!

রমণীটি এবার কুক্ তুলে কান্না শুরু করে দিল। চন্দ্রনাথ মাথার ক্ষত স্থানটি এক হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো। একটি চোখ তার বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য চক্ষুটিতে নিদারুণ ক্রোধ।

কর্কশ স্বরে সে বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদাকাটি করে আপনি পাড়া-পড়শীর ভিড় জমাতে চান! ভেতরে এসে যতখুশী কাঁদুন!

স্ত্রীলোকটি বললো, আমার এখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরাই ভালো! আমাকে ছেড়ে দিন!

—মত্তে চান মরবেন। তার জন্য এত ব্যস্ততার কী আচে!

—আমার কপালে আগুন নেগেচে, আপনি কেন শুদুমুদু নিজের হাত পোড়াবেন?

—সে চিন্তা আপনাকে কত্তে হবে না!

সুলতান এর মধ্যেই একটা ছোট গামলা ভর্তি গরম জল, তুলো আর খানিকটা সাদা কাপড় নিয়ে এসেছে।

—আগে বাইরের দরোজাটা বন্দ করে দে!

দরজা বন্ধ করে এসে সুলতান অতি দক্ষ হাতে গরম জলে তুলো ভিজিয়ে চন্দ্রনাথের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। চন্দ্রনাথ বললো, আঃ, আস্তে. সাবধানে, দ্যাক বোধহয় একটা কাঁচ ফুটে আচে।

নবীনকুমার সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্ত্রীলোকটির দিকেও সে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। সে এখনো স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পায়নি।

স্ত্রীলোকটির মুখ দেয়ালের দিকে। নবীনকুমার বেশ অস্বস্তিজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো।

সুলতান বললো, উরি বাস রে! কেটে একেবারে ফাঁক হয়ে গিইয়েচে। কোন্ দুশমন বোতল দিয়ে মেইরেচে। অ্যাত্ত বড় একটা কাঁচ।

চন্দ্রনাথ মুখ দিয়ে কোনো যন্ত্রণার শব্দ করছে না। সে বললো, তুই হাত দিয়ে তুলতে পারবি না, একটা সন্না নিয়ে আয়...আমার শোবার ঘরের দেরাজে আচে দ্যাক।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কে তোমায় এমন মারলো, চন্দ্রনাথ?

এবারও চন্দ্রনাথ নীরব।

আর এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নবীনকুমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই চন্দ্রনাথ মুখ তুলে বললো, আপনাকে একটি রিকোয়েস্ট জানাতে পারি?

নবীনকুমার থমকে গিয়ে বললো, কী?

—এই রমণীকে আপনি আজ রাতের মতন কোনো জায়গায় আশ্রয় দিতে পারেন?

—আমি একে আশ্রয় দোবো? আমি কোতায় আশ্রয় দোবো?

—বাঃ! ওউনার অফ ডজনস অ্যান্ড ডজনস অফ বিল্ডিংস ইন ক্যালকাটা, তিনি জিজ্ঞেস করচেন, কোতায়?

চন্দ্রনাথের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে নবীনকুমার অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তার মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে সে চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। তারপর ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে সে বললো, হ্যাঁ, বাড়ি আমার অনেকগুলোন আচে বটে, তা বলে এই মাঝরাতে একজন অজ্ঞাতকুলশীল স্ত্রীলোককে নিয়ে গিয়ে তুলবো, তাই-ই বা কেমন কতা!

—অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয় বলেই ঠাঁই দেবার প্রশ্ন ওঠে। যার ভদ্রস্থ বাড়ি ঘর আছে, সে আপনার কাচে রাতের বেলা এমন সাহায্য চাইবে কেন?

—এই রমণীটি কে? কোতায় একে পেলে?

—সে সব কতা পরে জানলে চলে না? আপনি এক্ষুনি যা বললেন, ধরে নিন তাই, অজ্ঞাতকুলশীল—

—তুমি একে এনেচো, তোমার বাড়িতেই রাকচো না কেন?

—দিস ইজ এ ব্যাচেলরস অ্যাবোড, এখানে কোনো স্ত্রীলোকের থাকা সমীচীন হয় না। সে কারণেই আপনার ওপর এ দায়িত্ব দিতে চাই—

—বাঃ, তুমি কোতায় না কোতায় ইচ্ছে করে হেঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বে, নারী-হরণ করে আনবে। তারপর তার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে?

—তা হলে সেপাইদের ছাড়া ঘোড়ার মতন আপনার এখানে ফালতু ল্যাজ নাড়াবার তো কোনো প্রয়োজন দেখি না। রাত হয়েচে, আপনি এবার বাড়ি যান।

নবীনকুমারের মুখের ওপর যেন কশাঘাত হলো। তার কথার মধ্যে সব সময়ই একটা কৌতুকের সুর থাকে। চন্দ্রনাথ তার কাছে এই রমণীটিকে আশ্রয় দেবার

ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছে, এটা এমন কী আর কঠিন ব্যাপার। দুলালকে হুকুম দিলেই সে যে-কোনো উপায়ে একটা ব্যবস্থা করবেই। ইচ্ছে করলে সে এই রাত্রেই একটি নতুন গৃহ ক্রয় করে সেখানে এই রমণীকে স্থাপিত করতে পারে। কিন্তু কোন্‌খানে মারপিট হলো এবং কী ভাবে বা কেন এই রমণীটিকে নিয়ে আসা হলো সেই ইতিহাস চন্দ্রনাথ বলতে চাইছে না বলেই নবীনকুমার উল্টো সুরে কথা বলছিল তার সঙ্গে। কিন্তু রঙ্গ-রস বোঝার ক্ষমতা এমনিতেই চন্দ্রনাথের কম, তা ছাড়া সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় কৌতুক অনুধাবন করা সহজও নয় মোটেও।

এবার নবীনকুমার গম্ভীর স্বরে বললো, দ্যাকো চন্দ্রনাথ ওঝা, বেয়াদপির একটা সীমা আছে। কার সঙ্গে কেমন ভাবে কতা কইতে হয় তুমি জানো না। যদি সমূলে ধ্বংস হতে না চাও তো আমার সামনে মুখ সামলে চলো।

চন্দ্রনাথও এবার একটু সুর নরম করে বললো, আদপ-কায়দা শেকবার তো সুযোগ পাইনি জীবনে, তাই মানী লোকের মান কীভাবে রাকতে হয় হয়তো জানি না। আপনার মতন মানী লোক যেখেনে সঠিক মান পাবেন, সেখেনেই আপনার গতায়াত করা উচিত। আমার মতন একটা চাঁড়ালের বাড়িতে...

পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, আঃ, মেরে ফেলবি, আস্তে, ওরে আস্তে —ইতিমধ্যে সুলতান ওপর থেকে সন্না নিয়ে এসে চন্দ্রনাথের মাথা থেকে কাচের একটি বড় টুকরো তোলার চেষ্টা করছিল। ভুল করে একটা খোচা লাগিয়ে দিয়েছে, চন্দ্রনাথের মস্তক থেকে আবার রক্তপাত হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি কান্না থামিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এতক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েছিল, চন্দ্রনাথের আর্ত স্বর শুনে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। এগিয়ে এসে সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে সে লজ্জা-শঙ্কামিশ্রিত কম্পিত স্বরে বললো, আমি চেষ্টা করবো?

স্ত্রীলোকটির মুখ থেকে অবগুণ্ঠন সরে গেছে।

সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতন বিস্ময়ের এক ঝাপটা লাগলো নবীনকুমারের শরীরে। এই রমণীটি কে? এ নবীনকুমারের সম্পূর্ণ অচেনা, অথচ বিষম চেনা বলে মনে হচ্ছে।

রমণীটি প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া, অত্যুজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, আয়ত চক্ষু, মাথায় ভ্রমর-কৃষ্ণ এক রাশ চুল। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে রূপের উগ্রতা নেই, তার দৃষ্টি থেকে ওষ্ঠের ভঙ্গিমা পর্যন্ত কোমল, কমনীয়, স্নিগ্ধ। যেন নবীনকুমারের জননী বিম্ববতীর মুখখানা হুবহু বসানো।

নবীনকুমারের বক্ষ স্পন্দন অতি দ্রুত হয়ে গেল। আজ প্রাতেই সে বহুদিন পর তার জননীর কথা স্মরণ করেছিল, আজ রাতেই সে এ কোন্‌ রূপ দেখলো? মানুষে মানুষে এমন মিল সম্ভব? সময় ও স্থানের দূরত্বে বিম্ববতী আজ সুদূরবাসিনী, তবু কোন্‌ মন্ত্রবলে যেন তিনি এখানে যৌবনবতী হয়ে উপস্থিত। তবে কি এ বিম্ববতীর কোনো সহোদরা? কিন্তু নবীনকুমার যত দূর জানে, তার মাতৃকুলে কেউ আর জীবিত নেই।

যুবতীটি কুশলী হস্তে সন্না দিয়ে চন্দ্রনাথের মাথা থেকে কাচের একটি বড় টুকরো তুলে আনলো। তারপর সুলতানকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে গাঁদা ফুলের গাছ নেই?

সুলতান তৎক্ষণাৎ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, প্রায় চক্ষের নিমেষেই হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়নের ভঙ্গিতে একরাশ গাঁদাফুলের গাছ নিয়ে এলো দুই

বগলে। কোনো প্রতিবেশীর বাগান থেকে সেগুলি সে সমূলে উপড়ে এনেছে।

যুবতীটি অনেকগুলি পাতা একসঙ্গে নিয়ে থেঁতো করে সেই রসের প্রলেপ দিতে লাগলো চন্দ্রনাথের ক্ষতস্থানে। চন্দ্রনাথ এখন চেয়ারে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে, অনেক রক্তক্ষরণে তার মুখখানি পাণ্ডুর বর্ণ। চক্ষু বুজে ফেলেছে সে। সুলতান তার ছিন্নভিন্ন কোট খুলে নিতে দেখা গেল তার ঘাড়ে ও বুকেও তলোয়ারের মতন কোনো ধারালো অস্ত্রের দাগ।

যুবতীটি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, কেন আপনি নিজের জীবনটা এমন ভাবে...কেন আপনি আমার জন্য...

সাদা কাপড় দিয়ে মাথার ক্ষতটি ভালোভাবে বেঁধে দিয়ে যুবতীটি অন্যান্য ক্ষত তুলো দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বললো, কোনো ওষুধ বিষুধ না লাগালে... আমি তো কিছুই জানি নাকো...

নবীনকুমার নির্বাক হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল, একবার যুবতীটির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি...আপনি কে?

যুবতীটি চক্ষু নত করে উত্তর দিল, আমি এক হতভাগিনী!

চন্দ্রনাথ অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সুলতান, আমার হাতটা ধর, আমি এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বো, আর বসে থাকতে পাচ্ছি নি—

নবীনকুমার বললো, চন্দ্রনাথ, তা হলে এঁকে আমি নিয়ে যাবো! তোমার কোনো চিন্তা নেই, ইনি ভালো জায়গায় থাকবেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

যুবতীটি যেন অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে চন্দ্রনাথের হাত চেপে ধরে বললো, না, না, আমি আর কোতাও যাবো না!

নবীনকুমার বললো, আপনার কোনো ভয় নেই, আপনি সসম্মানে, নিরাপদে থাকবেন।

যুবতীটি ফের বললো, আমি এঁকে ছেড়ে যাবো না! এঁর এত বিপদ...কেউ যদি সেবা না করে...আমি যতটুকু পারি...

নবীনকুমার বললো, আমি ওর জন্য চিকিৎসক ডাকতে চেয়েছিলুম, উনি রাজি হন নি। তবু আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তার আর সারা রাত জেগে সেবা করবার জন্য লোক পাটিয়ে দিচ্চি...

চন্দ্রনাথ বললো, মিঃ সিংহ, আপনি আমার উপকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমি কারুর কাচ থেকে উপকার নিই না। কারণ, প্রত্যুপকার করবার বোধশক্তি আমার নেই।

—তুমি বালখিল্যের মতন কতা বলচো, চন্দ্রনাথ। এখন তোমার চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন, তাই ডাক্তার আসবে। এর মধ্যে উপকারের প্রশ্ন আসচে কোতায়?

—অনেক মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আচে। এতে আমার কিচু হবে না। আমি আবার বেঁচে উঠবো ঠিকই।

তারপর সে যুবতীটিকে উদ্দেশ করে বললো, ইনি নবীনকুমার সিংহ, একজন বিশিষ্ট মানী ব্যাক্তি, আপনি এঁর সঙ্গে ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। ইনি আপনাকে তোয়াজের সঙ্গে রাকবেন—

যুবতীটি অতি দ্রুত বললো, নাঃ!

নবীনকুমার মিনতি করে বললো, আপনি চলুন, আমি শপথ করে বলচি, আপনার কোনো ভয় নেই—

যুবতীটি ঝাঁঝের সঙ্গে চন্দ্রনাথকে বললো, আপনি যদি আমায় অন্যের হাতে

সংপেই দেবেন, তবে নিজের প্রাণের ঝংকি নিয়ে আমায় বাঁচালেন কেন? এখেনে নিয়ে এলেন কেন? আমি আর কোতাও যাবো না, মত্তে হয় তো এখেনেই মর্বো!

চন্দ্রনাথ খংব ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললো, আমি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাকে বাঁচাই নি...কতগংলো রাফিয়ান, পাষন্ড পথের মধ্যে আপনাকে কুৎসিত-ভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করছিল, তাই তাদের শাস্তি দিতে গেসলংম...তারপর আপনি আমার সঙ্গে এলেন...মিঃ সিংহ প্রথমে আপনাকে আশ্রয় দিতে চান নি, তারপর বোধ হয় আপনার মংখ দেকে আপনাকে পচন্দ হয়েচে...

নবীনকুমার বললো, ছিঃ!

চন্দ্রনাথ বললো, ইনি একজন মস্ত বড় বড়মানংষ, আর আমি একটা চাঁড়াল, তা জেনেও যদি আপনি এখেনে থাকতে চান, ...তা হলে থাকুন...সংলতান আপনার ব্যবস্থা করে দেবে...

নবীনকুমার বাইরের দিকে দ্বার খংলে উত্তেজিতভাবে ডাকলো, দংলাল! দংলাল!

চন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ঘংমে জড়িয়ে এসেছে। সে বললো, তা বলে যেন এঁকে জোর করে নিয়ে যাবেন না! আমি স্ত্রীলোকদের ওপরে জোর-জবরদস্তি খাটানো একদম সহ্য কত্তে পারি না।

অপেক্ষমান জংড়িগাড়ি থেকে দংলাল তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হতেই নবীনকুমার ব্যগ্রভাবে অঙ্গংলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো, দ্যাক তো দংলাল, এঁকে চিনতে পারিস?

দংলাল একটংক্ষণ নিরীক্ষণ করে বিমংঢ়ভাবে বললো, আজ্ঞে, না তো।

—এঁকে দেখে কারংর কতা মনে পড়চে না তো!

দংলালও অতি বাল্যকাল থেকে বিম্ববতীকে দেখেছে। সংতরাং নবীনকুমার আশা করেছিল, দংলালও যংবতীটিকে দেখা মাত্র তারই মতন চমকিত হবে। কিন্তু দংলালের মংখে কোনো রেখাই ফংটলো না। সে আমতা আমতা করে বললো, আজ্ঞে না, ছোটবাবং।

নবীনকুমার অস্থিরভাবে হতাশ নিশ্বাস ফেললো। তারপর যংবতীটির দিকে দং'এক পা এগিয়ে এসে অত্যন্ত আন্তরিক কাতরতার সঙ্গে বললো, আপনি চলংন আমার সঙ্গে, এর পর আপনি যা চান, আপনি যেখানে খংশী যেতে চান... আপনাকে সম্মানের জীবন ফিরিয়ে দোবো আমি...

যংবতীটি পংনরায় বললো, না! আমি একে ছেড়ে যাবো না!

চন্দ্রনাথ বললো, আমার ঘংম পাচ্চে, আমার বিষম ঘংম পাচ্চে মিঃ সিংহ, তা হলে আপনি বাড়ি যান...

নবীনকুমার এদিক ওদিক মংখ ফেরালো। একটা কোনো ভারি বস্তু পেলে সে হয়তো কান্ডাকান্ড জ্ঞানশংন্য হয়ে তখংনি তা দিয়ে চন্দ্রনাথের মাথায় আঘাত হানতো। অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিল।

দংলালচন্দ্র কোনোদিন তার প্রভংকে এই অবস্থায় দেখে নি। সে ভয়ে ভয়ে বললো, ছোটবাবং, বাড়ি যাবেন না?

—চল।

যংবতীটির দিকে শেষবারের মতন তৃষ্ণার্ত দংষ্টিপাত করে নবীনকুমার নির্গত হয়ে গেল সেই কক্ষ থেকে। তারপর চন্দ্রনাথের বাড়ির দ্বার থেকে তার জংড়িগাড়ি পর্যন্ত যেন বহং দংরের পথ এইভাবে হেঁটে গেল সে।

ভেতরে উঠে বসবার পর বিভ্রান্ত দংলাল মংখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, ছোটবাবং,

ঐ মেয়েছেলেটি কে? অমনি নবনীকুমার তার গালে প্রচণ্ড জোরে এক চপেটাঘাত করে বলে উঠলো, চুপ কর, বেল্লিক! গাড়ি চালাতে বল্।

আজ সকালেই নবীনকুমার দুলালের সন্তানকে একটি বাড়ি দান করেছে। সুতরাং, একটা চপেটাঘাত তো তার বিনিময়ে অতি সামান্য। জুতো মেরে গরু দানের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

জুড়িগাড়ির মধ্যেই ব্র্যাণ্ডির বোতল মজুত থাকে। সেই বোতলের ছিপি খুলে নবীনকুমার ঢক ঢক করে গলায় ঢালতে লাগলো। একটু পরেই সে কাঁদতে লাগলো খুঁক খুঁক শব্দে। তার বুকের মধ্যে যে শিশুটি লুক্কায়িত আছে, সেই শিশুটিই যেন অভিমানে কাঁদে। এই এমনই অভিমান, যা কিসের বা কার প্রতি কিংবা কী জন্য তা বোঝা যায় না।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নবীনকুমার স্নান-আহার কিছুই করলো না। তার কোনো কিছুতেই যেন রুচি নেই। তার মুখখানিতে নৈরাশ্যের কালিমা মাখানো। আজই অপরাহ্ণে সে মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কত বিজ্ঞ-মানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাধুবাদ পেয়েছে, তার নামে সবাই ধন্য ধন্য করেছে, আর এখন এই মধ্য রাত্রে সে যেন একজন নিঃস্ব, পরম দুঃখী মানুষ।

নিজের পৃথক কক্ষে শুয়েও তার ছটফটানি কমলো না। একটু পরেই সে উঠে পড়ে অন্য একটি দ্বারে করাঘাত করে ডাকলো, সরোজ! সরোজ!

সরোজিনী শশব্যস্তে উঠে এলো শয্যা ছেড়ে। ঘুম জড়িত চক্ষে সে একেবারে বিস্মিত, বিহ্বল। তার বিদ্বান, বিখ্যাত স্বামী তার প্রতি আর মনোযোগ দেয় না। কতদিন পর যে সে এই গভীর রাত্রে আবেগের সঙ্গে ডাক দিয়েছে।

দ্বার খুলে সরোজিনী বললো, আসুন, ভেতরে আসুন।

অল্প নেশাচ্ছন্ন এবং অতিশয় ব্যাকুল কণ্ঠে, নবীনকুমার বললো, সরোজ আমার কিছুই ভালো লাগচে না, আমার একদম কোনো কিচু ভালো লাগচে না, আমি কী করি বলো তো?

এবার সরোজিনীর চক্ষে দেখা দিল ত্রাস। আবার কি সেই রকম রোগ ধরলো তার স্বামীকে? সে বললো, আপনার শরীর খারাপ লাগচে? মাতা ব্যাতা কচ্চে? কোবরেজ মশাই, ডাক্তার...দুলালকে ডাকবো?

—না, না। আমার সে রকম কিচু হয়নি। আমার শরীর ভালো আচে, কিন্তু আমার মনটাকে কে যেন খিমচে ধরেচে, আমাকে কে যেন বেড়ালছানার মতন টুঁটি টিপে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে...

—ওমা, কী সব্বোনাশ! আপনি সিরাপ খাবেন? সিরাপ খেলে যদি মন ভালো হয়...আপনার ঘর থেকে বোতল এনে দোবো?

—না, না, ও সব চাই না।

—মাতা টিপে দোবো? পা টিপে দোবো?

—সরোজ, তুমি আমার মনটা সুস্থির করে দিতে পারো? আমার সারা গায়ে যেন হাজার হাজার কাঁটা ফুটচে...

সরোজিনীর যতখানি সাধ্য, তার বেশী সে আর করবে কী করে! অনেক দিন পর স্বামী যে তার শয্যায় এসে বসেছেন, এতেই সে ধন্য। নবীনকুমার পত্নীর স্কন্ধে হাত রেখে চঞ্চল নেত্রে দেখতে লাগলো এদিক ওদিক। আসঙ্গ লিপ্সার উষ্ণতা তার

স্পর্শে নেই। বরং তার ওষ্ঠের ভঙ্গিমায় গভীর কষ্ট লেখা আছে।

সরোজিনী অতি যত্নে স্বামীর পদসেবা করতে লাগলো।

একটু পরেই নবীনকুমার ধপ্ করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েই তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাবার ঠিক আগে সে ভাবলো, যত সত্বর সম্ভব সে হরিদ্বারের দিকে যাত্রা করবে। সে তার জননীকে কতদিন দেখে নি!

পরদিন সকালে নবীনকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হলো অনেক দেরিতে।

সরোজিনী ইচ্ছে করেই তাকে জাগায় নি। বারবার এসে স্বামীকে দেখে গেছে। দু' একবার শিয়রের কাছে বসে সন্তর্পণে হাত রেখেছে স্বামীর মাথায়। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। নবীনকুমারের শয়ন ভঙ্গিটি কেমন যেন করুণ ধরনের। তেজী, অহংকারী মানুষটি ঘুমের মধ্যে একেবারে অন্যরকম। হাত দুটি বুকের কাছে গুটোনো, হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করা, তার এক কাত হওয়া দীর্ঘ শরীরটি এই সময় ক্ষুদ্র দেখায়। যেন জননীর ক্রোড়ের কাছে শুয়ে আছে শিশু।

ঠিক আটটার তোপ পড়ার মধ্যেই সরোজিনী প্রতিদিন স্নান সেরে নিয়ে পুজায় বসে যায়। এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে যে পরিপূর্ণ দিন শুরু হবার আগেই স্নান না করলে তার গা কিট কিট করে। আজ সেই নিয়মের ব্যত্যয় হলো। অনেক দিন পর তার শয্যায় তার স্বামী নিজে থেকে এসে শয়ন করেছেন, সারা রাত সরোজিনী ঘুমোতেই পারে নি। এর পর জেগে উঠে নবীনকুমারের কী মর্জি হবে, হঠাৎ কী চেয়ে বসবে, তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পালঙ্কের পাশে একটি ছোট মোড়া টেনে নিয়ে বসে রইলো সরোজিনী। ঘুমন্ত মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নবীনকুমারের বক্ষস্পন্দন দেখছে সে। কাল রাতে নবীনকুমারের অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখে সরোজিনী ভয় পেয়েছিল, বুঝি আবার কোনো নতুন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো তার স্বামী। আজ সে ভয় ভেঙে গেছে। অনভিজ্ঞ চক্ষেও নবীনকুমারের নিদ্রামাখা মুখখানি দেখলে কোনো রোগ-ব্যাধির আশংকা জাগে না। নবীনকুমারের চক্ষের পাতা দুটি মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে, অর্থাৎ সে স্বপ্ন দেখছে। তার ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত।

এক একবার নবীনকুমার পাশ ফিরতেই সরোজিনী চমকিত হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পালঙ্কের একেবারে কিনারায় এসে পড়লেও সে স্বামীকে সরিয়ে দিতে সাহস পায় না। স্বামীর মেজাজকে সে ভয় পায়। হঠাৎ জাগিয়ে দেওয়া যদি তিনি পছন্দ না করেন।

সরোজিনীর অঙ্গে যৌবন একটু তাড়াতাড়ি এসেছে এবং যেন বেশী করেই এসেছে। সবে বিংশতি বর্ষে পা দিয়েছে সে, এর মধ্যেই বেশ ভারভাত্তিক চেহারা, মুখখানি প্রায় গোলাকার হয়ে এসেছে। সে খেতে খুব ভালোবাসে, আর ভালো-বাসে ঘুম। পছন্দমতন আহার, বিশেষত নানারকম ঝাল, ব্যঞ্জন আর আচার তার খুবই প্রিয়, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুম, জীবনে এর চেয়ে শান্তির আর কী আছে! স্বামীসঙ্গ বিশেষ পায় না বলে সরোজিনী সম্প্রীতি করে নিয়েছে আলস্যের

সঙ্গে, আলস্য তার অতি বিশ্বাসযোগ্য সঙ্গিনী, সে মনের দ্বার বন্ধ করে রাখে, কোনো ক্ষোভ জমতে দেয় না। সকালবেলা ঘণ্টাখানেক পুজোআচ্চা করা ছাড়া সারাদিন তার আর কোনো কাজ নেই।

নবীনকুমার ঘুমের মধ্যে বলে উঠলো, অকৈতব...

সরোজিনী ব্যগ্র হয়ে উঠে এসে শোনবার চেষ্টা করলো। ঘুমেলা জড়ানো কণ্ঠস্বর এমনিতেই দুর্বোধ্য হয়, তার ওপরে ঐ শব্দটি সরোজিনীর একেবারেই অপরিচিত। সে বিস্মিত মুখখানি ঝুঁকিয়ে রইলো স্বামীর বুকের কাছে!

নবীনকুমার আবার বললো, রক্ত...সবই কি রক্তের দোষ...

তারপর পাশ ফেরা থেকে চিৎ হয়ে চোখ মেললো। সরোজিনীর মুখখানা অত কাছে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, কে?

—আমি! আমি সরোজ।

নবীনকুমার আবার চক্ষু মুদে বললো, অত সহজ নয়...যে কোনো একটা পথ...।

নিদ্রা আর জাগরণের মধ্যকার সীমারেখাটি নবীনকুমার এখনো পুরোপুরি অতিক্রম করেনি, দু' একবার চোখ মেলছে, আবার চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছে আপন মনে।

একটু পরেই সে আবার চোখ চেয়ে বললো, সরোজ এক গেলাস জল দেবে? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

উঠে বসে, বড় রুপোর গেলাসের ভর্তি জল প্রায় এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে সে বললো, আমি বুঝি তোমার খাটে এসে শুয়েছিলুম কাল? তুমি কখন উটোচো?

সরোজিনী যে ঐ শয্যায় আর স্থান নেয়নি, সারারাত ভূঁয়ে বসে কাটিয়েছে, সে কথা আর জানালো না।

সামান্য হেসে নবীনকুমার বললো, আজ তোমায় বেশ খাসা দেকাচ্ছে, সরোজ। কালীঘাটের পটের বউয়ের মতন গাবলা-গোবলা...।

সরোজিনী লজ্জা পেয়ে হাসলো। তার স্বামীর মুখে তার রূপের প্রশংসা। এ কথার কী উত্তর দিতে হয়, তা অবশ্য সরোজিনী জানে না।

—আচ্ছা সরোজ, আমি যদি বিলেতে গিয়ে রামমোহন কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন মরে যাই, তা হলে কেমন হয় বলো তো? সাহেবরা আমার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াবে আর তার দরুণ এ দেশে আমার অনেক সুনাম হবে।

সরোজিনীর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হলো।

—হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস পাচ্ছো না? ওদেশে মড়া পোড়াবার নিয়ম নেই, মুসলমান আর খৃীস্টানদের মতন হিন্দু মল্লেও মাটি চাপা দেয়। আমি স্বপন দেকলুম, রামমোহনের কবরের ওপর কতকগুলোন চ্যাঙগড়া-চেঙ্গড়ি সাহেব মেম ধেই ধেই করে নাচচে। তারপরই দেকি যে, রামমোহনেরই কবর বটে, কিন্তু চ্যাঙগড়া-চেঙ্গড়িরা সাহেব মেম নয়। আমাদেরই এখেনকার হিন্দু কলেজে পড়া ছেলে আর তাদের বেটার হাফ্। তারা গান গাইচে, গাড সেইভ দি কুইন...

অকস্মাৎ কথা থামিয়ে পালঙ্ক থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালো নবীনকুমার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর সরোজিনীর গাল টিপে দিয়ে বললো, তুমি বড্ড ভালো, সরোজ। ঐ যে কতায় বলে না, বোবার শত্রু নেই।

—আপনার স্নানের জল গরম কত্তে বলবো?

—বাঃ, এই তো কতা ফুটেচে। এবার বলো, 'আপনার জন্য ভিজে ছোলা আর

গুড় এনে দোবো?' তার চেয়ে আজ অন্য কিছু করা যাক বরং। ধরো, আজ আমি দাঁতন কল্লুম না, মুখ ধুলুম না, তুমি আমার হয়ে মুখ ধুয়ে নিলে। কিংবা ধরো, আজ আমি খেলুম না, তুমি আমার হয়ে খেয়ে নিলে। আমি আজ আর ঘুমোলুম না, তুমি আমার হয়ে ডবল ঘুমিয়ে নিলে,...কী, পারবে না?

—আমি মুখ্যু বলে আপনি আমায় এইসব কতা বলচেন?

—না, না, না, কে বলেচে তুমি মুখ্যু। ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস্। তুমি তো সুখী। লেকা পড়া করে যে, অতি অসুখী হয় সে। আহা, তোমার কোলে আজও একটা ছেলে দিতে পাল্লুম না।

—ও কতা বলবেন না। আমাদের এখুনো ঢের সময় রয়েছে...আমার ন'মাসীমা...

—তোমার ঢের সময় আচে বটে, কিন্তু আমার কি আচে? আমি যে কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, টুক্ করে কোন সময় সব কাজ ফুরিয়ে যাবে। একটা গান আচে জানো? "অকাজের কাজী অকূলে ডুবালে তরী, দিন না ফুরালো, না ফুরালো বিভাবরী।" হাঃ হাঃ হাঃ...আজ সকালবেলা আমার মনটা বড় হাল্কা লাগচে, অথচ রাত ভোর কত বিদঘুটে স্বপন দেকলুম। আমার আর একটা স্বপ্ন শুনবে? গাদাগুচ্চের লোক আমায় মিথ্যেবাদী বলে গঞ্জনা দিচ্চে, আঙুল দেকিয়ে দুয়ো দিচ্চে আমাকে...কিন্তু কোন্ মিথ্যের কাজ করিচি, বলো তো? লোকগুলোনই বা কে, জায়গাটাই বা কোতায়...তাই কিচুই চিনলুম নাকো। ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিস মনে পড়েচে, কাল রাতে ঠিক আমার মায়ের মতন...

এই সময় সরো, ও সরো বলে ডাকতে ডাকতে কুসুমকুমারী এসে দাঁড়ালো সেই কক্ষের দ্বারের সামনে। নবীনকুমারকে দেখে সে হঠাৎ থমকে গেল। কুসুমকুমারী অতি প্রাতে জেগে উঠে রোজ সারা বাড়ির তদারকি করে। নবীনকুমার ও সরোজিনীর শয়নকক্ষ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর সে যখন তখন সরোজিনীর ঘরে আসতে দ্বিধা বোধ করে না।

স্নান সারা হয়ে গেছে কুসুমকুমারীর, চুল পিঠের ওপর খোলা। পরনে একটি হলুদ বর্ণ শাড়ী। সরোজিনীর চেয়ে সে বয়সে কিছু বড় এবং নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এলেও তার মুখমণ্ডলে এখনো বালিকা-ভাবটি লেগে আছে। তার চোখের নীলবর্ণ মণি দুটি থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ে।

অপ্রস্তুত ভাবটি কাটিয়ে উঠে কুসুমকুমারী বললো, আজ সকালে আমাদের কী সৌভাগ্য! লক্ষ্মী-জনার্দনকে অনেকদিন পর একসঙ্গে দেকলুম। তাই ভোরবেলা উঠেই বাতাসে বসন্তকালের গন্ধ পাচ্চিলুম যেন!

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

কুসুমকুমারী এবার সরাসরি নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো, আমাদের সরো কোনোদিন যা ভোলে না, আজ আপনি ওকে সেই ঠাকুরের পুজো পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েচেন। আপনার জন্য ওর ঠাকুর-দেবতা সব তুচ্ছ হয়ে গেল।

কুসুমকুমারীর এই রঙ্গ-সুরের কথার উপযুক্ত কোনো উত্তরই দিল না নবীনকুমার। সে শুষ্কভাবে বললো, ভালো আছেন, বৌঠান?

তারপর তার পাশ কাটিয়ে নবীনকুমার বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে।

উপযাচিকার মতন নবীনকুমারের সঙ্গে ভাব করতে চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুসুমকুমারীর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তখনই তার মনে হল, তার স্বামীকে

বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়? নবীনকুমার যদি তাকে এতই অপছন্দ করে, তবে আর এক ছত্রছায়ায় থাকার প্রয়োজন কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সে সামলে নিল। সরোজিনীকে সে কিছু বুঝতে দিতে চায় না এখনই, ও বেচারির তো কোনো দোষ নেই। আবার মুখখানি সহাস্য করে সে সরোজিনীর বাহু ছুঁয়ে বললো, কী হয়েচে রে, সরোজ? মুখখানা বেজার কেন?

সরোজিনী কুসুমকুমারীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে কিছুই বুঝতে পারে না বলে মাঝে মাঝে তার মধ্যে এক ধরনের তীব্র, বন্য দুঃখ জেগে ওঠে।

প্রতি সকালেই নানা ধরনের মানুষ জন অপেক্ষা করে থাকে নবীনকুমারের জন্য। সে কারুর সঙ্গেই দেখা করলো না। গতকাল রাত্রির সম্পূর্ণ দৃশ্যটি তার মাথায় বারংবার ফিরে ফিরে আসচে। চন্দ্রনাথের গৃহের সেই অজ্ঞাতনামা যুবতীটি। অবিকল তার জননীর মতন। অথচ দুলাল কোনো সাদৃশ্য পর্যন্ত লক্ষ্য করলো না। নবীনকুমারের তো চোখের ভুল নয়। তার শৈশবে সে বিম্ববতীকে ঐ রকম রূপেই দেখেছে। বিম্ববতীর একখানি অয়েল পেইন্টিংও নেই এ গৃহে। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর জননীর অয়েল পেইন্টিং করাবার পর নবীনকুমারও জিদ ধরেছিল সেই সাহেব শিল্পীকে দিয়ে তার মায়ের একখানি ছবি গড়াবে। বিম্ববতী কিছুতেই রাজি হলেন না। কোনো পরপুরুষের সামনেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলবেন না, কোনো সাহেব তো দূরস্থান!

চন্দ্রনাথ তাকে অপমান করে দিল, তবু চন্দ্রনাথের বাড়িই তার মন টানছে। নবীনকুমার হরিদ্বার যাবার চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আবার সে ফৌজদারি বালাখানার দিকেই যাবে বলে মনস্থ করলো। তার আগে সে ভাবতে চেষ্টা করলো যে, তার মাতৃকুলের কেউ কোথাও আছে কিনা। সে তার মায়ের মুখে অনেকবার শুনেছে যে বিম্ববতী বিবাহের পর একবারও পিত্রালয়ে যান নি। এখন কি না রাণী ভিকটোরিয়ার আমল, তাই একালের মেয়েরা অনেক সুবিধে পেয়েছে, ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ি যেতে পারে। কিন্তু কোম্পানির আমলের শেষাশেষি অবধিও নারীদের এত সুযোগ ছিল না।

নবীনকুমার জ্ঞান হবার পর থেকেই জানে, তার মামাবাড়ি বলে কিছু নেই। তার মাতামহ ও মাতামহীর ততদিনে দেহান্ত ঘটেছে, আর কোনো পুত্র-কন্যা নেই তাদের। এতদিন পর অবিকল বিম্ববতীর মত চেহারার এক যুবতী কোথা থেকে এসে উদয় হলো তবে?

আহারাদি না করেই দুলালকে সঙ্গে নিয়ে গৃহ থেকে নির্গত হলো নবীন-কুমার। সহিসকে সে ফৌজদারি বালাখানার দিকে যাওয়ার হুকুম করায় দুলাল রীতিমতন অবাক। ও রকম একটা বাড়িতে বার বার কেন সেধে সেধে যেতে চান ছোটবাবু? আবার কিসের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়তে চলেছেন?

কিন্তু চন্দ্রনাথের বাসাবাড়ির কাছে এসে ওরা সম্পূর্ণ অন্য রকম দৃশ্য দেখলো।

সে স্থান একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাছাকাছি কোম্পানির বাগানের পুকুর থেকে বড় বড় মাটির জালায় করে

জল বয়ে আনছে অনেক লোক। কিছু লোক অনর্থক চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে।

গাড়ি থেকে তড়াক করে নেমে নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কোন বাড়িটা রে, দুলাল?

—মনে তো হচ্ছে সেই বাড়িই, ছোটবাবু?

—যে করে হোক আমাদের ভেতরে যেতে হবে। তুই ব্যবস্থা কর।

কিন্তু অত মানুষের ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্য। সঠিক কী যে হয়েছে, তাও জানার উপায় নেই, গুজবে কান পাতা দায়। কেউ বলছে, শেষ রাতে এক দল দুর্বৃত্ত এসে পুরো মহল্লাটা জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিল। কেউ বললো, ভূত ধরার ওঝাকে ভূতে এসে শাস্তি দিয়ে গেছে। কেউ বললো, পাঁচজন লোক জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, কেউ বললো, পনেরো জন। কেউ বললো সর্বাঙ্গ জ্বলন্ত অবস্থায় একজন রমণীকে ছাদ থেকে ঝাঁপাতে দেখা গেছে, কেউ বললো, তিনটি আধ-ঝলসানো স্ত্রীলোককে চিকিৎসালয়ে পাঠানো হলো এইমাত্র।

একটি কথা শুধু পরিষ্কার জানা গেল, এই অগ্নিকাণ্ড কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা-প্রসূত নয়, একদল হামলাকারী এসে চন্দ্রনাথের বাড়িটিতে চড়াও হয়ে তারপর অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে।

কারণটি অনুমান করতেও নবীনকুমারের অসুবিধে হয় না। গত রাত্রে কোন অভিযান থেকে চন্দ্রনাথ রক্তাক্ত-আহত হয়ে ফিরেছিল, তা সে কিছুতেই জানাতে চায়নি। কিন্তু বোঝাই যায় যে ঐ রমণীটিকে কেন্দ্র করেই সে কোনো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। সে সবলে ওকে কেড়ে এনেছে। সেই প্রতিপক্ষই পরে কোনো-ক্রমে চন্দ্রনাথের গৃহের সন্ধান পেয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল।

চন্দ্রনাথদের পরিণামের কথা চিন্তা করতেই নবীনকুমারের বক্ষঃস্পন্দন যেন থেমে যেতে চাইলো। দুর্বৃত্তরা কতজন এসেছিল, তা জানবার উপায় নেই, তবে যে-ক'জনই আসুক, তাদের প্রতিরোধ করবে কে? চন্দ্রনাথ গুরুতর রকমের অসুস্থ, তার আর অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, সঙ্গে এক অবলা নারী এবং সুলতান নামের ঐ ছোকরাটি। অস্ত্রধারী একটি মাত্র ব্যক্তিই ওদের পর্যুদস্ত করতে পারে।

বাড়িতে ওরা অগ্নিসংযোগ করলো কেন? নিশ্চয়ই রমণীটিকে ওরা পুনরায় হরণ করে তারপর চন্দ্রনাথ ও সুলতানকে জীবন্ত দগ্ধ করতে চেয়েছে। চন্দ্রনাথ ভালো করে না জেনেশুনে কোনো দারুণ হিংস্র পশুর গুহায় পা দিয়েছিল। এরকম কিছুর আশঙ্কা করেই সে কাল নবীনকুমারকে অনুরোধ করেছিল রমণীটিকে অন্যত্র আশ্রয় দেবার জন্য।

দুলাল অনেক চেষ্টা করেও জনতা ভেদ করে পারলো না পথ করতে। এখানকার পাঁচ মিশেলি মানুষজন কেউ নবীনকুমারকে দেখে চেনেনি। কিন্তু নবীনকুমার একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েকজন সেপাই-হাবিলদার ছাড়াও দু'জন ইংরেজ অফিসারও এসেছে। নবীনকুমার সেই অফিসারদ্বয়ের সামনে এসে ইংরেজিতে আত্মপরিচয় দিয়ে বললো, মহাশয়, ঐ গৃহের বাসিন্দারা আমার পূর্ব পরিচিত। উহাদের ভাগ্যে কী ঘটিয়াছে তাহা আমি অবিলম্বে জানিতে চাই!

অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান ইংরেজটি বললো, ওয়েল, বাবু, তোমাকে আর কী

বলিব! এই সমস্ত হুজুগ পরায়ণ নেটিভরা অকারণে ভিড় জমাইয়া আমাদের উদ্ধারকার্যে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। উহারা সুশৃঙ্খল রূপে দূরে দাঁড়াইলে আমাদের কার্যে অনেক সুবিধা হইত। এইসব নেটিভরা কোনো সাহায্যে লাগিবার বদলে শুধু বাধারই সৃষ্টি করে। ইহাদের দূরে সরাইবার কোনো উপায় বাৎলাইতে পারো?

নবীনকুমার বললো, আপনারা হুংকার দিউন। তাহা হইলেই ব্যাঘ্রের হুংকারে মেষপালের মতন সকলে দূরে পলাইবে।

সাহেব বললো, আমরা অকারণে হুংকার খরচ করি না। তাহার বদলে নেটিভ পুলিসদের লেলাইয়া দিয়া গুটি কতক লোককে লাঠির বাড়ি খাওয়াইলে কাজ হইতে পারে মনে হয়।

ততদূরও যেতে হলো না, সাহেব দু'জন খোলা পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতেই লোকদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কয়েকজন ছিট্‌কে পড়লো মাটিতে, কয়েকজন ছুটে গেল তাদেরও ওপর দিয়ে, বিকট স্বরে চিৎকার শুরু করলো অনেকে।

নবীনকুমার সাহেব দু'জনের পিছু পিছু চলে এলো অনেকখানি। অগ্নিকাণ্ড এমনই ভয়াবহ হয়েছিল যে চন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব দ্বিতল বাসা বাড়িটি এখন একটি কঙ্কাল মাত্র। চটের বস্তা মাথায় দিয়ে কয়েকজন উদ্ধারকর্মী ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সন্ধান করে এলো কারুকে পাওয়া যায় কিনা। একটি মাত্র মৃতদেহই তারা দেখতে পেয়েছে। ইট-কাঠের জঞ্জাল যতদূর সম্ভব সরিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কারুকে পাওয়া গেল না।

সাহেব দু'জন নবীনকুমারকে ডেকে নিয়ে গেল মৃতদেহটি সনাক্ত করবার জন্য। এসব দৃশ্য সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এখন উপায় নেই, সে নিজেই সাহেবদের কাছে ধরা দিয়েছে।

মৃতদেহটির দিকে এক লহমার জন্য তাকিয়েই নবীনকুমার করুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, এ কে? একে তো আমি চিনি না!

লোকটি মধ্যবয়েসী, বলবান, ওপরের ঠোঁটের খানিক অংশ কাটা, মাথার চুল পুড়ে গেছে, শরীরটাও কাঠ কয়লার মতন, এমন কোনো লোককে আগে এ বাড়িতে দেখে নি নবীনকুমার। গত রাত্রে সে চলে যাবার আগে পর্যন্ত এই ব্যক্তি এখানে ছিল না।

ব্যাপারটা যেন জতুগৃহদাহের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মতন। চন্দ্রনাথ তার সঙ্গের রমণীটি কিংবা সুলতানের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, যে-ভাবেই হোক তারা পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাদের পরিবর্তে পুড়ে মরেছে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষ।

খানিক বাদে অকুস্থল থেকে দূরে চলে আসার পর গাড়িতে উঠতে গিয়ে নবীনকুমার চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কোতায় গেল বল তো, দুলাল।

দুলাল কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

নবীনকুমার একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার চোয়াল কঠিন হয়ে এলো। সে আবার বললো, তুই লোক জোগাড় কর। যত টাকা লাগে লাগুক, ওদের খুঁজে বার কবতেই হবে।

"কোটাল, ছেড়ে দে মোরে
নিয়ে যা তুই চোর, দিগে ফাঁসি!
মালীর মেয়ে ফুল বেচে খাই,
কোন্ বেটী বা চোরের মাসী।
এ যে দেখি সৃষ্টি ছাড়া
দেখি নাক এমনি ধারা
যেমন শনিবারের মড়া,
রবিবারে হয়েছে বাসি..."

হার্মোনিয়াম সহযোগে এই গান তারস্বরে ভেসে আসছে দ্বিতলের এক কক্ষ থেকে। গৃহের সামনের পথে হুজুগ-খোর, উন্পাঁজুরে লোকেরা ভিড় জমিয়েছে এই উপলক্ষে, কেউ অহো-হো বলে তারিফ করছে মাঝে মধ্যে, কেউ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছে, কে রে? কে গায়? এ যে দেক্‌চি স্বয়ং গোপাল!

গানটি পুরুষকণ্ঠের বটে, কিন্তু কখনো কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কোনো নারীর বেসুরো স্বর। ভালো করে সন্ধ্যা নামেনি, এর মধ্যেই মজলিশ বেশ জমে উঠেছে বোঝা যায়। এই সব বাড়ি একেবারে বারদুয়ারী, যার খুশী প্রবেশ করতে পারে। তবে যার জেবে কড়ির জোর নেই, তাকে নোকরের হাতে কোঁৎকা খেতে হয়। নোকররাও মুখ দেখেই মানুষ চেনে।

এরই মধ্যে এক দল লোক একটা ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে এনে এমন জমাটি ভিড় দেখে থেমে গেল। একজন হ্যাট-কোট পরা ব্যক্তি হেদোর মোড়ের কালো সাহেবের খ্রীষ্টানী বক্তৃতার ঢং-এ চিৎকার করে উঠলো, কালো জগতের আলো! আইস, আইস, দ্যাখো, দ্যাখো! কলিযুগের কী বাহার, অল্প রান্নায় অপূর্ব আহার! গিন্নীর হইল ভাবান্তর, পাকশালায় যুগান্তর।

বাঈজী গানের শ্রোতারা এবার কৌতূহলী হয়ে এদিকে মুখ ফেরালো।

ক্যাটি কেষ্ট ভায়ার মতন চেহারার হ্যাট-কোট পরা লোকটি এবার ঠেলাগাড়ির ওপরে এক লাফে চড়ে চারদিক ঘুরে দেখে নিল একবার। তারপর এক হাত কোমরে দিয়ে এক হাত ওপরে তুলে কেষ্ট যাত্রার সখীদের মতন নাচের ভঙ্গি করে গান গেয়ে উঠলো।

ময়লার সাথে মিল দেবে কী?
গয়লা আছে হাতের কাছে
গয়লার সাথে মিল দেবে কি?
গয়লা বেচে সাদা দুগ্ধ
বুড়ো গুঁড়ো সব যা খেয়ে মুগ্ধ
সেই দুধ কেউ ময়লা করে কি?

গয়লা ভেয়েরা মাথায় পাগড়ি
ডান্ডা হাতে লয়ে এসো আগুরি
ময়লা কইলে মেনে লবে কি?

গায়কটি এখানে একটু থেমে মাথার শোলার টুপিটি খুলে একবার ঘাম মুছে নিল। পুনশ্চ দম নিয়ে সে বললো, ওয়েল, জেন্টেলমেন, ময়লার সাথে কেউ কি গয়লার মিল দেয়, আপনারই বলুন? ভেবে চিন্তে বলুন! আপনাদের ব্রেনের মধ্যে জাঁতাকল ঘুরিয়ে একেবারে ঠিক ঠাক বলুন!

একজন হেঁড়ে গলায় বললো, দূর বেটা অনামুখো! ময়লার সঙ্গে মিল দেবার জন্য মাতা খুঁড়চিস কেন? কয়লাই তো রয়েচে!

সবাই হো-হো করে অট্টহাস্য করলো।

হাসির রেশ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গায়কটি অদ্ভুত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, হীয়র! হীয়র! ওয়েল সেইড। ভাই বেরাদরগণ আমাদের এই লার্নেড ফ্রেন্ডের সম্মানে সবাই ক্ল্যাপ দিন! চটাপট চটাপট চটাপট! উনি ঠিক বলেচেন! ময়লার সঙ্গে আমি মিল দেবার জন্য মাথা খুঁড়চিলুম, উনি কেমন যুগিয়ে দিলেন। কয়লা হলো ময়লা!

এবার সে ঠেলাগাড়ির ওপরে একটি বস্তা চাপা দেওয়া চ্যাঙগাড়ি থেকে এক ঢেলা কয়লা তুলে নিয়ে বললো, এই দেখুন, কয়লা, প্রকৃতই ময়লা, তাই না? কয়লা হলো কালো, কুচকুচে কালো। কাক কালো, কোকিল কালো, কেষ্টঠাকুর কালো, যুবো বয়েসের মাতার চুল কালো, তা হলে এই সবই হলো গে ময়লা! ম্যাগো! ছিঃ! এই কয়লা, তুই ময়লা কেন রে?

দর্শকদের একজন বললো, এ আবার কোন্ নতুন সং রে বাবা!

হ্যাট-কোটধারীটি আবার বললো, শুনুন মশায়েরা। কালো, জগতের আলো, কেমন কিনা? ধলা, পায়ের তলা!

তারপর আবার পূর্বোক্ত ভঙ্গিতে গানঃ

এই যে কয়লা
এমন ময়লা
এ হলো আমার প্রাণের সয়লা!...

কেন? বুঝিয়ে দিচ্ছি! বাড়িতে গিন্নীন চাঁদবদনে হাসি ফোটাতে পারলে দুনিয়াটাই স্বগ্যো স্বগ্যো মনে হয় কিনা? আপনার গিন্নীর যদি গেঁটে বাত হয়, কোমরে ফিক ব্যথা হয়, তা হলে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় কিনা? কেন গিন্নীদের গেঁটে বাত হয় আর ফিক ব্যথা হয়? জানেন? কেউ জানেন? এনিবডি? আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ডটি এর রিপ্লাই দিতে পারেন? পারবেন না! আমি বলচি, শুনুন! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবার মতন এই যে বাড়ির গিন্নীদের দু বেলা অন্তত দশবার চুল্লির মুখে ফুঁ দিতে হয়। সেই জন্যই তো কোমরে ফিক ব্যথা আর গেঁটে বাত!

সকলে আবার অট্টহাস্য করে উঠলো।

লোকটি এবার কণ্ঠস্বর বদলে গম্ভীরভাবে বললো, যদি ডবকা নীরোগ গিন্নী চান, বাড়িতে কয়লা নিয়ে যান। কয়লা দিয়ে রান্না করুন। চ্যালা কাঠের যুগ শেষ! এক বোঝা চ্যালা কাঠের বদলে এইটুকখানি কয়লায় আপনার রান্না শেষ! কয়লার চুল্লি জ্বালাতে কোনো হ্যাপা নেই, ফুঁ দিয়ে চোখ লাল কত্তে হয় না।

দুখানা ঘুঁটে তলায় দিলেই দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কী করে সহজে কয়লার উনুন জ্বালাতে হয়, তা এখুনি দেকিয়ে দিচ্চি! প্রাণকেষ্ট!

ঠেলা গাড়ির নিচে বসে এক ছোকরা ততক্ষণে এক তোলা উনুন সাজিয়ে ফেলেছে। সেটি এবার ওপরে স্থাপন করলো। হ্যাট-কোটধারী সেটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললো, এই যে দেকুন! সাজাবার ক্যায়দা আচে। এতে কম কয়লা খর্চা হয়, আগুনও জ্বলে জলদি। যারা এই কায়দা শিকতে চান, আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি গিয়ে শিকিয়ে দিয়ে আসবে। ফ্রি অব চার্জ! প্রাণকেষ্ট, আগুন জ্বাল!

সব সরঞ্জাম ওদের সঙ্গে তৈরিই আছে। একটি বড় মাটির মালসায় তুষের আগুন। ডগায় গন্ধক মাখানো এক টুকরো প্যাঁকাটি তার মধ্যে ঠুসে ধরতেই সেটা ফস করে জ্বলে উঠলো। তারপর তার সাহায্যে প্রাণকেষ্ট তোলা উনুনে সাজানো কয়লা ধরিয়ে ফেললো সহজেই।

সে আগুন দেখে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো এক ধরনের। তা ঠিক বিস্ময়ের নয়। কেউ যে আগে কয়লার আগুন দেখেনি, তা নয়। কয়লার ফেরিওয়ালাও এই প্রথম নয়। তবু অনেকের মনেই কয়লা সম্পর্কে একটা বিরাগের ভাব আছে।

ফেরিওয়ালাটি উত্তম প্রচারক। সে সব রকম প্রতিক্রিয়ার কথাই জানে। এবার সে বলতে শুরু করলো, মশায়েরা, জেণ্টেলমেন, কয়লার এক হাজার গুণ, কিন্তু সে গুণগান না করে আমি এর কিছু দোষের কতা বলি, কেমন? যেমন, কয়লা সত্যিই ময়লা। চ্যালা কাঠ ময়লা নয়। তাই নয়? কয়লায় হাত দিলে কালি লাগে। ঠিক! কিন্তু হাত ধুয়ে ফেললেই সে কালি উঠে যায়। যে-কেউ পরীক্ষা করে দেকতে পারেন। চ্যালা কাঠ থেকে যে যখন তখন চোঁচ ফুটে হাত রক্তারক্তি হয়, কয়লায় কিন্তু সে ভয় নেই। কয়লায় ধোঁয়া হয়। বেশী ধোঁয়া হয়! ঠিক। কিন্তু কয়লার ধোঁয়ায় যে মশা মাছি পালায়, সে খবর জানেন? পরীক্ষা প্রার্থনীয়! বোকা লোকেরা কয়লার নামে যে আর একটা অপবাদ দেয়, সেটা কিন্তু আমরা মানবো না! কোনো এক বাংগালা কাগচে এক পত্রদাতা লিকেচেন যে কয়লার রান্না খেলে নাকি খাদ্য ঠিক পরিপাক হয় না, হজমের দোষ হয়, অম্লরোগ হয়! এমন গোমুখ্যুও এ দেশে আচে! আমি আপনাদের শত শত সার্টিফিকেট দেকাতে পারি যে, কয়লায় রান্নাও যেমন তাড়াতাড়ি হয়, হজমও হয় তেমন ঘোড়দৌড়ের মতন! কয়লার রান্না খেলে ছোট শিশুদের উদরাময় সেরে যায়। সাহেবদের কতা বাদই দিলুম, সাহেবরা তো কয়লার নাম আদর করে দিয়েচে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড, জানেন বোধ হয়, যা কয়লা, তাই হীরে! এ ছাড়া, আমাদের দেশে শত শত বামুন পণ্ডিত, জমিদার, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-মাস্টার কয়লার রান্না খেয়ে ভুরি ভুরি প্রশংসা করেচেন। এই দেকুন না, আমার সঙ্গেই যে চারজন রয়েচেন, একজন বামুন, একজন কায়েত, একজন সোনার বেনে আর একজন তেলী। জিজ্ঞেস করে দেকুন, ওঁয়ারা সব্বাই গত এক বচ্ছর কয়লার রান্না খেয়ে কেমন আচেন! আমার সামনে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আপনারা প্রাইভেটলি টক করে দেখুন! ওদিকে আমাদের মোছলমান ভায়েরাও কয়লার রান্নায় দিব্যি বিরিয়ানি-পোলাও-কারি-কাবাব খাচ্ছেন! আর ক্রিশ্চানদের তো কয়লার আঁচ ছাড়া কেক্-পুডিং তৈরিই হয় না! আমাদের রয়াল বেঙ্গল কোল কোম্পানি চোদ্দ পয়সায় এক মণ কয়লা দিচ্চেন! প্রথম দশ সের ফিরি। আমাদের কয়লাঘাট গুদামে গিয়ে চাইলেই প্রথম দশ সের সেম্পেল হিসেবে ফিরি পাবেন! মনে রাখবেন মশায়েরা, নতুন যুগ আসচে, পাড়াগেঁয়ে রীত্ আর চলবে না,

রান্নাঘরের আমূল সংস্কার করুন! গিন্নীদের মুখে হাসি ফোটান! উদরের প্রকৃত আদর করুন তা হলেই সমাজে সমাদর পাবেন!...

সন্ধ্যার পর অন্য দৃশ্যও দেখা যায়। ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব অনুপ্রবেশ করায় প্রায়ই তাঁরা দল বেঁধে সংকীর্তনে বার হন। ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই বিদ্বান ও উচ্চবর্ণের মানুষ বলে পথের পাঁচ মিশেলি লোকদের উটকো মন্তব্য বা ব্যঙ্গোক্তিতে তাঁরা কর্ণপাত করেন না। এ ছাড়া আছে পাড়ায় পাড়ায় হরিসভা, ব্রাহ্মদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরাও বার করেন কীর্তনের দল। এবং ছুটির দিন হলেই শুরু হল অষ্টপ্রহরব্যাপী নাম গান, সেই সঙ্গে মুড়কি ও বাতাসা বিতরণ।

বিশেষ বিশেষ পল্লীতে বিশেষ রকম গান বাজনা। সাহেবপাড়ায় চলছে বড়-দিনের মহড়া। ইডেনের বাগানে গোরারা প্রতি সন্ধ্যাবেলা হাইল্যান্ডার ব্যান্ড বাজায়, তা দর্শন ও শ্রবণ করার জন্যও প্রচুর জমায়েত হয়। নেটিভ পাড়াও পিছিয়ে নেই। দুর্গা পুজো কালী পুজোর পর আর কাছাকাছি বড় কোনো পুজোর উৎসব নেই, সুতরাং দেশী লোকেরা ইদানীং সাহেবদের দেখাদেখি বড়দিন পুজো শুরু করেছে। ডিসেম্বর মাস পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে যায় গান বাজনার ধুম। এই উপলক্ষে বড় মানুষের সন্তানরা দেদার টাকা-পয়সা শুঁড়ি ও বারনারীদের ঘরে ঢালে ।

তালতলার দিকে দেখা গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য। একখানি বিচিত্র আকৃতির জুড়ি গাড়ি আসছে, সেটিকে দেখতে অবিকল একটি বিশাল খাঁচার মতন। তার মধ্যে তিন চার জন সাকরেদের মধ্যিখানে বসে আছে এক অদ্ভুত পোশাক পরা ব্যক্তি। এই বাবুটি রীতিমতন সুপুরুষ, উত্তম কোঁচানো ধুতি এবং আলপাকার কোট, মাথার চুল তো কোঁচকানো বটেই, নাকের নিচে পুরুষ্ট গুম্ফটিও কুঞ্চিত মনে হয়। এবং তাঁর দু বাহুর সঙ্গে জোড়া রয়েছে দুটি ডানা। তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন।

অল্প বয়েসী ছোকরাদের কাছে এই দৃশ্য অভিনব। তারা পথ চলা বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে থাকে। শহরের প্রবীণ লোকরা কিন্তু ঠিকই চিনতে পারে। তারাও বিস্মিত হয়ে বলে, আরে, এ সেই পক্ষীর গাড়ি না? খুব কাছে এসে তারা সেই মধ্যমণি ডানাওয়ালা বাবুটিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলে, এ কি, এ তো স্বয়ং রূপচাঁদ পক্ষী মশায়!

পক্ষীর দলের শিরোমণি রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় ইদানীং আর বাড়ি থেকে বিশেষ বের হন না। পক্ষীর দলের সেই রবরবা অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। সেই রাজা নবকেষ্টও নেই, গোপীমোহন ঠাকুরও নেই, তেমন পৃষ্ঠপোষক আর পাওয়া যাবে না। আর সেই এক আসনে বসে একশত ছিলিম গাঁজা টানার মতন কলজের জোর দেখানো মানুষই বা কোথায়! রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় অনেক দিন পর্যন্ত দল টিঁকিয়ে রেখেছিলেন, তারপর কালের নিয়মে সবই নষ্ট হয়ে গেছে।

অনেক দিন পর তিনি বাগবাজারের বাসা থেকে কয়েকজন ইয়ার বক্সীর সঙ্গে বেরিয়েছেন তাঁর সেই পুরাতন, মার্কামারা গাড়িটি নিয়ে। উদ্দেশ্য বাগবাজারে গিয়ে আগেকার দিনের সঙ্গীরা যে কয়েকজন বেঁচে বর্তে আছেন, তাঁদের নিয়ে আবার একটি ঘরোয়া আসর বসাবেন। কিন্তু তাঁকে চিনতে পেরে পথচারীরা চার পাশ দিয়ে ঘিরে ধরে খাঁচা-গাড়ি আটক করে দিল। সকলের অনুরোধ, একখানা

গান শোনাতেই হবে।

রূপচাঁদ দাস পক্ষী মশায়ের বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, কণ্ঠে আর সেই আগেকার মতন জোর কিংবা লহরী নেই। তবু এত লোকের উপরোধে তাঁকে গাইতেই হলো। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি ধরলেনঃ

চিরদিন সমান যায় না রে ভাই,
উন্নতি বিলয় প্রায় দেখতে পাই,
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসিচে সদাই
কালে হত হবে দুনিয়া।...

কয়েকজন এনকোর, এনকোর বলে উঠলো। কয়েকজন বললো, এ গান নয়। এ বড় উঁচু ভাবের গান। একখানা রসের গান হোক!

খগপতি রূপচাঁদ হাত জোড় করে বললেন, সে রকম আর পারি না। এখন ক্ষমা দাও, ভাইগণ।

কিন্তু জনতা তা মানবে না। রসের গান শোনাতেই হবে। কেউ কেউ বলে উঠলো, সঙ্গে কল্কে নেই? দু চার দম দিয়ে নিন না, তা হলে গলা খোলতাই হবে!

বাধ্য হয়েই রূপচাঁদ আবার ধরলেনঃ

গো মেনকা শোন তোর অম্বিকার গতি
গাঁজা টেনে শ্মশানে যায় পশুপতি
মাঠে ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্তিক-গণেশ দুই নাতি।
শৈশবে যদি শিখাতে দুটিরে
বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ করে
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে।
হতো হাইকোর্টের বিচারপতি...।

এতেই হাসির হর-রা পড়ে যায়। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নতুন লোক এসে জমে। দু চারজন ইংরেজী শিক্ষিত যুবক অভক্তিও প্রকাশ করে। একজন বললো, ড্যাম এই গেঁজেল পক্ষীর দল তো গোল্লায় গেসলো, আবার কি রিটার্ন করলো? কাল্‌ট কি পেচিয়ে যাচ্চে না এগুচ্চে!

কিন্তু উপভোক্তাদের সংখ্যাই বেশী। আরও কয়েকখানি গান শোনাতে হলে রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয়কে। তারপর অনেকে মিলে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলো: আমারে ফ্রড করে! আমারে ফ্রড করে! ওটা একবার না শোনালে ছাড়ান ছুড়িন নেই

তখন রূপচাঁদ ধরলেন তাঁর বিখ্যাত গানঃ

আমারে ফ্রড করে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি,
গোল্‌ডেন বডি হলো কালি।
হো মাই ডিয়ার, ডিয়ারেস্ট
মধুপুরে তুই গেলি কৃষ্ট
ও মাই ডিয়ার, হাউ টু রেস্ট
হিয়র ডিয়র বনমালী।
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি।)
পুওর কিরিচর মিল্ক গেরেল
তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল

ননসেন্স তোর নাইকো আক্কেল
ব্রিচ অব কণ্ট্রাক্ট করিলি।
(ফিমেলগণে ফেল করিলি।)

গান থামিয়ে রূপচাঁদ বললেন, আর মনে নেই।

কিন্তু মনে করিয়ে দেবার মতন মানুষ আছে। শ্রোতাদের মধ্য থেকেই দু' তিন জন বলে উঠলো, লম্পট শঠের ফরচুন! লম্পট শঠের ফরচুন!

রূপচাঁদ আবার ধরলেনঃ

লম্পট শঠের ফরচুন খুললো
মথুরাতে কিং হলো
আংকেলের প্রাণ নাশিল
কুব্জার কুঞ্জ পেলে ডালি...।

তালতলার রাস্তায় এই সন্ধ্যায় রূপচাঁদ পক্ষীকে পেয়ে বিনি পয়সায় দুশো মজা লুটলো পথের মানুষ। তাদের মধ্যে আগাগোড়া প্রচ্ছন্নভাবে মিশে রইলো নবীনকুমার।

দুলালের ধারণা, তার বাবুর মাথাটি বিগড়ে গেছে একেবারে। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে নবীনকুমারের নানা প্রকার উৎকট বাতিকের সঙ্গে পরিচিত, যুবাবয়েসে তার খামখেয়ালিপনা বেড়েছে বই কমেনি সদাসর্বদা দুলাল ছায়ার মতন তার পশ্চাতে থেকে তাল সামলেছে। কিন্তু এখন এ কী অবস্থা, এর যে কোনো প্রকার মাথামুণ্ডু নেই। এ নিশ্চয়ই এক প্রকার গুপ্ত উন্মাদ-রোগ।

এ বিষয়ে দুলাল আর পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করারও সাহস পায় না। অন্তত গঙ্গানারায়ণকে একবার জানানো কর্তব্য, কিন্তু গঙ্গানারায়ণের সামনে এসেও দুলাল বলি বলি করেও কথাটি মুখ ফুটে বলতে পারে না। তার পশ্চাতে তার সম্পর্কে দুলাল কিছু আলোচনা করেছে, একথা নবীনকুমার জানতে পারলে চটে একেবারে আগুন হবে, এমন কি দুলালের গর্দানও চলে যেতে পারে।

নবীনকুমারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই নগরীর বড় মানুষদের সমাজ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট, বাইরের ঠাট-ঠমক ভেদ করে অনেকেরই ভেতরের আসল স্বরূপটি জানতে তার বাকি নেই। সেই সব মানুষদের তুলনায় তার মনিব নবীনকুমার সিংহকে সে অগাধ শ্রদ্ধা না করে পারে না। তবু, এতদিন পর দুলালের ইচ্ছে হয় তার মনিবকে ছেড়ে চলে যেতে।

এতকাল নবীনকুমারের সংস্পর্শে থেকে তার চরিত্রের খানিকটা প্রভাব দুলালের ওপরেও পড়েছে। অন্যান্য সাধারণ মানুষদের তুলনায় তার মন অনেকখানি মুক্ত, ভূত-প্রেত কিংবা দেব-দ্বিজের প্রতি তার অহেতুক ভয় বা ভক্তি নেই। কোনোদিন পাঠশালা-বিদ্যালয়ে না গেলেও সে নিজের চেষ্টায় কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। সে নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে এবং সুন্দর চিঠি লিখতে পারে। সিংহ-বাড়ির অনেকেই পত্র-রচনার প্রয়োজনে দুলালের শরণাপন্ন হয়। তার হস্তাক্ষর দেখে

চমৎকৃত হয়ে নবীনকুমার একদিন বিশেষ তারিফ করেছিল। এবং যে-ক'মাস নবীনকুমার 'পরিদর্শক'-এর সম্পাদক ছিল, তখন মধ্যে মধ্যে সে দুলালকে দিয়ে নিজের রচনা কপি করিয়েছে।

দুলাল যেমন নবীনকুমারের সব হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, সেইরকম নবীনকুমারও দুলালের প্রতি সর্বদা উদার হস্ত। কিছুদিন আগে সে দুলালের পুত্রের নামে একটি বেশ বড় বাড়ি লিখে দিয়েছে, দুলালের বর্তমান বেতন একশো পঁচিশ টাকা, সওদাগরি হৌসের ইংরেজী জানা, পাশ করা কেরানীরা এর অর্ধেক বেতনও পায় না। এ ছাড়া নবীনকুমারের যখন তখন খুশির বখশিশ তো আছেই। দুলালের আহার বাসস্থান বাবদ কোনো ব্যয় নেই, তার পুত্রটি বেশ ডাগরটি হয়েছে, এখন ইস্কুলে পড়তে যায়, নবীনকুমারের নির্দেশে সে-খরচও বহন করে এস্টেট। পদমর্যাদায় দুলালচন্দ্র যদিও এখনো নবীনকুমারের নিজস্ব ভৃত্য এবং শরীররক্ষী, কিন্তু মনে মনে সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে মধ্যবিত্তে। এবং মধ্যবিত্তের প্রধান কাম্য সামাজিক পরিচিতির ঠাট, দুলালের অন্তরেও সে আকাঙ্ক্ষা জাগা স্বাভাবিক। তাই সে আর ভৃত্য থাকতে চায় না, সে নিজেই নিজের জন্য ভৃত্য রাখতে চায়।

বস্তুত, সারা জীবন সে যদি শুধু পরের গোলামীই করে যাবে, তা হলে আর অর্থ সঞ্চয় করে লাভ কী হলো! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিজস্ব গৃহে সে যে পৃথক একটি সংসার পেতে বসবে, তার উপায় নেই, কারণ, তার নিজস্ব কোন সময়ই নেই। নবীনকুমার কখন হুটহাট করে কোথায় যায় তার ঠিক নেই, এবং যখনই ডাক আসবে, তখনই দুলালকে যেতে হবে। জুড়িগাড়ির পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকতে হয় দুলালকে, লোকে মনে করে সে বুঝি সহিস শেখ ইদ্রিসের সহকারী। যে-সব মানুষ তার নোখেরও যুগ্যি নয়, তারাও তাকে 'তুই' সম্বোধনে কথা বলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা সদ্য যার মনে জেগেছে, তার কাছে এর চেয়ে অসহ্য পীড়াদায়ক আর কী হতে পারে!

দুলালের হাতে এখন যা নগদ অর্থ আছে, তা দিয়ে অনায়াসেই সে একটি ব্যবসা শুরু করতে পারে। তার খুব ইচ্ছে একটি বইয়ের দোকান খোলা। স্কুল-কলেজের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, তেমন বই-খাতা-কালি-কলম-দোয়াতের চাহিদাও বাড়ছে হু-হু করে। পটলডাঙ্গা কিংবা সানকিভাঙা অঞ্চলে একখানা বাড়ি ভাড়া করে সে দিব্যি একটি দোকান খুলে বসতে পারে। বইয়ের দোকান খুললে অতিরিক্ত লাভ হবে এই, সে নিজে বিনি পয়সায় সব বই পড়ে ফেলতে পারবে। দুলাল ইদানীং প্রায়ই এই স্বপ্নটি দেখে। মস্ত বড় দোকানে খাটাখাটি করছে কর্মচারীরা, পেছন দিকে ক্যাশের টেবিলে বসে আছে দুলাল, পরণে ফরাসডাঙার তাঁতীদের বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর ধুতি, মলমলের পাঞ্জাবী, কাঁধে গোলাপী রঙের উড়ুনি, চোখে চশমা, মুখে পান, মাথার চুল টেরি-কাটা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠ্য বইয়ের লট্ কেনবার সময় বেশী কমিশন পাবার লোভে এই যে দুলালবাবু, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল, এই বলে খাতির করে কথা বলবে। নবীনকুমারের জন্য বিভিন্ন সময় পুস্তক ক্রয় করতে গিয়ে দুলাল এইরকম দৃশ্য দেখেছে। ...পুস্তক ব্যবসায়ী বলে পাড়া-প্রতিবেশীরা অতিরিক্ত খাতির করবে দুলালকে, চাঁদা চাওনীরা এসে বলবে, আপনার মোশাই দোকানের অমন রমরমা, আপনি অন্তত পঞ্চাশটি টাকা না দিলে কী মান থাকে...।

কিন্তু নবীনকুমার স্বেচ্ছায় মুক্তি না দিলে দুলালের এই স্বপ্ন সম্ভব হবেই বা কী করে! দুলাল কারুর কাছে দাসখৎ লিখে দেয় নি, মহারানীর রাজত্বে সে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশী চলে যেতে পারে, কিন্তু এতখানি কৃতঘ্ন আর নিমক-হারাম যে সে নিজেই হতে পারবে না।

রাত কত তার ঠিক নেই, চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এক মজা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে নবীনকুমারের জুড়িগাড়ি। পেছনের তক্তাটিতে বসে আছে দুলালচন্দ্র। মুখখানি তার বিরক্তিতে তিক্ত, ইচ্ছে থাকলেও ঘুমোবার উপায় নেই, এমন মশার উপদ্রব। মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসছে আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এক ঝাঁক মশার আক্রমণে। মশা মারার চটাস চটাস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঘোড়ারা দাঁড়িয়েই ঘুমোয়, গাড়ির ছাদে শেখ ইদ্রিশও কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, মশার কামড়ে তারাও ছটফট করছে মাঝে মাঝে। নবীনকুমার কোথা থেকে কী অবস্থায় বা কখন ফিরবে, তার কোনোই ঠিক নেই। এইরকম অবস্থায় আরও বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে দুলাল, কিন্তু এখন যেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শারীরিক কষ্টটাই বড় কথা নয়, নবীনকুমারের অদ্ভুত জীবন-যাপন পদ্ধতিই তার কাছে বেশী কষ্টকর। জোড়াসাঁকোর সিংহ-বাড়ির প্রধান পুরুষের এই পরিণতি!

চন্দ্রনাথের বাসাবাড়িটি ভস্মীভূত হবার পর তাদের আর কোনোরকম সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাদের খুঁজে বার করবার জন্য নবীনকুমার গণ্ডা গণ্ডা লোক নিযুক্ত করেছিল, ব্যর্থ হয়েছে সকলেই। চন্দ্রনাথ যেন উপে গেছে কর্পূরের মতন। অথবা ভূত ধরার ওঝা নিজেই এখন ভূত পূর্ব।

কিন্তু নবীনকুমার কিছুতেই তা মানতে রাজি নয়। চন্দ্রনাথের শরীরের গুরুতর জখম সে নিজের চক্ষে দেখেছে, ওরকম আহত অবস্থায় কোনো মানুষের পক্ষে কিছুতেই বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়। শত্রু পক্ষের চক্ষু এড়িয়ে সে নিশ্চিত এই নগরীর কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

নবীনকুমার-নিযুক্ত চরেরা ব্যর্থ হবার পর নবীনকুমার নিজেই সে ভার নিয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভূতগ্রস্তের মতন সে গৃহ থেকে নির্গত হয়, তারপর বিভিন্ন কু-পল্লীতে অনুসন্ধান চালায়। নবীনকুমারের ধারণা, আত্মগোপন করার পক্ষে ঐ সব অঞ্চলই বেশী সুবিধাজনক। কারুর কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধে সে কর্ণপাত করে না। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, সম্প্রতি সে একা যেতে শুরু করেছে। বাড়ি থেকে সে জুড়ি গাড়িতেই বার হয় বটে, তারপর কোনো এক স্থানে সে গাড়িকে অপেক্ষা করতে বলে পরিভ্রমণ করে পদব্রজে। হ্যাঁ, পদব্রজে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ধনীকুলচূড়ামণি রামকমল সিংহের একমাত্র সন্তান নবীনকুমার সিংহ সাধারণ পাঁচপেঁচি মানুষের মতন পায়ে হেঁটে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সময়ই লোকে তাকে চিনতে পারে, সবিস্ময়ে তাকায়। সমাজের উঁচু মহলে এই বিষয়ে নানা রকম গুঞ্জন শুরু হয়েছে, দু' একটি বাংলা সংবাদপত্রে বাঁকা মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে। লোকে চিনুক বা বিরূপ মন্তব্য করুক, তার চেয়েও বড় কথা, এর মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে পদে পদে। এই সব পল্লীতে খুনে-ঠ্যাঙাড়ের অবাধ বিচরণ, তাদের হাতে যে-কোনো মুহূর্তে পড়তে পারে নবীনকুমার। তবু সে ভ্রূক্ষেপহীন। দুলালকেও সে সঙ্গে নিতে চায় না। দুলাল গোপনে তাকে

অনুসরণ করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। নবীনকুমারের এ আচরণের অর্থ বার করা সত্যিই তো দুঃসাধ্য। যদি শখ হয় রাখুক না সে দশ-বিশটা রক্ষিতা, যদি মদ্যপানের নেশা ধরে থাকে, এক সমুদ্র ব্র্যান্ডি-শ্যাম্পেন পান করতে তাকে কে বাধা দেবে? কিন্তু অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে সে বুনিয়াদী সমাজের সকলের নাম ডোবাতে চাইছে কেন? একে উন্মাদ-দশা ছাড়া আর কী বলা যায়?

কোনো গলির মাথায় হলুদ রঙের অর্ধেক চাঁদ উঠেছে, বাকি আকাশে মেষ-রোম মেঘ, কেমন যেন অপ্রাকৃত আলো পড়েছে পৃথিবীতে, শীতের বাতাসে যাই যাই শব্দ। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় নবীনকুমার। তার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি এমনভাবে কোথায় চলেছি, কেন চলেছি? কোন্ আলেয়ার সন্ধানে আমি এমন ঘুরে ঘুরে মরছি!

আলেয়াই বটে! শুধু তো চন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করার জন্য তার এত শিরঃ-পীড়া নয়। সে চায় সেই রমণীটিকে আর একবার দেখতে। কে সেই রমণী? কোনো ভদ্রঘরের কুলবধূ নিশ্চয়ই নয়, তা হলে অত রাতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সে আসবে কেন? চন্দ্রনাথকেও নবীনকুমার যতটা চিনেছে, তাতে তাকে কারুর বাড়ির বউ-ঝি ফুস্‌লে আনার মতন প্রবৃত্তির মানুষ মনে হয়নি। বরং স্ত্রী জাতি সম্পর্কে তার ব্যবহারে খানিকটা বিরাগ ভাবই প্রকাশিত হতো। তা হলে কে ঐ নারী?

নবীনকুমর তো একথা কারুকে বলতে পারবে না যে এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে অবিকল তার মায়ের মতন দেখতে বলেই সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! সে নিজের মাকেই দেখেনি কতদিন, হরিদ্বারে মাতৃ সন্নিধানে যাবে বলে সংকল্প নিয়েছিল, তাও এখন শিকেয় তোলা। ঐ রমণীটিকে দ্বিতীয়বার না দেখতে পেলে তার কিছুতেই শান্তি হবে না।

মাঝে মাঝে সে নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন তোলে যে, ওর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলেই বা কী হবে? একজন বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার মায়ের মুখের আদল যদি থাকেও, তাতেই বা কী আসে যায়? তাকে খুঁজে বার করবার জন্য এই গোঁয়ার্তুমি কেন? এর উত্তর নবীনকুমার নিজের কাছে দিতে পারে না। দুলাল ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বিম্ববতীর কোনো মিল খুঁজে পায়নি, হয়তো সবটাই নবীনকুমারের দৃষ্টিবিভ্রম। তবু সে আর একবার মিলিয়ে দেখবেই। সন্ধে হবার পর এই জেদ ছাড়া তার আর কিছুই মনে থাকে না।

সুস্থ মস্তিষ্কে, স্বচ্ছ চোখে নবীনকুমার ঐ সব গৃহে প্রবেশ করতে পারে না, কারণ নোংরা পরিবেশ, নানা রকম খাদ্য পানীয়ের মিশ্রিত বিকট গন্ধ তাকে পীড়া দেয়। অপরিচ্ছন্নতার প্রতি তার তীব্র ঘৃণাবোধ আছে। সেই জন্য সে শুরু থেকেই মদ্য গলায় ঢেলে চক্ষু রঙীন করে নেয়, তখন আর নাকে অন্য কোনো ঘ্রাণ আসে না। এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে পরিক্রমার সময় মদ্যপান বাড়তেই থাকে। এক-একটি বারবনিতার কক্ষের দ্বারে আঘাত করে সে বাইরে দাঁড়ায়। প্রথমে বারবনিতাটির মুখ দেখে সে নিরাশ হয়, গলায় এক ঢোঁক ব্র্যান্ডি নেয়, তারপর চন্দ্রনাথ ও সেই রমণীটির বর্ণনা দিয়ে বলে, এরা কোতায় থাকে জানো? দ্বিতীয়বার নিরাশ হয়ে সে কুর্তার পকেট থেকে দশ-বিশ টাকা বার করে বার-বনিতাটির দিকে ছুঁড়ে দেয়।

এইভাবে গত কয়েক মাসে নবীনকুমার দুই সহস্র চারশত বাহাত্তরটি রূপোপ-জীবিনীর মুখ দর্শন করেছে। কিন্তু স্পর্শ করেনি একজনকেও। তার পরিচ্ছন্নতার বাতিক, অপরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য সে প্রাণ গেলেও গ্রহণ করতে পারবে না।

দিনের বেলায় নবীনকুমার স্বাভাবিকভাবে কিছু কাজ কর্ম করে। গীতা অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে, সম্পূর্ণ রামায়ণের গদ্য অনুবাদের জন্য তোড়জোড় চলছে। দরিদ্র গ্রন্থকারদের পুস্তক রচনায় সাহায্য ও প্রকাশের ব্যয় বাবদ সে মুক্ত-হস্তে সাহায্য করে। দুটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যাপারে সে প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আদালতে দেশীয় বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে একটা আন্দোলন গড়ে তোলায় সে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু রাত্রিকালে সে অন্য মানুষ।

একদিন নবীনকুমারের নামে পার্শেল যোগে একটি পুস্তিকা এলো। সেটির নাম 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। কয়েকটি পৃষ্ঠা অবহেলার সঙ্গে ওল্টাতেই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো বিশেষ ভাবে। পুস্তিকাটি তার সম্পর্কেই লিখিত। হুতোম প্যাঁচার নক্সা লিখে সে সমাজের অনেক ভণ্ড মহৎবাবুদের বিষ নজরে পড়েছিল, তাদেরই কেউ কোনো ভাড়াটে লেখক দিয়ে এই আক্রমণাত্মক রচনাটি লিখিয়েছে। এতে নবীনকুমারের নাম দেওয়া হয়েছে নববাবু। ওষ্ঠে মৃদু-মৃদু হাস্য রেখে নবীনকুমার পুস্তিকাটি পড়ে যেতে লাগলো। ভাড়া করা লেখকটি লিখেছে অনেক কিছুই. নবীনকুমারের বাল্যকাল, তাঁর নাটক ও অভিনয়ের প্রশংসাই করেছে, যদিও এর ভাষা একেবারে হুতোমের নকশারই অক্ষম নকল। ক্রমে দেখানো হয়েছে, এই নববাবু কেমন ভাবে মদ, মেয়েমানুষে আসক্ত হলো। বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা স্থাপনের ভড়ং করে নববাবু আসলে ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে পঞ্চ ম-কারের চর্চা করেন...."নববাবু সভ্যবাবুদিগকে মেয়েমানুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঘোষজা বলিলেন, মহাশয়, অনেক বেটীর সঙ্গে আলাপ আছে, আর আলাপ না থাকলে অবিদ্যাদের সঙ্গে আলাপ করবার মুশকিল কি? মিত্রবাবু বলিলেন, মহাশয়, আলাপ নাই এমত মেয়েমানুষ নাই! ...বাবু বলিলেন, কেন গো, আপনি যে সতী সাবিত্রীর মতন কথা কোচ্চেন, তবে এ পথে এসে কেন দাঁড়ালেন? খান্‌কী হয়ে তোমাদের কি এরূপ কথা বলা সাজে?..."

পড়া শেষ করে নবীনকুমার খুব এক চোট হাসলো। এর আগে সংবাদপত্রে দু-একটা ছুটোছাটা মন্তব্য তারও চক্ষু এড়ায়নি। ব্যাপার তবে এতদূর গড়িয়েছে যে এখন তাকে নিয়ে বই লেখা হয়! এই লেখকের ধারণা যে নবীনকুমার এ শহরের কোনো মেয়েমানুষকেই ভোগ করতে বাকি রাখেনি। ভাবুক, ওদের যা ইচ্ছে ভাবুক।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে কখন, দুলাল জুড়িগাড়ির পশ্চাতের তক্তায় বসে মশার দংশনে ছটফট করছে, আর সেই সময় নবীনকুমার একাকী ঘুরছে ওলাই-চণ্ডী তলার একটির পর একটি বাড়িতে। তার চক্ষু জবাফুল বর্ণ, পদদ্বয় আর মস্তিষ্কের ভার বহন করতে চাইছে না, তবু তার গৃহে ফেরার কথা মনে নেই। যত নেশা বাড়ে, তত বাড়ে তার জেদ আর দুঃখ, কেন সে তার মাতৃ-মুখী সেই

রমণীকে আর দেখতে পাবে না? কেন একই রকম রূপের দুটি রমণীর একজন হয় স্নেহময়ী পুতচরিত্রা নবীনকুমারের জননী আর অন্যজন হয় বারনারী?

একটি কক্ষের দ্বারে করাঘাত করে নবীনকুমার বললো, খোলো!

ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর এলো, হবে না, হবে না, যাও। আমার লোক আচে!

নবীনকুমার বললো, সে থাকগে যাক্, একবারটি শুধু তোমার মুখটি দেকবো, যত টাকা লাগুক—

—কে রে, মুখপোড়া, দূর হ!

—একবারটি খোলো, আমি আর কিছুই চাই না, শুধু দেকবো—

—আরে আমার পিরীতের নাগর রে! শুধু দেকবো! যা, যা—

এরূপ কিছু বাক্য বিনিময়ের পর তিতিবিরক্ত হয়েই স্ত্রীলোকটি দ্বার খোলে। দু' জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে যেন তড়িতাহতের মতন স্থাণু হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটিই কথা বললো প্রথমে। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সে বললো, তুমি? কেষ্টঠাকুর! আমায় খুঁজতে খুঁজতে এত দূর এসোচো? এসো, এসো, ভেতরে এসো, তোমায় আমার আঁচল পেতে বসতে দোবো—

স্ত্রীলোকটি বিস্মিত স্তম্ভিত নবীনকুমারের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

নবীনকুমারকে বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থায় চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমণীটি হা হা শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলো, তার শরীরটি দুলতে লাগলো বেতস লতার মতন। পশ্চিমা বাঈজীদের মতন তার অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল লাল মখমলের কামিজ, দুই চক্ষে গাঢ় সুর্মা, চুড়ো করে চুল বাঁধা। চক্ষের মণি দুটি যেন দু' টুক্‌রো হীরে। প্রথম নজরে রমণীটিকে মনে হয় যেন এক ভয়ংকরী অগ্নিশিখা!

নবীনকুমারের হাত চেপে ধরে সে বললো, হাঁ করে দেকচো কী গো? ওগো নবদুর্বাদলশ্যাম, আমায় চিনতে পারো নি? আমি সে তোমার সেই শিক্‌লি-কাটা পাখি!

নবীনকুমার অস্ফুট কণ্ঠে বললো, সুবালা!

প্রায় হ্যাঁচকা টানে নবীনকুমারকে কক্ষের মধ্যে এনে সুবালা বললো, না গো, সে সুবালা আর নেই কো! আমি এখুন পুতুলী বাঈ। তবে জানতুম, তুমি একদিন না একদিন আসবে! প্রাণের টান কি কোনোদিন ছেঁড়া যায়?

কক্ষের এক ধারে মদ্যপানরত দুই ব্যক্তি এদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। তাদের একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললো, ছেলাম আলেকুম, বন্দে আজ্ঞা হোক, ছায়েব, আমায় চিনতে পারেন নি!

নবীনকুমারের তখনও বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা কাটেনি। তাছাড়া চক্ষে নেশার ঘোর। লোকটির মুখখানি সামান্য পরিচিত হলেও আর কিছু সে ধরতে পারলো না। বস্তুত সুবালাকে দেখার পর থেকেই তার শরীরে একটু একটু করে ক্রোধের উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। এই সুবালা তার জীবনের একটি ব্যর্থতার প্রতীক।

সে আর কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সুবালা ছুটে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে সেখানে পিঠ ঠেস দিয়ে দু' বাহু

ছড়িয়ে দাঁড়ালো। তারপর হীরামন পাখির মতন তীক্ষ্ম স্বরে বললো, কোতায় যাচ্চো, নাগর! এতদিন পর তোমায় পেয়েচি। আমারই খোঁজে এতদূর এসে আবার অমনি সট্‌কান দিতে চাইচো যে? এ কী খেলা তোমার, নাথ? ঘরে অন্য লোক দেখে বুঝি তোমার গোঁসা হয়েছে?

নবীনকুমার বললো, পথ ছাড়ো!

সুবালা দুদিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, উঁহু! সেটি হচ্চে না। যাবো বললেই কি যাওয়া হয়? এতদিন পরে এসোচো, বঁধু, আধো আঁচরে বসো, পান খাও, দুটো রসের কতা শোনাও...ওরা দুজনে এক্ষুনি চলে যাবে...ওরা আমার রোজকার নুন-পান্তা, আর তুমি হলে গে পোলাও কালিয়া...

নবীনকুমার বললো, আমায় যেতে দাও! আর কোনোদিন তোমার মুখ দেকতে হবে আমি ভাবিনি—

সুবালাও কম নেশাগ্রস্ত নয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে বারবার তার জিহ্বা দিয়ে ডালিম-রঙা ওষ্ঠ লেহন করছে। উত্তম সাজসজ্জায় এবং মাজাঘষায় তার রূপ অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তার মুখে যেন একটা নিষ্ঠুর ভাব এসেছে।

সে বললো, আহা-রে মরে যাই! মরে যাই! আমার মুক দেকতে হবে ভাবো নি! ও মুক দেখিলে অঙ্গ জ্বলে, না দেখিলে মন সদা উচাটন! তোমার তবে সেই অবস্থা! এতদিন পর খুঁজে খুঁজে তবে আমার দুয়োরে এসে কেন দাঁড়ালে, বংশীধারী? তোমায় দেকে আমারও গা জ্বলে যাচ্চে, তুমি আমার শত্তুর, পরম শত্তুর, তবু তোমারই প্রতীক্ষেতে এতকাল ঘুমহারা নয়নে বসে আচি।

এর পর সুবালা গান ধরলোঃ

> এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,
> আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব।
> (ও নাম শুনবো না, শুনবো না, নিলাজ বঁধুর নাম
> শুনবো না, শুনবো না)
> এক নয়ন বলে আমি কৃষ্ণরূপ দেখিব
> আর এক নয়ন বলে আমি মুদ্রিত হয়ে রব
> (ও রূপ দেখবো না, দেখবো না, কালীয় কুটিলের রূপ
> দেখবো না, দেখবো না!)

এই গানের সময় মাতাল বাবু দুটির একজন অপরের পৃষ্ঠদেশকে ডুগিতবলা বানিয়ে তাল দিতে শুরু করে, রীতিমতন আড়ে ঠেকা সহযোগে।

নবীনকুমার বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে আর এক পা অগ্রসর হয়ে বললো, আমায় যেতে দাও! তোমাদের ছুঁতে চাই না আমি, নইলে জোর করে তোমায় সরিয়ে দিতুম!

সুবালা বললো, কী? আমাদের ছুঁতে চাও না? আমাকে তুমি ঘরের বার করে এনোচো, ভদ্দরঘরের বউ ছিলুম, বাজারে মাগী করোচো, এখন বলে ছুঁতে চাই না! এখন বিড়েল তপস্বী সাজচো!

সুবালার এমন নৃশংস মিথ্যাভাষণে নবীনকুমার একটুক্ষণের জন্য আবার বাক্যহীন হয়ে যায়। এ সর্বনাশিনী বলে কি? এক কদর্য পতিতালয় থেকে একে উদ্ধার ক'রে নবীনকুমার একে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেবার সর্বরকম চেষ্টা করেছিল, তা সে তুচ্ছ করে আবার এই নারকীয় জীবনে ফিরে এসেছে। সে এখন

অপর লোকদের সামনে এই অপবাদ দিচ্ছে!

সুবালা অন্য লোক দুটির দিকে চেয়ে আদেশের সুরে বললো, তোরা এই মিনসেটাকে পেড়ে ফ্যাল তো! আজ আমি ওর বুকে বসে দুরমুস্ করবো!

সুরাপায়ী দুজনের মধ্যে যে নবীনকুমারকে সনাক্ত করেছিল, তার মাথায় একটি ফেজ, চিবুকে ছুঁচোলো দাড়ি অনেকটা মেহেদী রঙের, সে জিহ্বা বার করে বললো, তোবা, তোবা! এসব কী বলছো গো পুতুলীবিবি! এই বাবু কতবড় ইমানদার আদমী, সারা বাংলা মুলুকে কে না ইনাকে চিন্‌হে!

লোকটি এসে নবীনকুমারের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকখানি ঝুঁকে সেলাম বাজিয়ে বললো, সিংহী ছায়েব আপনে যখন উর্দু 'দুরবীন' আখবরের মালেক ছিলেন, তখন আমি সেখানে কুছুদিন সব্ এডিটারি করেছি। আপনার মনে নেই...

নবীনকুমারের মনের মধ্যে এমনই ঝঞ্ঝা চলছে যে সে এই লোকটি বিষয়ে মনঃসংযোগই করতে পারলো না। সে যে-কোনো প্রকারে এখান থেকে চলে যেতে চায়।

ফেজ পরিহিত লোকটি তার সংগীর হাত ধরে টেনে, নবীনকুমারকে এড়িয়ে সুবালার কাছে এসে জানালো যে, সুবালার পুরোনো প্রেমিক এসেছে, তাদের মান-অভিমানের পালায় অন্যলোকের উপস্থিতি শোভা পায় না। সুতরাং তারা এখন বিদায় নিচ্ছে। তবে বাবু নবীনকুমার সিংহের যাতে কোনোরকম বে-ইজ্জতী না হয়, সেটা তার দেখা উচিত।

লোক দুটি নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র দরজায় অর্গল লাগিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম কণ্ঠস্বরে সুবালা বললো, আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়িচি, না? আপনার দাঁড়ের সোনার শিক্‌লি কেটে আমি একদিন ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে নীল আকাশে ডানা মেলেচিলুম...

নবীনকুমার কক্ষের সব দিকে চক্ষু বুলিয়ে বললো, এই নীলাকাশ?

সুবালা আবার হাসলো। এগিয়ে এসে নবীনকুমারের কণ্ঠে দু'টি হস্ত স্থাপন করে বললো, যার যা নিয়তি! এই দুনিয়াটাই হলো গে ধোঁকার টাটি। চক্ষু বুজলে এই ঘরটাই আকাশ। তেমন তেমন কপাল হলে চোখ মেললেও কেউ কোনোদিন আকাশ দেকতে পায় না। আসলে এই শরীরটাই তো খাঁচা গো! শোনো নি সেই গান, খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক ফকির এই গান গাইতে গাইতে যেত। এ বাড়ি নয়গো, আমার বাপের বাড়ি, সে অনেককাল আগেকার কতা! সেই অচিন পাখিটা যেদিন এই খাঁচা ছেড়ে যাবে, সেইদিন নীলাকাশের সন্ধান পাবো!

সুবালার হাত দুটি নামিয়ে দিয়ে নবীনকুমার একটু সরে দাঁড়ালো। সুবালা সম্পর্কে শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণাও অনেকখানি জমে ছিল তার মনের মধ্যে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এরকম রহস্য ভরা সুন্দর কথা সে এ পর্যন্ত আর কোনো স্ত্রীলোকের মুখে শোনেনি। প্রথম সাক্ষাতে এই ধরনের কথা শুনেই সে সুবালার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এরকম রমণীরও কেন এই বারবনিতার জীবনই পছন্দ হলো!

সংগের সুরার বোতলটি বার করে নবীনকুমার গলায় ঢাললো অনেকখানি। এরকম অবস্থায় কণ্ঠে তরল আগুনের আঁচ না পেলে সে মনের জোর ফিরিয়ে আনতে পারে না।

সুবালা বললো, ডাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! এই তোষক-জাজিম যদি তোমার অপবিত্র বোধ হয়, তা হলে আমার চোখের জল দিয়ে সব ধুয়ে দিচ্চি! হ্যাঁ গা,

আমায় খ‌ুঁজে পেতে তোমার খ‌ুব কষ্ট করতে হয়েচে, তাই না? আমি ইচ্ছে করেই তোমার কাচ থেকে এতদিন ন‌ুকিয়ে রয়েচি। জানতুম, তুমি নিজে থেকে একদিন না একদিন আসবেই।

—আমি তোমায় খ‌ুঁজতে আসিনি!

—আহা-হা, আমি যেন আর জানি না! আর ভাঁড়িয়ো না গো, ভাঁড়িয়ো না! চাদ্দিকে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গ্যাচে, আর উনি এখনও ছাঁটা মেরে বলচেন, তোমায় খ‌ুঁজতে আসিনি! কত লোক আমায় এসে বলে যাচ্চে, ওগো, নবীনকুমার সিংগী যে সব পাড়ায় পাড়ায় তোমায় হন্যে হয়ে খ‌ুঁজচেন! ঐ যে ফকির‌ুদ্দীন, ঐ ফক্‌রা ছোঁড়াই তো তোমায় দেকেচে কতদিন, তুমি এক একজন রাঁঢ়ের বাড়ি যাচ্চো, আর তার ম‌ুখ দেকে ভিরকুট্টি মেরে বলচো, এ না! এ তো সে না! হি-হি-হি-হি! তুমি আমায় সহজে পাবে কী করে, আমার সেই আগেকার নাম নেই, এখন আমি যবনী হইচি, আর আমার স‌ুরৎও পাল্টে গ্যাচে!

—তোমায় আমি খ‌ুঁজবো কেন? তুমি আমার ব্যবস্থায় থাকতে চাওনি—

—কেন চলে এসিচিল‌ুম, তুমি ব‌ুঝতে পারো নি? তুমি আমায় সব দিয়েচিলে, খাওয়া-পরার স‌ুখ, দাস-দাসী, আরও কত কী, শ‌ুধ‌ু তুমি নিজেকে দাওনি! কোনো মেয়েমান‌ুষ এতে খ‌ুশী হয়? ব্রজের রাখালরাজার মতন ম‌ুখখানি তোমার, আর তুমি মেয়েমান‌ুষের মনের এই খবরটা জানো না! তবে আমি জানতুম, তুমি একদিন না একদিন আসবেই—

—আমি তোমার জন্য আসিনি। আমি অন্য একজনকে খ‌ুঁজচিল‌ুম—

—কাকে গো, কাকে? সে আবাগীর বেটী কী এমন প‌ুণ্যি করেচে যে আমার চেয়ে তাকে তোমার মনে ধরবে? বলো না গো, কে? ওগো দ‌ুঃখী, তুমি কার সন্ধানে সবার দোরে দোরে ঘ‌ুরচো? তোমার ব‌ুঝি কোনো বন্ধ‌ু নেই, কেউ প্রাণের দোসর নেই, তাই তুমি একজন সঙ্গী খ‌ুঁজে বেড়াচ্চো? তোমার কত টাকা, তুমি টাকা ছড়ালে গণ্ডায় গণ্ডায় হ‌ুরী-পরী কিনতে পারো, তব‌ু কেন সন্ধ্যেবেলাগ‌ুলোতে আমাদের মতন পাতকিনীদের মধ্যেই ঘ‌ুরতে হয় তোমায়? আহা গো!

আর কোনো উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার গলায় আর কয়েক ঢোঁক ব্র্যান্ডি ঢাললো। সত্যি সত্যিই সে কাকে খ‌ুঁজছে, সে কথাটা এখানে আর বলার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া অজান্তে একটা কথা বলে স‌ুবালা তার হ‌ৃদয়ের এক গোপন দ‌ুঃখের তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে। তোমার কোনো বন্ধ‌ু নেই! এর চেয়ে সত্য আর কী হতে পারে! সেইজন্যই কি তার এমন অব‌ুঝ ছটফটানি!

ফকির‌ুদ্দীন ও তার সঙ্গীর ফেলে যাওয়া স‌ুরার বোতলটি তুলে নিয়ে স‌ুবালাও পান করলো খানিকটা। বড্ড গরম, এই বলে সে তার ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়ানো অতি স‌ূক্ষ্ম ওড়নাখানি ছ‌ুঁড়ে ফেলে দিল দ‌ূরে।

তারপর নবীনকুমারের দিতে তীব্র দ‌ৃষ্টি ন্যস্ত করে বললো, সে বাব‌ু, তুমি যাই বলো, তুমি আমায় খোঁজো বা নাই-ই খোঁজো, আমি তো জানতুমই, তুমি একদিন না একদিন আসবেই...তুমি এসোচো, আর আমি তোমায় ছাড়চি নি। তুমি কতক্ষণ ডাঁড়িয়ে থাকবে? এবার একট‌ু এসো।

—না।

—সে তুমি ডাঁড়িয়ে থাকো বা বসেই থাকো, আজ আমি তোমায় খাবো! আমি রাক্ক‌ুসী! এই দ্যাকো আমাব দাঁতের ধার, আমার নোখ দেকোচো! ঈগল পাখির ঠোঁটের মতন...তুমিই আমায় ঘরের বার করে পথে নামিয়োচো, এখন আমার ওপর

ঘেন্না! আমায় ছোঁবে না!

নবীনকুমার দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, তুমি কী সব বকচো পাগলের মতন! কেন বলচো, আমিই তোমায় পথে নামিয়িচি? তুমিই তো গপ্পো শুনিয়েচিলে তোমার কোন্ দেওর না দেওরের শালা...

—সে তো তুমিই—

—পাপীয়সী, পথ ছাড়ো আমার! তোমার প্রলাপ শোনবার মতন সময় নেই আমার! শরীর নিয়ে পাপের বেসাতি করাতেই তোমার সুখ, তাই নিয়েই থাকো! আমার সঙ্গে তোমার কোনো সংশ্রব নেই।

—শরীর নিয়ে পাপের বেসাতি...ঠিক বলোচো! এসব বড্ড ভালোবাসি আমি। শরীর আমার বাঘিনী, পুরুষ মানুষের রক্ত খেতে চায়। তোমার রক্ত না খেয়ে কি আর ছাড়বো? তুমি আমার নাগর, মৌলাআলীতে আমার জন্য সুন্দর বাসা ভাড়া করেচিলে, কত দয়া তোমার! তুমি সব বোঝো, শরীর বোঝো না, তাই না? মেঠাই খাবার লোভ অথচ হাত বাড়াতে নজ্জা। এসো, সব তোমায় শিকিয়ে-পড়িয়ে দিচ্চি!

—তোমাকে আমি অনেকবার বলিচি, তোমাদের শরীরের প্রতি আমার লোভ নেই—

—লোভ নেই তো বাজারে মাগীদের দরজায় দরজায় রোজ রোজ ঘোরো কেন? তারা শরীর ব্যাচে না অমৃত ব্যাচে? ওগো আমার সন্ন্যিসী ঠাকুর রে, উনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চেন আর ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে খুঁজচেন। এই বেবুশ্যেপাড়া তোমার সেই গহন বন, আর আমি তোমার ঈশ্বর!

কথা বলতে বলতে সুবালা তার শরীরের সমস্ত বসন ত্যাগ করতে লাগলো। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে সে নবীনকুমারের একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বললো, এবার?

সুরার প্রভাবে ও নগ্ন নারীরূপের ঝাঁঝে নবীনকুমারের শরীর টলমল করে উঠলো। সে সবেগে মস্তক আন্দোলিত করে বলতে লাগলো, না, না!

সুবালাকে স্পর্শ না করে সে দ্বারের দিকে এক লম্ফে চলে যেতে গিয়ে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। দেয়ালের কোণে মাথা ঠুকে গেল বেশ জোরে।

মাঠের মধ্যে জুড়ি গাড়ির পিছনের তক্তায় বসে মশার কামড় খেতে খেতে সারা রাত কেটে গেল দুলালের। ভোরের মধ্যেও ফিরলো না নবীনকুমার। বিরক্তিতে, গ্লানিতে এবং দুর্ভাবনায় তার মাথা খারাপ হবার মতন অবস্থা। এখন তার কী কর্তব্য? সে কোথায় তার প্রভুকে খুঁজতে যাবে? নবীনকুমারের যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে এখুনি কি গৃহে ফিরে গিয়ে গঙ্গানারায়ণকে তা জানানো উচিত? আবার, নবীনকুমার যখন তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে আদেশ করে গেছে, তখন এ স্থান ত্যাগ করাও কি তার পক্ষে সঙ্গত?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বেলা বাড়তে লাগলো। কোচোয়ানও কোনো পরামর্শ দিতে পারলো না। ন'টার তোপ্ পড়বার পর দুলাল যখন নিজ দায়িত্বে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেই সময় এসে উপস্থিত হলো নবীনকুমার। চক্ষু দু'টি রক্তবর্ণ, কপালের এক কোণে একটি সরু কাটা দাগ, মুখখানি গম্ভীর। কোনো রকম কারণ দর্শাবার চেষ্টা না করে সে গাড়িতে উঠে হুকুম করলো, বাড়ি চল্!

এরপর নবীনকুমার কয়েকদিন পুরোপুরি একেবারে গৃহে অবস্থান করলো। শারীরিক কোনো অসুস্থতা না থাকলেও সে প্রায় শয্যাত্যাগই করলো না। দিন চারেক পরে যেন তার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হলো।

দুলালকে দিয়ে সে খবর পাঠালো গঙ্গানারায়ণের কাছে, বিশেষ প্রয়োজনে সে একবার দেখা করতে চায়। গঙ্গানারায়ণ বাড়িতেই ছিল। সে নিজেই চলে এলো কনিষ্ঠ ভ্রাতার মহলে।

নবীনকুমার শান্ত ভাবে জানালো যে সে আগামী দু' একদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। তার প্রথম উদ্দেশ্য হরিদ্বারে গিয়ে জননী বিম্ববতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তাঁর কাছে কয়েকটি দিন কাটিয়ে তারপরও সে নানান দেশ পরিভ্রমণ করবে।

গঙ্গানারায়ণ অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে বললো, বেশ তো, বেশ তো, এ তো খুব ভালো কতা! তোর শরীরটাও অনেক শুকিয়ে গ্যাচে, পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্তন করলে উপকার হবে। মায়ের সঙ্গে আমিও একবার দেকা করতে যাবো ভাবচিলুম, কিন্তু তুই আর আমি দু'জনে এক সঙ্গে গেলে এখেনকার বিষয়-তদারকি কে করবে!

নবীনকুমার বললো, আমি ঘুরে আসি, তারপর তুমি যেও! আমি মাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেকচি, মা বোধহয় আমায় ডাকচেন!

নবীনকুমারের অনুপস্থিতির জন্য যে-সব কাগজ-পত্রে সই-সাবুদ করে যাওয়া দরকার সে-সব সারা হলো। তা ছাড়া নবীনকুমার বাইরে যাবে, সেজন্য এলাহী বন্দোবস্তের দরকার। লোক-লস্কর নিতে হবে প্রচুর।

এই প্রথম দুলাল কাঁচুমাচু হয়ে জানালো যে সে যদি সঙ্গে না যায়, তা হলে কি ছোটবাবুর খুব অসুবিধে হবে? দুলালের পত্নী দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়েছে, সেই জন্য সে এখন দূরে যেতে চায় না। কিন্তু নবীনকুমার দুলালচন্দ্রের এই প্রার্থনা খারিজ করে দিল। দুলালকে সঙ্গে না পেলে তার চলবে না। তার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের আরও মাস চারেক দেরি, দুলাল অন্তত হরিদ্বার পর্যন্ত তো সঙ্গে চলুক, তারপর না হয় তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

গঙ্গানারায়ণ শুধু একবার নবীনকুমারকে বললো, ছোট্কু, তুই যাওয়ার আগে একবার জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে দেকা করে যাবি না? মা নিশ্চয়ই জ্যাঠাবাবুর কতা জিজ্ঞেস করবেন।

অতি বাধ্য বালকের মতন নবীনকুমার বললো, হ্যাঁ, যাবো! এক সময় সে শপথ করেছিল, আর কোনো দিন সে ও গৃহে প্রবেশ করবে না। এখন সে কথা তার মনে পড়লো না। গেলও সে পরদিন সকালে। বিধুশেখর তখন পূজার কক্ষে ঢুকেছেন, অন্তত একটি ঘণ্টা তো সেখানে কাটাবেনই। অতক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই নবীনকুমারের, আবার পরে আসবো বলে সে বিদায় নিল নিচের তলা থেকেই। আর আসা হলো না। দেখাও হলো না।

তিনখানি বজরা ও পিনিসের বহর নিয়ে শুভ লগ্নে যাত্রা করলো নবীনকুমার। কলকাতা ত্যাগ করার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে যেন সত্যই পল্লী প্রকৃতির শোভা দর্শন ও মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য তৃষ্ণার্ত। একটি ব্যাপারে দুলালও খুব বিস্মিত। এতদিনের জন্য যাত্রা, অথচ ছোটবাবুর বজরায় একটিও সুরার বোতল নেওয়া হয়নি। যেভাবে ছোটবাবু পতিতালয়গুলিতে সন্ধ্যাযাপন করতে শুরু করেছিলেন, তাতে দুলালের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ছোটবাবুর এই বিদেশ যাত্রা শহরের অন্যান্য বড় মানুষের সন্তানদের মতন প্রমোদ ভ্রমণ ছাড়া

আর কিছুই নয়। নারী-সুরা ও নৃত্য-গীতই চলবে। সেই কারণেই দুলালের এত অনিচ্ছা ছিল এই ভ্রমণের সঙ্গী হওয়ার। অথচ সে সব কিছুই নেই!

নবীনকুমার কলকাতা পরিত্যাগ করার পক্ষকাল পরে একদিন এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালো সিংহ সদনের দ্বারে। সে গঙ্গানারায়ণ সিংহ কিংবা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাৎ প্রার্থী। গঙ্গানারায়ণও তখন গৃহে ছিল না। সন্ন্যাসী ঠায় এক বেলা দাঁড়িয়ে রইলো দ্বারের বাইরে। ভৃত্য ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিশেষ অনুরোধেও সে ভিতরে এসে বসলো না, কারণ সে কোনো গৃহস্থ বাড়িতে পদার্পণ করে না।

সন্ধ্যাকালে গঙ্গানারায়ণ প্রত্যাবর্তন করার পর সন্ন্যাসী তার হাতে একটি পুঁটুলি দিয়ে দুর্বোধ্য হিন্দীতে জানালো যে রামকমল সিংহের পুত্রের হাতে ঐটি তুলে দেবার জন্যই সে তার গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে হরিদ্বার থেকে কলকাতায় এসেছে। আজ রাত্রেই সে আবার ফিরে যাবে।

পুঁটুলির মধ্যে রয়েছে একখানি নামাবলী, একখানি রুদ্রাক্ষের মালা এবং একটি অঙ্গুরীয়। এই গুলিই বিম্ববতীর শেষ চিহ্ন। প্রায় দু' মাস কাল আগে বিম্ববতী এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন।
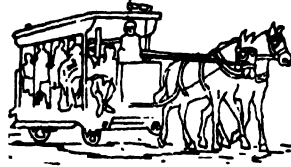
গঙ্গানারায়ণের প্রথমেই মনে হলো ছোট্‌কুকে খবর দিতে হবে!

নবীনকুমার ঠিক কোন্ পথে এবং কতদিন সময় নিয়ে হরিদ্বার পৌঁছোবে, সে কথা সবিস্তারে জানিয়ে যায় নি। তবে মোটামুটি এই প্রকার ঠিক আছে যে, প্রথমে সে নৌকাযোগেই কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে, তারপর সেখান থেকে স্থলপথে অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করবে। এর মধ্যে সে কত দূরের পথ পার হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

এখন রেলপথে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, কিন্তু ভদ্র-সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ সহসা রেলওয়ে ক্যারেজে উঠতে চান না। শৌখিন, আরামদায়ক প্রথম শ্রেণীর কামরা দখল করে থাকে সাহেবরা, আর অন্যান্য কামরাগুলিতে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা। তা ছাড়া নবীনকুমার ধীরে সুস্থে দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত জননীর কাছে পৌঁছোবে, এই রকম বাসনা প্রকাশ করে গিয়েছিল।

দিবাকর এখন বাতে প্রায় পঙ্গু, নকুড় আর দুর্যোধন নামে দুজন এখন গোমস্তার কাজ চালায়। এদের মধ্যে দুর্যোধন খুব কারিৎকর্মা। একবার গঙ্গানারায়ণ ভেবেছিল, সে নিজেই যাবে। প্রবাসে অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে যদি ছোট্‌কু একেবারে ভেঙে পড়ে! তারই উচিত স্বয়ং গিয়ে ছোট্‌কুকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সব কিছু অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে তার পক্ষে হঠাৎ চলে যাওয়া সম্ভব নয়, ব্যবস্থা করতে দু'চারদিন সময় লাগবে। অথচ নবীনকুমারকে সংবাদ পাঠাতেও দেরি করা আর কোনোক্রমেই উচিত নয়।

সন্ন্যাসীটিকে কোনোক্রমেই আতিথ্য গ্রহণে সম্মত করাতে না পেরে গঙ্গানারায়ণ চলে এলো অন্দর মহলে। কুসুমকুমারী কুরুস কাঠি দিয়ে টেবিল-ঢাকা

জন্য নকশা বুনছিল. স্বামীর পদশব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল। গঙ্গানারায়ণের মুখ দর্শন করেই কুসুমকুমারী অমঙ্গল অনুভব করল. হাতের জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দ্রুত পদে কাছে এগিয়ে আসতেই গঙ্গানারায়ণ কম্পিত কণ্ঠে বললো, কুসুম, মা আর নেই!

শুধু শোক নয়, তার চেয়েও বেশী অনুতাপানলেই যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে গঙ্গানারায়ণের হৃদয়। বহুকাল সে বিম্ববতীকে দেখেনি। ভাব-বৈকল্যে দেশান্তরী হবার পর থেকেই তো আর সে দেখেনি জননীর মুখ। কলকাতায় পুনরায় ফিরে বিবাহ-টিবাহ করে থিতু হয়ে বসবার পর সে কতবার ভেবেছে না হরিদ্বারে গিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসবে? যাওয়া যে হয়নি, সে জন্য তার কর্মব্যস্ততাই শুধু দায়ী নয়, তার মনে কি একটা অপরাধবোধও সুপ্ত ছিল না? সে জানে, সে যে বিধবা বিবাহ করেছে তা বিম্ববতী কখনোই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারবেন না। তার বিবাহ হয়েছিল অনেকটা হুড়োহুড়ি করে, জননীর সম্মতি চাওয়ার সময় ছিল না, সে প্রশ্নও ওঠেনি। পরে অবশ্য গঙ্গানারায়ণ দীর্ঘ পত্র লিখেছিল। বিম্ববতীর অক্ষরজ্ঞান নেই, অপরের দ্বারা লিখিত একাধিক পত্র তিনি এর মধ্যে যদিও পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেই সব পত্রও তাঁর ব-কলমে নয়। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষভাবে কারুকে সম্বোধন করেন নি, তাঁর হয়ে অন্য কেউ কুশল সংবাদ জানিয়েছে। কোনো পত্রেই গঙ্গানারায়ণের বিবাহের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বাড়ি থেকে একাধিকবার লোক প্রেরণ করা হয়েছে বিম্ববতীকে দেখে আসবার জন্য, একবারও কারুর হাত দিয়ে বিম্ববতী সামান্যতম কোনো উপহারও প্রেরণ করেন নি তাঁর পুত্রবধূদের জন্য। এ জন্য গঙ্গানারায়ণের মনের মধ্যে একটি কাঁটা বিঁধে ছিল।

কুসুমকুমারী অবশ্য এই অপরাধবোধ কিংবা গ্লানি থেকে মুক্ত। সে যে এক সময় বিধবা ছিল এই স্মৃতিই যেন মুছে গেছে তার মানসপট থেকে। যেন গঙ্গা-নারায়ণের সঙ্গে মিলনই তার পক্ষে বিধির নির্বন্ধ ছিল। বধূ হিসেবে না হলেও এ বাড়িতে কুসুমকুমারী আগে যে কয়েকবার এসেছে তখন বিম্ববতীকে দেখেছে এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক সাদর সম্ভাষণ পেয়েছে। বিম্ববতী তার চোখে স্বর্গের দেবীর তুল্যা। সুতরাং, এই দুঃসংবাদ শোনা মাত্র কুসুমকুমারীর দুই চক্ষে অশ্রু উদ্‌গত হল।

স্বামী স্ত্রী দুজনে বসে কাঁদলো কিছুক্ষণ।

গঙ্গানারায়ণই সামলে নিল প্রথমে। পরিবারের কর্তার পক্ষে এমন ভেঙে পড়লে চলে না। এখন অনেক কাজ বাকি।

বিধুশেখরকে এই সংবাদ জানাতে হবে। সে ব্যাপারেও গঙ্গানারায়ণের ভয়। সে নিজের মুখে কী করে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ দেবে সেই বৃদ্ধকে! আবার কোনো কর্মচারী মারফতও এমন খবর পাঠানো শোভা পায় না!

সেই রাত্রেই গঙ্গানারায়ণ গেল ও বাড়িতে। যদি বিধুশেখর এর মধ্যে নিদ্রা গিয়ে থাকেন, তা হলে এক পক্ষে গঙ্গানারায়ণের পক্ষে ভালোই। কিন্তু বিধুশেখর জেগেই আছেন। প্রথমেই বিধুশেখরের সঙ্গে দেখা না করে গঙ্গানারায়ণ খোঁজ করলো সুহাসিনীর।

সুহাসিনীর পুত্র প্রাণগোপাল এখন সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করেছে, সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসিকা। ঐ বয়েসের নবীনকুমারের সঙ্গে তার মুখের কিছুটা সাদৃশ্য আছে এমন হঠাৎ মনে হয়। তবে ছেলেটি নবীনকুমারের

তুলনায় অতিশয় লাজুক। সে এখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়ে। এই প্রাণ-গোপালের সঙ্গেই প্রথম দেখা হল গঙ্গানারায়ণের। একে জানিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই গঙ্গানারায়ণ প্রাণগোপালকে দিয়েই ডেকে পাঠালো সুহাসিনীকে।

গঙ্গানারায়ণ এ গৃহে কচিৎ-কদাচিৎ আসে। সেই বড় ঝড়ের পর এই আর এক-বার। নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর ব্যাপার। সে প্রায় ছুটে এসে ভয়-চকিত নেত্রে প্রশ্ন করলো, কী, গঙ্গাদাদা? কী হয়েচে? কর্তামা'র কোনো চিটি পেয়েচো? তিনি ভালো আচেন তো?

পুরুষের তুলনায় নারীর বোধ-অনুভূতি হয় অনেক বেশী তীক্ষ্ন, অথবা ভিন্নপথে চলে। সুহাসিনী এমন সঠিক অনুমান করলো কী করে? সন্ন্যাসীটিকে দেখেও তো গঙ্গানারায়ণের এরকম কিছু মনে আসে নি।

চক্ষে আঁচল চাপা দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো সুহাসিনী। গঙ্গানারায়ণ কিছু-ক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, সুষি, ওঠ। কাজের কতা আচে। শান্ত হ', বোনটি!

সুহাসিনী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, এ পৃথিবীতে...কত পাপী-তাপী... কত পাষণ্ড-কুষণ্ড বেঁচে থাকে...আর কর্তামা...অমন সতী সাধ্বী...অত দয়া-মায়া... তিনি রইলেন না...গঙ্গাদাদা, তিনি যে আমাদের মায়ের চেয়েও বেশী আপন ছিলেন গো...

আরও একটু পরে গঙ্গানারায়ণ জিজ্ঞেস করলো, সুষি, তুই একটা পরামর্শ দে তো! কী করে বড়বাবুর কাচে কতাটা ভাঙি? তাঁর শরীরগতিক ভালো নয়, এত বড় একটা আঘাত যদি পান...আবার তাঁর কাছ থেকে গোপন করেও রাখা যায় না...কোনো এক সময় তাঁর কানে ঠিক উঠবেই।

ঠিক ন'টার তোপ পড়লে বিধুশেখর দ্বিতলেরই এক কক্ষে রাত্রির আহার গ্রহণ করতে আসবেন। তার আগে কি তাঁকে এই সংবাদ দেওয়া উচিত হবে? তাঁর আহার মানে তো রোগীর পথ্য, তা বাদ দেওয়া তাঁর শরীরের পক্ষে আরও অনিষ্টকর। সুতরাং, গঙ্গানারায়ণ অপেক্ষা করাই মনস্থ করলো।

কিন্তু কার্যকারণের যোগাযোগ সব সময় মানুষের হিসেব মতন হয় না। বিধুশেখর নিজের ঘরের জানালা দিয়ে একটু আগে গঙ্গানারায়ণকে তাঁর বাগানের মধ্যেকার সুরকিঢালা পথ দিয়ে আসতে দেখেছেন। গঙ্গানারায়ণ স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বিস্মিত হন, এ বাড়িতে এসেও কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ তাঁর দর্শনপ্রার্থী হলো না, এটা আরও আশ্চর্যের কথা। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

কেল্লা থেকে পর পর ন'বার তোপ্ দাগার শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের বারান্দায় শোনা গেল বিধুশেখরের খড়ম ও লাঠির যুগপৎ ঠকঠক শব্দ। বিধুশেখর খাবারের ঘরে আসছেন। সুহাসিনীই তাঁর পরিচর্যা করে। সে দ্বারের কাছে প্রস্তুত হয়েই ছিল, পিতার হাত ধরে মেঝেতে পাতা পশমের আসনে বসিয়ে দিল। খাড়া অবস্থা থেকে নিচে মাটিতে বসতে বিধুশেখরের প্রয়োজন হয় অপরের সাহায্যের। শ্বেত পাথরের গেলাস থেকে একটু জল হাতে ঢেলে নিয়ে

বিধুশেখর প্রথমে পঞ্চ দেবতাকে অন্ন নিবেদন করে আচমন করলেন। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, সুষি, ও বাড়ি থেকে গঙ্গা এয়েচে দেকলুম যেন!

বিধুশেখরের সামনে মিথ্যে বলবে এমন সাধ্য কার! সুহাসিনী ধরা গলা কোনো-ক্রমে সংযত করে বললো, হ্যাঁ, গঙ্গাদাদা এয়েচে!

বিধুশেখর কনিষ্ঠা কন্যার দিকে তাঁর এক চক্ষু স্থির রেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই রাতে কেন এসেচে সে?

—কী জানি! আপনার সঙ্গে কোন জরুরি কাজের কতা আচে।

—ডাক তাকে এখেনে!

—বাবা, আপনি আগে খেয়ে নিন বরং...গঙ্গাদাদা বলেচে, এমন কিছু তাড়া নেই—

বিধুশেখর গলা চড়িয়ে বললেন, ওরে, কে আচিস? ও বাড়ির গঙ্গাবাবু কোতায় বসে আচে দ্যাক। তাকে খপর দে, বল্, আমি এখেনে ডাকচি!

গঙ্গানারায়ণ মাত্র দু'খানি ঘর পরে প্রাণগোপালের পাঠকক্ষে অপেক্ষারত ছিল। ডাক শুনে তাকে আসতেই হলো।

বিধুশেখর ঘাড় ঘুরিয়ে গঙ্গানারায়ণের আপাদ-মস্তক দেখলেন একবার। গঙ্গানারায়ণ দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। বাল্যকাল থেকেই এ গৃহে তার অবারিত দ্বার। তবু যেন কোনো সংস্কার বশে সে জানে যে একমাত্র ঠাকুরঘরে এবং কেউ রন্ধন করা অন্ন গ্রহণ করার সময় তখন সে ঘরে তার প্রবেশ করতে নেই। কারণ, যত আত্মীয়তাই থাকুক, এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি।

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, কে মারা গ্যাচে?

গঙ্গানারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু সুহাসিনী আবার কান্না শুরু করতেই সব বোঝা গেল।

গঙ্গানারায়ণ সবিস্ময়ে দেখলো, বিধুশেখর একেবারেই বিচলিত হলেন না। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি যেন উদাসীন হয়ে পড়েছেন একেবারে। সামনের একটি ছোট বাটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, হরিদ্বার থেকে পত্তর এসেচে?

এবার সন্ন্যাসী সংক্রান্ত বৃত্তান্তটি গঙ্গানারায়ণ বিবৃত করলো।

বিধুশেখর বললেন, তা, যা হয়েচে, ভালোই তো হয়েচে। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন স্বেচ্ছায়, তারপর আর বেঁচে থাকা না থাকা ও একই কতা! তিনি পুণ্যবতী, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ঠাঁই চেয়েছিলেন, এখন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হলেন...এই শোকতাপের পৃথিবীতে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ...এখানে থাকলেও নানারকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেকে দুঃখ পেতেন...

গঙ্গানারায়ণের কর্ণকুহরে এসব কথা যেন প্রবেশ করছেই না। দু' এক বৎসর পর বিধুশেখরকে দেখে তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধুশেখর যেন শেষ বয়সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। একটি চক্ষু অবশ্য চিরতরে গেছে, বাঁ পা-টিও অবশ, কিন্তু আগেকার মতন জড়ভরত ভাবটি নেই, কণ্ঠস্বরও বেশ সুস্থ মানুষের মতন পরিষ্কার।

তাঁর সামনের খাদ্য দেখেও গঙ্গানারায়ণের চক্ষু কপালে ওঠার উপক্রম। বড় একটি থালার মাঝখানে যুঁই ফুল রঙের কিছুটা ভাত এবং সেই থালা ঘিরে

অবিকল যোড়শ ব্যঞ্জন যাকে বলে। এমনকি এই শোকের অবস্থাতেও গঙ্গানারায়ণ গুণে দেখলো, ঠিক ষোলোটি বাটিতেই নানা রকম রান্না সাজানো। তবে যে সুহাসিনী বলেছিল, উনি রাত্রে নিছক রোগীর পথ্য খান!

সুহাসিনী অবশ্য মিথ্যে বলে নি, রাত্রে বিধুশেখর শুধু একটুখানি নুন-চিনি ছাড়া সাদা ছানা এবং এক টুকরো মাগুর মাছ খান। সম্পূর্ণ তণ্ডুল-বর্জিত খাদ্য খেয়েই তিনি বহুমূত্র রোগ থেকে কিছুটা নিরাময় হয়েছেন। শুধু চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি মাঝে মাঝে খান তাঁর অতি প্রিয় মুসুর ডাল ছোট এক বাটি ভর্তি। অতুল সম্পদের অধিকারী বিধুভূষণ মুখুজ্যের নিজের আহার্যের জন্য দু' বেলার ব্যয় দু' আনাও নয়। তবে সম্প্রতি এই একটি নতুন বাতিক হয়েছে তাঁর। তিনি নিজে খান বা না খান প্রতিদিন দু' বেলা এরকম ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিতে হবে তাঁর সামনে। বড় গলদা চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা কিংবা আলু পোস্তের তরকারি ভক্ষণ তাঁর বাকি সারা জীবনের মতন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলো রোজ অন্তত একবার করে দেখতে দোষ কী! আর ঘ্রাণে অর্ধভোজনও চিকিৎসাশাস্ত্রে নিষেধ করে না। বিধুশেখর কোনোদিনই খুব একটা ভোজনরসিক ছিলেন না, ইদানীং তিনি উত্তম উত্তম খাদ্যের দৃষ্টিলোভী বা ঘ্রাণ-লোভী হয়েছেন। অথবা, তিনি হয়তো নিশ্চিন্ত হতে চান যে তাঁর আত্মীয় পরিজনরা অন্তত দু'বেলা এগুলি খেতে পাবে।

ডালের বাটিটি এক চুমুকে শেষ করে বিধুশেখর বললেন, শুনে যা বুঝচি, প্রায় মাস দু'এক আগেই তোমাদের মাতা-ঠাকুরাণীর মৃত্যু ঘটে গ্যাচে। তবে আর বিলম্বে কাজ নেই, তোমরা দু'ভায়ে মিলে কাল-পরশুর মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে ফেল। বেশী ঘটা করারও প্রয়োজন নেই কো, তিনি সন্ন্যাসিনী হয়েছেলেন, ওঁদের শ্রাদ্ধ নিয়ে বেশী ঘটা পেটা করা শোভন হয় না। পুরুত ঠাকুরদের ডাকাও, যেটুকু না করলে নয়...তবে পিণ্ডদান যেন শুধু ছোটকুই করে, তোমার আর করবার দরকার হবে না—।

নবীনকুমার শহরে উপস্থিত নেই শুনে বিধুশেখর খাওয়া বন্ধ করে ফের মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন, অ্যাঁ? সে এখেনে নেই মানে? কোতায় গ্যাচে?

বিম্ববতীর মৃত্যু সংবাদের চেয়েও যেন নবীনকুমারের অনুপস্থিতির সংবাদ বিধুশেখরকে অনেক বেশী বিচলিত করে। তিনি বারবার নবীনকুমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন। তারপর নৈরাশ্যের সুরে বললেন, সে গেল, একবার আমার সঙ্গে দ্যাকা পর্যন্ত করে গেল না?

—সে আসেনি? সে যে বলেছেল, যাবার আগে আপনাকে প্রণাম করে যাবে?

—নাঃ! ছোটকু আমার কাচে আসে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, সুষি, আজ চিঁড়ের পায়েস করিস নি? দে, আজ একটু পায়েস খাই, মুখটা তেতো তেতো লাগচে...।

অতঃপর নকুড় আর দুর্যোধনকেই পাঠানো হলো কিছু লোকজন সঙ্গে দিয়ে। যেমন করে পারে, তারা যেন নবীনকুমারকে ভারতের যে কোনো অঞ্চলে খুঁজে বার করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

গঙ্গানারায়ণ সংক্ষিপ্তভাবে বিম্ববতীর শ্রাদ্ধ সেরে নিল নিজে একাই। বিধু-শেখর যা-ই ইঙ্গিত করে থাকুন না কেন, বিম্ববতীকে সে নিজের জননীই মনে

করে থাকে। পিণ্ডদান বিষয়ে অবশ্য তার নিজেরও কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যভুক্ত হয়নি বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গুপ্ত ব্রাহ্ম, বারাণসীতে প্রবেশের পূর্বে সে নিজেই নিজেকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, তার থেকে সে আর সরে আসেনি। শ্রাদ্ধের সময় নারায়ণ শিলার পূজা কিংবা পিণ্ডদানে সে বিশ্বাসী নয়।

দুই গোমস্তা ছোটকুকে সঙ্গে নিয়ে কিংবা তার সংবাদ বহন করে এক সপ্তাহের মধ্যেও ফিরলো না। গঙ্গানারায়ণ প্রতিদিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে। তার প্রবল ইচ্ছা জেগেছে তারা দুই ভাই কাছাকাছি বসে অনেকক্ষণ ধরে তাদের মায়ের সম্পর্কে কথা বলবে। বিম্ববতী আর নেই বলেই গঙ্গানারায়ণের মনে আসছে তাঁর সম্পর্কে অসংখ্য স্মৃতি।

শ্রাদ্ধের সময় গঙ্গানারায়ণের আরও একটা কথা বার বার মনে আসছিল, এই সিংহ পরিবারে একটা পর্বের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে গেল। বিম্ববতী এত বছর অনেক দূরে রইলেও এ গৃহ থেকে তাঁর অস্তিত্ব মুছে যায় নি। দাস-দাসী-কর্মচারীরা বলতো, ওটা কর্তামা'র ঘর, ওটা কর্তামা'র স্নানের পাল্কী, খাঁচা-বন্দী পাখিগুলি ছিল কর্তামার পাখি, এ ছাড়া বিম্ববতীর নামে এস্টেটের পৃথক তহবিল, পৃথক সম্পত্তি আরও কত কিছু। এখন তার সব শেষ। বিম্ববতীর দেওয়া ওকালতিনামার জোরে গঙ্গানারায়ণ এতকাল তাঁর সব কিছুর তদারকি করতে পেরেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সব কিছুর মালিকানা নবীনকুমারের ওপরেই বর্তাবে।

বিধুশেখর নিজে একদিন এসে সে কথা গঙ্গানারায়ণকে জানিয়েও দিয়ে গেলেন। নবীনকুমার ফিরে আসার আগে বিম্ববতীর সম্পত্তির অংশ যেমন আছে তেমনই থাকবে।

গঙ্গানারায়ণের বিষণ্ণতার ভার বেশ কয়েকদিনেও কাটলো না। হৌসে বেরুতে ইচ্ছে করে না। নেহাত যেটুকু কাজ না করলে নয়, তা সেরে দিয়ে সে বইপত্র পাঠ করে মন ফেরাতে চায়। মা ও বাবা দু'জনেই চলে যাবার পর একটা বিরাট শূন্যতার ভাব আসে। কিন্তু তা যে এতখানি শূন্যতা, তা গঙ্গানারায়ণ আগে জানবেই বা কী করে!

রাত্রিবেলা ছাদে পায়চারি করতে করতে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে গঙ্গানারায়ণ চেয়ে থাকে। শিশুদের মতন তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে আকাশে একটি নতুন নক্ষত্র উঠেছে, সেই নক্ষত্রটি বিশেষ আলো ফেলে চেয়ে আছে তার দিকে। পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে বিম্ববতীই যেন তার জননী হন আবার! পরজন্ম...? কে যেন বলেছিল পরজন্মের কথা?

কাশীর গঙ্গায়, নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বিন্দুবাসিনী বলেছিল, আবার পরজন্মে...। গঙ্গানারায়ণের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। কয়েকদিন আগে বিধুশেখরদের গৃহে গিয়ে তার একবারও মনে পড়েনি বিন্দুবাসিনীর কথা। আশ্চর্য! মানুষের মন এমনও হয়!

—আপনি এমন হিমের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন!

গঙ্গানারায়ণ চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। কুসুমকুমারী তাকে ডাকতে এসেছে। কুসুমকুমারীর মুখখানির চার পাশে যেন আভা ফুটে আছে, এমনই সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও রোধ করলো গঙ্গানারায়ণ। পরজন্ম না ছাই! ওসব কিছুই নেই। বিন্দুবাসিনী এ জন্মে কিছুই পেল না, শুধু লাঞ্ছনা আর বেদনা নিয়ে চলে গেল। অথচ সে তো কুসুমকুমারীকে পেয়েছে। সে স্বার্থপর!

এর কয়েকদিন পর একটি চমকপ্রদ রোমহর্ষক সংবাদে কেঁপে উঠলো সারা শহর। সব সংবাদপত্রগুলি হুলস্থূল করতে লাগলো এই ব্যাপার নিয়ে। এক অত্যন্ত ধনী পরিবারের কুলবধূ তার স্বামীকে স্বহস্তে খুন করে রক্তাক্ত খড়্গ হাতে চামুণ্ডার মতন বেশে পথে নেমে এসে বলেছে, হ্যাঁ, আমি আমার স্বামীকে খুন করিচি! বেশ করিচি!

সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে রটে আরও বেশী। কেউ বললো, সেই খড়্গধারিণীকে ধরতে গিয়ে দু'জন সেপাই জখম হয়েছে। কেউ বললো, না, না, সে তো স্বেচ্ছায় গিয়ে গারদে ঢুকেচে। কেউ বললো, নন্দকুমারের যেমন ফাঁসী হয়েছেল, এবার এক হিন্দু ঘরের বউকে গড়ের ময়দানে সর্বসমক্ষে ফাঁসীতে লটকাবে ইংরেজ সরকার বাহাদুর। কেউ বললো, না, না, সে বেটী আদালতে ডাঁড়িয়ে নিজেই নিজের সওয়াল করেচে আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেচে, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সে নিজের হাতে তার স্বামীকে নিধন করেচে। যে আদালত তার পাপিষ্ঠ-নরাধম স্বামীকে শাস্তি দিতে পারেনি, সে আদালত কোন্ এক্তিয়ারে তার মতন নির্যাতিতা রমণীকে শাস্তি দিতে আসে! কেউ বললো, না গো না, কোর্টে কোনো মেয়েমানুষের কতা কইবার এক্তার নেই, ব্যারিস্টার এম এস্ ডাট্, তার মানে সেই যে আমাদের মেঘনাদের কবি শ্রীমধুসূদন গো, তিনিই ঐ খুনে মেয়ের হয়ে সওয়াল করবেন। কেউ বললে, মেয়েমানুষের এত বাড়, হিন্দু ধর্ম এবার রসাতলে গেল। কেউ বললে, মেয়েমানুষ যদি এমন-ভাবে কুলাঙ্গার পতির বিনাশ করতে পারে, তবে বুঝতে হবে দেশটা একটু নড়াচড়া দিয়ে উঠচে।

সংবাদের মধ্যে সত্যতা শুধু এইটুকুই যে হাটখোলার প্রখ্যাত ধনী মল্লিক পরিবারের এক বধূ, তার নাম দুর্গামণি, তার লম্পট দুশ্চরিত্র স্বামী চণ্ডিকা-প্রসাদের গলায় এক রাতে ক্রোধের বশে ছুরি বসিয়ে তারপব নিজেও আত্মঘাতিনী হতে গিয়েছিল। কিন্তু সে পুলিস হেফাজতে এখনও বেঁচে আছে।

এ খবর কুসুমকুমারী শোনা মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল গঙ্গানারায়ণের পায়ের কাছে।

যদুপতি গাঙ্গুলীর মনে একেবারেই সুস্থিরতা নেই। অন্নচিন্তা এমনই চমৎকার যে ঈশ্বরচিন্তায় পর্যন্ত মন বসে না। গ্রাম থেকে তার তিনটি বেকার ভাগিনেয় এসে তার ঘাড়ের ওপর আছে। ভাগিনেয় তিনটির কোনো কাজকর্মের সুরাহা করা যায় নি এখনো, দু'বেলা গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দায়। উপরন্তু গ্রাম থেকে বিধবা দিদি বারংবার চিঠি লিখে শাসাচ্ছেন যে তিনিও কলকাতায় এসে ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকতে চান। গ্রামে গ্রামে এখন হাহাকার। উড়িষ্যায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, বাংলার গ্রামেও খাদ্য নেই। যা কিছু লভ্য খাদ্যবস্তু ব্যবসায়ী-দের কেরামতিতে কলকাতা এবং অন্য বড় শহরগুলিতে এসে জমছে, যেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আছে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণতি সুবে বাংলার

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শহরে শুধু খাদ্যবস্তুই পাচার হয়ে আসছে না, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসছে দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষ। সর্বত্র জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেই সব নিম্নবিত্ত মানুষের দল, যারা সমাজে ভদ্রলোক নামে পরিচিত। তারা পোশাক-পাদুকা পরিধান না করে পথে বেরুতে পারে না, সম্পূর্ণ অভুক্ত থাকলেও লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে পারে না। তাদের এখন পেটে কিল মেরে পড়ে থাকার মতন অবস্থা। আবার এই ভদ্র সমাজেরই উঁচু তলার বিত্তবান মানুষেরা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, তাদের মধ্যে নাচ-গান-ফুর্তি, ধর্মসভা, বক্তৃতাসভা, দোল-দুর্গোৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধের মচ্ছব দিব্য চলছে।

ভাগ্নে তিনটির জন্য কোনো কর্মসংস্থান করতে না পারলেও যদুপতি নিজে সকালে-বিকেলে দু' জায়গায় দুটি ছাত্র পড়াবার কাজ জুটিয়েছে আবার। তাতে কোনোরকমে অনাহার থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। এইসব ছেড়ে ছুড়ে সে পুরো-পুরি ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ করবে ঠিক করেছিল, তা আর হলো কই! দ্বিতীয় বিবাহ না করলেও সংসার তাকে ছাড়লো না। সময়ের অভাব তো আছেই, তা ছাড়াও নানারকম দুশ্চিন্তায় সে ব্রহ্ম-উপাসনার সময় ঠিক মতন মনঃসংযোগ করতে পারে না। তাতে সে আরও অনুশোচনায় ভোগে। আর সবকিছু ছাড়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়া মোটেই সহজ নয়! যদুপতি মাঝে মাঝেই শোকাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভাবে, হায় আমার এ কী হলো! ক'টি অপোগণ্ড ভাগ্নের জন্য আমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলুম! অথচ, সমাজে বাস করে এদের পরিত্যাগ করাই বা যায় কী ভাবে!

একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে সাপ্তাহিক উপাসনার শেষে প্রিয়নাথ নামে এক সতীর্থ ব্রাহ্ম তাকে নিম্ন গলায় প্রশ্ন করলো, ভ্রাতঃ তুমি বঙ্কিম চাটুজ্যের নবেল-খানি পড়েছো নাকি?

যদুপতির মন অপ্রসন্ন হয়েই ছিল কারণ আজও উপাসনার মধ্যপথে দু'বার অর্থচিন্তা করেছে। সেইজন্য ঈষৎ বিরক্তভাবে সে বললো, কে বঙ্কিম চাটুজ্যে? তার নবেল আমি পড়তেই বা যাবো কেন?

প্রিয়নাথ বললো, বড় সরেশ লিখেছেন বইখানি। তুমি তো এক সময় কবিতা আদি রচনা করতে, সেই জন্যই ভাবলুম ও বই নিশ্চয়ই তুমি আগে ভাগেই পড়ে ফেলেছো। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করা যাবে।

যদুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললো, আর কবিতা! সে সব কবেই চুকে গিয়েছে।

কাব্যলক্ষ্মী স্বয়ং অন্তর্হিতা হয়েছেন না যদুপতি জোর করে তাঁকে নিজের মন থেকে বিদায় দিয়েছে, তা বলা যায় না। কুসুমকুমারীর বিবাহের আগে সে শেষ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিল। তারপর সে বিবাহ ঘটে যাবার পর যদুপতি নিজের যাবতীয় কাব্যকীর্তির পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

পাশে আর একজন যুবক বসেছিল। এই যুবকটিকে যদুপতি আগে কয়েক-বার দেখেছে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে, কেশব সেনের বাড়িতে এবং অন্যান্য আলোচনাসভায়। কিন্তু সে যে দীক্ষিত ব্রাহ্ম নয়, তা যদুপতি জানে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মতন পোশাক-আশাক। সেই যুবকটি ব্যগ্রভাবে বললেন, সে কি

মশায়, আপনি এখনো বঙ্কিমবাবুর লেখা পড়েন নি? আপনার কবিতা তো আমরা পড়েছি, আমার সহাধ্যায়ীরা বলাবলি করে যে যদুপতি গাঙ্গুলীর কবিতা অতি উচ্চ ভাবের।

যদুপতি বললো, আমা সদৃশ সামান্য ব্যক্তির কবিতাও আপনি পড়েছেন? এ যে বড় বিস্ময়ের কথা! আমাকে আপনি চেনেন, কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো জানা হলো না।

প্রিয়নাথ বললো, তুমি এ'কে চেনো না? ইনি তো সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগনে। এ'র নাম শিবনাথ—

যদুপতি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগ্নে আর তার নিজের ভাগ্নে—কত তফাত!

—এই শিবনাথও কবিতা লেখেন। সোমপ্রকাশে দ্যাকো নি? শিবনাথ আরও একটি কাণ্ড করেছিলেন...এক হিসেবে আমাদের শিবনাথ বিশ্বে অদ্বিতীয়, ইনি নিজের বউয়ের বিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিলেন—।

শিবনাথ বললো, আঃ প্রিয়বাবু, আপনি থামুন তো!

প্রিয়নাথ বললো, হ্যাঁ হে, যদুপতি, আমি ঠিকই বলছি। অল্প বয়েসে শিবনাথের পিতা ওঁর দু'বার বিবাহ দিয়েছিলেন...কিছুদিন আগে শিবনাথ উঠে পড়ে লেগেছিলেন, দ্বিতীয় পত্নীটির পুনর্বিবাহ দেবেন। ইনি বিদ্যাসাগরের এককাঠি বাড়া হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

শিবনাথ বললো, ওসব কথা ছাড়ুন তো। হচ্ছিল বঙ্কিম চাটুজ্যের কথা—প্রিয়বাবু, আপনি বঙ্কিমবাবুর কোন্ উপন্যাসটির কথা বলছেন?

—'কপালকুণ্ডলা'! আমি তো একটির কথাই জানি। আরও লিখেছেন নাকি?

—কেন, আপনি দুর্গেশনন্দিনী পড়েন নি! সে তো দু' তিন বছর আগেই বেরিয়ে গেছে। অহো, সে কি অপূর্ব ব্যাপার! আমি বলে দিচ্ছি শুনে রাখুন, আমাদের দত্ত কবির একজন সমকক্ষ লেখক এসে গেছেন!

—মাইকেল দত্ত তো বিলেত থেকে পাক্কা সাহেব হয়ে এসেছেন। আর কি তিনি বাংলা লিকবেন? এক দু' বছরে কিছুই তো লিখছেন না দেখি—খালি মদ ওড়াচ্ছেন।

—এখন তিনি ব্যারিস্টার, কত ব্যস্ত, সাহেব মহলে দহরম মহরম...তবে একটু থিতু হয়ে বসলে আবার লিখবেন নিশ্চয়।

যদুপতি বিস্মিত হয়ে শুনছিল। অনেক দিন সে এইসব ঘটনা থেকে বিযুক্ত, ঠিক খবর রাখে না। মেঘনাদবধ কাব্য প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন বিলাতফেরত হয়ে বাংলা লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। এই মাইকেলকে তারা নবীনকুমার সিংহের বাড়িতে সংবর্ধনা দিয়েছিল, মনে আছে সেই দিনটির কথা—।

শিবনাথ বললো, সংবাদ প্রভাকরে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর একটা সংবর্ধনা পত্র বেরিয়েছিল, আপনারা সেটাও দেখেন নি?

যদুপতি বললো, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী কিংবা মিরর-এ তো আমি এই বঙ্কিমবাবু বিষয়ে কিছু লেখা দেখিনি!

শিবনাথ বললো, রহস্য, সন্দর্ভ, সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়টে অনেক কথা লেখা হয়েছে। আমার মাতুল অবশ্য বঙ্কিমবাবুর লেখা তেমন পছন্দ করেন নি।

যদুপতি বললো, কে এই বঙ্কিমবাবু? কোনো অজ্ঞাতকুলশীল হঠাৎ উৎকৃষ্ট বই লিখে ফেললো? এর নিবাস কোথায়? কোথাকার চাটুজ্যে? পিতা কী করেন।

—বাঃ, মনে নেই এই বঙ্কিম চাটুজ্যের কথা? যেবার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পরীক্ষা নেওয়া হলো, তাতে দুজন মাত্র ছাত্র পাস করেছিল, বঙ্কিমবাবু ফার্স্ট হলেন, পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটির চাকরি—।

শিবনাথ বললো, ইনি একসময় সংবাদ প্রভাকরে কবিতাও লিখেছেন অনেক।

এবার ওঁদের কথায় বাধা দিয়ে যদুপতি বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ইনি কি সেই বঙ্কিম চাটুজ্যে যিনি 'ললিতা তথা মানস' নামে একখানি চটি কবিতা-পুস্তক ছাপিয়েছিলেন? সে বই আমি কিনেছিলুম এক কাপি, কিন্তু সে তো অনেককাল আগেকার কথা।

প্রিয়নাথ বললো, তুমি কিনেছিলে? তবে তো তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি। কৃষ্ণকমলের মুখে গল্প শুনলুম, ঐ কবিতা পুস্তক মাত্র ছ' কাপি বিক্রি হয়েছিল—তাই বঙ্কিমবাবু রাগ করে আট দশ বছর বাংলা লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শিবনাথ বললো, বঙ্কিমবাবু সম্পর্কে আমি আরও অনেক গল্প শুনেছি। ইনি নাকি চাকরিতে যাবার সময় খানিকটা গঙ্গাজল নিজের জননীর পায়ে ঠেকিয়ে একটা শিশিতে ভরে সঙ্গে নিয়ে যান। ওঁরা ভাটপাড়া-নৈহাটীর বামুন, খুব গোঁড়া হিন্দু মনে হয়। তবে যাই বলুন, রচনাশক্তি অসামান্য।

প্রিয়নাথ বললো, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ক্রিশ্চিয়ান আর এমন অপূর্ব বাংলা নবেলের লেখক গোঁড়া হিন্দু। আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ তেমন প্রতিভা দেখাতে পারেন না!

যদুপতি বললো, কেন, দেবেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে দ্বিজুবাবু বেশ লেখেন, সত্যেন্দ্রবাবুও ভালো গান রচনা করেছেন।

—রাখো তোমাদের দেবেন্দ্রবাবুর ছেলেদের কথা। ওসব শখের লেখায় কিছু হবে না...মন-প্রাণ ঢেলে দেওয়া যে রচনা, তা লিখেছেন এই বঙ্কিমবাবুই, অহো, 'কপালকুণ্ডলা' গদ্য তো নয়, যেন কাব্য! তবে বঙ্কিমবাবুর একটাই দোষ, রচনাটিতে কোনো উচ্চ ভাব নেই, বড় বেশী প্রণয়...দেশের মানুষের জন্য কোনো নীতি প্রচার করেন নি।

শিবনাথ বললো, দোষ কি মশাই, সেটাই তো গুণ। সেক্সপীয়ার-কালিদাস কোন্ নীতি প্রচার করেছেন?

যদুপতি ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এই বঙ্কিমবাবুটি যদি গোঁড়া হিন্দুই হবেন, তবে নিজের জননীকে দিয়ে এমন পাপটা করালেন? গঙ্গাজলে পা ছোঁয়ালেন? এ কেমনতর হিন্দু! ওঁদের কাছে গঙ্গাজলের স্থান তো মাথায়।

শিবনাথ বললো, ওসব যাই বলুন, বইখানি পড়লে একেবারে মোহিত হয়ে যাবেন।

যদুপতি বললো, নিছক প্রণয়ের গল্প পড়বার আমার সাধ নেই। আমি এখন মরছি অন্য জ্বালায়।

প্রিয়নাথ বললো, না হে, যদু, তুমি তবু একবার বইখানি পড়ো। চাও তো আমিই দিতে পারি। 'কপালকুণ্ডলা' আমার বাসাতেই আছে।

শিবনাথ বললো 'দুর্গেশনন্দিনী'ও আমি সংগ্রহ করে দিতে পারি।

যদুপতি ফস্ করে বলে ফেললো, পড়তে পারি বইখানি, যদি সেই সঙ্গে পাঁচটি টাকা ঋণ দাও। ঘরে এককণা চাল নেই, শূন্য উদরে কি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করা যায়?

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বললো, বা রে, বা, আমি কি বঙ্কিমবাবুর ফড়ে যে

জোর করে তাঁর বই লোকজনকে পড়াবো? সেজন্য আমায় অর্থ ব্যয় করতে হবে?
সে রাতে প্রিয়নাথের কাছ থেকে তিনটি টাকা এবং এক কপি 'কপালকুণ্ডলা' নিয়ে যদুপতি বাসায় ফিরলো। বাড়িতে মহাহাঙ্গামা, মধ্যম ভাগ্নে লাড্‌লীমোহন পল্লীর কয়েকটি দুর্বৃত্ত যুবকের সঙ্গে কোন্দল করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। এখন সে একটি দরজার খিল খুলে নিয়ে তা দিয়ে ফের সে মারামারি করতে যেতে চায়। অপর দুই ভাই তাকে জাপ্‌টে ধরে আছে।
সত্যিকারের ব্রাহ্মসুলভ সংযম ও স্থৈর্যের পরিচয় আর দিতে পারলো না যদুপতি. পা থেকে চটিজুতো খুলে লাডলীমোহনকে পেটালো কয়েকবার। বইখানা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। অতিরিক্ত ক্রোধের ফলে যদুপতির নিজের বুকের মধ্যেই ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল, অসুস্থ বোধ করে সে শুয়ে পড়লো শয্যায়। তখন তিন ভাগ্নে তার চৌকির পাশে বসে শুরু করে দিল মড়াকান্না। তাতে আর এক বিপদ। প্রতিবেশীরা না ছুটে আসে।
খানিকবাদে কিছুটা সুস্থ হয়ে যদুপতি উঠে বসে বললো, হতভাগারা, খেতে পাস না, তবু তোদের এত তেজ কিসে? কাল থেকে সকাল-সন্ধ্যা অন্তত আধঘণ্টা ধরে যদি প্রার্থনায় না বসিস, তবে তোদের খাওয়া বন্ধ।
ছোট ভাগ্নে ভুবনমোহন বলে উঠলো, মামা, আজ রাতে কী খাবো?
যদুপতি পকেট থেকে একটি টাকা বার করে বড়টিকে বললেন, যা, বাজার থেকে চাল আর ডাল নিয়ে আয়। যদি পাস তো খানিকটা মাছও আনিস। আর সেরখানেক আলু। আজ পেট পুরে খিচুড়ি খাবো। যা, ছুটে যা!
সব সরঞ্জাম যোগাড়ের পর খিচুড়ি রান্না শেষ করতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। তবে ভোজনটা হলো বেশ তৃপ্তিপূর্ণ। বড় ভাগ্নেটা কোনো বাড়িতে রসুই বামুনের কাজ নিলে পারতো, ওর রান্নার হাত ভালো। খিচুড়ি-আলুসেদ্ধ আর খলসে মাছ ভাজা। রান্না হয়েছিল এক হাঁড়ি। চারজনেও শেষ করতে পারলো না। লাডলীমোহন বললো, কাল আবার খাবো। বাসি খিচুড়ির সোয়াদ বেশী ভালো হয়।
একটি পান মুখে দিয়ে শুতে যাবার আগে যদুপতির মনে পড়লো বইটির কথা। সেখানা কোথায় গেল? ঐ বইয়ের লেখকের সুবাদেই তো আজ রাত্তিরে এমন খাওয়া-দাওয়া হলো। এখন বইটি অন্তত উল্টে পাল্টে দেখা দরকার।
তখন মনে পড়লো, ভাগ্নেকে প্রহার করবার সময় উঠোনে বইটি খসে পড়েছিল হাত থেকে। আর তোলা হয়নি। ভাগ্নেরাও উঠিয়ে রাখেনি। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে উঠোনের এককোণে বইটি পেয়ে গেল যদুপতি। সে নিজে যখন কাব্য রচনা করতো, তখন কোনো গ্রন্থের প্রতি এতখানি অবজ্ঞা প্রকাশ করা যদুপতির স্বপ্নাতীত ছিল। দিন-কাল কেমনভাবে বদলে গেছে!
শিয়রের কাছে সেজবাতি জেলে যদুপতি শুয়ে শুয়ে খুললো বইটির প্রথম পৃষ্ঠা। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম সাগর সঙ্গমে। তার নিচে শেক্সপীয়ারের 'কমেডি অব এররস থেকে একটি কোটেশান। তারপর শুরু: প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালে প্রথা ছিল...।
পাঠ করতে করতে যদুপতির ভ্রু কুঞ্চিত হলো। 'যাতায়াত'? এই লেখকটি বি এ পাশ যখন, তখন শিক্ষিতই বলা যায়, তবে যাতায়াত লেখে কেন? 'গমনাগমন' শব্দটি জানে না? যাতায়াত মুখে বলি বটে কিন্তু ভাষার শুদ্ধতার জন্য গমনাগমনই

লেখা সঙ্গত ছিল নয় কি?

যাই হোক, প্রিয়নাথ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগ্নে যখন অত উচ্চ প্রশংসা করলে, তখন আর একটুখানি পড়ে দেখা যাক।

...যুবা উত্তর করিলেন, 'আমি তো আগেই বলিয়াছি যে সমুদ্র দেখিবার বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।' পরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না...'

পরদিন সকালবেলাতেই যদুপতি প্রিয়নাথের গৃহে উপস্থিত। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল অবিন্যস্ত, শয়নের ধুতিটিও পরিবর্তন করেনি। প্রিয়নাথকে দেখামাত্র আলিঙ্গন করে সে তীব্র আবেগের সঙ্গে বললো, ভ্রাতঃ তুমি আমার এ কী করলে! কাল সারা রাত্র এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। কপালকুণ্ডলা আমি তিনবার পড়েছি, এখনও মনে হচ্ছে আবার পড়ি। আবার পড়ি। বাংলাভাষাতে এমন রচনা সম্ভব? ইচ্ছে হচ্ছে, বইখানি মাথায় নিয়ে নৃত্য করি!

প্রিয়নাথ বললো, আরে রও, রও, একেবারে যে পাগল হলে দেখছি। বলেছিলুম কিনা, বইটি ধরলে আর ছাড়তে পারবে না!

—কোথায় থাকেন এই বঙ্কিমবাবু? আমায় এক্ষুনি দেখিয়ে দাও, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নেবো!

তুমি ব্রাহ্ম হয়ে হিন্দুর পায়ের ধুলো নেবে? না হয় একখানা ভালো বই লিখেছেন...

—একখানা ভালো বই? এ লেখক বিশ্বজয় করতে এসেছেন। তুমি 'কপালকুণ্ডলা'র মতন গদ্যবাক্য ইংরেজী ভাষাতে কয়খানা আছে বলো দেখি। আমাদের বাংলাভাষার যে এমন ক্ষমতা কে জানতো? কোথায় থাকেন বঙ্কিমবাবু, আমি এখুনি তাঁর কাছে যাবো!

—কোথায় থাকেন তা তো জানি না। তবে কৃষ্ণকমলের কাছে শুনেছি, বঙ্কিমবাবু এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন।

—তার মানে? দশ বছর আগে তিনি বি এ পাস করে গেছেন। ডেপুটিগিরি করেন মফস্বলে, তিনি আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হন কীভাবে?

—অত উত্তেজিত হয়ো না, চুপ করে একটু বসো। ছাত্র হতে পারবেন না কেন? বি এ পাশ করবার সময় তিনি আইন পড়া শেষ করতে পারেন নি। ঝটিতি চাকরি পেয়ে গেছেন তো...তাই এখন আইন পড়াটা সম্পূর্ণ করে পরীক্ষা দিতে চান। সেই জন্য ক্লাস করছেন...তুমি তো কৃষ্ণকমল ভটচাজকে চেনো।

—খুব ভালোই চিনি। সে সন্ধান দিতে পারবে?

—হ্যাঁ। কৃষ্ণকমলও এখন আইনের ক্লাস করছে। উকিল হতে চায়। তার মুখেই আমি বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। কৃষ্ণকমল এখন বঙ্কিমবাবুর সহপাঠী।

যদুপতি তখনই ছুটে গেল কৃষ্ণকমলের কাছে। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে হলো না। কৃষ্ণকমল জানালো যে বঙ্কিম চাটুজ্যে অতি সুলেখক হলেও মানুষটি অতি গম্ভীর ও রাশভারি। অচেনা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাই বলতে চান না। কেউ উপযাচক হয়ে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি রীতিমতন বিরক্ত হন। সুতরাং যদুপতির পক্ষে এখনি বঙ্কিম চাটুজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না যাওয়াই ভালো। তাতে বরং প্রিয় লেখক সম্পর্কে আশাভঙ্গ ও স্বপ্নভঙ্গ হতে পারে।

যদুপতি তাতেও সম্পূর্ণ নিরস্ত হলো না। আলাপ না করলেও সাক্ষাৎ সে

একবার করবেই। অন্তত দূর থেকেও। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো তীর্থের কাকের মতন। এক সময় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস শেষ হতে ছাত্ররা বেরিয়ে এলো বাইরে। কৃষ্ণকমলের কাছ থেকে বঙ্কিমবাবুর চেহারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সে শুনে এসেছিল, সেই জন্য যদুপতির চিনতে দেরি হলো না। এ কেমন অদ্ভুত ছাত্র! চোগা-চাপকান পরিহিত শামলা আঁটা প্রকৃত ডেপুটির মতনই চেহারা, গম্ভীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন, এক আর্দালি তাঁর মাথার ওপর ছাতা ধরে চলেছে পেছনে পেছনে। যদুপতির চেয়ে বেশ ছোটই হবেন। বরং কৃষ্ণকমল-নবীনকুমারের সমবয়েসী বলে মনে হয়।

বঙ্কিম চাটুজ্যের ভাবভঙ্গি দেখে যদুপতি এগিয়ে গিয়ে কথা বলার সাহস পেল না। যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। উনি চোখের আড়াল হতেই যদুপতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো নিজের বাড়ির দিকে। তৎক্ষণাৎ আবার খুলে বসলো 'কপালকুণ্ডলা'।

...'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে। কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্র মর্মরিত হইতে লাগিল...।

পাঠ করতে করতে সত্যি সত্যিই বইখানা নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিল যদুপতি।
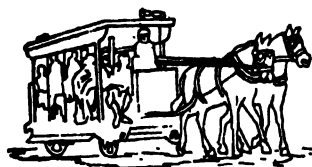
অতিশয় উৎফুল্ল চিত্ত নিয়ে নবীনকুমার প্রতিদিন ভোরে জেগে ওঠে। বস্তুত সন্ধ্যার একটু পরেই তার মনে হয়, কখন আবার প্রত্যুষ আসবে! রাত্রি তার পছন্দ হয় না, বিশেষত এখন অমাবস্যা, চতুর্দিকে দেখা যায় না কিছুই। শীতের ধারালো বাতাসের মধ্যে অন্ধকারে অন্ধের মতন বসে থাকতে কেনই বা তার ভালো লাগবে। সায়াহ্নের পর কিছুক্ষণ সে নিজের কামরায় বসে গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন থাকে। তারপর আহার সেরে নিয়ে সে শয্যাগ্রহণ করে।

ভোরগুলি সত্যিই বড় মনোরম।

ঘুম ভাঙা মাত্র নবীনকুমার উঠে চলে আসে গবাক্ষের কাছে। বাইরের দিকে তাকালে চক্ষু যেন জুড়িয়ে যায়। মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার ফলে তার শরীরে কোনো অবসাদ নেই. প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয়, মস্তিষ্ক যেন এই ধরণীর রূপ রস গন্ধ শুষে নেবার জন্য উন্মুখ। সব মানুষেরই শরীর এরূপ থাকে, নাকি যারা এক সময় নেশায় অসাড় হয়ে যেত, তারাই শুধু শরীরের এই অসাধারণ ধারণক্ষমতা টের পায়? নবীনকুমারের মনে হয়, সে যেন পুনর্জীবন পেয়েছে।

আগে মাত্র একবার নবীনকুমার নদীপথে পরিভ্রমণে এসেছে। সেবারে সে এসেছিল গুরুতর অসুস্থতার পর ভগ্ন শরীর নিয়ে, শ্রবণক্ষমতা প্রায় লুপ্ত ছিল। এবার, নবীনকুমার ভাবে, সে এসেছে তার অন্ধত্ব সারাতে। সত্যিই যেন সে নতুন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। এই জগৎ তার কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে নতুন

রূপে।

ব্যস্ততা কিছু নেই। নবীনকুমার মাতৃসন্দর্শনে চলেছে বটে, কিন্তু এই নদী-মেখলা সবুজ-শ্যামল ভূমিও যে তার মায়ের মতন, নবীনকুমার তা এই প্রথম অনুভব করছে। 'দেশ' নামক আদর্শটির কথা লেখা থাকে ইংরেজী বইতে। ভারতবর্ষে 'দেশ' শব্দটির ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ঐ আদর্শটি নেই। এখানে শুধু বিভিন্ন রাজা ও রাজত্ব। হিন্দু রাজত্ব, পাঠান রাজত্ব, মুঘল রাজত্ব, এখন যেমন ব্রিটিশ রাজত্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী আসে, রাজত্ব বদলায়, দেশ আপন মনে শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে শুধু পাশ ফেরে। দিগন্তবিস্তৃত শয়ান সেই দেশ নবীনকুমারের চক্ষে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভোর হতেই গায়ে একটি শাল জড়িয়ে নবীনকুমার বজরার ছাদে উঠে এসে একটি কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে। তখনও দাঁড়ী-মাঝিরা সকলে প্রস্তুত হয়নি। রাত্রে বজরার বহর বাঁধা থাকে কোনো ঘাটের কিনারে, সন্ধ্যায়-সকালে কাছাকাছি কোনো লোকালয় থেকে আনাজ-তৈজসপত্র সংগ্রহ করা হয়, তারপর রোদ চড়বার আগেই যাত্রা শুরু।

দুলাল এক ঘটি খেজুররস নিয়ে আসে। ক'দিন ধরে নবীনকুমার এই খেজুর-রসের জন্য লোভীর মতন অপেক্ষা করে থাকে। শ্বেতপাথরের গেলাসে ভরতি করে রস ঢেলে দেয় দুলাল, নবীনকুমার হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ করে দেয়। দুলাল জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আর একটু দিই? নবীনকুমার সাগ্রহে ঘাড় নাড়ে। পর পর তিন গেলাস পান করার পর তার অন্তঃকরণ পর্যন্ত জুড়িয়ে যায়।

খানিক পরে, বেলা বাড়লে দুলাল নিয়ে আসে দু-তিনটি ডাব।

নবীনকুমার এই আর একটি নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করেছে। সে যে আগে কখনো খেজুরের রস কিংবা ডাবের জল পান করেনি তা তো নয়। কিন্তু এই যাত্রায় এসে তার মনে হচ্ছে এমন সুন্দর পানীয় আর হয় না। কী আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রকৃতি গাছের ডগায় মানুষের জন্য এমন সুস্বাদু পানীয় রেখে দিয়েছেন। ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ মদ্য-ব্যবসায়ীও কি অবিকল এই পানীয় উৎপন্ন করতে পারবে?

একদিন দুলাল তীরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে সদ্য গাছ থেকে কাটা এক ছড়া মর্তমান কলা এনেছিল। কলাগুলোর ওপরে তখনো মিহিন সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে, সবগুলো পাকেনি, কয়েকটা ফেটে ফেটে গেছে। তার থেকে একটি কলা ছিঁড়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে এক কামড় দেওয়া মাত্র নবীনকুমার যেন দিব্য আনন্দ পেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়েছিল, মানুষের কোনো রন্ধনপ্রণালীই তো এমন অপূর্ব খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। একেবারে ঠিকঠাক মিষ্টি। একটু বেশীও নয়, কমও নয়, শক্তও নয়, নরমও নয়। মনে মনে নবীনকুমার ঘোষণা করেছিল, ঈশ্বর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনী। বিভিন্ন লঙ্কায় তিনি বিভিন্ন রকমের ঝাল দিয়ে রেখেছেন ; নিম পাতা, পলতা পাতা, তুলসী পাতায় তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন নানা রকমের স্বাদ, লেবুতে দিয়েছেন তিনি অম্ল রস, আম-কাঁঠালে মিষ্ট রস, আবার বেল কিংবা কালো জাম কিংবা হরীতকীতে এমন রস, যার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। এত বহু বিচিত্র রকমের রন্ধন আর কার পক্ষে সম্ভব?

তবে, এই বিরাট রন্ধনশালাটি কার, ঈশ্বরের না প্রকৃতির? এ নিয়ে মাঝে মাঝে নবীনকুমারের খটকা লাগে। তবে যাঁরই হোক, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না।

নবীনকুমারের মধ্যে আস্তিকতার গোঁড়ামি যেমন নেই, তেমন সে নাস্তিকতার বিদ্রোহী ধ্বজা তুলে ধরতে চায় না।

সবচেয়ে বড় কথা, ঈশ্বর বা প্রকৃতি যেই হোন, তাঁর সৃষ্টিশালায় রয়েছে কত রকম অপ্রয়োজনের সৌন্দর্য। যে সব ফুল থেকে কোনো দিন ফল হয় না, ফুটে আছে সেই রকম শত-সহস্র নয়ন-সুখ অপূর্ব সুশ্রী ফুল।

আগেরবার নবীনকুমার মানুষের কথার শব্দ শোনার জন্য ব্যগ্র অধীর হয়ে থাকতো, এবার যেন সে করছে নীরবতার সাধনা। দুলালের সঙ্গেই শুধু দু-চারটি বাক্যবিনিময় হয়, এ ছাড়া সারা দিনে সে পারতপক্ষে অপর কারু সঙ্গে কথা বলে না। এর মধ্যে একবারও সে তীরের কোনো লোকালয়ে যায় নি। দু-এক জায়গায় তাদের জমিদারির পাশ দিয়ে যেতে হয়েছে, সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে প্রজারা, কিন্তু নবীনকুমার বজরা থামাবার আদেশ দেয়নি। যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে ফেরার পথে সে জমিদারি পরিদর্শন করবে।

বজরার বহরে লোকজন অনেক রয়েছে বটে, তবু এর মাঝে থেকেও যে একাকিত্ব, তাতে বোধশক্তি সূচাগ্র হয়ে ওঠে। কল্পনা ও স্মৃতি মিলে-মিশে চক্ষের সম্মুখে অজস্র স্থাণু মুহূর্তের সৃষ্টি করে। এ অনুভূতি সব সময় সুখকর নয়। নদীর দু-পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে তার মধ্যে স্থাপিত হয়ে যায় এক একটি অন্য ছবি। রৌদ্র-ঝলমল বর্তমানের মধ্যে বসে থেকে নবীনকুমার বার বার ফিরে যায় তার ছায়াচ্ছন্ন অতীতে। নিজের জীবনের প্রাক্তন ঘটনাগুলিকে সে যাচাই করে, তাতে কষ্ট বাড়ে বই কমে না। স্লেটের লেখার মতন অতীতটাকে ভিজে ন্যাতা দিয়ে একেবারে মুছে ফেলা যায় না বলে সে মাঝে মাঝে নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়েও ওঠে।

দুটি নারীর মুখ বারবার ফিরে আসে তার মানসপটে। একজন নারীকে সে দেখেছে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য, চন্দ্রনাথের বাড়িতে, তাও সে বেশির ভাগ সময় অবগুণ্ঠিতাই ছিল। কেন সেই পথ থেকে কুড়িয়ে আনা রমণীকে মনে হলো অবিকল তার মায়ের মতন? নবীনকুমারের সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লেগেছিল। এমন অভিজ্ঞতা যার হয় নি সে এর মর্ম বুঝবে না। পরদিন সকালেই রমণীটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল বলেই তো নবীনকুমারের এতখানি যাতনা। যদি তার সঙ্গে আবার দেখা হতো, তার সঠিক পরিচয় জানতো, তা হলে এতদিনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যেত।

আর একটি মুখ, সে বড় গোপন, বিষম গোপন। সে মুখ নবীনকুমার কিছুতেই মনে আনতে চায় না। কিছুতেই না। যাতে মন থেকে একেবারে মুছে যায়, সেই জন্য নবীনকুমার তার সংস্রব এড়িয়ে চলে, দেখা হলে বাক্যবিনিময় পর্যন্ত করে না। তবু কেন কল্পনায় ফিরে আসে সেই মুখ!

মানুষের কি দুরকম চিন্তাশক্তি থাকে? নবীনকুমার প্রবল চিন্তাশক্তি দিয়ে যে মুখখানি ভুলে যেতে চায় তবু সেই মুখ কেন ফিরে আসে? এ তবে কার ইচ্ছাশক্তি? তখন কোনো গ্রন্থপাঠেও নবীনকুমার মনোনিবেশ করতে পারে না, প্রকৃতির দিকে চোখ মেললেও কিছু দেখতে পায় না। প্রাণপণে কোনো কিছু জোর

করে ভুলে যাবার চেষ্টা যে এমন অসাধ্য, এমন যন্ত্রণাদায়ক তা সে আগে জানতো না। মানুষ কোনো কিছু পাবার জন্য সর্ব শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু কোনো কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার জন্য কি তার চেয়েও বেশী শক্তি লাগে?

নবীনকুমারের বজরা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, নকুড় ও দুর্যোধনের দলবল তাকে ধরে ফেললো নদীয়ায়।

বিম্ববতীর মৃত্যুসংবাদ নবীনকুমার গ্রহণ করলো খুব শান্তভাবে। যেন সে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল যে মায়ের সঙ্গে তার দেখা হবে না। এ কথাটা তার প্রথম মনে আসে চন্দ্রনাথের গৃহে তার মাতৃমুখী সেই রমণীটিকে দেখে। এই চিন্তাটিকে কুসংস্কারের মতন উড়িয়ে দেবার জন্যই সে হরিদ্বার যাত্রা করতে চেয়েছিল।

গঙ্গানারায়ণের পত্র পাঠ করে সে কিছুক্ষণ বসে রইলো চুপ করে। নবীনকুমারের চক্ষু অশ্রুহীন, কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুলাল উচ্চ স্বরে কাঁদছে বালকের মতন। বিম্ববতী তার কাছে ভগবতীতুল্যা। বিম্ববতীর জন্যই তার যা কিছু। বয়স হবার পর সে বুঝতে পেরেছে যে পাছ মহলের ভৃত্যতন্ত্র থেকে সে যে ওপরতলায় প্রভুপুত্রের সহচর হিসেবে স্থান পেয়েছে, তা শুধু বিম্ববতীর দয়ায়।

দুলালকে কিছুক্ষণ কান্নাকাটির সময় দিল নবীনকুমার।

তারপর মৃদু কণ্ঠে সামনে দণ্ডবৎ হয়ে থাকা নকুড় ও দুর্যোধনকে বললো, দুলালকে ভেতরে ডাক—।

দুলাল চক্ষু মুছে ভেতরে এসেও আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে বললো, ছোটবাবু, ছোটবাবু, কত্তামা চলে গ্যালেন—

নবীনকুমার মুখ তুলে বললো, কাছাকাছি কোনো বড় জায়গায় বজরা ভেড়াতে বল। তারপর পুরুত যোগাড় করতে হবে, আর সব যোগাড়-যন্তর করতে হবে, আমি এই নদীর ধারে মায়ের পারলৌকিক কাজ করবো!

নকুড় হাত জোড় করে বললো, কলকেতায় ফিরে যাবেন না, ছোটবাবু! বড়বাবু অনেক করে বলে দিয়েচেন—

নবীনকুমার বললো, না, এখন আমার ফেরা হবে না। তোরা ফিরে যা—।

অদূরেই রাসপুর নামে একটি গঞ্জ মতন এলাকা। সেখানেই এসে থামলো বজরার বহর। দুলালের খুবই ইচ্ছে এখনই কলকাতার দিকে রওনা হওয়ার, সে প্রস্তাব একবার নবীনকুমারের কাছে তুলে ধমক খেল। নবীনকুমার আগে মায়ের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন করবে, তারপর অন্য কথা।

নদীবক্ষে শালগ্রাম শিলার পূজা এবং পিণ্ডদান ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়। তীরে নামতেই হবে। আবার, অপরের জমিতে বসে নবীনকুমারের মতন জমিদারপুত্র মাতৃদায় থেকে উদ্ধার হবে, এটাও মোটেই ভাল দেখায় না। পুরোহিত ও দুলালের এই মিলিত যুক্তি শুনেও নবীনকুমার নিবৃত্ত হলো না। সে আদেশ দিল যে সেদিনের মধ্যেই কাছাকাছি কোথাও দু-দশ বিঘে জমি সমেত একটি বাড়ি কিনে ফেলার ব্যবস্থা করা হোক: আগামীকাল সেইখানে কাজ হবে।

এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য দুলালের নেই। তৎক্ষণাৎ সে পাঁচ-সাতজন লোক পাঠিয়ে দিল জমির সন্ধানে। পুরোহিতের তালিকা অনুযায়ী শ্রাদ্ধের দ্রব্য-সম্ভার

সংগ্রহে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এত সব জিনিস রাসপুরে পাওয়া যাবে না। ঘোড়া ভাড়া করে লোক পাঠাতে হবে দূরে দূরান্তরে।

এগারো বিঘে জমি সমেত একটি ছোট বাড়ি পাওয়া গেল আধ ক্রোশের মধ্যেই এবং নদীর ধারে। পরদিন সেখানে সব ব্যবস্থা হলো। ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে নবদ্বীপ থেকে আনানো হল দানের ষোড়শ উপচার। মস্তক মুণ্ডিত করে নদীতে স্নান সেরে নবীনকুমার এসে বসলো যজ্ঞে।

প্রথম দিনে একশোটি ব্রাহ্মণের সেবা এবং প্রত্যেককে পিতলের কলস, এক জোড়া ধুতি ও দশটি করে রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হলো। সুখের বিষয়, এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণের কোনো অভাব নেই। বৃষোৎসর্গও বাদ গেল না।

পরদিন কাঙালীভোজন। সেদিন এলো প্রায় দু' তিন হাজার লোক। বিনা নিমন্ত্রণে এত গ্রামবাসীকে আসতে দেখে দুলালদের চক্ষু স্থির হবার উপক্রম। গ্রামে এত কাঙালী? যাই হোক, ব্যবস্থার ত্রুটি হলো না কোনো। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বসে গেলে নবীনকুমার নিজের হাতে অন্ন পরিবেশন করলো।

সব কিছু মিটে যাবার পর সন্ধ্যাকালে নবীনকুমার নদীর ধারে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, সে সময় তার চক্ষু থেকে বিমোচিত হলো কয়েক বিন্দু অশ্রু। তার ভিতরের শুষ্কতায় সে নিজেই বিস্মিত হচ্ছিল। যত আড়ম্বরের সঙ্গেই তর্পণ করা হোক, চোখের জল ছাড়া কি লোকান্তরিত জনক-জননীর পূজা সম্ভব! মনে মনে সে বললো, মা, আমি জানি, আমি যদি তোমায় এক কোটিবারও দুঃখ দিয়ে থাকি, তবু জানি, তুমি তার সবই ক্ষমা করোচো!

শীতের পরিষ্কার আকাশে, নদীর পরপারে বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নবীনকুমারের মনে হলো, এরকম সূর্যাস্ত প্রতিদিনই হয়, কিন্তু প্রতিদিন এ দৃশ্য এক রকম নয়। আছে, অন্য কিছু আছে। যা আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি, যুক্তি দিয়ে বুঝি, তার আড়ালেও অন্য রকম কিছু আছে। নইলে জীবন বড় এক-রঙা হতো।

একটু পরেই নবীনকুমারের নির্জনতা বিঘ্নিত হলো। নদীর ওপার থেকে একটি বড় নৌকো এসে থামলো এপারে। তার থেকে নেমে একজন মধ্যবয়স্ক লোক নবীনকুমারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, নমস্কার ছোটবাবু!

নবীনকুমার খানিকটা বিরক্ত, কিছুটা কৌতূহলী হয়ে লোকটির দিকে চাইলো। সে যে একজন বড় জমিদার, তা ইতিমধ্যেই রটে গেছে। সচরাচর গ্রামবাসীরা তার সঙ্গে কথা বলতে এলে ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে আগে প্রণাম সেরে নেয়। এই লোকটি তার ব্যতিক্রম। এর কথার মধ্যে খুব একটা বিনয়ের ভাবও নেই, যদিও লোকটি তাকে চেনে। ছোটবাবু বলে সম্বোধন করেছে।

এই ব্যক্তিটির বেশ গোলগাল চকচকে চেহারা। ধুতিটির রং টকটকে লাল, উত্তমাঙ্গে একটি মুগার চাদর জড়ানো। নবীনকুমারের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে মাটিতে বসে পড়ে সে বললো, আমি খবর পাইলাম আজ সকালে। আইস্যা বুঝতে পারছি, অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে।

লোকটি নবীনকুমারের মুণ্ডিত মস্তকের দিকে হাতের ইঙ্গিত করলো। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-শান্তি যে চুকে গেছে, সেই কথাই সে বলতে চাইছে।

—আপনি কে?

—আপনি না, আমাকে তুমি বলেন। সেইডাই মানানসই হইবে। একেবারে যে

তুই-তুকারি দিয়া শুরু করেন নাই এই আমার বাপের ভাইগ্য! অধীনের নাম ভুজঙ্গ শর্মা।

—আমার কাছে কী প্রয়োজনে আসা?

—সে রকম কোনো প্রয়োজন নাই! এইরকম খবর শুনলে আইসতে হয়, সেই আর কি! আসছি আমি ইব্রাহিমপুর থিকা। সেখানে এককালে আপনাগো জমিদারি আছিল, জানেন বোধ হয়?

—ছিল? এখন নেই?

-নাইও কইতে পারেন, আছেও কইতে পারেন!

—অর্থাৎ?

—কাগজে-পত্তরে আইজও আছে, কাজে-কম্মে নাই। যেমন ধরেন, এককালে আমি আপনেগো নায়েব আছিলাম। এখন আমারে আপনেগো নায়েব কইতেও পারেন, নাও কইতে পারেন। আছিও বটে, নাইও বটে।

—আপনি হেঁয়ালি করে কতা বলচেন কেন আমার সঙ্গে? আমি এসব পছন্দ করি না। যদি প্রয়োজনের কোনো কতা থাকে চট্‌পট শেষ করুন নইলে বিদেয় হোন!

ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখে নিয়ে বললো, এ বাড়িখান কার? আরে রাম রাম, রামকমল সিংহের একমাত্র সন্তান, কত্তামার নয়নের দুলাল নবীনকুমার সিংহ কালাশৌচ পালন করতাছেন পরের বাড়িতে? ছি ছি, কী লজ্জা!

নবীনকুমার তীব্র স্বরে বললো, এ বাড়িটি আমার!

—তা ক্যামনে হয়, ছোটবাবু। ইদিকে তো আপনেগো কোনো ভূ-সম্পত্তি নাই! আমারে আপনে ভুল বুঝাইবেন? আমি যে সব জানি!

লোকটির ঔদ্ধত্যে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো নবীনকুমার। একে এক্ষুনি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেবার জন্য নবীনকুমার হাঁক দিল, দুলাল! ওরে কে আচিস, দুলালকে ডাক্।

ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য তৃপ্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললো, হুঁ, ফোঁস শুনলেই জাত চেনা যায়। সিংহের ছাওয়াল সিংহ। রাগ করেন ক্যান, ছোটবাবু! আগে আমার সব কথা শুইন্যা লন।

—আপনার যা বলবার আচে, দুলালকে গিয়ে বলুন। আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হয়ে যান!

—দুলাল-টুলালের সঙ্গে কথা কওয়া তো আমার সাজে না! আমি নিজেও যে একজন জমিদার।

—এটা কি আপনার জমিদারি? আমি আপনার জমিদারির মধ্যে বসে আচি?

—না, সে কথা কইতাছি না। আমার না হউক, অপরের জমিদারির মইধ্যে বইস্যা থাকাও আপনার শোভা পায় না। এটা কীর্তিচন্দর রায়গো জমিদারির মইধ্যে পড়ে। আমার জমিদারি এর লগে লগেই। তয়, আমিও আসল জমিদার নয়, নকল। চেহারাখান দ্যাখছেন না, এই কি জমিদারের চেহারা! আমি নকল।

—ফের হেঁয়ালি?

—এবার তয় সাদা কথাই কই। আসলে জমিদারের ব-কলমা দিতে দিতে আমি এখন পেরায় জমিদার হইয়া গেছি। লোকে অবইশ্য এখনো আমারে নায়েববাবুই কয়।

—আপনি ইব্রাহিমপুর পরগনার নায়েব?
—ইব্রাহিমপুরে আপনেগো জমিদারি আছিল, সে কথা আপনে জানেন? খবর রাখেন কিছু?
—কেন জানবো না?
—বৎসর ছয়-সাতের মইধ্যে সেখানে জমিদারবাবুগো একজনারও পায়ের ধুলি পড়ে নাই। তাগাদায় কেউ আসে নাই। কাজে কাজেই আমি এখন সর্বেসর্বা। ও জমিদারি এখন আমার!
—আমাদের জমিদারি আপনি আত্মসাৎ করেচেন?
—নামে আপনাগোই। কোম্পানির আমলে সেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কইরা গ্যাছে, তারপর না ব্যাচলে তো কেউ জমিদারি কাইড়া নিতে পারে না। তেমন তেমন নায়েব হইলে জমিদারি ফোঁপরা কইরা দিতে পারে। আমিও তাই দিছি।

লোকটির কথা বলার বিচিত্র ধরনে নবীনকুমার আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। নিজের মুখেই স্বীকার করছে যে তাদের একটি পরগনা এই লোকটি ভোগদখল করছে। সে কথা নিজের মুখে জানাতে এসেছে কেন? এ কথা সত্য যে নবীনকুমার তাদের জমিদারির আদায় তহশিলের ব্যাপারে কখনো কোনো আগ্রহ দেখায় নি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, সে গঙ্গানারায়ণের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে কিংবা কলকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করেছে। ইব্রাহিমপুর পরগনার তা হলে এই অবস্থা!
—এখনো বুঝতে পারলুম না, আপনি আমার কাছে কেন এসেচেন?
—বাতাসের মাথায় খবর রটে। লোকে কইত্যাছে যে জমিদারের পোলা নবীন সিংহ মায়ের ছেরাদ্দ করতাছেন অইন্যের জাগায়। নদীর ধারে অনাথের মতন বইস্যা আছেন। তাই দৌড়াইয়া আইলাম। ইব্রাহিমপুরে নতুন কুঠিবাড়ি বানাইছি, থাকতে হয় সেখানে আইস্যা থাকেন। চলেন আমার সঙ্গে।
—আপনি আমায় নিতে এসেচেন?
—হ।
—আশ্চর্য। সেখানে গিয়ে যদি আমাদের জমিদারি আমি আবার দখল করে নিই!
—নিতে ইচ্ছা হয় নিবেন?
—এত বছর ধরে আমাদের ঠকিয়েচেন, টাকা পয়সা কিচ্ছু দ্যান নি, সে জন্য যদি আপনাকে জেলে দিই?
—সেটি পারবার উপায় নাই, ছোটবাবু। কাগজ-পত্তর একেবারে পাক্কা। হিসাব নিতে গেলে দ্যাখবেন আর কিছুই নাই, বরং ধার দেনা, শুধু ধার দেনা। খাজনার দায়ে বাজনা বিকাইবার উপক্রম। আমারে ধরতে-ছুঁইতে পারবেন না।
—আপনাকে বরখাস্ত করে নতুন নায়েব নিযুক্ত করতে পারি। সে ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমার আচে। নামে যখন আমিই জমিদার?
—তা পারেন, নিশ্চয় পারেন। কিন্তু নূতন নায়েব দুই দিনেই ল্যাজ গুটাইয়া পলাইব, দ্যাখবেন। প্রজারা যে সক্কলেই আমারে মানে।
—অর্থাৎ আপনাকে কিছুতেই হঠানো যাবে না। ও জমিদারি আমাদের যাবেই।
—আপনেরা কইলকেতায় বইস্যা আমোদ-আহ্লাদ করবেন, বছরের পর বছর

এদিকে একবার পাও দিবেন না, প্রজারা বাঁইচলো না মরলো সে তল্লাশও করবেন না, তাইলে নায়েবরা সেই সুযোগ সব হাতাইব না? কন? সুযোগ পাইছি, আমিও নিছি।

—আপনার নাম ভুজঙ্গ, আপনি দেখচি সত্যিই একটি কাল-ভুজঙ্গ!

—হাঃ হাঃ হাঃ! এডা কী কইলেন, ছোটবাবু? নাম শুইন্যা কি মানুষ চিনা যায়? কাউর বাপ-মায়ে কখনো শখ কইরা সন্তানের নাম ভুজঙ্গ রাখে? ভুজঙ্গ না, ভুজঙ্গ না, আমার আসল নাম ভুজঙ্গধর। ভুজঙ্গ মানে সাপ, আর ভুজঙ্গধর হইলো শিব। আপনে বিদ্বান মানুষ, এডা জানেন নিশ্চয়। তাইলেই দ্যাখেন কত তফাত হইয়া গেল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য বললো, আপনের দাদা কেমন আছেন? তিনি দ্যাবতুল্য মানুষ। তিনি বিবাহ করেছেন শুনিছি। আমারে একখান নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত পাঠান নাই। এমন কথা ভূ-ভারতে কেউ কোনো দিন শুনেছে যে জমিদারের বিবাহ হয়, আর প্রজারা তো দূরের কথা, নায়েবগো পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হয় না? এমন জমিদারের জমিদারি কখনো রক্ষা পায়?

নবীনকুমার চুপ করে রইলো।

এই সময় দুলালকে এদিকে আসতে দেখে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য নিজেই তাকে ডেকে বললো, দিবাকর গোমস্তা কোথায়? সে সংগে আসে নাই? তারে একবার ডাকো, সে আমারে চেনে।

দুলালও তার প্রভুর মত বিস্মিত।

দিবাকর আসে নি শুনে ভুজঙ্গ ভট্টাচার্য অপ্রসন্ন স্বরে বললো, সেই জইন্যেই এমন অব্যবস্থা। যত সব পোলাপানের কান্ড, জমিদারকে পথের ধুলায় বসাইয়া রাখছে। চলেন, ছোটবাবু, কুঠিবাড়িতে চলেন। আপনার লোকগুলোরে তল্পি-তল্পা গুটাইতে কন। বেশী দূর না, এক বেলার পথ।

আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলবার পর নবীনকুমার ইব্রাহিমপুরে যাওয়াই মনস্থ করলো।

ইব্রাহিমপুরের প্রাক্তন কুঠীবাড়িটির পাশেই নির্মিত হয়েছে নতুন এক ইমারৎ। পুরোনো কুঠীবাড়িটির ধ্বংসস্তূপ এখনো বিদ্যমান। প্রকৃতির যা নিয়ম, ধ্বংস-স্তূপের ওপরেও আবার প্রাণের আবির্ভাব হয়, সেখানে জন্মে গেছে অনেক গাছ-পালা।

সেদিকে অংগুলি নির্দেশ করে ভুজঙ্গধর বললো, ঐ দ্যাখেন, ঐ ছিল আসল কুঠীবাড়ি, নীলকর সাহেবগো প্যায়দারা এক রাইতে আগুন লাগাইয়া দিছিল। বউ-ছাওয়াল-মাইয়া লইয়া আমি সেই রাইতেই নিরাশ্রয়। তাড়া-খাওয়া ইন্দুরের মতন আমি প্রাণের ভয়ে সকলডিরে লইয়া পলাইছি।

নবীনকুমার সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভুজঙ্গধর পুনরায় বললো, আপনে যেখানে খাড়াইয়া আছেন, ঠিক ঐখানেই

একদিন আপনের অগ্রজ গঙ্গানারায়ণ সিংহ অকস্মাৎ একদিন আইসে খাড়াইয়া-ছিলেন। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। আমি তেনারে চেনবো ক্যামনে? আমি ঠাওরাইছিলাম বুঝি এ আর এক জাল প্রতাপচন্দ্র। পরে নরসুন্দর ডাকাইয়া ক্ষৌরি করাইতেই তেনার আসল রূপ বাইর হইল...।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, নীলকর সাহেবরা এখন প্রজাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে?

ভুজঙ্গধর বললো. কমু. সব আপনেরে খুইলা কমু। আগে মুখ-হাত ধোন, বিশ্রাম করেন। পাঁচজনে কয় যে আমার ব্রাহ্মণীর রান্নার হাত নাকি সরেশ, যদি আজ্ঞা হয় তবে আইজ আমার ঘরেই আপনের আহারাদির ব্যবস্থা করি।

নদীকূলে বজরা থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয় এই কুঠী-বাড়িতে। ভুজঙ্গধর পালকির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, কিন্তু নবীনকুমার তাকে নিরস্ত করে পদব্রজেই এসেছে। গ্রামের কোনো প্রজাই তাকে চেনে না। অনেকে তার মুণ্ডিত-মস্তক দিব্যকান্তির দিকে বিস্ময়ভরা নয়নে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু জমিদার ভেবে সম্ভ্রমে সামনে লুটিয়ে পড়েনি।

ভূতপূর্ব কুঠীবাড়ির আঙিনা থেকে ভুজঙ্গধর তাকে নিয়ে এলো নতুন গৃহে। তার মধ্যে একটি কক্ষের দ্বারের তালা খুলে ভুজঙ্গধর বললো, এই দ্যাখেন ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখি নাই। এ-ঘরের খাট-আলমারি, তোশক বালিশ বিছানা সবই নতুন। জমিদারবাড়ির কেউ যদি কোনোদিন আসেন সেই লাইগ্যা সাজাইয়া রাখছি। কিন্তু গত ছয় বৎসরের মধ্যে কেউ আসে নাই!

নবীনকুমার কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে. ভুজঙ্গধরের ঈষৎ বাঁকা সুরের কথায় সে যুৎসই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে সে আগে বিশেষ কোনো চিন্তাই করেনি। বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের জমিদারি আছে, সে এই কথাই শুধু জানে. সেই জমিদারি পরিচালনা বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। প্রায় কৈশোর বয়স থেকেই সে নিজস্ব নানান পরিকল্পনায় মত্ত থেকেছে। অর্থের প্রয়োজন হলেই সে তলব করেছে খাজাঞ্চিকে। এস্টেটের তহবিল থেকে সে চাহিদা মতন পর্যাপ্ত অর্থ না পেলে এক একবার বিক্রয় করেছে কলকাতার এক একটি সম্পত্তি। বিষয়-তদারকির ভার গঙ্গানারায়ণের ওপরে। অবশ্য একা গঙ্গানারায়ণই বা কতদিকে সামলাতে পারবে! কিন্তু সেকথা নবীনকুমার এতদিন ভাবেনি।

দুজন ভৃত্য অবিলম্বে কক্ষটি ঝাড়-পোঁছ করে দেবার পর নবীনকুমার সে-কক্ষে প্রবেশ করলো। সেটি আয়তনে বেশ বড়, আসবাবগুলি রুচিসম্মত, কোনো জমি-দারের সাময়িক বসবাসের অনুপযুক্ত নয়। গ্রীষ্মে টানা পাখার ব্যবস্থা আছে। পালঙ্ক ছাড়াও রয়েছে একটি আরামকেদারা। ভুজঙ্গধরের অনুরোধে নবীনকুমার সেটিতে বসলো।

ভুজঙ্গধর ভূমিতে আসন গ্রহণ করে আবার সেই বিদ্রূপ ও কৌতুক মিশ্রিত সুরে বললো, আমি আপনেগো জমিদারি গ্রাস কইরা লইছি বটে, কিন্তু আমারে একেবারে নিমকহারাম কইতে পারবেন না। তাইলে আর জমিদারের লাইগ্যা এমন ঘর সাজাইয়া রাখছি ক্যান? এই ঘরে কিন্তু আইজ পর্যন্ত কেউ শোয় নাই! আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মশায় অন্তত একবার আসবেন এমন আশা কইরাছিলাম। তিনি আইলে নিজেও খুব খুশী হইতেন। তিনি প্রজাগো পক্ষ লইয়া নীলকর সাহেবগো বিরুদ্ধে জবর লড়াই দিছিলেন, এবার আইলে

তিনি স্বয়ং সেই লড়াইয়ের ফলাফল স্বচইক্ষে দ্যাখতে পারতেন।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ফলাফল?

—যে ম্যাকগ্রেগর সাহেবের নাম শোনলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইতো, এমনকি আমাগো বুকের মইধ্যেও গুড়গুড়াইতো, সেই ম্যাকগ্রেগর সাহেব আত্মহত্যা করছে! ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের লেডীর সাথে তার যেন কী সব হইছিল। যাউক সেকথা। সে বেটা পাইছে তার পাপের শাস্তি। তারপর একদিন নীলকুঠীতেও আগুন লাগে। সাহেবরা সব পিঠটান দিছে, এহানে আর নীলকুঠী নাই। আমাগো কুঠী যারা পুড়াইয়া দিছিল, তার নিজেরাও নিস্তার পায় নাই। এখন আর এই এলাকার জমিতে নীলচাষ হয় না, আবার সোনার ধান ফলে।

—শুনে আমিও খুশী হলুম যে আমার দাদা যে কারণের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা সার্থক হয়েচে!

—কিন্তু তিনিও শহরে গিয়া অইন্যগো মতন ফুকা জমিদার হইলেন। আর গ্রামে আইলেন না।

—আমার দাদা অনেক রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত। না আসতে পারা তাঁর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে আমাদের এস্টেটের আর কোনো কেউ কখনো আসেনি বলতে চান? তা হতেই পারে না।

—আইছে, আইছে। গোড়ায় গোড়ায় প্রত্যেক বছরেই একবার দুইবার আমলা-গোমস্তারা আইছে। আমি তাগো হাঁকাইয়া দিছি। ঐ দিবাকরই তো আইছিল তিনবার। আমি তারে কইছি, যা বেটা, ফের এদিকে আইলে তুর মাথা ফাটাইয়া দিমু!

—আমাদের প্রতিনিধিকে কেন আপনি হাঁকিয়ে দিয়েচেন, তা জানতে পারি কি?

—নিশ্চয় জানতে পারেন। দিছি আমার খুশী! শোনেন, শোনেন, অমন উত্তেজিত হন ক্যান? স্পষ্ট কথা শোনার অভ্যাস আপনাগো নাই! তাই মাথা গরম হইয়া যায়। শোনেন, আমি যদি হই শিয়াল, তাইলে আপনেগো ঐ আমলা-গোমস্তারা হইলো কুমোইর, অর্থাৎ আপনেরা যারে কন কুমীর। পরের ধনে পোদ্দারি করতে গ্যালেও আমারে তবু খাটতে হয়। আর অরা আইস্যা লুটের বখরা চায়। অগো হাতে আমি টাকা দিমু ক্যান! জমিদার আইলেও না হয় হিস্যা বুজাইয়া দিতাম, অগো হাতে টাকা দিলে সে টাকা আপনেগো এস্টেটের তবিলে জমা পড়বে কইতে চান? কোনোদিন না। অন্তত তিন ভাগের দুই ভাগ অরা নিজেরা হজম করবে! তাই আমি ঠিক করলাম অগো দিমু ক্যান, পুরাপুরি আমি নিজেই খাই। আমারও পরিপাক শক্তি কম নয়। দিব্যি হজম হইয়া যায়!

—অর্থাৎ যে-কোনো কৌশলে জমিদারকে ঠকানোই আপনার মূল উদ্দেশ্য।

—তাইলে ছোটবাবু, এই কথার জবাব দ্যান তো! নীলকরের অত্যাচারে আমি যখন বউ, ছাওয়াল, মাইয়া লইয়া নিরাশ্রয় হইছিলাম, তখন জমিদার আমারে দেখছিলেন? জমিদার একবারও কি চিন্তা করছিলেন যে আমি কোথায় থাকুম, কী খামু? আমি মরলাম না বাঁচলাম, হ্যার কেউ খোঁজ নিছে? এই যে কী সাংঘাতিক আকাইল গ্যাল, গেরামের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে হাহাকার, তখন প্রজাগো একটুও কি সাহায্য করছে জমিদার? সে সব যদি না করে, তবুও আমি জমিদারের গোমস্তা আইলেই তার পা ধোওয়নের জল দিয়া খাতির করুম আর তার হাতে টাকার থলি তুইল্যা দিমু?

—অন্য সব জমিদাররা মহালে নিয়মিত আসে বলতে চান?

—যারা আসে না, তাগো জমিদারি আইজ না হউক কাইল লাটে ওঠবেই। আপনের পিতামহ নিয়মিত আসতেন, আপনের পিতাঠাকুরও যৌবনে আসছেন বেশ কয়েকবার। তারপর আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতারে পাঠাইতেন। তারপর যেই আসা বন্ধ হইল, আপনেগো জমিদারির দশাও জল-শুকনা নদীর মতন হইল। আর বেশী দিন নাই—।

—আমরা যদি এ জমিদারির অংশ বিক্রি করে দিতে চাই?

তা পারবেন। কিন্তু দাম পাইবেন না! এই ফোঁপরা জমিদারি কেনবে কেডা?

—আপনিই ফোঁপরা করে রেকেচেন, বোঝা যাচ্ছে!

—বোঝা অত সহজ নয়, ছোটবাবু। আগে গেরামের অবস্থা ভালো কইরা নিজের চইক্ষে দ্যাখেন, তারপর বোঝবেন।

—জমিদারির অবস্থা যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে কতা আপনি আমাদের চিঠি লিকে ত জানাননি কো!

—আমার বিপদের সময় অন্তত সাতখান্ পত্র পাঠাইছিলাম আপনেগো কাছে, একখানেরও কোনো জবাব পাই নাই। মানলাম, আপনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন জেল খাটতে আছিলেন, কিন্তু আপনেও তখন নিতান্ত অবোধ বালকটি তো না, আপনের কুড়ি-একুইশ বৎসর বয়স, কিন্তু আপনে তখন একটুও নজর দ্যান নাই। আপনে তখন মহাভারত রচনার মতন মহৎ কর্মে ব্যস্ত আছিলেন। আপনে নমইস্য ব্যক্তি, আমি ব্রাহ্মণ না হইলে আপনের পায় হাত দিয়া প্রণাম করতাম। কিন্তু আপনে জমিদার হিসাবে অপদার্থ। আপনে বিধবা বিবাহের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন শুনছি, কিন্তু আপনে আমার গ্রামগুলার অনাহারী মানুষগো জইন্যে এক মুঠা অন্নও দ্যান নাই।

—আমি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য অর্থ সাহায্য করে ভুল করিচি বলতে চান?

—না। ভুল ক্যান কমু? অতি মহান আদর্শের কাম করছেন। কিন্তু এদিগে যে আপনেগো অবিবেচনার ফলে গেরামের কত গেরস্থ বাড়ির বউ অকালে বিধবা হইল, সে খবর রাখেন নাই।

নবীনকুমারকে নিরুত্তর অবস্থায় গুম হয়ে যেতে দেখে ভুজঙ্গধর উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর বদলে বললো, আরে রাম রাম, আমি শুধু বকবকই করতে আছি, আপনের খাওন-দাওনের কোনো ব্যবস্থা হইল না এহনও...আপনে বিশ্রাম করেন, ছোটবাবু, আমি একটু ভিতরে যাই—।

দিন তিনেক ভুজঙ্গধরের কুঠীবাড়িতে কাটিয়ে দিল নবীনকুমার। লোকটির সঙ্গে দু বেলাই তার কথা কাটাকাটি হয়। ভুজঙ্গধর ইংরেজিতে নিরক্ষর হলেও বাংলা ও সংস্কৃতে যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, এই পরগনার বাইরের জগৎ সম্পর্কেও খবরাখবর রাখে। স্তাবক বা খোসামুদেদের বদলে স্পষ্টবাদীদের নবীনকুমার বরাবরই পছন্দ করে। কিন্তু এই লোকটির কথাবার্তা সে পুরোপুরি সহ্যও করতে পারছে না, আবার অগ্রাহ্য করতেও পারছে না।

একদিন প্রাতঃকালে নবীনকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হলো একটি গান শুনে। অতি সুমিষ্ট সুর, গানের কথাগুলিও সুমধুর। নবীনকুমার ঘুম-জড়িত চক্ষে উঠে

এসে দেখলো বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একজন বৈষ্ণব গায়ক গুপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে, আর সামনে একটি জলচৌকিতে বসে মুগ্ধভাবে শুনছে ভুজঙ্গধর।

নবীনকুমারকে দেখে ভুজঙ্গধর শশব্যস্তে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল নাকি, ছোটবাবু?

নবীনকুমার বললো, না। ভট্‌চাজমশাই, ঐ গায়কটিকে এদিকে ডাকুন তো, গানটি ভালো করে শুনি।

গায়কটি নবীনকুমারের পরিচয় আগে থেকেই শুনে থাকবে নিশ্চয়। কাছে এসে সে ভূমিতে মস্তক ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো, দণ্ডবৎ, হুজুর। আপনার পিতারে আমি গান শুনাইছি। তিনি গান বড় ভালোবাসতেন।

নবীনকুমার বললো, ঐ গানটি আর একবার গান তো। কতাগুলো সব বুঝতে পারিনি।

গায়কটি আবার শুরু করলো :

হৃদিবৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি!
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দন! পাপ-ভার গোবর্ধন
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি...

নবীনকুমার সহর্ষে তারিফ করে বললো, বাঃ, বাঃ! বড় খাসা বাঁধুনী! এমন সুন্দর রূপক-গান বহুদিন শুনিনি। এ গান কে রচেচে? এ তো রামপ্রসাদেরও নয়, তিনি কালীভক্ত, আর এ গান বৈষ্ণবদের।

গায়কটি বললো, আজ্ঞে, এ গান দাসু রায় মশাইয়ের।

নবীনকুমার সবিস্ময়ে বললো, দাসু রায়?

ভুজঙ্গধর বললো, সে কি ছোটবাবু, আপনি দাসু রায়ের নাম শোনেন নাই? বর্ধমান-কাটোয়ার দাসু রায়ের গান বাংলায় কে না শোন্‌ছে? আমাগো এই দিকে কাশীমবাজারে গাওনা করতে আইসাই তো তিনি দেহরক্ষা করলেন। সে বোধকরি সেই সেপাই যুদ্ধের বৎসরে।

নবীনকুমার বললো, দাসু রায়ের নাম কেন জানবো না? কিন্তু সে লোকটা তো অতি কুচ্ছিৎকদর্য খেউড়ের পাঁচালী গাইত। কতাগুলো সব ইতরামিতে ভরা। তার মুখ দিয়ে এমন গান বেইরেচে, বিশ্বাস হয় না!

ভুজঙ্গধর বললো, ঐ তো মজা, পঙ্কেই পদ্ম ফোটে। ডাকাইত রত্নাকরই বাল্মীকি হয়। এ গানও দাসু রায়ের। এমনকি নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও দাসু রায়কে সম্মান দিছে শ্যাস্‌ পইর্যন্ত। আইচ্ছা, এইডা শুইন্যা কন্‌ তো, কার? নেতাই, সেইডা গাও তো, দোষ কারো নয়গো, মা—।

নিতাই আবার ধরল :

দোষ কারো নয় গো, মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ

সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল কালমনোরমা।
আমার কী হবে তারিণি
ত্রিগুণ ধারিনী
বিগুণ করেছি স্বগুণে...

নিতাইয়ের গান মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করলো, এ গান আগে শুনছেন কখনো ছোটবাবু? কন তো, কার?

নবীনকুমার বললো, এটি শ্যামাসঙ্গীত, অতি উচ্চাঙ্গের। এ গান নিশ্চয়ই রামপ্রসাদ কিংবা কমলাকান্তের।

ভুজঙ্গধর বললো, হইল না। এই গানও ঐ দাসু রায়েরই। একই মানুষ এই শ্যামাসঙ্গীত আর আগের বৈষ্ণব গান ল্যাখছে।

—আমরা তাকে অশ্লীল পাঁচালীকার হিসেবেই জানি। এই দুটি গানে তো একটাও নোংরা কথা নেই!

—তাহলেই বোঝেন আপনেরা কত কিছু ভুল জানেন শহরে বইস্যা। শোনেন তয় একটা গল্প কথা। এই গানে ঐ যে একখান্ কথা আছে না, 'ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ'—ঐ কোদণ্ড শব্দটার ঠিক অর্থ দাসু রায় মশায় জানতেন না। তিনি ভাবছিলেন কোদণ্ড মানে কোদাল, তাই সে কোদণ্ড দিয়া কূপ খুঁড়াইছেন। কিন্তু আপনে সংস্কৃত অতি উত্তম জানেন, আপনের জানা আছে নিশ্চয়ই যে কোদণ্ড মানে হইল ধনুক। শুধু ধনুক, তীরও না, সুতরাং কোদণ্ড দিয়া কূপ কাটা যায় না, দাসু রায় মশাই ভুলই করছেন। এই জইন্য এক টোলের পণ্ডিতের ছাত্তররা দাসু রায় মশাইরে উপহাস করছিল। ল্যাখাপড়া তেমন শেখেন নাই দাসু রায়, একটা আধটা কথার ভুল হইতে পারেই, কিন্তু এমন গান বান্ধতে পারে কয়জন? টোলের ছাত্রগো সেই মস্করার কথা শুইন্যা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাম শিরোমণি ছাত্রগুলারে বইক্যা কইছিলেন, দাসু রায় যখন ল্যাখছেন, তখন ওডা হইলো আর্ষ প্রয়োগ! আজ থিকা কোদণ্ডের অর্থ ধনুকও হবে, কোদালও হবে।

নবীনকুমার বললো, বাঃ, বেড়ে গল্পটি তো। দাসু রায়ের যে এসব দিকে এত সম্মান হয়েছিল, তা আমি জানতুম না। তবে গল্প শোনার চেয়ে গান শোনা ভালো। আরও গান গাইতে বলুন ওকে।

আরও তিন চারখানি গান শুনে উত্তরোত্তর মুগ্ধ হয়ে নবীনকুমার এক সময় বললো, একে আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। এমন চমৎকার এর সুরেলা কণ্ঠস্বর, শহরে গেলে এর যোগ্য সমাদর হবে। এর গান শুনে দাসু রায় সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভুল ভাঙবে।

ভুজঙ্গধর বললো, ওকে আপনি কলকাতায় নিয়া যাইবেন?

—হ্যাঁ। আমি যখন ফিরবো, ও আমার সঙ্গেই যাবে।

—বাঃ! অতি উত্তম প্রস্তাব। নিতাইচাঁদের কপাল খুইল্যা গেল। কী রে, নেতাই, ছোটবাবুর সাথে কইলকাতায় যাবি?

নিতাইচাঁদ গান থামিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির বয়স অন্তত ষাট হবে। কেশবিরল মস্তক, মুখখানি খুব সরু। তার আকৃতিতে কেমন যেন একটা শালিক পাখির ভাব আছে। গায়ে একটি নামাবলী।

ভুজঙ্গধরের প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। তারপর বললো, তেমন সৌভাইগ্য কি আমার হবে?

ভুজঙ্গধর বললো, তুই ছোটবাবুর নেকনজরে পইড়া গেছস, তোর আর চিন্তা

কি? আইজ যাইতে কইলে আইজই যাবি?

নিতাইচাঁদ বললো, নিশ্চয়। আমার তো পিছুটান নাই। কোনো দিন র‍্যাল-গাড়িতে উঠি নাই, বড় শখ একবার র‍্যালগাড়িতে যাই। আর কইলকাতায় গিয়া এক-দিন বরফ খামু। বরফের কথা অনেক শুনছি, কোনোকালে চইক্ষে দেখি নাই, জীবনে যদি এই সাধটা মিটে।

ভুজঙ্গধর হাসতে হাসতে বললো, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন ছোটবাবু। ও এক কথায় রাজি। একেবারে এক পায়ে খাড়া। এই নেতাই বোষ্টমরে আমি কতকাল ইস্তক দেখতে আছি, কোনোকালে এই দুই তিনখান গেরামের বায়রায় যায় নাই, আর আইজ আপনার কথা শুইন্যা অমনেই কইলকাতায় যাইতে চায়।

নবীনকুমার বললো, আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওর গান সবাইকে শোনাবো। এমন সুকণ্ঠের অধিকারী হয়ে শুধু শুধু গাঁয়ে পড়ে থাকবে কেন?

ভুজঙ্গধর এবার বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বললো, গেরাম থিকা সব ভালো ভালো জিনিস যদি আপনেরা শহরে লইয়া যান তাইলে আমরা কী লইয়া থাকুম? শহর থিকা কিছু ভালো জিনিস ছিটেফোটা গ্রামে পাঠাইতে পারেন না?

নবীনকুমার বললো, এটাই এ যুগের রীতি। ভট্‌চাজমশাই, সুযোগ পেলে সব গুণী জ্ঞানীরা শহরে যাবেই। কারণ শহরে টাকা আছে। টাকাই তো মধু!

—হ। টাকা যে কতবড় মধু, তা আমি জানি। কিন্তু ছোটবাবু, শহরের সেই টাকার যোগান দেয় কে? এইসব গেরামের টাকাই শহরে যায় না? গ্রামই হইল গিয়া দেহ, এই দেহ'র সব রক্ত যায় শহর নামের মস্তিষ্কে। কি, ভুল কইতাছি? তবে, আপনেরাও এই কথাডা ভোলবেন না যে মানুষের হৃৎপিণ্ডটা থাকে দেহ'র মইধ্যেই, মস্তিষ্কে না। গ্রামই দ্যাশের প্রাণ।

নবীনকুমার নিজ গাত্র থেকে শালটি খুলে নিতাইচাঁদকে শিরোপা দিল। তারপর তার গুপীযন্ত্রটি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

সেইদিন থেকেই নবীনকুমার নিতাইচাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা নিতে শুরু করলো। তার নিজের কণ্ঠেও বেশ সুর আছে, গান তুলতে পারে সহজে। এই শিল্পকলাটি সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটা তৃষ্ণা রয়ে গেছে অনেক দিন থেকেই। হরিশ মুখুজ্যের সঙ্গে সে মুলুকচাঁদের আখড়ায় যেত প্রধানত নৃত্য-গীতের আকর্ষণেই। মনে মনে সে সঙ্কল্প নিয়ে ফেললো, এবার ফিরে গিয়ে সে বাড়িতে নিয়মিত গান বাজনার আসর বসাবে। গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আরও ভালো ভালো গায়কের সন্ধান পেলে সে তাদেরও নিয়ে যাবে শহরে।

দিন দুয়েক পরে সে ভুজঙ্গধরের পেড়াপিড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই গ্রাম পরিদর্শনে বেরুলো। এবার অবশ্য পদব্রজে নয়, পালকিতে। সঙ্গে দুলালচন্দ্র এবং অন্য কয়েকজন সহচরও রইলো। ঘোরা হলো প্রায় চার-পাঁচটি গ্রাম। মধ্যে মধ্যে পালকি নামিয়ে নবীনকুমারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, সেই আসরে গ্রামের কিছু মানুষজনের সঙ্গেও দেখা হয়। অধিকাংশই রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা। নবীনকুমার বিস্ময় বোধ করে। এখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আর নেই, তবু গ্রামের মানুষদের এ দশা কেন?

এক স্থানে সম্ভবত আগে থেকেই কোনো ব্যবস্থা করা ছিল। নবীনকুমার একটি বড় আটচালাসমেত কাছারি বাড়িতে এসে পৌঁছোলো মধ্যাহ্নে।

ভুজঙ্গধর জানালো যে এখানেই নবীনকুমার আহার সেরে কয়েক ঘণ্টা জিরিয়ে নেবে। তবে তার আগে স্থানীয় প্রজাদের একবার সাক্ষাৎ দিলে ভালো হয়।

নবীনকুমার কাছারি থেকে আটচালার প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, সেখানে জমায়েত হয়েছে প্রায় হাজার খানেক মানুষ। ভুজঙ্গধর তাদের উদ্দেশে সাধু বাংলায় বললো, শুন. প্রজাগণ। আমাদের পরম পূজ্য জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত নবীনকুমার সিংহ মহাশয় তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এতদিন আমাদিগের এ অঞ্চলে আসিতে পারেন নাই। তোমরা ইঁহার অগ্রজ বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ মহাশয়ের পরিচয় এককালে জানিয়াছ। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য নিজের রক্তপাত পর্যন্ত করিয়াছিলেন, কারাগারের অন্ধকারে দুঃসহ ক্লেশের সহিত দিন কাটাইয়াছেন। ইনি তাঁহারই সুযোগ্য ভ্রাতা, আমাদের পূজনীয়, মহানুভব ঈশ্বর রামকমল সিংহের পুত্র। এতকাল পরে তিনি এতদঞ্চলে আসিয়া, তোমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং পর পর দুই বৎসরের আকালের কথা বিবেচনা করিয়া, তিনি দয়াপূর্বক তোমাদের এই দুই বৎসরের খাজনা মকুব করিয়া দিলেন।

প্রজারা প্রথমে একেবারে নীরব থেকে মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে একেবারে ফেটে পড়লো।

ভুজঙ্গধর নবীনকুমারের দিকে চেয়ে বললো. হুজুর, এবার আপনি ঘোষণাটি একবার নিজের মুখে উচ্চারণ করুন।

নবীনকুমারের কাছে ঘোষণাটি যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই অদ্ভুত। সে কড়া গলায় বললো. এই প্রহসনের মানে কী? এখেনকার আদায়-তহশিল আপনি করেন, আমি নামেই শুধু জমিদার। আপনি নিজের মুখে স্বীকার করেচেন যে এখেন থেকে একটা আধলাও আমরা পাই না। তবে আর আমার এ খাজনা মকুব করা না-করায় কী আসে যায়?

ভুজঙ্গধর বললো, ছোটবাবু. আমি আপনেগো টাকা কড়ি দেই বা না দেই সেটা ভেন্ন কথা। সেটা আমার-আপনেগো ব্যাপার। আমি জানি, এই লোকগুলোর এখন খাজনা দেওয়ার ক্ষ্যামতা নাই। আমি হয়তো খাজনার জইন্যে অগো উপর চাপ দিলাম না, কিন্তু খাজনা না দিয়া জমিদারকে ঠকাইলে অগো মনের মইধ্যে একটা পাপের ভাব থাকে। অরা ভাবে. খাজনা না দিলে জমি পয়মন্ত হয় না। সুতরাং, আপনে জমিদার হইয়া যদি নিজের মুখে খাজনা মকুব কইরা দ্যান অরা স্বস্তি পায়।

দু' হাত তুলে প্রজাদের উদ্দেশ করে ভুজঙ্গধর আবার বললো. এই চুপ! চুপ! ছোটবাবু কথা কবেন. তোরা মন দিয়া শোন।

সকলে থেমে যেতে নবীনকুমার বললো. তোমাদের খাজনা মকুব।

ভুজঙ্গধর বললো, দুই বৎসরের জন্য।

নবীনকুমার বললো. না। চিরকালের জন্য। আজ থেকে আমার এলাকার সব জমি নিষ্কর হয়ে গেল!

নবীনকুমার এইটুকু বলে থেমে যেতেই এমন কোলাহল শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দুষ্কর। কারুর কোনো কথা বোঝা যায় না। প্রজারা অনেকে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। জমিদার আছে. অথচ জমির খাজনা লাগবে না, এ আবার কেমন কথা! কয়েকজন লোক অতশত না বুঝেও ছুটে এলো নবীনকুমারের পায়ে পড়ে প্রণাম জানাবার জন্য। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে নিরাপত্তার জন্য নবীনকুমারের

পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভুজঙ্গধর নবীনকুমারকে টেনে নিয়ে এলো কাছারি ঘরের মধ্যে।

এবার নবীনকুমারের মুখে মৃদু হাস্যের রেখা। ভুজঙ্গধরের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকের সুরে বললো, কেমন জব্দ করলুম আপনাকে?

ভুজঙ্গধর বিমূঢ় ভাবে বললো, এ আপনে কী কইলেন ছোটবাবু? চিরকালের জইন্য খাজনা মকুব? তাও কখনো হয় না কি? এ তো পোলাপানগো মতন কথা!

নবীনকুমার বললো, আপনি ভেবেচিলেন, আপনি নিজে চিরকাল আমাদের জমিদারির রোজগার হজম করবেন! সে পথ মেরে দিলুম কি না?

ভুজঙ্গধর বললো, কিন্তু সরকারের ঘরে তো আপনাগো বৎসর বৎসর ট্যাকসো জমা দিতে হইবে ঠিকই--যদি কোনো আয় না থাকে, তাইলে...

---সে দেখা যাবেখন!

নবীনকুমারের ঘোষণায় বিরাট এক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। ইব্রাহিমপুর পরগনায় অনেকগুলি গ্রাম, সেইসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কার কার খাজনা মকুব হলো, কার হলো না, তা বোঝাই গেল না। যে-সব প্রজা সেদিন উপস্থিত ছিল জমিদারের সামনে, শুধু তারাই কি এই সুবিধে পেল? এর মধ্যে আবার কিছু এলাকা ছিল নীলকরদের কাছে ইজারা দেওয়া, সাহেবরা চলে যাবার পর চাষীরা আপনমনে চাষ করে চলেছে বটে কিন্তু জমি ইজারামুক্ত হয়েছে কি না তাই বা কে জানে!

নবীনকুমারের পক্ষে আর ইব্রাহিমপুরের কুঠীবাড়িতে টেঁকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দলে দলে লোক ধেয়ে আসছে, তারা প্রত্যেকে নিজের জমির খাজনা বিষয়ে জমিদারের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সে এক অসম্ভব ব্যাপার, নবীনকুমারের স্নানাহার করারও সময় নেই, কারণ এই সব অবোধ মানুষগুলি এক কথা বারবার বুঝিয়ে বললেও বোঝে না। গ্রামে-গঞ্জে ঢাক পিটিয়ে জমিদারের বার্তা জানাবার জন্য ঘোষক পাঠানো হলো। কুঠীবাড়ি ছেড়ে নবীনকুমার আশ্রয় নিল বজরায়। সেখানেও তার সঙ্গী রইলো ভুজঙ্গধর।

বজরা ভেসে চললো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই। দিনে মাত্র একবার কোনো জনবিরল স্থানে থামে। ভুজঙ্গধরের কাছে প্রায় সর্বক্ষণ সে-গ্রামের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় শোনে। এ যাত্রার প্রারম্ভে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল প্রকৃতি প্রেমে, এখন তার আগ্রহ জীবন্ত মানুষ সম্পর্কে। ইতিমধ্যেই নবীনকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইব্রাহিমপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটানা পাকা সড়ক সে নিজব্যয়ে নির্মাণ করে দেবে। পথের যোগাযোগের অভাবে গ্রাম্য পণ্য মার খায়।

একদিন মধ্যাহ্নে নদীর দক্ষিণ তীরের একটি গ্রামে বহু লোকের বিপন্ন হাহাকার শোনা গেল। মানুষজন ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। নবীনকুমার সেদিকে বজরা ভেড়াতে বলতেই ভুজঙ্গধর নিষেধ করলো। ঐ পারে সুখচরের জমিদারের এলাকা।

ভুজঙ্গধর বললো, আপনের পক্ষে ওখানে পদার্পণ করা মোটেই উচিত হয় না। ঐ দ্যাখেন আর এক লাহামের জমিদার। ওনার নায়েব পাঁচখানা হাতি লইয়া গেরামে আসে। যে-সব দুষ্ট প্রজা খাজনা দেয় না, তাগো বাড়ি হাতির পায়ের গুঁতায় গুঁড়াইয়া দ্যায়। সেইজন্যই সুখচরের জমিদারের বাড়িতে সব সময় টাকা ঝমর ঝমর করে। সেই টাকায় বাবুরা কইলকাতায় বাঈজী নাচায় আর পায়রা উড়ায়। মন্দিরও বানাইছে দুই তিন খান!

একটু হেসে ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করে, ছোটবাবু, আপনে কইলকাতায় মন্দির বানান নাই?

নবীনকুমার সে প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করে অন্যমনস্কভাবে বলে, সরকারের চোকে আমরা এখনো ইব্রাহিমপুরের জমিদার। আপনি আমাদের নায়েব। এখন থেকে আপনি নিয়মিত মাস মাইনে পাবেন। আপনার ওপর অনেক কাজের ভার দোবো। প্রতি দুখানা গাঁ অন্তর ইস্কুল বানাতে হবে, আকালের বচরে বিনা সুদে চাষীদের বীজ ধান আর খোরাকি ধান দিতে হবে। আর...

ভুজঙ্গধর বললো, কইলকাতায় ফিরা গ্যালেই সব ভুইল্যা যাবেন জানি। কিংবা, বিধু মুখুইজ্যা এখনো বাঁইচ্যা আছেন না? তিনিই সব ঘুরাইয়া দিবেন।

নবীনকুমারের বজরার হাল ভেঙে পড়ায় মেরামতির জন্য এক স্থানে থামতে হলো। টানা প্রায় পাঁচ দিন বজরায় বসে থেকে হাত পায়েরও খিল ধরে গেছে। নবীনকুমার নেমে একটু ঘোরাঘুরি করতে চায়। স্থানটি ইব্রাহিমপুর সদর থেকে অনেক দূরে, সম্ভবত নবীনকুমারের আগমনবার্তা এতদূর এসে পেঁছোয় নি।

ভিনকুড়ি আর ধানকুড়ি নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গত কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গাছপালা আরও বেশী সবুজ। বাতাস খুব সুখপ্রদ। দুলাল ও ভুজঙ্গধর সমভিব্যাহারে নবীনকুমার হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো অনেকখানি। তাদের পশ্চাতে ছোট একটি কৌতূহলী দলের ভিড় জমেছে। সেদিকে মন না দিয়ে নবীনকুমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।

একটি তাল গাছের নিচে বহুকাল আগে অগ্নিদগ্ধ এক কুটিরকে ঘিরে আগাছার এক জঙ্গল জন্মে গেছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনুষ্য-কণ্ঠের ঘড় ঘড় শব্দ শুনে নবীনকুমার থমকে দাঁড়ালো।

সেই জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো একজন। অনেকটা মনুষ্যাকৃতি হলেও সে মানুষ না বন্যপ্রাণী তা সহজে বোঝা যায় না। তার পরণে কোনো সুতির বস্ত্র নেই, কয়েকটি গাছের ডাল তার কোমরের ঘুনসীর সঙ্গে বাঁধা। বুকে মুখে মাটি মাখা। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছর সে কোনো ক্ষৌরকারের সংস্পর্শে যায় নি। লোকটি এগিয়ে এসে সেই দলটির দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

গ্রামবাসীদের কয়েকজন বলে উঠলো, সাবধান বাবুরা, ওর কাছে যাবেন না।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কে এই লোকটি?

গ্রামবাসীরা জানালো যে, এই লোকটির নাম ত্রিলোচন দাস। এক সময় কয়েক বৎসরের খাজনা বাকি পড়ায় জমিদারের লোক-লস্কর এসে ওর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সব কিছু এখনো সেই অবস্থাতেই আছে।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, এখানে কাদের জমিদারি?

ভুজঙ্গধর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো যে, এটাও ইব্রাহিমপুরের মধ্যেই বটে, কিন্তু এই ঘটনা তার আমলে নয়। এ ঘটনার কথা সে জানে।—ভুজঙ্গধর নায়েবী করছে গত বিশ বৎসর। তার আগেকার নায়েব উদ্ধবনারায়ণের নাম শুনলে এখনো অনেকে ভয়ে কাঁপে। প্রজাদের ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা ছিল তাঁর শখের ক্রীড়া।

নবীনকুমার বললো, এতকাল ধরে এই বাড়ি সেই অবস্থায় আছে। আপনার আমলেও আপনি কিছু সুবন্দোবস্ত করেন নি?

ভুজঙ্গধর জানালো যে, চেষ্টা করলেও করবার উপায় নেই। ও কারুকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

গ্রামবাসীরা আরও তথ্য জানালো যে, নায়েবের অত্যাচারে লোকটি স্ত্রী-পুত্র-

কন্যাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। অনেক দিন ওর কোনো সংবাদ ছিল না, ওর ভিটে এই পোড়ো অবস্থাতেই ছিল। তারপর বেশ কিছু বছর পর ও একা ফিরে আসে ঘোর উন্মাদ হয়ে। নিজের ভিটেটুকু শুধু চেনে। আর কোনো মানুষ চেনে না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও এই ভিটের মাটি কামড়ে কামড়ে খায়। আর কোনো খাদ্য ওকে কেউ গ্রহণ করতে দেখেনি কখনো। এমন কি অন্য কেউ কিছু খাদ্য ছুঁড়ে দিলেও ও তা স্পর্শ করে না। শুধু মাটি খেয়েই ও বেঁচে আছে।

এই সময় ত্রিলোচন দাস ধীর স্বরে বললো, বাবু, একটু জল দেবেন, চিঁড়ে ভিজায়ে খাবো!

নবীনকুমার বললো, ঐ তো লোকটি জল চাইছে, চিঁড়ে চাইছে!

গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে বলে উঠলো, না, না, শুনবেন না, ওটা ওর কথার কথা। ও খুব সাঙ্ঘাতিক। কাছে যাবেন না। কিন্তু নবীনকুমার সে সব অগ্রাহ্য করে দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো, হ্যাঁ, তোমাকে চিঁড়ে দোবো, অন্য খাদ্য দোবো, তোমার চিকিৎসা করাবো তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

ত্রিলোচন দাস সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ব্যাঘ্রের মতন এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নবীনকুমারের ওপরে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই দেখা গেল, নবীনকুমার ভূতলশায়ী, আর ত্রিলোচন তার বক্ষস্থল কামড়ে ধরেছে।

সকলে মিলে হুড়োহুড়ি করে যখন ত্রিলোচন দাসকে টেনে তোলা হলো, তখন দেখা গেল তার মুখে নবীনকুমারের পোশাকের একটি টুকরো সমেত এক খাবলা মাংস।

তার প্রভুর এই দশা করেছে দেখে দুলাল ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ লোকটির চুলের মুঠি ধরে ফেলে দিল মাটিতে এবং তারপর তার হাত ও পা সমানে চালাতে লাগলো। অন্যরাও যোগ দিল তার সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই উন্মাদ ত্রিলোচন দাস দুলালের প্রহারে খুন হয়ে গেল।

ভুজঙ্গধরের ক্রোড়ে শায়িত নবীনকুমার তখন সংজ্ঞাশূন্য। তার ক্ষতস্থান দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

কলকাতার গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য, তাদের সংযত ও সুশৃঙ্খল রাখার ভার নিয়েছে শ্বেতাঙ্গ ফৌজী বাহিনী। স্বাস্থ্যবান অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় গোরা সৈনিকদের অঙ্গে নতুন উর্দি, তাদের কৃতিত্বের মেডেলগুলি সদ্য মার্জিত হয়ে ঝকঝক করছে। প্রিন্সেপ ঘাটে এসে থেমেছে বিশাল এক রাজকীয় রণতরী। নতুন ভাইসরয় আজ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পদার্পণ করবেন।

তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। তাদের সকলের মুখমণ্ডলেই কৌতূহলের চিহ্ন পরিস্ফুট। নতুন ভাইসরয় হিসেবে যিনি আসছেন তিনি রাজনীতিজগতে প্রায় অপরিচিত। সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক পদটি কে পাবেন, তা নিয়ে অনেক

দিন ধরে জল্পনা কল্পনা চলে, প্রার্থীও থাকেন ইংলন্ডের সর্বোচ্চ সমাজের বেশ কয়েকজন। কিন্তু এবার এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ভাইসরয় হয়ে আসছেন একজন আইরিশম্যান। এই লর্ড নাস-এর নাম কলকাতার শ্বেতাঙ্গরা প্রায় কেউই শোনেনি।

প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি যখন লর্ড নাস-কে এই সর্বোচ্চ চাকুরিটিতে নিয়োগ করলেন, তখন প্রচুর সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, কিন্তু ডিজরেইলি অটল। লর্ড নাস জাহাজ যোগে যাত্রা করলেন ভারতের উদ্দেশে। মধ্যপথে পেঁছোতেই এক নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। পার্লামেন্টে পতন হলো ডিজরেইলির দলের। প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্লাডস্টোন। ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেলের পদে প্রধানমন্ত্রীর নিজের পছন্দের লোক না রাখলে চলে না। ডিজরেইলি-গ্লাডস্টোনের রেষারেষি বহু বিদিত। ভারতের ভাইসরয় হিসেবে গ্লাডস্টোন নিজের লোক বসাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মধ্যপথ থেকে মনোনীত প্রার্থীকে ফিরিয়ে আনা সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে সম্মানহানিকর, মহারানী ভিক্টোরিয়ারও সেরকম অভিপ্রায় নয়, তাই গ্লাডস্টোন আপত্তি জানালেন না।

এই লর্ড নাস কিছুদিন আগে মেয়ো-র আর্লডম পাওয়ায় এখন লর্ড মেয়ো নাম নিয়েছেন।

তোপধ্বনি শুরু হবার পর লর্ড মেয়ো জাহাজ থেকে নেমে স্থলে পা দিলেন। তাঁকে প্রথম দর্শনেই সমবেত দর্শকদের মধ্য থেকে প্রশস্তিসূচক শব্দ উত্থিত হলো। এমন সুপুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের এমন সমন্বয়ই বা ক'জনের হয়। লর্ড মেয়ো দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, মহাব্যূঢ়, অথচ তাঁর মুখখানি লালিত্যময়। তাঁর শরীরে তেজ, দীপ্তি এবং শ্রী একসঙ্গে মিশে আছে।

প্রিন্সেপ-এর ঘাট থেকে লাটভবন পর্যন্ত সামান্য পথটুকু তিনি পদব্রজেই গেলেন। প্রজাদের অভিভূত করবার জন্য বড়লাটের প্রথম আগমন উপলক্ষে প্রচুর জাঁকজমকের ব্যবস্থা থাকে। পথের দু'পাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হাইলান্ডার পোশাক পরিহিত বাদকরা শুরু করে ঐকতান, অস্ত্র ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়। এই স্বল্প পথ পার হতেই লর্ড মেয়োর অনেক সময় লাগলো।

প্রথা অনুযায়ী, লাটভবনের সামনের সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন বিদায়ী ভাইসরয় জন লরেন্স। তাঁর অঙ্গে আজ বড়লাটের সম্পূর্ণ পোশাক পদক, তারকায় বক্ষস্থল প্রায় আবৃত। মধ্যবয়স্ক জন লরেন্সের মুখখানি ক্লান্ত দেখলেই বোঝা যায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে। তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে সগৌরবে নয় ভগ্নমনোরথে। ভারতের বহু যুদ্ধের বীর সেনানী জন লরেন্স ভাইসরয় হিসেবে তেমন সার্থক হতে পারেন নি। কলকাতা শহরটিকে তিনি পছন্দ করতে পারেন নি, কলকাতার কর্মচারীরাও পছন্দ করেনি তাঁকে। রণক্ষেত্রে হুকুমজারি করতে যিনি অভ্যস্ত, অসংখ্য ফাইলের লাল ফিতের বন্ধনে বাঁধা পড়ে তিনি ছটফট করেছেন। তরবারি ছেড়ে শাসকের কলম ধরলে যেকোনো নির্দেশ জারি করবার আগে তাঁকে অধীনস্থ কর্মচারীদের সূক্ষ্ম কূট যুক্তিজালের সম্মুখীন হতে হয় তা ছাড়া তিনি সর্বক্ষণ লাট সাহেবের মতন কেতাদুরস্ত থাকতে পারেন না কলকাতার গরম অসহ্য হলে যখন তখন কোট, ওয়েস্ট কোট, কলার, টাই খুলে ফেলেন, এমন কি জুতোর বদলে চটি পরে বেড়ান, মাঝে মাঝে দেশীয় লোকদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলেন। কোনো বড়লাটের পক্ষে এরকম ব্যবহার তো অকল্পনীয়। তিনিই প্রথম প্রতি গ্রীষ্মে কলকাতা থেকে রাজধানী সিমলা

পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, তাতেও সিভিলিয়ানদের খুশী করতে পারেন নি। কখনো কখনো তাঁর কথাবার্তায় নেটিভদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন বলে আড়ালে তিনি তাঁর স্বজাতীয়দের উপহাসের পাত্র।

আজ সম্পূর্ণ ধরাচূড়া পরে, আড়ষ্ট, ক্লান্তভাবে তিনি দাঁড়িয়ে বড়লাট হিসেবে শেষ কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত। লর্ড মেয়ো পরিধান করে আছেন সরল সকালের পোশাক। সেই সুদর্শন পুরুষটি প্রফুল্ল বদনে উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। তোপ-ধ্বনি তখনও চলেছে।

নতুন ভাইসরয়ের আগমনের কারণে আজ গঙ্গায় সবরকম নৌকা ও জাহাজ চলাচল বন্ধ। নদীর মধ্যখানে সারি সারি যুদ্ধজাহাজ ঘাটগুলি ঘিরে রেখেছে। নবীনকুমারের বজরা এর মধ্যে এসে বড়ই অসুবিধেয় পড়ে গেল। উজানের টানে বজরাটি চলে এসেছে চাঁদপাল ঘাটের দিকে, কিন্তু এখন কূলে বজরা ভেড়াবার কোনো উপায় নেই। নবীনকুমার গুরুতর রকমের অসুস্থ। যত শীঘ্র সম্ভব তার সুচিকিৎসার প্রয়োজন। বজরার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দুলালচন্দ্র একেবারে দাপা-দাপি করতে লাগলো। কিন্তু গোরা সিপাহীদের সে কী উপায়েই বা বোঝাবে! এখন ভাঁটা ঠেলে বজরা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

বজরার মধ্যে ছোট কামরায় নবীনকুমার নিদ্রিত। শিয়রের কাছে বসে আছে ভুজঙ্গধর। নবীনকুমারের বক্ষের ক্ষতস্থানে মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভুজঙ্গধর সেই সাঙ্ঘাতিক ঘটনার পর অনতিবিলম্বেই ধানকুড়ি গ্রামের এক প্রবীণ কবিরাজকে দিয়ে নবীনকুমারের ক্ষতস্থানে ওষুধ প্রয়োগ করে বেঁধে দিয়েছে। এবং আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে অতিরিক্ত দাঁড়িমাঝি নিয়ে বজরা চালিয়েছে ঝড়ের বেগে কলকাতার দিকে।

মাঝে মাঝেই নবীনকুমারের ব্যাণ্ডেজের সাদা কাপড় ভিজে যাচ্ছে লাল রক্তে। ঘুমের মধ্যে এক আধবার পার্শ্ব পরিবর্তন করলেই নতুনভাবে রক্তক্ষরণ হয়। এর মধ্যে দু'বার মাত্র জ্ঞান ফিরেছিল নবীনকুমারের।

মানুষের কোলাহল, ব্যাণ্ড বাদ্য এবং তোপের প্রচণ্ড গর্জনেও নবীনকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে না দেখে ভুজঙ্গধর শঙ্কিত হয়ে উঠলো। নিজের কাছে সে একটি ছোট কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দর্পণ রেখে দিয়েছে। এখন সেই দর্পণটি অতি সাব-ধানে নিয়ে এলো নবীনকুমারের নাসিকার কাছে। একটু পরে সেই আয়নার কাঁচ একটু ঝাপসা হতে দেখে ভুজঙ্গধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

নদীতীর প্রহরীমুক্ত হবার পর নবীনকুমারকে নামানো হলো বজরা থেকে। তারপর একটি পালকিতে শুইয়ে দেবার পর ভুজঙ্গধর পালকিবাহকদের নির্দেশ দিল যে, তাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে পা মেপে মেপে চলতে হবে ধীরে ধীরে। কোনোক্রমেই যেন পালকি না দোলে। দুলাল আর সে রইলো পালকির দু-পাশে। জোড়াসাঁকোর সিংহসদনে পৌঁছোতে পৌঁছোতে তাদের দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেল।

গঙ্গানারায়ণ তখন গৃহে নেই, লোক ছুটলো তাকে সংবাদ দিতে। দুলাল তার মধ্যেই প্রায় সবলে ধরে নিয়ে এলো ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীকে। তিনি কিছুদিন যাবৎ এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। তিনি সদ্য তখন মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন, দুলালের তাড়নায় আহার অসমাপ্ত রেখে তাঁকে ছুটে আসতে হলো।

ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষত স্থান দেখে ডাক্তার সাহেব বলে উঠলেন, মাই গাড্!

কোন্ ক্যানিবালের পাল্লায় পড়েছিলেন ইনি? মানুষ কখনো মানুষের মাংস এত-খানি কামড়ে নিতে পারে?

তারপরই তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, উণ্ডের ওপর এত সব ধুলো বালি কেন? হট্ ওয়াটারে কটন ভিজিয়ে পরিষ্কার করে দেবার বুদ্ধিও কারুর হেড-এ আসে নি?

ভুজঙ্গধর কাঁচুমাচু ভাবে বললো, আজ্ঞে, তা দেওয়া হইয়াছে। এক কবিরাজ মশায় ঔষধ লাগাইয়া দিছেন।

সূর্যকুমার বললেন, ওষুধ না রাবিশ। দোজ কোয়াক্স্! একেই বলে অ্যাডিং ইনসাল্ট টু দি ইনজুরি! এর ফলে কত কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে—

কবিরাজদের একেবারেই পছন্দ করেন না সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তিনি দ্রুত হাতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লাগলেন।

ডাক্তার আসবার আগে পর্যন্ত সরোজিনী এবং কুসুমকুমারী এই কক্ষে ছিল। যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলেই সরোজিনী ভীতি-বিহ্বল হওয়া ও কান্না ছাড়া আর কিছু জানে না। এখন তারা অপেক্ষা করছে পার্শ্ববর্তী কক্ষে। ডাক্তার সাহেবের মুখে ইংরেজী তর্জন গর্জন শুনে সরোজিনী আরও ভয় পেয়ে কান্না শুরু করে দিল আবার। সরোজিনী বাইরের কোনো লোকের সামনেই যায় না, তাদের সঙ্গে কথাও বলে না। কুসুমকুমারী এতটা পরদা মানে না। সে এগিয়ে এসে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে বললো, দুলাল, ডাক্তারবাবুকে ভালো করে জিজ্ঞেস কর, কতখানি ক্ষতি হয়েচে! কোনো সাহেব ডাক্তারকে ডাকতে হবে কিনা!

ডাক্তার বললেন, ভয়ের তো কিছু নেই। আউটওয়ার্ড ইনজুরি, ক-দিনেই শুকিয়ে যাবে। ইউ ক্যান কল্ ইওরোপিয়ান ডক্টরস, কিন্তু আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখি না।

কুসুমকুমারী আবার বললো, দুলাল, তুই ডাক্তারবাবুকে বলিচিস, যে কামড়েচে সে একটা বদ্ধ পাগল?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, পাগল না হলে কোনো সেইন লোক কি কোনো মানুষকে এমনভাবে বাইট করে। ওহে, তোমার গিন্নীমাদের জানিয়ে দাও, চিন্তার কোন কারণ নেই।

ডাক্তার সাহেব ক্ষত পরিষ্কার করে, মলমের প্রলেপ লাগিয়ে পটু হাতে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর অন্য ঔষধপত্রের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফ্রেস ব্লিডিং যদি হয়, দেন অ্যান্ড দেয়ার আমায় কল দেবে। নচেৎ আমি কাল সকালে নিজেই আবার আসবো।

ডাক্তার চলে যাবার পর দুলাল বাইরের অন্যান্য লোকদের ঘর ছেড়ে দিতে বললো। সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনী, কুসুমকুমারী ও অন্য কয়েকজন আত্মীয় রমণী এসে ঢুকলো সেখানে এবং এক-একজন পালা করে বলতে লাগলো অন্য কবে কোথায় মানুষে মানুষকে কামড়ানোর ঘটনা শুনেছে বা দেখেছে। দেখা গেল, এই ঘটনা খুব দুর্লভ নয়। অনেকেই এ রকম বিষয়ে জানে।

এই সময় জুতো মসমসিয়ে ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ফিরে এসে দাঁড়ালেন দ্বারের কাছে। মহিলারা পালাবার পথ পায় না, যে যার দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একগলা ঘোমটা টেনে দিল। শুধু কুসুমকুমারী স্থানচ্যুতা হলো না, চোখ নামালো মাটির দিকে।

ডাক্তারসাহেব বললেন, একটা ইম্পর্টাণ্ট কথা বলার জন্য আমি ফিরে এসেছি।

ইউ মাস্ট নট ডিস্টার্ব দি পেশেণ্ট। এখানে শোরগোল করবেন না। শুধু একজন দু-জন থাকুন, যাতে জ্ঞান ফিরলে পেশেণ্ট হঠাৎ উঠে না বসতে চায়। ইংলণ্ডের রমণীরা এই রকম সময়ে বেশী কমপোজড...আই মীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়।

এবারে রইলো শুধু সরোজিনী ও কুসুমকুমারী। একটুক্ষণ থেকে থেকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে সরোজিনী। কুসুমকুমারী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, ওলো, কাঁদিস নি বোনটি, মিছিমিছি কান্না যে অলুক্ষুণে, ডাক্তার-বাবু তো বললেনই ভয়ের কিছু নেই।

সরোজিনী অশ্রুসজল মুখখানি তুলে বললো, ও দিদি, মানুষের দাঁতে যে সাঙ্ঘাতিক বিষ!

কুসুমকুমারী বললো, কে বললে তোকে?

সরোজিনী বললো, হ্যাঁ আমি জানি! পাগল যদি কারুকে কামড়ায়, তা হলে সেও পাগল হয়ে যায়! আমার বাপের বাড়িতে একবার এমন হয়েছেল!

নিজের অজ্ঞাতসারেই কুসুমকুমারী নিজের বাম স্কন্ধে হাত রাখলো। মানুষে মানুষকে কামড়ায়। এমনকি কোনো পাগল কামড়ালেও যে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো সে নিজে। তার কাঁধে এখনো দাগ আছে।

কিন্তু সে ঘটনার উল্লেখ না করে সে আস্তে আস্তে বললো, না রে, ও সব ভুয়ো কতা! তেমন কিছু ভয় থাকলে ডাক্তারবাবু বলতেন না?

সরোজিনী দু দিকে মাথা নেড়ে বললো, বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই, ও দিদি ভাসুরঠাকুর কখন আসবেন? আমার বুকের মধ্যে এমন ধড়ফড় কচ্চে, আমি যে আর বসে থাকতে পাচ্চি নি!

গঙ্গানারায়নের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেরি হলো। গঙ্গানারায়ণ নিজেদের কোম্পানির হৌসে বেরিয়েছিল, সেখানে গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে সে চলে গেছে স্পেনসেস হোটেলে।

বিলাত থেকে ফেরার পর মধুসূদনের প্রায় দুই বৎসর কেটে গেছে এই হোটেলে। এই ব্যয়বহুল স্থান ছেড়ে কোনো ভদ্র পল্লীতে বাসা ভাড়া করে থাকবার জন্য বন্ধু শুভার্থীরা অনেকেই পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদন কর্ণপাত করেননি। সাহেবগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যারিস্টারি করতে গেলে সাহেবী চাল-চলন রক্ষা করতেই হবে। মধুসূদনের ভাষায় এটাই বামুনপাড়া।

স্ত্রীকে বিলাতেই রেখে এসেছেন, পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাও চলছে সেখানে। প্রতি মাসে সেখানে অর্থ প্রেরণ করা এবং স্পেনসেস হোটেলে নিজের খরচ চালানো কয়েক মাসের পরেই মধুসূদনের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে এলো। ব্যারিস্টার মাইকেল এম এস ডাট যত খ্যাতনামা তত উপার্জনক্ষম নন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলে আদালতে তাঁর স্পীচ্ ততটা মর্মস্পর্শী নাটকীয় হয় না। মাঝে মধ্যে তিনি বিচারকদের তির্যক বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। নিয়মিত আদালতে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। মক্কেলদের সঙ্গে ব্রীফ নিয়ে আলোচনা করার বদলে বান্ধব সংসর্গে মজলিস করাই তাঁর বেশী পছন্দ। অর্থের সাঙ্ঘাতিক টানাটানি থাকলেও কোনো পরিচিতব্যক্তি মামলা নিয়ে এলে, এমনকি কোনো বন্ধুর সুপারিশ নিয়ে কেউ এলেও মধুসূদন তাদের মামলায় ফি নিতে চান না। তাঁরা নেহাত জেদাজেদি করলে বলেন, ঠিক আছে, তা হলে এক বোতল বার্গাণ্ডি, আধ ডজন বীয়ার আর শ'খানেক মালদার ল্যাংড়া আম পাঠিও।

প্রবাসে নিরুপায় হয়ে যাঁর কাছে বার বার হাত পেতেছেন, স্বদেশে এসেও চরম আর্থিক বিপর্যয়ের সময় সেই বিদ্যাসাগরের কাছেই আবার ঋণ চাইতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগরেরও একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তিনি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মধুকে টাকা পাঠিয়েছেন, এখন সেই সব মহাজনরা তাঁকে ঋণ শোধের জন্য বার বার তাগিদ দিয়ে এখন মামলার হুমকি দিচ্ছে। এবার বিদ্যাসাগর কঠোর হলেন। মধুসূদনের বর্তমান জীবনযাপন পদ্ধতি তাঁর পছন্দ হবার কথা নয়, বিশেষত এজন্য তিনি কেন অর্থের জোগান দিয়ে যাবেন!

মধুসূদন ব্যারিস্টারিতেও সার্থক হতে পারছেন না। এদিকে তাঁর কবিত্ব শক্তিও উধাও। এটা সেটা লেখবার চেষ্টা করছেন, কোনোটাই দানা বাঁধে না। ভিতরে ভিতরে দারুণ অস্থিরতা এবং তা নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় সুরাপান।

বিলাতে অর্থ প্রেরণ অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় হেনরিয়েটাও দারুণ দুর্বিপাকে পড়েছে। পুত্রকন্যারা আবার অনাহারের সম্মুখীন। এই অবস্থায় হেনরিয়েটা আবার কলকাতায় স্বামী সন্নিধানে ফিরে আসার সংকল্প নিল। নিজেই সে চেষ্টা করতে লাগলো কোনো জাহাজ কোম্পানির কাছে সস্তায় প্রত্যাবর্তনের টিকিট পাবার জন্য! এই সংবাদ পেয়ে মধুসূদন আরও অস্থির। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের তিনি যোগ্য সমাদরের সঙ্গে কোথায় রাখবেন, কেমনভাবে সংসার চালাবেন? এই চিন্তায় চিন্তায় মধুসূদনের মদ্যপানের পরিমাণ আরও বর্ধিত হলো।

বন্ধুরা সকলেই মধুর বর্তমান অবস্থার জন্য উৎকণ্ঠিত। এ রকমভাবে চললে মধু আর কতদিন বাঁচবে? তার শরীর অসম্ভব স্থূল হয়ে গেছে। কথাবার্তা সর্ব-ক্ষণ জড়ানো। পানের মতন আহারের প্রতিও মধুসূদনের খুব ঝোঁক হয়েছে ইদানীং। হোটেলে ছ কোর্সের কমে আহার করেন না। কখনো কখনো বিলাতি খাদ্যে অরুচি হলে কোনো বন্ধুর গৃহে গিয়ে সুক্তো-চচ্চড়ি-কুমড়োর ছক্কা খাবার জন্য বায়না করেন। এক একদিন হোটেলের খানসামাকেও বলেন কোনো দিশী পদ রন্ধন করতে। একদিন তাঁর মুগের ডাল খাবার শখ হলো, খানসামাকে হুকুম দিলেন মুগের ডাল বানাতে। হোটেলের পাকশালা থেকে খানসামা পোর্সিলিনের পিরিচে যে তরল পদার্থটি নিয়ে এলো, সেটি মুখে দিয়েই মধুসূদন থুথু করে উঠলেন। এর নাম মুগের ডাল? তৎক্ষণাৎ চিঠি দিয়ে এক আর্দালিকে পাঠালেন খিদিরপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে। তাঁর আজই মুগের ডাল চাই। কিন্তু বাঙালী বাড়ির বাটি-গামলার মতন কোনো পাত্রে তুচ্ছ কোনো দেশী খাবার তো স্পেনসেস হোটেলে ঢোকানো চলে না। তাই মধুসূদন আর্দালির হাতে পাঠিয়ে দিলেন একটি খালি মদের বোতল। সেই বোতলে ভরেই এলো মুগের ডাল এবং মদ্যপানের ভঙ্গিতেই সরাসরি বোতলে চুমুক দিয়ে সেই ডাল খেয়ে মধুসূদন তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আঃ!

মধুসূদনের এই উদ্দাম মদ্যপান কিছুটা রহিত করতে না পারলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মধুর কাণ্ড-জ্ঞান পর্যন্ত চলে গেছে। নইলে সে মাননীয় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে চিঠি লিখে অনুরোধ জানায়, এক বোতল মদ সংগ্রহ করে রাখবেন!

কার্যসূত্রে গৌরদাসকে বাইরে থাকতে হয়, তাই সে গঙ্গানারায়ণকে অনুরোধ করেছে মধুর খবরাখবর নিতে। সেই জন্য গঙ্গানারায়ণ আজই এসেছে। আজও মধুসূদন আদালতে যাননি, একটি ড্রেসিংগাউন আলুথালুভাবে অঙ্গে জড়ানো।

কক্ষটি উগ্র তামাকের গন্ধে ভরপুর। আগে মধুসূদন শখ করে শুধু সিগারেট টানতেন, এখন তিনি আলবোলাতেও ধূমপান করেন। মধুসূদনের হাতে দুটি কাঁচা লঙ্কা, তাদের ডগা ভেঙে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড় জিভ বার করে তাতে ঐ ভাঙ্গা লঙ্কা দুটি ঘষছেন।

গঙ্গানারায়ণের দিকে ফিরে মধুসূদন বললেন, গঙ্গা, মাই ডিয়ার বয়। এই লঙ্কা একটু চেকে দ্যাক তো ঝাল আছে কি না। আই কানট্ ফিল এনিথিং!

গঙ্গানারায়ণের দুই চক্ষে গভীর বিস্ময়। মধুসূদনের কথা শুনে সে প্রায় আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাপরে, কাঁচা লঙ্কা...আমি জন্মে কখোনো খাইনি...।

মধুসূদন ঈষৎ হেসে বললেন, আমরা যশুরে বাঙাল, আমরা খুব ঝাল খেতে পারি. .কিন্তু এখন আর জিভে কোনো সাড় নেই...যত লঙ্কাই ঘষি, ঝাল লাগে না...জিভের আর দোষ কী!

—মধু, তুই কেন এমন সর্বনাশ কচ্চিস! তুই...

—ডোন্ট সারমনাইজ, মাই ডিয়ার...তুই এসিছিস, আয় সেলিব্রেট করা যাক। বোয়! পেগ লাগাও!

—না, না না মধু, এই ভর-দুপুর বেলা তুই আবার শুরু করিস নি!

—ও, তুই তো নিরিমিষ্যি! তা হলে আমি খাই! না খেলে আমার শরীরটা কেমন দম্‌সম করে!

—মধু, আমি সারমন দিচ্চি নি। কিন্তু এ কতা তো আমরা বলবোই যে তুই এত খরচ-পত্তর করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলি, এবার কোথায় বেশ গুচিয়ে বসবি, মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর্বি, তা না, এই হোটেলে ছন্নছাড়ার মতন...।

—গুছিয়ে বসা আর আমার হলো না এ জীবনে!

একটু থেমে মধুসূদন দুঃখিত কণ্ঠে আবার বললেন, সবাই এসে বলে, কেন আমি মন দিয়ে প্র্যাকটিস করছি না! কেউ তো বলে না, কেন আমি আর কাব্য রচনা করছি না?

—না, না। সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন। মেঘনাদের মতন আর একখানা মহাকাব্য তুই কেন শুরু কচ্চিস না? দেশবাসী তোর কাচ থেকে আরও অনেক কিচু প্রত্যাশা করে!

—আই অ্যাম ফিনিসড্! গঙ্গা, দি মিউজ হ্যাজ লেফট মি! আমার আর লেখার ক্ষমতা নেই। আমার পক্ষে এখন বাঁচা-মরা সমান! বিষ খেতে ভয় পাই, তাই এইটে খাচ্চি!

আরও কিছুক্ষণ বসে গঙ্গানারায়ণ নানা রকম কথা বলেও মধুসূদনকে নিবৃত্ত করতে পারলো না। মধুসূদন তো শিশু নন যে অন্যের কথা শুনে চলবেন। তাঁর নেশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রায় হাহাকারের মতন তিনি বার বার বলতে লাগলেন, দি মিউজ হ্যাজ লেফ্‌ট মী!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গঙ্গানারায়ণ হোটেলের বাইরে এসে দেখলো তার জুড়ি-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুর্যোধন গোমস্তা। নানা সূত্র থেকে সে গঙ্গা-নারায়ণের সন্ধান পেয়ে এখানে এসেও সাহস করে সাহেবী হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

সংবাদ পাওয়া মাত্র গঙ্গানারায়ণ বাড়ির দিকে ছুটলো। নবীনকুমারকে তখনও নিদ্রাভিভূত দেখে সে দুলাল ও ভুজঙ্গধরের কাছ থেকে একাধিকবার শুনলো সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ। তারপরই সে আবার বেরিয়ে গেল পরপর এই শহরের

অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক প্রধান তিন চিকিৎসকের কাছে। তিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিল। একমাত্র কবিরাজ ব্যতীত বাকি দু জন তেমন বিপজ্জনক মনে করলেন না। তবে সকলেই ক্ষতস্থান স্বচক্ষে পরীক্ষা করতে চান।

তারপর গঙ্গানারায়ণ গেল ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর কাছে। সূর্যকুমার জেদী পুরুষ। তিনি বললেন, গঙ্গানারায়ণের ইচ্ছে হলে সে যত খুশী বিশেষজ্ঞ দেখাতে পারে। কিন্তু অন্য কেউ চিকিৎসা করলে তিনি আর ভার নেবেন না। সূর্যকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি একাই সারিয়ে তুলতে পারবেন।

গঙ্গানারায়ণ ফাঁপরে পড়ে গেল। সূর্যকুমারও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক এবং পারিবারিক শুভার্থী, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং অন্তত আর একটি দিন অপেক্ষা করতেই হয়।

পরদিন সূর্যকুমার এসে দেখলেন, নবীনকুমারের সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে। মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, কিন্তু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। নবীনকুমারের মাথায় সদ্য গজানো ঘাসের মতন বাইশ দিনের চুল। সূর্যকুমার এসে শুনলেন, অতি প্রাতঃকালেই তাঁর রোগী ক্ষুধার কথা জানিয়ে এক বাটি দুগ্ধ পান করেছে।

শয্যার পাশে একটি চেয়ারে তিনি আসন গ্রহণ করবার পর নবীনকুমার পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বললো, ডক্তর চক্রবর্তী, কেমন অবস্থা আমার? বাঁচবো তো?

সূর্যকুমার বললেন, মরবার জন্য আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অন্তত আরও পঞ্চাশ বছর!

নবীনকুমার ক্ষীণভাবে হাসলো। তারপর বললো, কতখানি কামড়ে নিয়েচে? অনেকখানি?

ডাক্তারবাবু নিজের ডানহাতের আঙুলগুলো দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গোল তৈরি করে বললেন, এই এইটুক্ খানি! দিস মাচ! নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট!

নবীনকুমার হঠাৎ উঠে বসতে যেতেই ডাক্তারবাবু তাকে ধরে ফেলে বলে উঠলেন, আরে ওকি, ওকি!

—এই বাঁধনগুলো একবার খুলুন তো, আমি একবার নিজের চক্ষে দেখবো!

এই কথার সমস্বরে প্রতিবাদ করলো গঙ্গানারায়ণ এবং সূর্যকুমার। কিন্তু নবীনকুমার কিছুতেই মানবে না। তার নিজের শরীরের কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা সে নিজে না দেখে ছাড়বে না। সূর্যকুমার অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে দু-তিন দিনের মধ্যে ব্যাণ্ডেজ খোলা উচিত নয়। খুলতে গেলেও খুবই ব্যথা লাগবে। কিন্তু নবীনকুমার নাছোড়বান্দা। এই মানুষটি যে কত জেদী তার প্রমাণ সূর্যকুমার আগে অনেকবার পেয়েছেন, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যাণ্ডেজ খুলতে বাধ্য হলেন। নবীনকুমারের দারুণ ব্যথা বোধ হচ্ছে নিশ্চয়, তবু সে মুখের একটা রেখাও কাঁপালো না।

নবীনকুমারের বাঁ দিকের বুকে একটি মুষ্টি পরিমাণ বৃহৎ ক্ষত। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ায় লাল রঙের মাংস হাঁ করে আছে।

গঙ্গানারায়ণ অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে ধরা গলায় বললো, ছোটকু, তুই কেন অমন উদবঙ্কা পাগলের কাচে গেলি? কেউ যায়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নবীনকুমার বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইলো নিজের বুকের দিকে। তারপর যেন আপন মনেই বললো, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপরে...ওই গর্তটা দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে না তো?

সূর্যকুমার বললেন, সে কী কথা! একেবারেই সুপারফিসিয়াল ইনজুরি, পচন

ধরেনি, ভয়ের কিছু নেই—।

আবার শুয়ে পড়ে চক্ষু মুদে নবীনকুমার বললো, ডক্তর চক্রবর্তী, আমায় তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলুন! আমায় এখন বেশী দিন শুয়ে থাকলে চলবে না, আমার অনেক কাজ!

ডক্তর সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী এর আগেও নবীনকুমারের চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু এবার নবীনকুমার যেন অন্য মানুষ। এ রকম রোগী পাওয়া চিকিৎসকদের পক্ষেও সৌভাগ্যের বিষয়। এই রোগী চিকিৎসকের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত, যে-কোনো ঔষধ-পথ্যে আপত্তি নেই এবং ব্যাণ্ডেজ খোলা-বাঁধার সময় একটুও ব্যথা বেদনার অনুযোগ করে না। সে শুধু বার বার বলে, ডক্তর চক্রবর্তী, আমাকে খুব শিগগির চাঙ্গা করে তুলুন, আমার এখন অনেক কাজ, মাতার মধ্যে হাজারো পরিকল্পনা গিসগিস কচ্চে।

এমনকি ব্যথা খুব বৃদ্ধি পেলে তার কিছুটা লাঘবের জন্য ডাক্তার যখন পরামর্শ দিলেন মাঝে মাঝে একটু ব্র্যাণ্ডি সেবন করতে, তখন নবীনকুমার বলে উঠলো, না, না, আমায় ওসব আর ছুঁতে বলবেন না। আমি ওসব থেকে মুক্ত হয়িচি।

সূর্যকুমার ভাবলেন, মানুষের জীবনের গতি কী বিচিত্র! কয়েক বৎসর আগেও এই মানুষটিকে শত ঝুলোঝুলি করেও মদ্যপানের উৎকট স্বভাব ছাড়ানো যায়নি। আর আজ সে ওষুধের ডোজেও মদ্য স্পর্শ করতে অরাজি।

সপ্তাহখানেক কেটে যাবার পর সূর্যকুমার অন্য কয়েক জন চিকিৎসককে দিয়ে এই রোগীকে পরীক্ষা করাতে নিমরাজি হলেন। এমনিতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ঘটেনি, পূর্ণবয়স্ক যুবক নবীনকুমারের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। মেদহীন মজবুত শরীর, ব্যাধির আর কোনো উপসর্গ নেই। এর মধ্যেই সে উঠে চলাফেরার শক্তি ফিরে পেয়েছে, শুধু ক্ষতস্থানটি শুকোচ্চে না। সেই রকমই দগদগে ভাব। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে এমনও বলা যায় না। আর জখমটি এমনই মোক্ষম জায়গায় যে ওখানে সার্জারিরও তেমন সুযোগ নেই!

নবীনকুমার এখনই নিজেই স্নানাগার-শৌচাগারে যেতে পারে বটে, কিন্তু সামান্য চলাফেরা করলেই তার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। সূর্যকুমারের কোনো ঔষধেই এই রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, সেই জন্য তিনি অন্য পদ্ধতির ঔষধ একবার পরখ করে দেখতে চান।

প্রথমে মহেন্দ্রলাল সরকার এবং রাজাধিরাজ দত্ত নামে হোমিওপ্যাথির দুই চিকিৎসক এলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার এদেশের হোমিওপ্যাথির প্রধান চিকিৎসক তো বটেই, অ্যালোপ্যাথিতেও এ দেশের সর্বোচ্চ উপাধি এম ডি পেয়েছিলেন। ভারতের তিনিই দ্বিতীয় এম ডি। তা সত্ত্বেও তিনি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হ্যানিম্যান প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথির সমর্থক হয়েছেন। রাজাধিরাজ দত্তও যথেষ্ট খ্যাতিমান। দু

জনেই মত প্রকাশ করলেন যে গ্যাংগ্রিন হয়নি। এই ক্ষত ঔষধেই নিরাময় করা যায়।

পরদিন এলেন দুই কবিরাজ ভৃগুকুমার সেন এবং বিষ্ণুচরণ সেন। তাঁদেরও ঐ একমত। চিকিৎসা বিভ্রাটেরও কোনো সম্ভাবনা দেখা দিল না, কারণ নবীনকুমার শুধুমাত্র ধনীর দুলাল নয়, সে যথেষ্ট খ্যাতিমান এবং নানা কারণে দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়। সুতরাং চিকিৎসকরা নিজেদের অহমিকা প্রচ্ছন্ন রেখে রোগীর দ্রুত আরোগ্যের ব্যাপারেই মনোযোগী হলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার নিজেই বললেন, এখনই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বন্ধ করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেবার দরকার নেই। সূর্যকুমারের চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক। সেই সঙ্গে কবিরাজি ওষুধও চলতে পারে, কারণ অ্যালোপ্যাথিক এবং কবিরাজি ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই ।

যে-হেতু রোগীরও পূর্ণজ্ঞান বর্তমান, তাই চিকিৎসকরা নবীনকুমারেরও মতামত জানতে চাইলো এ ব্যাপারে। নবীনকুমার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শই মেনে নিল। গঙ্গানারায়ণেরও মনে হলো, এটাই উচিত ব্যবস্থা।

শয্যার ওপরে তিনটি বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে আছে নবীনকুমার। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। মুখে সামান্য পাণ্ডুর ভাব, তার কথা কওয়া নিষেধ হলেও সে মাঝে মাঝে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিচ্ছে, দু একবার হাস্য পরিহাসও করছে।

কবিরাজ ভৃগুকুমার সেন পরম বৈষ্ণব। তিনি শুধু ঔষধ দিয়েই চিকিৎসা সারেন না। রোগীর কল্যাণার্থে নামজপও করেন। অন্য চিকিৎসকরা গল্পে রত, কবিরাজ ভৃগুকুমার অনেকক্ষণ ধরে নবীনকুমারের এক হাতের নাড়ি ধরে কী যেন বলে চলেছেন অস্ফুট স্বরে। তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, দেহ এমনই নিস্পন্দ যে মনে হয় ঘুমন্ত, শুধু ওষ্ঠ নড়ছে একটু একটু।

সেদিকে তাকিয়ে রাজাধিরাজ দত্ত এক সময় ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন, ও কোবরেজ মোয়াই, আপনাদের বোষ্টমদের হরিসভায় কদিন আগে কী কাণ্ড হয়ে গেল, শুনেচেন?

ভৃগুকুমার চোখও খুললেন না, উত্তরও দিলেন না।

বিষ্ণুচরণ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

বিষ্ণুচরণও বৈষ্ণব, তবে ততটা আচার অনুষ্ঠান মানেন না। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শাক্তমতে একটু কারণবারি পান করেন। ভৃগুকুমারের বেশী খ্যাতির জন্য তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ঈর্ষা আছে।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, সে তো এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। কলুটোলার কালী দত্তের নাম শুনেছেন? যার বাড়িতে প্রকাণ্ড হরিসভা বসে?

কালী দত্তের বাড়িতে হরিসভার আসর বসলে এমন জনসমাগম হয় যে সামনের পথ দিয়ে লোকজন গাড়িঘোড়া চলাচল করতে পারে না। সভার মধ্যখানে একটি বেদীতে পাতা থাকে একটি শূন্য আসন। সকলকে কল্পনা করে নিতে হয় যে ঐ আসনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করছেন। তাঁকে ঘিরে ভক্তরা ভাগবত পাঠ করে। তারপর নৃত্য সহযোগে নামগান হয়।

সেই কালী দত্তের হরিসভার কথা কে না শুনেছে!

—কী হয়েছে সেখানে?

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, যা হয়েচে, তাতে বোষ্টম বাবাজীরা একেবারে স্ক্যাণ্ডালাইজড। কালীসাধক রামকৃষ্ণ সেখানকার চৈতন্যদেবের আসনের ওপরে

উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেল। শুধু তাই নয়, ডাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই অজ্ঞান।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, রামকৃষ্ণ কে?

—রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজুরী। যে রামকুমার চাটুজ্জেকে দিয়ে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির খোলালেন, এ তার ভাই।

বিষ্ণুচরণ বললেন, আমি গেছি দক্ষিণেশ্বরে। রামকুমারের ভায়ের নাম তো গদাধর।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, হ্যাঁ, সেই গদাধর ঠাকুরই বটে। কোন্ এক নাগা সন্ন্যেসী নাকি এঁকে দীক্ষা দিয়ে অবধূত বানিয়ে ন্যাচেন। এখন নাকি তাঁর একেবারে ন্যাবড়া-জ্যাবড়া অবস্থা। যখুন তখুন ভাব হয়। একটা হাত ওপর দিকে উঠে আঙুল বেঁকে যায়।

বিষ্ণুচরণ বললেন; আমি মানুষটি সম্পর্কে অনেক রকম কথা শুনেছি। পূজ্যপাদ, ধন্বন্তরি গঙ্গাপ্রসাদ সেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এঁর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর মুখেই শুনেছি যে লোকটির ধরন-ধারণ অত্যাশ্চর্য। উন্মাদরোগ হয়েছে বলে মথুরবাবু নানা চিকিৎসক ডেকে এই পূজারীটির চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কেমন উন্মাদ? দিনের পর দিন ঘুমোয় না, বুক-পিঠ লাল, কুকুরের সামনে থেকে খাবার তুলে নিয়ে নিজে খায়। কালীপুজা করতে বসে ফুল-বেলপাতা দিয়ে নিজেকেই পুজা করে, অথচ মুখখানি বড় করুণ। চক্ষু দুটি কান্না মাখানো। পূজ্যপাদ গঙ্গাপ্রসাদ সেন আমায় বলেছিলেন, কোনো ঔষধেই সেই মানুষটির কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। বড়ই বিস্ময়কর।

রাজাধিরাজ দত্ত বললেন, সে যাই হোক গে, কিন্তু এটা কেমন ব্যাপার বলুন! এক শাক্ত কালীসাধক বোষ্টমদের আখড়ায় গিয়ে চৈতন্যদেবের আসনের ওপর উঠে দাঁড়াবে? অ্যাঁ?

ভৃগুকুমার এবার নবীনকুমারের হাত ছেড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চক্ষু খুলে বললেন, বেশ করেছেন তিনি! আমি সেই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মুখের পানে তাকালেই দিব্যভাব টের পাওয়া যায়।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন মানে? তাও কি সম্ভব?

ভৃগুকুমার বললেন, সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁর হলো ভাব সমাধি। চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মশায়, এই আমি বলে দিলুম, ঐ রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে-সে লোক নন, ক্ষণজন্মা পুরুষ! দেখবেন, একদিন শত সহস্র লোক ওঁর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে।

নবীনকুমার বললো, তা হলে তো এই সাধুটির সঙ্গে একদিন দেকা করতে হয়।

গঙ্গানারায়ণ বললো, তুই ভালো হয়ে ওঠ, ছোট্‌কু, তারপর তোতে আমাতে একদিন একসঙ্গে যাবো।

শয্যায় শুয়ে শুয়েই নবীনকুমার নানা রকম বিষয়কর্ম পরিচালনা করতে লাগলো। ভুজঙ্গধর মারফত তাদের অন্যান্য জমিদারির নায়েবদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। নবীনকুমার নির্দেশ দিল, সমস্ত প্রজাদের খাজনা মকুব করে দেওয়া হবে। যার যা জমি আছে তাতে সে চিরস্বত্ব ভোগ করবে। সরকারের ঘরে জমিদারের দেয়

খাজনা জমা পড়বে জমিদারের তহবিল থেকে।

কিন্তু খাজনা একেবারেই আদায় না করলে জমিদারের তহবিল থাকবে কী?

কেন, জমিদারের নিজস্ব অনেক খাস জমি, বাগান, জলকর আছে, তার থেকে আয় কম নয়। তাতেও ব্যয় সংকুলান না হলে সেগুলি বিক্রয় করতে হবে একের পর এক! এর মধ্যেই উড়িষ্যার এক বিশাল জঙ্গল এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় দুটি বিল নবীনকুমার বিক্রি করে দিয়েছে। সেই টাকায় শহরের উপকণ্ঠে কেনা হয়েছে অনেকখানি জমি সমেত একটি বাড়ি। সেখানে খোলা হবে কৃষি কলেজ। তার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডও সে ঠিক করে ফেলেছে।

গঙ্গানারায়ণ একদিন কুণ্ঠিতভাবে বললো, তুই এ সব কী কচ্চিস, ছোটকু? আমাদের কলকাতার হৌসে খুব দুঃসময় চলচে, বহু টাকার শেয়ার গচ্চা গ্যাচে, এখন ঋণ করে খাতকদের টাকা শুধতে হবে। তুই এর মধ্যে দুহাতে সব উড়িয়ে দিচ্চিস?

নবীনকুমার সে প্রসঙ্গে কান না দিয়ে অত্যুৎসাহের সঙ্গে বললো, কিন্তু, কৃষি কলেজের খুবই দরকার কিনা বলো? হিন্দু কলেজের আগেই আমাদের এখেনে কৃষি কলেজ খোলা উচিত ছিল না? চাষ-বাস থেকেই এ দেশের যাবতীয় আয়, আর সেই চাষীদের জ্ঞান বুদ্ধি দেবার কোনো ব্যবস্থা না করে আমরা শুধু কেরানি তৈরি কচ্চি? দাদামণি শুধু কলকেতায় নয়, আমরা গ্রামে গ্রামেও কৃষি বিদ্যালয় খুলবো। চাষীরা সেখেনে এসে ইংরিজি-বাংলা শিকবে না, চাষের নতুন নিয়ম শিকবে। আয়ারল্যাণ্ডের চাষীরা উত্তম সেচ ব্যবস্থা জানে, সেখেন থেকে আমরা শিক্ষক আনাবো।

দুপুরবেলা নবীনকুমার ঘুমিয়ে পড়লে সকলে ঘর ফাঁকা করে চলে যায়। শুধু মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে থাকে দুলাল। হঠাৎ এক সময় নবীনকুমারের ঘুম ভেঙে যায়, এই অনুভূতি নিয়ে যে সব কিছুর জন্যই বড় বেশী দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখুনি সব কিছু সক্রিয়ভাবে শুরু করা দরকার। এ রকম ভাবে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে চলবে না।

আস্তে আস্তে উঠে বসে সে কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। ঘরের সাদা দেয়ালটি বড় শান্ত, মায়াময়। বেশ একটা স্নেহের ভাব আছে। ওদিকে তাকালেই মনে হয়, এই পৃথিবী বড় উপভোগ্য স্থান।

নবীনকুমার নিজেই ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করে। প্রতিবারই খোলার সময় খুব যন্ত্রণা হয়। নবীনকুমার ওষ্ঠ কামড়ে থাকে, টুঁ শব্দটি করে না। একেবারে খোলা হয়ে গেলে সে একবার ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেললো। ক্ষতস্থানটি ঠিক যেন একই রকম রয়েছে।

ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে সে গিয়ে দাঁড়ালো আয়নার পাশে। হেঁটে আসতে তার কষ্ট হলো না, কিন্তু বুকের বাঁ দিকে তাকিয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। অদ্ভুত ধরনের লাল একটা গর্ত। এই গর্তটা বুজবে না? নবীনকুমারের আবার মনে হলো, এই গর্ত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসবে না তো?

আস্তে আস্তে রক্ত গড়াতে লাগলো ক্ষত থেকে। নবীনকুমার আবার ব্যাণ্ডেজ জড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, কে?

সেখানে কেউ নেই।

অথচ নবীনকুমারের স্পষ্ট মনে হলো, আয়নায় সে অন্য একজনের ছায়া দেখেছে।

অবিবেচকের মতন একটু দ্রুতই এসে নবীনকুমার উঁকি দিল দরজার বাইরে। কারুর চিহ্ন নেই সেখানে। তাহলে কি মনের ভুল!

বুক থেকে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ছে। নবীনকুমার এলোমেলোভাবে ব্যাণ্ডেজের গজ জড়িয়ে ফেললো বুকে। তারপর শয্যায় ফিরে আসবার সময় পালঙ্কে একটু হাঁটুর আঘাত লাগতেই সেই শব্দে জেগে উঠলো দুলাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েচে, ছোটবাবু?

নবীনকুমার বললো, না রে, কিছু না। একটু দেকচিলুম ঘোরাফেরা করতে পারি কিনা। বেশ পেরে তো গেলুম।

দুলাল বললো, না, ছোটবাবু। ডাক্তাররা বারণ করেচেন!

নবীনকুমার বালিশে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে একটা চাদর চাপা দিল বুকের ওপর। তারপর বললো, দুলাল, শোন!

—কী ছোটবাবু?

—যে লোকটা আমায় কামড়েছেল তাকে তুই একেবারে মেরে ফেললি? কেন রে?

—আমার মাথায় খুন চেপে গেস্‌লো।

—লোকটাকে তোর মারা ঠিক হয়নি কো। ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে পারতিস।

—কী বলচেন, ছোটবাবু, সে কি মানুষ, না নরপশু? ওকে যে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলিনি...

—তুই নিয়তিতে বিশ্বাস করিস, দুলাল?

—নিশ্চয়, ছোটবাবু। নিয়তিই তো মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্চে!

—আমার নিয়তিই কি আমায় টেনে নিয়ে গেল ঐ লোকটার কাচে? একটা সাধারণ পাগল, সে হঠাৎ আমাকেই কামড়ে দিল কেন?

—আপনি ভালো হয়ে যাবেন, ছোটবাবু। এত সব তাবড় তাবড় ডাক্তার কোবরেজরা বলচেন।

—ভালো হয়ে তো উঠবোই। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্চে রে!

পর মুহূর্তেই নবীনকুমার আবার চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

দুলাল বললো, কোতায় কে ছোটবাবু?

—দরজার পাশ থেকে কে যেন স্যাঁৎ করে চলে গেল। দ্যাকতো দ্যাকতো! কে উঁকি দিয়ে ফিরে যাচ্চে!

দুলাল ছুটে বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক খুঁজে এলো। কারুর চিহ্ন নেই এবারেও।

দুলাল ফিরে এসে বললো, না ছোটবাবু, কেউ নেইকো।

নবীনকুমার ভুরু কুঁচকে রইলো।

পরদিন মধ্য দুপুরে নবীনকুমার আবার নামলো পালঙ্ক থেকে। বেশ কয়েক পা ঘুরে বেড়ালো। ব্যাণ্ডেজ আস্তে আস্তে লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে বটে

কিন্তু আজ সে আরও সাবলীলভাবে হাঁটতে পারছে। রক্তক্ষরণের ফলেও যদি শরীরের দুর্বলতা বোধ না হয়, তা হলে আর চলাফেরা করতে আপত্তি কী?

গায়ে একটা মুগার চাদর জড়িয়ে নিয়ে নবীনকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। যেন সে একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে, অনেক দিন ধরে সে বন্দী হয়ে আছে।

ওপর মহলে মানুষজন এমনিতেই খুব কম। দুপুরবেলা একেবারে সুনসান থাকে। সরোজিনীও দিনের বেলা নবীনকুমারের কাছে আসে না। এখন সে প্রায় সর্বক্ষণই ঠাকুর ঘরে থাকে।

এক সময়ে নবীনকুমারের মনে হলো, এই গৃহটি কার? এত বড় বড় খিলান, প্রশস্ত সব কক্ষ, কারুকার্যখচিত দরজা, এ সব কে বানিয়েছে? কারা থাকে এখানে? নবীনকুমার যেন এক আগন্তুক, ভুল করে কোনো অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। বড় সুন্দর তো এই বাড়িটি?

কে যেন বড় সুমধুর স্বরে গান গাইছে। খুবই মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু এই শূন্য পুরীতে সেই গানের তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। নবীনকুমারের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো। কেমন যেন অলৌকিক অনুভূতি হয়। এই ঘুমন্তপুরীতে কোনো রমণী একা একা গান গেয়ে চলেছে।

সেই সুরের টানে আকৃষ্ট হয়ে নবীনকুমার পায়ে পায়ে তার উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাম হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে আছে, যেন এইভাবে ধরে থাকলে রক্তক্ষরণ কম হবে।

একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে সে থামল। এবার সে চিনতে পেরেছে। এ তো তার জননীর কক্ষ। এখানে কে গান গায়? তার জননী তো আর ইহলোকে নেই।

ডান হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

ভিতরে একটা জলচৌকিতে বসে আছে কুসুমকুমারী। তার আলুলায়িত কুন্তল পিঠের ওপর ছড়ানো। হাতে একজোড়া খঞ্জনী। তার সামনে পা ছড়িয়ে বসে গান গাইছে এক দাসী আর কুসুমকুমারী তাতে তাল দিচ্ছে।

গানের মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিল দুজনেই, অকস্মাৎ দরজাটা খুলে যেতেই কুসুমকুমারী চমকিত হয়ে বললো, ওমা!

বিম্ববতীর কক্ষে যে গঙ্গানারায়ণ-কুসুমকুমারী অনেক দিন ধরেই রয়েছে, সে কথা নবীনকুমার ভালোভাবেই জানে। কিন্তু আজ যেন তার ঘোর লেগেছে, কিছুই মনে নেই। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কুসুমকুমারীকে চিনতে পারলো না।

দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে কুসুমকুমারী উঠে এসে বললো, কী হয়েচে, ঠাকুরপো?

কথা শোনা মাত্র নবীনকুমারের ঘোর কেটে গেল। এ তো তার ভ্রাতৃবধূ কুসুমকুমারী। সে দুপুরবেলা দাসীর কাছে গান শুনচে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই।

নবীনকুমার লজ্জিত, বিব্রতভাবে বললো, না, না, আমার ভুল হয়ে গ্যাচে, আমি এখেনে ভুল করে এসিচি!

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে দাঁড়ালো।

কুসুমকুমারীর বারংবার ব্যাকুল প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিল না সে। আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো নিজের কক্ষের দিকে।

জুড়িগাড়ি থেকে দুলালের সাহায্য না নিয়ে নিজেই নামলো নবীনকুমার। হাতে তার পিতার রূপো-বাঁধানো ছড়ি। কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতির ওপর রেশমী বেনিয়ান, মাথার চুল এখন কদম ফুলের মতন, কখনো কখনো সে একটি জরির টুপী পরিধান করে। তার শরীর আগের তুলনায় শীর্ণ, গৌরবর্ণ মুখখানি ঈষৎ ধূসর, তাকে অনেকটা ইংলণ্ডীয় কবি জর্জ বায়রনের মতন দেখায়।

দুলাল, ভুজঙ্গধর ও আরও কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে সে ধীর পদে সম্মুখে অগ্রসর হলো। বিস্তীর্ণ জলাভূমির এক পাশে একটি খাপরার চালার কুটির, মধ্যে মধ্যে কিছু গাছ। সকলে গিয়ে কুটিরটির সামনে উপস্থিত হবার পর একজন লোক বললো, ঐ যে হুজুর, সামনে যে তালগাছটা দেকচেন, ঐ পর্যন্ত হলোগে একদিকের সীমানা। আর ডাইনে-বাঁয়ের সীমানা মাপ-জোক কত্তে হবে।

ভুজঙ্গধর জিজ্ঞেস করলো, কতখানি জমি?

—ঊনপঞ্চাশ বিঘে।

নবীনকুমার বললো, জমি কোতায়? এ তো জলা। আমি কি মাছের চাষ কত্তে চাইচি নাকি?

লোকটি বললো, জল বেশী নেই, হুজুর, একটু ছেঁচলেই ডাঙ্গা জেগে উঠবে। ঐ দেকুন না, এদিক ওদিকে ধান চাষ হচ্ছে।

স্থানটি রসাপাগলা গ্রামের সন্নিকটে। এদিকে ওদিকে দুচারটি মাত্র বাড়ি দেখা যায়, আর সবই জলাভূমি আর ধানজমি আর নল খাগড়ার বন। এ স্থানের নাম বালিগঞ্জ। দিনের বেলাতেই ঝাঁক ঝাঁক মশা তেড়ে এলো আগন্তুকদের প্রতি।

নবীনকুমার ছড়িটি তুলে বললো, ওদিকে কি খাল কিংবা নদী আচে? আমার খানিকটে জলও দরকার, তবে বহতা জল হলে ভালো হয়।

—নদী বলতে সেই আদি গঙ্গা। সে তো কিছুটা দূরে, হুজুর।

নবীনকুমার ভুজঙ্গধরকে জিজ্ঞেস করলো, কী পছন্দ হয়?

ভুজঙ্গধর দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো, না।

নবীনকুমার বললো, হুঁ, আমিও তাই মনে কচ্চি। বহতা জল নেই, আর এই কাদা জমিতে তাড়াতাড়ি বালি তোলার অনেক হ্যাপা। একশো জনের থাকবার মতন বাড়ি বানাতে হবে, তা ছাড়া চাই মাস্টারদের কোয়ার্টার আর গুদোম ঘর—

জমির দালালটি বললো, দর অতি সস্তা হুজুর, একেবারে জলের দাম বলতে পারেন, আপনি রাবিশ মাটি দিয়ে ভরাট করলেও খর্চা অনেক কম পড়বে—

নবীনকুমার ফেরার জন্য উদ্যত হয়ে বললো, চলো, অন্য কোতায় আর কোন জমি সন্ধানে আচে তাই দেকাও।

ভুজঙ্গধর বললো, আমি কই কি ছোটবাবু, নদীয়ায় আমাগো ঐখানে আপনের চাষের ইস্কুল খুলেন।

নবীনকুমার বললো, হবে, সেখেনেও হবে। সব জেলায় জেলায় হবে। কিন্তু আগে আমি কলকেতায় খুলবো কৃষি বিদ্যালয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের চেয়েও

সেটা বড় হবে। ওরা হাফ এডুকেটেড কেরানী বানাচ্ছে, আমি শিক্ষিত চাষা বানাবো। তারা শুধু চাষ শিখবে না। সেই সঙ্গে নাম সই আর সরল অংকও শিখবে।

ফিরে এসে গাড়িতে ওঠবার পর নবীনকুমার খুব সন্তর্পণে তার বক্ষের বাম দিকে হাত রাখলো। কিছু বোঝা গেল না। তখন সে তার বেনিয়ানের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ব্যাণ্ডেজটি স্পর্শ করলো। একটু যেন ঠাণ্ডা, ভিজে ভিজে লাগছে। নবীনকুমার হাতটি বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলো। না, কোনো রক্তের দাগ নেই। তখন নিশ্চিন্ত বোধ করলো সে।

চিকিৎসকরা অনেক যত্নে তার বুকের ক্ষতটি বুজিয়েছে বটে, কিন্তু সে স্থানটি স্বাভাবিক হয়নি। মাটির ঢিবির মতন সেখানে লাল মাংস উঁচু হয়ে আছে, এখনো যখন তখন সেখান থেকে ঘামের মতন বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসে। তাই সর্বক্ষণ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখতে হয়। কতদিন আর সে শয্যাশায়ী থাকবে। তাই চিকিৎসকরাও তাকে অনুমতি দিয়েছেন সাবধানে চলা ফেরার। পুরো দস্তুর পোশাক করে নবীনকুমার যখন পথে বার হয়, তখন তাকে দেখে বোঝা যায় না যে তার পোশাকের নিচে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ, যা প্রায়শই রক্তে ভিজে যায়।

শহরে এখন নবীনকুমারের নামে লোকে নানা কথা বলে, তার সম্পর্কে লোকের বিস্ময়বোধটাই বেশী। সকলেই জেনে গেছে যে ধনকুবের রামকমল সিংহের সন্তান নবীনকুমার সিংহ এখন ঋণগ্রস্ত। বেঙ্গল ক্লাব সমেত বড় বড় অট্টালিকাগুলি বিক্রয় হয়ে গেছে। জমিদারিও হাতছাড়া। মাত্র এই কয়েকটি বৎসরে এই অতুল বৈভব একজন মানুষের পক্ষে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? নবীনকুমার এখন যুবা, সামনে তো কত বয়স পড়ে আছে। একসময় যার কাছ থেকে কোনো প্রার্থী ফিরে আসতো না, এখন সেই নাকি হুণ্ডি কাটছে অনবরত। এর পর বসতবাড়ি পর্যন্ত বাঁধা না পড়ে।

গঙ্গানারায়ণ কিছুদিন নবীনকুমারকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। এখন সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এই জমিদারি বা বিষয় সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ নেই, বিম্ববতীর প্রতিনিধি হয়েই সে যেন বিষয়ের মোহে বাঁধা পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজস্ব তো কোনো প্রয়োজন নেই। অনাড়ম্বর জীবনে সে অভ্যস্ত। ছোট্‌কু যদি তার খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য সব উড়িয়ে দিতে চায় তো দিক। এ বিষয়ে সে কুসুমকুমারীর মতামত নিয়েছে। কুসুমকুমারীও নবীনকুমারকে বাধা দেবার পক্ষপাতী নয়।

আত্মীয়-বন্ধুদের ধারণা নবীনকুমারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। মহাভারত অনুবাদের মতন মহৎ পুণ্যকর্ম যে করেছে, সে এখন মেতে উঠেছে অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানায়। চাষাভুষোদের ইস্কুল। চাষীরা জমিজমা, চাষবাস ফেলে পড়তে আসবে কলকাতায়? সাহেব মাস্টাররা নাকি চাষাদের ধান চাষ শেখাবে? শুনলে হাস্য সম্বরণ করা যায়?

যে-সব পণ্ডিত মহাভারত অনুবাদের কাজে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা কয়েক বৎসর ছিলেন দিব্যি খাতির যত্নে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নবীনকুমারকে বললেন, আপনি যে রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি অনুবাদেরও পরিকল্পনার কথা পূর্বে জানিয়েছিলেন, তার কী হলো? নবীনকুমার প্রত্যেককে থোক কিছু অর্থ দান করে বলেছেন, আপনারা যদি পারেন তো করুন, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই! যদি অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেন, তা হলে সে গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব আমার!

ভুজঙ্গধর ফিরে গেছে নদীয়ায়, সেখানে সে ছোট আকারে একটি কৃষি শিক্ষা

কেন্দ্র চালু করে দিয়েছে। কলকাতাতেও জমি পছন্দ হয়েছে শেষ পর্যন্ত! তিল-জলার সন্নিকটে একটি খাল সমেত বাহান্ন বিঘা জমি ও একটি ছোট কুঠি বাড়ি। পৌনে দু-লক্ষ টাকা দিয়ে সে সম্পত্তি কিনে ফেললো নবীনকুমার। সেখানে দ্রুত আবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে চিঠি লিখে সেখান থেকে দু-জন অভিজ্ঞ চাষীকে আনবার ব্যবস্থাও পাকা। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছে যে আইরীশ চাষীরা আলু চাষেই বেশী দক্ষ, আমেরিকাতে ভালো ধান হয়, সুতরাং সেখান থেকেও দু-একজন চাষাকে আনালে হয়। নবীনকুমার তাতেও রাজি। রাইমোহন নেই বটে, কিন্তু তার শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য মানুষের অভাব হয় না। নবীনকুমারের কাছাকাছি এরকম কয়েকজন উপদেষ্টা জুটে গেছে, তারা এই সুযোগে কিছু টাকা পয়সা লুটেপুটে নিচ্ছে।

যখনই একা থাকে, তখনই নবীনকুমার তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রাখে। এক এক সময় তার হাতে লেগে থাকে রক্ত।

একদিন কৃষি বিদ্যালয়ের কাজের তদারকিতে যাচ্ছে নবীনকুমার, এমন সময় পথের পাশে একজনকে দেখে সে চমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে রোখ, রোখ, গাড়ি রোখ!

গাড়িটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো নবীনকুমার। একটা নিম গাছ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নিমপাতা পাড়ছে উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক ছোকরা। তার মাথায় একটিও চুল নেই, দু-চোখে ভুরুও নেই। নবীনকুমার ঠিক চিনতে পেরেছে, এ সেই চন্দ্রনাথের চ্যালা সুলতান।

ছড়ি উঁচিয়ে নবীনকুমার ডাকলো, ওহে, এদিকে একটু শোনো তো—।

সুলতান মুখ ফিরিয়ে নবীনকুমারকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক চেয়ে ছুট লাগালো বিপরীত দিকে।

নবীনকুমার বললো, দুলাল ধর তো ওকে।

সুলতান বেজীর মতন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগলো বিদ্যুৎ গতিতে। তবু দুলাল তাকে ধরে ফেললো এক সময়। টানতে টানতে নিয়ে এলো নবীনকুমারের কাছে।

মাটির দিকে চোখ রেখে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুলতান।

নবীনকুমার জিজ্ঞেস করলো। কী হে, আমি তোমায় ডাকলুম, আর তুমি পোঁ পোঁ করে ছুটলে কেন? আমায় চিনতে পেরোচো?

সুলতান কোনো উত্তর দিল না।

—তোমার বাবু কোতা? সেই চন্দ্রনাথ ওঝা?

—জানি না!

—জানো না মানে? তুমি কি এখন একলা থাকো? সেই আগুন লেগে তোমাদের বাড়ি পুড়ে গেস্‌লো, তোমাদের আর সন্ধান পাওয়া যায়নি, আমি ঠিক জানতুম, তোমরা কোতাও লুকিয়েচো। সেদিন কে তোমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল?

—জানি না।

—আমাকে তোমার ভয় কী? তোমার বাবুর সঙ্গে আমার একটা দরকার আচে—।

সুলতান বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে চাইলো না। খুব নরমভাবে তাকে অনেক বোঝাবার পর সে তাদের বাসস্থান দেখিয়ে দিতে রাজি হলো।

মারহাট্টা ডিচের ওপারে কিছু গোলপাতার ঘরের বস্তি, তার মধ্যে দু'তিনটি মাঠকোঠা। খালের ওপরে একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। নবীনকুমার সেই সাঁকোর ওপর পা দিতেই দুলাল কাতরভাবে বললো, ছোটবাবু, আপনি ওদিকে যাবেন না!

নবীনকুমার বিস্মিতভাবে বললো, কেন রে?

দুলাল বললো, কেন যাচ্ছেন? ওসব নোংরা জায়গায় যাওয়া কি আপনাকে মানায়?

দুলাল যেন বলতে চায়, ও রকম বস্তিতে নবীনকুমারের মতন মানুষের তো যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি, তার সঙ্গী হিসেবে দুলালেরও যাওয়াটা মানায় না। মাত্র কয়েকদিন আগে নবীনকুমারের দেওয়া বরানগরের বাড়িটির দখল নিয়ে দুলাল সেখানে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে সংসার স্থাপন করেছে। এখন সেও একজন মধ্যবিত্ত।

নবীনকুমার বললো, ঐ চন্দ্রনাথ ওঝার সঙ্গে আমার একবার দেখা করার বিশেষ দরকার।

—আপনি যাবেন কেন? হুকুম করুন, পাইক গিয়ে তাকে ডেকে আনবে!

—হুকুম করলে সে আসবে না। আমি জানি, সে মানুষটা বড্ড দেমাকী।

নবীনকুমার সাঁকোর ওপর এক পা এগোতেই দুলাল কাকুতি-মিনতি করে বললো, আপনি যাবেন না, ছোটবাবু! আপনার শরীর ভালো নেইকো—

—তুই সর, দুলাল!

—না, ছোটবাবু, আমার কতাটা শুনুন...

জেদী নবীনকুমার নিজের মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা সহ্য করে না। অন্য যে-কোনোদিন সে দুলালের এরকম ব্যবহার দেখলে হাতের ছড়ি তুলে কয়েক ঘা কষিয়ে দিত। কিন্তু আজ তার শরীরে ক্রোধের উষ্ণতা এলো না, সে দুলালের চক্ষের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীর, উদাসীন কণ্ঠে বললো, সরে যা, দুলাল। তুই যা, তোকে আমি মুক্তি দিলুম। আজ থেকে তোকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

—আমি আপনাকে কক্ষনো ছেড়ে যাবো না, ছোটবাবু! ওখানে যাবেন না, গেলে আপনার আবার বিপদ হতে পারে—।

—আমার আবার কিসের বিপদ! তুই সর! এই সুলতান, চলো আগে আগে—।

খালটি কচুরিপানায় ভর্তি, তার নিচে কত জল আছে বোঝা যায় না। সেই সাঁকো কোনোক্রমে পেরিয়ে এ পারে চলে এলো নবীনকুমার।

বস্তির মধ্যে একটা দোতলা মাঠকোঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রনাথ। তাকে পূর্বেকার চন্দ্রনাথ হিসেবে চেনা খুবই দুষ্কর। যে সুঠাম সুপুরুষটি সর্বক্ষণ সাহেবী পোশাক পরিধান করে থাকতো, এখন তার পরণে একটি চৌখুপ্পি লুঙ্গি, উন্মুক্ত বক্ষে, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। চন্দ্রনাথের একটি চক্ষু কানা, বাম বাহুতে চারটি আঙুল নেই, দক্ষিণ হস্তটি অবশ্য দারুণ সবল, সেই হাতে একটি লাঠি ধরা। প্রবল কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে এখনো বেঁচে আছে।

ক্ষুদ্র দলটিকে দেখেই চন্দ্রনাথ হুংকার দিল, সুলতান!

সুলতান কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আমি আনতে চাইনি, এই ছায়েবরা জোর করে আইলেন।

খালের ধারে রজকেরা ধপাধপ শব্দে কাপড় কাচছে। এই মাঠকোঠাটির ঠিক

পাশেই গরু-মহিষের খাটাল, বৃহৎ জন্তুগুলি ফ-র-র ফ-র-র শব্দে নিশ্বাস ফেলছে এবং ভেসে আসছে বিকট দুর্গন্ধ। কিছু দূরে একজন স্ত্রীলোক পুরুষের ভাষায় অশ্রাব্য গালমন্দ করছে যেন কাকে। সমগ্র পরিবেশটি যেন ছাই ছাই রঙে ঢাকা।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে উঠতে লাগ্‌লো নবীনকুমার। প্রতিটি পদক্ষেপই যেন বেশী ভারি লাগছে, চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে তার শরীর।

চন্দ্রনাথ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই?

নবীনকুমার চন্দ্রনাথের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তভাবে বললো, সে কোথায়?

—কে?

—তুমি জানো...যে তোমার সঙ্গে ছিল...

—কামুক কুক্কুর. গন্ধ শুঁকে শুঁকে এতদূর পর্যন্ত এসেছো?

চন্দ্রনাথ হাতের লাঠিটি উঁচু করে তুলতেই দুলাল এগিয়ে এসে বললো, এই, সাবধানে কতা বলবে!

নবীনকুমার বললো, তুই চুপ কর, দুলাল।

তারপর আর এক পা এগিয়ে এসে সে বললো, চন্দ্রনাথ ওঝা, এই দেশ-কাল আর সমাজের ওপর তোমার রাগ রয়েছে, আমি বুঝি। কিন্তু তুমি একলা একলা লড়তে চাও কেন? এ ভাবে একা কি তুমি জিততে পারবে? দ্যাখো, আজ তোমার কী অবস্থা! এ তো মূর্খের গোঁয়ার্তুমি। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দাও, আমরা দুজনে মিলে—

—তুমিই তো আমার প্রধান শত্রু!

—আমি?

—নিশ্চয়ই! তুমিই আমার এই চোখ নষ্ট করেচো, তুমিই আমার ঘরে আগুন লাগিয়েচো।

—না, না, চন্দ্রনাথ, এ তোমার ভুল! আমি তোমার সুহৃদ্ হতে চেয়েছিলুম। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করার কতা চিন্তাও করিনি—

—আমি মোটেই ভুল বুঝিনি! তোমাদের হাতে কোতোয়ালি। সব স্ত্রীলোক তোমাদের ভোগের বস্তু! আমার সঙ্গে জোরে না পারলে তুমি পুলিস ডেকে এনে আমায় ধরিয়ে দেবে. আমার ঘরের মেয়েমানুষকে তুমি জোর করে কেড়ে নেবে, ভাড়াটে প্যায়াদারা আবার এ বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—

—না, না, না।

—বাঁচতে চাও তো, এখেন থেকে দূর হয়ে যাও!

—চন্দ্রনাথ ওঝা, তোমাকে আমি নিজের বাড়িতে স্থান দোবো, আমি সেইজন্যই এসিচি—

—তোমার দয়ার ওপর এই আমি থুতু ফেললুম! থুঃ!

এই সময় ঘরের দ্বার খুলে গেল। নবীনকুমার চক্ষু তুলে দেখলো সেই রমণীকে। একটা কস্তা পেড়ে বিবর্ণ শাড়ী তার অঙ্গে জড়ানো, মুখখানি ধূলিমলিন। কিন্তু সেই চোখ. সেই ওষ্ঠের রেখা, সেই চিবুক. পিঠজোড়া দীঘল চুল, যেন অবিকল যৌবনের বিম্ববতীর প্রতিমূর্তি।

সহসা নবীনকুমারের চক্ষে জল. বুকে রক্ত এবং সারা শরীরে স্বেদ নির্গত হতে লাগলো। সে অপলক চেয়ে রইলো সেই রমণীর দিকে। কী করে এমন হয়, জননীকে কতকাল ভুলে ছিল নবীনকুমার, প্রবাসে অনাত্মীয় পরিবেশে তাঁর মৃত্যু

হয়েছে, তবু সেই জননী মূর্তি কেন এমনভাবে ফিরে আসে? এই ক্লেদাক্ত পরিমণ্ডলে, এমন হীন অবস্থায়!

একটিও কথা বলতে পারলো না নবনীকুমার। দু' হাত দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে ফেললো।

রমণীটি চন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে কী যেন বললো, তা নবীনকুমারের কর্ণে প্রবেশ করলো না। সে যেন তার দু' পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, এখনি চেতনা হারিয়ে ফেলবে। তবু প্রাণপণ মানসিক শক্তিতে সে স্থির থাকতে চাইলো, সে মনে মনে ভাবতে চাইলো, কেন আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়ছি। শুধু শারীরিক সাদৃশ্য, তা ছাড়া আর কিছুই নয়, তার জন্য এতখানি বিচলিত হওয়া তো শোভা পায় না। তবু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের এক রহস্যময়তা তাকে ব্যাপ্ত করে ফেলছে।

বিপরীত দিকে ফিরে সে ধরা গলায় বললো, চল, দুলাল!

চন্দ্রনাথ বললো, দাঁড়াও নবীনবাবু, এতই যখন তোমার সাধ, তুমি নিয়ে যাও একে!

নবীনকুমার দু' হাতে কান চাপা দিল।

চন্দ্রনাথ বললো, আমি নিজের ভোগের জন্য একে আনিনি। পথের মধ্যে কয়েক কুলাঙ্গারের হাত থেকে একে উদ্ধার করিচিলুম। তারপর এ আর আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। তোমার যখন এতই লোভ, তুমি নিয়ে যাও, আমি ছেড়ে দিচ্ছি—

নবীনকুমারের আর কথা বলারও সাধ্য নেই। দু' হাতে কান চেপে সে দুদ্দাড় করে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। তারপর ছুটলো বাঁশের সাঁকোর দিকে।

সাঁকোতে পা দেবার আগেই দুলাল এসে তাকে ধরে ফেলে বললো, ছোটবাবু, কী কচ্চেন! আপনার কী হয়েছে!

নবীনকুমারের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে ঢলে পড়লো দুলালের বুকে। ব্যাণ্ডেজ ছাপিয়ে তার পিরানে ফুটে উঠেছে রক্তের ছোপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন দেখতে এলেন, তখন নবীনকুমারের জ্ঞান নেই। কয়েকদিন ধরেই এমন চলেছে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য তার জ্ঞান ফেরে, আবার সে তলিয়ে যায় অচৈতন্যের আঁধারে। তার বুকের ক্ষত আবার উন্মুক্ত হয়েছে, এবার বুঝি সত্যিই বেরিয়ে আসছে তার হৃৎপিণ্ড। রক্তপাতের বিরাম নেই। যেটুকু সময় তার জ্ঞান ফেরে, তখন নিশ্চয়ই তার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু মুখ দিয়ে সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না।

বিদ্যাসাগর যখন এলেন, তখন তিনজন চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত। তাঁদের মুখে ঘোর ছায়া। বিদ্যাসাগরের নিজেরও শরীর ভালো নয়, শিরদাঁড়ায় ব্যথা, মনেও নানারূপ অশান্তি। তবু তিনি নবীনকুমারের গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনে এসেছেন। এই ছেলেটির কোনো কোনো ব্যবহারে তিনি এক এক সময় বিরক্ত হয়েছেন বটে, আবার এর সম্পর্কে তাঁর বেশ দুর্বলতাও আছে। এই চপল, চঞ্চল যুবকটি কোনোদিন ধরা বাঁধা পথে চলেনি। এর অর্থব্যয়ের মধ্যে এমন একটা রাজকীয়তা আছে, যা তিনি আর কোনো বড় মানুষের মধ্যে দেখেন নি। কৃষ্ণদাস পাল তাঁকে বলে এসেছিলেন যে নবীনকুমার বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত ভক্তি করে, তিনি গিয়ে দুটো কথা বললে এই ব্যাধির সময় সে সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু তিনি

কী কথা বলবেন এই নীরব, অচৈতন্যের সঙ্গে।

তিনি নবীনকুমারের কপালে নিজের দক্ষিণ হস্তটি রাখলেন। উত্তাপ বেশ স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের মনে হলো, তা হলে চরম আশঙ্কা নেই। তিনি চিকিৎসক-দের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো হয়ে উঠবে, তাই না?

ডাক্তার সূর্যকুমার বললেন, তাই তো আশা করি।

বিদ্যাসাগর বললেন, এ ছেলেটি কোনো কাজ একবার ধরলে অসমাপ্ত রাখে না। মহাভারত যেমন শেষ করেছে, তেমন পরে যে কাজে হাত দিয়েছে, তাও নিশ্চয় শেষ করে যাবে।

ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে আসবার পর গঙ্গানারায়ণ তাঁর পদধূলি নিল। তারপর মৃদুস্বরে বললো, আপনি যদি দয়া করে একবার অন্দর মহলে আসেন...আমার পত্নী একবার আপনাকে প্রণাম করবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, বেশ তো!

গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তিনি গেলেন ভেতরের প্রকোষ্ঠে। গলায় আঁচল দিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে কুসুমকুমারী তার মাথা বিদ্যাসাগরের পায়ে ছুঁইয়ে প্রণি-পাত জানালো। বিদ্যাসাগর অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন হাত তুলে। তারপর কুসুম-কুমারী মুখ তোলবার পর সেদিকে চেয়ে তিনি ঈষৎ চমকিত হলেন। কিছু যেন তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের সবচেয়ে সার্থকতম জুটি এই দু'জন। নবীনকুমারই ছিল এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা।

তিনি গঙ্গানারায়ণকে বললেন, তোমাদের দুই ভাইয়ের কাছ থেকে এই দেশ আরও অনেক কিছু আশা করে।

সে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পাল্কিতে ওঠবার পর তিনি উড়ুনির প্রান্ত দিয়ে চক্ষু মুছলেন। কান্না তাঁর এক রোগ। কখন যে কান্না এসে যায়, তার ঠিক নেই।

আরও অনেকেই দেখতে এলো নবীনকুমারকে। দেখা শুধু এক পক্ষের, কারণ নবীনকুমার প্রায় অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞান, কখনো জ্ঞান ফিরলেও সে মানুষ চিনতে পারে না। কোনো কথা বলে না। শহরে তাকে নিয়ে গুজবের অন্ত নেই। কেউ বলে, অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তার যকৃৎ দুম্ ফটাস হয়ে গেছে। কেউ বলে, এক অবিদ্যার বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে গেলে এক দুশমন তাকে ছুরি মেরেছে। কেউ বলে, এক পাগল মরণ কামড় দিয়ে তার কলিজার আধখানা খেয়ে ফেলেছে। আবার কেউ বলে, ঋণের অপমান থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেই বিষ পান করেছে সে।

চতুর্থ দিন কেটে যাবার পর বিকারের ঘোরে নানা কথা বলতে লাগলো নবীন-কুমার। কখনো তার চক্ষু মুদিত, কখনো খোলা থাকলেও শূন্য দৃষ্টি। গঙ্গা-নারায়ণ এবং সরোজিনী খুব কাছ থেকে সেই সব কথা শোনবার চেষ্টা করে। ওরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলে নবীনকুমার কোনো উত্তর দেয় না।

এক একসময় নবীনকুমারের কণ্ঠস্বর খুব স্তিমিত, আবার কখনো বেশ সাবলীল। তার কথাগুলি এই রকম:

...মায়ের গায়ের গন্ধ, আমি যখন নদীর ধারে শ্রাদ্ধ কত্তে বসেচিলুম...আগুনের ধোঁয়ায় আমার চোকে জল, আবার সেই আগুনেই মায়ের গায়ের গন্ধ...ঠিক যেমন ছোটবেলায় বুকের পাশটিতে শুয়ে থাকতুম...আমার সেই বেড়ালটা...

...কৃষ্ণকমল, কৃষ্ণকমল, তুমি ঠিক বলেচিলে, এত সব টাকা কোতা থেকে আসে...আচ্ছা কৃষ্ণ ভায়া, তুমিই কি চন্দ্রনাথ? যাই বলো, আমি তো মন্দির

বানাইনি...

...গোলদিঘিতে ফড়িং ধরে বেড়াতুম দুপুরে...আঁক কষতে ভালো লাগে না, এক দুইগুলো যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতন তাড়া করে আসে, তবে কি না ইংরিজি, হ্যাঁ, ইংরিজি তো শিকেচি বটেই, রাজার জাত বলে কতা। কিন্তু এমন দেশও আচে, যেখেনে প্রজারাই রাজত্ব চালায়, হ্যাঁ, আচে, সত্যি আচে—

...সধবার একাদশী...অনেকটা আমার নকশার মতন, সেই পোস্ট অফিসের বাবুটি লিকেচেন, নীলদর্পণ বড় খাসা, কত তেজ, আর এতে শুধুই রগড়,...উনি একদিন আমায় দেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কেন এত রাগ?

...আমার অনেক কাজ, আরও অন্তত তিরিশটা বচ্ছর বাঁচতে হবে, গুপুস্ গুপুস্ করে একশোটা তোপ পড়বে, নতুন সেঞ্চুরি আসবে, তখন দেকবে, সাহেবরাও ফরফরিয়ে বাংলা কতা বলচে—

...বাড়ির ছাদে বট-অশথ্ গাছ আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠে এমন তো আপনা আপনি গোলাপ ফুল গাছ গজায় না। এ ভারি অন্যায় ব্যাভার গাচেদের—

...হ্যাঁ, ভুল হয়েছেল, ভুল হয়েছেল, জানি হয়েছেল, সেইজন্যই তো বুকে এমন ব্যথা।

...ওকে আমি পাগল বলে বুঝতে পারিনি, ভেবেচিলুম একজন সাধু-টাধু হবে বোধহয়...তাই কামড়ে দিলে। তুমি কেন আমায় কামড়ে দিলে? আমি তো আর জমিদার নই! সব গ্যাচে! ভালোই হয়েচে। আমার ছেলেপুলেও নেই, জমিদারিও নেই...তা কামড়ে দিয়েচে, দিয়েচে, তা বলে দুলাল, তুই ওকে পিটিয়ে মেরে ফেললি?

...একদিন আমি থাকবো না, তুমি থাকবে না, কেউ থাকবে না, অন্য মানুষ আসবে, পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে—

...কে কাঁদে? সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় কে কেঁদে বেড়ায়? নাকি ও হাওয়ার শব্দ? হাওয়াও কাঁদে তা হলে?

...সরোজ, আমি তোমায় কোনো সন্তান দিইনি। আমার মতন মানুষের বংশধর থাকতে নেই, জানো না? সরোজ, আমি মলে বিদ্যেসাগরমশাই তোমার আবার বে দেবেন। তখন তুমি সুখী হবে।

এই বাক্যটি শুনে সরোজিনী ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। নবীনকুমারের কথা তবু থামে না। সে নানারকম কথা বলেই চলে, তাকে যেন কথায় পেয়ে বসেছে।

পঞ্চম দিনে সে হঠাৎ আবার চুপ করে গেল। তার চক্ষু দুটি খোলা। কোনো পথ্য তো সে এ-কদিন গ্রহণ করেই নি, ঝিনুকে করে ওষুধ খাওয়াতে গেলেও তা কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। নবীনকুমারের ডান হাতখানি তার বুকের ক্ষতস্থানের ওপর রাখা।

সরোজিনী সব সময় কাঁদাকাটি করে চোখ মুখ ফুলিয়ে থাকে, ওষুধ খাওয়াতে গেলে তার নিজেরই হাত কাঁপে। তাই কুসুমকুমারী গেল নবীনকুমারের মুখে ওষুধ দিতে।

তখন অপরাহ্ণ কাল, সূর্য ঢলে এসেছে, সারা আকাশ ছায়া-মেদুর। নবীনকুমারের কক্ষের জানালাগুলি খোলা, সেখান দিয়ে আসছে তাপহীন, কোমল বাতাস।

নবীনকুমার চোখ চেয়ে আছে দেখে কুসুমকুমারী বললো, ঠাকুরপো, একটু

ওষুধ দি?

নবীনকুমার দেখলো, তার সামনে রাত্রিবেলার গন্ধরাজ পুষ্পের মতন একটি মুখ, দুটি নীল রঙের চক্ষু, নদীতটের মতন কপাল, ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিত চুল। সেই দৃষ্টিতে যেন আলো...

নবীনকুমার নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিল এক পাশে। বুক ভর্তি নিশ্বাস টেনে সে খুব আস্তে আস্তে বললো, ব-ন-জ্যো-ৎ-স্না!

তারপর তার ঘাড় ঢলে গেল।

এ এক অদ্ভুত আলোক, ঊষা কিংবা গোধূলি, ঠিক বোঝা যায় না। ছায়া ছায়া, হিম, পট পরিবর্তনের সামান্য চঞ্চলতা মাখা। দীর্ঘ ঘুম অকস্মাৎ ভাঙলে যেমন হয় সব কিছুই অচেনা লাগে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের অবস্থানটা ঠিক ঠাহর হয় না। ঈষৎ শীতের আমেজে গায়ে লেপটে থাকে একাকিত্বের আলোয়ান, মনে হয় আর কেউ নেই, অথবা আত্মীয় বন্ধু শুভার্থীরা অন্য কোথাও এক স্থানে জড়ো হয়ে ডাকছে, এসো, এসো...শুধু একজনেরই সেখানে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেই রকম আলো আজ ছড়িয়ে আছে নগরীতে।

প্রকৃতি চলে নিজের নিয়মে, তেমনই এই জীবন। দ্বিপ্রহরে কালো মেঘ কিংবা কাক-জ্যোৎস্নায় প্রকৃত আলো-অন্ধকারের রূপের কোনো হেরফের হয় না। অপরাহ্ণের পর ঠিকই সন্ধ্যা নামে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলেই জেগে থাকে। সদ্য অন্ধকার হওয়া রাজপথ মাঝে মাঝে জুড়িগাড়ির সহিসের তল্পিদারের হাতের মশালের আলোয় ঝলসে ওঠে। কোনো কোনো বৃহৎ অট্টালিকার ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আভা এসে বাইরে পড়ে। পগারের পাশ দিয়ে সাবধানে কোঁচা সামলিয়ে বাড়ি ফিরছেন হৌসের বাবুরা। অবস্থাপন্ন বাবুরা তখন বাড়ি থেকে নির্গত হচ্ছেন ফেটিং, সেলফ ড্রাইভিং, বগি বা ব্রাউহামে, ফ্রেন্ড ও মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়া খেতে।

বেলফুলওয়ালা তার ধামায় গুছিয়ে রাখছে তার সন্ধের সওদা। দিন-আনি দিন-খাইরা মুদি দোকানে চাল কেনবার জন্য ভিড় জমিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে শঙ্খের ফুঁ, কাঁসর ও ঘন্টার আওয়াজ। পূজিত হচ্ছেন বড় বড় অট্টালিকাগুলির গৃহদেবতা এবং বিভিন্ন হরিসভা, কীর্তন সভা ও মন্দিরের দেব-দেবীগণ। ব্রাহ্ম সমাজগুলির কয়েকটিতে উপাসকেরা জড়ের মতন নিস্তব্ধ—একমাত্র তাদের আচার্যরা অনর্গল সরব। অন্য কোথাও সদ্য প্রবর্তিত ভক্তিরস, নাচ-গান ও কীর্তনে ভক্তেরা প্রায় উন্মাদ, কেশবচন্দ্র সেনকে অনেকে স্বয়ং চৈতন্য-জ্ঞানে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

মসজিদে মসজিদে শেষ নামাজের পর মুসলমানদের পৃথক পৃথক জটলা, তাদের ভুরুর নিচে প্রগাঢ় ছায়া, বক্ষে আহত অভিমান। নতুন রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষিতে এত দিন পর্যন্ত তাদের চক্ষে ছিল বিদ্রুপচ্ছটা, এখন

দুশ্চিন্তা। লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অনেকের হৃদয় ফুঁসছে, কেউ কেউ গা ভাসিয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের সঙ্গে, কেউ কেউ এতদিন পর মনে করছে, এবার সন্তানদের মাদ্রাসা থেকে ছাড়িয়ে ইংরেজি শেখার ইস্কুলে আর ভর্তি না করালেই নয়।

গীর্জাগুলির শান্ত গম্ভীর পরিবেশে চলেছে সুমহান গান। কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মান্তরিতরা এই স্বপ্নে মশগুল যে, এখন তারাও বুঝি রাজার জাতের সমান। হঠাৎ বিদেশী শিক্ষার আলোয় চক্ষু ধাঁধিয়ে যাওয়া যুবক, পথভ্রষ্টা কিংবা নির্যাতিতা রমণী এবং শত শত অনাহারক্লিষ্ট মানুষ শরণ নিচ্ছে করুণাময় প্রভু যীশুর। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট এবং অন্যান্য ডিনোমিনেশানের চার্চের প্রতিনিধিদের মধ্যেও শুরু হয়েছে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা, কে কত বেশী অজ্ঞ ভারতীয়কে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসবে।

সাহেবপাড়ার আর্দালিরা দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ছোট বেতের টেবিলের ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখছে শেরি, শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডির বোতল এবং নানাবিধ ক্রকারি। গড়ের ময়দানে রাইডিং সেরে এসে তাদের মনিব শ্রান্তি মোচনের জন্য চোটা পেগ-এর হুকুম দেবেন। মেম বিবিরা শয়নকক্ষের দেয়ালে সাঁটা বিশাল বেলজিয়াম দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সারবার আগে প্রায় মুক্ত-বসনা হয়ে শরীরের ঘামাচিগুলি মেরে নিচ্ছে। ভ্যাপসা গরমের দেশে এই এক জ্বালা।

উচ্চবর্ণের রাজপুরুষগণ সপ্তাহান্ত ব্যারাকপুরের প্যালেসে কাটাবার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেখানে ভাইসরয়ের পার্শ্বচর হয়ে মধ্যরাত্রে শৃগাল শিকার উৎসবে অংশ নিতে হবে।

সিমলে, হাটখোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজারের বনেদী বাবুরা প্রকাণ্ড দিবানিদ্রা থেকে উঠে বিশ্রাম করে নিচ্ছেন একটু। নব্য বাবুদের বাড়ির ভিতর মহলে ঠাকুরঘরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতি, মাইনে করা পুজুরি বামুন এসে নারায়ণ শিলার গায়ে গাঁদা ফুলের ঠোক্কর মেরে দ্রুত কাজ সারছে। আর বার-মহলে নব্যবাবু তাঁর সতীর্থদের নিয়ে নানা উচ্চাঙ্গের বিষয় ডিসকাশন করছেন।

সেই রকম এক আলোচনার নমুনাঃ

এক নব্যবাবু জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের মন্থর সন্ধ্যা ও পথের ধারে পুকুরের জলে গাছগুলির অপসৃয়মান রক্তিম ছায়া দেখে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বললেন, কী বিউটিফুল সীনারি! এ যেন কাণ্টস্টেবল-এর আঁকা ওয়াটার কলারের এক ছবি!

তাঁর এক সুহৃদ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, ওহে, কী বল্লে? কী বল্লে? ও নাম অমনভাবে প্রনানসিয়েট কত্তে নেই।

—কোন্ নাম?

—ঐ যে আর্টিস্টের নামটি বললে। ও নামের প্রথম সিলেব্‌লটি যে রুচি দুষ্ট, অশ্লীল!

প্রথম বাবুটি প্রথমে একটু দমে গেলেও ইংরেজি জ্ঞানে তাঁর কোনো বন্ধুর কাছে হেরে যাবার পাত্র নন। তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, ও, তুমি কাণ্টস্টেব্‌ল-এর বদলে সেই থিংসটেবলের ব্যাপার বলচো? এ যে দেখি সাক্ষাৎ মিসেস গ্র্যাণ্ডি! জানো, শেক্সপীয়ার ঐ অবসীন শব্দটি কীভাবে ম্যানেজ করেছিলেন? টুয়েলফথ নাইটে আচে, 'বাই মাই লাইফ, দিস ইজ মাই লেডীজ হ্যান্ড! দিজ্ বী হার সিজ (বড় হাতের সি, বুঝলে?) হার ইউজ, (এটাও ক্যাপিটাল)

অ্যান্ড হার টিজ (টি ক্যাপিটাল, আর ঐ অ্যান্ড-এর মধ্যে এন আছে)...তা হলে কী হলো?

—আরে ছি, ছি, ছি, ছি। ওটাই তোমার মনে পড়লো? শেক্সপীয়রই কি ঐ শব্দটির বদলে 'ডিয়ারেস্ট বডিলি পার্ট' কিংবা 'পিকিউলিয়ার রিভার' ব্যবহার করেননি?

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ডিয়ারেস্ট বডিলি পার্ট...পিকিউলিয়র রীভর...কী চমৎকার লাইভলি ডেসক্রিপশান! এও তো ছবি!

এইভাবে আলোচনা আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর দিকে চললো। বাবুদ্বয় ইংরেজি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। এবং মস্তিষ্ককে চাংগা করবার জন্য খোলা হলো ব্র্যান্ডির বোতল।

শহর গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শহরতলী। সাবেকী আমলে যেখানে ছিল ব্যবসায়ী থেকে রূপান্তরিত নগরবাসী জমিদারদের বাগানবাড়ি। এখন সে সব স্থান আর তেমন নিরালা নেই, ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠছে ছোট ছোট বাড়ি, গ্রাম থেকে আসা এক পুরুষের চাকুরিজীবীরা সেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী আসছে রজক, পরামানিক, তন্তুবায় প্রভৃতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে ক্ষুদ্র কৃষকেরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন দাসে, দিন মজুরির আশায় তারাও শহরে আসছে স্রোতের মতন। শুধু বাংলা নয়, উড়িষ্যা, বিহার, এমনকি সুদূর উত্তরপ্রদেশ থেকে।

শহরতলীর বাইরে গ্রাম। রোদ্দুর মিলিয়ে যাবার সংগে সংগেই সেগুলি নিস্তেজ। শত সহস্র যোজনব্যাপী সেই অন্ধকার নিস্তব্ধতা।

শহর আছে, শহরতলী আছে, গঞ্জ, গ্রাম আছে, কিন্তু দেশ নেই। কাবুল-কান্দাহার থেকে কন্যাকুমারিকা, বর্মা দেশ থেকে দ্বারকা পর্যন্ত ইংরেজ বেঁধে রেখেছে শাসন শৃংখলে, কিন্তু এটা কার দেশ? সিসিলি দ্বীপের এক উগ্র চরিত্রের পুরুষের সংগে প্যারিস শহরের এক সুশিক্ষিত, নম্র, রুচিবান নাগরিকের যতখানি অমিল, একজন আফ্রিদি, বেলুচিস্থানের পাঠানের সঙ্গে আসামের কোনো ভদ্র বৈষ্ণব গৃহস্থের অমিল তার চেয়ে ঢের গুণ বেশী। এরা কেউ কারুকে চেনে না তবু এরা এক দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিত। এই অলীক দেশের অবস্থান নেই কারুর মনে। তবু কেউ দেশ খোঁজে মহাভারতের পৃষ্ঠায়, কেউ মুঘল ইতিহাসে, কেউ বা সার্ভে অফিসের মানচিত্রে।

এই বিপুলাকার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সেই সব দ্বীপে রাত্রির প্রদীপ জ্বালিয়ে এক একজন চিন্তা করে যাচ্ছে ধর্ম সংস্কারের, শিক্ষা বিস্তারের, নারী-মুক্তির, নিজস্ব সংস্কৃতির জাগরণের, রাজা-প্রজা সম্পর্কের উন্নতির, দারিদ্র্য নিবারণের কিংবা চরিত্র পরিশুদ্ধির। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার অতি গোপন স্বপ্নও ঝলসে উঠছে কারুর কারুর চক্ষে। অবশ্য সেই সব আলো তাদের নিজ গৃহের আঙিনা ছাড়িয়ে আর বেশী দূর যেতে পারে না। তবু কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে।

প্রদীপের চেয়েও শহুরে উৎসবের আলোর রোশনাই চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ভোগীদের জন্য নির্দিষ্ট, এখন চলেছে তাদের তাণ্ডব।

রানী এলিজাবেথ জলদস্যু দলপতিদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন,

কারণ তারা এনেছিল ইংলণ্ডের জন্য ধন-সম্পদ। বর্তমান মহারানী ভিকটোরিয়া আগে থেকেই লর্ড বা ব্যারণ উপাধি দিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করছেন এই ভারতভূমিতে ; যাদের কাজ আরও অনেক বেশী ব্যাপক, লুণ্ঠন কার্যের সভ্য মার্জিত রূপ দেওয়া। এই মুহূর্তে ব্যারাকপুরের সুরম্য কাননের মধ্যে নয়ন-বিমোহন বৃটিশ-পসন্দ্ প্রাসাদের ভোজকক্ষে বড় লাট লর্ড মেয়ো সপারিষদ পানাহারে ব্যস্ত। টেবিলে সামান্য আদব-কায়দার ত্রুটি হলে তিনি বিরক্ত হন। তাঁর পোশাকে, চলনে-বলনে সূক্ষ্ম রুচি ও আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁর সুন্দর মুখশ্রী দেখে কে বলবে যে তিনি আসলে একটি সুশিক্ষিত দস্যু দলের সর্দার হয়ে এখানে বিরাজ করছেন! তাঁর স্বজাতীয় ইতিহাস লেখকরাই আবার নাদির শা, তৈমুর লংকে দস্যু আখ্যা দিয়ে হীন করেছে, যদিও মহারানীর প্রতিনিধিদের তুলনায় নাদির, তৈমুর নিতান্তই শিশু!

লুণ্ঠনের সময় স্থানীয় কয়েক জনের সাহায্য পেলে কিছুটা সুবিধে হয়। তারাও লুণ্ঠিত সম্পদের ছিঁটেফোঁটা ভাগ পায়। সেই ছিটেফোঁটার ভাগীদাররাই এখন দেশীয় সমাজের শিরোমণি ধনী। ঐশ্বর্যের আকস্মিকতায় বিহ্বল ভাবটা তাদের এখনো কাটছে না। অর্থ ব্যয়ের জন্য তাদের স্মৃতিতে আছে নবাবী আমলের বিলাস। সুতরাং তারই অনুকরণের চেষ্টা চলছে প্রাণপণে। এ রমণী ভোগ শুধু রতি সুখের জন্য নয়, এ সুরাপান নয় ইন্দ্রিয়ে আগুন জ্বালাবার জন্য, এ সব কিছুই অপরের চক্ষু ঝলসে দেবার উদ্দেশ্যে। তাই এত বেশী বেশী। এত ক্লেদাক্ত, এত অপৌরুষেয়। নেটিভপাড়ার ঝাড়বাতির আলো ঝলমল বাড়িগুলিতে এখন চলছে বিলাসের নামে নতুন ক্লীব ধনীদের দাপাদাপি। আসলে তারা দুঃখী। তারা মনে মনে জানে, তারা চোর কিংবা ছিঁচকে তস্কর, কোনোক্রমেই তারা শ্বেতাঙ্গ দস্যুদের সমকক্ষ হতে পারবে না। বালক যেমন বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তলোয়ার বানিয়ে মনে মনে সেনাপতি সেজে দারুণ বিক্রমে দু' পাশের ভেরেণ্ডা গাছ নিধন করে সেই রকমই এই সব উটকো বড় মানুষরা নিজেদের বিবেক খোওয়া গেছে বলে পয়সা ছড়িয়ে যত পারে অন্য মানুষের বিবেক চূর্ণ করে যাচ্ছে। ব্যতিক্রম দু-চার জন মাত্র।

মধ্যরাত্রির রাজপথে হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায় অনেক মানুষের কোলাহল ও হাসির গর্রা। বাঘের পশ্চাতে ফেউ-এর মতন কোনো নেশাখোর বড় মানুষের সঙ্গে চলেছে গাদাগুচ্ছের দালাল ও ফড়ে। এ দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায়, আবার বাঙালদেশ থেকে কোনো উট্‌কো জমিদার শহরে এসে পয়সা ছড়াচ্ছে। পূর্ব বাংলার কোনো ধনী এলে শহুরে ফন্দীবাজদের মধ্যে বড় ধূম পড়ে যায়। এদের দু'চারটি উৎকট বাতিক সহ্য করতে হয় বটে কিন্তু এদের চিবিয়ে, চুষে, নিঙড়িয়ে সর্বস্বান্ত করতে বেশী দেরি লাগে না।

রাত্রির পর ভোর আসে। প্রতিটি ভোরই প্রতীক্ষার. মনে হয় নতুন কিছু ঘটবে।

নবীনকুমার বিভ্রান্তিকর আলোর স্বরূপ চিনে যেতে পারলো না। জীবনের শেষ কথাটি উচ্চারণ করে অপরাহ্নে তার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়েছিল, তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল পরদিন প্রত্যূষে। তার সৌন্দর্য-পিপাসু মন পূর্ণ যৌবনে এসে একটা বাঁক নিয়েছিল, অকস্মাৎ তাকে চলে যেতে হলো।

বেলা এখন দশটা। সারা বাড়ি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সম্মিলিত কান্নার ধ্বনি থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে, এখন যেন কারুর চলাফেরারও কোনো শব্দ নেই। সব কটি ঘরের দরজা এবং সিংহদ্বার হাট করে খোলা। শোকের বাড়ি দেখলেই চেনা যায়।

সরোজিনী অজ্ঞান হয়ে আছে, তার মাথাটি কোলে নিয়ে পাষাণ মূর্তির মতন বসে আছে কুসুমকুমারী। তার দৃষ্টি একেবারে স্থির। পা টিপে টিপে অন্য স্ত্রী-লোকেরা এসে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে সেখানে। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। কিন্তু কুসুমকুমারীর যেন বাহ্যজ্ঞান নেই। তার কানের কাছে দ্রিমামা ধ্বনির মতন বাজছে একটি নাম, এটা যে তারই অপর একটি নাম তাও ঠিক বলা যায় না, কারণ, এই নাম ধরে তো কেউ কোনোদিন তাকে ডাকেনি! তার পুতুল খেলার সংগী, ভাগ্যচক্রে যে একদিন তার দেবর হয়েছিল, সে কি মৃত্যুকালে তাঁকে ঐ নাম ধরে ডাকলো, না নামটা শুধু মনে করিয়ে দিল? এ নামের যে কী সার্থকতা, তা তো কুসুমকুমারী জানে না। তার জীবনেরই বা কী সার্থকতা? এই প্রশ্ন কিছুদিন ধরেই কুসুমকুমারীর চিন্তায় ঘুরে ঘুরে আসছে। মানুষ বেঁচে থাকে কোন্ প্রত্যাশায়? তার জীবনটার বদলে কি নবীনকুমার বেঁচে থাকতে পারতো না? কাল সারা রাত কুসুমকুমারী ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করেছে ব্যাকুলভাবে, হে ঠাকুর, আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই, আমার জীবনের বিনিময়ে ওঁকে বাঁচিয়ে তোলো! হে ত্রিলোকেশ্বর, হে বিপন্নপালক, হে করুণাময়। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনটা নিয়ে আপনি ওঁকে পৃথিবীতে রাখুন। উনি অনেক মানুষকে দেখবেন, আমি কাকে দেখবো?

কুসুমকুমারীর চক্ষু এখন শুষ্ক, কিন্তু যতক্ষণ অচেতন নবীনকুমারের বক্ষে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু ছিল, সে তার সব অশ্রু ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছে। কিন্তু তিনি বধির ও দৃষ্টিহীন, অথবা সামান্য কোনো নারীর অশ্রুর কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে।

সিংহদ্বারের কাছে এবার খানিকটা গুঞ্জন শোনা গেল, কয়েক জন ছুটে গেল সেদিকে। কুসুমকুমারী একই রকম অনড়ভাবে বসে রইলো।

বাইরে পাল্কী থেকে নামলেন বিধুশেখর। এখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তাঁর নাতি প্রাণগোপাল সংগে এসেছে, তিনি তার স্কন্ধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন সিংহসদনের দিকে।

বিম্ববতীর গৃহত্যাগের পর তিনি আর এ গৃহে আসেন নি। অনেক বছর হয়ে গেল। এক সময় এখানে প্রতিদিন না এলে তাঁর চলতো না। বিম্ববতী চলে যাবার পর থেকেই বিধুশেখরের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই শতাব্দীর ঠিক প্রথম বছরে তাঁর জন্ম। এমন কী-ই বা বয়েস হয়েছে তাঁর, শতাব্দী শেষ হতে এখনো অন্তত তিরিশ বছর বাকি। হয়তো সেই পর্যন্ত এমন পংগু অবস্থাতেই বিধুশেখর বেঁচে থাকবেন।

সমগ্র প্রাসাদটির ওপর বিধুশেখর তাঁর এক চক্ষুর দৃষ্টি বোলালেন। এতদিন পরে এলেও এখনো এ-বাড়ি তাঁর নিজের বাড়ি বলে মনে হয়। এ বাড়ির মানুষদের নিয়তিও তাঁর করায়ত্ত ছিল, তিনি ইচ্ছে করলে এই অট্টালিকা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারতেন যে-কোনো দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধুশেখর বললেন, চল্।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে এখন তাঁর শরীরের সব কটি হাড়ের জোড়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। মুখবিকৃতি না করেও কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেই তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

গঙ্গানারায়ণ ছুটে এসে অন্য দিক থেকে তাঁকে ধরতে আসতেই তিনি হাত তুলে বললেন, থাক, থাক, আমি নিজেই পারবো।

বিধুশেখর এখনও গঙ্গানারায়ণের স্পর্শ বাঁচিয়ে থাকতে চান। বরাবরই তিনি যত দূর সম্ভব অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন। তাঁর নাতি প্রাণগোপাল এখন বেশ বলিষ্ঠকায় কিশোর। সেও একলা দাদুকে টেনে তুলতে পারছে না।

বিধুশেখর আবার দু ধাপ উঠলেন। হাঁপরের মতন ওঠা-নামা করতে লাগলো তাঁর বুকের পাঁজরা।

গঙ্গানারায়ণ বললো, এক কাজ কল্লে তো হয়, আপনি একটা চেয়ারে বসুন, তারপর ক'জনে সেই চেয়ারসুদ্ধু আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে আপত্তি না জানিয়ে বিধুশেখর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গানারায়ণ নিজে ছুটে ওপরে গিয়ে তার পিতার লাল রেশমি গদি মোড়া মেহগনি কাঠের কেদারাটি নিয়ে এলো। বিধুশেখরকে সেটাতে বসিয়ে তিন-চারজন মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলো নবীনকুমারের ঘরে।

ধপধপে সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা, হাত দুটি বক্ষের ওপরে আড়াআড়ি, নিমিলিত-চক্ষু নবীনকুমারকে দেখলে মনে হয়, কেউ নাম ধরে জোরে ডাকলেই সে জেগে উঠবে।

কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিধুশেখর চলে এলেন নবীনকুমারের শিয়রের কাছে। তারপর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়তে লাগলো। যেন তিনি কোনো কথা বলছেন, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোনো স্বর বেরুচ্ছে না।

ঘরে বহু লোক এসে ভিড় করেছে। বিধুশেখরকে সমীহ মিশ্রিত ভয় করে না এমন কেউ নেই। সেই জন্য কেউ কোনো শব্দ করছে না এবং সকলেই চেয়ে আছে বিধুশেখরের দিকে।

একবার মুখ ঘুরিয়ে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতন বিধুশেখর মানুষগুলিকে দেখলেন। তাঁর মুখে শোক-তাপের কোনো ছাপ নেই। তিনি যেন কাকে খুঁজছেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? এ কি সত্যিই আমাদের সেই ছোট্‌কু?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, তাই সকলেই নীরব রইলো। পিছন দিকে ফুঁপিয়ে উঠলো ক'জন। শোকের বাড়িতে সকলেই যে শোকে কাঁদে তা নয়। কাঁদতে হয় বলেও অনেকে কাঁদে।

—ছোট্‌কুর এমন কঠিন ব্যামো হয়েছে, আমায় কেউ কোনো খবর দেয়নি কেন?

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর হয় না। শয্যাশায়ী, রুগ্ন বিধুশেখরকে আগে খবর দিলে সুরাহা তো কিছু হতো না, বরং তাঁকেই অকারণে উদ্বিগ্ন করা হতো।

নাতির দিকে ফিরে বিধুশেখর বললেন, গোপাল, ছোট্‌কুকে যে আমি তোর মতন বয়েসী দেকেচিলুম, বড় দুরন্ত, বড় তেজী। কিন্তু কী মেধা! তারপর কবে সে এত বড়টি হলো, কিচুই তো মনে পড়চে না! আমায় কিচু না জানিয়ে ও চলে গেল? অ্যাঁ?

প্রাণগোপাল বললো, দাদু, আপনি অন্য কোনো ঘরে বসবেন চলুন।

বিধুশেখর শুষ্ক স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তাই চ। আমি আর এখেনে থেকে কী করবো।

বৃদ্ধ দিবাকর এসে বললো, বড়বাবু, বলচিলুম কি...।

দিবাকর বুঝেছে যে বিধুশেখর যখন এসে পড়েছেন, তখন পরবর্তী কার্য-কলাপগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়েই ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন।

দিবাকর আবার বললো, বলচিলুম কী, বাইরে আরও লোকজন এসেচে, এখুন অনেক লোক আসবে। তাই জন্য খাটখানা ধরে নিচে নিয়ে রাকলে হয় না?

বিধুশেখর বললেন, তা ঠিক। অনেক লোক আসবে, শহর ভেঙে পড়বে। ছোটকু কত লোককে বিনিপয়সায় মহাভারত দিয়েচে। কত মানুষের সাহায্য করেচে...

প্রাণগোপাল আবার বললো, দাদু, আপনি অন্য ঘরে চলুন, সেখেনে বসে কতা বলবেন—

বিধুশেখর আর একবার মুখ ফিরিয়ে ভূতপূর্ব নবীনকুমারকে দেখলেন।

তারপর একেবারেই অকস্মাৎ প্রাণগোপালকে ছেড়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নবীনকুমারের শবের ওপর। নদীর বাঁধ ভাঙা বন্যার মতন তীব্র হাহাকারে কান্নায় তিনি বলতে লাগলেন, ছোটকু, ছোটকু, তুই চলে গেলি! ওরে, আমার মুখাগ্নি কে করবে? ছোটকু...ছোটকু...ওরে, তুই যে আমার সব...আমাদের কত পুণ্যের ফলে তুই আমাদের ঘরে এসিছিলি...ছোটকু, ছোটকু। তুই তোর মায়ের কাচে যাচ্চিস... আমাকে ফেলে গেলি...।

এই সুদীর্ঘ জীবনে বিধুশেখর কম মৃত্যু দেখেন নি। সবাই বলে, ওঁর বুক-খানা পাথর দিয়ে গড়া। তাঁর চোখের সামনে তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, তাঁর ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ রামকমল সিংহ শেষ চক্ষু বুজেছেন তাঁরই কোলে মাথা রেখে, তবু কখনো তিনি স্থৈর্য হারান নি। সেই বিধুশেখরকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সারা বাড়ি থেকে লোক ছুটে এলো এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখবার জন্য।

নবীনকুমারের মুখখানি চেপে ধরে প্রবল কান্নার সঙ্গে বিধুশেখর ঐ কথা-গুলিই বলে চলেছেন বারবার। তাঁকে টেনে তোলা যায় না।

শেষ পর্যন্ত জোর করেই তাঁকে তুলে আনতে হলো। কারণ পোস্তার রাজার এক ভাই ও রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস নবীনকুমারকে শেষ দেখার জন্য এসেছেন। আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অপেক্ষা করছেন নিচে।

বিধুশেখরকে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো অন্য একটি কক্ষে। তিনি কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। এখানে সব শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবেন। তিনি বালকের মতন অবোধ হয়ে পড়েছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছেন, না, না, না, তোরা আমায় যেতে বলিস না।

বার বার তিনি উঠে নবীনকুমারের কাছে যেতে চান। তাঁকে ধরে বসে রইলো প্রাণগোপাল।

সেই অবস্থায় বিধুশেখর রইলেন মধ্য দুপুর পর্যন্ত। তখন শোনা গেল এবার মৃতদেহ বাড়ির বার করা হবে। পুরোহিতগণ সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। সে কথা শুনে বিধুশেখর বললেন, তিনি আবার দেখতে যাবেন ছোটকুকে।

শয্যায় উঠে বসে তিনি এক হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে অশ্রু মার্জনা করতে

লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখখানি বদলে যেতে লাগলো। তাঁর সুস্থ চক্ষুটিতে ঝিলিক দিল পুরোনো কালের ব্যক্তিত্ব। একটু সামলে নেবার পর তিনি কঠোর গলায় বললেন, শুধু তাই নয়, আমি শ্মশানেও যাবো। ছোটকু অপুত্রক অবস্থায় মরেচে, আমি তার মুখাগ্নি কর্বো। গোপাল, তুই গিয়ে গঙ্গাকে বল—।

গঙ্গানারায়ণের এখন কান্নাকাটি করার অবকাশ নেই। সব কিছুর বন্দোবস্ত করার জন্য তার দিশেহারার মতন অবস্থা। অবশ্য দ্বিপ্রহরের পর তার বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাস, রাজনারায়ণ ও বেণী এসে পড়েছেন। তাঁরা পরামর্শ দিতে লাগলেন।

একটি নতুন পালঙ্ক, নতুন গদি-বালিশ-চাদর ও ফুলমালা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে শেষ শয্যা। নবীনকুমারকে সাজানো হয়েছে বর-বেশে, এখনো তার মুখখানি তাজা। কয়েকজন মিলে যখন ধরাধরি করে নবীনকুমারের শরীরটি তুলছে, তখন প্রাণগোপাল সেখানে দাঁড়িয়ে।

প্রাণগোপাল এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে, অতিশয় মেধাবী ছাত্র। এই বয়েসেই সে রুশো-ভলতেয়ারের রচনা পড়ে ফেলেছে এবং কোঁৎ-এর পজিটিভিজমের তুলনায় সে রুশোর সাম্যতত্ত্ব বেশী পছন্দ করে। নবীনকুমার অনুবাদিত মহাভারতও সে পড়েছে। নবীনকুমারকে সে ছোট মামা বলে ডাকতো। কিন্তু নবীনকুমারের সঙ্গে তার ঠিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। দূর থেকেই সে নবীনকুমারের প্রতি ভক্তিমিশ্রিত অনুরাগ পোষণ করেছে।

প্রাণগোপাল দেখলো, নবীনকুমারকে তোলার পর তার প্রাক্তন শয্যা থেকে একটি কাগজ উড়ে গিয়ে নিচে পড়ল। কাগজটি নবীনকুমারের শরীরের তলায় চাপা পড়ে ছিল। তাতে অনেক কিছু লেখা। তার ওপর ছিটে ছিটে রক্ত লাগা। তবু, কৈশোরের কৌতূহলে সে তুলে নিল কাগজটি।

কিন্তু তখনই কাগজটির লেখাগুলি পাঠ করার সুযোগ সে পেল না। সেই মুহূর্তে একটি গোলযোগ ঘটলো।

আলুথালু পোশাকের একটি লোক ছুটে এসে দু' হাত তুলে নৃত্য করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। নবীনকুমারের দেহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে বলতে লাগলো, ওহে নবীন, ভুল, ভুল! তুমি যা বলোচো, তাও ভুল! দেবেন্দ্রবাবু, কেশববাবুও ভুল বলেচেন। ভগবান নেই! বুঝলে, নেই, নেই! শালা খিদেই হচ্ছে ভগবান। খিদের চেয়ে আর বড় কিছু নেই!

চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে অন্যদের চিনতে পারার কথা নয় যে এই লোকটিই যদুপতি গাঙ্গুলী। অনাহার ও অপমানের জ্বালায় কিছুদিন আগে তার এক ভাগিনেয় আত্মঘাতী হয়েছে। সেই থেকেই যদুপতির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে একটু একটু।

যদুপতিকে ঠেলে সরিয়ে দেবার পর একজন মন্তব্য করলো, একটা আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো, এরকম কোনো বিশিষ্ট মানুষের মৃত্যু হলেই দু'-চারজন লোক পাগ্‌লা হয়ে যায়। এরকম আমি অনেকবার দেকিচি।

শবযাত্রা শুরু হবার পর বিধুশেখর সত্যিই জেদ ধরে গেলেন শ্মশানে। তাঁকে তোলা হলো একটি পাল্কীতে। প্রাণগোপাল আর গেল না। এ বাড়ির অন্দরমহলে সে খুবই কম এসেছে, এখন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

কুসুমকুমারীর কোল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরোজিনীকে। কুসুমকুমারী তবু সেইরকম জোড়াসনে বসে আছে একই জায়গায়। কয়েকজন স্ত্রীলোক তাকে নানা কথা বলে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কুসুমকুমারী নিশ্চুপ। দ্বারের

পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণগোপাল কুসুমকুমারীকে একটুক্ষণ দেখলো, তার মনে হলো, ইনিই কি সদ্য বিধবা হয়েছেন?

শ্মশানের কাজ শেষ হলো অনেক রাত্রে। নিজের কক্ষে এসে শুতে যাবার আগে সেজবাতিটি নেভাতে গিয়ে প্রাণগোপালের মনে পড়লো সেই কাগজটির কথা। সে কামিজের পকেট থেকে কাগজটি এনে মেলে ধরলো আলোর সামনে।

কাগজটিতে নবীনকুমারেরই হস্তাক্ষর, তবে খুবই কাঁপা কাঁপা। অসুস্থ অবস্থায় একেবারে শেষ দিকে নবীনকুমার এতে লিখেছে, হয় তো সবাই যখন ঘুমন্ত সেই সময়ে জেগে ওঠে, বুকের প্রদাহ ভুলবার জন্য।

...আমি পুরোপুরি ভোগের মধ্যে কখনো ডুব দিতে পারিনিকো। কেউ যেন আমার ঘাড় ধরে পেছোনে টেনেচে, আবার পুরোপুরি মোহমুক্ত হতেও পারিনি, কেউ যেন আমায় ঠেলে দিয়েচে মোহের দিকে।

...এক দুর্ভাগা জাতির আমি সন্তান, যে জাতি আজিও পর-পদানত। এখন আমি নিজেকে দিয়া সেই জাতির সকলকে বিচার করিতেছি। আমি অনেক সময়েই কোন্ দিক সম্মুখ আর কোন দিক পশ্চাৎ-অপসরণ তাহা চিনতে পারি নাই।

...এ অজ্ঞানের ঘোর কবে কাটিবে? পূর্ব পুরুষের পাপ আমারে দংশিল কি?

...ধর্ম বলো, জাতি বলো, শিক্ষা বলো আর সাহিত্য বলো, যদি সকলকে এক সঙ্গে জড়াইতে না পারে, তা হইলে কোনো সুফল নাই...আর, আমার বুকে বড় ব্যথা, এ কি আমার সব ভুলের জন্য? হ্যাঁ, ভুল করিচি, আবার ঠেকে শিকেচিওতো বটে...চন্দ্রনাথের নিকটে সে রমণীকে দেখিয়াছিলাম, কেন তাহার কথা এখনো এত মনে পড়িতেছে? তিনি আমার কে?...

...খুব বাসনা ছিল পরের শতাব্দীটি দেখে যাবো...কতই বা দূর! সেই এক রাত্রে ঘন ঘন তোপধ্বনির মধ্যে এই শতাব্দীর অবসান হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিবে...মনশ্চক্ষে যেন দেখিতে পাই...তাহা কত আলোকোজ্জ্বল...কত আনন্দময় ...হে অনাগত যুগ, তোমার জয় হউক!

...মরিতে ইচ্ছা করে না, যে-যাহাই বলুক, আমার একেবারেই মরিতে ইচ্ছা করে না! আমায় বাঁচিতে দাও, আমায় বাঁচিয়ে দাও, বড় সাধ...।

এলোমেলো এবং অসমাপ্ত রচনা। প্রলাপের সময় নবীনকুমার যা বলছিল যেন তারই বাকি অংশ। প্রাণগোপাল সেই লেখাগুলি পাঠ করলো কয়েকবার।

কৈশোর বড় আত্মকেন্দ্রিকতার সময়। এই বয়েসে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত দুঃখ ছাড়া অপরের দুঃখ সম্পর্কে মনোযোগ দিতে চায় না। কৈশোরে আগুন বড় বেশী। কান্না সেজন্য কম। আজ সারাদিনে প্রাণগোপাল একবারও অশ্রুপাত করেনি। এখনো সে কাঁদলো না। ঐ কাগজখানি হাতে নিয়ে সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। শত শত তোপধ্বনির মধ্যে আলোকোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর পদপাতের কথাটাই তার মনে লেগেছে বেশী। যেন সে সেই দিনটি দেখতে পাচ্ছে। তার চোখে এসে লাগছে সেই সুদূরের অন্যরকম আলোর আভা।

॥ সমাপ্ত ॥